নবীনচন্দ্রের গ্রন্থাবলী।

দ্বিতীয় খণ্ড।

—•—

কলিকাতা,

৭০নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, ধন্বন্তরী ষ্টীম মেশিন যন্ত্রে

শ্রীঅশ্বিনীকুমার হালদারের দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩১১ সাল।

আমার

সরলা স্নেহময়ী শোকসন্তপ্তা

স্বর্গীয়া জননীর

পবিত্র চরণাম্বুজে

সদ্য-শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে

এই শোক-কাব্য

উৎসর্গ করিলাম।

ণাঘাট, ৩০ শে বৈশাখ,
১৩০০ সাল।

নবীন।

নিবেদন।

—*—

'কুরুক্ষেত্র' স্বতন্ত্রকাব্য হইলেও ইহার উপাখ্যান ভাগ কিঞ্চিৎ পরিমাণে 'রৈবতকের' সঙ্গে গাঁথা। ইহার অনেক চরিত্রের উন্মেষ 'রৈবতকে'। অতএব 'রৈবতক' না পড়িলে 'কুরুক্ষেত্রের' সম্যক্ কাব্যরস উপলব্ধি হইবে না। 'রৈবতকের' ভিত্তিভূমি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আদ্যলীলা, 'কুরুক্ষেত্রের' ভিত্তিভূমি তাঁহার অনন্তকালস্পর্শী মধ্যলীলা।

আমার পুত্রপ্রতিম

ভাগিনেয়

৺কামিনীকুমুদ সেন

প্রাণাধিক,

তোমার বড় আদরের কুরুক্ষেত্র,—নানা কারুকার্য্যে খচিত করিয়া মুদ্রিত করিবে বলিয়া তুমি যে 'কুরুক্ষেত্রের' মুদ্রাঙ্কন দুই বৎসর যাবৎ স্থগিত রাখিয়াছিলে,—তুমি রোগ-শয্যায় শায়িত হইলে যে 'কুরুক্ষেত্রের' আভরণহীন মুদ্রাঙ্কন আরম্ভ হইয়াছে শুনিয়া তুমি এত অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলে,—আজ সে কুরু-ক্ষেত্রের মুদ্রাঙ্কন শেষ হইল, আর তুমি কি আজিই একটি পবিত্র সুখস্বপ্নের মত অন্তর্হিত হইলে ? তুমি যে একবার মুদ্রিত কুরুক্ষেত্র দেখিয়াও গেলে না আমার এ দুঃখ কোথায় রাখিব ? আমি একটি শিশু-শোক-স্মৃতির সহিত 'কুরুক্ষেত্র' আরম্ভ করিয়াছিলাম, জানিতাম না তোমার শোক-স্মৃতি ইহার শেষের সহিত জড়িত হইয়া থাকিবে। ভগবানের যে শোক আমি কল্পনায় অনুভব করিয়াছিলাম, জানিতাম না যে সেই শোক 'কুরুক্ষেত্রের' মুদ্রাঙ্কনের শেষের সহিত মূর্ত্তিমন্ত হইয়া আমার হৃদয় আচ্ছন্ন করিবে। জানি-তাম না যে,যে মহাচিতা কল্পনার চক্ষে দেখিয়াছিলাম,তাহা আমার হৃদয়ে চিরজীবনের জন্য জ্বলিবে। তথাপি আমার দুঃখ নাই। তোমার জীবনে বুঝি জন্মান্তরের কিঞ্চিৎ কর্ম্মছায়া ছিল, ২৩ বৎসর কাল ধরাধামে থাকিয়া তাহা অপসারিত করিয়া, তোমার চরিত্রের সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য ও দেবত্ব কোনরূপে কলুষিত হইবার

পূর্ব্বেই তুমি আজ পবিত্র ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে প্রকৃতির শান্তিময়ী মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে "নীরবে শান্তভাবে" দেবলোকে চলিয়া গেলে। যাও বৎস! আমিও পুণ্যব্রতী শৈলজার মত দেখিতেছি——

"ওই সর্ব্ব-শোক-নিবারণ
দাঁড়াইয়া নারায়ণ শান্তিপ্রস্রবণ।"

আমিও শৈলজার মত সেই——

"শান্তির ত্রিদিব-বুকে,
পুত্রে সমর্পিয়া সুখে,
করি আমাদের শোক চরণে অর্পণ,
গাব সুখে কৃষ্ণনাম জুড়াবে জীবন।"

রাণাঘাট, ৩০ শে বৈশাখ,
১৩০০ সাল।

তোমার শোকে সন্তপ্ত
নবীন।

কুরুক্ষেত্র।

প্রথম সর্গ।

———:*:———

ধর্ম্মক্ষেত্র।

—:*:—

"নীরেন্দ্রপ্রতিম নীল নির্ম্মল আকাশ,
শরতের শেষ মেঘে উর্দ্ধে তরঙ্গিত,—
নীরব, নিস্পন্দ, ভীত। নিম্নে তরঙ্গিত
চতুরঙ্গে, রণরঙ্গে ভীম উদ্বেলিত,
গর্জ্জিতেছে রক্তসিন্ধু মহাভারতের
মহাক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র! সান্ধ্য রবিকরে
দেখাইছে রক্তমেঘে প্রতিবিম্ব তার,
নীরব নিস্পন্দ ভীত বিশ্বচরাচরে।
দুই প্রান্তে সংখ্যাতীত সজ্জিত শিবির,

তরঙ্গিত বেয়া যেন স্বর্ণ-পয়োধির।"—
কহিলেন দ্বৈপায়ন শিষ্যে আপনার
দাঁড়াইয়া দূরে বট-বিটপি-ছায়ায়,
কহিলেন—"দেখ বৎস! পৃথিবী আবার
হইতেছে সিক্ত জীব-শোণিত-ধারায়!
কতরূপ মৃত্যুজিহ্ব অস্ত্র ভয়ঙ্কর
উঠিতেছে পড়িতেছে ছাইয়া গগন,—
অসংখ্য বিদ্যুৎগতি তীব্র বিষধর
খেলিতেছে শমনের কি ক্রীড়া ভীষণ!
অস্ত্রের নিস্বন উর্দ্ধে, ঘাত প্রতিঘাত,
কালানল উদ্‌গীরণ; নিম্নে হাহাকার
মিশি সিংহনাদ সহ, অশনি সম্পাত
কোদণ্ড-টঙ্কার ঘোর, শ্রবণে আমার
লাগিতেছে যেন দূর সমুদ্র হুঙ্কার
বাতক্ষুব্ধ, সহ ঘন অশনিঝঙ্কার।"
কহিল বিনীত শিষ্য ভয়ে ব্যাকুলিত—
"কি ভীষণ দৃশ্য, প্রাণ কাঁপে থরথর!
নরকের দৃশ্য যেন সম্মুখে বিস্তৃত!
বীরেরা মানব নহে, শমনকিঙ্কর!
এই পাপ দৃশ্য প্রভু! দেখিলেও হায়!
হয় চিত্ত কলুষিত। নিষ্ঠুর মানব
এইরূপে নিরমম হিংস্র জন্তু প্রায়
নাশে কি হে পরস্পরে—একি অসম্ভব!
মহাক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র পরিণত, হায়!
পাপক্ষেত্রে, এ নরক দেখা নাহি যায়।"
মহর্ষি ঈষৎ হাসি উত্তরিলা ধীরে—

"পাপপুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম, জগতের নীতি,
বড়ই দুরূহ তত্ত্ব। সেই রত্নচয়
অনন্ত তিমিরগর্ভে। হিংসা আর প্রীতি
ঘটনার চক্রে করে স্থান বিনিময়।
নির্ম্মম নিষ্ঠুর এই পাপ অভিনয়ে
শীর্ষ অভিনেতা যিনি নিষ্ঠুর হৃদয়,
দয়ার সাগর তিনি, পুণ্য-পারাবার।
নিরস্ত্র বসিয়া কৃষ্ণ অর্জ্জুনের রথে
সাধিছেন স্থির চিত্তে ক্ষত্রিয় বিনাশ,
ন্যাশিছেন প্রিয়জন-দেখ কত মতে,
হাহাকারে পূর্ণ করি আপন আবাস।
যথা কৃষ্ণ তথা ধর্ম্ম, সেইখানে জয়,—
সতী গান্ধারীর কথা সত্য নিঃসংশয়।"
বিস্ময়ে কহিল শিষ্য,—"হায়! যদি প্রভু!
এই হত্যাকাণ্ড ধর্ম্ম, অধর্ম্ম কি আর?
এই হত্যাকাণ্ড ধর্ম্ম!— হৃদয়েতে কভু
নাহি পায় স্থান, এই হিংসা পারাবার!
না পারি বুঝিতে কিছু। নর-নারায়ণ
কেশব করুণাসিন্ধু বিষ্ণু অবতার,—
জীবে দয়া, বিশ্বহিত, ধর্ম্মসংরক্ষণ,
ইহা ধর্ম্মনীতি,—এই কার্য্য তাঁর?
যেই সুধাকর সুধা করিবে বর্ষণ,
সে কি এই হলাহল বর্ষিছে ভীষণ!"
ব্যাস। সংহার স্রষ্টার নীতি, সৃষ্টির কারণ,
জড়ে ও অজড়ে বৎস! সর্ব্বত্র সমান।
সৃষ্টি স্থিতি লয় দেখ চক্রের মতন

ঘুরিতেছে বিশ্বে, নাহি তিলার্দ্ধ বিশ্রাম,
ধ্বংস বিনা সৃষ্টিস্থিতি, বৎস ! অসম্ভব।
ক্ষুদ্র, তবু না মরিলে ওই তৃণগণ,
নাহি সাধ্য তৃণ অন্য হইবে উদ্ভব ;—
না পারিবে স্থিতি লাভ করিতে কখন।
রুদ্ধ কর মৃত্যুদ্বার, হইয়া বর্দ্ধিত
জীবসংখ্যা আত্মঘাতী হইবে নিশ্চিত।

শিষ্য। মানিলাম ধ্বংসনীতি। সৃজন পালন
যাঁর মায়া, মানিলাম ধ্বংসও তাঁহার।
না পারি একটি বালি করিতে সৃজন,
আমার তাহাতে কিবা আছে অধিকার?
আমি কে?

ব্যাস। তাঁহার অস্ত্র। সৃষ্টিস্থিতিলয়
যেই নীতিচক্রে নিত্য হতেছে সাধিত,
তুমি পরমাণু তার ; সেই নীতিচক্রে
সকলের কর্ম্মক্ষেত্র আছে নিয়োজিত ;—
স্বয়ং নির্লিপ্ত তিনি। এই নীতিবলে
শার্দ্দূল নাশিয়া, বৎস ! ক্ষুদ্র প্রাণী যত,
পড়িছে শার্দ্দূলাধিক কালের কবলে ;
নাশিছে এ বৃক্ষ দেখ তৃণ ছায়াগত।
আংশিক এ ধ্বংসনীতি করিতে সাধিত
জীবদের হিংসাবৃত্তি দত্ত বিধাতার।
এই নীতি অনুসরি যদি নিয়োজিত
কর তাহা, কেন পাপ হইবে তোমার?
পোড়ায় অনল যদি, ডুবায় সলিল,
বল কি তাদের পাপ হয় একতিল?

নিগূঢ় সংসার-তত্ত্ব। হায়! ক্ষুদ্র নর,
কেমনে বুঝিবে তাহা, কে বুঝাবে তারে?
ব্যাস। মহাকাব্য বিশ্বগ্রন্থ—তত্ত্ব-রত্নাকর!
ভাসি এই অনন্তের মহা পারাবারে,
মহাধ্যানে লভিতেছে মহাজনগণ
এই মহা অনন্তের যেই ক্ষুদ্র জ্ঞান,
ধর্ম্মশাস্ত্র নাম তার। শাস্ত্র-অধ্যয়ন,
যোগবল, মানবের শিক্ষার সোপান।
বিপ্লব-ঝটিকা-গর্ভে জন্মি অবতার
করেন জগতে ধর্ম্ম-যুগের সঞ্চার।
শুনিয়াছি দ্বাপরেতে কৃষ্ণ অবতার;
এই ধ্বংস-যজ্ঞ প্রভু! ধর্ম্মশিক্ষা তাঁর?
জীবে দয়া,—জীবহিংসা? সর্ব্বজীবহিত,
সর্ব্বজীবের বিনাশ? এই মহারণ,—
কুরুক্ষেত্র,—ধর্ম্মক্ষেত্র? প্রভু! উৎপাটিত
করিলে কি, এই তরু হবে সংরক্ষিত?
এই ধ্বংস-যজ্ঞ, ধর্ম্ম। কর দরশন
সর্ব্বত্র ধর্ম্মের গ্লানি, অধর্ম্ম প্রবল,
সাধুদের হাহাকার, দুষ্কৃত দুর্জ্জন
বর্ষিতেছে নিরন্তর পাপ-হলাহল।
অধর্ম্মের অভ্যুত্থান, এই পাপভার,
করিতে মোচন বৎস! করিতে প্রচার
মহারাজ্য ধর্ম্মরাজ্য, করিতে প্রচার
ভারতে মহাভারত,—কৃষ্ণ অবতার।
অপূর্ব্ব জীবনলীলা! কংসের নিধন,
উগ্রসেনে রাজ্যদান, আত্মনির্ব্বাসন

নিবারিতে অন্তস্রোত সমুদ্রের পার।
সেই জরাসন্ধ-বধ, অদ্ভুত কৌশল,—
কারামুক্তি, রাজমেধ যজ্ঞ-নিবারণ!
রাজস্যুয়ে পাণ্ডবের সাম্রাজ্য প্রবল
বিনা যুদ্ধে কি কৌশলে হইল স্থাপন!
সর্ব্বত্র নির্লিপ্ত কৃষ্ণ, সর্ব্বত্র নিষ্কাম,
সর্ব্বত্রই দয়াধর্ম্ম আদর্শ মহান্।
ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ধর্ম্মরাজ্য তাঁর
জান যে অধর্ম্মে তাহা হ'লো অপহৃত!
জান সভা মধ্যে সেই ঘোর অত্যাচার
সতী দ্রৌপদীর প্রতি, নরক-অতীত!
বাল-নির্যাতন; জতুগৃহের দাহন;
ত্রয়োদশ বৎসরের ঘোর বনবাস;
সন্ধি তরে স্বয়ং কৃষ্ণ সহি নির্যাতন
পঞ্চগ্রাম ভিক্ষা করি হইলা নিরাশ।
'বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী'—
শুনিয়াছ লোভীর সে প্রতিজ্ঞা ভীষণ।
সাধুদের পরিত্রাণ দুষ্কৃতদমন,
সাধিবারে অনিবার্য্য হ'ল ধর্ম্মরণ।

শিষ্য। মানিলাম দুর্য্যোধন পাপী দুর্ব্বিনীত;
কিন্তু ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ নৃপতিমণ্ডল?—

ব্যাস। পাপের প্রশ্রয়-দাতা,—অধর্ম্মে পতিত,—
জ্বালাইল সবে এই সমর-অনল।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ পঙ্গপাল মত
অসংখ্য বীরেন্দ্র-বৃন্দ না হ'লে সহায়,
হইত কি দুর্য্যোধন এই পাপে রত?

নদীস্রোতে রক্তস্রোত বহিত কি, হায় !
কি অধর্ম্ম অভ্যুত্থান ক্ষত্রিয়-জগতে
ঘটিয়াছে, বৎস ! এই ভীষণ সমর
না হইতে নির্ব্বাপিত, হায় ! কত মতে
দেখিবে তাহার আরো চিত্র ভয়ঙ্কর।
অধর্ম্ম-অনলে, বৎস ! পঙ্গপাল মত
হইবে ক্ষত্রিয়জাতি ভস্মে পরিণত।

শিষ্য। কিন্তু পাণ্ডবের পক্ষ বীরেন্দ্রমণ্ডল
মরিতেছে কোন্ পাপে ?

ব্যাস। মৃত্যু অনিবার।
দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন
ক্ষত্রিয়ের মহাধর্ম্ম,—ত্রিদিব তাহার
বীরব্রতে ধর্ম্মরণে জীবন-অর্পণ।
মানবসমাজ-রক্ষা হয় নিরন্তর
এইরূপে ; জান বৎস ! নির্লিপ্ত ঈশ্বর।

শিষ্য। ঘোরতর কর্ম্মলিপ্ত অবতার তাঁর
দেখিতেছি ভগবন্ ! বুঝিব কেমনে
ঈশ্বর নির্লিপ্ত তবে ?

ব্যাস। কি ভ্রান্তি তোমার !
কর্ম্মত্যাগ নির্লিপ্ততা ভাবিও না মনে।
ভগবান্ কর্ম্মরত। বিপুল সংসার
কর্ম্মক্ষেত্র ; নাহি কারো তিলার্দ্ধ বিশ্রাম।
জগতের সুখমাত্র সুখ আপনার,
আমি জগতের অংশ—এ নিঃস্বার্থ জ্ঞান
যার কর্ম্ম-মূলে ; কর্ম্মফলে কদাচন
নাহি ক্ষুদ্র স্বার্থ যার ; নির্লিপ্ত সে জন।

নিষ্কাম বা নির্ব্বিপ্তের আদর্শ উজ্জ্বল
মহিমা-মণ্ডিত ওই সম্মুখে তোমার,—
কৃষ্ণের জীবনচিত্র পবিত্র নির্ম্মল!
আছে কি স্বার্থের রেখা কোথাও তাহার?
নারায়ণ, নারায়ণী সেনা আপনার,
দেখ প্রতিকূল পক্ষে! সমগ্র ক্ষত্রিয়
সমবেত যেই ক্ষেত্রে, ক্ষুদ্র কীট ছার
যশোলোভে মত্ত যথা, বীর অদ্বিতীয়
ভারতের সেই ক্ষেত্রে নিরস্ত্র আপনি!
সারথির ব্রতে ব্রতী! শৃগালের ব্রতে
ব্রতী সিংহ; খদ্যোৎব্রতে ব্রতী দিনমণি!
জগত তাঁহার রথ; অনন্ত তাঁহার
কুরুক্ষেত্র; শক্তি অস্ত্র; অনন্ত সমর,—
সৃজন পালন লয়; অনন্তে সাঁতার
দিতেছে সে মহারথ কল্প কল্পান্তর!
কাতর অর্জ্জুনে সেই যোগেশ্বর হরি
যেই ধর্ম্ম-গীতামৃত করাইয়া পান
করিলা স্বধর্ম্মে রত, যোগধ্যান ধরি
করিয়াছি সঙ্কলন,—পরিতৃপ্ত প্রাণ!—
সেই গীতা উত্তরীয়-অঞ্চলে তোমার।
যাও, বৎস! পুণ্যতোয়া হিরণ্বতী-তীরে
এখনি সায়ংসন্ধ্যা করি সমাপন
যাব আমি। গিয়া তুমি পাণ্ডব-শিবিরে
সুভদ্রার করে গ্রন্থ কর সমর্পণ,
মম আশীর্ব্বাদ সহ। শান্তনুতনয়
এই গীতামৃত তরে আকুল হৃদয়।

কহিও ভদ্রারে—"যেই ধর্ম্ম মূর্ত্তিমান্
"সুভদ্রে! তোমাতে নিত্য, যে ধর্ম্মে দীক্ষিত
"তব পতি বীরবর পার্থ মহারথী,
"এই গ্রন্থে সেই ধর্ম্ম ভাষায় চিত্রিত।
"বিরাজিত যেই চন্দ্র, সুধার আধার,
"তব বক্ষে, এই গীতা জোৎস্না তাহার।"
যাও বৎস! যাও চলি। যথা-অবসর
করিব যতেক শিষ্যে এ অমৃত দান।
মিলিয়াছে মোক্ষসুধা, যুগ যুগান্তর
যার তরে যোগিগণ করিতেছে ধ্যান।
মানবের কর্ম্মাকাশে ধর্ম্ম-ধ্রুবতারা
জানিলাম এত দিনে হ'ল সমুদিত;
অনন্ত কালের তরে অন্ধ দিক্‌হারা
দেখিবে গন্তব্য পথ মানব পতিত।
গীতার এ রঙ্গভূমি, মহাতীর্থ মত,
কুরুক্ষেত্র ধর্ম্মক্ষেত্রে হবে পরিণত।

দ্বিতীয় সর্গ।

—•—

জীবন-সঙ্গীত।

—•—

ঝটিকাবিক্ষুব্ধ মত্ত বিধূনিত
পারাবার-গর্ভে মরকতপুর

শোভে বরুণের, শান্তির আধার,—
বরুণ বারুণী কি চিত্র মধুর!
রণ-ঝটিকায় মত্ত বিক্ষোভিত
কুরুক্ষেত্র-গর্ভে শোভার আধার
শোভিছে শিবির—শান্তির ত্রিদিব
প্রীতিপূর্ণ—অভিমন্যু উত্তরার।
প্রীতির স্বপন প্রতিমা যুগল,
সুখশান্তি হাসি জ্যোৎস্না মুখে।
প্রীতির স্বপন নয়নে তরল,
সুখশান্তি ভরা জ্যোৎস্না বুকে।
ক্ষুদ্র এক খণ্ড ফুল্ল নিরমল
বৈশাখী জ্যোৎস্না অমৃতে ভরিয়া
সৃজিলেন বিধি মূর্ত্তি উত্তরার,
অঙ্গে অঙ্গে রূপ-তরঙ্গ তুলিয়া।
আনন্দনির্ঝর উছলে হৃদয়ে,
আনন্দনির্ঝর নয়নতারা,
আনন্দনির্ঝর ক্ষুদ্র রক্তাধার
ঢালে অবিরল আনন্দধারা।
সে হাসি আনন্দ, আনন্দ সে ভাষা,
কাঁদিতেও হাসি অশ্রুতে ভাসে;
অভিমানভরে থাকে যদি বালা,
কোথা হাসি যেন লুকায়ে হাসে।
যথায় উত্তরা তথা উচ্চহাসি,
তরঙ্গে তরঙ্গে বাঁশরীঝঙ্কার।
যথায় উত্তরা তথা উচ্চভাষা—
কিশোরীর? না না, স্বর্গীয় বীণার।

হাসিতে ভাষিতে, কিবা মূর্চ্ছনায়
আনন্দ-সঙ্গীত বহে অবিরল ;
চঞ্চলার মত যাইতে ছুটিয়া,
না ছোঁয় ধরণী চরণ চঞ্চল ॥
এই হাসিরাশি-কুসুমকাননে
কৈশোর যৌবন করিছে কি রণ !
কহিছে যৌবন—"উত্তরা যুবতী।"
কৈশোর কহে—"না, কিশোরী এখন।"
বসি অভিমন্যু বিচিত্র আসনে
সুবর্ণে নির্ম্মিত, রতনে খচিত,
আঁকিছেন চিত্র ;—বীর-অবয়ব
সুবর্ণে নির্ম্মিত, রতনে ভূষিত।
আকর্ণ বিশ্রান্ত যুগল নয়ন,
আকর্ণ নিবিড় যুগল ভুরু,
বিশাল ললাট, বিশাল উরস,
ক্ষীণ কটী, কিবা বিশাল উরু !
গবাক্ষের তলে হিরণ্বতীজলে,
জ্বলে ধক্ ধক্ পশ্চিম রবি ;
গবাক্ষ সম্মুখে প্রশস্ত ললাটে
জ্বলে ধক্ ধক্ প্রতিভাছবি !
এই বীরত্বের মহারঙ্গভূমে
কৈশোর যৌবন করিছে কি রণ !
কহিছে কৈশোর—"এখনো কিশোর।"
"মিথ্যা কথা"—গর্ব্বে কহিছে যৌবন।
চিত্রিছেন অভিমন্যু একমনে
"ভীষ্মশর-শয্যা" আনত মুখে ;

আসি চুপে চুপে আসনপশ্চাতে,
কহিলা বিরাট-বালা কৌতুকে,—
"কিহে বীরবর! আজি যে সকালে
রণ-ক্ষেত্র হ'তে দিলে পিটটান?
জীব-হত্যা-রঙ্গে হ'ল কি অপ্রীতি?
কত শত আজি দিলে বলিদান?"
আঁকিতে আঁকিতে কহে অভিমন্যু—
যথার্থ উত্তরে! দিয়েছি পিটটান।
বুঝিতে বুঝিতে কি মনে পড়িল,
কার হাসি টুকু, কার মুখখানি।'
"দেখি দেখি"—কহি সুকোমল করে
আদরে উত্তরা তুলিলা মুখ।
হাসি অভিমন্যু কহিলা আদরে—
"এই মুখ বটে, এ হাসি টুক!"
অধরে অধর হইল মিলিত;
অধরে অধর রহিল গাঁথা!
অধরে অধর কি সুধা ঢালিল,—
নিমীলিত চারি নয়ন-পাতা।
নরহত্যা করি মিটেনি কি সাধ?
নারী-হত্যা কেন এরূপে আবার?
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে করে নর-হত্যা
যে জন, এ কথা সাজে কি তার?
তবে নর-হত্যা মানি শ্রেষ্ঠ তব,
মারিয়া বাঁচাও দিনে শত বার।
ইচ্ছা, থাকি প্রেম-অনন্তস্বপনে
ওই বুকে মরি, জাগি না আর।

উত্তরা। থাক্ মেনে থাক্, তব ভালবাসা।
সে ছাই বীরত্বে কাটি সারাদিন
ফিরিলে শিবিরে, চিত্রে নিমগন ;
নহে কবিতায় থাক উদাসীন।
গাইয়ে বাজিয়ে কাটাইব দিন
ভাবি মনে মনে, তাও সাধ্য কার ?
ওই দেখ ওই শিবিরকোণায়
আদরের যন্ত্র সব স্তূপাকার।
বাঁধিতেছি বীণা, কর্ণে এক কর,
অন্য কর তারে,—ছাড়িল হুঙ্কার
সেই পোড়া অস্ত্র,—কি নাম তাহার ?
চমকিল কর, ছিঁড়ে গেল তার!
আর সাজ করি বাজাতেছি যদি,
সেই হুম্‌হাম্—কি নাম্ তাহার ?
বীর সিংহনাদ! তাহার উপর
ট্যাঙ্গ ট্যাঙ্গ সেই কোদণ্ড-টঙ্কার!
অভি। উত্তর গোগৃহে যে বীরত্ব ভাই
দেখাইল, ইহা পরিশিষ্ট তার!
উত্তরা। ছাই শত্তুরের মুখে রাশি রাশি!
মন্দ বুঝি সেই বীরত্ব দাদার ?
কেমন অক্ষত শরীরে ফিরিয়া
আসিল, আনিল কতই ভূষণ।
কতই পুতুল করিনু নির্ম্মাণ
সে বীর-বসনে মনের মতন।
কেহ না মরিল, কেহ না কাঁদিল,
পতিহীনা নাহি হ'ল্ল কারো দারা,

কা'রো শিশু নাহি হ'ল পিতৃহীন,
না হইল কোন মাতা পুত্রহারা।
"অদ্ভুত বীরত্ব!"—পিতার বীরত্বে
পুত্রের হৃদয় উঠিল ভরি,—
কহি অভিমন্যু, রহিলা নীরব,
চিত্রবৎ শূন্য দরশন করি।
চুপে চুপে চুপে তূণটি লইয়া
চুপে চুপে গেল উত্তরা সরিয়া।
"চোর! চোর!"—বলি হাসিতে হাসিতে
গেলা অভিমন্যু পশ্চাতে ছুটিয়া।
ক্রীড়ারত বন-কুরঙ্গিনী মত
ঘুরিছে ফিরিছে বিরাটবালা;
হাসিয়া হাসিয়া ছুটিছে বালিকা,
হাসির ঝলকে শিবির আলা।
ক্রীড়ারত বন-কুরঙ্গের মত
পশ্চাতে পশ্চাতে কিশোর ধায়,—
মুখভরা হাসি, প্রেমভরা আঁখি,
দুইটি বিদ্যুৎ খেলিয়া যায়!
এবার যুবক ধরিল সাপটি,
"হি-হি" উচ্চ হাসি হাসিছে বালা—,
কর হ'তে তূণ লইল কাড়িয়া
চাপিয়া হৃদয়ে কুসুমমালা।
চুম্বিলা সে হাসি আবার আবার,
হাসিতে সুন্দর মিশিল হাসি।
নিপীড়িত যুগ্ম কুসুমস্তবক
ঢালিল হৃদয়ে অমৃতরাশি।

যুবকের বাম প্রকোষ্ঠে বামার
শোভিছে বদন মুক্তকেশাবৃত,
শ্রমে পদ্মপর্ণ-কপোল যুগলে
ভাসিছে গোলাপ সদ্য বিকসিত ;
শোভিছে দক্ষিণ প্রকোষ্ঠে যুবার
ক্ষীণ কটি ; চারু কুসুম-দাম,
জ্যোৎস্নার লতা, উত্তরীয় মত
শোভিতেছে বক্ষে,—মোহিত প্রাণ !
চুম্বিছে যুবক আবার আবার
ফুলে ফুলে সেই পুষ্পিতা লতা।
আবার আবার হাসির তরঙ্গ,
কি ভাষা হাসির ! মরি কি কথা।
সাঙ্গ হ'ল রণ ; আবার আসনে
বসিল যুবক আঁকিতে ছবি।
কহিল—"পাগলি ! দেখ গো চাহিয়া
জগতে অতুল বীরত্বরবি !
দেখ ভীষ্মদেব প্রসন্ন বদনে
শুইয়া কেমন শরের শয্যায় !
বীরের পিপাসা নিবারিতে বীর
সৃজেছেন উৎস কি সুন্দর হায় !
বামপার্শ্ববিদ্ধ-শায়কে শায়িত ;
ঘন অস্ত্রাঘাতে উরস-অম্বর
আচ্ছন্ন কিংশুকে বীরত্ব-আধার ;—
নাহি পৃষ্ঠে ক্ষুদ্র একটি আঁচড়।
বিস্মিত পাণ্ডব, বিস্মিত কৌরব,
বিস্মিত ধরার বীরেন্দ্রমণ্ডল,

দাঁড়ায়ে নীরবে শ্লথধনু করে
দেখিছে এ দৃশ্য আঁখি ছল্ ছল্।
ধান্যক্ষেত্রে ছিন্ন তৃণরাশি মত
চারি দিকে অস্ত্র পড়ি স্তরে স্তরে ;
চারি দিকে হত চতুরঙ্গ দল,
দ্বীপ-মালা যেন শোণিত-সাগরে।"

মুহূর্ত্ত বালিকা দেখিল সে চিত্র
দক্ষ তুলিকার উচ্ছ্বাসে চিত্রিত।
চাহিয়া চাহিয়া অধর টিপিয়া
উত্তরিল, চিত্রনৈপুণ্যে মোহিত,—
"কি নিষ্ঠুর দৃশ্য! দেখা নাহি যায়
বীরত্বের হায়! এই পরিণাম!
শুইত যে নিত্য কুসুম-শয্যায়,
অসংখ্য শরাগ্রে আজি সে শয়ান!
হরি! হরি! হরি! মানুষে মানুষ
কেমনে এমন করে প্রহার?
হায়! সকলের একই পরাণ,
প্রাণে প্রাণ-ব্যথা বুঝে না আর?"

আকাশের পানে চাহিয়া চাহিয়া
কহে অভিমন্যু গম্ভীর মুখে—
"বড়ই কঠোর বীরধর্ম্ম এই!
কি পাষাণ চাপা বীরের বুকে।—
সত্য লো উত্তরে! ভাবি যবে মনে,
ইচ্ছা নাহি হয় ধরিতে শর;
করি রণ যেন কলের পুতুল,
শিবিরে ফিরিয়া আসি সত্বর।

বিনা ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ কৃপ আর,
দেখি সব ক্ষুদ্র পতঙ্গের মত।
নাহি দেখি কেহ অস্ত্রযোগ্য মম,
কাঁদে প্রাণ দেখি ক্ষুদ্র সৈন্য হত।
বজ্র অস্ত্র যার, হয় কি, উত্তরে!
পিপীলিকা-বধে প্রবৃত্তি তার?
উত্তালতরঙ্গ-সঙ্কুল-পয়োধি
ডুবাতে কি চাহে পতঙ্গ ছার?
হায়! বিধাতার সুখের সংসার,
সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডার। হৃদয়ভরা।
হায়! কেন নর হিংসি পরস্পরে
এমন নরক করে এ ধরা!
কি যে বীরধর্ম্ম না'হ বুঝি, প্রিয়ে!
নরনারায়ণ জনক মাতুল
যেই পথগামী, ধর্ম্মপথ তাহা
এই বালকের পবিত্র, অতুল!
বীরধর্ম্ম পুণ্য নিয়তি আমার।
মাগ প্রিয়তমে! এ বর কেবল,-
হেন শরশয্যা লভি রণক্ষেত্রে
কৃষ্ণার্জ্জুন-মুখ করি সমুজ্জ্বল।"
"ওই ছাই কথা শুনিব না আমি",—
কহি সব তুলি ফেলিল ছুড়িয়া।
কুড়াইতে গেলে বিরক্তে যুবক,
ছাবটি লইয়া ছুটিল হাসিয়া।
"এখনি উননে করি সমর্পণ
এ সাধের ছবি করিব ছাই।

ফেলিয়া সে ছাই হিরণ্‌ নীজলে,
দিব করতালি তাই, তাই, তাই।"—
কুসুমকোমল কক্ষ-গালিচায়
কুসুমিত লতা ঢলিয়া পড়ি,
কাম-স্বপ্ন-শয্যা পুষ্পিত উরসে
হাসিছে ছবিটি চাপিয়া ধরি।
আপদচুম্বিত দীর্ঘ কেশরাশি
আবরি সুতনু সুবর্ণলতা,
আবরি গালিচা,—শোভিছে সুতন্বী.
কানন-আঁধারে জ্যোৎস্না যথা।
মুগ্ধপ্রাণ যুবা চাহিয়া চাহিয়া,
ঈষদ্‌ ঈষদ্‌ করে পরশন
সুবঙ্কিম গ্রীবা সুগোল সুন্দর,
পার্শ্বে ব্রীড়ালয় মার্জ্জিত কাঞ্চন।
দিয়া গড়াগড়ি হাসিতেছে বালা,
লহরে লহরে ছুটিছে হাসি,
বিকাশিছে মরি উন্মেষ যৌবন
লহরে লহরে কি রূপরাশি!
দিয়া গড়াগড়ি হাসিতে হাসিতে
চিত্র হ'তে চিত্র পড়িল সরিয়া;
এক চিত্র করে, অন্য চিত্র বক্ষে,
হাসিয়া যুবক লইল তুলিয়া।
প্রাণেশের করে ক্ষীণ কটি খানি,
যেন ফুলধনু দুলিয়া পড়ি।
আলু থালু কেশে, আরক্ত বদনে,
আয়ত নয়নে, কি ক্রীড়া মরি!

অশ্রান্ত হাসিয়া আবেশ নয়নে
পতিমুখ পানে চাহিয়া চাহিয়া,
বাড়াইছে কর ধরিতে সে ছবি,—
খেলে দুই পদ্ম কি লীলা করিয়া!
কি লীলা করিয়া দোলে কর্ণফুল!
কি লীলা করিয়া খেলিছে বলয়।
দোলে মুক্তাহার কি লীলা করিয়া!
শিঞ্জিনী-শিঞ্জন কিবা লীলাময়!
আবার আবার সহস্র চুম্বন,
চুম্বন সহস্র আবার আবার;
হাসির লহরে সহস্র সহস্র
কুসুমবর্ষণ কিবা অনিবার!
বাসনা যুবক আঁকিতে সে ছবি;
কক্ষতলে বালা বসিল মানে,
বারিভরা মেঘ বিস্তৃত নয়নে,
ছল ছল চাহি গালিচাপানে।
কহে অভিমন্যু—"দেখ, এসে দেখ,।
কেমন সুন্দর ফলেছে রঙ্গ।"
মাথা নাড়া দিয়া কহে ক্রোধে বালা—
"নাহি চাহি ভালবাসার ঢঙ্গ।
বড়ই আমার লেগেছে বিষম।"
হাসি কহে যুবা—"লেগেছে কোথায়—
শরীরে, মনে, কি নাকের আগায়?
দিতেছি ঔষধ আয় কাছে আয়।"
"আয় কাছে আয়"—মাথা হেলাইয়া
হাসিকান্না-মুখে কহিল উঠি।

উঠিলা যুবক ; ছুটিল যুবতী—
উড়ে কেশভার চরণে লুটি।
আঁকিতে লাগিলা যুবা পুনঃ ছবি ;
চুপে চুপে বালা ফিরিয়া আসি,
ধীরে ধীরে ধীরে বীণাটী লইয়া
ঢালিতে লাগিল অমৃতরাশি।
সেই বীণা তানে প্রাণেশের প্রাণে
বহিতে লাগিল কি সুধাধারা!
আঁকিতেছে চিত্র, কিন্তু চিত্রকর
কি আঁকে না জানে,—আপনাহারা!
মিশিল বীণায় কণ্ঠ উত্তরার,
বীণায় জীবন্ত বীণার লয়!
ভরিয়া শিবির সঙ্গীত-তরঙ্গ
হল, অপরাহ্ণ-গগণময়।
"ওই যা! আঁকিলাম কি আঁকিতে কি!
উত্তরে! উত্তরে! পায়ে পড়ি তোর"—
কহে অভিমন্যু—অল্প আছে বাকি,
এই করি শেষ, মাথা খাস মোর।"
"এ রাগিণী ভাল নাহি লাগে যদি
বাজা'তেছি অন্য"—উত্তরিল বালা,
ছড়ের আছাড়ে, ঝন্ ঝন্ ঝন্,
কার সাধ্য বসে কাণ ঝালাপালা।
এক করে টিপি কপোলযুগল,
অন্য করে বীণা লইয়া কাড়ি
কহে অভিমন্যু—"এই দেখ তবে
সাধের এ বীণা ভাঙ্গি আছাড়ি।

হি-হি-হি-হি হাসি—"দাইমা ! দাইমা !"
উঠিল চীৎকার উপরে চীৎকার,
গর্জ্জি বেগে সুলোচনা ঠাকুরাণী,
নামিয়া আসরে দিলেন বার।
অন্তরাল হ'তে ধাত্রী সুলোচনা
দেখি অভিনয় মোহিত মনে,
এবে ছল-রোষে রাঙ্গাইয়া আঁখি
কহিলা গর্জ্জিয়া ভ্রূকুটী সনে

সুলো। "কি হয়েছে বল ?"
উত্তরা। মেরেছে আমায়।
সুলো। কে মেরেছে ? অভি ?
অভি। দাইমা ! অভাগী
মিছে কথা কহে।
সুলো। চোরের বেটা চোর,
চোরের ভাগিনা ! কি বলিলি কি ?
দাইমা অভাগী ? ভদ্রা কৃষ্ণার্জ্জুন
ধ্যান করে যার মহিমা অপার ?
অভি। না দাইমা ! আমি আঁকিতেছি ছবি,
শুধু জ্বালাতন করে বার বার।
সুলো। বটে দুষ্ট মেয়ে !
উত্তরা। জানি লো, জানি লো,
তুই ওর দিকে টানিস্ সতত।
হইবে বাবার সমক্ষে বিচার,
মার কাছে হবে উচিত মত।
সুলো। কে রে তোর বাবা ? কি বলিলি তুই ?
দিলিরে আমারি বিচার দোষ ?

আমার উপরে কে সে বিচারক!
চল দেখি যাই।
করি মহারোষ,
ছু'টে বালিকায় অঙ্কেতে লইয়া,—
হাসে পুষ্পরাশি সে পুষ্পদোলায়।
চুম্বিয়া চুম্বিয়া সেই হাসিরাশি
হাসিতে হাসিতে সুলোচনা যায়।
ভাবে অভিমন্যু—"দাই মা এ কায
করিল কি ভাল? হৃদয়ে আমার
রাখি মেঘ, গেল বিজলি চলিয়া,
আজি ছবি আঁকা হবে না আর

তৃতীয় সর্গ।

—:*:—

নারী-ধর্ম্ম।

—*—

"অভাগি! এরূপে কি লো অনিদ্রায় অনাহারে
খোয়াইবি দেহ আপনার?"—
কহে সুলোচনা খেদে,—সুভদ্রা শিবিরে ফিরি,
ম্লান দেহ ক্লান্তির আধার
রাখিয়া শয্যায় যবে হইলা অর্দ্ধশায়িতা,
অবসন্না মূর্ত্তি করুণার!

শ্লথ গ্রন্থি গেল খুসি, ধূসরিত কেশরাশি
ধূলামাখা পড়িয়া শয্যায়।
পাশে বসি সুলোচনা চারু সুকোমল করে
ধীরে ধীরে বিনাইছে তায়।

সুলো। অভাগি! এরূপে কি লো অনিদ্রায় অনাহারে
খোয়াইবি দেহ আপনার?
নাহি রাত্রি নাহি দিন থাক প্রলেপের মত
লাগি অঙ্গে আহত সবার।
শিবিরে শিবিরে ঘুরি আহতের শুশ্রূষায়
হইয়াছে কি দশা তোমার।
বসিয়া গিয়াছে চোক, মলিন বিবর্ণ মুখ,
ধূলায় ধূসর কেশভার।
আজি একাদশ দিন বাধিল এ পোড়া রণ,
দেখি নাই তব হাসি মুখ।
এইরূপে রাত্রি দিন মরিয়া মড়ার তরে
নাহি জানি পাও কিবা সুখ

সুভ। এতোধিক রমণীর আছে কিবা সুখ!
রোগে শান্তি, দুঃখে দয়া, শোকেতে সান্ত্বনাছায়া
দিদি! এই ধরাতলে রমণীর বুক।
এতাধিক রমণীর আছে কিবা সুখ!
যেমতি অনল জল সৃজিলেন নারায়ণ,
সৃজি সেইরূপ দিদি! রোগ, শোক, দুখ,
সৃজিলা অনন্ত প্রেম-পূর্ণ নারীবুক।
আছে আর কিবা সুখ, হায়! এইরূপে যদি,
ঢালিয়া অমৃত মৃতে, শান্তি যন্ত্রণায়,
রমণী জীবন-গঙ্গা বহিয়া না যায়!

ওই দেখ নিত্য নিত্য কতই পুরুষরত্ন
পালিয়া স্বধর্ম্ম কিবা ত্যজিছে জীবন!
পালিতেছি আমরা কি স্বধর্ম্ম তেমন?

সুলো। মানিলাম নারী-ধর্ম্ম আর্ত্ত আহতের সেবা,
কিন্তু শত্রুদের সেবা কেন?
তাহাদের মড়া নিয়া তাহারা মরুক গিয়া,
তোর কেন মাথাব্যথা হেন?

সুভ। শত্রু!—শত্রু কি মানুষ নহে লো আমার মত?
রক্ত মাংস নাহি কি তাহার?
তোমার আমার প্রাণ, নহে কি শত্রুর প্রাণ?
এক জল, ভিন্ন জলাধার।
তাও এক ধাতুময়, অস্ত্রে একরূপে হয়
সর্ব্ব দেহ ক্ষত ও বিক্ষত;
সহে একরূপ ব্যথা, একরূপ মৃত্যুমুখে
শত্রু মিত্র হয় নিপতিত।
শত্রু!—এক ভগবান সর্ব্ব দেহে অধিষ্ঠান,
সর্ব্বময় এক অদ্বিতীয়!
কেবা তুমি, কেবা আমি, কেবা শত্রু, মিত্র কেবা?
কারে বল প্রিয় বা অপ্রিয়?

সুলো। শত্রুকেও তাহা বলি করিব কি মিত্র জ্ঞান?
মিত্র ওই কর্ণ দুর্য্যোধন?
দুর্জ্জনের (ও) দুঃখে দুঃখী হইব কি? সমভাবে
বিষামৃত করিব গ্রহণ?

সুভ। যেই জন পুণ্যবান, কে না তারে বাসে ভাল?
তাহাতে মহত্ত্ব কিবা আর?
পাপীরে যে ভালবাসে, আমি ভালবাসি তারে,

সেই জন প্রেম-অবতার।
সুগন্ধ নির্গন্ধ ফুল বিরাজিছে সমভাবে
দেখ অঙ্কে মাতা বসুধার!
সমুজ্জ্বল রত্ন সহ অনন্ত বালুকারাশি
বহিতেছে গর্ভে পারাবার
জগতের সাম্যনীতি, সুখময় প্রেমগীতি,
মানবের কি শিক্ষার স্থান!
সর্ব্বত্র সমান প্রেম, সর্ব্বত্র সমান দয়া,
সর্ব্বত্র কি একত্ব মহান্!
না, দিদি!—আমরা নারী বিশ্বজননীর ছবি,
আমাদের শত্রু মিত্র নাই
বরিষার ধারা মত অজস্র জননীপ্রেম
সর্ব্বত্র ঢালিয়া চল যাই!
মিত্রকে যে ভালবাসে, সকাম সে ভালবাসা,
সে ত ক্ষুদ্র ব্যবসায় ছার!
শত্রু মিত্র তরে যার সমভাবে কাঁদে প্রাণ,
সেই জন দেবতা আমার!
জনকজননীমুখ শিশুর ক্ষুদ্র জগত,
শিশু কিছু নাহি জানে আর
ক্রমে বাড়ে পরিসর, কিশোর কিশোরী দেখে
ভ্রাতাভগ্নী-পূর্ণ এ সংসার!
পতি পত্নী প্রেমরঙ্গে যৌবনে ছুটে তরঙ্গে,
আলিঙ্গিয়া ভূতল গগন।
ক্রমে সন্তানের স্নেহ দেখায় অনন্তমুখ,—
পুণ্যতীর্থ সাগর-সঙ্গম!
প্রেমধর্ম্ম এই, দাদা! কালি কৃষ্ণার্জ্জুন মত

দেখিতাম সকল সংসার।
মাতৃস্নেহ-পূর্ণ বুকে আজি দেখিতেছি সব
অভিমন্যু উত্তরা আমার!
পিতা মাতা, ভগ্নী ভ্রাতা, পতি, পুত্র, মহাবিশ্বে,
এই প্রেম তৃপ্তি নাহি পায়।
অনন্ত এ বিশ্ব ছাড়ি কি যে গো অনন্ত আছে,
প্রেমসিন্ধু সেই দিকে ধায়।
সরিল না কথা আর; নিশ্চল প্রতিমা মত
দুই জন রহিল চাহিয়া
সেই অনন্তের পানে, সেই অনন্তের ধ্যানে,
প্রেমানন্দে হৃদয় ভরিয়া।
"আমিও তেমতি বোন্! এক সত্যভামাময়"—
চাপি হাসি কহে সুলোচনা—
"দেখি জীবগণ যত; ইচ্ছা সকলের সঙ্গে
ঝগড়া করি পূরিয়া বাসনা।
দ্বারকা ছাড়িয়া যেন আসিয়াছি কত যুগ!
মরি জিহ্বাকণ্ডুয়নে হায়!
তোর কাছে আসি যদি বিজি বিজি কি বকিস্,
শুনি মম হাড় জ্ব'লে যায়।
যাই উত্তরার কাছে, তার সেই হিহি হাসি,
একেবারে কাণ ঝালাপালা!
পোড়া শাশুড়ীর মুখে চিরদিন চাপা হাসি,
বউটী ফুটন্ত হাসিডালা!
গালি পাড়,—তাও হাসি, মার,—অনর্গল হাসি,
হাসির কিছুতে নাহি শেষ।
বুড়িয়া ঝগড়া করি, হাসিতে ঝগড়ার ঝোঁক

ভেসে যায়,—এ ত জ্বালা বেশ!
দুর্ল্লভ রমণীজন্ম লভিয়া, ঝগড়া যদি
না করিল, জীবন বিফল।
তাই, লো বিরলে বসি, সত্যভামা উদ্দেশেতে
ছাড়ি শব্দভেদী শরদল ”
সুভ। সত্য লো উত্তরা, দিদি! ফুটন্ত হাসির ডালা,
জ্যোৎস্না-প্লাবিত পুষ্পবন।
হৃদয়ের জ্যোৎস্নায় নাহি সংসারের ছায়া,
নির্ম্মল আনন্দ-প্রস্রবণ।
সেই হাসি, সেই ভাষা, সে আনন্দ, ভালবাসা,
কিবা স্বর্গ, সরলতাময়!
সরলা আনন্দময়ী আমার উত্তরা, দিদি!
এই জগতের যেন নয়!
কৃষ্ণার্জ্জুন শিষ্য শিষ্যা উভয়ের সংমিলন—
মিলন সৌন্দর্য্য প্রতিভার!
ঘুমন্ত প্রতিভা-অঙ্কে ফুটন্ত সৌন্দর্য্য-স্বপ্ন;
কি সংযোগ শশাঙ্ক সুধার!
সুলো। হউক তা, কিন্তু যেনে না জানে ঝগড়া ছুঁড়ী,—
কমল্ কণ্টকে মনোহর!
সুভ। কেন, দু'জনে ত দিদি! করে ঝগড়া অহরহ;
সে কোন্দল কতই সুন্দর!
সুলো। মূর্খ তুই শিক্ষকের শিক্ষার অভাব টুক
চাহিতেছি করিতে পূরণ!
কিন্তু সে হাসির স্রোতে সকল ভাসিয়া যায়,
হইতেছে পণ্ড মম শ্রম।
সুভ। দিবসান্তে কৃষ্ণার্জ্জুন আসিলে শিবিরে ফিরি

ঝগড়া ত বাদ তব নাই।
তাতে কি উদর তোর নাহি ভরে, পোড়ামুখি!
শিশু দুটী নিয়ে মর তাই!

সুলো। হরি! হরি! এ কি কথা! মিটিল না সাধ যার
সত্যভামা-কোন্দলসাগরে,
কিসে সে গণ্ডুষ-জলে বাঁচিবে?—এত দিনে
সুলোচনা পড়িল ফাঁফরে!

সুভ। কোন্দল-রোগের তোর করিতেছি প্রতিকার,—
সঙ্গে মম থাকি নিরন্তর
করিবি আহত-সেবা, পালিবি রমণী-ধর্ম্ম,
আয়, দিদি! এই সত্য কর।

সুলো। তোর নারী-ধর্ম্ম নিয়া মর্ গিয়া মড়া ঘাটি,
আমার তাহাতে কায নাই।
আহত আমার প্রেমে স্বয়ং কৃষ্ণার্জ্জুন, অন্য
আহত সেবিতে আমি যাই!
উত্তরা ও অভিমন্যু,—দুই পুত্র কন্যা মম—
থাকিব লইয়া আমি বুকে।
এই মম নারী-ধর্ম্ম; থাকে যদি ধর্ম্ম আর,
মারি শত ঝাটা তার মুখে।
এই ব্যঙ্গ আবরণে কি হৃদয়-স্নেহোচ্ছ্বাস!
পরশিল মরম ভদ্রার।
দুই আঁখি ছল ছল চাহি শূন্য, কহিলেন—
স্নেহময়ী মূর্ত্তি করুণার—
"আপন পুত্রের মাতা, আপন মাতার পুত্র,
যে হয়, কি মহত্ত্ব তাহার?
...ত্রের মাতা, পরের মাতার পুত্র,

যে হয়, সে পুণ্য-পারাবার !"
"জয় ! সুভদ্রার জয় ! অর্জ্জুনমহিষী জয় !"—
কে গাইল বাঁশরীর স্বরে ?
সুলো। আ মলো ! কে কালামুখি ! "জয় সুলোচনা জয়"—
তোর বুঝি কণ্ঠে নাহি সরে ?
"জয় পাণ্ডবের জয় ! জয় কৌরবের জয় !"—
শুনে শুনে হাড় জ্বালাতন।
"জয় ! সুভদ্রার জয় !"—তাঁহার উপরে কেন
কাটা ঘাঁয়ে নুন বরিষণ।"
"মহার্ষি শিবির-দ্বারে ব্যাস-শিষ্য এক জন"—
সখী অন্যতরা কহে আসি।
ব্যস্তে ভদ্রা কহে—"আন পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তাঁকে।"
সুলোচনা ক্রোধে অগ্নিরাশি।
জানি সেই বুড়া বিনা এমন বেহদ্দ আর
তালকাণা কেহ কি লো হয় ?
খেটে খুটে সারাদিন লভিতেছি এ আরাম,
এলো কি না—"সুভদ্রার জয় !"
এখনই সে অদ্ভুত ঘট, পট, সর্ব্বভূত,
খোলা যাবে কত শাস্ত্র-হাঁড়ি।
যাই উত্তরার কাছে, হাসির তরঙ্গে তার
যদি ভূত নামাইতে পারি।"
শিবির-দুয়ারে আহা ! ও কি মূর্ত্তি মনোহর !
সখীর না চলিল চরণ।
নীলোৎপল প্রতিমায় জাগিতেছে যৌবনের
কি মধুর প্রথম স্বপন !
সুন্দর গৈরিকে ঢাকা অপরাজিতার রাশি

৭

সুকুমার দেহ মনোহর।
ললাটে চূড়ার মত বেণীবদ্ধ কেশরাশি,
অমার্জ্জিত ধূলায় ধূসর।
সুগোল কোমল মুখে যুগল নয়ন ভাসে,
আকর্ণবিস্তৃত ছল্ ছল্।
ভাসিছে যুগল তারা, নীলিম প্রভাতাকাশে
দুই সুখতারা সমুজ্জ্বল।
কি তারায়, কি নয়নে, শান্ত স্থির সে বদনে,
ক্ষুদ্র সেই অধর কোণায়,
কি ত্রিদিব-কোমলতা, কি ত্রিদিব-স্নেহকণা
হৃদয়ের, ভাসিতেছে হায়!
প্রণমিতে পার্থ-প্রিয়া উঠিলে, নিবারি যুবা
কহিল.—কি কণ্ঠ সুকুমার!—
"যে ধর্ম্মে দীক্ষিত আমি, তুমি প্রতিমূর্ত্তি তার,
দেবি! তুমি নমস্যা আমার।
যে ধর্ম্মের আত্মা কৃষ্ণ, বাহুবল ধনঞ্জয়,
জ্ঞানবল কৃষ্ণদ্বৈপায়ন,
দেহ যার মূর্ত্তিমতী আপনি সুভদ্রা তুমি,
পুণ্যময়ী প্রেম-প্রস্রবণ,
এ পবিত্র মহাগীতা তার সুধাময়ী ভাষা,
আশীর্ব্বাদ সহ উপহার
বিশ্বারাধ্য গুরুদেব অর্পিলেন তব করে,
সুধাকরে সুধার ভাণ্ডার।
মানব-অদৃষ্টাকাশে বিরাজিয়া পুণ্যবতী,
গীতামৃত করি বিকীরণ,
সুশীতল জ্যোৎস্নায় জুড়াও, জগতারাধ্যে!

জগতের তাপিত জীবন।"
উদ্দেশেতে দ্বৈপায়নে প্রণমিয়া ভদ্রাদেবী,
শিরে গ্রন্থ করিয়া ধারণ,
পার্শ্বস্থিত পুষ্পাধারে রাখি শূন্যপানে চাহি
রহিলা বসিয়া শূন্যমন।
সুলোচনা চিত্রবৎ তপস্বীর ক্ষুদ্র মুখ
স্থিরনেত্রে রয়েছে চাহিয়া।
সেই তীব্র দৃষ্টিতলে, চাহি ধরণীর পানে
আছে যুবা সলজ্জ বসিয়া।
সেই কণ্ঠ, সেই ভাষা, ত্রিতন্ত্রীর সে মূর্চ্ছনা,
স্মৃতির কি সঙ্গীত অতীত,
যেন সুভদ্রার কাণে, যেন সুভদ্রার প্রাণে,
বাজিল মধুর স্বপ্ন-গীত।
বহুক্ষণ আত্মহারা বসি ভদ্রা ধীরে ধীরে
কহিলা মধুরে—"তপোধন
আছিলেন প্রতিশ্রুত পবিত্রিতে কুরুক্ষেত্র
পুনর্ব্বার কার পদার্পণ।"
উত্তরিল শিষ্য ধীরে—"সান্ধ্যকৃত্য করি শেষ
করিবেন শুভ আগমন।
গোধূলিরে পদধূলি দিয়া উদিবেন, দেবি!
ঋষিকুল নক্ষত্র প্রথম।"
উভয় নীরব পুনঃ, উভয়ের হৃদয়েতে
ভাসিয়াছে কি যেন উচ্ছ্বাস।
দেখিল তপস্বী, নেত্র ছল ছল সুভদ্রার;
কি করুণা করিছে বিকাশ।
সরিল না কথা আর, বিদায় হইয়া যুবা

ধীরে ধীরে ত্যজিল শিবির,
কহে সুলোচনা —"এর ঋষিপনা বল, ভদ্রা,
করি আমি এখনি বাহির।
এ যদি সে শৈল নহে, নহি আমি সুলোচনা,
জানে ছুঁড়ি ছদ্মবেশ কত।
অপরাজিতার আহা ! মরি মরি ! কি পুতুল !"
সুভদ্রা নীরব চিত্রমত।

চতুর্থ সর্গ।

—:*:—

মাতা-পুত্র।

—:*:—

"মা ! মা ! ওমা ! মা, আমার !"— উচ্ছ্বসিত প্রাণে
ডাকি অভিমন্যু আসি ধরিয়া গলায়
জননীর, চাহি মার স্নেহমুখ পানে,
রাখে মুখ মার বুকে ক্ষুদ্র শিশু প্রায়।—
উপধানে অবসন্ন অঙ্গ আরোপিয়া
এখনো সুভদ্রা দেবী বসিয়া শিবিরে।
আনন্দে হৃদয়-নিধি হৃদয়ে লইয়া,
অসংখ্য চুম্বন স্নেহে বরষিলা শিরে।
আসি গরজিয়া মত্তা মাতঙ্গিনী মত
সুলোচনা ক্রোধভরে লইল কাড়িয়া

মাতৃ-বুক হ'তে পুত্র মাতঙ্গিনী মত
কহিল কৃত্রিম ক্রোধে ঘন গরজিয়া—
"হারে রে! কৃতঘ্ন ছেলে! উহারে না বলিতে মা
কতবার করিয়াছি মানা।
বল আমাকেই মা,—"মা"! বল আরবার মা, "মা
ডাক আরবার বলি মা,—"মা"!
আঁটিয়া ধরিয়া বুকে চুম্বি মুখ সুলোচনা
যত কহে, হাসি খল খল
তত ডাকে "মা" বলিয়া চাহি তার মুখপানে
চারি চক্ষু স্নেহে ছল ছল!
"বল, নহে সুভদ্রা মা" উত্তর—"সুভদ্রা মা
পড়িল অমনি গালে চড়!
"বল, নহে সুভদ্রা মা"— "সুভদ্রা আমার মা"—
পুনঃ চড় স্নেহ-পুষ্পশর!

সুলো। হাঁরে! কৃতঘ্নের ছেলে এই ধর্ম্ম তোর!
আমি পালিলাম, তুই পুত্র হলি ওর?

অভি। আমার যুগল মাতা স্নেহ-নির্ঝরিণী,
তুই লো শূলীমা, আর সুভদ্রা জননী।

সুলো। "শূলীমা! শূলীমা!"—আচ্ছা আসুক এখন
তোর সে যুগল পিতা,—নর নারায়ণ!
কেমন শূলী রে আমি যাবে আজ জানা,
দেখি দু'জনের আছে কাণ কয়খানা।

অভি। গালি দিস্, তোরে নাহি মা ডাকিব আর।
আচ্ছা সত্য কথা তবে বলি এইবার।
আমার যুগল মাতা, করুণার ছবি,
সুভদ্রা ও সুলোচনা—দেবী ও মানবী

সুভদ্রা মায়ের স্নেহ স্বর্গ নিরমল,
স্থলোচনা মার স্নেহ ধরণী শীতল।

স্থলো। সারাদিন মড়া ঘেঁটে মরে ওই পোড়ামুখী,
তোরে নাহি দেখে একবার,
'দেবী মা' হইল রে সে, 'মানবী' হইনু আমি,
সে স্বর্গ লো, আমি মাটি ছার?

অভি আমাকে দেখিতে,'মা গো, আছে ত মা স্থলোচনা,
হৃদয় স্নেহের পারাবার!
তাদের দেখিতে বল কে আছে মা!, রণক্ষেত্রে?
তাদের মা জননী আমার।
সে দিন মা! রণক্ষেত্রে প্রখর রবির
জ্বলিতেছে মস্তক উপর।
জ্বলিছে প্রখরতর চারি দিকে যুদ্ধানল,
পিপাসায় হইনু কাতর।
সারথি আনিল বারি, আগ্রহে মা পানপাত্র
লইয়াছি করিবারে পান,
দেখিনু অদূরে মা গো! পড়িয়া সৈনিক এক
অস্ত্রাহত, কণ্ঠগত-প্রাণ।
মৃত্যু-মুখে পিপাসায় রয়েছে চাহিয়া হায়!
মম পানপাত্র, নেত্রস্থির।
ছুটে গিয়া কাছে তার, কহিলাম—"পান কর,
আনিয়াছি সুশীতল নীর!"
কহিল সে ক্ষীণকণ্ঠে—"কুমার! বালক তুমি,
আপনি কাতর পিপাসায়;
এখনি মরিব আমি, নিবিবে পিপাসা মম,
পান করি কি হইবে হায়!"

কাঁদিয়া তাহার শির রাখিয়া অঙ্কে আমার,
কহিলাম—"পিপাসা আমার
কিছু আর নাহি ভাই। তুমি নাহি কর পান,
এই জল ছুঁইব না আর।"
বাম করে খুলি মুখ দিলাম ঢালিয়া বারি,
পান করি কহিল আবার,—
"এমন না হবে কেন, অভিমন্যু তুমি পুত্র
আমাদের মাতা সুভদ্রার।"
বহিল যুগল ধারা দু'নয়নে, দুই তারা
ক্রমে ক্রমে অপলক স্থির;
মায়ের পবিত্র নাম থাকিতে অধর-প্রান্তে
বীর-স্বর্গে চলি গেল বীর।
সেই জগতের মাতা আমার সুভদ্রামাতা"—
ছাড়ি গলা সুলোচনা মার,
গলায় মা সুভদ্রার পড়ি, কহে- "মা! মা! ওমা!
জগতজননী মা আমার!"
স্নেহভরা মুখখানি সুভদ্রা লইয়া বুকে
চুম্বিলেন আবার আবার,
কহিলেন,—"সত্য বৎস! তুচ্ছ ভদ্রা, সুলোচনা,
জগতজননী মা তোমার।
মাতৃ-প্রেম-পূর্ণ বুকে দেখিয়া তাঁহার মুখে
পরিপূর্ণ অখিল সংসার,
ঢালিও এ প্রেমধারা, তখন দেখিবে মাতা
দুই নহে, অসংখ্য তোমার!"
ছয় চক্ষু ছল ছল যেন পুষ্প-পাত্রোৎপল!
কি সঙ্গীত জগৎ প্লাবিয়া

হৃদয়ের যন্ত্রে এবে বাজিতেছে একতানে !
তিন জন রহিলা শুনিয়া !
"এ কি গ্রন্থ ?"—কহে যুবা, ল'য়ে প্রসারিয়া কর,—
'ভগবদ্গীতা' কি মা ! কবি কে ?"

সুভ ! মহর্ষিবর।
পড়িতে লাগিলা পুত্র হইয়া নিবিষ্টমন,
শুনিতে লাগিলা মাতা গীতামৃত-প্রস্রবণ।
প্রথম অধ্যায় শেষ করি উচ্ছ্বসিত মনে
কহিতে লাগিলা যুবা, ভ্রমিয়া অধোবদনে,—
"বুঝিলাম এতদিনে, না হয় প্রবৃত্তি মম
কেন এই মহাযুদ্ধে ? যথায় ক্ষত্রিয়গণ
জগতের এক ক্ষেত্রে হইয়াছে সমবেত,
সেই যুদ্ধে কেন হই আমি বা কাতর এত !
কেন সিংহশিশু আমি, শুনি বীর-সিংহনাদ
না নাচে হৃদয় মম। পাছে হয় অপবাদ
কেন শুধু যন্ত্রমত করি যুদ্ধে যোগদান,
কেন শ্লথ করে আমি ছাড়ি লক্ষ্যহীন বাণ।
'কাঁপিতেছে অঙ্গ মম, হইতেছে রোমাঞ্চিত ;
প'ড়ছে গাণ্ডীব খসি, হতেছে দেহ দাহিত।
'কি কাজ রাজ্যে, গোবিন্দ ! কি কায ভোগে, জীবনে ?
যাদের কারণ
'চাহি রাজ্য ভোগ, সুখ, তারা উপস্থিত যুদ্ধে
ত্যজিতে জীবন।
'হই বা নিহত যদ ইহাদের করে আমি,
হে মধুসূদন !"

'তুচ্ছ মহী, ইহাদেরে না ইচ্ছি ত্রৈলোক্যতরে
বধিতে কখন।'—
কি গভীর কাতরতা, মা গো! পিতার আমার!
হৃদয় কি প্রেম-স্বর্গ, কিবা দয়া-পারাবার!
কি দেবহৃদয়ে! অহো! কি বাড়ব প্রস্রবণ!
কি প্রেম-সলিলে ভাসে কিবা বীর্য্য-হুতাশন!
কি ধর্ম্মভীরুতা সহ কিবা বীর-পৌরুষতা!
কি বীরত্ব-পারিজাতে কি স্নেহ-ত্রিদিবলতা!
পিতার এ ভাব যবে, মা গো! কি বিস্ময় তবে,
অযোগ্য পুত্রের তার হৃদয়ে এ ভাব হবে?
হায় মা! তথাপি পিতা করুণহৃদয় মম,
কেন করিছেন বল এই মহাপাপ রণ?
স্বয়ং নারায়ণ কেন, হইয়া সারথি তাঁর,
করিছেন এইরূপে সংহার মা! এসংসার?
সুভ। ভক্তিভরে পড় বৎস! এই গ্রন্থ জ্ঞানাধার,
বুঝিবে রহস্য তুমি পাইবে উত্তর তার।
তখন বসিয়া যুবা লাগিলা অনন্ত মনে
পড়িতে সে মহাগ্রন্থ, অতুলিত ত্রিভুবনে।
সুলোচনা কাছে বসি হাই তুলি কিছুক্ষণ,
চলি গেল ব্যাসদেবে করি মিষ্ট সম্ভাষণ।
সাংখ্যযোগ, কর্ম্মযোগ, অধ্যায়ে অধ্যায়ে যত
পড়িতে লাগিল পুত্র, জননী জলের মত
লাগিলেন বুঝাইতে সেই ধর্ম্মতত্ত্বরাশি,—
নিত্য, সত্য, সনাতন,—ভক্তির উচ্ছ্বাসে ভাসি
উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসে যুবা রাখিয়া [illegible] কথন
[illegible] সুখে, [illegible]

ক্রমে একাদশ সর্গ —কিবা দৃশ্য ! বিশ্বরূপ !
বিরাট ও বিশ্বময়, চিন্তাতীত, অপরূপ !
সর্ব্বদেহ রোমাঞ্চিত, পড়িয়াছে গ্রন্থ খসি,
চাহি শূন্য পানে যুবা বিস্মিত স্তম্ভিত বসি !

অভি। এক কৃষ্ণ রূপে ব্যাপ্ত দেখি বিশ্ব চরাচর,
অনাদি অনন্ত কিবা বিরাট পুরুষবর !
সংখ্যাতীত সৌর রাজ্য, চন্দ্র, তারা, প্রভাকর,
ঝলসি সে মহাবপু ভ্রমিতেছে নিরন্তর !
সংখ্যাতীত ধূমকেতু, সৌর অগ্নি অস্ত্রমত,
অনন্ত পূরিয়া স্বনে ছুটিয়াছে অবিরত !
ছুটিয়াছে মহামন্দ্রে মেঘবৃন্দ অগণন
বিক্ষেপিয়া তাড়িতাস্ত্র ঘন বজ্র বিভীষণ !
গ্রহে গ্রহে বিধূনিত সংখ্যাতীত পারাবার,
বহিতেছে সংখ্যাতীত নদ নদী অনিবার।
অসংখ্য ভূধরমালা, অগ্নি-গিরি অগণন,
সধূম্র গৈরিক-রাশি করিতেছে উদ্গিরণ।
মুহুর্মুহু কত গ্রহ, অগ্নি-উল্কা বিকীর্ণিত
করিয়া, বিরাট শব্দে হইতেছে বিচূর্ণিত !
স্থাবর জঙ্গম সব হইতেছে অবিরত
সৃষ্ট, স্থিত লীন দেহে, জলে জলবিম্ব মত।
অনন্ত করাল-মূর্ত্তি করিছে বিশ্ব সংহার,
উঠিয়াছে গ্রহে গ্রহে কি ভীষণ হাহাকার !
করুণানিধান কৃষ্ণ, মা গো ! জগন্নাথ হরি,
কেন নাশিছেন বিশ্ব এ ভীষণ রূপ ধরি ?
অদ্বিতীয়, সর্ব্বময়, সর্ব্বভূত-মূলাধার
যদি বৎস ! বিশ্বেশ্বর, বিশ্ব তবে রূপ তাঁর।

জ্ঞানাতীত বিশ্বনাথে মানবের বুঝিবার
বিশ্ব ভিন্ন নাহি বৎস! সোপান দ্বিতীয় আর।
দেখিলে এ বিশ্বরাজ্য, অভিন্ন চেতনে জড়ে,
নির্ম্মম সংহার নিত্য সর্ব্বত্র নয়নে পড়ে।
নহে নির্দ্দয়তা, বৎস! ধ্বংসনীতি দয়াধার।
ধ্বংস বিনা এ জগতে উঠিত কি হাহাকার!
রুদ্ধ কর ধ্বংসদ্বার; মুহূর্ত্তেতে জীবগণ
অন্নাভাবে, স্থানাভাবে, করিবে কি বিভীষণ
দারুণ যন্ত্রণাভোগ! মাগিবে দয়া মৃত্যুর
কাতরে, সলিল যথা মরু-দগ্ধ তৃষ্ণাতুর।
রুদ্ধ কর ধ্বংস-দ্বার, অধর্ম্মের অভ্যুত্থান
করিবে ভারত মত, জগত মহাশ্মশান।
কৌরবের লোভ হ'তে করিতে বিশ্ব-উদ্ধার,
ধ্বংস বিনা বল, বৎস! আছে কি উপায় আর?
পাপের প্রশ্রয় দাও, নাহি কর বিনাশিত,
বিশ্বরাজ্য পরিণত নরকে হবে নিশ্চিত।
না বিনাশ বিষবৃক্ষ, না নিবাও দাবানল,
নাশিবে সুরম্য বন অনল ও হলাহল।
নির্লিপ্ত পরমব্রহ্ম, নিত্য, সত্য, সনাতন;
সৃষ্টি, স্থিতি, লয় করে নীতিচক্রে বিচরণ।
সংখ্যাতীত ধ্বংস যথা, সৃষ্টি তথা সংখ্যাতীত
হতেছে মুহূর্ত্তে, স্থিতি এরূপে হয় সাধিত।
সর্ব্বভূতহিত তবে ধ্বংস নিষ্ঠুরতা নয়;
দগ্ধ করে বৈশ্বানর, তবু অগ্নি দয়াময়।
ধ্বংসনীতি ধর্ম্মনীতি, ধ্বংসরূপী নারায়ণ।
ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র, ধর্ম্মযুদ্ধ এই রণ।

আবার আবার পুত্র পিতার সে মহাধ্যান
পড়িল বিহ্বল চিত্তে, অ তঙ্কপূরিত প্র ণ
করি পাঠ সমাপন, শিবির-গবাক্ষপথে
চাহি আকাশের পানে রহিল, জ্ঞানের রথে
স্তম্ভিত বিস্মিতমন হইয়া যেন উত্থিত
কি অনন্তে, কি আলোকে, গাম্ভীর্য্যে কল্পনাতীত,
হইল বিলীন ক্রমে; ক্রমশঃ অজ্ঞাতসারে।
মিশাইল বারিবিম্ব যেন মহাপারাবারে।
অধ্যায়ে অধ্যায়ে ক্রমে, কক্ষে কক্ষে ধীরে ধীরে,
প্রবেশিল অভিমন্যু অপূর্ব্ব মহামন্দিরে—
অতল, অনন্ত-স্পর্শী; পশি কক্ষে উর্দ্ধতম
দেখিল কি মহাদৃশ্য—গঙ্গাসাগরসঙ্গম!
জাহ্নবী জড়প্রকৃতি চেতন পুরুষবক্ষে
মিলিয়াছে, মহাগীত উঠিতেছে কক্ষে কক্ষে,—
"আমা হ'তে পরতর নাহি কিছু, ধনঞ্জয়!
আমাতে গ্রথিত বিশ্ব, সূত্রে যথা মণিচয়।"
চাহি উর্দ্ধ পানে স্থির শুনিতেছে এই গীত
জ্ঞানস্বরূপিণী মাতা কুমার প্রতিভান্বিত।
কি আনন্দ-মন্দাকিনী বহে উভয়ের চক্ষে!
কি পূর্ণ আনন্দসিন্ধু উচ্ছ্বসিছে দুই বক্ষে!
প্রদোষ অস্ফুটালোক ধীরে ভক্তিভরে আসি,
এ আনন্দে, এ উচ্ছ্বাসে, ঢালিছে গাম্ভীর্য্যরাশি!
কুমার অস্ফুটালোকে ভ্রমিতে লাগিলা ধীরে
গাম্ভীর্য্যপূর্ণ হৃদয়ে শিবিরে, আনতশিরে।
জননী প্রফুল্লমুখে কহিলা প্রফুল্লস্বরে,—
...সল পূরবী সান্ধ্য-সমীরে ভকতিভরে—

"বুঝিলে কি, অভিমন্যু!—অব্যক্ত ব্রহ্ম পরম,
অবলম্বি স্বপ্রকৃতি করেন বিশ্ব সৃজন।
কল্পক্ষয়ে সর্ব্বভূত তাঁহার প্রকৃতি পায়;
কল্পারম্ভে তাহাদের সৃষ্টি হয় পুনরায়।
এইরূপে চরাচর জন্মি জন্মি হয় লয়;
সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, বৎস! এরূপে সাধিত হয়।
'যথা আকাশেতে নিত্য সর্ব্বগামী মহাবায়ু
করে অবস্থান',
সেইরূপে সর্ব্বভূত তাঁহাতেই অবস্থিত,—
তিনি ভগবান।
নির্লিপ্ত সূক্ষ্মতা হেতু সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বগত
আকাশ যেমন,
সর্ব্বদেহে অবস্থিত নির্ব্বিকার পরমাত্মা
নিলিপ্ত তেমন।
নরের কর্তৃত্ব, কর্ম্ম, কর্ম্ম-ফল কদাচিত
না সৃজেন বিভু, জীব স্বভাবেতে প্রবর্ত্তিত!
কিবা জীব, কি উদ্ভিদ, চেতন, অজড়, জড়,
সকলই নিজ নিজ স্বতন্ত্র প্রকৃতিপর।
স্বপ্রকৃতি অনুসারে স্বয়ং যবে নারায়ণ
নির্লিপ্ত কর্ম্মেতে রত,—সৃষ্টি, স্থিতি, বিনাশন—
স্বপ্রকৃতি অনুসারে নির্লিপ্ত কর্ম্মসাধন
মানবের একমাত্র মহাধর্ম্ম সনাতন।
ব্রহ্মে সমর্পিয়া কর্ম্ম নিষ্কাম যে কর্ম্মে রত,
না হয় সে পাপে লিপ্ত পদ্মপত্রে জল মত।
সর্ব্বভূতস্থিত ব্রহ্ম; সাধ সর্ব্বভূত-হিত,
হইবে তোমার কর্ম্ম ব্রহ্মে তবে সমর্পিত।

জলধির হিত যাহা, তাহা জলবিন্দুহিত,
জগতের হিত, বৎস ! তোমার হিত নিশ্চিত।
অভ্যাস ও জ্ঞানবলে ইন্দ্রিয় করি সংযত,
জগতের হিতে করি নিজ স্বার্থ পরিণত,
স্বপ্রকৃতি অনুসারে স্বধর্ম্ম কর পালন,
এইরূপে কর্ম্মফল ব্রহ্মে করি সমর্পণ।
ফলিয়া অনন্ত তরু, বরষিয়া মেঘদল,
সাধিছে কি স্বার্থ ? বিশ্ব আদর্শ নিষ্কাম ঃে
আপন প্রকৃতি মতে ফলে তরু, বর্ষে ঘন,
জগতের হিতে সাধি স্বধর্ম্ম মোক্ষ পরম।
বীরত্বপ্রকৃতি তব, স্বধর্ম্ম যুদ্ধ তোমার ;
ধর্ম্মযুদ্ধ হ'তে শ্রেয়ঃ ক্ষত্রিয়ের নাহি আর।
সুখে দুঃখে অনাসক্ত, লাভালাভে জয়াজয়,
কর যুদ্ধ তুমি, বৎস ! যথা কৃষ্ণ ধনঞ্জয়।
বুঝিলে কি অভিমন্যু ! গীতামৃত করি পান,—
নিবারিতে ধর্ম্ম-গ্লানি, অধর্ম্মের অভ্যুত্থান ;
সাধুদের পরিত্রাণ, বিনাশ দুষ্কৃতদের,
করিতে সাধন ;
স্থাপন করিতে বৎস ! জগতে ধর্ম্ম-সাম্রাজ্য,—
এই মহারণ ?"
"বুঝিলাম,"—জননীর পদতলে পড়ি
কহে গদগদ্ যুবা,—"বুঝিনু আমার
মাতা দেবী, পিতা দেব, মামা নারায়ণ,
আমি তোমাদের মা গো ! পুত্র নরাধম।
বুঝিলাম ক্ষুদ্র শুক্তি জন্মে রত্নাকরে ;
কুফল অশ্বত্থে, বটে ; তৃণ মহীধরে।

দিলে আজি পুত্রে তব জন্ম শ্রেষ্ঠতর,
শিরে দিয়া দুই হাত আশীর্ব্বাদ কর,—
স্বধর্ম্ম পালনে মা গো! করি প্রাণদান,
জন্মে জন্মে তোমাদের পদে পাই স্থান।”
দেব পুত্রে দেবী মাতা লইয়া হৃদয়ে
অশ্রুমুখী, চুম্বি সেই সিক্ত কুবলয়ে,
কহিলা উচ্ছ্বাস-কণ্ঠে ভকতিপূরিত,
মাতৃ-স্নেহে দুই ধারা করি বিগলিত—
“লও আশীর্ব্বাদ—করি স্বধর্ম্মপালন,
গীতার সাম্রাজ্য কর জগতে স্থাপন।
কৃষ্ণের ভাগিনা তুই, অর্জ্জুন-তনয়,
তোর মাতা,—হ'ক মম এই পরিচয়।”

পঞ্চম সর্গ।

—*—

ভ্রাতা ভগিনী।

—*—

হেমন্তশৈশবসন্ধ্যা ধীরে বিষাদিনী
উত্তরিলা কুরুক্ষেত্রে; উত্তরিলা ধীরে
অদূর দক্ষিণারণ্যে, বসিয়া যথায়
সন্ন্যাসিনী জরৎকারু সন্ধ্যাস্বরূপিণী।

অপরাহ্ণ হ'তে বায়ু বসি একাকিনী
বনপ্রান্তে, দূর পথ চাহি অবিরাম,
কহিল—"গিয়াছে আশা। এইরূপে হায়!
যাইবে জীবন কি লো? সূর্য্য অস্তমিত;—
যেই সন্ধ্যা-ছায়া হায়! ভাসিতেছে এবে
জীবনে এ দুঃখিনীর, নিবিড় নিশীথে,
তাও অভাগিনীর কি হবে পরিণত?
রমণীর সুখসূর্য্য, রমণীর প্রেম,
ডুবিয়াছে বহুদিন। হয় ত উদয়
অস্তরবি, অস্তপ্রেম ফিরে না কি আর?
ভ্রাতার সাম্রাজ্য আশা এক ক্ষীণালোক
সঞ্চারিয়া সেই ঘোর নিরাশা-আঁধারে,
করিয়াছে সন্ধ্যাময় জীবন আমার
এইরূপে, এইরূপে সেই ক্ষীণালোক,—
হা বিধাতঃ! এইরূপে যাবে কি নিবিয়া?"

হেমন্ত-শৈশব-সন্ধ্যা ধীরে ছায়াময়ী
উত্তরিয়া কুরুক্ষেত্রে, ঢালিল শান্তির
শীতল বিষাদ ছায়া সমর-অনলে।
দিবসের শেষ অস্ত্র উঠিল, পড়িল;
দিবসের শেষ মৃত চুম্বিল ভূতল;
শেষ সিংহনাদ, শেষ কোদণ্ডটঙ্কার,
মিশাইল সন্ধ্যানিলে। শেষ শঙ্খনাদে
দিবসের রণ-শান্তি ঘোষিয়া গম্ভীরে,
যোদ্ধৃগণ দুই স্রোতে চলিল শিবিরে,—
অনন্ত বলাকামালা দুই স্রোতে যেন
চলিল কাকলীকণ্ঠে প্লাবিয়া গগণ;

দুই প্রতিকূলানিলে চলিল ছুটিয়া
ফেনিল তরঙ্গমালা মহাপারাবারে।
নিবিল ঝটিকা, ঘোর শঙ্খের নিনাদ,
সমর-নির্ঘোষ,— মত্ত জলধি উচ্ছ্বাস,
সন্ধ্যালোক সহ ধীরে। মহর্ষি দুর্ব্বাসা
বনান্তর হইতে ধীরে হইলা বাহির,
বিবর হইতে যেন তীব্র বিষধর।
এখন (ও) যুবতী বসি চাহি পথপানে
বিবশা, আপনা-হারা, না দেখে নয়নে
রণক্ষেত্র, বনক্ষেত্রে না শুনে কাকলী।
কিছুক্ষণ ভ্রমি ঋষি অজ্ঞাতে পশ্চাতে
ডাকিলা—"মনসে!" বামা শুনিল না কাণে,
চিত্রিত প্রতিমা মত রহিল বসিয়া।
"পাপীয়সি!"—স্বপ্নোত্থিতা, চমকিয়া বামা
দেখিল ফিরিয়া ঋষি। "পাপী-পাপীয়সি।"—
ক্রোধেতে ঋষির অঙ্গ কাঁপে থর থর,
—"নিয়ত আমায় তুচ্ছ! নিয়ত এখানে
থাকিস্ বসিয়া; নিত্য একই ভাবনা!"
কাতরে কহিল কারু,—"সংসার-বন্ধন
একে একে হায়! প্রভো! ছিঁড়েছি সকল;"
—মুখ ফিরাইয়া পুনঃ চাহি পথপানে,—
"একই বন্ধনে বাঁধা সংসারের সহ
উদাসিনী পত্নী তব। স্নেহ-পারাবার
ভ্রাতা সে বন্ধন তার। সেই এক বৃন্তে
শুষ্ক ফল সম এই হৃদয় আমার
ঝুলিছে সংসার-বৃক্ষে; কাটিও না তারে,

শুষ্ক ফল হায়! প্রভু! পড়িবে ঝরিয়া।
জগতে এমন ভাই কোথা আছে আর?
শৈশবে এ অভাগীরে গেলেন ছাড়িয়া
জনক জননী। হায়! পিতৃব্যভগিনী—
বিশ্বাসঘাতিনী শৈল! হারা'ল শৈশবে
জনক জননী তার। দুইটি বালিকা
বন বল্লরীর মত পালিলা আদরে
অঙ্গে অঙ্গ জড়াইয়া, অঙ্গ মিশাইয়া,
কল্পতরু নাগরাজ। প্রভু! আমাদের
নাগরাজ পিতা, মাতা, ভ্রাতা, সহচর।
শুনিয়াছি মহাবনে আছে তরুবর,
কঠিন কঠোর দেহ, হৃদয় তাহার
দুগ্ধে ভরা. সেই তরু মম সহোদর,—
শিলারোধে অবরুদ্ধ স্নেহের সাগর।
মুখে মুখে বুকে বুকে অনাথা দু'জনে
বিহঙ্গ-শাবক মত করিলা পালন
কত দুঃখে, কত স্নেহে; কতই আদরে
শিখা'লেন অস্ত্রবিদ্যা, শিল্প, ও সঙ্গীত।
আমি উগ্র, শৈল শান্ত; স্নেহে সহোদর
কহিত তপতী আমি, শৈলজা নর্ম্মদা।
বনে বনে, পর্য্যটনে, আমরা দু'জন
থাকিতাম অঙ্গে লাগি; গলায় গলায়
দুলিতাম, পড়িতাম অঙ্কে ঘুমাইয়া।
করে নাই আমাদেরে, করিনি আমরা
সহোদরে, মুহূর্ত্তেক নয়ন-অন্তর।
হায়! অভাগিনী শৈল, বিশ্বাসঘাতিনী

পুড়ি মনস্তাপানলে,—জগতে এমন
নাহি বুঝি দুঃখ আর !—ছাড়ি মর্ত্ত্যলোক,
ওই বুঝি আকাশেতে রয়েছে ফুটিয়া
সেই ক্ষুদ্র স্নেহফুল ! এই দীর্ঘকাল
নাহি জানি ভাই কোথা।"
কাঁদিল রমণী,
দর দর দুই ধারা বহিল নয়নে।
দুর্ব্বাসা। পতিচিন্তা, একমাত্র সতী রমণীর
মহাধর্ম্ম, অন্য চিন্তা মহাপাপ তার।
নারীর আবার কে বা পিতা, মাতা, ভ্রাতা ?
তাহার সর্ব্বস্ব স্বামী। বিবাহের সনে
ছাড়ি পিতৃকুল, পতিকুলেতে স্থাপিত
হয় অরুন্ধতী মত। হ'লে বৃক্ষান্তর,
ভাঙ্গিয়া পড়ুক ঝড়ে, পড়ুক কুঠারে
পূর্ব্ব তরু, আছে তাহে কি দুঃখ লতার ?
"ভ্রাতার সাম্রাজ্য-সাধ যাক্ রসাতলে।
ইচ্ছা—এই দণ্ডে পোড়া যজ্ঞকাষ্ঠখানি
ভাঙ্গি ঝড়রূপ ধরি, করি খণ্ড খণ্ড
কুঠারে অস্থিপঞ্জর"—কহিয়া স্বগত,
কহিল কাতর-কণ্ঠে শিহরি রমণী—
"শিব ! শিব ! একি কথা ! ইহা যদি, প্রভু !
নারীধর্ম্ম আর্য্যদের, অনার্য্যা এ দাসী
পারিবে না তাহা কভু করিতে পালন।
বিবাহের পরে থাকি অনার্য্যা আমরা
পিতৃবাসে, পিতৃকোলে, জননীর বুকে,
ভ্রাতা ভগ্নীগণ সঙ্গে গলায় গলায় !

ছাড়ি সেই স্বর্গ, ছাড়ি পিতা, মাতা, ভ্রাতা,
ছিন্ন করি সে অনন্ত স্নেহের বন্ধন,
ঋঁচিতে অনার্য্যা লতা পারে না কখন।
মানব-হৃদয় সিন্ধুনদ শতমুখ ;—
কত আশা, কত তৃষা, কত ভালবাসা।
অবরুদ্ধ সর্ব্বস্রোত মম হৃদয়ের।
এক স্রোতে হায় ! আমি দিয়াছি ঢালিয়া
এ জীবন, এ হৃদয় ; সহোদর-স্নেহ
সেই স্রোত, সেই স্বর্গ। জীবন-প্রবাহ,—
অম্লানবদনে পারি রোধিতে তাহায় ;
এ প্রবাহ, অভাগিনী পারিবে না, হায় !
দাসী বন-নিবাসিনী ; বন-বিহঙ্গিনী
কাটিবে পিঞ্জর, নহে ত্যজিবে জীবন
অনাহারে অভাগিনী, তথাপি কখন
কাটিবে না স্নেহময়ী স্নেহের বন্ধন
ওকি দেখা যায় ওই ! আসিলা আমার
ওই বুঝি দাদা ! ওই !—দাদা ! দাদা দাদা !"
যেমতি পিঞ্জর-মুক্ত বন-বিহঙ্গিনী,
ছুটিয়া রমণী বেগে আনন্দে অধীরা,
পড়িল বাসুকি বক্ষে। গলা জড়াইয়া
কহিল কাঁদিয়া—"দাদা ! ছাড়িয়া আমারে
কেমনে রহিলে তুমি বল এত দিন ?
তুমি বিনা এ জগতে কি আছে আমার ?"
উচ্ছ্বাসে লইয়া বুকে চুম্বিয়া আদরে,
কহিলা বাসুকি, নেত্র স্নেহে ছল ছল,—
"কারু ! কারু ! পাগলিনি ? আসিতে আমার

হইল বিলম্ব কিছু ; ছিলাম ব্যাপৃত
নানা কার্য্যে, অসম্পূর্ণ এসেছি রাখিয়া,।
কেবল দেখিতে তোরে, লইতে রে বুকে
কোমল মু'খানি তোর ; জুড়া'তে জীবন,—।
দুরাকাঙ্ক্ষা-মরীচিকা,—তোর স্নেহাসারে।
না দেখি আমারে তোর যত কাঁদে প্রাণ,
কাঁদে মম ততোধিক ; সংসার-মরুতে
একমাত্র তুই মম স্নেহ-মন্দাকিনী।"
আবার আবার স্নেহে চুম্বিয়া বদন,
স্মার্ত্ত ফুল্ল নীলোৎপল, জিজ্ঞাসিলা ধীরে—
"কেমন আছিলি কহ।"
উত্তরিল হাসি
ধীরে অধোমুখী বামা—"আছিলাম,—আছি
আশ্রিত পাদপ-চ্যুত লতিকার মত।
ঝটিকায় ভূপতিত দেহ লতিকার,
পদাঘাতে বিদলিত ; মরে না তথাপি,
স্নেহের বেষ্টনে বাঁধা লতিকার মূল
পাদপের পদমূলে আছে নিরবধি।
"নরাধম ! দুরাচার !"—লৌহ দৃঢ়তম
আঘাতিল শিলা দৃঢ়। অগ্নির স্ফুলিঙ্গ
ছুটিল বাসুকিচক্ষে। "পাপী ! নরাধম !—
ধর্ম্ম-ব্যবসায়ী, জ্ঞানী, সুসভ্য ইহারা।
আমরা অনার্য্যগণ অসভ্য বর্ব্বর।
ভ্রাতা ও ভগিনী" ; —চাহি আকাশের পানে,
ভগিনীকে লয়ে বুকে কহিলা কাতরে,—
"ভাগ্য দুই জন। না জানি এমন

আছে কি জগতে আর। নিরাশা-অনলে
হায় রে! জ্বলিতেছিল দুইটি হৃদয়।
ডুবিনু আপনি, আর ডুবাইনু তোরে,
অনার্য্যের রাজ্যোদ্ধার দুরাশা-সাগরে,
নিবাইতে সেই জ্বালা,—সে ভীষণ জ্বালা
রাজ্যলাভে পারে, যদি, পারি নিবাইতে!—
হায়! যদি রণরঙ্গে, শত্রুর শোণিতে,
প্রতিহিংসা-সুধামৃতে নিভে রে সে জ্বালা!
বুঝিলাম আশা মত্ত আমরা দুজন।
অন্যথা বাসুকি তোর তিল সুখ তরে,
তুচ্ছ কথা ধরারাজ্য, সুররাজ্য পারে
ফেলিতে চরণে ঠেলি অম্লান বদনে।
কিন্তু তোর অপমান, এ ঘোর নিগ্রহ!
হা বিধাতঃ! বাসুকির স্নেহের মৃণালে
একটি যে নীলোৎপল, অতুল জগতে,
কুটিল, তাহার ভাগ্যে লিখিলে এ লিপি!
ফেলিলে আমায়ে এই বনের শার্দ্দূল,
করিলে নির্বীর্য্য হেন, রয়েছে চাহিয়া
ভগিনীর অপমান!”—
বহিল নয়নে,
বিদ্যুৎ-বিক্ষেপী মেঘে, সলিলের ধারা।
কাতরে কহিল কারু,—“এ কি কথা, দাদা!
বাসুকির ভগ্নী আমি, নাগেন্দ্রনন্দিনী,
কি সাধ্য একটি দীন ঋষি দুরাচার
করে মম অপমান? একটি পতঙ্গ
কি সাধ্য নিগ্রহ, দাদা! করে সিংহিনীর?

একটি কমল ক্ষুদ্র তুলিতে কণ্টক
জ্ঞান ত সহিতে হয়! সামান্য নিগ্রহ
সহিতে না পারি যদি, বীরেন্দ্র! কেমনে
একটি বিশাল রাজ্য করিব উদ্ধার?"
দাঁড়াইয়া ঋষিবর দেখিতেছিলেন
এই দৃশ্য, ভাবিতেছিলেন, মনে মনে—
"সংসারবন্ধন যদি মোহের বন্ধন,
মোহ তবে কি মধুর! কি স্বর্গ সুন্দর,—
ভ্রাতা ও ভগিনী ওই গলায় গলায়!
জরৎকারু—জরৎকারু! কিবা মূর্ত্তিখানি!
কিবা মুখ! কিবা রূপ! রূপের সাগরে
খেলে কি তরঙ্গ ভঙ্গ সঞ্চারি আবেগ
যজ্ঞকুণ্ড সম মম যোগীন্দ্রহৃদয়ে!
নার্য্যা; অঙ্গ-বাতাসেও তার
হয় দেহ কলুষিত আমি দুর্ব্বাসার;
ঘৃণায় শিহরে অঙ্গ। কিন্তু কি করিব
ব্রাহ্মণের আধিপত্য রক্ষিত বর্দ্ধিত
করিতে লয়েছি ব্রত। তার উদ্‌যাপন
না হইবে যত দিন, হইবে সহিতে
অনার্য্য-সংসর্গ-পাপ, এই বিড়ম্বনা!"
প্রণমিল নাগরাজ। আশীষিয়া ঋষি
জিজ্ঞাসিলা—"কহ, শু'ন শুভ সমাচার।"
উত্তরিলা নাগরাজ ছাড়িয়া নিশ্বাস—
"অসংখ্য অনার্য্য জাতি হইবে গ্রথিত
একতার সূত্রে, ঋষি! অসম্ভব কথা।
দুই চারি জন যদি হয় অগ্রসর,

তুই চারি শত যায় পশ্চাৎ সরিয়া।
অসংখ্য নক্ষত্রাবলি ওই আকাশের
গাঁথিলে গাঁথিতে পার,—হায়! আমি এই
দুরাকাঙ্ক্ষা-সমুদ্রের নাহি দেখি কূল।"
অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করি কুরুক্ষেত্র-প্রতি,
ঈষৎ হাসিয়া—সেই হাসিতে কি বিষ!—
উত্তরিলা ঋষিবর.—"ওই দেখ কূল!"

বাসুকি। কূল!—কূল নহে ঋষি! ঘোর প্রতিকূল!
ভীষ্ম অর্জ্জুনের যেই বীরত্বের গীত
জনরব শত মুখে করিছে প্রচার,
প্লাবিয়া ভারতভূমি পশিয়াছে বনে
সে অপূর্ব্ব বীর-গাথা। করেছে সঞ্চার
কি যে ত্রাস হৃদয়েতে বনপুত্রদের
কহিতে না পারি আমি। জিজ্ঞাসে সকলে—
'কে ধরিবে অস্ত্র বল ইহাদের আগে?'
আছি ভাল সুশীতল কানন-ছায়ায়
মাতা বনদেবী-অঙ্কে জ্বালি দাবানল,
কি ফল লভিব বল পুড়িয়া মরিয়া?"

দুর্ব্বাসা। জরৎকারু ঋষিশ্রেষ্ঠ যথা যজ্ঞাগারে
কাষ্ঠের অগ্নিতে কাষ্ঠ করে ভস্মীভূত,
ক্ষত্রিয়-অগ্নিতে তথা সমগ্র ক্ষত্রিয়
পোড়াইছে এই দেখ! আশু দাবানল
নিভিবে ক্ষত্রিয়হীন করিয়া ভারত।
শর-শয্যা-শায়ী ভীষ্ম ওই দেখ, ওই,
মৃত সজারুর মত পড়িয়া ভূতলে!
দৃশ্য হাস্যকর! বীর্য্যে, অহঙ্কারে,

ধরা ভাবিতেন সরা ; বুঝেছেন এবে
সার্দ্ধ তিন হস্ত ভূমে সেই পৃথিবীর
হয়েছে গর্ব্বিত শৌর্য্য বীর্য্য পরিমিত,—
ভীষ্ম ও ভীরুর শেষে এক পরিমাণ !
ওই ষণ্ড, রাজসূয় যজ্ঞে মহাদর্পে
বাড়াইয়া গোপস্থতে করিল প্রহার
ব্রাহ্মণের শিরে অসি। বিধর্ম্মী পামর
প্রাণভয়ে অর্জ্জুনের সাজিয়া সারথি,
উপযুক্ত প্রতিদান দিয়াছে তাহার,—
ওই ভীষ্মদেব, পড়ি মণ্ডুকের মত !
বীরত্বের এ বিদ্রূপে অঙ্গ বাস্থকির
উঠিল জ্বলিয়া ক্রোধে—“যজ্ঞব্যবসায়ী
কাপুরুষ তুমি ঋষি ; বীরত্ব তোমার
অশ্বমেধ, নরমেধ ; এই বীরত্বের
কেমনে বুঝিবে তুমি অতুল মহিমা,—
মূষিকে বুঝিবে কিসে সিংহের গৌরব
ভীষ্মের পতনে স্তব্ধ কৌরবের পতি
করে যদি সন্ধিভিক্ষা,—জান তুমি চাহে
পঞ্চগ্রাম মাত্র ভিক্ষা ভাই পঞ্চজন !
কিংবা যেই পক্ষ জয়ী এই মহারণে
হইবে, তাহার কীর্ত্তি ছুঁইবে আকাশ ;
অনার্য্য কি কেহ তার দাঁড়াবে সম্মুখে ?
অসম্ভব কথা ঋষি !”

াসা। ‘অসম্ভব’ কথা
জরৎকারু মহর্ষির নাহি অভিধানে।
না হইতে প্রভাকর উদয় আবার,

ক্ষত্রিয়-অদৃষ্ট-গ্রহ যোগবলে আমি
ফিরাইব যেই মতে হেলা'য়ে তর্জনী,
নিশ্চয় হইবে তাহে সন্ধি অসম্ভব,
ভস্মিবে উভয় পক্ষ শিমূলের মত।
জয়ী পক্ষ এই রণে, বাসুকি! আমরা!
নীরবে চিন্তিয়া ঋষি কহে অধোমুখে—
"কর্ণের শিবিরে গিয়া কহিবে গোপনে
নাগেন্দ্র! আসিতে হেথা গভীর নিশীথে।"

জরৎকা। না, দাদা! একে ত ক্লান্ত হইয়াছ তুমি
দীর্ঘ পথ পর্য্যটনে। অবসন্ন দেহ
কাতরে মাগিছে শ্রান্তি, পড়িছে ভাঙ্গিয়া
মূলশূন্য তরু যেন। তাহাতে তোমায়
দেখে যদি কোন জন, চিনে যদি কেহ,
হইবে শত্রুর মনে সন্দেহ বিষম।
মহা-অন্ধকারে নাহি পারে লুকাইতে
মহীরুহ, ক্ষুদ্র লতা অলক্ষিতা সদা।
নহে তুমি, যাব আমি।

ষষ্ঠ সর্গ।

—*—

কুরুক্ষেত্রে পুতুল খেলা।

—*—

স্বর্ণ প্রদীপ সুগন্ধ-বিতরি,
সুমন্দ আলোক সহ,
আলোকিছে চারু পার্থের শিবির,
বহে ধীরে গন্ধবহ।

দুই পর্য্যঙ্কেতে, শু'য়ে দুই জন—
ধনঞ্জয়, জনার্দ্দন।
সুভদ্রা কৃষ্ণের, উত্তরা পার্থের,
ঔষধ অঙ্গে লেপন
করিছে আদরে,— বিষাদিত মুখ
মেঘমাখা চন্দ্র যথা।
ক'হিছেন হর্ষে শ্রান্ত কৃষ্ণার্জ্জুন
দিবসের রণ-কথা।
উত্তরা না শুনে সেই বীর-গাথা
তা'তে তার নাহি প্রীতি।
নীরবে তাহার নয়নের ধারা
পড়িছে কপোল তিতি।—
"সর্ব্ব অঙ্গ ক্ষত! কেমনে মানুষ
এমন নিষ্ঠুর হয়?
বীরের কি, বাবা! থাকে না হৃদয়?
তুমি ত করুণাময়!"
দেখিলা অর্জ্জুন কাঁদিছে উত্তরা,—
অশ্রু নহে স্নেহাসার;
চুম্বিয়া মু'খানি বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে
কহিলা—"বাছা আমার!
বীর-ধর্ম্ম যুদ্ধ, এ ত আর তোর
নহে পুতুলের রণ।
বীর-বালা তুই, দেখি অস্ত্র-লেখা
কাতরা কেন এমন?"
"না না বাবা! আমি না পারি বুঝিতে,
পোড়া বীর-ধর্ম্ম ছাই

সংসার ছাড়িয়া যা'ক্ যমপুরে
লইয়া সব বালাই।
একটি কণ্টক চরণে তোমার
ফুটিলে উত্তরা তব
না পারে সহিতে; নিত্য এত ক্ষত
কেমনে পরাণে সব?
কেন এই রণ? কেন দেব-অঙ্গ
এই রূপে ক'র ক্ষত?
কে আছে জগতে তোমাদের মত?
কে সুখী আমার মত?"
সুবর্ণ দর্পণ সে ক্ষুদ্র ললাটে
আদরে বুলায়ে কর,
কুঞ্চিত কুন্তল সরাইয়া ধীরে,
উত্তরিলা বীরবর—
"পিতৃরাজ্য বাছা! করিব উদ্ধার,
রাজা হবে অভি মম;
তুই হবি রাণী বসি বামে তার,
ইন্দ্রপাশে শচী সম!"
অধোমুখী বামা, কণ্ঠ ছল ছল,
কহিল বীণার স্বরে
কণ্ঠমূর্চ্ছনায় নারী-হৃদয়ের
অমৃত বর্ষণ করে—
"যেই তিন রাজ্য পাইয়াছি আমি,
রাজ্য কি বা আছে আর?
তোমার, মায়ের, নারায়ণ পদ,—
স্বর্গ-রাজ্য উত্তরার?

আমার সমান ভাগ্যবতী, বল,
কে আছে জগতে আর ?
তোমাদের স্নেহ, ক্ষুদ্র হাসি টুক,
স্বর্গ-রাজ্য উত্তরার !
এ পোড়া ধরার রাজ্যে কিবা সুখ ?
নিত্য এই কাটাকাটি ;
কে কারে মারিয়া কে কারে খাইবে,—
এ সংসার কান্নাহাটি।
করে পুত্রহীনা মাতা হাহাকার,
পতিহীনা কত নারী
কাঁদিছে অনাথ শিশু ল'য়ে বুকে,—
প্রাণে না সহিতে পারি !
এ রাজ্য ছাড়িয়া চল যাই বনে,
বাঁধিয়া কুটীর ঘর,
তোমাদের পদ সেবিবে উত্তরা,—
সে রাজ্য কি সুখকর ।"
পার্থ, কেশবের, মাতা সুভদ্রার,
ছয় চক্ষু ছল ছল ;
অর্জ্জুন আবার চুম্বিলা উচ্ছ্বাসে
বিষণ্ণ ফুল্ল কমল।
ক্ষুদ্র মুখ খানি রাখিয়া হৃদয়ে,
—নীলাকাশে যেন তারা,—
গদ গদ কণ্ঠে কহিলা অর্জ্জুন
উচ্ছ্বাসে আপনাহারা—
"আশীর্ব্বাদ করি,— এ কৌরব-কুল
মহা হিমাচল সম,

শোভে শিরে যেন রীরত্ব-কৈলাস
বাছা অভিমন্যু মম।
তুই মা আমার যাইবি বহিয়া,
জননী জাহ্নবী জিনি,
সংসার মরুতে ঢালিয়া অমৃত,
করুণার মন্দাকিনী!
আমার মতন নির্ম্মম পাষাণ,
হয় যেন মুক্ত স্নেহেতে তোর।
তোর স্নেহমুখ চাহিয়া চাহিয়া
জীবনের স্বপ্ন হয় মা! ভোর!"
সকলি নীরব; কি যেন কি স্বর্গ,—
জোছনার স্বপ্ন প্রায়!
কেবল সে স্বর্গে অনন্ত করুণা
উছলি উছলি ধায়।
ভাবিলেন কৃষ্ণ— "ধর্ম্ম শাস্ত্ররাশি
কি ছাই ঘাঁটিয়া মরি!
সরলা বালার পবিত্র হৃদয়ে
কি স্বর্গ দর্শন করি!
ভক্তি-উচ্ছ্বসিত রমণী-হৃদয়
যে স্বর্গে লইয়া যায়,
কত সাধনায় ধর্ম্মশাস্ত্র তার
ছায়া মাত্র দেখে, হায়!"
জিজ্ঞাসিলা ভদ্রা— "দাদা! জ্ঞানযোগ,
কর্ম্মযোগ, কিছু নয়
ভক্তি কাছে যেন; ভক্তই তোমার,
ভক্তের তুমি নিশ্চয়!"

"সকলের মূলে ভকতি, ভগিনি।
না থাকে ভকতি যদি,
পাইতে আমায় চাবে কেন তুমি।
জ্ঞানে কর্ম্মে নিরবধি?
জ্ঞান পদে পদে পতঙ্গের মত
যেখানে যাইতে চায়,
ভক্তি-বিহঙ্গিনী উধাও সেখানে
উচ্ছ্বাসে উড়িয়া যায়।"—
অন্যমনে কৃষ্ণ করিয়া উত্তর
রহিলেন চিন্তাকুল।
ভাবিলেন মনে কংস-নিসূদন—
"হ'তেছে বড়ই ভুল।
একে ত কোমল পার্থের হৃদয়,—
বীরত্ব আর্দ্র দয়ায়;
বালিকার এই করুণা-উচ্ছ্বাসে
বুঝি গীতা ভেসে যায়।"
বুঝিল উত্তরা পার্থের হৃদয়
হয়েছে কাতর অতি,
কিঞ্চিৎ ভাবিয়া অশ্রুতে হাসিয়া
কহে প্রত্যুৎপন্নমতি—
"হে বাবা! ত তুমি বহু দিন ধরি
পুতুলগুলি আমার
দেখ নাই, আজি আনি গিয়া সব,
দেখিবে কি একবার?"
ছুটিল বালিকা বিজলীর মত,
আনিল ভরিয়া ডালা

কতই পুতুল হাসিতে হাসিতে,—
পুতুল বিরাট-বালা!
এমন সময়ে শিবিরে বিরাট
হইলেন উপনীত,
ছুটিয়া উত্তরা দুলিল গলায়
যেন স্বর্ণ উপবীত।
হাসিয়া হাসিয়া কহিলা বিরাট—
"এ কৌতুক মন্দ নয়,
কুরুক্ষেত্রে এই পুতুলের নাচ।"
"দার্শনিক মহাশয়!
না হ'লে বিরাট মূর্খ হেন কথা
কে বলিতে পারে আর?
বানরে না বুঝে, রঙ্গরস বিনা
নাহি চলে এ সংসার।
বীর-নাচ, আর পুতুলের নাচ,
দেখি হাড় জ্বালাতন।
বানরের নাচ আজিকার মত
দেখিব ভরি নয়ন।"—
হাসিতে হাসিতে মন্থর গতিতে
সুলোচনা দিলা বার,—

বিরাট। ও কেও? কে? তুমি!

সুলো। পদ-চতুষ্টয়ে
করে দাসী নমস্কার।

বিরাট। না দেখি তোমায়, ভেবেছিনু মনে

কাটাব সন্ধ্যাটি আজি
গল্প করি সুখে, লাগিলে কি তুমি ?
লাগ তবে।

সুলো। একি পাজি !
যাই, কেন মরি শূকরে মুকুতা,
অরসিকে দিয়া প্রাণ ?

বিরাট। পায়ে পড়ি তোর, দেখ মেয়ে কাছে,
ছাড় রঙ্গ অভিমান।
ওই ঔষধির পাতাটি লইয়া
আয় দেখি, আয় কাছে।
দ্রোণ-অস্ত্রে আজি ক্ষত সর্ব্ব অঙ্গ,
তিলার্দ্ধ না স্থান আছে।
পাতাটি লইয়া হাসিটি চাপিয়া,—
"ফির"—সখী কহে ধীর।

বিরাট। ফিরিব কেন লা ?

সুলো। জানি আমি ভাল,
তুমি যে বিরাট-বীর,
বুক পাতি রণ কারো সনে তুমি
করিবার পাত্র নয় !
অস্ত্র-লেখা কিছু থাকে অঙ্গে যদি,
পিঠে তা আছে নিশ্চয়

সুভ। ক্ষমা কর দিদি ! পায়ে পড়ি তোর,
কাতর বিরাটেশ্বর
দিবসের রণে; ঔষধটি অঙ্গে
দিদি লো ! লেপন কর !

নয়ন মুদিয়া, অঙ্গ হেলাইয়া,
বসিয়া বিরাটপতি,—
"আহা! উহু! মরি! আহা! কি আরাম!
ঔষধ সুস্নিগ্ধ অতি
ততোধিক স্নিগ্ধ সুলোচনা তোর
সুকোমল হাত খানি,
জিহ্বাটিতে শুধু এত কেন ঝাল,
বুঝিতে না পারি আমি।—
বাবা গো! বাবা গো! গেছি রে! গেছি রে!
দূর লক্ষ্মীছাড়ী! ছাড়!
বড়ই লেগেছে!"

সুলো। কমলেতে কাঁটা
আছে, কি জান না আর?

কৃষ্ণ। কই লো মা তোর পুত্র কয় জন?

সুভ। বল মা! তাদের নাম।

উত্তরা। বল না দাই মা এইটি—

সুলো। অর্জ্জুন।

উত্তরা। এটি?

সুলো। বোকা ভগবান!
গালে ক্ষুদ্র চড় পড়িল অমনি।
সখী বাড়াইল কর,
বানরের মূর্ত্তি তুলিয়া কহিল—
"এইটি বিরাটেশ্বর!"

উত্তরা। দূর পোড়ামুখি! তা কেন না হবে?
এই ত বাবা সুন্দর!
ওইটির সঙ্গে দিব বিয়ে তোর,—

হলো। বিরাট পাবে দোসর !

উত্তরা। এই তিন পুত্র।

সুভদ্রা। কন্যা মা ! ক'জন ?

উত্তরা। এই কন্যা পঞ্চজনা—

তুমি মা, দুকন্যা দ্বারকায়,—

হলো। আর ?—

উত্তরা। পোড়ামুখী সুলোচনা।

অভিমন্যু। আমি মা ! না হব ছেলে তোর ক—

দেখ বেশি অলঙ্কার

দিয়াছিস্ তুই শ্বশুরে মা ! তোর,

বিমাতা তুই আমার !

উত্তরা। না বাবা ! তোমায় দিব আমি কাল

অলঙ্কার রাশি রাশি।

অর্জ্জুন। তা হইলে আমি নিশ্চয় তোমারে

ডাকিব—"উত্তরা মাসী।"

উত্তরা। না বাবা ! তোমায় সকলের বেশি

দিব আমি আভরণ।

শৈশব হইতে উত্তরা যে বাবা !

তোমার স্নেহের ধন।

ধরিয়া বালিকা অর্জ্জুনের গলা

কহিল এ কটি কথা।

পুনঃ অর্জ্জুনের আঁখি ছল ছল

চুম্বিলা সে স্নেহলতা।

"আয় মা ! আয় মা ! আয় মা ! আমার,

আয় দেখি একবার।"—

মু'খানি ধরিয়া কহিলা কেশব—
"ক' বাপ কহ তোমার ?"
উত্তরা। এ বাপ, ও বাপ, ওই বাপ আর—
কৃষ্ণ। শুনিলে বিরাটরাজ !
বিরাট। মা কটি মা ! তোর ?
উত্তরা। মা আমার পাঁচ।
বিরাট। বেয়াই ! কে জিতে আজ ?
সুলো। স্বামী পাঁচ জন তা তো হয়, জানি,
মাও এবে শুনি পাঁচ।
সংখ্যা শুনিলাম, সংজ্ঞা এবে শুনি
দেখি কার কিবা ছাঁচ !
উত্তরা। এক মা বিরাটে, ওই মাতা আরে,
দুই মাতা দ্বারকায়।
সুলো। দুই দুই চারি, তার পর শুনি ?
উত্তরা। শূলিমা বাপের পায়।
বিরাট। বাবা গো ! বাবা গো ! মরেছি এবার !
মেরেছে ঘায়ে কি খোঁচা !
সুলো। শূলিমার শূল লাগিল কেমন
আমার গোধন ওঁচা ?
উত্তরা। আমাকে মারিস, মারিস বাবাকে,
ঝগড়া তোর দিন রাতি।
কালামুখি ! সব এখনি বাবারে
দিব কয়ে পাতি পাতি।
দেখ বাবা ! দেখ, শূলিমা আমায়
আজ মারিয়াছে বড়,

আরো তোমাদের কত দেয় গালি,
বাবা গো বিচার কর।

অর্জ্জুন। হাঁ রে সুলোচনা! আমাদের গায়ে
ঝারি জিহ্বা দিন রাত
মিটে না কি সাধ? মেয়েটিরে শেষে
গালাগিলি দেখাতে হাত?

সুভদ্রা। হরি! হরি! হরি! কি সাধু সকল!
ঝগড়া কারো নাহি জানা।
আমি কালামুখী পোড়ামুখী আমি!
আর মুখ চাঁদ-পাণা।
ঐ যে সারা দিন শুনি রণ-ক্ষেত্রে
দু'দলেতে হাঁকাহাঁকি—
কুটুম্বিতা সব! লোকে কাটা কাণ
বলে চুল দিয়া ঢাকি!
কর সারা দিন মর্দ্দানি গুর্দ্দানি,
রণক্ষেত্রে ঘুরি ঘুরি,
গৃহক্ষেত্রে কিছু না রাখ খবর,
কি করে যে এই ছুঁড়ী।
সারাদিন তার পুতুলের বিয়ে,
হুলুধ্বনি, উচ্চহাসি,
দু'টিতে মিলিয়া করে কাড়াকাড়ি,
ঝগড়া করে রাশি রাশি।
কথা যদি কহি, মাথা ধরে মোর—
শত্তুরের মুখে চুণ!
নিদ্রা যাই যদি, হাসি ও চীৎকার—
ভেঙ্গে যায় কাঁচা ঘুম!

সাধুর বেটী সাধু! আমি কালামুখী?
আচ্ছা যাইতেছি আমি,
দিব চূণ তোর বাপের মুখেতে;
এই আমি সাক্ষী আনি।
ছুটিল যুবতী, ছুটিল উত্তরা,—
অর্জুন ধরিলা হাসি।
"ছেড়ে দাও বাবা!"—কহে হেঁট-মুখে—
"ছেড়ে দাও, যাই,—আসি।"
ছুটি অভিমন্যু পশিল শিবিরে,
প্রণমিয়া গুরুজন,
কৃষ্ণপদতলে বসে জানু পাতি।
জিজ্ঞাসিলা নারায়ণ—
"কহ বাবা! শুনি, কার কার সনে
করে'ছলে আজি রণ?"
"না মামা! যুদ্ধেতে—" হাসিয়া কিশোর—
"আজি না লাগিল মন।
কেবল মাতুল হার্দ্দিক্যের সনে
করেছিনু কোলাকুলি,
পিসা জয়দ্রথ হয়ে অগ্রসর
দিয়া গেলা পদধূলি।
মাতামহ শল্য আসিয়া তখন
আরম্ভিলা মহা রঙ্গ,
না হ'তে রগড় ছোট জেঠা আসি
করিলেন রস ভঙ্গ।"
এ কৌতুকে ঢাকা বীরত্ব অতুল
বুঝিলা শত্রুসূদন;

চুম্বিলা ললাট লয়ে গর্ব্বে থুকে—
শৈলে শৈলে সম্মিলন !
"থাক রঙ্গরস"— ধরি এক কাণ
উঠাইল সুলোচনা—
"তিন কুল চোর, তোর লাগি আমি
সহি রে এত গঞ্জনা !"
তোলে অন্য করে ধরি এক কাণ
বিরাট রাজকুমারী,—
"বল দেখি অভি ! তোর সঙ্গে আজ
কে করিল কাড়াকাড়ি ?"
দুই গালে চড় পড়ে দুই দিকে,
আদরে যে দিকে চায়।
"দেখ তবে এই দেই আল্পনা
বিরাট বীরের গায়।"
ঔষধির পাতা ছুটি তীর বেগে
পড়িল রাজার মুখে,
চূণ কালী যেন মেশামিশি করি
শোভিল মুখে ও বুকে।
হাসিলা অর্জ্জুন, হাসিলা কেশব
হাসিলা কিশোর কিশোরী যুগল।
চাপা হাসি আর না পারি রাখিতে
হাসেন সুভদ্রা চাহি ধরাতল।
কহে সুলোচনা— হাসি নাহি মুখে,
—বিরাট-নৃপতি ক্রোধে গড় গড়—
"আচ্ছা বল দেখি, হেন লক্ষ্য শুদ্ধ
চলে কি কখনো তোমার শর ?

সখের সমর বিরাট রাজার,
বসনে কখন লাগে না দাগ।"
মুখ চেয়ে দাগ লেগেছে বসন,
বিরাট রাজার এই ত রাগ?"
না থামিতে হাসি, কৌরব-শিবিরে
উঠে জয়ধ্বনি মেঘমন্দ্র জিনি।
চমকিলা সব, পশিল উত্তরা
সুভদ্রার বুকে ভীতা কুরঙ্গিণী।
বেগে রাজদূত পশিয়া শিবিরে
কহে,—"দ্রোণাচার্য্য করেছেন পণ,—
কালি মহারণে করিবেন হত
পাণ্ডবের মহারথী একজন।"

সপ্তম সর্গ।

—※—

দাবাগ্নি।

—*—

কুরুক্ষেত্র!—ক্রীড়াক্ষেত্র হায় দুরাশার!
অতীত প্রহর নিশি! কৃষ্ণা অষ্টমীর
নিবিড় তিমিরে এবে আচ্ছন্ন প্রাঙ্গণ।
উপরে নক্ষত্ররাশি জ্বলিছে কেবল
ব্যাপি ঘনকৃষ্ণ নভঃ; জ্বলিছে কেবল
অনন্ত আলোকরাশি শিবিরে শিবিরে

ঘনকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে ; জ্বলিছে কেবল
দুরাশার ক্ষীণালোক হৃদয়ে হৃদয়ে
ঘনকৃষ্ণ বিষাদের ঘোর অন্ধকারে।
বিষাদের প্রতিমূর্ত্তি, জ্বালিয়া হৃদয়ে
দুরাশার ক্ষীণালোকে, চলিয়াছে কারু
পাণ্ডব-শিবিরমুখে ধীরে বিষাদিনী,
ছাড়ি অলক্ষিতা অঙ্গপতির শিবির।
শবে, ভগ্ন রথ-কাষ্ঠে; স্খলিত চরণ
হইতেছে পদে পদে,—নাহি জানে বামা।
ছুটিতেছে চারিদিকে নৈশ-পর্য্যটক
মাংসাহারী হিংস্র পশু, না দেখে নয়নে।
বিকট চীৎকার স্থানে স্থানে পশুদের,
বীর-কণ্ঠ, উচ্চহাসি, উচ্ছৃঙ্খল গীত
সৈনিকের স্থানে স্থানে, উঠিছে ভাসিয়া
নৈশ নীরবতা বক্ষে রহিয়া রহিয়া—
না শুনে শ্রবণে বামা। খর চিন্তাস্রোতে
ছিন্ন লতা সম কারু চলেছে ভাসিয়া।

নীরবে এসেছে বামা, যাইছে নীরবে,—
চিন্তাকুলা, অন্যমনা ; জ্বলিছে হৃদয়ে
দুরাশার ক্ষীণালোক নিরাশা আঁধারে,
নৈশ অন্ধকারে ক্ষীণ তারালোক যথা।
ভাবিতে লাগিল কারু—"বুঝেছিনু আগে
ছদ্ম নাম জরৎকারু, সেই প্রবঞ্চনা,—
সেই রুদ্র দরশন,—করেছিল মনে
ক্ষীণ সন্দেহের ছায়া অস্পষ্ট সঞ্চার।
কিন্তু সহোদর মম ; সরল-হৃদয় ;

ওই নিরমল নভঃ হৃদয় তাঁহার,"
বিভাসিত পুণ্যালোক-নক্ষত্র-মালায়।
পাপময় পৃথিবীর কুটিলতা ছায়া
পড়ে না সে পুণ্যাকাশে; পড়িলা অজ্ঞাতে
পতঙ্গের মত এই উর্ণনাভ-জালে।
এই প্রবঞ্চনা যদি বুঝে ঘৃণা করে,
সিংহ পরাক্রমে এই প্রবঞ্চনা-জাল
ফেলিবে ছিঁড়িয়া; কিন্তু লভিব কি ফল?
এই জীবনের মত গিয়াছে ত হায়!
প্রেম আশা; রাজ্য-আশা ডুবিবে অতলে।"
নীরবে চলিল বামা নক্ষত্রখচিত
নব-শিত নিরমল আকাশের পানে
চাহিয়া চাহিয়া, ধীরে ধীরে চিন্তাকুলা।
"গিয়াছে ত প্রেম-আশা; হা হত বিধাতঃ!
কিন্তু কি গিয়াছে প্রেম? যায় কি তা কভু?
যায় আশা,—আকাঙ্ক্ষা ত যায় না কখন!
ভ্রাতার বিরহ-চিন্তা কিছুদিন হ'তে
করেছিল আকুলিত রমণী-হৃদয়
জাগাইয়া পূর্ব্বস্মৃতি! ধীরে সরাইয়া
যৌবন-জলদজাল, দেখাইতেছিল
জীবনের কি সুন্দর প্রফুল্ল প্রভাত,
স্নেহালোকে, আশালোকে, শান্ত সমুজ্জ্বল।
বহুদিন রুদ্ধ এক কক্ষের অর্গল
সরাইয়া হৃদয়ের, দেখাইতেছিল
কি শোকের দৃশ্য! যেই স্বর্গীয় আলোকে
ছিল কক্ষ সমুজ্জ্বল, গিয়াছে নিভিয়া;

ছিল পুষ্পকীর্ণ যেই স্বর্গীয় কুসুমে,
গেছে শুকাইয়া; যেই স্বর্গীয় সৌরভে
ছিল সুবাসিত, তাহা গিয়াছে ভাসিয়া।
কিন্তু সেই গন্ধে, পুষ্পে, দীপে, যে মূরতি
হইত পূজিত,—সেই হৃদয়ের দেব,
কারুর হৃদয়নাথ,—রয়েছে স্থাপিত
কারুর প্রণয় পদ্মে সেই মত হায়!
সেই রুদ্ধ কক্ষ-দ্বারে দ্বাদশ বৎসর
করেনি আঘাত কেহ; জগতে দ্বিতীয়
নাহি কেহ, পারিবে যে করিতে আঘাত
সেই দৃঢ় রুদ্ধ দ্বারে; খোলেনি কখন
সেই রুদ্ধ-দ্বার এই দ্বাদশ বৎসর।
স্মৃতি কুহকিনী হায়! অজ্ঞাতে কেমনে
খুলিয়া সে রুদ্ধ-দ্বার, জ্বালাইয়া দীপ,
বাঁচাইয়া শুষ্ক ফুল, ঢালিয়া সুবাস,
আরম্ভিল প্রেমারতি; রমণী-হৃদয়
আবেশে আবেগে হায়! হইল আকুল।
পর্ব্বতনির্ঝরে শুষ্ক বহিল ছুটিয়া
ঘোর বরিষার বন্যা প্লাবিয়া দু'কূল,
ভাসি সেই স্রোতোবেগে আকুলা রমণী
আসিলাম কুরুক্ষেত্রে। কুরুক্ষেত্রে, যথা
বিরাজিছে অভাগীর হৃদয়-ঈশ্বর।
অঙ্গের বাতাস তাঁর, অঙ্গের সুবাস,
সেই ফুল্ল কম্বু-কণ্ঠ,—বহুদিন শ্রুত
নিশীথ-নির্জনে দূর বাঁশরীর রব,—
ভেবেছিনু মনে, বহি নৈশ সমীরণে

জুড়াইবে হায়! এই প্রাণের উচ্ছ্বাস।"
সম্মুখে পথিক এক; জিজ্ঞাসিল কারু
মৃদুলে—"কোথায় কহ কৃষ্ণের শিবির?"
কহিল পথিক—"ওই নীল সূর্য্য মত
জলিছে আলোক যেই শিবিরের দ্বারে
কৃষ্ণের শিবির উহা।"
ওই নীলালোক!
সম্মুখে শিবির!—হায়! রমণীর আর
চলিল না পদ। বলে চাপিয়া উচ্ছ্বাস
উদ্বেলিত, অন্ধকারে পাদপের মূলে
হেলাইয়া বাম অঙ্গ, অবশ মস্তক,
আশ্রিতা লতিকা যেন বসিল রমণী—
বিহ্বলা, বিবশা, দীনা, রহিল চাহিয়া
অনিমেষনেত্রে সেই আলোকের পানে;
সেই নীলালোকে যেন নিরখিছে কারু
শিবিরের অন্তঃস্থল; নিরখিছে যেন
সুবর্ণপর্য্যঙ্ক-অঙ্কে শায়িত শিবিরে
নীলমণিময় কিবা মূরতি সুন্দর!
দেখিল জলধি যেন পূর্ণ শশধর;
উনমত্ত, উচ্ছ্বসিত, ছুটিল বহিয়া।
"মরি! মরি! কি সুন্দর!"—
ভাবিতে লাগিল কারু,—
"কিবা রূপ নয়ন মোহিয়া,
প্রাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিছে মম,
প্রাণে প্রাণে অমৃত ঢালিয়া।
কিবা অঙ্গভঙ্গিমায় মহিমা ভাসিয়া যায়!

কিবা বক্ষ মহিমা-পূরিত !
মহিমা নয়নে ভাসে, মহিমা অধরে হাসে,
বীর-কণ্ঠ মহিমা-সঙ্গীত !
পূর্ণচন্দ্র বিভাসিত সুনীল আকাশ সম,
কি ললাট মহিমা-দর্পণ !
যৌবনের পূর্ণতায় উচ্ছ্বসিছে মহিমায়
রমণীর কি স্বর্গ স্বপন !
দুরাকাঙ্ক্ষা কুহকিনী বলেছিল একদিন,
এই স্বর্গ হইবে আমার ;
আমি দীনা কাঙ্গালিনী পাইব হীরকখনি,
চকোরী পাইবে সুধাধার।
যদি নাহি পাইলাম, কেন নাহি মরিলাম
হায় ! নাথ চরণে তোমার ?
জীবন স্বপন সহ জীবন না পোহাইল,
জ্যোৎস্না হইলে অন্ধকার ?
রমণীর অভিমান হৃদয়েতে চাপিলাম ;
বিচূর্ণিত হইল হৃদয়।
তরঙ্গে তরঙ্গে আসি স্মৃতির-সলিল-রাশি
আজি বেলা ভাসাইয়া বয় !
উত্তাল এ সিন্ধু মাঝে ছিল মৈনাকের মত
অভিমান হৃদয় চাপিয়া ;
স্মৃতির নিশ্বাসে ক্ষুদ্র, এত দীর্ঘকাল পরে,
হায় ! তাহা গেল কি উড়িয়া ?—
এ ভগ্ন হৃদয় হায় ! অবারিত প্রেম-স্রোতে
এরূপে কি চলিল ভাসিয়া ?
একি দেখি ! একি দেখি ! ছিল একমাত্র চিত্র

হৃদয়ের দর্পণে বিম্বিত।
বিচূর্ণিত দর্পণেতে আজি সেই প্রতিবিম্ব
দেখিতেছি শত সংখ্যাতীত।
ব্যাপিয়াছে বিশ্ব যেন এ ভগ্ন-হৃদয়,
সেই প্রতিবিম্ব আজি দেখি বিশ্বময়।
মরি মরি কিবা রূপান্তর!
রূপান্তর কত মনোহর!
মোহিল যে অষ্টমীর শশী,
এ কিশোরী চকোরীর মন,
সেই শশী পূর্ণচন্দ্র আজি,
এ চকোরী যুবতী এখন।
বনবালা কিশোরীর প্রেম
গিরিসুতা ক্ষুদ্রা নির্ঝরিণী,
হইয়াছে আজি প্রাণনাথ!
মহানদী ধরাবিপ্লাবিনী!
বনবালা কিশোরীর হায়!
সে আকাঙ্ক্ষা বাঁশের আগুন,
হইয়াছে অকরুণ! আজি
পিপাসার দাবাগ্নি দারুণ।
ছিল যে পাতাল স্বর্গ মম,
তব স্মৃতি অমৃতে মণ্ডিত,
হইয়াছে আজি মরুভূমি,
তব স্মৃতি-দহনে দাহিত।
সাজিলাম যৌবনে যোগিনী,—
তব প্রেমে উদাসিনী আমি।
আরাধ্য দেবতা মম তুমি,

একমাত্র তুমি মম স্বামী।
দুর্ব্বাসা আমার নহে পতি,
আমি পত্নী নহি দুর্ব্বাসার ;
উভয় উভয়ে মাত্র দেখি—
উভয়ের সেতু আকাঙ্ক্ষার।
পারিব না দুর্ব্বাসা কখন
পরশিতে এ দেহ আমার।
দেব-পদে নিবেদিত যাহা,
চিরদিন রবে দেবতার।
বুঝিয়াছি তুমি নহে নর,
বুঝিয়াছি তুমি নারায়ণ।
কারুর হৃদয়নাথ তুমি,
তুমি জগন্নাথ সনাতন।
যেই প্রেম-উৎস বৃন্দাবন,
ভাসাইছ যে প্রেমে ধরায় ;
সেই প্রেম কারুর হৃদয়ে
উথলিছে মত্ত সিন্ধু প্রায়।
না না, নাথ ! তুমি মম স্বামী,
আমি আমরণ তব দাসী ;
চরণে ঢালিব আজি তব,
প্রস্ফুটিত এই পুষ্পরাশি।
এ শিবির ত্রিদিব আমার,
তুমি মম আরাধ্য ঈশ্বর,
পড়িব চরণে আজি তব,
পিপাসায় পুড়িছে অন্তর।”
দাঁড়াইল উন্মাদিনী ; গেল ছুটি পদদ্বয় ;

ছিন্ন লতা মত ঢলি পড়িল ভূতলে।
মাটিতে রাখিয়া বুক, কাঁদিতে লাগিল বামা,
স্নেহময়ী বসুন্ধরা তিতি নেত্রজলে।
"অভিমান! অভিমান! ওরে!
একি কথা, একি কথা তোর?—
'পাবি না রে পাবি না রে স্থান;
মরীচিকা হইবে রে ভোর।'
নাহি পাই, নাহি পাই যদি
তাঁহার চরণে আমি স্থান,
লইয়া হৃদয়ে পা দু'খানি
তেয়াগিব এ নিরাশ প্রাণ।
হায় নাথ! যেই জলধর
ঢালে বিশ্বে অমৃত-আসার,
একটি তাপিতা লতা বুকে
সে কি বজ্র করিল প্রহার?
যেই দিনমণি বিশ্বময়
খোলে নিত্য শোভার ভাণ্ডার;
সে কি এই কুমুদিনী প্রাণে
করে এই মরু আবিষ্কার?
যেই অগ্নি পতিত-পাবন,
জগতের আনন্দ-বর্দ্ধন,
পতিতা এ পতঙ্গিনী তরে
সে কি হায়! কেবল দাহন?
শুনি তুমি দয়া-পারাবার,
শুনি তুমি প্রেম-অবতার;
পতঙ্গেও পায় তব দয়া,

আমি মাত্র অযোগ্যা তাহার?
হায় মাতঃ বসুন্ধরে হৃদয়ে তোমার
দেও স্থান দুঃখিনীরে! দয়াময়ী তুমি,
বহিতেছ বক্ষে তব কত মরুভূমি।
এ হৃদয়-মরুভূমি কর মা! গ্রহণ,
জুড়াও দুঃখিনী তব কন্যার জীবন।”
স্মৃতিতে কাতর, প্রেম-উচ্ছ্বাসে বিহ্বল,
রমণীর হৃদয়েতে তীব্র অভিমান
দংশিল বৃশ্চিক সম; ছটফট্ করি
কাঁদিতে লাগিল বামা চাপিয়া হৃদয়
ধরাতলে, বাণবিদ্ধ বন-কপোতিনী।
অতীত প্রহর নিশি। নীরব প্রাঙ্গণ।
প্রান্তস্থিত শিবিরের অসংখ্য আলোক
আসিছে নিভিয়া ক্রমে। আসিছে নিভিয়া
ক্রমে দূর নর-কণ্ঠ; উঠিছে ভাসিয়া
নীরব শর্ব্বরী-বক্ষে নর-মাংসাহারী
কুকুর-শৃগাল-কণ্ঠ কর্কশ কঠোর।
সুপ্ত-উত্থিতার মত উঠিয়া রমণী
যন্ত্রের পুতুল যেন চলিল সবেগে
কিছু দূর,—ওকি কণ্ঠ!

ত্রিদিব-সঙ্গীতে
প্রাঙ্গণ হইল পূর্ণ; নৈশ সমীরণ
পারিজাত-পরিমলে হইল পূরিত;
কৌমুদী-প্লাবিত ফুল্ল মন্দাকিনীতীরে
কি স্বর্গ খুলিয়া গেল, শান্ত সুশীতল!
কি অমৃতে ঢল ঢল হইল সংসার!

সে সঙ্গীত, সে সৌরভ, স্বর্গ নিরমল ;—
মূর্চ্ছিতা হইয়া বামা পড়িল আবার।

অষ্টম সর্গ।

—:*:—

সূর্য্যমুখী।

—*—

নির্ম্মলা নক্ষত্রময়ী কৃষ্ণা অষ্টমীর নিশি ;
স্বচ্ছ সলিলের মত স্বচ্ছ অন্ধকার।
অনন্ত নক্ষত্ররাশি ফুটেছে নির্ম্মলাকাশে,
ফুটিয়াছে হিরণ্‌তি ! বক্ষেতে তোমার।
বসিয়া রমণী এক নীরব আনতমুখী।
দ্বিতীয়া শায়িতা অঙ্কে, নীলাব্জের হার,
মূর্চ্ছিতা, মুদিত-নেত্রা ; পার্শ্বে এক বীরোত্তম
জানু পাতি ভূমে ; মুখে কথা নাহি কার।
অঞ্জলি করিয়া বারি বর্ষিছেন বীরবর,
নিমীলিত নেত্রে, চারু ললাটে বামার।
কুন্তল আলুলায়িত পড়িয়াছে ধরাতলে,
অষ্টমীর অন্ধকার করিয়া আঁধার।
নিমীলিত নীলোৎপল ধীরে ধীরে উন্মেষিল
একবার আত্মহারা চাহি শূন্য পানে,
আবার মুদিল আঁখি কি সুখের স্বপ্নে যেন,
কি সুখ-মদিরা যেন পশিয়াছে প্রাণে।
আবার আবার রামা মুদিয়া মেলিয়া আঁখি,

নিরখিয়া শেষে সেই অবনত মুখ,
ভাবে মনে মনে কারু—"মরি, মরি ! একি মুখ !
দয়ার দর্পণে যেন চিত্র পর দুখ !"
অনন্ত নক্ষত্রময় আকাশ হইতে যেন
নামিয়া নক্ষত্র এক শীতল উজ্জ্বল,
রহিয়াছে স্থিরভাবে বামার বদন'পরে,
প্রীতিবিস্ফারিত নেত্রে চাহি ছল ছল।
জরৎকারু কিছুক্ষণ স্থির অপলক নেত্রে
চাহি সেই মুখ, সেই করুণার ছবি,
জিজ্ঞাসে বিস্ময়ে বামা, ক্ষীণ অস্ফুটিত কণ্ঠে,—
"কে তুমি রমণী ? তুমি দেবী, কি মানবী ?"
ভগিনি ! রমণী আমি, সুভদ্রা আমার নাম"—
উত্তরিলা ভদ্রা—"কথা কহিও না আর।"
জ্যোৎস্নাময়ীর কণ্ঠে বাসন্তী জ্যোৎস্না যেন
বরষি অমৃত প্রাণে পশিল বামার।
সুভদ্রা !—চমকি কারু, আবার রহিল চাহি
সেই মুখ পানে, স্থির বিস্মিত অন্তরে।
নিরখিল সেই মুখ শোভিতেছে অন্ধকারে,
ফুল্ল অরবিন্দ যথা নীল সরোবরে।
আঁধারে অস্ফুটতায় শোভিছে দ্বিগুণতর,
সে মুখের কি মহিমা, কিবা মধুরিমা !
নিরমল জ্যোৎস্নায় নিরমিত মুখখানি
শান্তির ত্রিদিব কিবা নয়ন-নীলিমা !
যেই অঙ্ক-উপধানে রয়েছে অবশ শির,
বুঝিল রমণী নহে অঙ্ক রমণীর ;
ত্রিদিব-কুসুম-রাশি স্তবকে স্তবকে যেন,—

সুশীতল সুকোমল স্বর্গ অবনীর।
কোমল কোমল কর বুলাইতেছিলা দেবী
ললাটে, কপোলে, সিক্ত কেশে রমণীর,
কোমল—কোমলতর—স্বপনে কোমলতার,
বুঝিল সে কর কারু নহে মানবীর।
হায় রে! বুঝিল কারু এত দিনে বাসুকির
সে দারুণ নিরাশার তীব্র দাবানল।
বুঝিল, এ রূপ নহে, ভূতলে রূপের স্বপ্ন;
বুঝিল, হইল দুই চক্ষু ছল ছল।
"ভ্রাতা যথা নরোত্তম"—ভাবিতে লাগিল কারু—
"হায় রে! ভগিনী তথা রমণীর মণি।
ভ্রাতা দেব, ভগ্নী দেবী, কি অপূর্ব্ব সম্মিলন!
ইঁহাদের পদস্পর্শে পবিত্রা ধরণী।
তেমতি আমরা হায়! ভ্রাতা ভগ্নী দুই জন,
হতভাগ্য এমন কি আছে ধরাতলে?
কাননের তরুলতা নন্দনের পারিজাত
চাহিলাম, মরিলাম পুড়ি বজ্রানলে।
হতভাগ্য বাসুকির গলায় শোভিত যদি
হা হত বিধাতঃ! এই পারিজাতমালা,
নিরখি তাহার মুখ, নিরখি এ দেবী-মুখ,
জুড়াতেম মরু-দগ্ধ জীবনের জ্বালা।
সেই মুখ, সেই বুক, সেই চক্ষু, সেই নাসা,
সেই মহিমা, সে ভঙ্গিমা, শোভা নিরুপমা!
উভয়ের কিবা রূপ! অনন্ত হৃদয়প্লাবী!
কিবা শোভা উভয়ের—আকাশ, জ্যোৎস্না!
ইহাকে লইয়া বুকে, ভাবি এই কৃষ্ণ মম,

পাইতাম কিবা সুখ সে ভ্রান্তিস্বপনে!
ইহার সুরভি শ্বাস, ইহার কোমল কণ্ঠ,
জাগাইত কি উচ্ছ্বাস মরমে মরমে।"
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি, চাপিয়া বিষাদ কারু
জিজ্ঞাসে—"কেমনে আমি আসিনু এখানে?"
ধীরে ধীরে অতিধীরে, কহিলা সুভদ্রা, যথা
কহে নৈশ-সমীরণ কুসুমের কাণে;
"হত ও আহতদের করিয়া সৎকার সেবা,
ভীষ্মদেব পাদপদ্ম করি প্রদক্ষিণ,
শিবিরে যাইতেছিনু ভ্রাতা ভগ্নী দুইজন,
দেখিলাম আঁধারে কি হইল পতন।
কাছে গিয়া দেখিলাম নিরাশ্রিতা লতা মত
রয়েছ ভগিনি! তুমি পড়িয়া ধরায়—
মূর্চ্ছিতা, ধূলি-লুণ্ঠিতা; দয়াময় ভ্রাতা মম
তোমায় লইয়া অঙ্কে আনিলা হেথায়।
"ভ্রাতা কে?"—জিজ্ঞাসে কারু; কহে ভদ্রা—"বাসুদেব।",
মুখ ফিরাইয়া কারু করিল দর্শন।
সে মূর্ত্তি মহিমাময়, দাঁড়াইয়া এক পার্শ্বে,
নীরবে চাহিয়া আছে তাহার বদন।
অষ্টমীর অন্ধকারে অস্ফুট অস্ফুট মাত্র
ভাসিয়াছে সেই দেব মূর্ত্তি মনোহর।
তথাপি দেখিল কারু যেন অন্ধকার পটে
রেখেছে আঁকিয়া কোন দক্ষ চিত্রকর।
কতদিন কত বর্ষ, কত বর্ষ, কত যুগ,
এই রূপ জরৎকারু দেখে নি নয়নে!
চেয়ে আছে অভাগিনী,—নিদাঘ-বিদগ্ধ-ধরা

কাতরা পিপাসাতুরা চাহি নব ঘনে।
কত দিন, কত বর্ষ, কত বর্ষ কত যুগ,
এক দিনে কত যুগ হইয়াছে গত
যে রূপ করিয়া ধ্যান ; আজি সেই রূপ ওই !—
কারুর হইল বোধ স্বপনের মত।
শুধু তাহা নহে, আজি কারুর জীবন-স্বপ্ন
কারুকে লইয়া অঙ্কে আনিলা হেথায়।
লাগিয়াছে অঙ্গে অঙ্গ, লাগিয়াছে, হায় কারু !
হৃদয়ে হৃদয় বুঝি। শিহরিল কায়।
অঞ্জলি-বারিতে তাঁর ভিজিছে ললাট মুখ,—
লাগিয়াছে অঞ্জলি কি কপোলে তাহার,—
নীলোৎপলে রক্তোৎপল ? আর না, হইল বামা
সেই স্মৃতিসুখাবেশে মূর্চ্ছিতা আবার।
হেলিয়া পড়িল শির, ধরিলেন ভদ্রা করে ;
বাসুদেব দ্রুত করে আনি নদী-জল
বর্ষিলেন মুখে চক্ষে ; এবার কাঁপিল কর,
হইল কৃষ্ণের দুই চক্ষু ছল ছল।
পুষ্পমুখী ভদ্রা ধীরে পুষ্পনিভ কম করে
মুছিছেন পুষ্পমুখ সুপ্তা রমণীর ;
প্রভাতসমীরে খেলি পুষ্পে পুষ্প আলিঙ্গিয়া
সরাইছে যেন ধীরে নিশির শিশির।
দেখিছেন সুতন্বীর আঁধারেও যেই শোভা
ভদ্রা দেবী, সে কি শোভা !—রূপ-পারাবার !
পুষ্পিতা বাসন্তী নিশি রূপের স্বপন খুলি,
শায়িতা নিদ্রিতা যেন অঙ্কেতে তাঁহার।
রমণী মেলিল আঁখি,—সরিয়া গেলেন কৃষ্ণ,—

সুভদ্রার মুখপানে রহিল চাহিয়া।
শ্বেত নীলাম্বুজ দুটি—যেন এক বৃন্তে ফুটি,
চেয়ে আছে পরস্পরে মোহিত হইয়া।
ধীরে রমণীর জ্ঞান, ধীরে রমণীর স্মৃতি,
আসিল ফিরিয়া, বামা ভাবে মনে মনে—
"হায়! নিদারুণ নাথ! যেই অঙ্গ-আলিঙ্গন
দিলে মূর্চ্ছিতায়, তাহা পাব কি জীবনে?
মূর্চ্ছায় পাইনু যাহা, মরিলেও পাই যদি,
লও, পদে সমর্পিব দুঃখিনীর প্রাণ।
সহিতে না পারি আর, এবে দয়া কর নাথ!—,'
ফিরাইল মুখ বামা; কৃষ্ণ অন্তর্ধান।
"চিনিতেও দুঃখিনীরে হা নাথ! পারিলে না কি?,'
বহিতে লাগিল নারী-অশ্রু অবিরল।
কিশোরীর প্রত্যাখ্যান, যুবতীর এ যন্ত্রণা,
জ্বালাইল অভিমান প্রচণ্ড অনল।
নীরবে উঠি বামা বসিল; সুভদ্রা করে
ধরিয়া কহিলা—"এ কি! কি কর ভগিনি!
হতেছে কি কষ্ট তব শুইয়া অঙ্কেতে মম?"
"কষ্ট!"—কহে গদ গদ নাগেন্দ্রনন্দিনী,
"এমন পবিত্র স্বর্গে অনার্য্যা বনবাসিনী
নাহি জানি কোন পুণ্যে করিনু শয়ন।
এই দয়া, এই সুখ, ইন্দ্রাণীর স্বপ্ন-শয্যা
এই অঙ্ক, আমি নাহি ভুলিব কখন!
কি ভাগ্য আমার! আমি ভগিনী হইব তব,
হবে হীনা বনলতা ভগ্নী মাধবীর।
যদি জন্ম-জন্মান্তরে তোমার ভগিনী হই,

সার্থক হইবে সেই জন্ম দুঃখিনীর।
তুমি ত মানবী নহ, অপরিচিতায় হায়!
এই দয়া, এই স্নেহ, মানবের নহে।
নহে রূপ মানবীর, মানবীর প্রাণে হায়!
কোথা এইরূপ দয়া-মন্দাকিনী বহে?"
"সে কি কথা?"—কহে ভদ্রা—
"মূর্চ্ছিতা আমায় পথে
পাইলে ভগিনি! তুমি যেতে কি ফেলিয়া?
একটি হরিণী হায়! এরূপে পড়িয়া পথে
দেখিলে কি, তব বুক পড়ে না ভাঙ্গিয়া?"
"পড়ে, কিন্তু আমি নারী অনার্য্যা, আমার ছায়া
মাড়ালেও মহাপাপ হয় যে আর্য্যার!
পশু, পক্ষী, যেই দয়া, পায় আর্য্যদের কাছে,
আমরা অনার্য্য নাহি পাই বিন্দু তার।
হায়! নাথ! তুমি পিতা'—চাহি আকাশের পানে
কাতরে, করুণ-কণ্ঠে, কহে নাগবালা—
"হায় নাথ! তুমি পিতা নহে কি অনার্য্যদের,
তবে কেন তাহাদের কপালে এ জ্বালা?
মানব তাহারা নহে যদি নাথ! তবে কেন
এক রূপ রক্ত মাংস করিলা সৃজন?
কেন বা হৃদয় দিলে, হৃদয়েতে দিলে প্রেম,
প্রেমেতে নিরাশা দিলে গভীর এমন?"
দয়াময়ী সুভদ্রার দুই আঁখি ছল ছল;
অন্তরালে আঁখি ছল ছল নারায়ণ।
করুণার এ উচ্ছ্বাস পরশি উভয় প্রাণ
কাঁদাইল এক তান বীণার মতন।

"না বোন! অনার্য্য আর্য্য" কহিতে লাগিলা ভদ্রা—
"একই পিতার পুত্র কন্যা সমুদয়।
এক রক্ত, এক মাংস, এক প্রাণ, সকলের
এক আত্মা; এক জল, ভিন্ন জলাশয়।
স্থান-ভেদে কাল-ভেদে, কর্ম্মভেদে, জন্মে জন্মে,
কোথায় পঙ্কিল জল, কোথায় নির্ম্মল।
সঞ্চারিয়া জ্ঞানালোক এই মলিনতা কর্ম্মে
কর অপনীত, হবে যে জল সে জল!
মানুষ যে গুণবলে অন্য জীব হ'তে শ্রেষ্ঠ,
মানুষের মনুষ্যত্ব সেই গুণচয়
করিছে ধারণ, ভগ্নি! উহাই মানব-ধর্ম্ম,
সে গুণের মহাদর্শ সর্ব্ব বিশ্বময়
বিরাজিত নারায়ণ, অনন্ত, অপরিজ্ঞাত!
আমরা মানব ক্ষুদ্র নৌকাযাত্রিগণ,
ভাসি এই গুণস্রোতে, চলেছি অনন্ত পথে;
এই যাত্রা মানবের ধর্ম্ম সনাতন।
যেই জন, যেই জাতি, যতদূর অগ্রসর
এই মহাধর্ম্ম পথে, তত নিরমল
আত্মা তার, তত শ্রেষ্ঠ তার ধর্ম্ম—মনুষ্যত্ব;
এই মনুষ্যত্বে নর বিভিন্ন কেবল।
এই ধর্ম্মে, মনুষ্যত্বে, আর্য্য জাতি শ্রেষ্ঠতর;
অনার্য্য হইল হীন এই হীনতায়।
তথাপি আর্য্যের ধর্ম্ম অপূর্ণ, অপূর্ণতার
জ্বলন্ত প্রমাণ এই কুরুক্ষেত্র হায়!
নিকৃষ্ট ইন্দ্রিয়গণ, তীক্ষ্ণ অসি দুই ধার,
অপরের প্রতি তুমি কর সঞ্চালন,

পাবে তুমি প্রতিঘাত,—প্রতিঘাত কি ভীষণ !
দেখ তার সাক্ষী এই কুরুক্ষেত্ররণ !
মানুষ মানুষে ঘৃণা করিলে, জানিও মনে
উভয়েই মনুষ্যত্বে হয়েছে পতিত।
প্রস্তরে ও পরস্পরে আঘাতিলে, দেখিয়াছ
কেমন উভয়ে হয় চূর্ণিত, ধ্বংসিত।
ত্যজ ভগ্নি ! পরিতাপ ! ঘৃণিয়া অনার্য্যগণে,
আজি পরস্পরে ঘৃণা করিছে কেমন
ওই দেখ আর্য্যজাতি ! দেখ মহা আত্মহত্যা,
অধর্ম্মের অভ্যুত্থান, ধর্ম্মের পতন !
ঈশ্বর মঙ্গলময় ! এই ঘোর অমঙ্গলে
কি মঙ্গল নীতি তাঁর আছে বিদ্যমান !
এই ঝটিকার শেষে কিবা শান্তি বিরাজিবে !
করিবে মানবজাতি কি অমৃত পান !
অবতীর্ণ নারায়ণ ! ভস্মিয়া অধর্ম্ম যবে
এ মহাশ্মশান হায় ! হবে নির্ব্বাপিত ;
প্রেমময় পুণ্যময়, শান্তিময় সুধাময়,
কি মহান্ ধর্ম্মরাজ্য হইবে স্থাপিত !
তখন অনার্য্য আর্য্য" চাহি আকাশের পানে.
বহে আনন্দাশ্রুধারা মাতা সুভদ্রার।
বহে আনন্দাশ্রুধারা গোবিন্দের দু'নয়নে ;
চাহি আকাশের পানে কাক চিত্রাকার !
"ত্যজ ভগ্নি ! পরিতাপ ! তখন অনার্য্য আর্য্য,
ভাই ভগ্নী, মিলি সব করিব প্রস্থান
সে অনন্ত স্বর্গপথে, অনন্ত কালের তরে,
গাইয়া তারকব্রহ্ম-মন্ত্র কৃষ্ণনাম।

অগ্রবর্ত্তী আর্য্যগণ, অনার্য্য পশ্চাদ্‌গামী
প্রীতির দক্ষিণ কর করি প্রসারিত
আনন্দে লইয়া সঙ্গে, কৃষ্ণ-পদ-চিহ্ন ধ্যান
করি, মনুষ্যত্ব-পথে হইবে ধাবিত।
বুঝিবে মানবগণ,—সর্ব্বজীবে নারায়ণ,
সর্ব্বজীব-হিত মহাধর্ম্ম নিরমল।
এই নব ধর্ম্মে, ভগ্নি! হবে ক্রমে পরিণত
মানব দেবত্বে, স্বর্গে এই ধরাতল।"
কারুর পড়িল মনে এরূপ পাতালে ব'সে
গাইত কিশোর কেহ, বহু বর্ষ গত,
এইরূপ স্বর্গ-গীতি মোহি কিশোরীর মন,—
কারুর সে সুখ আজি স্বপ্নে পরিণত!
সেই কৃষ্ণ, সেই কারু,—কারুর হইল ভ্রম
সেরূপ পাতালে যেন বসিয়া দু'জন।
জীবনের সে প্রভাত, সে প্রভাতে সেই স্বর্গ,
খুলিয়া মুহূর্ত্ত যাহা হইল স্বপন,—
কারুর পড়িল মনে। সেই স্মৃতি সুখে দুঃখে,
তরঙ্গে, প্রতি তরঙ্গে, হায় রে! বামার
কি দারুণ বেদনায় হইল অধীর প্রাণ,
ভাবিল দু' হাতে চাপি হৃদয় তাহার,—
"গাইয়া সে কৃষ্ণনাম, করি কৃষ্ণপদ ধ্যান,
পাবে নর দুঃখে শান্তি, পাবে পরিত্রাণ,
সেই নামে, সেই পদে সর্ব্বস্ব অর্পণ করি
লভিল কি দাসী, নাথ! এ মহাশ্মশান?"
অধীরা রমণী কহে বিকম্পিত কণ্ঠে—"দেবি!
বাড়িছে রজনী, চাহি চরণে বিদায়।

এ দয়ার প্রতিদান নাহি সাধ্য দিব আমি,
পূজিবে এ দাসী নিত্য হৃদয়ে তোমায়!"
দুই করে দুই কর, কহিতে লাগিলা ভদ্রা,
চারি রক্ত কমলের কিবা সম্মিলন—
"যাইবার আগে ভগ্নি! দেও আত্ম-পরিচয়
কে তুমি রমণীরত্ন? হেথা কি কারণ?"
নিশ্চয় কি কৃষ্ণ তবে কারুকে পারেন নাই
চিনিতে? কারুর বুক পড়িল ভাঙ্গিয়া।
মনেতে করিল স্থির নাহি দিবে পরিচয়,
কহিতে লাগিল তবে অবনী চাহিয়া,—
"নাগকন্যা, ঋষিপত্নী, মনসা দাসীর নাম,
দারুণ কপালগুণে যৌবনে যোগিনী।
বেড়ায় সে বনে বনে, শৈলে শৈলে নিরজনে,
বনমাতা প্রকৃতির প্রেমে উন্মাদিনী।
যথায় ঝটিকা গর্জ্জে করি বন বিলোড়িত,
করিয়া তরঙ্গভঙ্গে সিন্ধু বিধূনিত;
যথায় জলদযুদ্ধে দৃপ্ত বজ্র বিস্ফুরিত
ঘন দীপ্ত দিঙ্মণ্ডল, ধরা প্রকম্পিত,
তথায় বেড়াই আমি। প্রকৃতির মহাপটে
হৃদয়ের প্রতিকৃতি নিরখি আমার
পাই বড় শান্তি মনে,—আসিয়াছিলাম তাই
দেখিতে এ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ-পারাবার।
দেখিতে দেখিতে, দেবি!—বীরপত্নী জান তুমি
কি বিজলী নারী-প্রাণে করে সঞ্চালিত
বীরত্বে,—বীরত্বে মুগ্ধা যাইতেছিলাম চলি,
পথশ্রমে অবসন্না হইনু মূর্চ্ছিত।"

আবার কারুর কর ধরি দুই করে ভদ্রা
জিজ্ঞাসিলা,—সেই কণ্ঠ সিক্ত করুণায়,—
"কি দারুণ মনস্তাপ বহিছে হৃদয়ে আহা!
কহিবে কি? ভগ্নী আমি, কহ না আমায়?
জান, এক নদীস্রোত বহিলে দ্বিতীয় পথে,
হয় পূর্ব্ব স্রোতোবেগ মৃদু, মৃদুতর।
দুঃখের করিলে অংশী হয় দুঃখ প্রশমিত,
শোকে সম-হৃদয়তা বড় শান্তিকর।
রমণীর প্রাণে, প্রাণ মিশাইব রমণীর,
তোমার অশ্রুতে অশ্রু করিব বর্ষণ।
হৃদয়ের রক্ত দিয়া পারি যদি মুছাইতে
এক বিন্দু, হবে মম সার্থক জীবন।"
কারুর হৃদয় দৃঢ় শিলা-বাঁধা সরোবর
পরশিল এই স্নেহ, তুলিল উচ্ছ্বাস;
অন্ধকারে অশ্রুধারা বহে বেগে অবিরল,
কহিতে লাগিল কারু ছাড়িয়া নিশ্বাস,—
"ভগিনি! তোমার স্নেহ, তোমার পরশ-সুধা,
যেন মরুভূমে হায়! জল সুশীতল,
পশিছে হৃদয়ে মম; কিন্তু এই মরুভূমে
প্রবেশি হইবে তুমি উত্তপ্ত কেবল।
ভগিনি! আমার দুঃখ, রমণীর মর্ম্মব্যথা,
রমণীর প্রাণে নাহি সহিবে তোমার;
ভগিনি! আমার দুঃখ রমণীর মহাদুঃখ,
ততোধিক রমণীর দুঃখ নাহি আর!
সংসারের যত দুঃখ—রোগ ভিক্ষা, উপবাস,
পদাঘাত, অসিধার, রমণীর প্রাণ

সহিবে প্রফুল্লমুখে,—প্রফুল্ল পঙ্কজ যথা,
যতক্ষণ নাহি হয় দিবা অবসান,
সহে ঝড়, বজ্র, বৃষ্টি ; সেই দিবা, সেই স্বর্গ,
রমণীর প্রেম, আহা ! রমণীর প্রাণ।
সেই প্রেমে, সেই প্রাণে, রমণী প্রাণের প্রাণে;
নিরাশার কীট হায়! পাতিলে আসন,
হউক কুবেরপত্নী, ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী কিবা,
জগতে দুঃখিনী নাহি তাহার মতন।
কৈশোর নিশির শেষে দেখিলাম সুখ তারা
হৃদয়-আকাশে মম শান্ত সমুজ্জ্বল,
যৌবন-প্রভাতে মম হইল সে অস্তমিত ;
কি মরুতে আজি সেই আকাশমণ্ডল
হইয়াছে পরিণত, নিরাশা রবির করে !
প্রেমে মুকুলিত আহা কি নিকুঞ্জ বন
হইয়াছে বনভূমি ! সেই বিষবৃক্ষ-বনে
আজি জ্বলিতেছে কিবা দাবাগ্নি ভীষণ !
অভিমান শিলাখণ্ডে প্রজ্বলিত হুতাশন
চাপিয়াছিলাম এই দ্বাদশ বৎসর।
উড়াইয়া শিলাখণ্ড, হুঙ্কারিয়া হৃদয়েতে
আজি গর্জ্জিতেছে কিবা আগ্নেয় ভূধর !"
"নাগবালা ! ঋষিপত্নি !" কহিতে লাগিলা ভদ্রা,
জরৎকারু উচ্চ হাসি কহিল হাসিয়া—
"ভগিনি ! বলিতে আর পারিলে না পাপিনীরে।"
গেল সুভদ্রার মুখ লজ্জায় ছাইয়া।
"না না, ভগ্নি! পাপিনী যে তাকে সর্ব্বাধিক ভাল
বাসি আমি, তার তরে কাঁদে এ মরম।

অনন্ত মানবধর্ম্ম, কে পায় তাহার অন্ত,
কে পারে করিতে পূর্ণ স্বধর্ম্ম পালন ?
হৃদয় হইতে এই করাল কামনা-ছায়া
মুছে ফেল, পাবে শান্তি হৃদয়ে তোমার।
তুমি আমি, কে আমরা ? যিনি করিলেন সৃষ্টি,
তিনি করিবেন পূর্ণ কামনা তাঁহার।
অনন্ত নক্ষত্ররাশি আকাশে ফুটিয়া ওই,
আপনার কি কামনা করিছে সাধন ?
চন্দ্র সূর্য্য, গ্রহ, তারা, মস্তক পাতিয়া ধরা,
মঙ্গলকামনা তাঁর করিছে পালন।
মুছে ফেল, মুছে ফেল, করাল কামনা ছায়া !—
আশায় নিরাশা ফলে, দুঃখ কামনায় ;
রমণী সৃজনে তাঁর আছে যে মঙ্গল নীতি,
জীবন অর্পণ কর তার সাধনায় !"
"মুছিব কি ? মুছিবে কে ? রমণী"—
কহিল কারু—
"পারে কি প্রেমের ছবি মুছিতে কখন ?
অনন্ত সিন্ধুর বক্ষে ভাসে সুধাকর-ছবি,
সিন্ধুও ত পারে না তা মুছিতে কখন !
তুলিয়া তুমুল ঝড়, প্রসারি তরঙ্গ-কর,
ডুবাইতে ছবি সিন্ধু চাহে যদি আর,
এক ছবি হয় শত, হয় শত সংখ্যাতীত,
শত গুণ উদ্বেলিত করে পারাবার।
যাঁহার সৃজন আমি, আমার কামনা, দেবি !
নহে কি সৃজন তবে সেই বিধাতার ?
পতঙ্গ সৃজিলা যিনি, অনলেতে অনুরাগ

পতঙ্গের নহে কি লো স্বজন তাঁহারি ?
চাতকীর বিধাতায় অতৃপ্ত পিপাসা তার
নাহি কি মেঘের তরে করিলা স্বজন ?
মানবের এত আশা হইবে নিরাশা যদি,
নিস্ফল আশার সৃষ্টি কেন নিরমম ?
"কেন ?"—কহিলেন ভদ্রা—"জগতের এই 'কেন' ?
কি সাধ্য বুঝিব বল ক্ষুদ্র নরনারী।
কেন এ অনন্ত সৃষ্টি ? রবি শশী গ্রহ তারা ?
কেন ক্ষুদ্র বালুকণা ?—কে বলিতে পারি।
আছে বিশ্ব নীতিরাজ্য, সে নীতি মঙ্গলময়,
সেই নীতি জগতের ধর্ম্ম-সনাতন ;
মানবের আশা যত সেই নীতি অনুগত,
মানব-নিরাশা সেই নীতির লঙ্ঘন।
তৃণটি পারিবে কেন সিন্ধুস্রোত প্রতিকূলে
করিতে আপন ক্ষুদ্র বলে সন্তরণ ?
সিন্ধুস্রোত প্রতিকূলে ক্ষুদ্র তরঙ্গিণীধারা
বহিতে পারিবে কেন ? পারে কি কখন ?
জগতের সুখনীতি, সুখনীতি আমাদের,
মানবের সুখ, সুখ তোমার আমার।
সেই মহাসুখ-স্রোতে, যাই তুমি আমি ভাসি,
পাইব অনন্ত সিন্ধু, সুখপারাবার।
কেমনে জানিলে তুমি, এ কামনা-লতিকায়
ফুটিত ফলিত সুখ দুঃখ কি তোমার ?
এ আশায়, নিরাশায়, কেমনে জানিলে নাহি
মানব-মঙ্গল কোন নীতি নিয়ন্তার ?
এ তীব্র কামনা কেন, হায় ! মানবের তরে ?

চাহ রূপ? সৌন্দর্য্যে কি বিমুগ্ধ অন্তর?
এ বিশ্ব সৌন্দর্য্যে ভরা যাঁহার অনন্ত রূপ,
সেই বিশ্বরূপ চেয়ে বল কি সুন্দর?
চাহ গুণ? এই বিশ্ব যাঁর গুণ-লীলাভূমি,
সেই গুণাতীত চেয়ে গুণী কে আবার?
চাহ প্রেম? এই বিশ্ব যাঁর প্রেম পারাবার,
সেই প্রেমময় হরি, হৃদয়ে তোমার।
সেই প্রেমপারাবারে ঝাঁপ দেও নাগবালা,
এই প্রেমমরীচিকা কর নিমজ্জিত!
অনন্ত প্রেম-পিপাসা মানবের, মানবে কি
পূরাইতে, জুড়াইতে পারে কদাচিত?"
আকাশের পানে চাহি দু'নয়নে প্রেমধারা
বহিতেছে সুভদ্রার পবিত্র শীতল।
"হায়! এক বিন্দু বারি"—নাগেন্দ্রনন্দিনী কহে
চাহি আকাশের পানে হৃদয় বিহ্বল,
"হায়! এক বিন্দু বারি দেখিল না যেই জন,
সে কেমনে বুঝিবেক মহাপারাবার?
হায় রে! যাহার প্রেম অঙ্কুরে পুড়িয়া গেল,
সে অনন্ত প্রেমে দিবে কেমনে সাঁতার?"
চমকি কহিলা ভদ্রা—"সে কি কথা সুচরিত্রে?
ঋষিপত্নী তুমি, তব পতি শ্রেষ্ঠতম।
তাঁর প্রেম-নিরঝরে ভাসাইয়া মরীচিকা,
যাও বহি, যথা প্রেমসাগর-সঙ্গম।"
জরৎকারু উচ্চ হাসি হাসিল, বিদারি গিরি
নিরুদ্ধ গৈরিক যেন উঠিল গগনে।
"আগুণ ঋষির মুখে! পতি মম সেই জন—

জীবনে মরণে মম জনমে জনমে।
তুচ্ছ ঋষি, ইন্দ্র, চন্দ্র, দেবগণ (ও) পারিবে না
জীয়ন্তে কখন ছায়া ছুঁইতে আমার।
অভাগিনী সূর্য্যমুখী মরে চাহি রবিপানে,
অন্য দিকে তবু নাহি দেখে এক বার।
হায়! সূর্য্যমুখী মত চাহি সেই রবিপানে
এরূপে জীবন-বৃন্তে যাব শুকাইয়া।
আর,—নাগবালা আমি দংশিয়া তাহার বুকে
মারিব, মরিব তাকে এ বুকে লইয়া!"
বুকে করি করাঘাত, হাসি পুনঃ উচ্চ হাসি,
উন্মাদিনী বনমধ্যে চলিল ছুটিয়া;
ছুটিলা, ডাকিলা কৃষ্ণ বারেক অস্ফুটে—"কারু!"
গেল বামা উল্কা যেন আঁধারে মিশিয়া।

নবম সর্গ।

—•—

কৃষ্ণনাম।

—•—

কি পবিত্র তীর্থ! মহীরুহ-সমাবৃত
হিমাদ্রি-চূড়ার মত পড়িলা যথায়
রণক্ষেত্রে ভীষ্মদেব, বীরেন্দ্রকেশরী,
শরসমাবৃত অঙ্গে, শরের শয্যায়,
তথায় শিবির চারু হয়েছে স্থাপিত।

শিবিরে শান্তনু-সুত, বীরমূর্ত্তি ক্ষত,
অসংখ্য জবায় যেন পুষ্পিত, পূজিত,
শোভিতেছে অস্তগামী দিনকর মত!
বীরত্বের কি পবিত্র তীর্থ সেই স্থান!
সে শিবির কাল-বক্ষে মৈনাক মহান্।
অতীত প্রহর নিশি, ব্যাস, বাসুদেব
সে শিবিরে ধীরে ধীরে করিলা প্রবেশ।
জ্বলিতেছে দীপাবলী হেমদীপাধারে;
দেখিলেন ভীষ্ম করি নয়ন উন্মেষ।
কহিলেন—"বড় ভাগ্য আসন্ন সময়ে
দেখিলাম মহর্ষির চরণপঙ্কজ।"
লইলেন পদধূলি বাড়াইয়া কর,
ধরিলেন শিরে সেই পুণ্য পদরজঃ।
ভক্তিভরে বাসুদেব নমিলে চরণে,
কহিলেন গদগদ কণ্ঠে কুরুপতি,—
"কে নমে কাহারে; হায় এ লীলা তোমার,
কেমনে বুঝিব হায়! আমি অল্পমতি!
কে নমে কাহারে? হায়! আবির্ভাবে যাঁর
তুচ্ছ যদুকুল, নরকুল পবিত্রিত;
যাঁর আবির্ভাবে, এই জগতের হায়!
তৃতীয় যুগের সৃষ্টি হইল পূর্ণিত;
যাঁর পদতরী ভর করি যুগে যুগে
সংসার-অর্ণবযাত্রী যাবে মোক্ষধাম;
পাপের ঝটিকা দুঃখ-তরঙ্গ ভীষণ
উত্তরিবে করি যাঁর নামামৃত পান;
নারায়ণ! একি লীলা-রহস্য তোমার,

সেই কৃষ্ণ প্রণমিছে চরণে আমার !”
ভক্তিবিগলিত দুই নয়নধারায়
বীরের ভিজিতেছিল অস্ত্র-উপধান।
কহিলেন কৃষ্ণ—“আর্য্য।! একি কথা হয়
জগতে কাহাকে তবে করিব প্রণাম ?
পবিত্র জীবন যাঁর, বীরত্বের গাথা,
জগতের ইতিহাসে রবে অতুলিত,
দশ দিবসের যুদ্ধ শর-শয্যা যাঁর
করিবে মানব জাতি বিস্ময়ে পূরিত ;
পিতৃভক্তি যাঁর এই আত্ম-বিসর্জ্জন,
প্রতিজ্ঞা, জিতেন্দ্রিয়তা হইবে ঘোষিত
অনন্ত কালের কণ্ঠে প্রবাদের মত,
মানবের কর্ম্মপথ করি আলোকিত ;
মানব-জগতে রবে হিমাদ্রির মত
বিরাট গগনস্পর্শী মূরতি যাঁহার ;
তাঁর পদ-তীর্থে নাহি প্রণমিয়া হায় !
নমিব মানব আমি চরণে কাহার ?”

ভীষ্ম। মানব !—মানব তুমি !—তুমিও মানব !
দেবতার ঊর্দ্ধে তবে মানবের স্থান !
রবি শশী, বালুকণা ! পারাবার কূপ !
বল্মীকের স্তূপ তবে গিরি হিমবান !
ভীষ্ম কি এতই পাপী হা কৃষ্ণ ! এরূপে
আসন্ন কালেও তুমি বঞ্চিবে তাহায় ?
সেই রাজসূয়যজ্ঞে সর্ব্বাগ্রে কেশব।
চিনিয়াও না চিনিল ভীষ্ম কি তোমায় ?
এই মাত্র অভিমন্যু,—আহা ! বৎস মম
কৌরব-খনির শিশু মণি সর্ব্বোত্তম !

এই বাল-শশী হবে পূর্ণিত যখন
তাহার আলোকে ধরা হবে স্বর্গোপম।
মাতা পুত্র দুই জন আজি দুই দিন
কি অমৃত ক্ষত দেহে বর্ষিছে আমার।
হইয়াছে শর-শয্যা স্বর্গশয্যা মম
স্নেহ শুশ্রূষায় অভিমন্যু সুভদ্রার!—
এই মাত্র অভিমন্যু গম্ভীর ঝঙ্কারে
শুনাইল কি স্বর্গীয় গীতা সুধাময়!
সর্গে সর্গে কিবা স্বর্গ জ্ঞানের নয়নে
খুলিল, হইল আত্মা কি অনন্তে লয়।
কৃষ্ণের গগনব্যাপী জ্ঞান উচ্চতম,
মহর্ষির সুললিত ভাষা নিরুপম,—
হিমাদ্রিশেখরস্থিত সুধা সুশীতল
পতিতপাবনী গঙ্গা করিয়া বহন
অবতীর্ণা ধরাতলে, ধর্ম্মের পিপাসা
জুড়াইতে, মানবের পূরাইতে আশা।

ব্যাস। আমি মাত্র মালাকার। জ্ঞানের উদ্যানে
ফুটিয়াছে গোবিন্দের, যে ফুলনিচয়
গাঁথিয়াছি গীতাহার তুলি সেই ফুল,—
চিরসুবাসিত, পুণ্য-পরিমলময়।

কৃষ্ণ। ব্যাসদেব মালাকার! জ্ঞানের উদ্যান
গোবিন্দের! এ রহস্য বড় হাস্যকর।
কার সৃষ্টি গোবিন্দের কুসুমকানন?
কার সৃষ্টি সে কাননকুসুমনিকর?
কার পদতলে বসি সংহিতা বেদের
পড়িলাম, উচ্চ উপনিষৎ সকল?

কাহার অনন্ত জ্ঞান কৃষ্ণের নয়নে
উন্মেষিল এ বিশ্বের রহস্য অতল ?
শিষ্যের উদ্যান, আর গুরু মালাকার,—
বড় অসঙ্গত কথা ! এই পুষ্পবন
তোমারি সৃজিত প্রভু ! রচনা তোমার,
তোমারি কুসুম তুমি করেছ চয়ন।
জ্ঞানের অনন্তাকাশে তুমি প্রভাকর !
আমি মাত্র তবালোকে দীপ্ত শশধর।

ব্যাস। যেই আলোকের বৎস ! তুমি অবতার,
যে আলোক পূর্ণ প্রতিফলিত তোমায়,
আমি এক ক্ষীণ রশ্মি সেই আলোকের
অনন্ত, খদ্যোত ক্ষুদ্র তার তুলনায়।
হইয়া অতল সিন্ধুগর্ভে নিমজ্জিত
তুলিব অবিদ্ধ রত্ন, কি সাধ্য আমার ?
আমি ক্ষুদ্র মীন, ভাসি উপর সলিলে,
কি সাধ্য বুঝিব সিন্ধু-রহস্য অপার ?
করিয়াছি সত্য আমি বেদ সঙ্কলিত,
করিয়াছি বহু ক্ষুদ্র শাস্ত্র প্রণয়ন,
অনন্ত সমুদ্রবক্ষে পাতি ক্ষুদ্র জাল,
তুলেছি শম্বুকরাশি ভাবিয়া রতন।
মানবের মোক্ষসুধা চন্দ্রনিকেতন,
কেমনে পাইবে হায় ! দরিদ্র বামন ?

ভীষ্ম। যথায় ব্যাসের এই ভাবা আত্মগ্লানি,
যে অনন্ত কাছে ব্যাস এত ক্ষুদ্র হায় !
পশুবলে বলীয়ান্ আমরা সকল,
সেই অনন্তের জ্ঞান পাইব কোথায় ?

তথাপি পতঙ্গ মত উড়ি দুই হাত
ভাবিতাম এ অনন্ত করায়ত্ত মম,
আজি এই মহাগীতা শুনিয়া বিস্ময়ে
বুঝেছি পতঙ্গ আমি কত ক্ষুদ্রতম।
বড় শুভদিন আর্য্য! আজি মানবের!
মানবের অন্ধকার অদৃষ্ট-গগনে
কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন রূপে সূর্য্য শশধর
এত দিনে সমুদিত পবিত্র কিরণে!
বড় শুভদিন আর্য্য আজি মানবের!
মানব ভাসিতেছিল সংসারসাগরে
দিকহীন, লক্ষ্যহীন, আশ্রয়বিহীন;
মানব ডুবিতেছিল মহাপাপভরে।
বড় শুভদিন আজি! অদৃষ্টে তাহার
মিলিয়াছে এত দিনে আলোক যুগল!
মিলিয়াছে এত দিনে গীতার তরণী!
লক্ষ্য,—নারায়ণ; পথ,—প্রশস্ত, উজ্জ্বল!
উপজিল যথা সুধা সমুদ্রমন্থন,
উপজিল গীতামৃত কুরুক্ষেত্ররণ!
মহাযোগী যেইরূপে ধরি মহাধ্যান,
জীবাত্মা পরমাত্মায় করি নিমজ্জিত,
কহিয়া এ মহাধর্ম্ম পার্থে পুণ্যবান,
করিলা এ মহাধর্ম্ম-যুদ্ধে নিয়োজিত,
মহর্ষির মহাবীণা গগনে উঠিয়া
সেইরূপে এই গীতা না করিলে গান,
পারিত কি ভবিষ্যৎ যুগযুগান্তর,
এই নব ধর্ম্মামৃত করিবারে পান?

কবির কি উচ্চাসন ! যে কাল-তরঙ্গ
ঊর্দ্ধতম গ্রহ তারা করে তিরোধান,
যায় সেই কাল বহি লহরী খেলিয়া
কবির চরণাম্বুজে করিয়া প্রণাম।
কোথা সত্য ত্রেতা যুগ ! নাহি নিদর্শন
কোথায় কালের স্রোতে গিয়াছে ভাসিয়া।
এখনও গায় ঋক-গায়ক সকল,
বাজে বীণা বাল্মীকির জগত মোহিয়া।
দ্বাপর হইবে স্বপ্ন ; এই রঙ্গভূমি
কুরুক্ষেত্র কৃষিক্ষেত্রে হবে পরিণত ;
মানব অনন্তকাল করিবেক পান
মহর্ষির গীতামৃত আনন্দে সতত।
কবিরা কালের সাক্ষী, কালের শিক্ষক ;
শিক্ষা, সাক্ষী, বেদ সত্যযুগের সম্বল ;
কে শুনিত রামসীতা নাম সুধাময়,
না থাকিলে রামায়ণ ত্রেতার সম্বল ?
সাম্রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য জগত নশ্বর ,—
কবিতা অমৃত, আর কবিরা অমর।

ব্যাস। মহাকবি মহেশ্বর ! বিশ্বচরাচর
মহাকাব্য ! কবিত্বের মহাপারাবার
অনন্ত অতল ! কিবা কবিত্ব সুন্দর
অক্ষরে অক্ষরে করে অজস্র প্রচার !
যে পারে পড়িতে এই কাব্য চিন্তাতীত,
অনন্ত সঙ্গীত পারে করিতে শ্রবণ ;
খেলে প্রতিবিম্ব যার হৃদয়দর্পণে
এ অনন্ত কবিত্বের,—কবি সেই জন !

এই কবিত্বই ধর্ম্ম ; ধর্ম্মশাস্ত্র আর
এই কাব্য ; এক ক্ষুদ্র অক্ষর মানব।
মানব কে, নিয়তির কবিত্ব তাহার,—
যে পারে বুঝিতে, কবি, সেই বীরর্ষভ !
মানবের এই ধর্ম্ম, কবিত্ব তাহার,
আসৃষ্টি মানব কবি বুঝিতে কাতর ;
জ্বালিয়া খদ্যোতালোক নিয়তি তিমিরে
খুঁজেছে মানব কত কাল নিরন্তর।
সফল ত্রিযুগ-শ্রম ; কৃষ্ণ অবতার
মহাকবি, গীতা সেই ধর্ম্মের আধার।

কৃষ্ণ। ক্ষীণা স্রোতস্বতী, প্রভু ! সিন্ধু অভিমুখে
যত হয় অগ্রসর, হইয়া মিলিত
ক্রমশঃ সলিল রাশি বেগ, পরিসর,
ক্রমে ক্রমে তটিনীর করিয়া বর্দ্ধিত,
স্থানে স্থানে ঘূর্ণাবর্ত্ত করে উপজিত ;—
বিবশা তটিনী তাহে হয় নিমজ্জিত।
এ জীবন-স্রোতস্বতী, অনন্তের মুখে
যত হয় অগ্রসর, বেগ ও বিস্তার
বাড়াইয়া ক্রমে তত ঘটনানিচয়
স্থানে স্থানে ঘূর্ণাবর্ত্ত করে আবিষ্কার।
মানব সে ঘূর্ণাবর্ত্তে হইয়া পতিত,
হয় এক চিন্তাতীত শক্তির অধীন
অজ্ঞাতে আপনাহারা ; মানব তখন
হয় পূর্ণরূপে সেই শক্তিতে বিলীন।
কুরুনাথ ! বৃন্দাবনে বালকের প্রাণে
কি আলোক জ্ঞানাতীত ভাসিত সতত !

কি শক্তি শরীরে, মনে, করিত সঞ্চার !
চালা'ত শিশুকে ক্রীড়াপুতুলের মত !
সে আলোকে সে শক্তিতে হইয়া চালিত
নাচিতাম, হাসিতাম, করিতাম রণ ;
হইয়া প্রেমেতে মুগ্ধ, ভক্তিতে বিহ্বল,
নাচিত, হাসিত গোপ, গোপাঙ্গনাগণ।
বৃন্দাবনে গোচারণে বসি নিরজনে
শুনিতাম, যেন দূর সমুদ্র গর্জ্জন,
ভারতের কি বিরাট হাহাকার ধ্বনি
অশান্তির, অধর্ম্মের, প্লাবিছে কানন !
বন-অন্তরালে বসি দেখিতাম হায় !
অশান্তির, অধর্ম্মের, শিখা প্রধূমিত,
নিশি ঘোর জীব-ঘাতী যজ্ঞ-ধূমসহ,
করিতেছে কি ভীষণ মেঘ সঞ্চারিত !
শুনিতাম গোপমুখে বসি নিরজনে
মথুরার নিদারুণ শোক সমাচার।
পীড়িতের আর্ত্তনাদ, দুঃখীর রোদন,
কোমল কিশোর প্রাণে সহিল না আর।
প্রধূমিত অগ্নিমাঝে,—করিলাম স্থির,—
দিব ঝাঁপ, ধর্ম্মবারি করিব সিঞ্চন ;
সেই মহাশক্তি বলে ঝটিকা তুমুল
নিবারিব,—মহা রাষ্ট্র-বিপ্লব ভীষণ
সাধুদের পরিত্রাণ, বিনাশ দুষ্কৃতদের করিব সাধন।
স্থাপন করিব ধর্ম্ম, এক মহা ধর্ম্মরাজ্য
করিয়া সৃজন।
বধিলাম কংসরাজে, করিনু মথুরা

রাহুমুক্ত, শান্তি-শশী হাসিল আবার।
হইতেছি লক্ষ্যভ্রষ্ট, পড়িনু সরিয়া
বিমুখি মগধ-পতি সপ্তদশ বার।
পশ্চিম ভারতে শান্তি করিয়া স্থাপন,
লইলাম মহর্ষির চরণে শরণ ;
দিয়া প্রেম-পুষ্পাঞ্জলি সুভদ্রার করে,
পাণ্ডবের ভুজবল করিনু বরণ।
জ্ঞানবল, ভুজবল করিয়া আশ্রয়
হইলাম কর্ম্মক্ষেত্রে ধীরে অগ্রসর ;
বিশাল খাণ্ডবপ্রস্থ করিয়া বিজয়,
করিনু পাণ্ডব শক্তি, শান্তি, দৃঢ়তর।
দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে জরাসন্ধে করিয়া নিধন
নিবারিনু রাজমেধ, ঘোর পাপাচার।
করিল বিমুক্ত, বশী, নৃপতিমণ্ডল
রাজসূয়ে পাণ্ডবের সাম্রাজ্য প্রচার।
আনন্দে ভরিল প্রাণ ; বসি বৃন্দাবনে
গোচারণে যেই ধর্ম্ম-সাম্রাজ্য স্বপন
সতত দেখিত শিশু, হইল স্থাপিত ;—
এক বিন্দু রক্ত নাহি হইল পতন!
আনন্দে ভরিল প্রাণ ; যে শক্তি অঙ্কুর
সুভদ্রার স্বয়ংবরে হইল রোপিত,
রাজসূয়ে মহাবৃক্ষে ছাইয়া অম্বর,
করিল ভারতবর্ষ ছায়াসমাবৃত!
অন্তর-বিগ্রহে ক্ষত বিক্ষত ভারত,
করাল কামনা-দগ্ধ, কাম্যকর্ম্মে হায়!
উৎপীড়িত, প্রতারিত, সন্তপ্রধূমিত,

জাতীয় বিদ্বেষ বিষে জর্জ্জরিত কায়;—
ইহার ছায়ায় শান্তি পাবে নিরমল,
লভিবে অনন্তকাল মোক্ষসুখফল!
সাম্রাজ্যে, সমাজে, ধর্ম্মে, করিয়া সঞ্চার
নিষ্কামত্ব, দেখাইয়া সর্ব্বভূতময়
নারায়ণ কি নিষ্কাম, করিব সংসার
প্রীতিময়, শান্তিময়, সর্ব্বসুখালয়।
আবার অশান্তি-শিখা পশ্চিম ভারতে
দেখা দিল; করিতেছি যবে নির্ব্বাপণ,
হায়! মূষিকের মত পাপিষ্ঠ শকুনি
সেই মহীরুহমূল করিল ছেদন।
হইল নির্ম্মলাকাশে অশনির মত
পাণ্ডবের বনবাস মস্তকে পতন;
বিস্মিত, স্তম্ভিত, ভীত, কম্পিতহৃদয়ে
অধর্ম্মের অভ্যুত্থান দেখিনু ভীষণ।
বুঝিলাম যে অধর্ম্মে আছন্ন ভারত,
যে অধর্ম্ম নরমেধ যজ্ঞে পরিণত,
হৃদয়ে পড়িল ছায়া, বুঝি সে রাক্ষস
নরমেধ যজ্ঞ ভিন্ন হইবে না হত।
গেল পাণ্ডবেরা বনে; রয়েছে তথাপি
রাজসূয়ে যে সাম্রাজ্য হইল স্থাপিত।
পালিছে নৃপতিগণ আনত মস্তকে
রাজসূয়ে যেই মন্ত্রে হইল দীক্ষিত।
ভারত লভিছে শান্তি; নাহি জরাসন্ধ
ভারতের শান্তি-বিঘ্ন, নাহি শিশুপাল!
থাক কর্ণ দুর্য্যোধন তরু নব মূলে,

আছে তথা ভীষ্ম, দ্রোণ, বহু মহীপাল ;
এইরূপে এই ভিত্তি হবে দৃঢ়তর
ত্রয়োদশ বর্ষ ; শক্তি করিয়া সঞ্চয়,
ত্রয়োদশ বর্ষ পরে করিব নির্ম্মাণ
ধর্ম্মরাজ্য-অট্টালিকা, অমর, অক্ষয়।
ত্রয়োদশ বর্ষ নাহি হইতে অতীত
আকাশ হইতে ভূমে হইনু পতিত।
ত্রয়োদশ বর্ষ নাহি হইতে অতীত,
বিরাট-বিজয়ে চক্ষে করিনু দর্শন
অধর্ম্মও করিতেছে শক্তির সঞ্চয়,
ধর্ম্মের সহিত হায়! অনিবার্য্য রণ।
কি যত্ন না করিলাম! পঞ্চখানি গ্রাম
চাহিনু এ নরমেধ করিতে বারণ।
"বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী"—
শুনিলাম অধর্ম্মের প্রতিজ্ঞা ভীষণ!
দ্রবিবে না শিলা, নাহি কর বিচূর্ণিত ;
বিষবৃক্ষমূলে কর অমৃত সিঞ্চন,
তথাপি সুফল নাহি ফলে কদাচিত ;—
অধর্ম্মের শেষ ধ্বংস নিয়তি ভীষণ!
বাজিল সমরভেরী যুড়িয়া ভারত
শুনিলাম' দেখিলাম পতঙ্গপালমত
ছুটিল নৃপতিবৃন্দ মরিতে পুড়িয়া,—
বুঝিলাম বিধাতার ইচ্ছা ধ্বংসব্রত।
ভাঙ্গিয়া পড়িল বুক, কাঁদিল পরাণ,—
করিলাম দ্বারকায় শোকেতে প্রস্থান।
হইলে আহূত যুদ্ধে, ধর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের

পালিলাম, করিলাম যুদ্ধে যোগদান
নিরস্ত্র ও নিরপেক্ষ ; স্বধর্ম্ম-পালন
করিতে অশক্ত নহে পাণ্ডবকৃপাণ।
ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে সজ্জিত সমরে
দুই মহা অনীকিনী ; করিয়া দর্শন,
স্বজন উভয় সৈন্যে, করুণ হৃদয়ে
কহিলেন পার্থ,—"আমি করিব না রণ!"
শিহরিনু একি কথা!—"করিব না রণ।"
আশৈশব নির্যাতন, ঘোর পাপাচার,
সেই জতুগৃহ-দাহ, সেই বনবাস,
সে কপট দ্যূত-ক্রীড়া, দ্রুপদ-বালার
সেই অপমান লোমহর্ষণ ভীষণ,
পুনঃ ত্রয়োদশ বর্ষ বনবাস হায়!
সর্ব্ব শেষ বিনিময়ে সেই সাম্রাজ্যের
সূচ্যগ্র মেদিনী নাহি মিলিল ভিক্ষায়!—
থাকে যদি অধর্ম্মের এই অভ্যুত্থান
অক্ষুণ্ণ, হা ধর্ম্ম। তব কে লইবে নাম!
পার্থ করিবে না রণ! করিবে গ্রহণ
কৌরব-অধর্ম্ম তবে ধর্ম্মের আসন;
অধর্ম্ম-অশান্তি-শিখা জ্বলিবে এমন;
আমার সে ধর্ম্মরাজ্য হইবে স্বপন!
একদিকে বর্ত্তমান ক্ষুদ্র—ক্ষুদ্রতম,
অন্য দিকে ভবিষ্যৎ অনন্ত বিস্তার;
এক দিকে কৌরবেরা ক্ষুদ্র—ক্ষুদ্রতম,
অন্যদিকে সংখ্যাতীত মানব অপার।
অধর্ম্মের এ আদর্শে শত্রু বর্ত্তমান

করিবে অনন্ত ভবিষ্যত কলুষিত।
কৌরবের এ আদর্শে মানব দুর্ব্বল
করিবে অনন্তকাল পাপে প্রবর্ত্তিত!
জগতের এ অশান্তি রবে চিরদিন!
অন্তর-বিগ্রহানল জ্বলিবে এমন!
ধর্ম্মের এ দুরবস্থা, দুঃখ মানবের,
নারায়ণ! পারিব না করিতে মোচন?
কর্ম্ম,—যাগযজ্ঞ। জ্ঞান,—সংসারবর্জ্জন!
বৈদিক ধর্ম্মের এই ঘোর পরিণাম!
কত দিন আর্য্যজাতি রহিবে জীবিত
নিরন্তর করি এই মহাবিষ পান?
যেই ধর্ম্মামৃত পানে পাবে মোক্ষ নর,
না পাইল এক বিন্দু সেই শান্তিজল,
আমার জীবন-ব্রত চলিল ভাসিয়া;
জীবনের শ্রম মম হইল বিফল।
সাধুদের পরিত্রাণ, দুষ্কৃত দমন,
হইল না; হইল না ধর্ম্মের স্থাপন।
পড়িলাম ঘূর্ণাবর্ত্তে; দেখিলাম হায়!
এক দিকে অধর্ম্মের স্বচ্ছ অন্ধকার,
অন্য দিকে ধর্ম্মরাজ্য-জ্যোতি নিরমল,—
হইল জীবনে ব্রহ্মমুহূর্ত্ত সঞ্চার।
সে আশায়, নিরাশায়, আলোকে, আঁধারে,
কহিল কি চিন্তাতীত শক্তির অধীন!
কহিনু অর্জ্জুনে এই ধর্ম্ম সনাতন
হইয়া সে জ্ঞানাতীতে যোগস্থ, বিলীন।
গাহুক সে নারায়ণ; এই গীতা তাঁর;

আমি ও মহর্ষিমাত্র নিমিত্ত ইহার।
ভীষ্ম। মানব—মানব তুমি! মানবজীবন
এই লীলা! মানবের এ অনন্ত জ্ঞান!
আজি তুই দিন কৃষ্ণ! এ শরশয্যায়
অপূর্ব্ব চরিত তব করিয়াছি ধ্যান।
সামান্য মানব তুমি নহে কদাচন
বুঝিতাম, বুঝি নাহি আকাশ-বিস্তার
বিশ্বব্যাপী এই ব্রত। আসন্ন শয্যায়
আজি কি খুলিল ক্ষুদ্র নয়ন আমার?
আজি তব বিশ্বরূপ দেখিতেছি হায়!—
অনন্তের গর্ভে যেন,—হৃদয়ে তোমার—
ভাসিছে অনন্ত বিশ্ব; বুঝিতেছি হায়!
তোমার জীবন-ব্রত জগত উদ্ধার।
তব কুরুক্ষেত্র বিশ্ব; জীবাত্মা অর্জ্জুন;
ধর্ম্মাধর্ম্মে পাপ পুণ্যে বাজিয়াছে রণ!
হইয়া সারথি যুদ্ধে জীবাত্মার জয়
সাধিতেছ, নররূপী তুমি নারায়ণ।
এ ধর্ম্মসাম্রাজ্য-পথে ভীষণ কণ্টক
হইল কি ভীষ্ম? হায়! ভীষ্ম দুরাচার
ধর্ম্মভ্রমে অধর্ম্মকে করিয়া আশ্রয়
করিল কি সংখ্যাতীত জীবের সংহার?
বাসুদেব! বনমালি! কৃষ্ণ! নারায়ণ!
ভীষ্মের কি গতি হবে কহ জনার্দ্দন!
কৃষ্ণ। হে রাজর্ষি! বৃথা এই অনুতাপ তব।
মানুষ কালের ক্রীড়া। কাল-স্রোতঃ হায়!
যখন যে পথে বহে, সে পথে ভাসিয়া

বীয় নরগণ, তৃণসমষ্টির প্রায়।
অধর্ম্মের কি প্লাবনে প্লাবিত ভারত!
অন্যের কি কথা, ভীষ্ম দ্রোণ পূজ্যতম
ভাবেন অধর্ম্মে ধর্ম্ম, কুজ্ঝটিকা মত
ভ্রান্তিতে আচ্ছন্ন হায়! তাঁদেরও নয়ন।
অনিবার্য্য হ'লে যুদ্ধ, ছিল এক আশা—
ভীষ্ম দ্রোণ,কদাচিৎ করিবে না রণ।
কৌরব পাণ্ডব তুল্য তাঁদের নয়নে,
রহিবেন অস্ত্রহীন আমার মতন।
সে আশাও গেল ভাসি অধর্ম্মের স্রোতে।
কৌরবের আশৈশব ক্রুর ব্যবহার,
সেই জতুগৃহ-দাহ, সেই বনবাস,
সে কপট দ্যূতক্রীড়া, দ্রুপদ-বালার
সভাস্থলে নিরমম সেই নির্য্যাতন,
"না দিব সূচ্যগ্র স্থান"—প্রতিজ্ঞা ভীষণ,
ভুলিলেন ভীষ্ম, দ্রোণ, মোহের আবেশে।
"ধৃতরাষ্ট্র অন্নে প্রতিপালিত আমরা,
হইবে অধর্ম্ম"—মনে করিলেন স্থির,—
"কৌরবের পক্ষ নাহি করিলে গ্রহণ।"
অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হায়! কি গভীর!
অন্নদাতা হয় যদি পাপে প্রবর্ত্তিত,
হইতে হইবে তবু সহায় তাহার!—
ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম হায়! বলিব ইহারে?
পাপের প্রশ্রয় দেব! নহে পাপাচার?
অন্নদাতা হয় যদি পাপে প্রবর্ত্তিত,
নিবারিব যথাসাধ্য করি প্রাণপণ;

না পারি, রহিব দূরে ব্যথিত অন্তরে ;—
ইহা কৃতজ্ঞতা, ইহা ধর্ম্ম সনাতন।
আর সেই অন্ন,—অর্দ্ধ নহে কি তাহার
পাণ্ডবের? অর্দ্ধ-রাজ্য পাণ্ডবের নয়?
এই ভ্রান্তি ঘটাইল এই মহারণ,
করিল ভারত-ভাগ্য চির ছায়াময়!
ভীষ্ম, দ্রোণ, অস্ত্র নাহি করিলে গ্রহণ,
হইত কি দুর্য্যোধন রণে অগ্রসর?
হইলে, এ কুরুক্ষেত্র হইত নিশ্চয়
উত্তর গোগৃহ,—সেই ক্রীড়া হাস্যকর!
কিন্তু অধর্ম্মের ধ্বংস হইত কি হায়!
থাকিতে অধর্ম্মী এই ক্ষত্রিয় নিচয়?
থাকিতে প্রাচীর, স্তম্ভ, আশ্রয় প্রবল,
নাহি পড়ে অট্টালিকা, নাহি হয় লয়!
এই মহারক্ত-স্রোতে যেতেছে কি ভাসি
যুগের অধর্ম্ম? তব মহিমা অপার
কি বুঝিব নারায়ণ! আমি ক্ষুদ্র নর!
এই বুঝি,—তুমি সর্ব্ব মঙ্গল আকর।

ভীষ্ম। কি বুঝিব আমি তবে নর ক্ষুদ্রতম!
এই বুঝি,—তুমি কৃষ্ণ নর-নারায়ণ।
নাশিয়া দুষ্কৃত, সাধু করিয়া উদ্ধার,
স্থাপন করিতে ধর্ম্ম তব আগমন।
বিপুলা পৃথিবী ; মহাকাল অন্তহীন ;
অনন্ত মানবজাতি ; মুষ্টিমেয় তার,
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী, মানব মঙ্গল
রোধিতেছে,—কুরুক্ষেত্র করুণা অপার!

মানবের ভবিষ্যত কি আনন্দময় !
দেখিতেছি কুরুক্ষেত্রে করি আত্মক্ষয়
অধর্ম্মের ঘনঘটা, হিংসা বজ্রানল
নিবিল ; উঠিল কিবা ধর্ম্ম-সুধাকর !
পুণ্যজ্যোৎস্নায় স্নাত অনন্ত মানব
লভিতেছে কিবা সুখ যুগ যুগান্তর !
ভূতল আনন্দরাজ্য ! বিস্তৃত ত্রিপথ
হইয়াছে এক মহা বেদিমূলে লয়।
ত্রিপথে ত্রিবৈজয়ন্তী উড়িছে সুন্দর—
জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি—কিবা স্বর্গ শোভাময় !
সৌর-সরসিজ বক্ষে উর্দ্ধে নারায়ণ
বসি কৃষ্ণরূপী, মূর্ত্তি পূর্ণ মহিমায়।
মধুর বাঁশরীস্বরে ডাকিছে—"মানব !
আইস যে পথে পার, পাইবে আমায় !"
দেখিতেছি ছুটিয়াছে ত্রিপথে মানব
চারু বৈজয়ন্তীত্রয় করিয়া আশ্রয় ;
সুমধুর কৃষ্ণনাম, ভূতল গগণ
করিতেছে কি পবিত্র, কি আনন্দময় !
গৃহে গৃহে কৃষ্ণমূর্ত্তি, হৃদয়ে হৃদয়ে।
মুখে মুখে কৃষ্ণনাম, যুগ যুগান্তর !
দেখিতেছি পাপতাপ-পূর্ণ ধরাতল
হইতেছে ক্রমে স্বর্গ, স্বর্গ উচ্চতর।
নারায়ণ ! জনার্দ্দন !"

—চাহি বীরর্ষভ

কৃষ্ণপানে ভক্তিপূর্ণ সজলনয়নে—
"ভীষ্ম মহাপাপী নাহি পাইল কি স্থান

সে আনন্দরাজ্য-স্বর্গে, হায়। এ জীবনে?
জন্ম জন্মান্তরে তারে, ভকতবৎসল!
সেই স্বর্গে, পদাম্বুজ-প্রান্তে, দিও স্থান!
দয়াময়! ছিন্ন এবে সংসারবন্ধন,
দেও শিরে পদ, মুখে দেও কৃষ্ণনাম!
আমি নহি ভীষ্ম; তুমি নহ বাসুদেব।
আমি ভক্ত; দেখিতেছি তুমি ভগবান,
শঙ্খচক্র-ধর হরি; পতিতপাবন!
দেও শিরে পদ, মুখে দেও কৃষ্ণনাম!"
বহিতেছে প্রেমধারা বাহিয়া কপোল,
আকুল হৃদয়ে ভীষ্ম বাড়াইয়া কর।
বিহ্বল হৃদয়ে কৃষ্ণ পড়িলা হৃদয়ে,—
বিরাজিলা বৈকুণ্ঠেতে বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।
ভক্তিতে বিহ্বল ব্যাস, আকুলিত প্রাণ,
গাইতে লাগিলা প্রেমকণ্ঠে কৃষ্ণনাম।

দশম সর্গ।

—:*:—

ব্যাধ।

—:*:—

কৃষ্ণা অষ্টমীর নিশি অতীত প্রহর।
অদূরে অরণ্যে পত্রপল্লবকুটীরে
বসিয়া দুর্ব্বাসা, কর্ণ, চিন্তাকুল মন।
দূর প্রান্তরের শেষে চিতাগ্নির মত

জ্বলিতেছে কাষ্ঠধুনি জ্বলিয়া নিবিয়া!
জপিছেন ঋষিবর রুদ্রাক্ষের মালা
ধীরে ধীরে ; বনরাজি নীরব, নির্জ্জন।

কর্ণ। দশদিন মহারথী করি মহারণ,
বিনাশি অসংখ্য সৈন্য, চতুরঙ্গদল,
লিখিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি কালের হৃদয়ে
অস্ত্রমুখে, রণক্ষেত্রে রুধিরপ্লাবিত,
সিন্ধুগর্ভে অস্তমান অংশমালীমত,
ভীমকর্ম্মা ভীষ্মদেব শর-শয্যাগত!

দুর্ব্বাসা। উত্তম! ক্ষত্রিয়-ক্ষয় হয়েছে সাধিত
সংখ্যাতীত একদিকে, হত অন্যদিকে
ক্ষত্রিয়ের শীর্ষ ভীষ্ম কৃষ্ণ-উপাসক।
রাজসূয় যজ্ঞে এই বিধর্ম্মী পামর
বেদ-দ্বেষী কৃষ্ণে অর্ঘ্য করিয়া প্রদান
ব্রাহ্মণধর্ম্মের মূলে করিল প্রহার
প্রথম কুঠার তীক্ষ্ণ ; নিবারিতে রণ
কত ধর্ম্ম-তর্কজাল করিল বিস্তার।
উত্তম, সে বাহু, জিহ্বা, নড়িবে না আর!
তুমি?

কর্ণ। ধরে নাই অস্ত্র প্রভুর আদেশে
দাস এই দশ দিন, উপদেশ মত
সৃজিয়া কলহ-ছল ভীষ্মের সহিত।

দুর্ব্বাসা। উত্তম! সন্ধ্যান্তে আজি কি আনন্দধ্বনি
হইল কৌরব সৈন্যে?

কর্ণ। প্রতিশ্রুত দ্রোণ
বধিবেন কালি যুদ্ধে করি ঘোর রণ

পাণ্ডব পক্ষীয় মহারথী এক জন।

দুর্ব্বাসা। উত্তম, উত্তম! আর সংসপ্তকগণ?

কর্ণ। প্রভুর মন্ত্রণা দাস করেছে পালন।
তাহার কৌশলে প্রভু! সংসপ্তকগণ
করিয়াছে ধনঞ্জয়ে যুদ্ধে আবাহন,
হইতেছে সংসপ্তকে ধনঞ্জয়ে রণ
ঘোরতর!

হাসি ঋষি—"অতীব উত্তম।
মন্ত্রযুদ্ধে জয়ী বৎস! হইলে আমরা,
তব করে ঘৃতাহুতি করিয়া প্রদান
কৌরবের রাজ্যলোভে, করিলে বিফল
পঞ্চগ্রাম-ভিক্ষা-চক্র গোপ পামরের,—
নিবারিতে এই যুদ্ধ, শান্তির কমল
ফুটাইয়া ধর্ম্মরাজ্য করিতে স্থাপন
আপনার বেদ-দ্বেষী, কতই কৌশল
করেছিল দুরাচার! অজস্র শিশির
বরষিয়া তব করে করিলে নির্ম্মূল
অঙ্কুরে সে শতদল, গেল দ্বারিকায়।
রহি নিরপেক্ষ চক্রী ভেবেছিল মনে
রক্ষিবেক এই মহাক্ষত্রিয় খাণ্ডবে
আপনার কুলত্রয়। দেখিলাম আমি
দিব্য চক্ষে, থাকে যদি পশ্চিম ভারতে
এ বিশাল কুলত্রয়, ধর্ম্ম ব্রাহ্মণের,
ব্রাহ্মণের আধিপত্য, হবে না কখন
নিরঙ্কুশ; সেই হেতু আদেশি তোমায়
পাঠাইনু দুর্য্যোধনে দ্বারকানগরে।

নিশ্চয় পাণ্ডব তবে যাবে দ্বারকায়
দেখিলাম দিব্যচক্ষে, বুঝিলাম আর
হইলে আহুত যুদ্ধে চক্রী নিরপেক্ষ
অনিচ্ছায় দুইপক্ষ করিবে গ্রহণ,—
পড়িয়াছে উর্ণনাভ আপনার জালে!
সারথ্য করিয়া আজি দেখ নারায়ণ
নাশিছেন নারায়ণী সেনা আপনার,—
কণ্টকে কণ্টক দিব্য হয়েছে উদ্ধার!
কাপুরুষ বাঁচাইতে আপনার প্রাণ
করিয়াছে নীচকর্ম্ম সারথ্য গ্রহণ।
দুর্ব্বাসার যোগ-মন্ত্র কাল সেই প্রাণে
করিবেক বজ্রাঘাত অমোঘ সন্ধানে।
সব্যসাচী সংসপ্তকে হ'লে কাল রণ,
রবে একমাত্র যোদ্ধা পাণ্ডব শিবিরে
দ্রোণ-কর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বী, রক্ষিতে পাণ্ডবে
হইবেক মহারথী যুদ্ধে অগ্রসর,
তাহাকে বধিতে কালি হইবে নিশ্চয়!"

কর্ণ। কে সে প্রভো!

কাণে কাণে কহিলা দুর্ব্বাসা।
অঙ্গপতি বীর অঙ্গ উঠিল শিহরি।

দুর্ব্বাসা। পাণ্ডবের দুই ভুজ—কৃষ্ণ, ধনঞ্জয়।
ক্রোধে শোকে দুই ভুজ হইয়া অধীর,
উন্মত্ত, কটাক্ষে করি ধ্বংস কুরুকুল,
বিশ্বত্রাস বজ্রাগ্নিতে তৃণরাশি যথা,
হইবেক অবসন্ন। কাটিবে হেলায়
সপাণ্ডব এক ভুজ তুমি পরাক্রমে;

নিক্ষেপিব অন্ত ভুজ পশ্চিম সাগরে।
অব্যর্থ তপস্যা মম ;—দুই দিন আর
বেদ ব্রাহ্মণের শত্রু যাবে রসাতল ;
কর্ণের সাম্রাজ্য-ধ্বজা উড়িবে উজ্জ্বল।
ও কি!!

চমকিলা ঋষি—"কি যেন নড়িল!
আইস দেখিয়া।" কর্ণ কহিলা ফিরিয়া—
"কিছুই না, আঁধারের পশ্চাতে আঁধার।"
বসিলেন পূর্ব্বাসনে চিন্তাকুল মনে।

কর্ণ। এ দ্বাদশ দিন সে ত করে নাই রণ,
রণক্ষেত্র তার যেন ক্রীড়ার প্রাঙ্গণ!
আসিলে সে রণক্ষেত্রে, মহারথী কেহ
যদি হয় সম্মুখীন, অপূর্ব্ব কৌশলে
পরাভবি যায় শিশু উপহাস করি।
স্থির চিত্ত যদি রণে হয় অগ্রসর,
সহজে জিনিবে তারে দ্রোণ কি কর্ণের
নাহি সাধ্য, সিংহ-শিশু সিংহ-পরাক্রম।
হউক যতই ক্ষুদ্র ভীম বজ্রানল,
মহামহীরুহ নাহি সবে তার বল।

দুর্ব্বাসা। একা কর্ণ, একা দ্রোণ, নাহি পারে যদি,
দ্রোণ-কর্ণে মিলি তবে করিবে সমর।
নাহি পারে এক রথী, সপ্তরথী মিলি
বধিবে তাহারে রণে ; বধে যেই মতে
মৃগেন্দ্র ফেলিয়া জালে বনে ব্যাধগণ,
আনন্দের কোলাহলে পূরিয়া গগন।

কর্ণ। এই ব্যাধ-বৃত্তি প্রভু! বীরধর্ম্ম নয়।

পারিবে না দ্রোণ কর্ণ।

দুর্ব্বাসা। না পারুক দ্রোণ।

অবশ্য পারিবে কর্ণ।

কর্ণ। পারিবে না দাস।

দুর্ব্বাসা। হেলায় গুরুর আজ্ঞা করিবে লঙ্ঘন!

কর্ণ। অনুমতি কর গুরো! ধনুর্ব্বাণ করে
ন্যায় যুদ্ধে বিমুখিব বনের কেশরী,
ততোধিক পরাক্রমী পার্থে দিব রণ,—
আজীবন প্রতিদ্বন্দ্বী! আসুন আহবে
বজ্রপাণি, শূলপাণি, দেব-সেনাপতি,
পালিব তোমার আজ্ঞা, করিব সমর!
হানিয়াছিলাম খড়্গ তোমার আজ্ঞায়
পুত্র বৃষকেতু শিরে; আজ্ঞা কর যদি
হানিব আপন শিরে, কাটি এই শির
গুরুভক্তি উপহার দিব পদাম্বুজে।
এক মাত্র চাহি ভিক্ষা—বীরত্বে কর্ণের
করিও না এই ঘোর কলঙ্ক অর্পণ।

দুর্ব্বাসা। নিজ পুত্র হইতে কি তবে প্রিয়তর
শত্রুপুত্র? তার বধে পাপ সমধিক?

কর্ণ। প্রতিশ্রুত ছিল দাস পাদপদ্মে তব,—
গুরু, বিপ্রে, যেই ভিক্ষা চাহিবে যখন
অম্লান বদনে তাহা করিবে প্রদান।
আপনি চাহিলে ভিক্ষা; তুলিলাম অসি
পুত্রশিরে; ভাবিলাম রহিবে জগতে
দাতাকর্ণ নাম মম, রবে ভবে আর
পুত্রত্যাগী গুরুভক্তি আদর্শ অতুল।

দুর্ব্বাসা। আজিও চাহি এ ভিক্ষা।

কর্ণ। দিবে ভিক্ষা দাস;
কালি কর্ণ তার সনে করিবে সংগ্রাম
ঘোরতর। হা অদৃষ্ট! জয়, পরাজয়,
কর্ণের কলঙ্ক মাত্র ঘটাবে, উভয়।

দুর্ব্বাসা। দ্রোণ, কর্ণ, উভয়ের স্নেহ-শ্লথ কর
পারিবে না দ্বন্দ্বযুদ্ধে। বহুরথী মিলি,
ন্যায় কি অন্যায় যুদ্ধে, বধিবে তাহারে—
দুর্ব্বাসা চাহিছে ভিক্ষা।

কর্ণ। হা পুত্র আমার!
কুরুক্ষেত্রে প্রজ্বলিত হিংসা-মরু মাঝে
কি অমৃত বাছা মম করে বিকিরণ!
কি কৌরব, কি পাণ্ডব, উভয় শিবিরে
বেড়ায় মনের সুখে; কৈশোর উচ্ছ্বাসে
পরিপূর্ণ বুক তার, পরিপূর্ণ মুখ।
শত্রু মিত্র তার কাছে উভয় সমান,
উভয়ে সমান ভক্তি, প্রীতি সমতুল;
আকাশের সুধাপূর্ণ সুধাকর সম
সর্ব্বত্র বরষে সুধা অজস্র ধারায়।
শিশুরা সকলে ভাই: পিতৃব্য আমরা
সকলেই; পত্নীগণ সকলি জননী;
সমস্ত জগত তার প্রেমের নির্ঝর।
বৃষকেতু পাশে যবে বসে গলা ধরি,
গলা জড়াইয়া মম "তাত! তাত।" বলি
কহে যবে স্নেহকথা হাসি হাসি মুখ,
বাসি ভাল পুত্রাধিক। ইচ্ছা হয় মনে

চিরিয়া হৃদয় তারে রাখি সেই খানে,
সে নহে এই জগতের কর্কশ বন্ধুর।
ইচ্ছা হয় ত্যজি এই ছদ্ম অভিনয়,
ধনুর্ব্বাণ করে নাশি কৌরব পাণ্ডব,
ভারত সাম্রাজ্যে তারে করি অধিষ্ঠিত ;
জুড়াক্ জগত, শান্তি লভুক মানব।
দেব পিতা, দেবী মর্ত্তা, দেবতা মাতুল ;
জগতের এ দেবত্ব করিব নির্ম্মূল !
এ অধর্ম্মে নিপতিত করো না দাসেরে !
দয়া কর, ক্ষমা কর, ধরি তব পায় !
ক্ষুদ্র জতুগৃহ যেন উঠিল জ্বলিয়া
অকস্মাৎ ! উঠি বেগে ক্রোধান্ধ দুর্ব্বাসা
কহিলা কর্ণের শিরে করি পদাঘাত—
"নরাধম ! কৃষ্ণস্তুতি সম্মুখে আমার।
জমদগ্নি-সুত কাছে সূত্রধর-সুত
ক্ষত্রিয় বলিয়া যবে দিল পরিচয়,
সে ছলনা সমর্থন করিল দুর্ব্বাসা,
কোথা ছিল ধর্ম্ম তোর ওরে দুরাচার ?"
গুরুদেব ! গুরুদেব ! নাহি জানি কেন
শিখিবারে যুদ্ধ বিদ্যা আছিল পিপাসা
আশৈশব ; কৃপা করি করিলে পূরণ।
কিশোর জীবনে সেই হইল সঞ্চার
ক্ষুদ্র পাপ ! সেই পাপে আনিয়াছে কোথা ?
তোমার আদেশে প্রভু ! ক্রীড়া রঙ্গভূমে
প্রবেশিনু কৌরবের বৈশ্বানর রূপে,
ভস্মিতে ক্ষত্রিয়কুল অনন্ত নিগ্রহে।

সে অবধি হায়! তব অঙ্গুলি নির্দ্দেশে,
তব করধৃত জড় পুত্তলিকা মত,
করি ছদ্ম অভিনয় কৌরব সভায়,
জ্বালাইনু প্রভু! এই মহা দাবানল!
কোন পাপে আত্মা নাহি করিনু প্লাবিত?
নির্ব্বোধ অদূরদর্শী সেই দুর্য্যোধন
সূতপুত্রে দিল অঙ্গ-রাজ্য-সিংহাসন,
করিতেছি ভস্ম তারে স্বকুল সহিত।
পুড়িতেছি হায়! হীন পতঙ্গের মত
ক্ষত্রিয় বীরেন্দ্র-গ্রাম জগতগৌরব,
নররক্তে করিতেছি পৃথিবী প্লাবিত:
ভস্ম হইতেছে মহা মহীরুহ চয়;
শিশু তরুগণে কর দয়া! নররক্তে
লোহিত এ কর, দয়া কর, ক্ষমা কর,
শিশুরক্তে কলঙ্কিত করিও না আর!
দাতাকর্ণ নাম যার, বিশ্বাসঘাতক
নর-হন্তা আততায়ী সেই দুরাচার!
গুরুদেব! গুরুদেব! ক্ষমা কর এবে
ধরি তব পায়——

"পাপি! বিশ্বাসঘাতক!"

গর্জ্জিলা দুর্ব্বাসা পুনঃ করি পদাঘাত।
আসি এত দূর মূর্খ! এইরূপে তুই
দুর্ব্বাসার মনোরথ করিবি বিফল!
করিবি বিশ্বাস ভঙ্গ গুরু-জনকের!

কর্ণ। জনকের!

দুর্ব্বাসা। জনকের! বিস্মৃত নয়নে

বিস্ময়ে চাহিলা কর্ণ ঋষিমুখ পানে
বিকৃত বিবর্ণ ক্রোধে। পড়িল ভাঙ্গিয়া
পর্ব্বতের চূড়া যেন মস্তকে নিমিষে।
নিমিষে হইল যেন ভীষণ নিনাদে
বিদারিত বিচূর্ণিত পৃথিবীমণ্ডল,
বীর বক্ষ দুরু দুরু উঠিল কাঁপিয়া।

দুর্ব্বাসা। শুন তবে কুলাঙ্গার!
শিষ্য কুন্তিভোজ
করেছিল কন্যা কুন্তী আদেশে আমার
নিয়োজিত অভ্যাগত ব্রাহ্মণ-সেবায়,—
পুত্রার্থী। একদা আমি হইনু অতিথি
ভোজগৃহে; পরিতুষ্ট হইয়া সেবায়;
শিখাইনু কুমারীকে মন্ত্র অভিচার।
আকর্ষিল মন্ত্রবলে কুন্তী সবিতায়,
জনম হইল তোর। পাপীয়সী মাতা
নির্দ্দয়া সলিলে তোরে করিল নিক্ষেপ;
শিষ্যা রাধা সযতনে করিল পালন।
ব্রাহ্মণের প্রতিযোগী ক্ষত্রিয় সমূলে
বিনাশিতে, সুশাণিত ক্ষত্রিয়কৃপাণ
দেখিলাম যোগবলে হবে প্রয়োজন।
পরশুরামের করে সেই হেতু তোরে
ক্ষত্রিয়-নন্দন বলি করিনু অর্পণ
শিক্ষার্থে। দুর্ব্বাসা কভু নহে মিথ্যাবাদী,
কুন্তীর নন্দন তুই, মন্ত্র-পুত্র মম।
সূতের নন্দন নহে মহর্ষি দুর্ব্বাসা
শিখায় কি ধনুর্ব্বেদ? সূতের নন্দনে

ভারত সাম্রাজ্য চাহে করিতে প্রদান
দুর্ব্বাসা? বানরে চাহে দিতে ইন্দ্রপদ?
রে কৃতঘ্ন কুসন্তান! গুরুর, পিতার,
আজীবন ব্রত তুই করিবি বিফল?
যে চাহে সাম্রাজ্য তোরে করিতে প্রদান,
তার প্রতি তোর এই তীব্র তিরস্কার?
কি দারুণ কৃতঘ্নতা! করে যেই কর
তোর মুখে দুরাচার! আহার প্রদান,
দাহন করিবি তুই এই তীব্রানলে?
যা রে চলি কুলাঙ্গার! একটি অক্ষর
মম আদেশের যেন না হয় লঙ্ঘন।
স্তম্ভিত, বিস্মিত, ভীত কর্ণ রুদ্ধশ্বাসে
চলিলা মহর্ষি পদে করিয়া প্রণাম
চিন্তাকুল আত্ম-হারা। চলে না চরণ,
বসিলা কানন-প্রান্তে অবসন্ন মনে।
কৃষ্ণা নবমীর চন্দ্র উঠিতে লাগিল
হাসাইয়া বসুন্ধরা, ধীরে, ধীরে, ধীরে।
চাহিয়া উদয়মান সুধাকর পানে
কহিতে লাগিলা কর্ণ—"এইরূপে হায়!
আমার জীবন রাজ্যে ধীরে, ধীরে, ধীরে
হইতেছে সঞ্চারিত আলোক উজ্জ্বল।
বুঝিলাম এতদিনে সূত-নন্দনের
কেন এই ভুজে বল; কেন হৃদয়েতে
রাজ্য আশা; এ জিগীষা পিপাসা দারুণ
এ দারুণ অভিমান, কোন আকর্ষণে
চলিয়াছে এতদিন যন্ত্রের মতন

দুর্ব্বাসার ক্রুর করে। হায়, আমি তবে
কুন্তীর কানীন পুত্র, পুত্র দুর্ব্বাসার!
যার মন্ত্রণায় কুন্তী, কুন্তীপুত্রগণ,
ভুঞ্জিছে দুর্গতি এত, কুন্তীর তনয়
সেই পাপী, সহোদর পঞ্চ পাণ্ডবের!
ক্ষত্রিয় সে! অসম্ভব। না না এত নীচ
নহে রক্ত ক্ষত্রিয়ের! কুন্তী পুণ্যবতী;
তাঁর গর্ভে এ পাপীর জন্ম অসম্ভব!
সুরভির গর্ভে নাহি জনমে শার্দ্দূল
বিনাশিতে জননীকে সহ বৎসকুল;
সিংহিনীর গর্ভে নাহি জনমে শৃগাল।
ক্ষত্রিয় যে বীর, ব্যাধ নহে কদাচন!
বীরত্ব,—ক্রুরত্ব নহে,—ধর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের।
ক্ষত্রিয়ের শর ছোটে সরল রেখায়
দিবালোকে, অন্ধকারে ব্যাধ পাতে জাল।
সূতের নন্দন আমি, পিতা অধিরথ,
মাতা রাধা। না, দুর্ব্বাসা নহে মিথ্যাবাদী,
কুন্তীর তনয় আমি। কিন্তু যে জননী
নিক্ষেপিল জলে সদ্যঃপ্রসূত সন্তান,
মাতা নহে, রাক্ষসী সে। তার পুত্রগণ
পিতৃ শত্রু, শত্রু মম, নহে সহোদর।
অবশ্য করিব রণ।"

উঠিয়া সবেগে

আস্ফালিয়া দুই ভুজ কহিলা গর্জ্জিয়া—
"অবশ্য করিব রণ। আইস অর্জ্জুন!
আয় অভিমন্যু!—কিন্তু অস্ত্র পড়ে না যে মনে।

গ্রাসিছেন রথ-চক্র মাতা বসুন্ধরা
এ পাপীর। ধনঞ্জয়! ছাড় তীক্ষ্ণশর
ক্ষিপ্র করে বজ্রনাদে! নাহি জান তুমি
তব সহোদর কর্ণ। হায়! পিতঃ! তুমি
আজি হ'তে অস্ত্রহীন করিলে কর্ণেরে,
হরিলে বাহুর বল, রাজ্যের পিপাসা!
তথাপি তোমার আজ্ঞা করিব পালন।
কাটিলেন অস্ত্রগুরু জননীর শির
পিতার আদেশে; আমি পিতার আজ্ঞায়
কাটিবনা কেন হেন রাক্ষসী মাতার
পুত্রদের শির তবে?—যে পিতা আমার
পালিল বর্জ্জিত সদ্যঃপ্রসূত কুমার,
দিল জ্ঞান, অস্ত্র শিক্ষা, যাহার কৃপায়
কর্ণ আজি কর্ণ, কর্ণ অঙ্গ-অধিপতি?
এই চলিলাম মাতঃ! নিক্ষেপিলে জলে
যেই পুত্রে, পুত্রহীন করিয়া তোমায়
ভাসাইবে অকূল মা শোকের সাগরে।
মুদ আঁখি চন্দ্রদেব! তব বংশধর
চলিল নির্ম্মূল বংশ করিতে তোমার!"
ছুটিলেন বৈকর্ত্তন। হাসি উচ্চ হাসি,
বৃক্ষ অন্তরাল হ'তে হইয়া বাহির
কহিতে লাগিল কারু—"সহোদর মম
সরল শিশুর মত, ক্লান্ত পথশ্রমে
নিদ্রা যাইতেছে সুখে আপন কুটীরে।
কিন্তু আমি পোড়ামুখী শুনিনু যখন
হইবে মন্ত্রণা গুপ্ত কর্ণের সহিত

মহীষির, পোড়া চক্ষে আসিল না ঘুম।
কিন্তু আমি জাগ্রত কি? জাগিয়া মানুষ
এমন অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে কি কখন?
আমি কে? কারু কি? ধর্ম্মপত্নী দুর্ব্বাসার?
না কি স্বপ্ন রাজ্যে আমি কারুরূপী কেহ?
এ হাত? কারুর বটে। কদম্ব দাড়িম্ব?
কারুর। এ ক্ষীণ কটি? তাহাও কারুর।
শ্রোণী ভারে আর এই অলস গমন?
কারু সুন্দরীর তাও। সর্ব্বশেষ এই
মার্জ্জিত শাণিত বুদ্ধি? মনসা বিহনে,
দুর্ব্বাসার প্রাণেশ্বরী সম্ভবে কাহার?
কর্ণ দুর্ব্বাসার পুত্র, স্বপ্ন নহে তবে।
পুত্র নহে মন্ত্র-পুত্র! ভোজ নৃপতির
নাহি ছিল মৃত্যু আর, কুমারী কন্যায়
করেছিল নিয়োজিত দুর্ব্বাসা সেবায়।
সেবায় হইয়া তুষ্ট মহর্ষি গোপনে
দিলা মন্ত্র ব্যভিচার, না না, অভিচার।
কুমারী টানিল সূর্য্য, নামিল ভাস্কর
ছাড়ি আকাশের কাজ, জন্মিল কুমার!
গিলে কি হে আর্য্যজাতি এই ভস্ম ছাই
অকপটে? হরি! হরি! এ কি ব্যভিচার?
কি করিবে কৃপাপাত্রী কুন্তী অভাগিনী?
শিষ্য পিতা; দুর্ব্বাসাও ঋষি ধুরন্ধর,
অভিশাপে ভরা পেট, ক্রোধে গড় গড়!
পাইতাম আমি যদি মন্ত্র অভিচার,
না টানি পিতায় অগ্নি-পিণ্ড ভয়ঙ্কর

হস্ত, পদ হীন, টানি তনয়ে তাহার
চাপিতাম মহর্ষির মস্তক উপর।
তার পরে এতদূর নাহি গিয়া আর,
এই কুরুক্ষেত্র হ'তে আনিতাম টানি
আমার হৃদয় চোরে, এই জ্যোৎস্নায়
হইত কি অভিসার—না না,—অভিচার!
কিবা ঘোর ষড়যন্ত্র! অসাধ্য ইহার
নাহি বুঝি কোন পাপ অবনীমণ্ডলে?
কিন্তু ব্যাধ পড়িয়াছে আপনার জালে।
ফুরাবে কর্ণের লীলা দুই দিনে আর,
নিদ্রা যাও নাগরাজ! সাম্রাজ্যে তোমার।

একাদশ সর্গ।

—:*:—

মৃগ-শিশু।

—:*:—

সুবঙ্কিম শশধর কৃষ্ণা নবমীর
ফুটিতেছে ধীরে ধীরে দূর-বনরাজি শিরে,
হীরকের অর্দ্ধচন্দ্র, রঞ্জি ধরাতল
উজ্জ্বলরজতালোকে তরল শীতল।
চাহি সে ফুটন্ত শশী, শিবির গবাক্ষে বসি
উত্তরা ও অভিমন্যু; গাইছে উত্তরা,
বাজে কুমারের করে বীণা সপ্তস্বরা।

রহিয়া রহিয়া সুখে প্রেম-উচ্ছ্বসিত বুকে
গাইতেছে অভিমন্যু, সুধা বরষিয়া
জ্যোছনায় তিন বীণা উঠিছে ভাসিয়া।
সুস্বর-ত্রিবেণীধারা উদারা, মুদারা, তারা
খেলিয়া আকাশ-পথে উঠিছে কখন,
তারায় তারায় করি সুধা বিকিরণ।
কভু নামি ধরাতলে হিরণ্বতী নীলজলে,
হিল্লোল কৌমুদী মাখা করিছে চুম্বন,
কহি প্রকৃতির কাণে প্রীতির স্বপন।
প্রীতির স্বপন মত শুনিতেছে নিদ্রাগত
কুরুক্ষেত্র সে সঙ্গীত; নরকে হিংসার
প্রীতির ত্রিদিব যেন হতেছে সঞ্চার।
উঠিলেন শশধর; ধীরে সঙ্গীতের স্বর
জ্যোৎস্নার সহ যেন গেল মিশাইয়া,—
আত্ম-হারা দুইজন রহিলা চাহিয়া।

অভি। দেখ গো উত্তরে! চাহি, বসুন্ধরা অবগাহি
জ্যোছনায় উঠিছেন দেব শশধর,
পাপীর হৃদয়ে যেন পবিত্র ঈশ্বর।
এ সৌন্দর্য্য মনোহর, এ কবিত্ব মুগ্ধকর,
পারে লো বর্ণিতে বর্ণে কোন চিত্রকরে?
পারে কোন কবি বল চিত্রিতে অক্ষরে?

উত্তরা। পারে জানি একজন।
"কে উত্তরে?"—অন্যমন
জিজ্ঞাসি অভিমন্যু; অধরে তখন
আদরে বিম্বাধর বালা করিল চুম্বন।
"আমি!" যুবা কহে হাসি "তবে যেরে অগ্নিরাশি

করিস্ ব্যবস্থা মম চিত্র, কবিতার ?"

উত্তরা। তারা কেন প্রতিযোগী হইবে আমার ?
নিয়ে চিত্র কবিতায় থাক সদা, উত্তরায়
দিয়ে থাক সে কালের কতটুকু ভাগ ?
তাহাতে কি মানুষের নাহি হয় রাগ ?

অভি। না উত্তরে। তাহা নয়, মম চিত্র কাব্য চয়
তব অগ্নি-পরীক্ষার যোগ্যই কেবল।
কুতূণের প্রাণাধিকে! ধর সই মঙ্গল!

উত্তরা। কেন ? নিজে নারায়ণ প্রশংসা ত সর্বক্ষণ
করেন চিত্রের তব, তব কবিতার।

অভি। তেমন করেন নাকি চিত্রের তোমার ?

উত্তরা। লুকাইয়া একখানি এঁকেছিনু ছবি আমি,
দাইমা পোড়ারমুখী দেখি অকস্মাৎ
লইয়া ছুটিল, আমি ছুটিনু পশ্চাৎ।
বলে—"ভদ্রা দেখ! দেখ! আনিয়াছি ছবি এক,
শাশুড়ীর চুরি বিদ্যা শিখিয়াছে বউ।
ওমা! এ ছুঁড়ীর পেটে এত বিদ্যা, হুঁ ?"
মা বাবা হাসিয়া কত প্রশংসা করিল শত;—
মায়ের অঞ্চলে আমি লুকায়ে লজ্জায়।
কহিলেন মাতা যেন, গলিয়া মায়ায়,—
"কহিবি অভিরে, দিদি! আমার অঞ্চল-নিধি
রাখে যেন তার পার্শ্বে আঁকি এই পটে।"
তখন সে পোড়ামুখী কহে হাসি,—"বটে ?"
আমি তবে দিব আঁকি, অভির এ অঙ্ক ঢাকি,
ক্ষুদ্রতম অভি, মম অঞ্চলের ধন,
ফুটাব চন্দ্রের কোলে নক্ষত্র রতন।"

কহে বাবা উচ্চ হাসি— "আমি তবে দিব আসি
একটী উত্তরা ক্ষুদ্র আঁকি পাশে তার।"
সুলী কহে—"বরকন্যা তোমার আমার ?"
মা কহিলা হাসি——"তবে দ্বিতীয় গোগৃহ হবে
বুঝিতে তোমার পুনঃ, মনের মতন
যোগাইতে পুতুলের বসন ভূষণ !"
সুলীমার মুখে ছাই, হাসি কহে—'তাই, তাই,
সুলোচনা হবে তবে সৈরিন্ধ্রী আবার
বিরাট,—কীচক, ভীম,—ঝণ্টিকা আমার।"
চাহি ফুল্ল চন্দ্র পানে নীরব উভয়।
হইতেছে চন্দ্রে যেন সেই অভিনয়।
সেই জ্যোৎস্নার উৎসে জনক জননী,
পিতা নীলপ্রভ, মাতা জ্যোৎস্না বরণী—
দেখিছেন ছবি বসি আনন্দে অধীর,
দাঁড়াইয়া সুলোচনা বদন গম্ভীর।
চাহি সেই দৃশ্য পানে আঁখি ছল ছল,
লজ্জায় কুঞ্চিত নেত্র, ভক্তিতে সজল।

অভি। ভাগ্যবান ভাগ্যবতী আমাদের মত
আছে কি জগতে আর ?
না জানি, উত্তরে ! আহা ! জন্ম জন্মান্তর
করিয়াছি কত পুণ্য, অক্ষয় অতুল,
ভদ্রার্জ্জুন মাতা পিতা, গোবিন্দ মাতুল।

উত্তরা। এই পোড়া যুদ্ধ নাথ! কত দিনে আর
ফুরাইবে, জুড়াইবে অখিল সংসার ?
ইচ্ছা করে রাজ্য আশা দিয়া জলাঞ্জলি,
যাই কোন মনোহর অরণ্যেতে চলি।

মানুষে মানুষে যথা হিংসা নাহি করে,
কাঁদে রমণীর প্রাণ রমণীর তরে।
নির্ম্মাইয়া তথা পুষ্প-কুটীর সুন্দর
জনক জননী পদ সেবি নিরন্তর।
কানন কপোত, বন কপোতিনী মত,
মুখে মুখে, বুকে বুকে, থাকি অবিরত।

অভি। সুলীমা রবে না সঙ্গে?

উত্তরা। নিবে না তাহায়,
পোড়ামুখী নিত্য গালি দেয় বাপ মায়।
না নিলেও অভাগী যে যাইবে মরিয়া
না পারে থাকিতে এক তিল না দেখিয়া।
মুহূর্ত্তেক যদি আমি থাকি লুকাইয়া,
বৎসহারা গাভী মত মরে গরজিয়া।
আমিও যে পারিব না, কি যে সর্ব্বনাশী,
এত দেয় গালি তবু কত ভাল বাসি!
সুলীমাও যাবে সঙ্গে; তা হইলে আর,
রহিবে না কোনো দুঃখ তব উত্তরার।
কিন্তু——

অভি। কিন্তু কি লো?

উত্তরা। কিন্তু, পুত্রত আমার
হবে রাজা?

উচ্চ হাসি হাসিলা কুমার

উত্তরা। পুতুল লইয়া খেলা করিতাম যবে
পিত্রালয়ে, প্রাণনাথ! নাহি বুঝি ভবে
এমন সুখের দিন!
সখীদের পুত্রগণ মন্ত্রী কর্ম্মচারী!

হইত আমার পুত্র রাজা ছত্রধারী।
সে উত্তর গোগৃহের ভূষণে নির্ম্মিত
পুত্র পুত্রবধূ মম আছে সুরক্ষিত।
বাবা মা বড়ই ভাল বাসেন দুটিরে ;
হাসিয়া কহেন হরি—"নাতি নাতিনীরে
—কৌরবের ভূষণেতে নির্ম্মিত, ভূষিত,—
কৌরবের সিংহাসনে করিব স্থাপিত।"
অপূর্ব্ব পুত্তল দুটি কুরু সিংহাসনে,
যার তার এই মহা কুরুক্ষেত্রে রণ !—
উচ্চ-হাসি অভিমন্যু হাসিলা আবার।
উত্তরাও উচ্চ-হাসি হাসিল এবার।

অভি। কি সুখের ছবি আহা ! আঁকিলি, উত্তরে
সেই বনবাসে।
যায় তিন বর্ষ প্রায় এক দিন মৃগয়ায়
গিয়াছি মলয়াচলে কৈশোর উল্লাসে।
উল্লাসে উন্মত্ত প্রাণ ; কি বিদ্যুত খরশাণ
বহে মৃগয়ায় প্রিয়ে শিরায় শিরায়,
ছাড়াইয়া রক্ষিগণে, পশিনু নিবিড় বনে,
অনুসারি মহা ব্যাঘ্র ভীম চিত্রকায়।
করি ঘোর গরজন কাঁপাইয়া সর্ব্ব বন,
কানন-আতঙ্ক ব্যাঘ্র ত্যজিল জীবন ;
দেখিনু মস্তকোপরি প্রচণ্ড তপন।
ক্লান্ত প্রাণ পিপাসায়, হারায়েছি পথ তায়,
দেখিনু তখন
কি অপূর্ব্ব পুণ্যাশ্রম ! কিবা শান্তি-নিকেতন !
মরুভূমে চারু-মৃগ-তৃষ্ণিকা সৃজন।

কি সুন্দর সরোবর। কিবা বন মনোহর!
চারি ধারে বনে কিবা কুটীর সুন্দর,—
লতা পুষ্পে সুসজ্জিত চিত্র মুগ্ধকর!
সে কুটীরে মুগ্ধকর মাতৃ-মূর্ত্তি মনোহর,
জ্যোচ্ছনা-প্রদীপ্ত-নীল-আকাশ-নির্ম্মিত,
কিবা স্নেহ, কিবা শান্তি, কি সুধা মণ্ডিত!
পত্রে পুষ্পে সুসজ্জিত, বেদি বক্ষে সুস্থাপিত
পিতার মৃণ্ময়-মূর্ত্তি, সুচারু-নির্ম্মাণ,
মনোহর মৃগয়ার বেশে শোভমান।
পুলকে ভরিল বুক,— গাইতেছে সারীশুক
জনকের দশনাম বিহঙ্গ নিচয়
স্থানে স্থানে পিঞ্জরায়, বন বিহঙ্গেরা গায়
বৃক্ষে বৃক্ষে গান সেই নাম পুণ্যালয়;
নামের সঙ্গীতে বন প্রতিধ্বনিময়!
মুক্তকেশী উদাসিনী জননী বন-বাসিনী
সেই দশনাম প্রিয়ে। গাইলে আদরে,
শশক, ময়ূর, মৃগ, কুক্কুট সুস্বরে
প্লাবিত করিয়া বন, কলকণ্ঠে হংসগণ,
আসি পালে পালে সেই বন মাতা পাশে,
নাচিতে লাগিল কিবা কানন উল্লাসে!
আনন্দে ভরিল প্রাণ, ছুটিয়া করি প্রণাম
জননীর পদাম্বুজে, কহিনু—"যাহার
এ অপূর্ব্ব পূজা, আমি কুমার তাঁহার।
কে তুমি মা? কহ, বড় কুতূহল মনে।
কেন পূজ জনকেরে এ নিবিড় বনে?"
কি মধুর স্নেহ-হাসি ফুটিল সে মুখে;

কি মধুর স্নেহ-স্রোত উছলিল বুকে!
কি মধুর স্নেহ-স্বরে কহিলা—"বাছারে!
বিনা পরিচয়ে আমি চিনেছি তোমারে।
সেই সুভদ্রার মুখ, পার্থ অবয়ব,
সেই সুভদ্রার প্রাণ, পার্থের প্রভব!
অর্জ্জুনের মানবত্ব, দেবীত্ব ভদ্রার,
তাঁহাদের পুত্র বিনা কে পাইবে আর?
ত্রিদিবের পবিত্রতা, সৌন্দর্য্য ধরার,
তাঁহাদের পুত্র বিনা কে পাইবে আর?
পার্থ উপাসিকা আমি কেন পূজি তারে?—
কেন পূজে বৎস! নর ওই সবিতারে?
ঐশ্বর্য্য, সৌন্দর্য্য, বীর্য্য—কে না পূজে বল?
করে দেবত্বের পূজা কি স্বর্গ ভূতল।
জগতে দেবত্ব ধর্ম্ম-ভক্তি-প্রস্রবণ;
হিমাচলে সিন্ধু গঙ্গা লভেন জনম।
মম ভক্তি-হিমাচল জনক তোমার।
সেই ভক্তিবলে,
পাইনু তোমায় আজি এই বনস্থলে।
এস বৎস! এস বুকে! তপস্যা আমার
হইল সফল বুঝি";—
সরিল না আর
জননীর মুখে, লইয়া আমায় বুকে,
চুম্বিলা মা কতই চুম্বন!
কতই আনন্দ-অশ্রু করিলা বর্ষণ!
কোন রুদ্ধ প্রস্রবণ হ'য়ে অবারিত,
আমায় করিল যেন স্নেহেতে প্লাবিত।

কি সুখে কাটিল দিন, সন্ধ্যা আগমনে
কাকলি কল্লোল কিবা উঠিল কাননে।
সেই কাকলির সনে কণ্ঠ মিলাইয়া
বনপুত্র পুত্রীগণ গাইয়া গাইয়া
আসিতে লাগিল ; বন হইল পূরিত
হাম্বারবে শঙ্খনিভ, বাঁশীর সহিত।
আসি দ্বারে জননীর গাভী 'পুণ্যবতী'
"মা মা" বলি ডাকি, চাহি জননীর প্রতি
সস্নেহ নয়নে স্থির, সন্ধ্যার আঁধারে
শ্বেত কাদম্বিনী যেন শোভিল দুয়ারে।
"মা মা" বলি স্নেহে মাতা করিলে দোহন
করিল কি শ্বেতামৃত অজস্র বর্ষণ !
নেচে নেচে বন পুত্র, বন বালাগণ,
কত খাদ্য জননীকে করিল অর্পণ।
তাহাদের "মা মা" কণ্ঠ, স্নেহ সম্ভাষণ ;
জননীর স্নেহভাষা, আদর, চুম্বন ;
কেহ করে, কেহ কক্ষে, কেহ বা অঞ্চলে
ধরিয়া মায়ের, কেহ জড়াইয়া গলে,
কেহ জড়াইয়া বাহু, কেহ জানু আর,
কহিতেছে গোচারণ কত সমাচার !
বনপুষ্প সম বনপুত্র কন্যাগণ ;
পুষ্পিতা বল্লরী মাতৃ শোভা নিরুপম
জননীর ; সেই বন-স্নেহের কানন ;—
কি স্বর্গ খুলিল শিশু-হৃদয়ে প্রথম !
কহিলা জননী তবে—"দেখ বাছাগণ !
আসিয়াছে মম রাজ-পুত্র একজন।"

থামিল সে কোলাহল, বিস্ময়ে সকল
চাহিল আমার পানে, নেত্র অচঞ্চল।
চাহিয়া চাহিয়া মম বসন ভূষণ
কহিল সঙ্কোচে—"মা গো! বনপুত্রসনে
খেলিবে কি রাজপুত্র, যাবে গোচারণে?"
মাতা মাতুলের সেই শিক্ষা প্রীতিময়
তখন আমার মনে হইল উদয়;—
"সকল পুরুষ পিতা, রমণী জননী,
সকলের পুত্র কন্যা ভ্রাতা ও ভগিনী।
দেখিব সকল জীব আপনার মত,
পরহিত প্রাণপণে সাধিব সতত।"
"খেলিব, যাইব"—আমি কহিনু উল্লাসে।
পূরিল প্রাঙ্গণ কিবা আনন্দ-উচ্ছ্বাসে।
আকাশে উঠিল চন্দ্র, চারু জ্যোৎস্নায়
খেলিলাম কত খেলা আলোক ছায়ায়।
খাইলাম কত কিছু মিলি সবে সুখে,
পড়িলাম ঘুমাইয়া জননীর বুকে!
প্রভাতে বালকগণ খুঁজিয়া কানন,
আনিল সঙ্গীর তত্ত্ব! সজল নয়ন
বিদায় দিলেন মাতা। সজল নয়ন
গলা জড়াইয়া সেই ভ্রাতা ভগ্নী গণ
কহিল—"আবার ভাই আসিবে কি বনে?
আমরা তোমাকে ছাড়ি থাকিব কেমনে?
সাজাইয়া বন ফুলে, পল্লব-মালায়,
আমাদের রাজা ভাই! করিব তোমায়।"
কাঁদিয়া কহিলা মাতা—"বন-জননীরে

পড়িবে কি মনে বাছা! আসিবি কি ফিরে ?"
বড় কাঁদিলাম স্নেহ-বুকে জননীর,
কাঁদিলাম গলা ধরি ভাই ভগিনীর।
পথে পথে কত ফল, তুলি কত ফুল,
দিল তারা! সে যে স্নেহ জগতে অতুল।
জিজ্ঞাসে বিরাট-বালা সজলনয়না—
"বন-বাসিনীর সেই চারু উপাসনা
জানেন কি পিতা মাতা ?" সজলনয়নে
উত্তরিলা অভিমন্যু—"নাহি লয় মনে।
বিদায়ের কালে কোলে লইয়া আমারে
স্নেহ শোকোচ্ছ্বাসে মাতা কহিলা—'বাছা রে
জনক জননী-কাছে বন-বাসিনীর
কহিও না কোন কথা; এই তাপসীর
কহিলে তপস্যাব্রত হইবে বিফল।
যথাকালে তাঁহাদের চরণ কমল
দেখিয়া সে চরিতার্থ করিবে জীবন,
তদবধি এ তপস্যা রহিবে গোপন।
ক্ষুদ্র সূর্য্যমুখী কোথা পূজে সবিতারে,
কি কাজ জানিয়া তাঁর, জানাইয়া তাঁরে।'"

উত্তরা। গিয়াছিলে সেই বনে আর কি কখন
কি পবিত্র, কি সুন্দর, স্থান সেই বন

অভি। অধ্যয়ন অবসরে, অবসন্ন মন,
কতবার সেই বনে করেছি গমন।
সেই ক্ষুদ্র স্নেহ-স্বর্গে বনমাতাবুকে,
কাটায়েছি কত দিন, কত নিশি, সুখে।
সঙ্গী সঙ্গিনীর সঙ্গে কত দিবানিশি রঙ্গে

কাটায়েছি সেই বনে ক্রীড়া মৃগয়ার !
কত গীত, কত নৃত্য, কানন ছায়ায়
কভু বন-সরোবরে, নীল সুধাময়,
দিতাম সাঁতার ; কত নীল কুবলয়,
—বন-বালকের বন-বালিকা বদন,—
ভাসিত সে নীল জলে ; হংস হংসীগণ
সাঁতারিত, উচ্চ হাসি ছিন্ন গীত তানে
মিশাইয়া কলকণ্ঠ উল্লসিত প্রাণে।
হংসিনীর মত ক্ষুদ্র তরণী সকল
সাজাইয়া পত্রে পুষ্পে, পতাকা উজ্জ্বল
উড়াইয়া, পত্রে পুষ্পে সাজিয়া আমরা,
করিতাম জলক্রীড়া। তরী মনোহরা
সঙ্গীতের তালে তালে নাচিত হিল্লোলে,
নাচিত মরালগণ গাইয়া কল্লোলে।
সাজাইত পত্রে পুষ্পে আমাকে কখন
বনরাজা ; চারু বনমালা এক জন
সাজাইত বনরাণী ; পারিষদ চয়
সাজি সবে করাইত রাজ্য অভিনয়।
পুষ্পবেদিকায়, কিবা পুষ্পিতা শাখায়,
সিংহাসনে দেখি রাজারাণী পুষ্পকায়,
কত হাসিতেন মাতা, চুম্বিতেন কত !
কহিতেন—"বউ ত হয়েছে মনোমত ?"
সত্য, ভাবিতাম আমি সে আমার রাণী ;
সত্য সে ভাবিত মনে আমি তার স্বামী।
লইয়া দুটীকে মাতা কতই কৌতুক
করিতেন, হাসিতেন, চুম্বিতেন মুখ।

"সতিনী! সতিনী!"—বলি উঠিল হাসিয়া
উত্তরা—"আমার সেই পুতুলের বিয়া!
থাক এই পোড়া যুদ্ধ, রাজ্যের পিপাসা।
প্রাণনাথ! উত্তরার পূরাও এ আশা,—
চল সেই বনে নাথ! চল একবার
সেইমত বনরাণী সাজিব তোমার।
বসি সে মায়ের কোলে আনন্দে বিহ্বল,
সেই সতিনীর সঙ্গে করিব কোন্দল।"

অভি। আমারো এ সাধ প্রিয়ে! লইয়া তোমায়
রণান্তে যাইব সেই বনে দুজনায়।
কি আনন্দ-অশ্রু মাতা করিবে বর্ষণ!
কি আনন্দে পরিপূর্ণ হইবে কানন!
বড় সাধ মনে প্রিয়ে! রণান্তে সে বনে
সুন্দর আশ্রম এক সৃজিব দুজনে।
দেখিয়াছি সিন্ধুতীরে শৈল মনোহর;
নির্ম্মাইব সেই শৈলে আবাস সুন্দর।
অর্দ্ধচন্দ্র, অষ্ট কোণ, চতুষ্কোণ আর,
শোভিবে অলিন্দ চারু চারি ধারে তার।
শোভিবে অলিন্দে পুষ্প গুল্ম থরে থর,
চারুপত্র গুল্ম সহ মিশিয়া সুন্দর!
সুরঞ্জিত স্তম্ভ সারি বেষ্টি সুবিমল
শোভিবে পুষ্পিতা চারু লতিকা সকল।
বিচিত্র বিহঙ্গগণ স্তম্ভ অবসরে
নাচিবে গাইবে সুখে সুচিত্র পিঞ্জরে।
কুটীরের চারিদিকে চারি পুষ্পোদ্যান
চারি ভিন্ন অবয়বে হবে শোভমান।

শোভিবে উদ্যান-বক্ষ শ্যামল প্রাঙ্গণ
কারুকার্য্য-অলঙ্কৃত গালিচা যেমন।
প্রাঙ্গণের প্রান্তভাগে চম্পক, বকুল,
সুবাসিত পুষ্প বৃক্ষ শোভিবে অতুল।
শোভিবে পর্ব্বত পার্শ্বে, মূলে, মনোহর
ফলিত, পুষ্পিত, ক্ষুদ্র কানন সুন্দর।
বনে নির্ঝরিণী এক গাবে অবিরত
নিরজনে, অন্তঃপুরে উত্তরার মত!
বেষ্টি গিরিমূল এক তড়াগে নির্ম্মল
ঢালিবেক নির্ঝরিণী সুধা সুশীতল,
অভিমন্যু-হৃদয়েতে ঢালে যেই মত
উত্তরা শীতল প্রেম-অমৃত সতত।
নীলাম্বুতে ঢল ঢল সেই সরোবরে
সুবর্ণ রজত মীন সুখে রবিকরে
খেলিবেক শত শত; ভাসিবে সতত
মন্থরে মরাল-বধূ, উত্তরার মত,
স্বনাথ মরাল সহ। নানা জলচর
নানা বর্ণ জলক্রীড়া করিবে সুন্দর।
কুরঙ্গ শশক শিখী প্রসারি পেখম
বেড়াবে প্রাঙ্গণে, বনে; কুহুটি কূজন
উঠিবে পঞ্চমে কিবা রহিয়া রহিয়া!
ক্রীড়াশীলা কুরঙ্গিণী যাইবে ছুটিয়া,
বিলোল কটাক্ষময়ী, বিদ্যুৎ আকার,
ছুটে যথা ক্রীড়াশীলা উত্তরা আমার।
বনে রাখালের বাঁশী, কণ্ঠ সুপঞ্চম,
করিবে সে নিরজনে কি সুধা বর্ষণ!

ডাকিবেক গাভীগণ রহিয়া রহিয়া,
গভীর সে কম্বু কণ্ঠে কানন ভরিয়া।
কুটীরের কক্ষচয় রবে সুসজ্জিত,
মনোহর নানা উপকরণে খচিত।
শোভিবে শয়ন-কক্ষে গোলাপী প্রাচীরে
উত্তরার নানা চিত্র। কোথা মানিনীরে
সাধিতেছে অভিমন্যু; কোথায় ছুটিয়া
যাইতেছে ক্রীড়াশীলা ঝলকে হাসিয়া,—
উড়িতেছে মুক্ত কেশ তরঙ্গ খেলিয়া;
কোথায় বিখ্যাত সেই পুতুলের বিয়া।
কোথা বীণা করে বসি যেন বীণাপাণি,
কোথায় আমার বুকে রাখিয়া মুখানি,—
চন্দ্রের হৃদয়ে সুধা,—চাহি পরস্পরে
অনিমেষ অবিশ্রান্ত অতৃপ্ত অন্তরে।
বসিবার কক্ষে নীল আকাশপ্রতিম
প্রাচীরে শোভিবে চিত্র,—ভারত প্রাচীন
ইতিহাস অঙ্কে অঙ্কে রহিবে চিত্রিত,
আর্য্যদের শৌর্য্যবীর্য্য মহিমামণ্ডিত।
কোথায় সরল সেই আর্য্য পিতৃগণ
রক্ষিছেন মেষপাল; করিছেন রণ
অনার্য্যের সহ; কোথা বসি নদীতীরে
গাইছেন সামগান প্রভাতে গম্ভীরে।
রামায়ণ অঙ্কে অঙ্কে রহিবে অঙ্কিত,
ধনুর্ভঙ্গ, বনযাত্রা করুণার গীত।
বনবাস—পতি পত্নী প্রেম মনোহর;
সে জীবন্ত ভ্রাতৃভক্তি, চিত্তদ্রবকর;

সীতার হরণ; সেই করুণ রোদন
শ্রীরামের, চাপি বক্ষে সীতার ভূষণ;
অশোক-কানন; শক্তিশেল শোককর;
রথে রাম সীতা, নিম্নে ফেনিল সাগর;
নির্ব্বাসিতা সীতাদেবী ভাগীরথী-তীরে;
বাল্মীকির তপোবন; সীতা জননীর
উপহার সেই বন্দী পবনকুমার;
রামায়ণ গীত সেই শোক অযোধ্যার;
শোকসিন্ধু জানকীর পাতালপ্রবেশ,
কাঁদিবে যাহে কাল নির্ব্বিশেষ।
দেবযানী, শকুন্তলা, আখ্যান সুন্দর;
দময়ন্তী সাবিত্রীর চিত্র মনোহর!
অধ্যয়ন কক্ষে গ্রন্থ রবে চারি ধার,
চ[illegible]ালের জ্ঞানের ভাণ্ডার!
হরিদ্রাভ প্রাচীরেতে রহিবে চিত্রিত,
আর্য্য ঋষিগণ ব্যাস বাল্মীকি সহিত।
অঙ্কে অঙ্কে কবিতার জন্ম উপাখ্যান
রহিবে অঙ্কিত;—কোথা ব্যাধের সন্তান
সুপবিত্র রাম নামে হতেছে দীক্ষিত;
কোথায় লভিছে বীণা অমৃত পূরিত;
কোথা করি বিদ্ধ-ক্রৌঞ্চ-মিথুন দর্শন,
গাইতেছে "মা নিষাদ" কবিতা প্রথম;—
করিছে অপ্সরোগণ পুষ্প বরিষণ,
হাসিতেছে বসুন্ধরা, সার্থক জীবন।
রবে উপাসনা কক্ষে মর্ম্মরে স্থাপিত
মাতা পিতা মাতুলের মূর্ত্তি অতুলিত।

নরদেব পিতা মম, মামা নারায়ণ,
প্রেমস্বরূপিণী মাতা পবিত্র বন্ধন
উভয়ের ;—প্রেমে নর পায় নারায়ণ,
নারায়ণ নর-দেহ করেন ধারণ।
বেদিমূলে এক পার্শ্বে মাতা সুলোচনা ;
অন্য পার্শ্বে বনমাতা গৈরিক-বসনা।
অমল মার্জ্জিত শ্বেত প্রাচীরে চিত্রিত
রবে কৃষ্ণার্জ্জুন লীলা, নরের অতীত ;
সেই পুণ্য জন্মাষ্টমী ; শিশু জ্যোতির্ম্ময় ;
প্রহরী নিদ্রিত, দ্বার-মুক্ত কারালয় ;
যমুনা লঙ্ঘন সেই নিশীথ সময়ে ;
গোকুলে নন্দের গৃহে শিশু বিনিময়,
বৃন্দাবনে গোচারণে বীরত্ব অদ্ভুত ;
রাস দোল গোপবালা সহ গোপসুত ;
সভামধ্যে দুরাচার কংসের নিধন
উগ্রসেনে মথুরার রাজত্বে বরণ ;
সিন্ধুতীরে দ্বারাবতী ; মাতা সত্যভামা ;
মাতা রুক্মিণীর সেই কৃষ্ণ আরাধনা ;
বানপ্রস্থে পিতামহ পবিত্র দর্শন ;
পিতামহী মাদ্রীর সে চিতা আরোহণ ;
হস্তিনায় সেই অস্ত্র-পরীক্ষা সুন্দর ;
মাতা দ্রৌপদীর সেই চারু স্বয়ংবর ;
একরথে যদুকুল সহ সেই রণ,—
জননীর সে বীরতা, অশ্ব-সঞ্চালন ;
খাণ্ডব দাহন, জরাসন্ধের নিধন
করুণার দৃশ্য সেই কারা-বিমোচন ;

রাজসূয় যজ্ঞে শিশুপালের দলন ;
দ্যূতে পাণ্ডবের ধর্ম্ম-পরীক্ষা ভীষণ ;
সেই বনযাত্রা ; শিক্ষাগৃহ উত্তরার ;
উত্তর গোগৃহে রণ, সেই উপহার ;
সর্ব্বশেষ এই মহাকুরুক্ষেত্ররণ,—
কিবা শোভা এক রথে নর নারায়ণ !
চাহি অন্তরের পানে মহিমামণ্ডিত
দাঁড়াইয়া দুই বাহু করি প্রসারিত ,
জগতের মহাধর্ম্ম-গীতার প্রচার !
সেই বিশ্বরূপ—মহাকাল অবতার !
পবিত্র ত্রিমূর্ত্তি,—মাতা, পিতা, নারায়ণ—
পূজিব, করিব পদে আত্ম-সমর্পণ।
তাঁহাদের পদমূলে, ভক্তি-পূর্ণ মন,
করিব দুজনে নিত্য গীতা অধ্যয়ন।
তাঁহাদের সুপবিত্র নাম সুধাময়
গাইবেক অবিরাম বিহঙ্গনিচয়
কুটীর করিয়া পূর্ণ ; নর-লীলা গীত
গাইব আমরা ভক্তিকণ্ঠে পুলকিত।
সেই নাম-মন্ত্রে বন করিব দীক্ষিত,
গাবে বনবাসী, বনপশু সুললিত
শুনিবে সে নাম, তীর্থ হইবে কানন,
নর জন্ম, পশু জন্ম হইবে মোচন।
কখন সাজিয়া যোগী, সাজিয়া যোগিনী
বেড়াইব দেশে দেশে করি নাম ধ্বনি,
গাইয়া সে লীলা গীত ; করিয়া প্রচার
দ্বাপরের ধর্ম্ম—গীতা, কৃষ্ণ,—অবতার।

সাধুদের পরিত্রাণ দুষ্কৃত দমন
সাধিব, করিব ধর্ম্ম সাম্রাজ্য স্থাপন।
করিব ভূতল স্বর্গ, নর দেবোপম,—
নারায়ণ! এ স্বপ্ন কি হইবে পূরণ?

উত্তরা। আর সেই যোগী পিতা, যোগিনী মাতার
নিকটে আসিবে পুত্র নৃপতি ধরার,
চতুরঙ্গ দলে বলে, বউটি লইয়া,
হবে অভিনীত বনে পুতুলের বিয়া!
জড়ায়ে পতির গলা হাসে উচ্চ হাসি
বিরাট-নন্দিনী; চুম্বি সেই হাসি রাশি
অভিমন্যু উচ্চহাসি উঠিল হাসিয়া;
জ্যোৎস্নায় দুই হাসি গেল মিশাইয়া।

অভি। রবিকরে, জ্যোৎস্নায়, চাহি সিন্ধু শোভা,
চাহি বন-প্রকৃতির শোভা মনলোভা,
গাঁথিব কবিতা-হার; গাঁথিবে উত্তরা
কাছে বসি ফুলমালা; বীনা সপ্তস্বরা
বাজাইবে, বীণা কণ্ঠে গাইবে কখন
পূরিয়া সুধায় সেই নির্জ্জন কানন।
সঙ্গীত তরঙ্গে মুগ্ধ কল্পনা আমার
স্বর্গে, মর্ত্ত্যে, অঙ্কে অঙ্কে করিবে বিহার।
বাসন্ত, শারদ, ফুল জ্যোৎস্না-মণ্ডিত
নীল বন-সরোবরে, তরী মনোহরা
ভাসাইয়া, নিরখিয়া জ্যোৎস্না-প্লাবিত
নীলাকাশ গাব আমি, গাইবে উত্তরা।

উত্তরা। কি সুখের ছবি আহা! চল নাথ! চল,
এই কল্পনার স্বপ্ন করিগে পূরণ।

অভি। পূরাইব ; কিন্তু অগ্রে এই রণস্থল,
করিতে হইবে প্রিয়ে! স্বধর্ম্ম পালন।
উত্তরা। স্বধর্ম্ম!
অভি। স্বধর্ম্ম! প্রিয়ে! এ সুখ স্বপন
ছিল জীবনের মম আশা অন্যতম।
আজি সন্ধ্যাকালে বসি মায়ের চরণে
বুঝিয়াছি, দেখিয়াছি জ্ঞানের নয়নে,
অসার স্বপন নহে মানব-জীবন।
মানব-জীবন কর্ম্ম, স্বধর্ম্ম পালন।
ধর্ম্ম-যুদ্ধ প্রিয়তমে! স্বধর্ম্ম আমার।
এই কুরুক্ষেত্র মম ত্রিদিবের দ্বার।
কুরুক্ষেত্রে করি অগ্রে স্বধর্ম্ম পালন,
করি ধর্ম্মরাজ্য এই জগতে স্থাপন,
তবে পূরাইব শান্তি-স্বপ্ন আপনার,
নহে অগ্রে, পরে শান্তি যুদ্ধ ঝটিকার।
কালি হতে ঘোরতর করিব সংগ্রাম,
অর্পি ধর্ম্ম-রাজ্য ব্রতে এই ক্ষুদ্র প্রাণ।
উত্তরা। না, না, নাথ! উত্তরার থাকিতে জীবন,
দিবে না তোমায় যুদ্ধে করিতে গমন।
যতক্ষণ থাক যুদ্ধে, প্রাণেশ আমার!
জান না কি করে প্রাণ তব উত্তরার।
স্বয়ং শ্বশুর যুদ্ধ করিছেন যবে,
কি কাজ তোমার বল গিয়া সে আহবে?
বালক বালিকা নাথ! আমরা দুজন,
করিব তাঁদের সেবা,—স্বধর্ম্ম পালন।
অভি। উত্তরে! উত্তরে! ওই জনক আমার

করিয়াছেন কি ভীষণ যুদ্ধ অনিবার !
কত অস্ত্রাঘাত, ভীম বজ্রাঘাত কত,
সহিছেন অবিচল হিমাদ্রির মত।
তাঁহার তনয় আমি রমণী-অঞ্চল
ধরিয়া রহিব এইরূপে অবিচল ?
না, না, প্রিয়ে ! কালি আমি প্রবেশিব রণ,
দেখাইব অভিমন্যু অর্জ্জুননন্দন
বাঁচি যদি ধর্ম্ম-রাজ্য করিয়া স্থাপন,
সেই কল্পনার স্বর্গে কাটিব জীবন।
মরি যদি, মহাযুদ্ধে তাজিয়া জীবন
ওই চন্দ্রলোকে প্রিয়ে ! করিব গমন।
স্রষ্টার অনন্ত সৃষ্টি ; গ্রহ তারাগণ
মনে হয় মানবের ভবিষ্য আশ্রম।
পুণ্য অনুসারে ওই গ্রহ তারাগণ
জন্ম জন্মান্তরে নর করে বিচরণ।
পুণ্যময় চন্দ্রলোকে যাইব আমরা,—
পিতা, মাতা, পুত্র পুণ্য-জ্যোৎস্না উত্তরা
নারায়ণ পদতলে বসিয়া সকলে,
লভিব অনন্ত-শান্তি অমরমণ্ডলে।
  বালিকার ক্ষুদ্র মুখ হইল গম্ভীর,
পড়িল মেঘের ছায়া যেন জ্যোৎস্নায়।
চাহি চন্দ্র পানে, রাখি পতি-বুকে শির,
রহিল নীরবে, নেত্র মুদিল নিদ্রায়।
চাহি চন্দ্রপানে অভিমন্যু কতক্ষণ
রহিলা নীরবে বসি ; কতই ভাবনা
হইল উদয় মনে, জাগিল তখন

প্রতিভা সিন্ধুর বক্ষে কতই কল্পনা।
নিদ্রিতা বালিকা স্বপ্নে করিয়া চীৎকার
কহিল,—"না প্রাণনাথ! ছাড়ি উত্তরায়
যাইও না তুমি, ক্ষুদ্র উত্তরা তোমার
পারিবে না একা যেতে এত দূর হায়!"
কুমারের দুই চক্ষু হইল সজল।
রহিলা চাহিয়া সেই ক্ষুদ্র মুখখানি,—
জ্যোৎস্না প্লাবিত যেন মুদিত কমল!
ধরি দুই করে পুষ্পনিভ দুই পাণি
চুম্বি প্রেমভরে মুখ, রাখি উপধানে,
জানু পাতি ভূমিতলে বসি ভক্তিভরে,
চন্দ্রিকা-প্রদীপ্ত নীল আকাশের পানে
চাহিয়া, কহিলা কর-যোড়ে সকাতরে—
"নারায়ণ! এ স্বপ্ন কি তব মনস্কাম?"
দিও বালিকায় শান্তি, পদাম্বুজে স্থান।

দ্বাদশ সর্গ।

—*—

সুখ তত্ত্ব।

—*—

কৃষ্ণ। গুরুদেব। বৃন্দাবনে, নিরজনে গোচারণে,
শুনিতাম কি স্বর্গ-সঙ্গীত!
কি যেন অপ্সরা-কণ্ঠ গাইত আকাশে নিত্য
মনপ্রাণ করিয়া মোহিত।

গাইত—"অশান্তিপূর্ণ জগতের হাহাকার,
পশে না কি শ্রবণে তোমার ?
সাম্রাজ্যে, সমাজে, ধর্ম্মে, কোথাও না পাই শান্তি
জগত করিছে হাহাকার !
অন্তর-বিগ্রহ-বহ্নি জ্বলিতেছে রাজ্যে রাজ্যে,—
কিবা ঘাত, কিবা প্রতিঘাত !
অন্তর-বিগ্রহ-বহ্নি জ্বলিতেছে সমাজেতে,—
কি স্বার্থের ভীষণ সঙ্ঘাত !
ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, দুই বিদ্যুৎ-অগ্নি পূর্ণ মেঘ
ছুটেছে কি বেগে খরতর
আঘাতিতে পরস্পরে, মত্ত আধিপত্য তরে,—
নিবারিতে বাড়া'বে না কর ?
ধর্ম্মেও মোহান্ধ নর কামনার মরীচিকা
নিরন্তর করি অনুসার,
কি দারুণ দুঃখভোগ করিতেছে নিরন্তর,—
কাঁদে না কি হৃদয় তোমার ?
নহে বেদ পূর্ণ ধর্ম্ম ; যজ্ঞ নহে পূর্ণ কর্ম্ম ;
ধর্ম্ম কৃষ্ণ। সর্ব্বভূত-হিত।
তাহার সাধন কর্ম্ম, নারায়ণে কর্ম্ম-ফল
ভক্তিভরে করি সমর্পিত।
উত্তীর্ণ কিশোর তব, হও কর্ম্মে অগ্রসর,
জগত করিছে আবাহন
কাতর করুণ কণ্ঠে ; হও অগ্রসর, কর
জগতের দুঃখ বিমোচন !"
নীরবিলা বাসুদেব। নীরব শিবির।
নীরবে মহর্ষি ব্যাস বসি অধোমুখে

চিন্তামগ্ন, চিত্রবৎ। নীরব নিশীথ।
নীরবে জ্বলিছে ধীরে সুবাস প্রদীপ।
নীরবে কেশব ধীরে আনত বদনে
ভ্রমিছেন। শোভিতেছে পবিত্র গৈরিক
পরিধানে, অংসোপরে উত্তরীয় মত।
নাহি অস্ত্র-চিহ্নমাত্র কৃষ্ণের শিবিরে।
শোভিতেছে একদিকে বসন ভূষণ
সারথির, অন্যদিকে গ্রন্থ অগণন।

কৃষ্ণ। অধ্যয়ন অস্ত্রশিক্ষা অবসরে এইরূপে
শুনিতাম করুণ সঙ্গীত।
কে গায়, কোথায় গায়, এইরূপে কিশোরের
ক্ষুদ্রপ্রাণ করি আকুলিত?
কে গায়? কেমনে হায়! করিবে রাখালশিশু
জগতের দুঃখ বিমোচন?
কেমনে পতঙ্গ ক্ষুদ্র বেদরূপী হিমাচল
করিবেক করে উত্তোলন?
বেদভারে প্রপীড়িত, যজ্ঞধূমে মেঘাচ্ছন্ন,
উষ্ণজীব-শোণিতে প্লাবিত,
প্রদীপ্ত কামনানলে ভারতে করিবে হায়!
এই মহাধর্ম্ম প্রচারিত!
যে দিন মহর্ষি গর্গ সেই নিয়তির রেখা
আঁকিলেন অদৃষ্ট গগনে,*
সে দিন হইতে নিত্য এই নিয়তির গীত
শুনিলাম, ভাবিতাম মনে।

---

* রৈবতকের সপ্তম সর্গ।

কথনো বৈরাগ্য ঘোর ভাসিয়া উঠিত প্রাণে ;
ভাবিতাম ত্যজিয়ে সংসার
সন্ন্যাস গ্রহণ করি করিব নির্ব্বাণ দুঃখ,
নব ধর্ম্ম করিয়া প্রচার।
কিন্তু দেখিলাম ঊর্দ্ধে, দেখিলাম চারিদিকে,
কি জগৎ অনন্ত বিস্তার।
সুখ সৌন্দর্য্যেতে ভরা, কর্ম্মের সঙ্গীতে পূর্ণ,
কি উচ্চ অচিন্ত্য লয় তার !
গগনেতে গ্রহ তারা, ধরাতলে গিরি, গুল্ম,
তরু তৃণ নদী, পারাবার,
যেথানে যাহার সৃষ্টি, সেইখানে কর্ম্ম তার,
সেই কর্ম্ম নিয়তি তাহার।
কেবল মানব সৃষ্টি ভ্রম কি হে বিধাতার
জন্মক্ষেত্রে নাহি কর্ম্ম তার ?
এ সংসার, এই গৃহ, পিতা, মাতা, পত্নী,
সকলি কি ভ্রম বিধাতার ?
হৃদয়ের উচ্চতম পবিত্র প্রবৃত্তিচয়
দৃঢ় করে করিয়া ছেদন,
জন্মভূমি জন্মগৃহ ত্যজিয়া যাইব বনে,—
এই তব ইচ্ছা, নারায়ণ ?
পিতা, মাতা, পত্নী, পুত্র, একটি মানব, হায় !
যদি ভাল নাহি বাসিলাম,
অনন্ত মানব জাতি কেমনে বাসিব ভাল,
অনন্ত অচিন্ত্য ভগবান
আপনার জন্মভূমি, জননীর স্নেহ ক্রোড়,
রঙ্গভূমি কৈশোর ক্রীড়ার,

নাহি ভাল বাসি ; বিশ্ব কেমনে বাসিব ভাল,
অচিন্ত্য অতীত কল্পনার ?
ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী গর্ভে জনমিয়া ভাগীরথী
পায় তবে সাগর সঙ্গম।
অঙ্কুর হইতে ক্ষুদ্র জনমিয়া মহীরুহ
করে তবে আচ্ছন্ন কানন।
গৃহ ছাড়ি গেলে বনে, মনের কামনা শত
অনায়াসে হয় কি বিলীন ?
বিশাল কণ্টক-তরু করিলে কি স্থানান্তর
হয় তাহা কণ্টকবিহীন ?
সংসারের প্রলোভন কামনা করে সৃজন,
করিয়া ইন্দ্রিয় বিমোহিত।
প্রবেশি নির্জ্জন বনে ইন্দ্রিয় করিলে ধ্বংস,
কামাগ্নি কি হবে নির্ব্বাপিত ?
অন্ধের কি দর্শনের, বধিরের শ্রবণের
নাহি থাকে কামনা প্রবল ?
চক্ষু হীন, কর্ণ হীন, হলে কি মানবজাতি
পরমার্থ লভিত কেবল ?
হরি। হরি! মানবের ধারণের,—ধরমের,—
এই পথ নহে কদাচিত।
ধ্বংসের ও অধর্ম্মের এই পথ ঘোরতর,—
দেখি প্রাণ হইল ব্যথিত।
ইন্দ্রিয়, কামনা, ধ্বংস করি যদি, মানবের
মানবত্ব কিসে থাকে আর ?
পাদপের পাদপত্ব থাকে কিসে, ফল পুষ্প,
শাখা, পত্র, করিলে সংহার ?

শরীর, ইন্দ্রিয়চয়, মানবের অদ্বিতীয়
সুখের ও শিক্ষার সোপান।
কামনা ইন্দ্রিয়-জাত মানবের সুখ পথে
অদ্বিতীয় কর্ম্মের নিদান।
স্রষ্টা কি কামনা-হীন? চেয়ে দেখ মহাসৃষ্টি।
বিশ্ব-সুখ কামনা তাঁহার
ঘোষিতেছে মহাবিশ্ব, অনন্ত প্লাবিয়া কণ্ঠে,—
এ কামনা অশ্রান্ত অপার!
এ কামনা-সিন্ধু গর্ভে, কামনা-জাহ্নবী নর
শত মুখে করিয়া বিলীন,
করি ক্ষুদ্র মানবের অতি ক্ষুদ্র আত্ম-সুখ
জগতের সুখের অধীন,
উন্মেষিয়া আত্মশক্তি-জগতের সুখ পথে
যত নর হবে অগ্রসর,
আপন সুখের তার সিন্ধুমুখী নদ মত
ক্রমশঃ বাড়িবে পরিসর।
কামনা জগত-হিত, সাধনা জগত-হিত,—
এক মাত্র ধর্ম্ম সনাতন
মানবের গৃহে, বনে; ধর্ম্মক্ষেত্র শ্রেষ্ঠতর,—
বন নহে,—গৃহের প্রাঙ্গণ।
পিতা, মাতা, পত্নী, পুত্র, গৃহ, এই ধর্ম্ম-পথে
কিবা অবলম্বন সুন্দর!
তাহে ভর করি উঠি দেখে সুখ-স্বর্গ নর,
নারায়ণ সুখের সাগর।
চলিলাম গৃহে, প্রভু! মানবের ধর্ম্ম-ক্ষেত্রে
করি গৃহ অভ্যন্তরে বাস,

কামনা জগত-হিত, সাধনা জগত-হিত,
বুঝিলাম প্রকৃত সন্ন্যাস।
চলিলাম গৃহে, প্রভু! গৃহ এই মহাবিশ্ব,
বিশ্ববাসী মহাপরিবার!
এক মহা প্রাণে অনুপ্রাণিত অনন্ত বিশ্ব;
এক প্রাণ অনন্ত আধার।
এক মহা পিপাসায় আকুল অনন্ত বিশ্ব;
সুখ সেই পিপাসার ধন!
কামনার পুষ্পেপুষ্পে মত্ত মধুকর মত
করে নর সুখ অন্বেষণ।
জল-সিন্ধু সুখ যাহা, জল-বিন্দু সুখ তাহা,
নাহি সুখ দ্বিতীয় তাহার,—
এই মহা সুখ-তত্ত্ব না জানিয়া, দুঃখপূর্ণ
জগত করিছে হাহাকার।
যে অনন্ত নীতিচক্রে মানুষের মনুষ্যত্ব
করিতেছে ধারণ, বৰ্দ্ধন,
তাহাই মানবধৰ্ম্ম; তাহার শিক্ষক—শাস্ত্র,
কর্ম্ম ধৰ্ম্ম-শিক্ষা ও পালন।
এই মনুষ্যত্ব গতি কি অনন্ত সিন্ধু-মুখে!
সিন্ধু—চিদানন্দ নারায়ণ!
অনন্ত এ মনুষ্যত্ব, অনন্ত মানব সুখ,
মোক্ষ সেই সাগর-সঙ্গম।
চলিলাম গৃহে প্রভু, এই মহা সুখ-তত্ত্ব,—
নব ধৰ্ম্ম,—করিয়া প্রচার,
দেখাইয়া কুত্রাদর্শ, ঘোর দুখার্ণব হ'তে
এ জগত করিতে উদ্ধার।

কিন্তু কি দুরূহ ব্রত ! জানি নাহি কুরুক্ষেত্র
কর্ম্মক্ষেত্র হইবে আমার !
মানবের মুক্তিপথে এই দাবানল ঘোর !—
নারায়ণ কি লীলা তোমার !

ব্যাস। বাসুদেব ! বজ্রাঘাত, ঝটিকা ভীষণ,
মহাসংহারক মূর্ত্তি ঘোর দাবানল,
প্লাবন ভীষণ, নিত্য করি দরশন
জগতের সাধিছে কি অচিন্ত্য মঙ্গল !
এই মহা বজ্রাঘাত, ঝটিকা তুমুল,
করিবে ভারতাকাশ পবিত্র নির্ম্মল।
কু-বৃক্ষ কণ্টক বন দহিয়া আমূল,
উর্ব্বর সুবৃক্ষ-ক্ষেত্র করিবে অনল।
এ প্লাবনে প্রসারিয়া পবিত্র পঙ্কল,
সঞ্চারিবে নব শক্তি, নব ধর্ম্ম বল।

কৃষ্ণ। "মানবের দৃষ্ট ক্ষুদ্র, অদৃষ্ট অনন্ত"—
মহর্ষির মহাবাক্য অব্যর্থ, অমর।
মানব খদ্যোত ক্ষুদ্র অনন্ত তিমিরে
অদৃষ্টের করে ক্রীড়া করে হাস্যকর।
কোথায় অনন্ত শান্তি করিব স্থাপন,
কোথায় ঘটিল এই অনন্ত সমর।
কোথায় হাসিবে শূন্যে শান্তি সুধাকর,
কোথায় ঝটিকা এই বহে ভয়ঙ্কর !
কোথায় করিব ধর্ম্ম-সাম্রাজ্য স্থাপন,
কোথায় এ অধর্ম্মের বিপ্লব ভীষণ !
দেখিলে কণ্টক এক চরণে কাহার,
কি বিষম ব্যথা পাই মরমে মরমে !

একাদশ দিন এই হত্যা, হাহাকার,
সহিতেছি হায়! আমি অম্লান বদনে।
আমি যেন অবিদীর্ণ আগ্নেয় ভূধর,—
সৌম্য মূর্ত্তি, বহ্নি হৃদে কি গৈরিক ঝড়!

ব্যাস। অনন্ত মঙ্গলময়, অনন্ত করুণালয়,
অনন্ত জ্ঞানের পারাবার,
বৎস! যেই নারায়ণ, তাঁহার সৃষ্টিতে নিত্য
কত হত্যা, কত হাহাকার!
তথাপি তাঁহার মুখ, কি প্রসন্ন প্রীতিময়,
কি অনন্ত প্রেমের দর্পণ।
আপনি দেখিছ তুমি; কে দেখিতে পায় আর
এ জগতে তোমার মতন?
ভবিষ্যত কণ্ঠ, প্লাবি বর্ত্তমান হাহাকার,
করিতেছ আপনি শ্রবণ;
দেখিতেছ, অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী পৃষ্ঠদেশে
কত অক্ষৌহিণী অগণন।
গলদশ্রু তুনয়ন কহিলেন নারায়ণ—
"দেখিতেছি সেই মুখ কৃপায় তোমার।
বসি অর্জ্জুনের রথে কুরুক্ষেত্রে, গুরুদেব!
সেই মুখ বিনা কিছু নাহি দেখি আর।
কিছু নাহি শুনি আর বিনা ভবিষ্যত-কণ্ঠ;
অনন্ত নরের সেই গীত করুণার
কহিতেছে—'দয়াময়! দেখ দুঃখময় ধরা,
ধরার এ দুঃখ-ভার করিয়া মোচন
কর কৃষ্ণ! আমাদের উদ্ধার সাধন।
কি করুণ হাহাকার!"—কাঁদিয়া কহিলা হরি,

কাঁদিলেন নিজে দ্বৈপায়ন,—
"জগতের এই দুঃখ !—বিদরে হৃদয়, নাথ
হইল না, হবে না মোচন।"

ব্যাস। হতেছে, হইবে ; কৃষ্ণ আবির্ভূত ; দ্বাপর হতেছে শেষ ;
নব অবতার, নব যুগ ধর্ম্ম, করিতেছে পরবেশ !
সাধুদের ত্রাণ, দুষ্কৃত দমন, অধর্ম্ম হতেছে ক্ষয়,
এই কুরুক্ষেত্রে, ধর্ম্মের সাম্রাজ্য, হইতেছে সমুদয়।
এই নরমেধ করি সমাপন, সাম্রাজ্য করি স্থাপন,
অর্জ্জুন-সারথ্য ত্যজিয়া জগৎ-সারথ্য কর গ্রহণ।

কৃষ্ণ। হরি ! হরি। কে জানিত ভীষ্ম দ্রোণ হায় !
হয়ে ঘোর অধর্ম্মের সারথি এখন,
এইরূপ নরমেধ করি সংঘটন,
মানব-শোণিত-স্রোত ভাসাবে ধরায়।
ভীষ্মের ভীষণ দশ দিবসের রণ,—
মৃত্যুর ভীষণ ক্রীড়া,—করিলে স্মরণ
হৃদয় বিদরে শোকে ; আবার এখন
করিছেন দ্রোণাচার্য্য কি রণ ভীষণ !
রথী ধনঞ্জয়, আমি সারথি তাহার,—
ভেবেছিনু দুই দিনে এই বজ্রানল
নিবিবে, ভস্মিয়া মহা মহীরুহচয়
বিপক্ষের, রক্ষা পাবে তৃণগুল্ম দল !
কিন্তু জানি নাহি হায় ! অর্জ্জুন-হৃদয়ে
কি করুণা পারাবার ! বাড়বাগ্নি মত
যদিও ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম জ্বলে নিরন্তর,
তথাপি পার্থের কর করুণায় শ্লথ।
রূপে নবজলধর, বীরত্বেও হায় !
নবজলধর পার্থ। জীমূত-গর্জ্জন

গাণ্ডীব-টঙ্কার, বজ্র সায়ক নিচয় ;
করুণা-সলিলে সিক্ত শর, শরাসন।
নয়নে অনল, হৃদে জল সুশীতল,
বাহুতে অজেয় বল, হৃদয় দুর্ব্বল।
যদি কোনো ঘটনার ভীষণ আঘাত
নাহি করে এ হৃদয় কুলিশ কঠিন,
এইরূপে দ্রোণাচার্য্য মৃত্যু-অভিনয়
বিভীষণ, করিবেক আরো কত দিন!
গুরুভক্ত ধনঞ্জয় করুণ-হৃদয়,
করে গুরু সহ মাত্র রণ-অভিনয়।

ব্যাস। প্রচণ্ড ঝটিকা, কৃষ্ণ! প্রচণ্ড অনল,
হয় আশু নির্ব্বাপিত,—নীতি নিয়ন্তার।
এই মহা যুদ্ধানল,
ভস্মিয়া অধর্ম্ম বল,
নিবিবে অচিরে ; নব ধর্ম্ম-সুধাকর
উদিবে শীতল, শান্তি পা'বে চরাচর

কৃষ্ণ। নাহি অন্য মেঘ ছায়া সম্মুখে কি আর ?

ব্যাস। আছে,—আছে মেঘমালা দুর্ব্বাসাপ্রমুখ।
এই দীর্ঘকাল আমি
বেড়াইয়া স্থানে স্থানে
দেখিয়াছি এই মেঘ হতেছে সঞ্চার
ধীরে ধীরে, ধীরে ধীরে লভিছে বিস্তার।
উড়াইয়া তৃণচয়,
বায়ু কোন দিকে বয়,
চেয়েছি বুঝিতে, আমি বুঝেছি নিশ্চয়
এই শরতের মেঘ রহিবার নয়!

জগতের শীর্ষস্থল
ব্যাপি যেই হিমাচল—
অনন্ত গগনস্পর্শী—উঠিছে ভাসিয়া,
যে পুণ্য উত্তরানিল উঠিছে জাগিয়া,
পবিত্র নিশ্বাসে তার
সুশীতল পুণ্যাসার
তাপিত মানব প্রাণে করি বরিষণ,
নিবে উড়াইয়া মেঘ, রবে কতক্ষণ ?

কৃষ্ণ। নারায়ণ !
অর্জ্জুন তোমার চক্র, শঙ্খ দ্বৈপায়ন।
তব ধর্ম্ম মন্দিরের
ধনঞ্জয় ভুজবলে
করিতেছে কুরুক্ষেত্রে পরিখা খনন ;
বিশ্বকর্ম্মা দ্বৈপায়ন
করিবেন জ্ঞান বলে
এই পরিখায় তব মন্দির সৃজন।
মহর্ষির কম্বু কণ্ঠ
প্লাবিয়া অনন্ত কাল,
অনন্ত মানব যাত্রী করি আবাহন
ত্রিপথে, দেখাবে এই শান্তি নিকেতন।
অর্জ্জুনের কুরুক্ষেত্র
হইতেছে অন্তর্হিত ;
মহর্ষির কর্ম্মক্ষেত্র, অনন্ত বিস্তার,
হইতেছে প্রসারিত ;
দুষ্কৃত দমন ব্রত
অর্জ্জুনের, মহর্ষির সুকৃত উদ্ধার।

তাঁহার গাণ্ডীব,—জ্ঞান ; অস্ত্র,—তত্ত্বরাশি ;
অক্ষয় কবচ,—গীতা, নিত্য অবিনাশী।
সসৈন্যে মহর্ষি এবে
হউন রণে অগ্রসর ;
চক্রে ওই অধর্ম্মের করিছে সংহার ;
আনন্দে করুক শঙ্খ ধর্ম্মের প্রচার।
ব্যাস! তোমারই শঙ্খ, চক্র, কবচ তোমার।
চালাইবে চক্র, শঙ্খ বাজাবে যেমন ;
চলিবে বাজিবে তথা ;
পার্থ, দ্বৈপায়ন,
তব করধৃত অস্ত্র, যুগল ভূষণ।
শুনিলাম যেই দিন
অপূর্ব্ব স্বর্গীয় শিশু
বৃন্দাবনে ইন্দ্র যজ্ঞ করেছে বারণ,
ভক্তিতে বিহ্বল গোপ গোপাঙ্গনাগণ ;
দেবভাবে আকর্ষণ
করিতেছে প্রাণ মন,
পত্নী পতি ছাড়ি, মাতা কোলের সন্তান,
ছুটিছে পশ্চাতে ভক্তি উচ্ছ্বসিত প্রাণ।
বুঝিলাম সেই দিন
দ্বাপর হতেছে শেষ,
জগতের নবযুগ হতেছে সঞ্চার,
আবির্ভূত বৃন্দাবনে যুগ অবতার।
সেই দিন হ'তে ব্যাস
তোমার মহিমাধ্যান
করিতেছে নিরন্তর, আত্ম সমর্পণ

করিয়াছে তব পদে, নর-নারায়ণ!
কেবল তোমার লীলা
করিবারে দরশন,
করেছে প্রভাস-তীরে দ্বিতীয় আশ্রম!
অদূরে কুটীর ক্ষুদ্র
করিয়াছে নিরমাণ
কুরুক্ষেত্রে তব লীলা করিতে দর্শন।
একমাত্র কর্ম্ম তার,
না জানে দ্বিতীয় আর,
গাইবে ভকতি ভরে তব ভাগবত;
গাইবে মহিমাপূর্ণ এ মহাভারত।

ত্রয়োদশ সর্গ।

—*—

সম্মিলন।

—*—

দ্বিতীয় প্রহর নিশি; নির্ম্মল আকাশে
ভাসে নিরমল শশী নব হেমন্তের;
ধীরে নব হেমন্তের বহে সমীরণ
সুশীতল; কুরুক্ষেত্র নীরব নিদ্রিত।
"কি শান্তির মহামূর্ত্তি"—চাহি চন্দ্র পানে
কহে দ্বৈপায়ন-শিষ্য ভ্রমি ধীরে ধীরে—

"কি শান্তির মহামূর্ত্তি অনন্ত আকাশ—
নীরব, নিদ্রিত! নীচে নীরব, নিদ্রিত
কুরুক্ষেত্র কি বিরাট মূর্ত্তি অশান্তির!
বিরাট রাক্ষস-মূর্ত্তি বীরত্ব ভীষণ
ভারতের, দিবসেতে জীমূত নির্ঘোষে
গরজি অসংখ্য কণ্ঠে, সংখ্যাতীত ভুজে
প্রহারি অসংখ্য বজ্র, অসংখ্য চরণে
বীর দর্পে বসুন্ধরা করিয়া কম্পিত,
যোজন যোজনান্তর বিরাট শরীরে
ব্যাপি আত্মঘাতী এবে নীরব নিদ্রিত,—
ঝটিকান্তে সুপ্ত মহা পারাবার মত!
হায় মা! হায় মা! শিবে! শান্তিস্বরূপিণি!
দিবসে তুমি মা গৌরী, মা গো রজনীতে
কৃষ্ণভাগে তুমি কালী, শুক্ল ভাগে শুভ্রা
জ্যোৎস্না-বরণী মা গো তুমি সরস্বতী—
সর্ব্বত্র তোমার মুখ কি শান্ত সুন্দর!
তবে কেন তব এই জগতে, জননি!
এতই অশান্তি আহা! এত বজ্র, ঝড়?
সর্ব্বাণি! সর্ব্বেশে! সর্ব্বশক্তিসমন্বিতে!
জানি তুমি নিত্যা, আর অনিত্য জগত।
কিন্তু করিলে না কেন জগত তোমার
অনন্ত শান্তির ছায়া? শান্তিতে জন্মিয়া,
শান্তিতে এ পান্থশালে কাটিয়া দুদিন,
যাইত তোমার বক্ষে শান্তিতে মিশিয়া?
আপনি করুণাময়ী, সহ মা কেমনে
জগতের এত দুঃখ? প্রচণ্ড অনলে

পুড়িছ কেমনে হায়! পতঙ্গের মত
বিপুল ক্ষত্রিয় কুল? পুড়িছ বাসুকি,
অভাগিনী জরৎকারু? পুড়িছ দুর্ব্বাসা?
ঋষি কুলে ধূমকেতু, জ্বলন্ত বিদ্বেষ,
মহাক্রোধ মূর্ত্তিমন্ত, সৃজিলে কেমনে?
ভীষ্মের শিবির দ্বারে দিলেন বিদায়
মহর্ষি, যাইতেছিনু আশ্রমে অদূরে,
দেখিনু যোগিনী এক কৌরব শিবিরে
যাইতেছে, অলক্ষিতে চলিনু পশ্চাতে,—
কি যে অমঙ্গল ছায়া পড়িল হৃদয়ে!
একি দেখিলাম হায়! একি শুনিলাম!
কি স্বর্গ ছায়ায় কিবা নরক ভীষণ!
সুভদ্রার সেই দয়া, ধৈর্য্য গোবিন্দের,
কারুর নিরাশা মরু, ষড়যন্ত্র ঘোর
নিশীথে নিবিড় বনে কর্ণ দুর্ব্বাসার;—
আকাশ পড়িল ভাঙ্গি মস্তকে আমার।
বাছা! তুই বারি বিন্দু ত্রিদিব প্রসূত
পড়েছিলি আমি ক্ষুদ্র শুক্তির হৃদয়ে!
আমার হৃদয়-মুক্তা হৃদয় চিরিয়া
নিতেছে কাড়িয়া হায়! নির্দ্দয় তস্কর,—
সহিব কেমনে আমি? হায় বাছা মোর!"—
কাঁদিতে লাগিল শোকে উন্মত্ত হৃদয়ে
নীরব, নিদ্রিত, চন্দ্র-প্রদীপ্ত-প্রান্তরে।
"যাব নারায়ণ কাছে।— হায় হিমাদ্রির
পদমূলে পিপীলিকা, সিন্ধু পদতলে
বালুকা, দুঃখের কথা কহিবে কেমনে?

যিনি অন্তর্য্যামী, যাঁর জ্ঞানের নয়নে
জগতের তত্ত্ব রাশি মুক্ত, অবারিত,
এই ষড়যন্ত্র হায়! লুকাব কেমনে
তাঁর কাছে দুর্ব্বাসার? হইলে প্রকাশ
নাগরাজ্য উদ্ধারের ব্রত বাসুকির
ডুবিবে অতল জলে সহ বাসুকির,—
থাকিবে না অনার্য্যের একটি আশ্রয়!
যাইব পার্থের কাছে—যাইব কেমনে?
তাঁর অনুতাপানল উঠিবে জ্বলিয়া
দেখিলে আমারে, করুণ হৃদয়ে
পাইবেন নাথ কিবা ব্যথা নিদারুণ!
যাব কুমারের কাছে।—পারিব কি হায়!
নিবারিতে তারে আমি? তরুণ ভাস্কর
উঠিছে ক্ষত্রিয়াকাশে আলোকে পূরিয়া
দশ দিশ, নিবারিতে পারিব কি আমি?
দেখেছি নক্ষত্র মত, মত্ত মৃগয়ায়
ঘোর বিপদের মুখে যাইতে ছুটিয়া
হাসি উচ্চ বাল-হাসি। করিলে বারণ
গলা জড়াইয়া ধরি কহিত হাসিয়া—
'তুই মম বনমাতা; কি ভয় আমার
মৃগয়া আমার ক্রীড়া। দেখ্ দাঁড়াইয়া
এখনি কেমন খেলা আসিব খেলিয়া।
হাস্ মা! হাস্ মা! তোর হাসি আদরের
কি সুন্দর! কাঁদিবি ত দিব গালে চড়!"
স্মৃতিতে ভিজিল চক্ষু। চিন্তি কিছুক্ষণ—
"নিবারিতে নাহি পারি,—আশঙ্কা অজ্ঞাত

ছাইবে হৃদয়, বল হরিবে বাহুর ;
করিবেক সিংহ-শিশু বিষাক্ত দুর্ব্বল।
না, না, যাব দয়াময়ী সুভদ্রার কাছে !
মায়ের করুণ প্রাণ হইবে কাতর,
করিবে বারণ, আশা হইবে সফল।
গুরুদেব ! পরীক্ষিতে হৃদয় আমার
পাঠাইলে অপরাহ্নে ভদ্রার শিবিরে ?
আনন্দে তোমার আজ্ঞা করিনু পালন
ততোধিক গুরুতর পরীক্ষা কঠিন
লইব ; হৃদয় ! চল যাইব যথায়
নিদ্রিতা পার্থের বক্ষে, ত্রিদিবে আমার,
প্রেমময়ী ভদ্রা দেবী, নিদ্রিতা এখন
স্থিরা হিরণ্বতী বক্ষে জ্যোৎস্না যেমন।
দেখিব একটি শিরা কাঁপে কি তোমার,
পড়ে কি না অণুমাত্র ছায়া কামনার
তোমার তরল বক্ষে। রমণী হৃদয়
তরল সলিল মত ; সলিলের মত
দেখিব হয় কি তাহা নির্ম্মল, নিশ্চল।"
পার্থের শিবির পানে ছুটিল সবেগে।
দ্বৈপায়ন শিষ্য !—দ্বার ছাড়িল প্রহরী
সসম্ভ্রমে ; প্রবেশিয়া শিবিরে তখন
অপূর্ব্ব যোগিনী বেশ করিল গ্রহণ।
জ্বলিছে সুগন্ধ দীপ সুবর্ণ আধারে।
সুবর্ণ পর্য্যঙ্ক অঙ্কে সুবর্ণ প্রতিমা
সুষুপ্তা সুভদ্রা দেবী, নীলমণি ময়
বীরমূর্ত্তি নিরুপম সুপ্ত ধনঞ্জয়।

শোভিতেছে সুভদ্রার অতুল বদন
পতি বক্ষে, নীলাকাশে পূর্ণ শশধর,—
মানস-সরসে যেন একটি কমল।
আলিঙ্গিয়া পরস্পরে, মেঘ জ্যোৎস্নায়,
উভয়ে উভয় মুখ চাহিয়া চাহিয়া
নিদ্রাগত। নিদ্রাতেও অধরে অধরে
রয়েছে ঈষদ হাসি চারু চিত্রাঙ্কিত।
আলিঙ্গি সৌন্দর্য্যে শৌর্য্য, হিমাদ্রি জাহ্নবী,
সুবর্ণ শিঞ্জিনী নীলমণি-শরাসন,
দয়া ধর্ম্ম, পুণ্য প্রীতি, স্বর্গ মন্দাকিনী,
উভয় উভয়-ধ্যানে মোহিত যেমন।
ঈষৎ কাঁপিল চক্ষু, সংযত হৃদয়
যোগিনীর, অলক্ষিত কাঁপিল ভূতল
অনন্ত ভূধর ভারে স্থির অবিচল।
দুই হাতে চাপি বক্ষ, জানু পাতি ভূমে
চাহি ঊর্দ্ধ পানে কহে—"হা হত হৃদয়!
একি কম্প কামনার? না, না, প্রাণনাথ
করিয়াছি চতুর্দ্দশ বৎসর তোমার
আরাধনা; দেও শান্তি, শান্তি পূর্ণ বুকে
নিরখিব দেবমূর্ত্তি মম তপস্যার।"
উঠিল; মুহূর্ত্ত বামা নয়ন ভরিয়া
দেখিল যুগল রূপ। হৃদয় এখন
ভক্তি ভরে অবিচল; নীলাব্জ বদন
শান্ত, স্থির; আনন্দাশ্রু পূর্ণ দুনয়ন।
মুহূর্ত্ত,—মুহূর্ত্ত পরে কর-নীলোৎপল
অরপিল রক্তোৎপল ভদ্রার চরণে॥

চমকি বসিলা ভদ্রা, রহিলা চাহিয়া
উভয় উভয় পানে। উভয় মোহিতা
উভয়ের দরশনে, চাহি পরস্পরে,—
জ্যোৎস্না জ্যোৎস্না-মাখা সরসী নীলিমা;
জ্যোৎস্না প্রদীপ্তা স্থিরা জাহ্নবী যমুনা;
যোগিনী ও যোগারাধ্যা, শান্তি তপস্যায়,
বনদেবী গৃহলক্ষ্মী; দয়া দরিদ্রতা।
চাহি পরস্পরে যেন প্রীতি নিষ্কামতা,
প্রেমময়ী উদাসিনী, প্রতিভা কল্পনা।
অধরে যোগিনী করি অঙ্গুলি নিবেশ
করিলে সঙ্কেত,– ভদ্রা দেখিলা সে মুখ
পুণ্যের পবিত্রাকাশ—জড়াইয়া তারে
আদরে লইয়া বক্ষে চলিলা বাহিরে,
অদূরে জ্যোৎস্নাময়ী হিরণ্বতী তীরে।
উদ্বেলিত উচ্ছ্বসিত ভদ্রার হৃদয়
করুণার সিন্ধু; দৃঢ় আলিঙ্গনে বক্ষে
লইয়া তাহারে ভদ্রা কাঁদিলা নীরবে।
কাঁদিল নীরবে সেই স্বর্গে তপস্বিনী
লুকাইয়া মুখ। অশ্রু কত রূপান্তর!—
শোকাশ্রু ভদ্রার, সুখ-অশ্রু যোগিনীর।
ভদ্রা চাহে বুক চিরি সেই মুখখানি
রাখে বুকে চিরদিন। চাহে তপস্বিনী
চিরি বুক সেই বুকে, স্নেহের ত্রিদিবে,
পড়ে ঘুমাইয়া সুখে চিরদিন তরে।
স্নেহ-তরলিত কণ্ঠে কিছুক্ষণ পরে
কহিলা উচ্ছ্বাসে ভদ্রা—"শৈলজে! ভগিনি!

চির অভাগিনি !"—কথা সরিল না আর।
কিছুক্ষণ পরে শৈল করিল উত্তর,
বক্ষে লুকাইয়া মুখ,—"সে কি কথা দেবি !
ভদ্রার ভগিনী, স্নেহ ভাগিনী পার্থের
অভাগিনী যদি, তবে সুভাগিনী আর
কে আছে জগতে, দিদি ! শৈলজা তোমার
বড় ভাগ্যবতী, বড় ভাগ্যবতী যথা
নির্গন্ধ অপরাজিতা দেবপদাশ্রিতা।"
অপরাজিতার সেই ক্ষুদ্র মুখখানি
তুলিলেন ভদ্রা স্নেহে; চন্দ্র করতলে
দেখিলেন আনন্দাশ্রু যুগল নয়নে,
ঈষৎ আনন্দ হাসি ভাসিছে অধরে
সেই মুখ শান্ত, শান্ত শোভিতেছে যেন
চন্দ্রাভ আকাশ খণ্ড হৃদয়ে তাঁহার।
চুম্বিলা আদরে ভদ্রা সেই মুখখানি !
সে চুম্বনে কত স্নেহ ! কি সুধা শীতল
বহিল দুইটী প্রাণে ! অতৃপ্ত নয়নে
উভয় উভয় পানে রহিলা চাহিয়া।
"শৈল। শৈল !"—বলি ভদ্রা স্মৃতির উচ্ছ্বাসে
আত্ম-হারা চুম্বিলেন আবার আবার
সেই ক্ষুদ্র মুখখানি,—শৈলের কি স্বর্গ !
কহিলেন—"বল্ দিদি ! থাকিবি এরূপে,—
থাকিবি আমার বুকে ;—ছাড়ি আমাদের
আর যাইবি না ;— আমি দিব না যাইতে।"
চন্দ্রকর আস্তরণ বকুল তলায়
প্রসারিত, দুইজন বসিয়া তথায়

আলিঙ্গিয়া পরস্পরে। বাম অংসোপরে
সুভদ্রার অধোমুখ আছে শৈলজার।
চাহি শূন্য পানে ভদ্রা কহিতে লাগিলা--
"চতুর্দ্দশ বর্ষ আজি, প্রতিমা রে তোর
পূজিয়াছি নিরন্তর হৃদয়ে দুজনে।
স্মৃতিতে শোকাশ্রু কত করিয়া মিশ্রিত,
কত বর্ণে সে প্রতিমা করেছি চিত্রিত।
কভু ভাবিতাম তুই অস্ত্রে বাসুকির
নিহতা, আকুল প্রাণে কাঁদিতাম কত,
বৎসহারা বন-মৃগ-দম্পতির মত।
পুনঃ ভাবিতাম নহে নিষ্ঠুর এমন
নারায়ণ, এই বন-মল্লিকা তাঁহার
করিয়া অদৃশ্যে পুণ্য-সৌরভ বিস্তার,
তাপিত মানব প্রাণ করিছে শীতল ;—
এ জীবনে এক দিন পাব দরশন।
স্মৃতির আলেখ্য শৈল ধরিয়া নয়নে,
আঁকি দুই জনে তব চারু চিত্রপট,
রাখিয়াছি শয্যাগৃহে। আঁকিতে সে ছবি
কত অশ্রু দুই জন করেছি বর্ষণ।
সেই চিত্রে, এই চিত্রে কতই অন্তর!
সে নীলাব্জ-কলি আজি ফুটন্ত নলিনী ;
সে পঞ্চমী আজি কিবা পূর্ণিমা রজনী!
এই পবিত্রতা, প্রেম, শান্তি, সরলতা,
কে পারে চিত্রিতে,—এই প্রাণ-কোমলতা?
এ কোমল প্রাণে, এই কোমল শরীরে,
বেড়াইয়া বনে বনে হায়! বাণ-বিদ্ধ

বন-কুরঙ্গিণী মত, কি দুঃখ দারুণ
না জানি সহিলি বোন্! আয় বুকে আয়,
ভদ্রার্জ্জুন ক্ষতপ্রাণে ঢালি প্রেম ধারা
জুড়াইবে তোর প্রাণ, প্রাণ আপনার।
বিদগ্ধ খাণ্ডব বন; তব পিতৃ-ভূমি
সমুদ্ধৃত; পিতৃ-পুরী তব পুরাতন
করিয়াছে নিরমাণ, পার্থের আদেশে,
তোমার পিতৃব্য ময় শিল্পি-চূড়ামণি।
মরকত মূর্ত্তি হয়েছে স্থাপিত
সে পুরীতে; সেই স্থান করিয়া গ্রহণ
পরিতাপ তুষানল কর নির্ব্বাপিত
অর্জ্জুনের সুভদ্রার। এই যুদ্ধ শেষে
কিংবা চল ইন্দ্রপ্রস্থে, চল প্রেমময়
অর্জ্জুনের বুকে, এই বুকে সুভদ্রার।"
আবার আঁটিয়া ভদ্রা লইলেন
বুকে নাগ-নন্দিনীরে; কাঁদিলা আবার
দুই জন; ভদ্রা শোকে, সুখে নাগবালা।
কিছুক্ষণ সেই স্বর্গে রহিয়া নীরবে
উত্তরিল শৈল ধীরে—"দিদি! তোমাদের
চরণ যুগল স্বপ্ন-স্বর্গ শৈলজার।
সফল তপস্যা তার। কিন্তু কহ হায়!
কেবল কি বনে দুঃখ, গৃহে দিদি! সুখ,—
এই কুরুক্ষেত্র হায়! প্রাঙ্গণে যাহার!"
কি প্রশ্ন? ভদ্রার মুখ হইল গম্ভীর।
কেন শৈলজার মুখ শান্তির ত্রিদিব
বুঝিলা ঈষৎ। শৈল দেখিল নীরবে

অপূর্ব্ব শান্তির ছায়া চন্দ্র করতলে
ছাইল ভদ্রার মুখ। বিস্তৃত নয়ন
অলৌকিক প্রতিভায় হইল উজ্জ্বল,
ভাসিল জ্যোৎস্না যেন নীল সরোবরে;

ভদ্রা। শৈলজে! সুখের তরে আকুল জগত।
সুখ-অন্বেষণে,—স্থিতি, গতি, জগতের।
এ জগত সুখময়, নিত্য-সুখময়
নিজ বিধাতার মত। অজস্র ধারায়
ঝরে সুখ জ্যোৎস্নায়, বহে ঝটিকায়,
গর্জে জীমূতমন্দ্রে, বর্ষে বরিষায়,
গায় কোকিলের কণ্ঠে, শ্বাসে সুশীতল
মলয়ের সমীরণে, ফলে তরু দলে,
ফুটে ফুলে, ভাসে জলে, হাসে দিবালোকে।
সুখ বনে, সুখ গৃহে, সুখ সর্ব্বময়।
কেবল মানব নাহি পাইয়া সে সুখ
করিতেছে হাহাকার। মানুষের সুখ
নহে গৃহে, নহে বনে; বুঝে নাই, হায়!
নহে ধনে রাজ্যে সুখ, নহে তপস্যায়।

শৈ। বল দেবি! কিসে তবে সুখ মানুষের?

সু। জগত অনন্ত কণ্ঠে দিতেছে উত্তর
এক তানে,—বিহঙ্গের বিহঙ্গত্বে সুখ,
পশুর পশুত্বে, সুখ পুষ্পত্বে পুষ্পের;
মনুষ্যত্বে তবে বোন্! সুখ মানুষের।

শৈ। কারে বল মনুষ্যত্ব?

সু। চরিতার্থতায়
বিহঙ্গ-বৃত্তির বিহঙ্গত্ব বিহঙ্গের।

মানুষ কি নিয়া বল মানুষ, ভগিনি ?—
আত্মা, মন, কলেবর। চরিতার্থতায়
এ তিনের মনুষ্যত্ব ! যেই নীতি চয়
শারীরিক, মানসিক, বৃত্তি আধ্যাত্মিক,
—মানবের মানবত্ব,—করিছে ধারণ,
তাহাই মানবধর্ম্ম। স্বধর্ম্ম পালনে,
স্ববৃত্তির অনাসক্ত চরিতার্থতায়,
যতই মানুষ ক্রমে হয় অগ্রসর,
লভে তত মনুষ্যত্ব সুখ নিরমল।
পূর্ণ মনুষ্যত্ব,—দুঃখ-মুক্তি, নিরবাণ,
বৈকুণ্ঠ, পরম সুখ, স্বর্গ, ভগবান !

শৈ। ইহা কি বৈদিক ধর্ম্ম ?

সু। বেদধর্ম্ম, শৈল !
এই বৈকুণ্ঠের পথে প্রথম সোপান।

শৈ। এই মনুষ্যত্ব,—এই স্বধর্ম্ম,—সাধন
হয় না কি বনে দেবি !

সু। ক্ষেত্র শ্রেষ্ঠতর
এ ধর্ম্মের গৃহ, দিদি। এ মহা ধর্ম্মের
ভিত্তি লোকহিত, ভিত্তি সর্ব্বভূত হিত।

শৈ। চল তবে বনে দিদি ! হায় ! ধরাতলে
এমন প্রশস্ত ক্ষেত্র কোথা আছে আর
সাধিবারে লোকহিত ! এ ভারত ভূমি
যাহাদের পিতৃ-ভূমি, সে অনার্য্য জাতি
আজি কোথা, দেখ আহা ! কি দশা তাদের !
রাজ্যহীন, গৃহহীন, আহার-বিহীন,
আজি তারা বনে, আজি পশু নির্ব্বিশেষ।

সাম্রাজ্যে, সৌভাগ্যে, সুখে আজি আর্য্যগণ
দেবোপম, হায়! দেবি! আছে তাহাদের
কত শাস্ত্র, কত ঋষি, কতই আশ্রম,
সাধিতে অজস্র হিত; আছে তাহাদের
পার্থ ভুজাশ্রয়, স্বর্গ ভদ্রার হৃদয়,
সুখদাতা পরিত্রাতা নর-নারায়ণ।
হইয়াছে সূর্য্যোদয় আবির্ভাবে তাঁর
আর্য্যের অদৃষ্টাকাশে, পূর্ব্বাহ্ন প্রভায়
সমুজ্জ্বল আর্য্য ভূমি; অমাবস্যা ঘোর
অনার্য্যের হায়! দিদি! রবে কি এমন?
পতিত পাবন হরি,—এ পতিত জাতি
পাবে না তাঁহার দয়া? পাবে না তোমার
কি কাতর কণ্ঠ! কিবা কাতরতা মুখে!
বহিছে কি কাতরতা যুগল ধারায়
দুনয়নে! তুলি মুখ, জিজ্ঞাসিল শৈল—
"পাবে না তাঁহার দয়া? পাবে না তোমার?
বিস্মিতা, স্তম্ভিতা, ভদ্রা রহিলা চাহিয়া
সে কাতর মুখ পানে। কি যেন কি মেঘ
নয়ন হইতে গেল নিমিষে সরিয়া,
নিমিষে কি যেন স্বর্গ খুলিল নয়নে।
কহিলেন—"শৈল। শৈল! এ চৌদ্দ বছর
কোথা ছিলি, কি করিলি, এই ভগিনীরে
কহ দয়া করি।" শৈল ঈষৎ হাসিয়া,
—বরিষায় জ্যোৎস্না অশ্রুতে সে হাসি—
চাহি সুভদ্রার মুখ কহিল মধুরে—
"বড় সুখে ছিল দিদি! শৈলজা তোমার!"

সুভদ্রার অংসে পুনঃ রাখিয়া বদন,
ম্লানমুখে শূন্য-নেত্রে চাহি ধরাতল ।

শৈ । শুনিয়াছ কি নরক লইয়া হৃদয়ে
এসেছিনু রৈবতকে ! ! কি স্বর্গ লইয়া
প্রভুর চরণাম্বুজে হইনু বিদায় !
পশিনু নিবিড় বনে, ছায়ার মতন
চলিলাম,—কোন্ পথে, যেতেছি কোথায়,
কেন যাই,—নাহি জানি। উপরে আকাশ
শুভ্র মেঘে ঢাকা মরুময় ; মরুময়
নিম্নে ধরাতল ; হুহু রবে সমীরণ
যাইছে বহিয়া। এই মহা মরুভূমে
একাকিনী অনাথিনী চলিয়াছি আমি,—
আগে মরু, পিছে মরু, মরু চারিদিকে,
হুহু করিতেছে মরু প্রাণের ভিতরে।
ক্লান্ত অবসন্ন বুকে পড়িয়া ভূতলে
পড়িনু বিস্মৃতি অঙ্কে,—নিদ্রা কি মূর্চ্ছায়
নাহি জানি। ক্রমে ক্রমে উঠিল ভাসিয়া
জগত আনন্দময়, শ্যাম শোভাময়।

ফুটিল কুসুম, ছুটিল সৌরভ,
গাইল বিহঙ্গ সুখে,
মৃদুল কিরণে হাসিল ভাস্কর,
কি হাসি মানব মুখে।
দেখিলাম পার্থ বসিয়া শিয়রে
রাখি অঙ্কে মুখ মম ;
পিতৃ-স্নেহ পূর্ণ কি দুটী নয়ন—
পবিত্রতা প্রস্রবণ !

কহিছেন—"তোর পিতার শ্মশানে,
করেছি প্রতিজ্ঞা আমি,
দুহিতার মত পালিব যে তোরে,
জানেন অন্তরযামী।
অন্তর অন্তরে সৃজিয়া প্রতিমা,
পুষেছি তোরে সদায়
দুহিতার মত,— এই মহা পাপ
কেমনে করিব হায়!
দেখ পিতৃ-প্রেম অনন্ত বিস্তার
কি পবিত্র সুশীতল,
পতি-প্রেম তার কাছে তুচ্ছ কত,—
পূরিত কামনানল!"
ঈর্ষার নরক নিবিল, হৃদয়ে
ভাসিল শান্তি শীতল।
মেলিনু নয়ন, —বেলা অবসান,
শান্তি পূর্ণ ধরাতল!
মস্তক উপরে আনন্দ কাকলি
গাইছে বিহঙ্গগণ;
বসি চারি দিকে, কুরঙ্গ শশক
চাহিয়া সস্নেহ মন।
আশৈশব আমি ছায়ার মতন
ভ্রমিয়াছি বনে বনে।
কুরঙ্গ কুরঙ্গী, শশক শশকী
ভগ্নী যেন ভাবে মনে।
কুরঙ্গশাবক যাইছে ছুটিয়া
ঘ্রাণিয়া মুখ কখন,

খেলিতেছে সুখে, নাচিতেছে শিখী
আনন্দে ধরি পেখম।
সেই বন-শান্তি, সেই বন-স্নেহ,
স্বপ্ন-স্মৃতি স্নেহময়ী,
কি নব জীবন পাইলাম, যেন
আমি সেই শৈল নই।
বসিয়া আকাশ চাহি ভাবিতে লাগিনু,
কি করিব, কোথা যাব? শৈশবে জনক
কহিতেন মার কাছে—"ধর্ম্মে প্রিয়ে! সুখ;
ইন্দ্রিয় সংযম, সেই ধর্ম্মের সোপান।
নাহি চাহি রাজ্যধন। শৈলজা আমার
হইবে ধর্ম্মের রাণী, ধর্ম্মের জননী
অনার্য্যের, বিলাইয়া হরিনাম সুধা
বাঁচাবে অনার্য্য জাতি। ধর্ম্ম বিনা আর
হইবে না কোন মতে অনার্য্য উদ্ধার।"
কি করিব? কোথা যাব!—পাইনু উত্তর।
আকাশে কর্ত্তব্য রেখা দেখিনু অঙ্কিত।
জনক জননী মূর্ত্তি দেখিলাম আর
বিরাজিত সন্ধ্যাকাশে। অনাথিনী আমি,—
আশৈশব নিরজন বড় প্রিয় মম;
বড় প্রিয় বনভূমি। বসি নিরজনে
দেখিতাম ঊর্দ্ধে নীল মণিময় পটে
স্নেহময়ী মা আমার, পিতা স্নেহময়—
স্নেহের ত্রিদিবে, স্নেহ-দেবতা যুগল!
হায়! রৈবতকে দেবি! আসিনু যে দিন
পাপব্রতে, পুণ্য ছবি দেখি নাই আর।

আজি প্রেমময় মূর্ত্তি দেখিয়া আবার
সুপ্রসন্ন, কি আনন্দে ভরিল হৃদয়!
যুগল শীতল ধারা বহিল নয়নে।
বুঝিলাম দেব দেবী প্রীত মম ব্রতে।
প্রণমি সাষ্টাঙ্গে ভূমে, ডাকি ভক্তিভরে,
কহিলাম—"দেব! দেবি! দিয়া পদাশ্রয়
কন্যার কঠিন ব্রত করিও পূরণ।"
কোথা ছিনু? বিন্ধ্যাচলে। কি করিনু দেবি?
পার্থের প্রতিমা সৃজি, এ চৌদ্দ বছর
পূজিয়াছি ভক্তিভরে; এ চৌদ্দ বছর
শৈল ক্ষুদ্র সূর্য্যমুখী, পার্থ প্রভাকর॥
এ চৌদ্দ বছর ক্রমে পূজিতে পূজিতে,
সেই পতিভাব দেবি! হইল বিলীন
কি অনন্ত শান্তিপূর্ণ প্রীতি পারাবারে,
সিন্ধুমুখী গঙ্গামত! এই চরাচর
হইল অর্জ্জুনময়, হইনু তন্ময়।
কভু পার্থ পতি, আমি প্রেমে আত্মহারা,
কভু পার্থ পিতা, আমি ভক্তিতে অধীরা।
কভু পার্থ ভ্রাতা, আমি স্নেহে নিমজ্জিতা,
কভু পুত্র পার্থ, আমি বাৎসল্যে পূরিতা।
কভু পার্থ সখা, আমি সখী বিনোদিনী,
কভু পার্থ প্রভু, আমি দাসী আজ্ঞাধীনী।
কভু আমি পার্থ, পার্থ শৈলজা আমার।
অভিন্ন উভয় কভু—নদী পারাবার।
সু। কি সুন্দর উপাসনা! কি প্রেম গভীর!
উপাসক, উপাসিত, কি ধন্য উভয়!

এই প্রেম মানবের স্বর্গের সোপান।
এই প্রেমে মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ ভগবান।
আসক্তির করালতা, ছায়া কামনার,
নাহি যার প্রেমে, সেই উপাস্য আমার।

শৈ। নহে বহুদিন গত, দিদি, একদিন
আসিলেন দ্বৈপায়ন দাসীর কুটীরে,—
বন অন্তরালে যেন দেব অংশুমালী।
ফলিল তপস্যা মম। অন্তর্যামী প্রভু
চিনিলেন এ দাসীরে, কহিলেন—"শৈল!
সিদ্ধ তব পার্থ-পূজা. পূজ তুমি এবে
পার্থরূপে ভগবান, অনন্ত সুন্দর,
অনন্ত মহিমাময়, প্রেম পারাবার।
থাকে যদি কণা মাত্র কামনা-উত্তাপ
হৃদয়ে নিবিবে; শান্তি পাইবে পরম।"
কহিলাম,—"চিন্তাতীত সেই ভগবান,
বুঝিবে, পূজিবে, এই অবলা কেমনে
জ্ঞানহীনা?"

ব্যাস। "বুঝ, পূজ, ভক্তিভরে
আদর্শ মানব কৃষ্ণ, যুগ-অবতার।
পার্থ কৃষ্ণে, কৃষ্ণ কর নারায়ণে লয়,
এইরূপে পতঙ্গও উঠে হিমালয়।
কিন্তু বৎসে! তব এই যোগিনীর বেশ,
একি রৈবতকের সে ভৃত্য বেশ তব?"
"না, না, প্রভু!"—কহিলাম পড়িয়া চরণে—
"এই বেশ জীবনের ব্রত এ দাসীর;
অনন্ত অমৃতপূর্ণ জ্ঞান সিন্ধু তব,

পাইবে না অনার্য্য কি বিন্দুমাত্র তার ?
নারায়ণ ! এই নব জলধর-ধারা
পাবে না কি এই বিশ্বে চাতক কেবল ?
পাইবে না মরুভূমি ? দেহ এ দাসীরে
এক বিন্দু, বিলাইয়া বনে বনে দাসী
করিবে এ জীবনের ব্রত উদযাপন।"
কহিলা সজল কণ্ঠে,—"চন্দ্রচূড়-সুতে !
গাও তবে কৃষ্ণনাম, গাও বনে বনে
—বেড়াইয়া মুগ্ধপ্রাণা বিহঙ্গিনী মত
পতিতপাবন নাম ; অনার্য্য উদ্ধার
হবে এই নামে ; মন্ত্র নাহি জানি আর।"
অশ্রুজলে প্রক্ষালিয়া চরণ যুগল
কহিলাম,—"কর মন্ত্রে দীক্ষিত কন্যায় ;
পদ কল্পতরুমূলে বন লতিকায়
দেও স্থান ; নহে ভিন্ন করেছি শ্রবণ
কৃষ্ণ-বাসুদেব আর কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন।"
বহিল কি আনন্দাশ্রু মন্দাকিনীধারা
প্রভুর নয়নে—দুই চক্ষু জগতের !
আদরে লইয়া বক্ষে চুম্বিয়া ললাট
কহিলেন,—"মা আমার ! নিরুপমা এই
জ্বলন্ত পাবক শিখা-পশিলে আশ্রমে
পুড়িবে যে শিষ্যগণ, ভস্মিবে আশ্রম।"
"অর্জ্জুনের ভৃত্য"—আমি কহিনু সলাজে—
"হবে তব শিষ্য-পুত্র, সেবক তোমার"
গুরুর চরণাশ্রমে পাইয়াছি স্থান।
দেও স্থান, দেবি ! আজি চরণে তোমার।

পড়িল বিহ্বলা শৈল চরণে ভদ্রার।
আপনি বিহ্বলা ভদ্রা। বিহ্বলা বালায়
আবার লইয়া বক্ষে, কহিলা উচ্ছ্বাসে,—
"শৈল! শৈল! পুণ্যবতি! পদতীর্থ তোর
সুভদ্রার যোগী স্থান। ধন্য নারায়ণ!
দুর্জ্ঞেয় তোমার লীলা, কি বুঝিবে নর
গৃহমুখী পতি-প্রেম-মন্দাকিনী-ধারা
রুদ্ধ করি এইরূপে পিতৃ-স্নেহ শৈলে,
বহাইলে বনভূমি করিতে উদ্ধার
এই মতে, এই পথে! আয় দিদি! আয়!
দুইজনে গৃহে বনে গাব কৃষ্ণনাম।
এইরূপে দুইজনে প্রেম আলিঙ্গনে
বাঁধিব অনার্য্য আর্য্য। গাইবে জগত
কৃষ্ণ নাম; কৃষ্ণ প্রেমে ভাসিবে ধরণী
কুরুক্ষেত্র ঐরাবত ভাসাইয়া বেগে
ছুটিতেছে প্রেম-গঙ্গা পতিতপাবনী,
আর্য ভূমি বনভূমি, করিতে উদ্ধার।"
সুভদ্রার বক্ষে শৈল রাখিয়া মস্তক—
কি দেখিছে? "ওই দেখ! ওই দেখ, দিদি!"—
ছুটিয়া চলিল শৈল—"বসি চন্দ্রাসনে
জনক জননী মম, কি প্রীতি বদনে!
প্রসারিয়া কর মাতা কি কহিছ?—মাতা!
কে মাতা?—সুভদ্রা!" শৈল ফিরিয়া আবার,
পড়িয়া ভদ্রার বুকে,—"ওমা! মা আমার
মাতৃ-হীনা বনভূমি,—শৈল মাতৃ-হীনা,—
নারায়ণ! এত দিনে পাইল জননী।

পতিতপাবনী মাত! পতিতা কন্যায়
রাখিস্ চরণে তোর।" হইল মূর্চ্ছিতা।
নীরব রজনী। চন্দ্র হাসিছে আকাশে
নীরবে, নিরখি কিবা স্বর্গ ধরাতলে!
মূর্চ্ছিতা শৈলের মুখ অঙ্কে সুভদ্রার,
চন্দ্রকরে সমুজ্জ্বল সিক্ত নীলাম্বুজ,
সস্মিত, সুস্নিগ্ধ, শান্ত, চাহি চন্দ্রপানে
আত্মহারা ভদ্রা দেবী। কিবা দরশন
চন্দ্রে চন্দ্রে, চন্দ্রে চন্দ্রে কিবা সম্ভাষণ
প্রীতিময়, ভাবময়! বহিছে কপোলে
যুগল আনন্দ ধারা দর দর দর,—
কি পবিত্রা ধারা! কিবা পুণ্য নিরঝর!
তৃতীয় প্রহর নিশি, নব হেমন্তের
সুশীতল সমীরণ বহিতেছে ধীরে।
ভাঙ্গিল শৈলের মূর্চ্ছা। বসিয়া রমণী
ভদ্রার উরসে মুখ রাখিয়া আবার
কহিল,—"রজনী দেবি! অবসান প্রায়।
মানবের ভাগ্যাকাশে ভদ্রার মতন
ভাসিতেছে সুখতারা অনন্ত আকাশে,—
মানবেরো দুঃখ নিশি হতেছে প্রভাত।
বিদায়ের কালে ভিক্ষা চাহে এই দাসী
তোমার চরণাম্বুজে,—কর এ প্রতিজ্ঞা
কালি রণে পুত্রে তব দিবে না যাইতে;
রাখিবে বাঁধিয়া, মত্ত করি-সুত মত,
সুদৃঢ় স্বর্গীয় মাতৃ-স্নেহের নিগড়ে।"

সু। কেন, শৈল?

শৈ। শুনিয়াছি কৌরব-মন্ত্রণা
অলক্ষিতে। বীর ধর্ম্ম দিয়া বিসর্জ্জন
কালি রণে ঘটাইবে ঘোর অমঙ্গল
কুমারের; এইরূপে করিবে হরণ
দুর্জ্জয় গাণ্ডীব বল।

সু। অন্ধের সন্তান
হতভাগ্য কৌরবের, অন্ধ চিরদিন।
বুঝে নাই হায়! তারা গাণ্ডীবের বল
নহে শিশু অভিমন্যু। গাণ্ডীবের বল
জনার্দ্দন, গাণ্ডীবের বল নারায়ণ।
ধর্ম্মযুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম সনাতন,
জান শৈল। ধর্ম্মযুদ্ধে করিয়া বারণ
কুমারে, কেমনে ধর্ম্মে হইবে পতিতা
পার্থের রমণী, অভিমন্যুর জননী?
হইবে পতিতা আহা! কৃষ্ণের ভগিনী?

শৈ। ষোড়শ বর্ষীয় শিশু করিবে সমর,—
একি ধর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের?

সু। ধর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের।
কেশরীর ধর্ম্ম, ধর্ম্ম কেশরী-শিশুর।
ষোড়শ বর্ষীয় যেই ক্ষত্রিয় সন্তান
বিরত সংগ্রামে, সেই ভীরু কুসন্তান
ক্ষত্রিয় কুলের গ্লানি। ষোড়শ বর্ষীয়
পুত্র মম মহারথী। ক্রীড়ার অঙ্গন
যুদ্ধক্ষেত্র, ধনুর্ব্বাণ অঙ্গের ভূষণ।
পিতা করুণার সিন্ধু, পুত্র করুণার
নবঘন, শ্লথ করে করিতেছে রণ!

কৃষ্ণ সুভদ্রার যত্ন যাইছে ভাসিয়া
সেই করুণার স্রোতে। অন্যায় সমরে
করে অন্ধ কৌরবেরা বজ্রাগ্নি সঞ্চার
সেই মেঘে, বাড়বাগ্নি উত্তাল সাগরে,
চক্ষুর নিমিষে ভস্ম হবে কুরুকুল।
আজি অপরাহ্নে শিরে দিয়া দুই কর
করিয়াছি আশীর্ব্বাদ বীরে পুত্রে মম,
পালিয়া স্বধর্ম্ম, করি এই ঘোর রণ,
ধরাতলে ধর্ম্ম রাজ্য করিতে স্থাপন।
"নর-হরি! নারায়ণ! বিপদভঞ্জন!
রক্ষিও বাছায় তবে!"—সরিল না আর
রুদ্ধ কণ্ঠ শৈলজার,—বলিয়াছে বাছা
যাইবে আশ্রমে বন-মাতার তাহার,
যুদ্ধান্তে উত্তরা সহ; হইবে উদয়
অরুণ ঊষার সহ আশ্রমে আমার,—
আঁধার হৃদয়ে মম। অনাথিনী-নাথ!
এই চির অনাথিনী চাহে নাহি আর,
—চাহিবে না,—দেও তারে এই ভিক্ষা, এই
একটা বাসনা কর পূরণ তাহার!"
নীরবিল শৈল। অশ্রু বহিল নীরবে
কপোলে, বহিল অশ্রু নয়নে ভদ্রার।
কেন শৈলজার এই নৈশ অভিযান
বুঝিলেন ভদ্রা। চুম্বি বদন তাহার
কহিলেন,—"অলক্ষিতা থাকিয়া জগতে
বরষিতে স্নেহ সুধা জনম কি তোর
অভাগিনি! কত স্নেহ এই ক্ষুদ্র বুকে!"

শৈল। একটী হিল্লোলে আমি আকুল যাহার,
বহিছে সে স্নেহ-গঙ্গা হৃদয়ে তোমার
শান্তিময়ী, সুধাময়ী! করিয়াছ তুমি
কি অনন্ত গর্ভে লীন! বুঝিলাম, হায়,
এত দিনে কি কঠিন ধর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের।
বুঝিলাম এত দিনে লক্ষ্মী অনার্য্যের
কেন আর্য্য-পদানতা। বুঝিলাম আর,
শৈলজার স্থান কেন পদে সুভদ্রার।

সু। বড়ই কঠিন ধর্ম্ম, শৈল! ক্ষত্রিয়ের।
বসুন্ধরা ক্ষত্রিয়ের পত্নী, পুত্র নর।
ক্ষত্রিয়ার পুত্র নর, পতি বিশ্বেশ্বর।
সেই বসুন্ধরা আজি কি পাপ আধার।
মানব সমাজ আজি দুঃখ পারাবার।
দুঃখ নহে বিধাতার লিপি নিরমম,—
জগত আনন্দ রাজ্য, সুখ প্রস্রবণ।
অনন্ত চাহিয়া দেখ গ্রহ উপগ্রহ
—অসংখ্য, বিরাট মূর্ত্তি!—ভ্রমে অহরহ
কি ভীষণ বেগে,—গতি নর-চিন্তাতীত!—
পরস্পরে পরস্পর করি আকর্ষিত
কি অচিন্ত্য প্রেমে, কিবা চিন্তাতীত ব্রতে,
কি সুখে অচিন্তনীয় নিয়তির পথে!
কি অনন্ত সৌন্দর্য্যের উঠিছে উচ্ছ্বাস।
কি সুখ সঙ্গীতে পূর্ণ অনন্ত আকাশ!
কেবল মানব পথ-ভ্রষ্ট নিয়তির।
তাই মানবের হায়! এ দুঃখ গভীর!
মানবের সুখ পথে অধর্ম্মে সৃজন

করিয়াছে মহাবন, করিতে দাহন
সে খাণ্ডব, জ্বলিয়াছে কুরুক্ষেত্র রণ,—
শিবিরে বসিয়া ওই সাক্ষী নারায়ণ!
সুভদ্রার পতি পুত্র আত্ম-সমর্পণ,
করি এই হুতাশনে পৃথিবী পাবক,
করি ধরাতলে ধর্ম্ম-সাম্রাজ্য স্থাপন,
মানবের সুখ পথ করে উন্মোচন;—
তবে শৈল ভাগ্যবতী। পুণ্যবতী, আর
কে আছে এ ধরাতলে মত সুভদ্রার?
বহিছে যুগল ধারা জগত-মাতার
যুগল কপোলে মাতৃ-প্রেম-বিগলিত
সন্তাপ-হারিণী। শৈল কহিল উচ্ছ্বাসে,—
"পিতৃগণ! দেবগণ! কে আছ কোথায়,
দেখ পুণ্যবতীর এ আত্ম-বিসর্জ্জন
মানব উদ্ধার ব্রতে! এ পুণ্যে মাতার,
করিয়া শৈলের স্নেহে, কবচ নির্ম্মাণ
সমরে করিও রক্ষা বাছায় আমার!"
নীরবে আকাশ পানে চাহিয়া চাহিয়া
কিছুক্ষণ দুইজন, চাহিল বিদায়
নমিয়া চরণে শৈল। দাঁড়াইয়া ভদ্রা
সস্নেহে ধরিয়া কর কহিলেন ধীরে—
"থাক্ মুহূর্ত্তেক শৈল মধ্যম পাণ্ডবে
ডেকে আনি, ডেকে আনি নর-নারায়ণে,—
আমার তোমার দেব, উপাস্য যুগল!
পাইবেন যেই সুখ দেখি তোর মুখ
দুই জনে, পারিবে না কুরুক্ষেত্র-জয়

করিতে তুলনা তার! ভগিনীর তোর
রক্ষা কর্ অনুরোধ, এক দিন তার
থাক্ বুকে, লয়ে বুকে অভি উত্তরায়,—
কাটাবে একটী দিন স্বর্গে সুভদ্রায়।"
"না দিদি"—কহিল শৈল রাখিয়া মস্তক
সেই প্রেম-পূর্ণ বুকে,—"হয়নি এখনো
শৈলজার সে যোগ্যতা, সিদ্ধি তপস্যার,
কৃষ্ণার্জ্জুন পদ-তীর্থ করিবে দর্শন।
আজিও কাঁপিল বুঝি হৃদয় আমার
নিরখি পার্থের মুখ। হৃদয়-সংযম
প্রলোভনে,—সেই অগ্নি-পরীক্ষা ভীষণ,—
যে পারে, সে দেবী; দেবী সুভদ্রা সে জন।
শৈলের হৃদয়ে দিদি! নাহি সেই বল।
নাহি শক্তি পতঙ্গিনী।দেখিবে নয়নে
কৃষ্ণপদ প্রভাকর, চিন্তায় যাহার
আলোক সাগরে ডুবে পতঙ্গের মত
তাহার হৃদয় ক্ষুদ্র। পারিবে যে দিন
নিষ্কম্প প্রদীপ মত হৃদয় আমার
দেখিতে পার্থের মুখ; করিতে দর্শন
নারায়ণ পদাম্বুজ শান্তি নিকেতন;
পারিব যে দিন মিলি ভগিনী দুজনে,
আর্য্য অনার্য্যের শক্তি করিয়া মিলিত,
সেই মহা ধর্ম্মরাজ্য করিতে স্থাপিত
—রাজা অভিমন্যু, রাণী উত্তরা তোমার,—
সে মহা প্রয়াগ তীর্থ দেখিব যে দিন,—
আর্য্য অনার্য্যের শক্তি, সুভদ্রা শৈলজা,

বহিতেছে এক স্রোতে জাহ্নবী যমুনা,
অভিন্না অনন্ত প্রেমে ভগিনী যুগল ;
সে দিন আসিবে শৈল চরণে তোমার !
যত দিন এই স্বপ্ন ফলিবে না,—দেবি !
কহ এই স্বপ্ন হায় ! ফলিবে কি কভু ?—
তত দিন যেই উচ্চ ধর্ম্ম রমণীর
শিখিলাম, সেই ধর্ম্ম করিব সাধন ;
তত দিন—
গৃহ ক্ষেত্র সুভদ্রার, শৈলজার বন।"
এখনো চাহিয়া
আকাশের পানে শৈল হইল নীরব,
সুভদ্রার বুকে মুখ, ধরিয়া গলায়।
সুভদ্রা চাহিয়া স্থিরা আকাশের পানে,
চন্দ্রদীপ্ত অশ্রু-সিক্ত কপোল কমলে
বহিছে সে প্রেমধারা ; সিত চন্দ্রালোকে
হেম নীলমণিময় মূরতি যুগল
আলিঙ্গিয়া পরস্পরে স্বপ্নে মহিমার,
মানবের উদ্ধারের স্বপ্নে নিমজ্জিত,—
অপার্থিব, প্রেমময়, পবিত্রতাময়।
ধীরে ধীরে প্রসারিয়া নয়ন যুগল—
আকর্ণবিশ্রান্ত নেত্র,—প্রসারিয়া কর
কহিতে লাগিল শৈল উন্মাদিনী মত,—
"ওই দেখ ! ওই দেখ ! জনক জননী
আবার বসিয়া ওই শশাঙ্কমণ্ডলে !
কি হাসি বদনে, আহা ! কি প্রেম নয়নে !
সফল হইবে স্বপ্ন ? একি দেখি পুনঃ

হইয়া যুগল রূপ ক্রমে রূপান্তর
কি মূর্ত্তি ভাসিল ওই,—সুভদ্রা অর্জ্জুন!
পিতা ধনঞ্জয়, মাতা সুভদ্রা আমার।
পিত! পিত! মুছে ফেল শোক হৃদয়ের।
এই দেখ শৈল আজি দুহিতা তোমার।
সফল তপস্যা; দেখ হৃদয় তাহার
পিতৃপ্রেমে অবিচল, স্নিগ্ধ, অকম্পিত।
মা আমার! মা আমার! প্রেম মুখ তোর
কি সুন্দর, কি ত্রিদিব! কি দেখি আবার!—
এক অঙ্গে দুই রূপ হইয়া বিলীন,
কি মূর্ত্তি মহিমাময়, নীল মণিময়,
উঠিল ভাসিয়া শতচন্দ্র-করোজ্জ্বল!
বাসুদেব! নারায়ণ!"—
ধীরে ধীরে আসি
দাঁড়াইলা আগে কৃষ্ণ! হইল পতিতা
শৈলজা সুভদ্রা পদে, উভয় মূর্চ্ছিতা।
চাহি আকাশের পানে, মহিমা মণ্ডিত
দাঁড়াইয়া নারায়ণ, আপনি মূর্চ্ছিত।

* * * *

দাঁড়াইয়া থাক নাথ!
নিরখি নয়ন ভরি।
আর্য্য অনার্য্যের লক্ষ্মি!
থাক মা চরণে পড়ি!
অনার্য্য-আর্য্য শক্তির
এইরূপ সংঘর্ষণ—

ভারত-নিয়তি যদি,
তব ইচ্ছা নারায়ণ !
এইরূপে পদতলে
হ'য়ে শেষে সম্মিলিত
উদ্ধারি পতিত, নাথ !
হয় যেন প্রবাহিত।
থাক দাঁড়াইয়া নাথ !
নিরখি নয়ন ভরি।
আর্য্য অনার্য্যের লক্ষ্মি !
থাক মা চরণে পড়ি।

চতুর্দ্দশ সর্গ।

—:*:—

বিদায়।

—:*:—

"উত্তরে ! উত্তরে ! কই অভিমন্যু কই !"—
উত্তরার শিবিরেতে ঊর্দ্ধশ্বাসে সুলোচনা
আসি উন্মাদিনী প্রায় কহে স্নেহময়ী—
"উত্তরে ! উত্তরে ! কই, অভিমন্যু কই ?
শুনিয়াছি মহা-রণ করিতেছে দ্রোণ আজি,
উঠিয়াছে কুরুক্ষেত্রে মহা হাহাকার,
কই অভিমন্যু কই, উত্তরে ! আমার ?"
ধরিয়া সখীর গলা কাঁদিয়া বিরাটবালা
কহে—"ধর্ম্মরাজ-আজ্ঞা পাইয়া এখন,

গিয়াছেন তথা ; কিছু নাহি জানি আর ;
কাঁদিতেছে প্রাণ মা গো! তোর উত্তরার।
গত নিশি চন্দ্র পানে চাহিয়া চাহিয়া
হইনু নিদ্রিতা যবে, দেখিনু স্বপন
ঘেরিল অভিরে সপ্ত শার্দ্দূল ভীষণ।
দাঁড়াইয়া দৃপ্ত সিংহশিশু মধ্যস্থলে,
পরাজিল সপ্ত শত্রু অপূর্ব্ব কৌশলে।
শশাঙ্ক হইতে ধীরে নর-নারায়ণ,
মনোহর পুষ্পরথে করি আরোহণ,
নামিলেন ; নিরমল রথ জ্যোৎস্নায়
আলোকিল রণক্ষেত্র অমৃত ধারায়।
অভিরে তুলিয়া রথে লইলা আদরে ;
উঠিতে লাগিল রথ আকাশে মন্থরে।
কহিলাম,—'দয়াময়! নেও উত্তরায়।'
করুণ নয়নে চাহি কহিলেন হায়!
জগন্নাথ,—নেত্রে স্নেহ-অশ্রু দর দর—
'না, না, বৎসে! যাবে তুমি বৎসর অন্তর।'
কহিনু—'না, প্রাণনাথ! ছাড়ি উত্তরায়
যাইও না তুমি; ক্ষুদ্র উত্তরা তোমার
পারিবে না একা যেতে এত দূর হায়!'
জয়নাদে পূর্ণ হ'ল পৃথিবী গগন।
নাচিতে লাগিল রথ বেষ্টি তারাগণ।
কি সঙ্গীত, কি সৌরভ, বহিল ধরায়!
এ কি স্বপ্ন মা গো? অভি গেল মা! কোথায়?"
সু। বাপ তোর পোড়া মুখ, স্বপ্ন পোড়া ছাই
মুণ্ড তার, সাত বাঘ সগোষ্ঠী বিরাট।

ননীচোরা চুরি করি আনিল বাছায়
কোলে মম, তোর বাপ পড়ে যেন পায়ে।
কহিস অভিরে যদি এ পোড়া স্বপন
এখনি খাইবি মার! চলিনু এখন,
আজি রণে যেতে তারে দিবনা কখন।

অপূর্ব্ব স্বপন ব্যাখ্যা! হাসিল উত্তরা,
বরিষা-জ্যোৎস্না-খেলা,—নেত্র অশ্রুভরা।
ভাবিল—"সুলিমা ওই বাঘিনীর মত
ছুটিয়াছে শিশুহারা, আজি রণে আর
পারিবে না যেতে, আর কি ভয় আমার?
কেনইবা এত ভয় হয় আজি মনে,
থেকে থেকে কাঁপে বুক কেন অকারণে?
গোবিন্দ মাতুল যার, সুভদ্রা জননী,
পিতা ধনঞ্জয়, নিজে বীরেন্দ্র আপনি
রথি-শ্রেষ্ঠ—মহারথী, সে যাইবে রণে,
তাতে কেন এত ভয় হবে মম মনে?
হাসি মুখে নিত্য যায়, নিত্য করে রণ,
রণক্ষেত্র যেন তার খেলার প্রাঙ্গণ।
আমিই কি ডরি রণে? নহি কি ক্ষত্রিয়া।
বিরাটতনয়া আমি অভিমন্যু-প্রিয়া?
অর্জ্জুনের শিষ্যা আমি, সেই নাট্য ঘরে
শিখালেন অস্ত্র বিদ্যা কতই আদরে।
দেখি অস্ত্র শিক্ষা মম, লইয়া হৃদয়ে
কহিতেন—'হবে পতি অর্জ্জুন-তনয়।'
জানিত না অভি; এক দিন দ্বারকায়
সৃজিল দুর্ভেদ্য লক্ষ্য; বিঁধিনু হেলায়

সে লক্ষ্য; বিস্মিত বক্ষে লইয়া আমায়
কি চুম্বন, কি প্রশংসা গলায় গলায়।
নাহি ডরি রণে, কিন্তু চক্ষের অন্তর
হইলে মুহূর্ত্ত, প্রাণ কাঁপে থর থর।
এত রূপ, এত গুণ, পারিজাত হার
মিলিয়াছে মম ভাগ্যে প্রত্যয় আমার
নাহি হয় পোড়া মনে। জাগ্রতে নিদ্রায়
হারালেম, হারালেম,—ভয় হয় মনে।
ইচ্ছা করে, রাখি সদা নয়নে নয়নে,
মিশাইয়া বুকে বুকে জীবনে জীবনে।
কেন এত ভালবাসি, কেন তার তরে
প্রাণ মম নিরন্তর এইরূপে করে?
পিতা, মাতা, ভগ্নি ভ্রাতা, শাশুড়ী, শ্বশুর,
কারো তরে প্রাণ নাহি করে এত দূর।
ইচ্ছা করে চিরি বুক বুকের ভিতর
রাখি মুখখানি, দেখি জন্ম জন্মান্তর।
তাহার বসনখানি, পাদুকা তাহার,
কি সুগন্ধ! প্রতিদিন চুম্বি কতবার।
হইলে নিমেষ মাত্র চক্ষের অন্তর,
দুখানি পাদুকা রাখি বুকের উপর।
পদ-প্রক্ষালিত বারি-সুধা করি পান,
প্রাণের পিপাসা মম করি নিরবাণ।
কি যে করিতেছে প্রাণ! আজি কদাচিত
যাইতে দিব না রণে, এ কথা নিশ্চিত।
কিন্তু এ বিলম্ব কেন?" পতি সঙ্গহীনা
বন-বিহঙ্গিনী মত করিছে নবীনা

ছুট্ ফট্, শিবিরেতে উঠিয়া বসিয়া।
এবার বসিল বামা বীণাটি লইয়া।
গাইতে লাগিল, কণ্ঠ হয় না মধুর।
এত যত্ন তবু বীণা বাজিছে বেসুর।
আবার বাঁধিতে বীণা ছিঁড়ে গেল তার।
দূরে নিক্ষেপিয়া যন্ত্র, খুলিল ভাণ্ডার
পুতুলের,—ওকি দ্বারে অস্ত্র-ঝনৎকার!
বাজিল সে শব্দ বেগে প্রাণে উত্তরার!
যুদ্ধ বেশে অভিমন্যু,—মস্তকে উষ্ণীষ,
কক্ষে মণিময় অসি তীব্র আশীবিষ।
অঙ্গে বর্ম্ম, পৃষ্ঠে চর্ম্ম, তূণ, ধনুর্ব্বাণ,
অঙ্গুলিতে অঙ্গুলিত্র, বক্ষে উরস্ত্রাণ।
খচিত আরক্ত নীল কৌষিকে সুন্দর
সমাবৃত দীর্ঘায়ত হেম কলেবর,—
মেঘাবৃত হিমাদ্রির কাঞ্চন শেখর।
মুহূর্ত্ত উভয় পানে চাহে আত্মহারা,—
কৃষ্ণা-দ্বাদশীর চন্দ্র চাহি সুখতারা।
চিন্তার ঈষৎ মেঘে বদনে যুবার
করিয়াছে অনুপম গাম্ভীর্য্য সঞ্চার।
গেল সেই মেঘছায়া নিমিষে সরিয়া,
হাসির জ্যোৎস্না মুখে উঠিল ভাসিয়া।

অভি। উত্তরে! কি ভাগ্য তোর! কি ভাগ্য আমার!
ষোড়শ বৎসর মম; সেনাপতি-পদে
করেছেন ধর্ম্মরাজ এ দাসে বরণ
আজি রণে। এই দেখ উষ্ণীষে আমার
আশীর্ব্বাদ, গলে বীর-বাঞ্ছনীয় হার।

দ্রোণ-প্রতিদ্বন্দ্বী আমি! ষোড়শ বৎসরে
ফলিয়াছে এ গৌরব, এ ইন্দ্রত্ব ভার,
কোন্ ক্ষত্রিয়ের ভাগ্যে, কোন্ ক্ষত্রিয়ার?
দে বিদায় হাসি মুখে! খেল্ ততক্ষণ
পুতুল লইয়া তোর; পুতুলের সনে
খেলিয়া আমার খেলা আসিব এখন!

উ। হইবে বিবাহ আজি কন্যার আমার।
দেখ দেখি মেয়ে মম সুন্দরী কেমন!
কেমন সোণার নাক, রূপার নয়ন!
দেখ স্বয়ংবর-সভা! রাজা অগণন
বসিয়াছে চারিদিকে। বর-কর্ত্তা তুমি,
তুমি গেলে, কে করিবে বর-অভ্যর্থনা?
বিয়া ফেলি পাত্রী তবে যুড়িবে ক্রন্দন।
কাঁদ পোড়া মুখী।—

কন্যা কাঁদিতে লাগিল
"পিঁ পিঁ" রবে, অভিমন্যু হাসিয়া আকুল

অভি! থাকিতে এমন বর,—কৃষ্ণ, ধনঞ্জয়,
কাঁদিতে বরের তরে হইবে না তোর
দুহিতার। যুদ্ধ-অন্তে সায়াহ্নে পূরণ
হবে স্বয়ংবর-সভা; বিদায় এখন।

ছুটি বিজলীর বেগে, শিবিরের দ্বার
রুদ্ধ করি দাঁড়াইল বালা আচম্বিত,
রুদ্ধ কবাটেতে পৃষ্ঠ করিয়া স্থাপিত।
বাম পদে অগ্রে, করে কবাট চাপিয়া,
পটে যেন রতি-চিত্র উঠিল ভাসিয়া!
আলু থালু বেণী, আলুলায়িত বসন,

কেশ-বাস-সমাচ্ছন্ন অরুণ বরণ।
বিস্তৃত বিশাল নেত্র, বদন গম্ভীর,—
নবীন অরুণ বক্ষে নীল সরসীর।
দাঁড়াইয়া দুইজন, চিত্র নিরুপম,
ধ্যান ভঙ্গ দিনে যেন রতি ও মদন।

উ। না, না, নাথ! আজি রণে যাইতে কখন
দিবে না উত্তরা তারঁ থাকিতে জীবন।
যাঁবে যদি ওই বর্সা,
হান উত্তরার বক্ষে!
পড়িবে উত্তরা তব চুম্বিয়া চরণ,
লঙ্ঘি মৃত দেহ তার করিও গমন।

অভি। প্রাণাধিকে! একি কথা? বীরের দুহিতা,
বীরের বনিতা তুমি, এই কাতরতা
সাজে কি তোমার, পুত্রবধূ অর্জ্জুনের?
ষড়যন্ত্র করি শত্রু সংশপ্তক সনে
করিয়াছে পিতৃদেবে যুদ্ধে নিয়োজিত
ঘোরতর একদিকে; অস্ত্রগুরু দ্রোণ
অন্য দিকে চক্রব্যূহ করিয়া নির্ম্মাণ
করিছেন মহারণ। শুন হাহাকার
করিছে পাণ্ডব সৈন্য। সঙ্কট ভীষণ
দেখিয়া পাণ্ডব-পতি করিলা বরণ
এই দাসে; আজি আমি না করিলে রণ,
ধর্ম্মরাজে বন্দী আজি করিবেন দ্রোণ।

উ। এখনও পাণ্ডব পক্ষে আছে অগণন
রথী মহারথী।

অ। আছে,—দ্রোণের বিক্রম

না জান বলিকা তুমি। প্রতিজ্ঞা তাঁহার
শুন নাহি তুমি,—নাহি থাকে ধনঞ্জয়
করিবেন ধর্ম্মরাজে গ্রহণ নিশ্চয়।
ইন্দ্রোপম পিতা বিনা কেহ নাহি আর
পরাভবে দ্রোণে,—দ্রোণ সমরে দুর্ব্বার।

উ। করিবে কেমনে তুমি পরাভব তাঁরে?

অ। অভিমন্যু আমি, আমি অর্জ্জুনকুমার।

বাম করে শেল অসি করি নিষ্কোষিত
অন্য করে; শিবিরের চারু গালিচায়
অসি অগ্রে চক্রব্যূহ করিয়া অঙ্কিত
দেখাইলা,—বীর বক্ষ উৎসাহে পূরিত,—
কোন্ রূপে চক্রব্যূহ করিয়া ছেদন
পশিবেন দ্রোণ সৈন্যে। আনত বদন,
উত্তরা চাহিয়া আছে জন্মের মতন।
ধীরে ধীরে অনিচ্ছায় অজ্ঞাতে কেমনে
অমঙ্গল অশ্রুবারি আসিছে নয়নে।
তুলি মুখ অভিমন্যু কহিলা হাসিয়া,—
"এইরূপে চক্রব্যূহ করিব লঙ্ঘন,
লঙ্ঘে যথা সিংহ-শিশু ব্যাধের বন্ধন।
কিংবা লঙ্ঘি অবরোধ মেষপালকের
পশে যথা মেষপালে কেশরি-কুমার,
প্রবেশিব কুরু-সৈন্যে! দেখিবেন দ্রোণ
আজি রণে অগ্নি-শিশু অগ্নি-পরাক্রম।
দেখিবেন পিতৃ-গুরু, এ ভুজ বিশাল
অর্জ্জুনের, অর্জ্জুনের এই বক্ষ মম,
প্রদীপ্ত পার্থের বীর্য্যে শোণিত আমার;

এ ধনু গাণ্ডীব শিশু, এ তূণীর মম
অক্ষয় তূণীর-পুত্র, পূর্ণ বজ্র জালে,—
অর্জ্জুনের অস্ত্র-শিশু, বিষধর-শিশু
পিতৃসম তীব্র বিষধর। দেখিবেন দ্রোণ
এই ধনু, এ তূণীর, এই শরজাল,
অর্জ্জুনের পরাক্রম অরাতির কাণে
পারে কহিবারে বজ্র নির্ঘোষে ভীষণ ;
পারে লিখিবারে উগ্র অনল অক্ষরে
অরাতির বুকে। নাহি থাকুন অর্জ্জুন,
দেখিবেন দ্রোণাচার্য্য, অর্জ্জুনকুমার
করিবে বিফল আজি প্রতিজ্ঞা তাঁহার।
তুচ্ছ এক মহারথী, মহারথী দশ
হয় যদি হত আজি, তথাপিও দ্রোণ
ধর্ম্মরাজ-কেশাগ্রও ছুঁইতে কখন
নাহি পারিবেন। প্রিয়ে! কৃপ, কর্ণ, দ্রোণ
একে একে আজি রণে করি পরাজিত,
রাখিব ক্ষত্রিয় কুলে কীর্ত্তি অতুলিত।
কিন্তু সাতজনে যদি করে আক্রমণ ?
অভিমন্যু উচ্চ হাসি উঠিলা হাসিয়া—
"এ নহে ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম ; জাতিতে কেশরী
ক্ষত্রিয়েরা, এই নীচ বৃত্তি শৃগালের
নহে কর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের। আসে সপ্ত জন,
আসে সপ্তদশ জন,—কি ভয় উত্তরে ?
একা সিংহ নাহি ডরে শিবা অগণন।"
বাজিল সমর বাদ্য বিজয় ঝঙ্কারে
শিবিরের দ্বারে। বেগে ছুটিয়া কুমার,

বাম করে শেল, ধরি প্রেম প্রতিমায়
হৃদয়ে দক্ষিণ করে চুম্বিলা চুম্বন,
প্রভাত নলিনী যেন চুম্বিলা অরুণ।
মুহূর্ত্তের সে চুম্বনে কি অনন্ত ভরা!
কি অনন্ত প্রেম-তৃষ্ণা নীরব-মুখরা!
কি অনন্ত সুখ দুঃখ, কি অনন্ত ভাষা!
কি অনন্ত নিরাশায় কি অনন্ত আশা!
দুই হৃদয়ের সেই ক্ষুদ্র সম্মিলন,
দুই সমুদ্রের ক্ষুদ্র অনন্ত সঙ্গম!
সেই ক্ষুদ্র পথে কিবা উচ্ছ্বাস অপার,
উভয়ে উভয় প্রাণে করিছে সঞ্চার।
ঊর্দ্ধ মুখে অধোমুখ—শোভিছে কেমন,
চন্দ্র জলধির যেন শেষ দরশন
পূর্ণিমা উষায়! ধীরে ধীরে উত্তরায়
সরাইয়া অভিমন্যু, যথা জ্যোৎস্নায়
সরায় কাঞ্চন-শৃঙ্গ পূর্ণিমা প্রভাতে,
খুলিল শিবির দ্বার ছুটিলা কুমার,
ছিঁড়িয়া অজ্ঞাতে কণ্ঠহার উত্তরার
শেলাঘাতে। বজ্রঘাতে বুক উত্তরার
হইল চূর্ণিত, বামা রহিল চাহিয়া
বজ্রাহতা মত স্থিরা শূন্য নিরখিয়া।
সংশপ্তক যুদ্ধে গত বীরেন্দ্র ফাল্গুনি,—
ধ্যানস্থা সুভদ্রা মাতা বসিয়া পূজায়
পতির মঙ্গল ব্রতে। পশিয়া কুমার
সবেগে শিবিরে, স্থির রহিলা চাহিয়া
মুহূর্ত্ত মায়ের মূর্ত্তি নয়ন ভরিয়া।

দ্বারে রণ-বাদ্য, কক্ষে অস্ত্র ঝনৎকার,—
ভাঙ্গিল ভদ্রার ধ্যান। রাখিয়া উষ্ণীষ
মায়ের চরণ তলে, প্রণমি কুমার
কহিলা—"মা! দ্রোণাচার্য্য ঘোরতর রণ
করিছেন চক্রব্যূহ করিয়া নির্ম্মাণ।
পিতার অবিদ্যমানে, সেনাপতি পদে
ধর্ম্মরাজ এই দাসে করিলা বরণ।
দেও মা! বিদায় রণে, কর আশীর্ব্বাদ,
আজি যেন পরিচয় পায় ত্রিভুবন
অর্জ্জুনের পুত্র আমি সুভদ্রা-নন্দন,
গোবিন্দের প্রিয় শিষ্য। স্বধর্ম্ম পালন
করি, ধর্ম্মরাজ্য আজি করিব স্থাপন।"
গিয়াছেন পতি, পুত্র যাইছে, সমরে
দুর্জ্জয় সঙ্কট পূর্ণ; জাগিছে হৃদয়ে
শৈলজার প্রতিষেধ, অমঙ্গল ছায়া,
স্থির সরোবর বক্ষে ছায়া জলদের,—
তথাপি একটি রেখা মুখে রূপান্তর
হইল না সুভদ্রার। রহিলা চাহিয়া
প্রাণাধিক পুত্র পানে স্নেহ ছল ছল,
স্বর্ণ-দেবী-প্রতিমার মত অবিচল।
বুঝিলাম হইয়াছে পাণ্ডব বাহিনী,
কৃষ্ণার্জ্জুন বিনা, যেন বিপন্না তরণী
সিন্ধুগর্ভে ঝটিকায় নাবিক-বিহীনা।
হইয়াছে পাণ্ডবের মহা সৈন্য হায়।
যেন মহারথ রথি-সারথি বিহীন।
কৃষ্ণের ভাগিনা তুই, শিষ্য প্রিয়তম,

অর্জ্জুনের পুত্র তুই, নিজে মহারথী,
নির্ভয়ে ধরিয়া কর্ণ, আরোহিয়া রথে,
হেলায় সমর সিন্ধু করি অতিক্রম,
আনন্দে চলিয়া যাবি বিজয়ের পার!
নারীকুলে ভাগ্যবতী কে আছে এমন
তোর জননীর মত? ভ্রাতা নারায়ণ,
পতি ধনঞ্জয়, পুত্র ষোড়শ বৎসরে
মহারথী, ধর্ম্ম ক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে,
জগতের এই মহাক্ষেত্রে অদ্বিতীয়,
আজি পুত্র ক্ষেত্রপতি! শোভিছে তাহার
গলায় বরণ মালা, ললাটে তিলক!
আনন্দাশ্রু ধীরে ধীরে বহিতে লাগিল
বীর-জননীর বক্ষে; বহিতে লাগিল
জীবন্ত উৎসাহ ধারা শক্তি-সঞ্চারিণী
পুত্রের হৃদয়ে, পুত্র হইল বিহ্বল।
পুষ্পপাত্র হ'তে নিয়া চারু পুষ্পহার
দিলা কুমারের গলে সস্মিত বদন।
কুমার মায়ের বুকে রাখিয়া বদন
রহিলা নীরবে, মাতা নীরব সজল,
কি উচ্চ উচ্ছ্বাসে পূর্ণ হৃদয় যুগল!

সুভ। পিতৃ গুরু দ্রোণ, অতি সাবধানে
বাছা রে! করিস্ রণ।
না করিস্ তুচ্ছ, হয় যদি শত্রু
অতি ক্ষুদ্র তৃণোপম।
করি আশীর্ব্বাদ,— সুভদ্রার বুক
হইবে কবচ তোর;

সুভদ্রার অঙ্ক হবে তোর রথ;
শত্রু শরজাল ঘোর
হবে সুকুমার যেন সুভদ্রার
স্নেহ মাখা পুষ্পহার;
হৃদয়ে গোবিন্দ, বাহুতে অর্জ্জুন,
লক্ষ্য নর-সমুদ্ধার।
সমর প্রাঙ্গণ স্বয়ংবর সভা
হইবে, যাদু আমার!
জয় লক্ষ্মী আজি হইবে সপত্নী
মম বধূ উত্তরার।
চুম্বিলা ললাট আবার আবার
আদরে লইয়া বুকে;
কি করিছে হায়! মায়ের পরাণ
চিহ্ন তার নাহি মুখে।
মায়ের চরণে প্রণমি কুমার
চলিল সমরে সুখে;—
শিরায় শিরায় কি অজেয় বল,
কি বীর্য্য জ্বলিছে বুকে।
সুভদ্রে। সুভদ্রে! কই? মম বাছা কই?"
পাণ্ডব শিবির খুঁজি, খুঁজি অস্ত্রাগার,
সত্রাসে শিবির পুনঃ খুঁজি উত্তরার
উন্মাদিনী উর্দ্ধশ্বাসে আসি সুলোচনা
ধরিল কুমারে, অঙ্কে পড়িল অননা।
কহে গলা জড়াইয়া ধরি সুলোচনা,—
"কোথায় যাবি রে যাদু।"
"যাব না কোথায়"—

চাপিয়া কণ্ঠের বাষ্প, অশ্রু নয়নের,
কহে অভিমন্যু—"আমি যাব না কোথায়।
তোরে ছেড়ে কোথাও কি পারি মা! যাইতে?
তোরে ছেড়ে যাই যদি, স্বর্গেও আমার
হইবে না সুখ, স্বর্গ কোথা আছে আর?
তোর মুখ, তোর বুক, স্বর্গ যে আমার।"

সুলো। তবে কেন রণ-বেশ?

অভি। চাহি একবার
দেখাইতে দ্রোণাচার্য্যে স্তব্ধে সুলিমার
কত শক্তি, কত শক্তি ক্ষীরে সরে তার।

সুলো। না না, আজি রণে আমি প্রাণান্তে কখন
দিব না যাইতে তোরে। যাবি যদি আগে—
বসাইয়া অসি তোর সুলিমার বুকে
যা রে চলি! যাবি যদি মরিবে নিশ্চয়
এ অভাগী, মাতৃহত্যা ঘটিবে রে তোর।

অভি। ছি! মা! হেন অমঙ্গল কথা কদাচিত
আনিস্ না মুখে। তুই গেলে মা ছাড়িয়া,
কে দিবে রে সর ননী অভিরে মা। তোর?
কে দিবে তাহারে অন্ন? কে পূরিবে তারে
এত স্নেহ? কে কাঁদিবে যুদ্ধযাত্রাকালে
পবিত্রিয়া রণ-বেশ নয়নের জলে,
শক্র-শরজাল যেন না পারে ছুঁইতে?
গলায় বরণ মালা, ললাটে তিলক,—
দেখ মা নয়ন ভরি! কি গৌরব তোর,
পাণ্ডব সৈন্যের আজি সেনাপতি আমি!
কি গৌরবে আজি মম অসি সমুজ্জ্বল।

না যাই সমরে যদি, কি কলঙ্ক মা গো
রটিবে আচন্দ্র সূর্য্য ! সহিবি কেমনে ?
অভিমন্যু পুত্র তোর সহিবে কেমনে ?

সুলো। আমার এ বালসূর্য্যে কার সাধ্য করে
কলঙ্কের কালিমা অর্পণ ?
সহস্র কলঙ্ক যদি হয় তোর, হবে তাহা
অভাগীর অঙ্গের ভূষণ।

কহিস্ লোকের কাছে,— গোপকন্যা সুলোচনা
সম্বল তাহার ননী সর,
সর ননী সম প্রাণ নাহি জানে বীর ধর্ম্ম,
নাহি দিল করিতে সমর।
থাক্ তার পোড়া মুখ আরো পুড়ি, তবু তুই
থাক বুক অঙ্ক যুড়ি তার।
কলঙ্ক-ভঞ্জন কৃষ্ণ দিলা যারে পদ-ছায়া,
কলঙ্কে মা ! কি ভয় তাহার ?
আছে দেবী সুভদ্রার দেব পতি, দেব ভ্রাতা,
কর্ম্মক্ষেত্র অনন্ত সংসার।
সুলোচনা দুঃখিনীর কে আছে, কি আছে আর ?
একা তুই সর্ব্বস্ব তাহার।
তুই ধর্ম্ম, তুই কর্ম্ম, তুই প্রাণ, তুই মর্ম্ম,
তুই অবলম্বন আমার।
তোর চন্দ্রমুখ স্বর্গ, তোর গৃহ কর্ম্মক্ষেত্র,
তুই মম সকল সংসার।
আজন্ম অনাথা আমি, জানি কৃষ্ণার্জ্জুন স্বামী,
সত্যভামা সুভদ্রা রুক্মিণী

আমার ভগিনী তিন, তুই এক মাত্র পুত্র,
আমি তোর যশোদা জননী।
বড় সাধ বৃন্দাবনে নিয়া তোরে সাজাইব
বনমালী গোপাল আমার ;
হয়েছিল কৃষ্ণরূপে বিমোহিত বৃন্দাবন,
গৌর রূপে মোহিত আবার।
কৃষ্ণ-হারা বৃন্দাবন কাঁদিতেছে নিরন্তর,
গৌর রূপে উচ্ছুসিত প্রাণ
হাসিবেক স্বর্ণ হাসি, কালিন্দী হইয়া গৌরী
মন সুখে বহিবে উজান।
না, না, হৃদয়ের নিধি! চিরি অভাগীর বুক
আজি রণে যাইতে কখন
দিব না দিব না তোরে, না জানি আমার প্রাণ
আজি কেন করিছে এমন!
অভি। কেন মা নিত্য ত রণে যাইতেছি, কোন দিন
করিস্ নি এমন বারণ ?
সুলো। ছিল কৃষ্ণ ধনঞ্জয় করিবারে রণ-ক্ষেত্রে
অভাগীর শাবক রক্ষণ।
তাহাতে দ্রোণের আজি প্রতিজ্ঞা ভীষণ,
দুর্ব্বিজয় চক্রব্যূহ, দুর্নিবার রণ!—
আজি রণে যেতে তোরে দিব না কখন।
অভি। অর্জ্জুনের পুত্র আমি, সুভদ্রা-কুমার,
কৃষ্ণের ভাগিনা শিষ্য, কি ঘৃণা মা! তুই
ডরিস্ ব্রাহ্মণ দ্রোণে। ভাবিস্ কেমনে
সেই যজ্ঞ কাষ্ঠ দ্রোণে ফেলিবে উপাড়ি
এই শাল বৃক্ষ তোর পালিত বর্দ্ধিত ?

যাদব পাণ্ডব শক্তি, যমুনা জাহ্নবী,
মিলি জননীর গর্ভে, প্রয়াগে যেমতি,
বহিতেছে এই ভুজে ধারা সম্মিলিত,—
দ্রোণের কি সাধ্য, গতি রোধিবে তাহার ?
একা পার্থে, একা কৃষ্ণে, ডরে বৃদ্ধ দ্রোণ ;
একাধারে কৃষ্ণার্জ্জুন দেখিবেন আজি।
দেখিবেন পার্থ রথী, গোবিন্দ সারথী,
একাধারে মম রথে ; এই ভুজে মম
দুর্জ্জয় পার্থের বল, শিক্ষা গোবিন্দের।
তুচ্ছ দ্রোণ ; বিশ্বজয়ী পিতা ও মাতুল
আসেন সমরে যদি, নাহি ডরি আমি।
একা পার্থ, একা কৃষ্ণ, পারে জিনিবারে
ত্রিভুবন এক রথে, কে সহিবে তবে
কৃষ্ণ-পার্থ-সম্মিলিত পরাক্রম মম ?
তুচ্ছ চক্রব্যূহ, ওই বালির বন্ধন,
উড়াইয়া মুহূর্ত্তে মা ! সিন্ধু-পরাক্রমে
প্রবেশিব দ্রোণ-সৈন্যে মহা সিন্ধু বেগে
উদ্বেলিত, ভাসাইয়া বালি তৃণ মত
অরাতির অনীকিনী, রথী, মহারথী,
দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, শল্য। করিব না আমি
পিতার প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ, বধিয়া পরাণে।
মরণ অধিক যুদ্ধে হইয়া লাঞ্ছিত
পলাইবে দাঁতে তৃণ লইয়া কেমনে,
শুনিয়া হাসিবি তুই, হাসিবে জগত ;
অনন্ত কালের স্রোতে বহিবে সে হাসি।
ওই শুন্ ! ওই শুন্ ! ওই সিংহনাদ

কৌরবের, পাণ্ডবের ওই হাহাকার।
ছেড়ে দে মা! ছেড়ে দে মা!
ঘোর হাহাকার
উঠিল পাণ্ডব সৈন্যে,—"কুমার! কুমার!
হায়! হায়! আজি দ্রোণ করিবে সংহার।
সমস্ত পাণ্ডব সৈন্য।" নক্ষত্রের বেগে
ছাড়াইয়া ধাত্রী-কর ছুটিলা কুমার,
বাজিল সমর-বাদ্য বিজয় ঝঙ্কার।
সুলোচনা ভূমিতলে হইল পতিতা
বন্ধনবিহীনা স্বর্ণ-প্রতিমা, মূর্চ্ছিতা।

পঞ্চদশ সর্গ।

—*—

বীরের শোক।

—*—

ভারতের—জগতের—এবে অবসান
মহাদিবা!—কি শোকের কি সুখের দিন!
মানব পবিত্রকারী এই মহা শোক;
এই শোক মানবের সুখের সোপান।
অবসান? না না, এই দিবসের নাহি
অবসান। ব্যাপি চারি যুগ, মহাকাল
নিবিড় তিমিরাচ্ছন্ন, এই দিবালোক
জ্বলিতেছে, জ্বলিবেক;—ঘোর অন্ধকার

কাননের পথে ফুল্ল জ্যোৎস্নার হার।
সংহারিয়া সংশপ্তক কপিধ্বজ রথ
ফিরিতেছে ধীরে ধীরে; শোকভারে রথ
ভারাক্রান্ত, ভারাক্রান্ত রথীর হৃদয়।
কিন্তু সারথির সেই প্রশান্ত হৃদয়ে
প্রশান্ত ললাট স্বর্গে, নাহি সেই ছায়া।
পড়ে মেঘ-ছায়া ক্ষুদ্র বক্ষে সরসীর;
অতল জলধি বক্ষে যায় মিশাইয়া।
"হা কেশব! এ ছিল কি নিয়তি আমার!"—
বাষ্প-গদ-গদকণ্ঠে কহিলা ফাল্গুনি,—
"তব নারায়ণী সেনা, অতুল জগতে,
এরূপে অর্জ্জুন হায়! করিবে সংহার!
সত্য, দেব দ্বৈপায়ন! বুঝিনু আবার—
মানুষের দৃষ্টি ক্ষুদ্র, অদৃষ্ট অপার!"
"বৃথা অনুতাপ পার্থ!" প্রশান্ত বদনে
উত্তরিলা নারায়ণ,—"সেনা নারায়ণী
সাধিবারে নারায়ণ-কার্য্য ধরাতলে
হইল সৃজিত, সাধি নারায়ণ-কার্য্য
এই দীর্ঘকাল, আজি জলবিম্ব রাশি
মিশাইল মহাজলে ইচ্ছায় তাঁহার;—
গাণ্ডীবি গাণ্ডীব মাত্র করেতে তাঁহার।
এখনো বুঝিলে নাকি, ধ্বংস ক্ষত্রিয়ের,
কৌরব পাণ্ডব সেনা, সেনা নারায়ণী,
ইচ্ছা তাঁর। অধর্ম্মের যেই মহা বিষে
ক্ষত্রিয়ের রক্ত মাংস মজ্জা জর্জ্জরিত,
কার সাধ্য সেই বিষ করিবে উদ্ধার?

এখনো বুঝিলে নাকি, হায়! ক্ষত্রিয়ের
ধ্বংস বিনা ধর্ম্ম-রাজ্য হবে না স্থাপিত;
নিম্ব বৃক্ষে আম্র নাহি ফলিবে নিশ্চিত।"

ধীরে চলিয়াছে রথ। নাহি ক্ষুদ্র পথ
কুরুক্ষেত্রে; মহাক্ষেত্র সমাকীর্ণ এবে
বিকৃত মানব শবে, —দৃশ্য করুণার!
কেহবা নিদ্রিত যেন, প্রশান্ত বদন,—
কেহ দন্তে ওষ্ঠ কাটি, ঘূর্ণিত নয়নে
চাহি আকাশের পানে, মুষ্টিবদ্ধ কর,—
কেহ দন্তে তৃণ কাটি আলিঙ্গি বসুধা—
পড়ে আছে স্থানে স্থানে শোণিত কর্দ্দমে;
কারো অস্ত্র-ক্ষতে হায়! ঝলকে ঝলকে
এখনো শোণিতধারা বহিতেছে বেগে,
অঙ্গে অঙ্গে নানা অস্ত্র রয়েছে বিঁধিয়া।
জীবিত আহত কোথা করি নিষ্পেষিত
ছুটিতেছে পড়িতেছে ক্ষিপ্ত অশ্ব গজ
অঙ্গহীন শত শত, পূরি রণ-স্থল
ভীম নাদে মৃত্যুমুখে। কোথায় আহত
শত শত চাহিতেছে উঠিতে, চলিতে,
—হস্তহীন, পদহীন, ছিন্ন কলেবর,—
করিতেছে হাহাকার ব্যথায় ব্যাকুল।
ছিন্ন হস্তে পদে শিরে, কবন্ধ শরীরে,
ভগ্ন রথে, ভগ্ন অস্ত্রে, মৃত অশ্ব গজে,
আচ্ছন্ন সমর-ক্ষেত্র ক্রোশ ক্রোশান্তর।
শকুনি, গৃধিনী, কাক, শৃগাল, কুকুর
করি ঘোর কোলাহল করিছে ভক্ষণ

অভিন্ন জীবিতে মৃতে। সায়াহ্ন গগনে
আহতের আর্ত্তনাদ,—ভিক্ষা করুণার,
হিংস্র পশু পক্ষীদের ঘোর কোলাহল,
ভীষণ চীৎকার ক্ষত গজ তুরঙ্গের,
মিশি এক ঘোর রবে, কণ্ঠে প্রলয়ের
উঠিছে কি হাহাকার! কিবা হাহাকার
সায়াহ্নের সমীরণে যাইছে ভাসিয়া!

অবতরি স্থানে স্থানে কৃষ্ণ ধনঞ্জয়
আহতের ক্ষতে করি অমৃত সিঞ্চন,
করি মুমূর্ষুর প্রাণে শান্তি বরিষণ,
চলিলেন অশ্রুজলে প্লাবিয়া বদন।
সর্ব্বত্র আহতগণ জিজ্ঞাসে ডাকিয়া—
"আজি কোথা আমাদের সুভদ্রা জননী?
যন্ত্রণায় যায় প্রাণ।" কহিলেন পার্থ—
"কেন আজি সুভদ্রার সেবক, সেবিকা,
সৈন্য-চিকিৎসক সহ, না দেখি, কেশব!
রণস্থলে? প্রাণ বড় হয়েছে আকুল;
সত্বর শিবিরে চল, আসিব ফিরিয়া
সুভদ্রার সহ পুনঃ। কি যে ঘোর রণ,
ধ্বংসের ভীষণ ক্রীড়া, হইয়াছে আজি!—
না পারি দেখিতে আর। পাণ্ডব-সৈন্যের
এই দশা! নাহি জানি সৈন্যে কৌরবের
হইয়াছে অস্ত্রে মম কি দশা ভীষণ!"

চলিতে লাগিল রথ। বসি অন্যমনা
উভয় সারথি, রথী; অজ্ঞাতে কেমনে
পড়িয়াছে চক্র এক দেহে অচেতন,—

অভাগা করুণ কণ্ঠে করিল চীৎকার।
উভয় করুণ কণ্ঠে করিয়া চীৎকার
পড়িলেন ভূমিতলে, লইলেন তুলি
রথে পুনঃ—অচেতন দেহ অভাগার।
"কৌরব সে"—সৈন্য কেহ কহিল বিস্ময়ে।
প্রেম-অশ্রু-পূর্ণ মুখে, কণ্ঠে করুণার
কহিলেন কৃষ্ণ—"ভাই! শত্রু যুদ্ধকালে
কৌরবেরা, যুদ্ধ অন্তে ভাই পাণ্ডবের।
ঝটিকায় যে তরঙ্গ উত্তাল ফেনিল
মহাদ্বন্দ্বী, ঝটিকান্তে অভিন্ন সলিল।"
আবার চলিল রথ। নীরব উভয়
রহিলেন কিছুক্ষণ। কি অজ্ঞাত শোকে
দুইটি হৃদয় যেন আচ্ছন্ন, অচল।
সাশ্রুকণ্ঠে কিছুক্ষণ পরে ধনঞ্জয়
কহিলা—"কেশব! কেন হৃদয় আমার
ভীত আজি, মরু সম বিশুষ্ক বদন,
কাঁপিতেছে অঙ্গ মম, অবসন্ন প্রাণ?
বুঝিয়াছি নিঃক্ষত্রিয় করিতে জগত
জন্ম মম। করিয়াছি আত্মীয় বিনাশ
সে নিয়তি অনুসরি ত্রয়োদশ দিন;—
হয় নাই প্রাণ মম কাতর এমন।
কি যে অমঙ্গল ধ্বনি বাজিছে শ্রবণে,
অদূর মরুর যেন উত্তপ্ত নিশ্বাস
তৃষ্ণাতুর অবসন্ন পথিকের কাণে!
কি যে অমঙ্গল দৃশ্য মনের নয়নে
ভাসিতেছে, অবসন্ন নেত্রে পথিকের

অনন্ত উত্তপ্ত যেন মরু বিভীষণ!
চক্রব্যূহ করি, হায়! দুর্জ্জিয় দ্রোণ
করিলা কি ধর্ম্মরাজে বন্দী আজি রণে?
কিংবা অভিমন্যু তব আছে ত কুশলে?
দেখিতে তাহার মুখ, প্রীতি পুষ্পবন,
আজি কেন প্রাণ মম কাতর এমন?"
চাপি অমঙ্গল চিন্তা স্থিরকণ্ঠে ধীরে
কহিলেন বাসুদেব,—"আছেন কুশলে
ধনঞ্জয়! মহারাজ অমাত্য সহিত।
দুর্ভাবনা কর দূর। মঙ্গল-নিদান
করিবেন তোমাদের অজস্র কল্যাণ।"
উত্তীর্ণ সমর-ক্ষেত্র। নক্ষত্রের বেগে
চলিতে লাগিল রথ। দেখিলা অদূরে
দুই জনে নিরানন্দ পাণ্ডব-শিবির
আভাহীন শোভাহীন বিজয়া-প্রদোষে
যেন শূন্য পূজাগৃহ নিরানন্দময়।
আকুল হৃদয়ে পার্থ কহিলা,—"কেশব!
বাজে না মঙ্গলতুরী, দুন্দুভি, পটহ;
নীরব মুরজ বীণা। পরাভবি সংশপ্তক
আসিতেছি, কই নাহি গায় বন্দিগণ
অগ্রসরি স্তুতিপূর্ণ মঙ্গল সঙ্গীত।
পুর-নারীগণ নাহি গবাক্ষ-দুয়ারে
দাঁড়াইয়া শিবিরের দেয় হুলুধ্বনি,
করে পুষ্প বরিষণ। কই পুত্রগণ,
কই অভিমন্যু কই, আসে না ছুটিয়া
প্রীতিপূর্ণ মুখে করি প্রীতি সম্ভাষণ।

নারায়ণ !"— অর্জ্জুনের ভিজিল নয়ন,—
"পাণ্ডব-শিবির দেখ শূন্য নিরজন !"
চক্রব্যূহ মহা ক্ষেত্র দেখিলা বিস্ময়ে
শোভিছে অদূরে মহা দুর্গের মতন,
শবের প্রাচীরে উচ্চ। জন-স্রোত বেগে
ছুটিয়াছে একস্রোতে সেই দুর্গ পানে ;—
ছুটিল বিদ্যুৎবেগে রথ সেই দিকে।
কহিলা কেশব,—"পার্থ ! চক্রব্যূহ করি
আজি যুঝিলেন দ্রোণ ; সেই চক্রব্যূহ
হইয়াছে শব-ব্যূহ দেখ কি ভীষণ !
স্তরে স্তরে পড়ি শব—অশ্ব, গজ, নর,—
রথের উপরে রথ, শব তদুপর,
দুর্ভেদ্য প্রাচীর মত শোভিছে কেমন !
কোন্ বীর-মণি আজি জগত-বিস্ময়
এ অক্ষয় কীর্ত্তিমালা পরিল গলায় !
দেখিয়াছি বহু যুদ্ধ, করিয়াছি রণ
আজীবন, এ বীরত্ব দেখিনি কখন।"
আর চলিল না রথ ; পড়িলা ভূতলে
লম্ফ দিয়া দুই জন ; করিয়া লঙ্ঘন
উর্দ্ধশ্বাসে সে প্রাচীর, ছুটিলা সত্রাসে,—
হাহারবে সৈন্যগণ উঠিল কাঁদিয়া।
দেখিলেন কুরুক্ষেত্র শোকের সাগর।
শব-চক্র মহাবেলা ; প্রশস্ত প্রাঙ্গণ
ব্যাপিয়া পাণ্ডব সৈন্য, উর্ম্মির মতন
উদ্বেলিত মহা শোকে, কাঁদে অধোমুখে,—
গুণহীন ধনু, পৃষ্ঠে শরহীন তূণ।

রথী মহারথিগণ বসিয়া ভূতলে
কাঁদিতেছে অধোমুখে, যেন আভাহীন
সিক্ত রত্নরাজি পড়ি রত্নাকর তলে।
বাণ-বিদ্ধ মীন যত পাণ্ডব সকল
করিতেছে গড়াগড়ি পড়িয়া ভূতলে।
মূর্চ্ছিত বিরাটপতি; স্তম্ভিত প্রাঙ্গণ।
কেন্দ্রস্থলে অভিমন্যু, শরের শয্যায়,—
সিদ্ধকাম মহা শিশু! ক্ষত কলেবর
রক্তজবা সমাবৃত; সস্মিত বদন
মায়ের পবিত্র অঙ্কে করিয়া স্থাপিত,
—সন্ধ্যাকাশে যেন স্থির নক্ষত্র উজ্জ্বল,—
নিদ্রা যাইতেছে সুখে। বক্ষে সুলোচনা
মূর্চ্ছিতা; মূর্চ্ছিতা পদে পড়িয়া উত্তরা,
সহকার সহ ছিন্না ব্রততীর মত।
কেবল দুইটি নেত্র শুষ্ক, বিস্ফারিত,
এই মহা শোকক্ষেত্রে; কেবল অচল
এই মহা শোকক্ষেত্রে একটি হৃদয়;—
সেই নেত্র, সেই বুক, মাতা সুভদ্রার।
চাপি মৃত-পুত্র-মুখ মায়ের হৃদয়ে
দুই করে, বিস্ফারিত নেত্রে প্রীতিময়,
যোগস্থা জননী চাহি আকাশের পানে,—
আদর্শ-বীরত্ব বক্ষে প্রীতির প্রতিমা।
নীরব বিস্তৃত ক্ষেত্র। থাকিয়া থাকিয়া
কেবল কাঁপিয়া ধীরে মায়ের অধর
গাইতেছে কৃষ্ণ-নাম। মূর্চ্ছিত অর্জ্জুন
পড়িতে, ধরিলা কৃষ্ণ-বাহু প্রসারিয়া।

উচ্ছ্বাসে কহিলা কৃষ্ণ,—"অর্জ্জুন! অর্জ্জুন!
আমরা বীরের জাতি বীর-ধর্ম্ম রণ।
অযোগ্য এ শোক তব। এই বীরক্ষেত্র
করিও না কলঙ্কিত করিয়া বর্ষণ
এক বিন্দু শোক-অশ্রু। তুমি
বীর-শোক অশ্রু নহে, অসির ঝঙ্কার।"
মুহূর্ত্ত আগ্নেয়গিরি হইল কম্পিত।
হইয়া বিদীর্ণ তবে, মুহূর্ত্ত বর্ষিয়া
তরল শোকাগ্নি, বেগে বর্ষিতে লাগিল
বজ্রানল কুরুক্ষেত্র করিয়া কম্পিত।
"অসি! অসি!"—বেগে অসি করি নিষ্কোষিত,
—বিদীর্ণ আগ্নেয়গিরি বর্ষিল গৈরিক,—
"বসাইব কার বুকে কহ, মহারাজ?
অর্জ্জুনেরে পুত্রহীন কে করিল বল?—
প্রহারিল এই বজ্র হৃদয়ে তাহার?
কেশব, পার্থের, আহা! দেবী সুভদ্রার
হৃদয় বিদীর্ণ করি, হৃদয়ের ধন
কে হরিল এইরূপে? দেব-প্রতিভায়,
বিক্রমে, মাহাত্ম্যে, জ্ঞানে, অভিমন্যু মম
কেশবের সমকক্ষ, রথি-গণনায়
আমার অপেক্ষা পুত্র শ্রেষ্ঠ অর্দ্ধগুণে;
হেন মহাবাহু পুত্রে কে জিনিল রণে?
ওই দেখ ভূপতিত আদিত্যের মত
মণ্ডিত কিরণজালে, শোভে পুত্র মম
বিমণ্ডিত শরজালে! সস্মিত বদনে
কুঞ্চিত কেশান্ত মৃদু, ভ্রূযুগ বঙ্কিম,

স্থির নিমীলিত মৃগ-শাবক নয়ন,
সমুন্নত কলেবর শালবৃক্ষ সম,
মৃত্যুরো ছায়ায় দেখ শোভিছে কেমন!
সুদর্শন সংরক্ষিত অমৃত ভাণ্ডার
হরিল কি মৃত্যু আজি? হা পুত্র আমার।
তোমার অভাবে আজি ধরা মৃত্যু-পুরী,
মৃত্যু-পুরী স্বর্গ আজি প্রভাবে তোমার!
জগতের অদ্বিতীয় বীরত্বের রবি
হইল পূর্ব্বাহ্নে অস্ত? কবিতা জ্যোৎস্না
অদ্বিতীয়া নিবিল কি শুক্লা দ্বিতীয়ায়?
নরলোকে নিরুপমা সঙ্গীতের বীণা
নীরবিল আলাপের প্রথম উচ্ছ্বাসে?
প্রকৃতির অতুলিতা তুলী বিনোদিনী
পড়িল কি খসি চিত্র প্রথম আভাসে?
হায়! মাত বসুন্ধরে! প্রকৃতি জননি!
ক্ষত্রিয়ের কুল-লক্ষ্মি! এ দারুণ শোক
তোমরা পার্থের মত সহিবে কেমনে?
উঠ বৎস! উঠ! না, না, নাহি মৃত্যু তোর।
দেবীপুত্র তুই বাছা, ভাগিনা দেবের,
দেবশিশু তুই, ওরে করিতে প্রচার
জগতে দেবত্ব তোর জন্ম ধরাতলে।
দেবতার নাহি মৃত্যু। উঠ বৎস! উঠ!
অচেতনা দেবীমাতা বসিয়া শিয়রে;
অভাগিনী সুলোচনা বক্ষে অচেতনা;
অচেতনা পদতলে আনন্দ প্রতিমা
আমার উত্তরা বধূ। নিজে নারায়ণ

দাঁড়াইয়া পার্শ্বে তোর, মৃত্যুঞ্জয় হরি,—
কি সাধ্য আসিবে মৃত্যু নিকটে রে তোর !
উঠ বৎস ! উঠ ! এই পাপ ধরাতলে
এখনো ত ধর্ম্মরাজ্য হয় নি স্থাপিত।
মানব-উদ্ধার বৎস ! হয় নি সাধিত।
উঠ বৎস ! উঠ ! চল পিতা পুত্র মিলি
এখনি পশিব রণে, নিশীথ আহবে
বিনাশিয়া কুরুকুল, অধর্ম্ম-খাণ্ডব
পোড়াইয়া অস্ত্রানলে ;—ভীষণ কানন,—
ধর্ম্মরাজ্য ইন্দ্রপ্রস্থে করিব স্থাপিত।
বাজাও সমর বাদ্য ! সাজ সৈন্যগণ !
চল সঙ্গে ! পিতা পুত্র আজি এক রথে
যুঝিব, নাশিব শত্রু ; করিব স্থাপিত
ধর্ম্মরাজ্য ; উদ্ধারিব নর নিপতিত।"
শোকোন্মত্ত ধনঞ্জয় যাইতে ছুটিয়া
আস্ফালি গাণ্ডীব অসি, ধরিলা কেশব,—
জ্ঞানবক্ষে শোকবেগে হইল রোধিত।
"এই বিশ্ব লীলাভূমি"—গদ গদ স্বরে
কহিলেন নারায়ণ,—"বিশ্বনিয়ন্তার,
নিয়তির ক্রীড়াক্ষেত্র। জড় ও চেতন
আসে এই রঙ্গভূমে, হয় তিরোধান,
করি ক্ষুদ্র অভিনয় নিয়তির করে।
জ্বলিছে নিবিছে দীপ আলোকিয়া গৃহ
ইচ্ছায় গৃহীর, সাধি কার্য্য গৃহস্থের,—
আলোক প্রদান, পার্থ ! নিয়তি দীপের।
আমি নর ক্ষুদ্র দীপ, গৃহী নারায়ণ।

আমি নর, মনুষ্যত্ব নিয়তি আমার।
জন্মিতেছি, মরিতেছি নিয়তি আমার
পালিতেছি এই রূপে জন্ম জন্মান্তরে
নারায়ণ লীলাভূমে, ক্ষুদ্র চক্র আমি
সেই মহা লীলাযন্ত্রে, নিয়তি পালন
সুখ মম, ঘোর শোক নিয়তি লঙ্ঘন,—
ধনঞ্জয়! নাহি শোক দ্বিতীয় আমার।
দেখ বৎস সাধি বীর-নিয়তি তাহার
মানব উদ্ধার ব্রতে, ব্রতে নিয়ন্তার,
লভিয়াছে সুখ-নিদ্রা কোলে জননীর
শান্তিময়ী, প্রীতিময়ী। নহে শোক-অশ্রু,
ধনঞ্জয়! আনন্দাশ্রু কর বরিষণ।
তোমার, আমার, আজি ভগ্নী সুভদ্রার,
সার্থক জীবন। আজি ধন্য জগতের
দুই মহ কুল: দুই শক্তিস্রোতস্বতী
অভিমন্যু বীরদর্পে করি সম্মিলিত,
করিয়াছে কি প্রয়াগে আজি পরিণত!
কর শোক পরিহার! করি অনুসার
চল এই মহাগতি, সাধিয়া নিয়তি
এইরূপে! দুই জনে লভি নির্বাণ।"
ধনঞ্জয় শোকবেগ করি সম্বরণ
পুত্র-সারথির পানে চাহি জিজ্ঞাসিল।—
"কহ সূত! কোন্ মতে করি মহারণ
লভিল এ মহা শয্যা কুমার আমার?"
"ওকি দেখা যায়!"—ত্রস্তে কহিল সারথি,
চমকিল শ্রোতৃগণ আতঙ্কে বিস্ময়ে—

ওকি দেখা যায় ওই স্থির, বিভীষণ !—
চতুরঙ্গে বিনির্ম্মিত, অস্ত্রে ঝলসিত,
কণ্টকিত যেন ঘন অটবী-সজ্জিত,
ভাস্কর-প্রদীপ্ত দূর-অদ্রি-শ্রেণী মত !
ওকি চক্রব্যূহ ? মনে মানিয়া বিস্ময়
কহিনু,—"কুমার ! হায় ! লঙ্ঘিবে কেমনে
—এখনো বালক তুমি, এ ব্যূহ ভীষণ।'
হাসিয়া কেশরি-শিশু কহিলা নির্ভয়ে—
'খেলিয়াছি এত দিন, করি নাই রণ।
আজি সবিস্ময় সূত ! দেখিবে জগত
"অর্জ্জুনের পুত্র আমি, শিষ্য গোবিন্দের।"
কালের প্রস্তর বক্ষে আজি অসিধারে
লিখিব কৌরব রক্তে অমর-অক্ষরে,—
অর্জ্জুনের পুত্র আমি শিষ্য গোবিন্দের।
লইলা রথের রশ্মি করে আপনার,
ইরম্মদ বেগে রথ ছুটিল তখন।
দেখিলাম বজ্রাঘাতে মহা শৈলমালা
হয় যথা বিচূর্ণিত, হইল চূর্ণিত
কুমারের অস্ত্রে চক্রব্যূহের প্রাচীর।
বিদারিয়া হুহুঙ্কারে শৈল অবরোধ
ছুটি যথা মহানদ প্রবেশে সাগরে,
ফেনিল তরঙ্গে সিন্ধু করি প্রকম্পিত,
মুহূর্ত্তে বিদারি চক্রব্যূহ পরাক্রমে,
উড়াইয়া মহা বেগে, তৃণ-মুষ্টি মত,
মত্ত করি সিন্ধুরাজ দ্বার-রক্ষাকারী,
পশিল কুমার কুরু-সৈন্যের সাগরে

উৎক্ষোভিত, উদ্বেলিত, ভীত, প্রকম্পিত,
বিস্তীর্ণ সমর-ক্ষেত্র ভূমধ্যসাগর।
শোভিতেছে চক্রাকারে চতুরঙ্গ বেলা
মাতঙ্গে, তুরঙ্গে, রথে, সৈন্যে স্তরে স্তরে,
আচ্ছন্ন আয়ুধারণ্যে, ধ্বজ পতাকায়
ঝলসি মার্ত্তণ্ড করে বনরাজিলীলা;
বহির্ম্মুখ অন্তর্মুখে সৈন্য দুই মুখে
সুসজ্জিত; মহাবনে শৈলশৃঙ্গ মত
মহারথে মহারথী দর্পে স্থানে স্থানে
রক্ষিতেছে মহা বূহ; হইতেছে রণ
বহির্ভাগে ঘোরতর, হইতেছে আর
পাণ্ডবের হাহাকারে বিদীর্ণ গগন।
মুহূর্ত্তে অন্তর-সিন্ধু নীরব নিশ্চল।
মুহূর্ত্তে কুমার-বীর্য্য প্রভঞ্জন দর্পে
বহিল জলধিগর্ভে, জলধি-নির্ঘোষে
ধ্বনিল বিজয় শঙ্খ, প্রতিধ্বনি তুলি
শত শত মহাশঙ্খে কৌরব-বেলায়!
কৌরবের সৈন্যারণ্যে উঠিল জলিয়া
হুহুঙ্কারে দাবানল অস্ত্রে কুমারের;
কৌরবের হাহাকারে ছাইল গগন।
দ্রোণ, কর্ণ, দুর্য্যোধন, কৃপ, অশ্বত্থামা,
বৃহদ্বল, দুঃশাসন, শল্য—একে একে
করিয়া সংগ্রাম ঘোর হইয়া লাঞ্ছিত,
পলাইল বার বার শৃগালের মত।
কৌরব-দুর্গতি দেখি কুমার লক্ষ্মণ
পশিলে আহবে, হাসি সুভদ্রা-নন্দন

কহিলা ডাকিয়া স্নেহে,—ভাই রে লক্ষ্মণ!
আমাদের ক্রীড়াক্ষেত্র নহে এ প্রাঙ্গণ।
পিতার দুলাল তুমি, আদরে পালিত
সুখের শয্যায়, শত সম্ভোগের কোলে।
যে অনল দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, অশ্বত্থামা,
না পারি সহিতে গেল পলাইয়া ত্রাসে
বার বার, তুমি ভাই ননীর পুতুল
কেন ঝাঁপ দিলে সেই ঘোর দাবানলে
কেন তাত দুর্য্যোধন এইরূপে হায়!
করিছেন আত্মঘাতী ক্ষত্রিয় জগত?
বিপুলা পৃথিবী,—ক্ষুদ্র ক্ষীণজীবী নর;
বিপুল কৌরব-রাজ্য; কৌরব পাণ্ডব
দুই ভাই; এ দুয়ের হয় না কি স্থান
এ বিস্তীর্ণ পিতৃরাজ্যে দুদিনের তরে?
নাহি হয়, হবে ভাই তোমার আমার,—
তুমি ভানুমতী-পুত্র আমি সুভদ্রার।
এক ক্ষুদ্র আস্তরণে, গলাগলি করি
থাকিতে পরম সুখে পারিব আমরা;
পারিব থাকিতে, স্বর্গে ইন্দ্রের মতন,
মাতা ভানুমতী-অঙ্কে, মাতা সুভদ্রার।
যাও সেই স্বর্গে, যাও শিবিরে তোমার!'
'ওরে দুরাচার! এত আস্পর্দ্ধা রে তোর!'
গর্জ্জিয়া লক্ষ্মণ ক্রোধে তেয়াগিলা শর।
অনিচ্ছায়, অযতনে, কুমার তখন
তেয়াগিলা প্রতি, অস্ত্র। কাটি অর্দ্ধ পথে
লক্ষ্মণের শর, খেলি অগ্নি প্রতিঘাতে

ছুটিল আয়ুধ দৃপ্ত বিদ্যুতের মত।
ডাকিলা কুমার ত্রাসে,—'সম্বর লক্ষ্মণ!'
না পারিল সম্বরিতে দেখিলা যখন,
আঁখি নাহি পালটিতে কাটিতে সে শর
আপনি দ্বিতীয় অস্ত্র করিলা প্রেরণ।
প্রবেশিল পূর্ব্ব শর লক্ষ্মণ-গ্রীবায়
যে মুহূর্ত্তে, সে মুহূর্ত্তে নিল উড়াইয়া
সে শর দ্বিতীয় শরে—কি শিক্ষা-কৌশল!—
তবু ছিন্নগ্রীব ভূমে পড়িলা লক্ষ্মণ।
এক লম্ফে রথ হ'তে পড়িলা ভূতলে
কে যায় ছুটিয়া ওই?—পার্থ! পুত্র তব।
পড়িলা লক্ষ্মণ বক্ষে, শক্তিশেলে হত
লক্ষ্মণের বক্ষে যেন পড়িলা শ্রীরাম।
লক্ষ্মণ! লক্ষ্মণ! ভাই! প্রাণের লক্ষ্মণ!'—
শোকেতে অধীর শিশু কহিলা কাঁদিয়া,—
'লও এই অসি ভাই! হ'ন এই বুকে,
দুই ভাই এক সঙ্গে যাইব রে চলি,
এক বৃন্তে দুই ফুল ফুটিব ত্রিদিবে
নারায়ণ পদতলে।' মুছাইয়া অশ্রু,
মৃত্যু-মুখে ক্ষীণ-কণ্ঠে কহিলা লক্ষ্মণ—
'না না' ভাই অভিমন্যু! থাক তুমি ভাই
নারায়ণ পদতলে ফুটিয়া এখানে
পবিত্রিয়া পিতৃ-কুল, মোহিয়া জগত!
হায়! যেই পাপানলে ভস্মিছে কৌরব,
ভস্মিছে ক্ষত্রিয় জাতি, একটী পল্লব
নাহি ছোঁয় যেন তব,—এই ভিক্ষা চাহে

নারায়ণ পদতলে মুমূর্ষু লক্ষ্মণ!'
কুরুক্ষেত্র শোকক্ষেত্র। কিন্তু শোকতর
দৃশ্য আরো ছিল ভাগ্যে ভাবিনি তখন।
বর্ষিল শোকের বর্ষা; জীমূত গর্জ্জনে
গর্জ্জি দুঃশাসন আসি কহিল গর্জ্জিয়া,—
'ওরে কাপুরুষগণ! এখনো কি তোরা
রেখেছিস্ এই পুত্র-হন্তায় জীবিত?
যা রে দুরাচার শিশু! যা রে রথে তোর,
লক্ষ্মণের সঙ্গী তুই হইবি এখন।'
আবার বাজিল রণ। দম্ভোলি-দর্শন
ছুটিল আয়ুধরাশি। মুহূর্ত্তেক পরে
নির্ব্বাপিত বজ্রমত গেল লুকাইয়া
সংজ্ঞাহীন দুঃশাসন। একে, একে,
সপ্ত মহারথী পুনঃ পশিলা সংগ্রামে।
গর্জ্জিয়া কহিলা কর্ণ,—'কাপুরুষ-সুত
পিতা তোর নপুংসক করিয়া আশ্রয়
করে রণ লজ্জাহীন; তোর রণ-সাধ
বড় হাস্যকর। শুধু স্নেহেতে কেবল
এতক্ষণ তোর আমি রেখেছি জীবন।
যা চলি এখন আমি দিলাম অভয়।'
'তাত কর্ণ!'—হাসি শিশু করিল উত্তর,—
'বড় দুঃখ, এ স্নেহের দিতে প্রতিদান
অশক্ত এ ক্ষুদ্র শিশু। হইলে নিধন
তোমরা আমার অস্ত্রে স্নেহ-বিনিময়ে,
হবে পিতা পিতৃব্যের প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন,—
তাই পলায়ন-পথ উন্মুক্ত এমন।

'শিব না তব্ধ আমি ; কিন্তু শাখাগণ
তোমাদের কর রক্ষা,—পারিলে না হায় !
রক্ষিতে লক্ষ্মণে কেহ। দিতেছি প্রথম
পিতৃ-নিন্দুকেরে দণ্ড, কর সম্বরণ।'
ছুটিল কাণক অস্ত্র কাক-পক্ষ-ময়,
ফুটিয়া কর্ণের কর্ণে অলক্ষিত বেগে
রহিল ঝুলিয়া,—শল্য উঠিলা হাসিয়া
অন্য অস্ত্রে কর্ণানুজ পড়িল ভূতলে।
শল্যানুজ এই রূপে শল্যের সম্মুখে
হইল পতিত ; শেষে হইল পতিত
মহারথী বৃহদ্বল ; ছয় রথী আর
সিন্ধু-বেলা-প্রতিহত-লহরীর মত,
দেখিলাম ক্রমে ক্রমে গেল লুকাইয়া
তখন বাহিত সৈন্যে, ধন গীরন্ধ্রের
বর্ষিতে লাগিল মৃত্যু বরিষার মত,
পড়িল কৌরব-সৈন্যে মহা হাহাকার
নিরুপায় সপ্তরথী একত্রে তখন
—ক্ষত্রিয়ের সে কলঙ্ক কহিব কেমনে ?—
আক্রমিল এক মাত্র শিশু অসহায়,
আক্রমে নিষাদগণে শার্দ্দূল যেমতি
জালাবদ্ধ,—বসুন্ধরে ! যাও রসাতল
কর্ণ কাটিলেন ধনু ;—অশ্ব ভোজরাজ
ছিন্নধনু, রথহীন, খড়্গ চর্ম্ম ধরি
রথ হ'তে লম্ফ দিয়া পড়িলে ভূতলে
শত্রু মধ্যে, মেঘ মধ্যে ক্ষিপ্ত সিংহ যথা,—
দ্রোণ অসি, কর্ণ চর্ম্ম, ফেলিলা কাটিয়া

তখন ধরিয়া চক্র, চক্রধর মত
শোভিল কুমার তব। কাটিয়া অরাতি
আসিছে ফিরিয়া চক্র করে কুমারের
মুহুর্মুহু, খেলা করি বিদ্যুতের মত।
বরষি অজস্র শর সপ্তরথী মিলি
কাটিলা সে মহাচক্র, বিঁধিলা শরীর
বীরেন্দ্রের অবিচ্ছিন্ন। সেই বীর-শোভা,
পুষ্পিত কিংশুক সম ক্ষিক্ষত মূরতি,
ভ্রূকুটি-কুটিল-মুখ, আরক্ত নয়ন।
আকর্ণ বিস্তৃত, ঊর্দ্ধ ধৃত-চক্র বাহু,
সপ্তরথী সম্বেষ্টিত সে নির্ভীক রণ,
ঘন ঘন সিংহনাদ, ঘোর অট্টহাসি,
যে দেখেছে, যে শুনেছে তব তনয়ের
ভুলিবে না ইহ জন্মে। ছিন্ন-চক্র, শিশু
তখন লইয়া গদা, গদাধর মত
ছুটিল, পড়িয়া ভূমে ভয়ে দ্রোণাত্মজ
রথ হ'তে তিন লম্ফে গেল পলাইয়া।
সুবলনন্দন সপ্ত, সপ্ততি গান্ধার,
রথী সপ্তদশ, দশ মাতঙ্গ বিনাশি,
চূর্ণ করি অশ্ব রথ সারথি সহিত
দুঃশাসন তনয়ের, গদা যুদ্ধে ঘোর
গদাঘাতে দুই জন পড়িলা ভূতলে।
না উঠিতে পুত্র তব,—অবসন্ন প্রাণ
রণ-শ্রমে, রক্তস্রাবে,—দুঃশাসন সুত
—ক্ষত্রকুলে কুলাঙ্গার নৃশংস পামর,—
প্রহারিল গদা অর্দ্ধ-উত্থিত মস্তকে,—

ধনঞ্জয়! পুত্র তব উঠিল না আর।
'অধর্ম্ম! অধর্ম্ম! ঘোর'—ঘোর হাহাকার
জলধি-কল্লোল মত উঠিল চৌদিকে।
অধোমুখে সপ্তরথী ফিরিলা শিবিরে,—
রাধেয় মূর্চ্ছিত রথে। নিক্ষেপিয়া দূরে
কুরুসৈন্য অস্ত্র শস্ত্র, মুমূর্ষু বেড়িয়া
[illegible] লাগিল শোকে অশ্রু বারিষণ
কহিলা কুমার—'সূত! ললাটে আমার
লেখ হৃদয়ের রক্তে, শরের জিহ্বায়,
কৃষ্ণার্জ্জুন নাম, মধ্যে মাতা সুভদ্রার,
লেখ বুকে অনাথিনী নাম উত্তরার।'
খুলিলাম শিরস্ত্রাণ, ছিঁড়ি উরস্ত্রাণ
লিখিলাম,—হায়! লেখা যাইতেছে ভাসি
অশ্রুজলে লেখকের। চাহি ঊর্দ্ধ পানে
প্রীতি বিস্ফারিত নেত্রে, গাইতে গাইতে
পুণ্য নাম চতুষ্টয়, কহিতে কহিতে—
'নারায়ণ—ধর্ম্মরাজ্য—পতিত উদ্ধার'
শুনিতে শুনিতে—'জয়! অভিমন্যু জয়!'—
অনন্ত কৌরব কণ্ঠে, মুদিল নয়ন,
ঘুমাইল শিশু যেন কোলে জননীর;—
দেখিলাম দুই রবি গেল অস্তাচলে।
দেখ এই বীর-শয্যা; এই দেখ আর
মৃত-চক্র-ব্যূহে কিবা বীরত্ব অপার!
দেখ ক্ষত কলেবর তব সারথির।
পুত্র-সারথির দেখ অক্ষত শরীর!
"অদ্ভুত! অদ্ভুত কথা এ নহে সম্ভব!

পুত্রের যে এ বীরত্ব পিতার দুর্ল্লভ।”—
ভ্রমি অধোমুখে ধীরে কহিলা ফাল্গুনি।
“শুনিয়াছিলাম যেন কহিছে যুযুৎসু—
‘অধার্ম্মিক রথিগণ! এ অধর্ম্ম ফল
অর্জ্জুনের অস্ত্রমুখে লভিবি অচিরে।’
নারায়ণ! তুমি কি তা করনি শ্রবণ?
হায়! হায়! সুধৌতাগ্র সপ্তরথী শরে
হইয়া পীড়িত-বুঝি অসহায় শিশু
স্মরিল—‘হা পিত! কোথা, কোথায় মাতুল!’
না না, সে যে পুত্র মম, ভাগিনা তোমার
সুভদ্রার গর্ভজাত, এ বীরত্ব গাথা
যে লিখিল কাল-বক্ষে, হেন আর্ত্তনা
সে কেন করিবে? কিন্তু—ধিক্ ধর্ম্মরাজ!
ভ্রাতৃগণ! সমবেত পাণ্ডব পাঞ্চাল!
এইরূপে ব্যাধগণ বধিল শিশুরে!
ছিলে কি নিদ্রিত সবে? বর্ম্ম, চর্ম্ম, অসি,
রমণী-ভূষণ মত কর কি ধারণ?”
নত শিরে যুধিষ্ঠির বাষ্পরুদ্ধ স্বরে
কহিলা কাতর শোকে,—“ধনঞ্জয়! তুমি
জিজ্ঞাসিলে কার বুকে বসাইবে অসি?
হান মম বুকে, আমি পুত্রহন্তা তব।
প্রবেশিল অভিমন্যু আদেশে আমার
চক্রব্যূহে বজ্র বেগে, সার্থক জীবন
দেখিলাম সে বীরত্ব মানব-অতীত।
দাঁড়াইল জয়দ্রথ, অবরোধি দ্বার
হিমাচল শৃঙ্গ সম, টলাইতে তারে

না পারিল সমবেত পাণ্ডব পাঞ্চাল"
"হা পুত্র!"—নিশ্বাসি দীর্ঘ বিধূমিত গিরি
করিতে লাগিল পুনঃ অগ্নি বরিষণ—
"হায় পুত্র! মত্ত সিংহ-শাবকে এরূপে
লোহার পিঞ্জরে বন্দী করিয়া কৌশলে,
ভুলিয়া সৌহৃদ্য মম, ভুলি প্রাণ-দান,
জয়দ্রথ করিল কি অবরুদ্ধ দ্বার!
জয়দ্রথ! জয়দ্রথ!"—কৌরব শিবির
চাহিয়া গর্জ্জিলা ক্রোধে উন্মত্ত অর্জ্জুন,
কুরুক্ষেত্র থর থর উঠিল কাঁপিয়া।
নিক্ষেপি গাণ্ডীব ধনু বামে ও দক্ষিণে
কাঁপায়ে কোদণ্ড-শব্দে কুরুক্ষেত্র পুনঃ
কহিলেন,—"ধর্ম্মরাজ!
এ প্রতিজ্ঞা মম,—
না লয় আশ্রয় তব কালি জয়দ্রথ,
না লয় পুরুষোত্তম কৃষ্ণের আশ্রয়,
কালি জয়দ্রথে আমি করিয়া সংহার
বরষিব শান্তি-বারি এই শোকানলে
আমাদের। নারায়ণ!"—পড়ি পদতলে
গোবিন্দের—"নারায়ণ! এই পাদপদ্ম,
অর্জ্জুনের শান্তি-ধাম, করিয়া ধারণ,
চাহি পুত্র পানে বীর-শয্যায় শায়িত,
করিলাম এ প্রতিজ্ঞা,—দেখিয়া জীবিত
জয়দ্রথ কালি রবি হয় অস্তমিত,
এইখানে হুতাশন করি প্রজ্জলিত,
পিতা পুত্র এক চিতা করিবে প্রবেশ।

কে বুঝিবে তব লীলা। ঘোর অমঙ্গলে
এইরূপে সাধ তুমি মানব-মঙ্গল!
বুঝিলাম এই শোক শিক্ষা অর্জ্জুনের।
অধর্ম্মের অভ্যুত্থান বুঝিলাম হায়!
এত দিনে, এত দূরে; বুঝিলাম আর,
ধনঞ্জয় শ্লথ করে, আবৃত অসিতে,
বুঝিয়া করিতেছিল বৃদ্ধি নর-মেধ,
মায়াবশে ভ্রান্ত মতি; সপ্তরথী আজি
খুলিল অসির সেই স্নেহ-আবরণ,
শাণিত করিল ধার, করিল সঞ্চার
শ্লথ করে বিদ্যুতাগ্নি, খুলিল নয়ন,—
'ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র' বুঝিনু এখন।"
উঠি বেগে নিষ্কোষিত করি ভীমা অসি,
আস্ফালি,—"এখন এই অসি অর্জ্জুনের
অজস্র শোণিত-উৎস করিবে খনন
অধর্ম্মী অরাতি-বক্ষে; গর্জ্জিবে গাণ্ডীব
প্রলয়ের মেঘমন্দ্রে; ছুটিবে আয়ুধ
কেন্দ্রভ্রষ্ট প্রলয়ের সূর্য্যগণ মত।
পারিল না পিতা, পুত্র করিল স্থাপিত
আজি ধর্ম্মরাজ্য দিয়া আত্ম-বলিদান।
বাজাও বিজয় শঙ্খ মহারথিগণ!
কালি জয়দ্রথে বধি, ষষ্ঠাহ অতীত
না হইতে অরিকুল করি নির্ম্মূলিত,
আমরা করিব সেই সাম্রাজ্য ঘোষিত!"
মহাশব্দে পাঞ্চজন্য উঠিল বাজিয়া
দেবদত্ত শঙ্খ সহ; বাজিল তখন

সহস্র সহস্র শঙ্খ ; ঝটিকা গর্জ্জন
উঠিল ভরিয়া যেন সায়াহ্ন গগন।

ষোড়শ সর্গ।

—*—

শোকে শান্তি।

—*—

হত-বৎস-শার্দ্দুলের ভীষণ গর্জ্জন মত
শোকে ক্রোধে নিনাদিত শঙ্খের ঝঙ্কার
মূর্চ্ছা বধূ উত্তরার ভাঙ্গিল, উঠিয়া বালা
দাড়াইল উন্মাদিনী চিত্রিতা আকার।
কুন্তল আলুলায়িত করিয়াছে বিমণ্ডিত
সোণার প্রতিমাখানি ; হাসি খল খল
কহে বাহু প্রসারিয়া,—"সুলিমা ! সুলিমা
চক্রব্যূহ জিনি অভি আসিছে রে, চল
আজি বীর-পত্নী মত রণজয়ী বীরে
চল্ যাই আবাহন করিব অভিরে
উঠ্ পোড়ামুখি ! উঠ্ ! তোর এই চিরকাল,—
দুঃখের সময়ে তুই কাঁদিস্ সতত,
সুখের সময়ে নিদ্রা যাস্ এই মত।
উঠ অভাগিনি ! উঠ !"—কহে করে ঠেলি।

"নারায়ণ! নারায়ণ!"—পড়িয়া গলায়
গোবিন্দের কহে পার্থ—"এই দৃশ্য আর
না পারি সহিতে, বুক বিদরিয়া যায়।"
"একি? রক্ত! একি? অভি! কোথা আমি?"—
চারিদিক চাহি উন্মাদিনী মত ঘূর্ণিত নয়নে,—
"ও কে কাঁদিতেছে? বাবা! ও কে অধোমুখে ওই?
নারায়ণ! কেন দেব! বিষণ্ণ বদনে?"
ছুটি উন্মাদিনী গলা ধরি গোবিন্দের
কহিলা কাঁদিয়া,—"দেব! কহ একবার,
ভাঙ্গিয়াছে কপাল কি তব উত্তরার?
তাহার পুতুল খেলা নাহি ফুরাইতে, নাথ!
ফুরাইল জীবনের খেলা কি তাহার?
ভাঙ্গিয়াছে কপাল কি তব উত্তরার?

মামা যার নারায়ণ, জনক গাণ্ডীব-ধন্বা,
জননী সুভদ্রাদেবী, এই দশা তার?
ভাঙ্গিয়াছে কপাল কি তব উত্তরার?
সমরে যাইতে আজি শূলাগ্রে ছিঁড়িল হার,
রহিয়াছে সেই হার অঞ্চলে আমার,
উত্তরা কি সেই হার পড়িবে না আর?
শিবিরে সজ্জিতা বীণা এখনো রয়েছে পড়ি,
উত্তরার বীণাটি কি বাজিবে না আর?

ভাঙ্গিয়াছে কপাল কি তব উত্তরার?
তুমি উত্তরার হাসি কত যে বাসিতে ভাল,
মুছাইলে এইরূপে সে হাসি কি তার
ভাঙ্গিয়াছে কপাল কি তব উত্তরার?
দেখিলাম স্বপ্নে আমি, আনি চারু পুষ্পরথ

আজি বুঝি সেই মতে চক্রব্যূহ একরথে
ভেদিয়া, করিয়া এই ভীষণ প্রলয়,
—আমি যে অর্জ্জুন যাহা আমার বিস্ময়।—
হাসি শিশু খল খল, উল্লাসে কহিল বুঝি,—
'দেখ বাবা, মামা তুমি দেখ না আসিয়া,
বার বার সপ্তরথী যায় পলাইয়া।
ছিনু সংশপ্তক রণে না শুনিনু দুই জনে,
সেই অভিমানে বুঝি শর-শয্যা করি
রহিয়াছে ধরাতলে এইরূপে পড়ি।
উঠ বাবা! উঠ চল! মনে বড় কুতূহল
জনক মাতুল তোর সেই মহারণ
দেখিবে, করিবে আর সার্থক জীবন।
উঠ ভদ্রা, উঠ দেবী, বীরজননীর মত
সাজাইয়া বীরপুত্রে বীর আভরণে
চল যাই, এই রণ দেখি তিন জনে।
পতি-রথ-রশ্মি ধরি দেখেছিলে একবার
যে বীরত্ব, রথ-রশ্মি ধরি আরবার
পুত্রের বীরত্ব দেখ কত কল্প শ্রেষ্ঠতর,
কোথায় সরসী, আর পয়োধি ফেনিল!
কোথায় ঝটিকা, আর মলয় অনিল!"
"না না, ধনঞ্জয়!"—কৃষ্ণ কহিলা করুণ কণ্ঠে—
"কুরুক্ষেত্র কর্ম্মক্ষেত্র, রঙ্গভূমি নয়
বড় ভাগ্য আমাদের, বড় ভাগ্য মানবের,
এই মহা শর-শয্যা নহে অভিনয়।
ওই শর-শয্যা পার্থ! এই শর-শয্যা আর
উভয় মহিমাময়। কিন্তু কত দূর

প্রৌঢ়ের বীরত্বে, আর শূরত্বে-শিশুর !
ভীষ্মদেব মরুভূমি ; অভিমন্যু উপবন।
নব কিসলয়ে পুষ্পে সুন্দর শ্যামল।
সে ভীষণ লবণাম্বু ; এ পবিত্র সুধা সিন্ধু।
সে বন্ধুর বিন্ধ্যগিরি ; এই হিমাচল।
শিরে দেবী মন্দাকিনী সুভদ্রা-রূপিণী ওই,
বহে বক্ষে দুই ধারা, জাহ্নবী যমুনা,
পত্নী-প্রেম মাতৃ-প্রেম, উত্তরা ও সুলোচনা,
বারাণসী-বক্ষে যেন অসি ও বরুণা !
সম্মিলিত এই স্রোতে, বীরত্বের ব্রহ্মপুত্র
মিশিয়া করেছে কিবা তীর্থের সৃজন—
এই শর-শয্যা গঙ্গা-সাগর-সঙ্গম ;
সেই সিন্ধু নারায়ণ। মাতৃ-প্রেম, ধাতৃ-প্রেম,
পতি-প্রেম, পিতৃ-প্রেম, ভ্রাতৃ-প্রেম আর,
এই রূপে শত প্রেম, উপজিয়া শত ক্ষেত্রে,
মিলি এক স্রোতে,—নর-প্রেম দুর্নিবার,
পশিয়াছে শত মুখে প্রেম-পারাবার।
কুরুক্ষেত্র কর্ম্মক্ষেত্র ; কিন্তু কত রূপান্তর,
বীর ব্রতে প্রৌঢ়ের সে সমর্পণ প্রাণ !
নরহিতে শিশুর এ আত্ম-বলিদান !
সুভদ্রে !"—ডাকিলা কৃষ্ণ উচ্ছ্বাস-কম্পিত কণ্ঠে।
পশে নাই যে কর্ণে শঙ্খের গর্জ্জন
শত শত, প্রবেশিল মৃদু সম্ভাষণ
ধীরে উদ্ধ-দুনয়ন নামিল, রহিল চাহি
কেশবের মুখপানে, ভক্তি ছল ছল।
"সুভদ্রে !"—কহিলা কৃষ্ণ—' নাহি আমাদের শোক,

গাও প্রেমপূর্ণ-স্বরে মানব-মঙ্গল!
যশস্বী কুমার তব লভিয়াছে যেই গতি,
কোন জননীর পুত্র লভেছে কথন?
আমরা সকলে মিলি সাধিতেছি যেই ব্রত,
একা অভিমন্যু আজি করিল সাধন।
সকল জীবন-ব্রত, অধর্ম্ম হয়েছে হত,
ধরাতলে ধর্ম্মরাজ্য হয়েছে স্থাপিত।
গাইছে মানব জাতি কি মঙ্গল গীত!"

এতক্ষণে জননীর বহিল নয়নে দুই
নিরমল বারিধারা, নহে শোক-জল,
আনন্দাশ্রু ভকতির আলোকে উজ্জ্বল।
"দয়াময়! নাহি শোক"—বাজিল ত্রিতন্ত্রী যেন
ভকতির পরশনে করুণা হিল্লোলে,—
"দয়াময়! নাহি শোক, সাধিল তোমার কর্ম্ম
পুত্র যার, তার শোক নাহি ধরাতলে।
ক্ষত্রিয়ের গুরু দ্রোণ, ভুজবলে তাঁর পণ
ষোল বৎসরের শিশু লঙ্ঘিল যাহার,
সেই বীর-জননীর শোক কি আবার?
ক্ষত্রিয়ের শিরোমণি সপ্তরথী এক রথে
ষোল বৎসরের শিশু জিনিল যাহার,
সেই বীর-জননীর শোক কি আবার?
সম্মিলিত সপ্তরথী সম্মুখে ভাঙ্গনাহবে
এই শর-শয্যা শেষে হইল যাহার,
তার জননীর শোক সম্ভবে কি আর?
ক্ষুদ্র লতা দুরবল, প্রসবি বৃহৎ ফল,
তাপিত মানব প্রাণ করে সুশীতল;

তব পদাশ্রিতা লতা পুণ্যবতী ভদ্রা তথা
প্রসবিয়া অভিমন্যু এই মহা ফল,
সাধিয়াছে যদি দেব! মানব-মঙ্গল,—
লতার ত এই সুখ; পূর্ণ সুভদ্রার বুক
মাতৃ-প্রেমে, পাদপদ্মে লও উপহার
সেই প্রেম, সুভদ্রার শোক কি আবার?
সমগ্র মানব জাতি আজি অভিমন্যু মম,
আজি অভিমন্যু মম বিশ্ব চরাচর।
এক নর-পুত্র মম হারাইয়া, লভিয়াছি
আজি কি মহান্ পুত্র অনন্ত অমর!
বড় ভাগ্যবান পুত্র, তাহার নিয়তি পূর্ণ!
অপূর্ণ নিয়তি আছে এখনো ভদ্রার,—
ধরাতলে কৃষ্ণ নাম হয় নি প্রচার।
অনন্ত অমর পুত্রে আনন্দে লইয়া বুকে
এইরূপে, শিখাইব নাম নিরমল;
কর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে এরূপে করিয়া রণ
শিখাইব সাধিবারে মানব-মঙ্গল!"
নীরব নিশ্চল কৃষ্ণ, বিস্ফারিত দুই নেত্রে
চাহি আকাশের পানে শান্তির আধার।
শোক-ঝড়-বিলোড়িত হৃদয়েতে অর্জ্জুনের,
শান্তির অনীল ধীরে হইল সঞ্চার।
চাহি দূর শূন্য পানে অস্ফুট অস্ফুট যেন
দেখিলা সে পুত্রমুখ অনন্ত অমর,
ছুটিল হৃদয়ে নব প্রীতির নির্ঝর।
মুখ ফিরাইয়া কৃষ্ণ ডাকিলেন—"সুলোচনে!"
শুনিল না সুলোচনা, শুনিবে না আর।

পরশি ললাট কৃষ্ণ দেখিলেন, রহিলেন
চাহিয়া নীরবে, মুখ গাম্ভীর্য্য আধার
"না না, দেব ! নিদ্রা তার"—কহিলেন ভদ্রা দেবী—
"না না, দেব ! নিদ্রা তার ভাঙ্গিবে না আর।
তাঁহারো নিয়তি পূর্ণ, কি দয়া তোমার !
তব পদ হিমাচলে উপজি আনন্দ জলে
যে অনন্ত নির্ঝরিণী বহিল ছুটিয়া,
তার এক ক্ষুদ্র ধারা—পুণ্যময়ী সুলোচনা—
ভদ্রার্জ্জুন প্রেম-স্রোতে গেল মিলাইয়া,
অভিমন্যু পুত্রে আজি হৃদয়ে লইয়া।
হাসে নাহি নিজ সুখে, কাঁদে নাহি নিজ দুখে,
চিরদিন প্রেমময়ী সলিলের মত
আপন তরল প্রাণ পরে করিয়াছে দান,
সুলোচনা চিরদিন পর-প্রাণগত।
তাহার নিয়তি ক্ষুদ্র, কিন্তু দেব ! কি গভীর
কি নিষ্কাম, নিরমল, কিবা পুণ্যাধার !
অতি ক্ষুদ্র কর্ম্ম পথে, মানব যাইতে পারে
অনন্ত সুখের পার, বৈকুণ্ঠে তোমার,
পুণ্যবতী সুলোচনা আদর্শ তাহার।
যাও দিদি, যাও তবে, হায় ! অভিমন্যু সহ
হইয়াছে পরিপূর্ণ নিয়তি তোমার।
আশীর্ব্বাদ কর, যেন তুমি পুণ্যবতী মত
পর-পুত্র বুকে প্রাণ যায় সুভদ্রার,—
নারায়ণ ! পূর্ণ কর নিয়তি তাহার !"
সঙ্গে শিষ্য দ্বৈপায়ন আসিলেন ধীরে ধীরে,
উভয়ের ঊর্দ্ধনেত্র, ঊর্দ্ধ বাহুদ্বয়,

সুপবিত্র হরিনাম, উভয়ে করিছে গান,
বিগলিত প্রেম-অশ্রু দুনয়নে বয়।
স্থির গাত্র উর্দ্ধনেত্রে, চিত্রার্পিত কুরুক্ষেত্র
এ সঙ্গীত ভক্তিভরে করিল শ্রবণ।
চাহি অর্জ্জুনের পানে শান্ত স্থির দুনয়নে
কহিলেন দ্বৈপায়ন উচ্ছ্বসিত মন,—
"ধনঞ্জয়! শোক তব কর পরিহার।
বিশ্বক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র বিশ্ব-নিয়ন্তার।
এ বিশ্বের স্তরে স্তরে রয়েছে লিখিত
অভ্রান্ত ভাষায়,—নাহি হইতে সৃজিত
ক্ষুদ্রতম জীব-বীজ, গিয়াছে বহিয়া
কি অনন্ত কাল বিশ্ব ভাঙ্গিয়া গড়িয়া।
ছিল কত শত জীব, আজি নাহি আর;
কত শত নব জীব হইবে আবার
কে বলিবে! কিবা মহা কালের হুঙ্কার!
উঠিছে পশ্চাতে, আর সম্মুখে তোমার।
কালের তরঙ্গে যদি নেয় ভাসাইয়া
মানব-জীবন-বীজ, দেয় মুছাইয়া
পৃথিবীর বক্ষ হ'তে মানবের নাম,
সর্ব্ব জীবনের বীজ করে তিরোধান,
তথাপি এ মহাবিশ্ব যাইবে ছুটিয়া
অনন্ত কালের গর্ভে ভাঙ্গিয়া গড়িয়া।
ভাঙ্গিতেছে পুরাতন গাড়ছে নূতন,
জগতের নীতি এই মহা বিবর্ত্তন।
এই বিবর্ত্তন গর্ভে আমি ক্ষুদ্র নর,
কেমনে রহিব স্থির, হইব অমর?

পুত্র যাবে, পৌত্র হবে, প্রপৌত্র আবার,
এই বিবর্ত্তনে,— শোক কর পরিহার।
সৃজন, পালন, লয়, করিছে সাধন
মুহূর্ত্তে অনন্ত এই নীতি-বিবর্ত্তন।
কি সে নীতি, কে নিয়ন্তা, কিছুই না জানি;
আছেন উভয়, জানি ক্ষুদ্র নর আমি।
চেয়ে দেখ বীণা যন্ত্র কত ভিন্ন তার।
আকৃতি, প্রকৃতি, স্বর, স্বতন্ত্র সবার।
কিন্তু সর্ব্ব তার হয় এক স্বরে লয়,
সেই মূল স্বরে তার বাঁধা সমুদয়।
মহা যন্ত্র বিশ্ব-রাজ্য কর দরশন!
চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা, দেখ অগণন!
আকৃতি, প্রকৃতি, গতি, স্বতন্ত্র সকল,
নিত্য বিবর্ত্তিত বিশ্ব তবু সুশৃঙ্খল
এক মহা নীতি বলে; কি নীতি না জানি,
কে নিয়ন্তা নাহি জানি, এই মাত্র জানি
সেই নীতি এই বিশ্ব করিছে ধারণ
বিশ্বের সে মূল নীতি, ধর্ম্ম সনাতন।
আর জানি সে নিয়ন্তা এই বিশ্ব-স্বামী
তিনি মাতা, তিনি পিতা, তিনি অন্তর্য্যামী
তাঁহার নীতিতে বিশ্ব হতেছে চালিত
কল্প কল্পান্তর, হ'য়ে ঘোর বিবর্ত্তিত,
অনন্ত উন্নতি পথে। এই বিবর্ত্তনে
ঝরে যথা শোক-অশ্রু মানব-নয়নে,
ফুটে তথা সুখ-হাসি মানব-বদনে।
কেন অশ্রু, কেন হাসি, কিছুই না জানি;

সকলি তাঁহার ইচ্ছা ; এই আমি জানি
এই হাসি-অশ্রু-পূর্ণ বিবর্ত্তন-রথে
ছুটিছে মানব নিত্য উন্নতির পথে।
আমি সে মানব-অংশ, পুত্রও আমার ;
আমি মার, মরে পুত্র, শোক কি আবার ?
মরে পিতা, মরে পুত্র, না মরে মানব !
নাহি হয় উন্নতির তিলার্দ্ধ লাঘব।
জলবিম্ব যায় পার্থ ! মিশাইয়া জলে।
একে ভাটা, অন্য দিকে জোয়ার উছলে।
এই উন্নতির পথ ; শোক, বিঘ্ন তার।
এ শোকে মানব আজি করে হাহাকার।
নর-শোকে পুত্র-শোক করি নিমজ্জিত,
আপন নিয়তি উচ্চ করিয়া পালিত,
তব বীর-পুত্র মত, হও অগ্রসর
মানব-উন্নতি পথে। ওই শিরোপর
নারায়ণ, উন্নতির পূর্ণ পরিণতি !
চারিদিকে উন্নতির বিবর্ত্তন-গতি
বিলোড়িত করি বিশ্ব যাইছে ছুটিয়া
কি প্রখর বেগে বিশ্ব ভাঙ্গিয়া গড়িয়া !
চল ভাসি মানবের সাধিয়া মঙ্গল,
আনন্দে গাইয়া "হরে ! মুরারে" কেবল।
শিষ্য উদাসিনী স্থির দাঁড়াইয়া এতক্ষণ,
উদ্ধনেত্রে আত্মহারা হৃদয় অচল।
জানু পাতি বসি ধীরে, মৃত কুমারের শিরে
বর্ষিল চুম্বন, দুই বিন্দু অশ্রুজল।
নীরবে উঠিয়া গিয়া পড়ি পার্থ-পদতলে,

কহিল—"চাহিয়া দেখ শৈলজা তোমার
তব পদতলে, পূর্ণ তপস্যা তাহার।"
"শৈলজে! শৈলজে!"—পার্থ উচ্ছ্বাসে উন্মত্ত প্রায়
লইলা তুলিয়া বুকে নীলাব্জ প্রতিমা,
শোভিল সুনীলাকাশে সন্ধ্যার নীলিমা।
"শৈলজে! শৈলজে! শৈল!"—সরিল না কথা আর
শোকপূর্ণ হৃদয়ে যে ছুটিল উচ্ছ্বাস,
নাহি তার ভাষা, পার্থ স্থির চিত্রাঙ্কিত প্রায়
রহিলেন আত্মহারা চাহিয়া আকাশ।
শৈলজা পড়িয়া পুনঃ অর্জ্জুনের পদতলে,
চাহি শান্ত দুনয়নে, কহে পুনর্ব্বার—
"অজ্ঞানী মানব নাথ! কল্পনা করিয়া যথ
নারায়ণ রূপ, পূজা করি দেবতার,
হয় পূর্ণ মনোরথ, দেখে জীবনের পথ,
দেখে শান্তি-সুধা-পূর্ণ জীবন-নির্ঝর,
অন্ত অন্তরালে দেখে অনন্ত ঈশ্বর;
তেমতি পূজি তোমায়, শৈলজার দেবতায়
ক্ষুদ্র নিয়তির রেখা করেছি দর্শন,
পূজি নর, পাইয়াছি নর নারায়ণ।
পতিত-পাবনী মাতা সুভদ্রার পদতলে
শুনিলাম কর্ণে যেই নাম পুণ্যময়,
আজ পুত্র পুণ্যবান দিয়া আত্ম-বলিদান,
লিখিল হৃদয়ে নাম অমৃত-নিলয়।
চতুর্দ্দশ বৎসরের তপস্যার পরে নাথ!
ছিল যেই শুভ্র ছায়া প্রাণে কামনার,
পুত্র আজি প্রাণ দিয়া মুছাইল সেই ছায়া,

পতি, পিতা, পুত্র, তুমি আজি শৈলজার,
পুণ্যবতী,—আজি পূর্ণ তপস্যা আমার।
আমি তার বনমাতা, বনে তার কত ভ্রাতা
করিবে বিরহে তার বনে হাহাকার,
বনের আলোক আজি হইল আঁধার।
পুত্র-প্রেম-প্রস্রবণ, উদ্ধার করিতে বন,
শূন্য করি তব অঙ্ক, মাতা সুভদ্রার,
গেল উড়ি প্রেম-পাখী; শূন্য অঙ্কে—মুছ আঁখি—
বন পুত্রগণে তব দেও অধিকার,—
প্রেমময়! পুত্র-শোক রবে না তোমার।
উঠ মা! উঠ মা!"—শৈল ধরি সুভদ্রার কর
কহিল—"উঠ মা! না না, আমরা কখন
করিব না আজি শোক-অশ্রু বরিষণ।
জগতে কাঁদিয়া আসি, এইরূপে গেল হাসি
কাঁদায়ে জগত যেই শিশু দেবোপম,
আমরা তাহার তরে কাঁদিব না, তার তরে
করিবে অনন্ত কাল অশ্রু বরিষণ।
বর্ষিব না অশ্রুবিন্দু আমরা কখন।
উঠ মা। উঠ মা! ওই সর্ব্ব-শোক-নিবারণ
দাঁড়াইয়া নারায়ণ শান্তি-প্রস্রবণ।
শান্তির ত্রিদিব বুকে পুত্র সমর্পিয়া সুখে,
করি আমাদের শোক চরণে অর্পণ,
গাই কৃষ্ণনাম, মা গো! জুড়াই জীবন!
স্নেহের শৃঙ্খল তোর, স্নেহের শৃঙ্খল মোর,
কাটিলেন বিধি যদি উধাও উড়িয়া
তুই গৃহে, আমি বনে বন বিহঙ্গিনী মত,

গাব কৃষ্ণনাম মা গো! বিশ্ব জুড়াইয়া।”
উচ্ছ্বাসে ছুটিয়া গিয়া অর্জ্জুন লইয়া তুলি
এক করে পুত্র, পুত্র-বধূ অন্য করে
অর্পিলেন গোবিন্দের বক্ষে প্রেমভরে।
পুণ্যবতী সুলোচনা পড়িয়া চরণতলে,—
সেই পাদপদ্ম বিনা স্বপনেও আর
জানে নাহি অনাথিনী জীবনে তাহার।
বসি পাদপদ্মতলে, শৈলজা, সুভদ্রা; পার্থ,
প্রীতির শান্তির তিন মূরতি সুন্দর:
এতক্ষণ সুভদ্রার বহিল যুগল নেত্রে
পতিত-পাবনী প্রীতিধারা দরদর।
এক করে মৃত-পুত্র, অন্য করে পুত্রবধূ
মূর্চ্ছিতা বিমুক্তকেশী লইয়া হৃদয়ে
দাঁড়াইয়া নারায়ণ; কি মূর্ত্তি মহিমাময়!
ঊর্দ্ধনেত্রে নিরমল প্রীতিধারা বয়।
ঊর্দ্ধবাহু দ্বৈপায়ন, ঊর্দ্ধবাহু কুরুক্ষেত্র,
অশ্রুনেত্রে, প্রেমকণ্ঠে সায়াহ্ন-গগন
পূরিয়া গাইল “হরে! মুরারে!” তখন

সপ্তদশ সর্গ।

—*—

মহাভারত।

—*—

অতীত তৃতীয় যাম, নিবিড় নীরব নিশি
আকাশ ও ধরাতল আঁধারে গিয়াছে মিশি।
জ্বলিতেছে ক্ষীণালোক, নীরব শিবির তলে
বসিয়া রমণী এক, শুষ্ক নয়নের জলে
অঙ্কিত কপোল শুষ্ক, যেন দেবী নিশীথিনী
হেমন্তের মূর্ত্তিমতী, শিশিরাক্ত, বিষাদিনী।
পড়েছে গৈরিক ঢাকি ধূসরিত কেশভার,
হেমন্তে বিষাদ-মাখা শিশিরাক্ত অন্ধকার।

দক্ষিণ কপোল বামা রাখিয়া দক্ষিণ করে
চেয়ে আছে অধোমুখে শোকের আবেগ ভরে।
শোভিতেছে অঙ্কে সুপ্তা মূর্চ্ছিতা রমণী আর,
নিশীথিনী কোলে যেন বিশুষ্ক কুসুম-হার!
আচ্ছন্ন করিয়া অঙ্ক পড়িয়াছে কেশাবলী,
শৈবালে পড়িয়া যেন ছিন্ন কমলের কলি।
শোকে শুভ্র অর্দ্ধ কেশ, নয়ন গিয়াছে বসি;
শোকে শুষ্ক দেহলতা, বরণ হয়েছে মসী।
বিশুষ্ক আরক্তাধর; ক্ষীণ বহিতেছে শ্বাস;
নিদ্রা যাইতেছে যেন ছিন্ন-বীণা-শোকোচ্ছ্বাস।
বহুক্ষণ পরে বালা মেলিল নয়ন ধীরে;

চাহি আত্মহারা মত স্থির নেত্রে রমণীরে
জিজ্ঞাসে—"কে আমি ?"
"তুমি উত্তরা মা ! আদরিণী !"
"উত্তরা কে ?"—"উত্তরা মা ! বিরাট-রাজ-নন্দিনী
"উত্তরা ! উত্তরা আমি ! বিরাট-রাজ-নন্দিনী !"—
বিস্ময়ে কহিয়া, রহে শূন্যচাহি বিষাদিনী।
শিবির প্রাচীরে দীর্ঘ প্রশস্ত দর্পণ পানে
চাহিয়া জিজ্ঞাসে পুনঃ—"কারা বসি ওইখানে ?"
আত্মহারা বালিকার ভগ্ন-কণ্ঠে নারীপ্রাণ
উঠিল কাঁদিয়া, বামা করিল উত্তর দান,—
"কেহ নহে, দর্পণেতে প্রতিবিম্ব মা ! তোমার
দেখিতেছ, দেখিতেছ প্রতিবিম্ব মা ! আমার !"
"উত্তরা—উত্তরা আমি ! প্রতিবিম্ব উত্তরার !
উত্তরার শুভ্র কেশ ! ওই মুখ ! চোক আর !"
ভিজিল তাপসী আঁখি,—ছয় দিনে উত্তরার
কি দারুণ শোকে শুভ্র হইয়াছে কেশ ভার !
"কে তুমি ?"—"শৈলজা আমি বনবালা উদাসিনী"
"না, তুমি মা ! স্বপ্ন-দেবী। স্বপ্নে দেখিয়াছি আমি,
পূর্ণচন্দ্র বক্ষ হ'তে হায় মা ! পড়িনু আমি
আঁধার পাতালে, শৈলে,—কি কঠিন শিলাখানি !
চূর্ণিত হইল দেহ, বিচূর্ণ হইল বুক।
আসিলেন নারায়ণ,—কি করুণাপূর্ণ মুখ !
পাতাল হইল পূর্ণ কি আলোকে নিরমল,
কি মধুর হরিনামে পূর্ণ হ'ল রসাতল।
চুম্বিয়া ললাট, করি সঞ্জীবনী সুধা দান,
পবিত্রা দেবীর এক অঙ্কেতে দিলেন স্থান।

তুমি কি সে স্বপ্ন-দেবী ? এবা কোন্ পুণ্যভূমি ?—
স্বপ্ন-রাজ্য ? দেব-রাজ্য ?"—"তোমার শিবিরে তুমি"
"শিবিরে ! শিবির কোথা ?"—"কুরুক্ষেত্র ধর্ম্মক্ষেত্রে'
রহিল বালিকা শুনি চাহি শূন্যস্থির নেত্রে।
কৃষ্ণপক্ষ অন্ধকারে ক্ষীণ চন্দ্র-কর-লেখা,
যেইরূপে ধরাতলে ধীরে ধীরে দেয় দেখা,
স্মৃতির আলোক ধীরে মনোরাজ্যে উত্তরার
ভাসিতে লাগিল, ভেদি আত্ম-ভ্রান্তি অন্ধকার।
অনেক দিনের দূর-বিস্মৃত সঙ্গীত মত
পড়িতে লাগিল মনে জীবন-ঘটনা যত
সুখপূর্ণ, শোকপূর্ণ ;—পিতৃগৃহ নাট্যালয়,
বৃহন্নলা, সে অপূর্ব্ব উত্তর গোগৃহ-জয়,
কৌরবের বেশ ভূষা, আনন্দে পুতুল খেলা,
পাণ্ডবের পরকাশ, বিবাহ—আনন্দ মেলা,
ছয় মাস সুখস্বপ্ন, কুরুক্ষেত্র মহারণ,
এ শিবির, চক্রব্যূহ, হত-পতি-দরশন,—
তার পর অন্ধকার, মনে পড়িল না আর ;
পড়ে গেল যবনিকা, রুদ্ধ নাট্যগৃহ-দ্বার !
স্মৃতির সমীরে ধীরে জ্বালাইল শোকানল,
কাঁদিতে চাহিল বালা, কিন্তু কোথা অশ্রুজল ?
শোকের সন্তাপে তীব্র নয়নের নিরঝর
গিয়াছে শুকায়ে ; শুষ্ক ক্ষুদ্র মুখ ইন্দীবর
লুকা'ল শৈলজা-বক্ষে ; হায় ! শৈলজার প্রাণ
আবার উঠিল কাঁদি। করিতে চুম্বন দান
উষ্ণ দুই অশ্রুবিন্দু পড়িল ঝরিয়া মুখে
উত্তরার বিমলিন, শুষ্ক শতদল বুকে

নিশির শিশির যথা ; বিস্ময়ে কহিল বালা,—
"কেন মা কাঁদিস্ তুই ? তোর বুকে এই জ্বালা
কে জ্বালিল ? বনমাতা তুই কি অভির হায় ?"
শৈলজার অশ্রুধারা বহিল বেগে ধারায়।
"আমি তার বনমাতা, আমি সেই পুণ্যবতী।"
বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বামা কহিল কাতরে অতি—
"হায় মা ! হায় মা ! তোরো এ অমৃত প্রস্রবণে
জ্বালিল বাড়বানল বিধি অকরুণ মনে !"
"না মা !"—উত্তরিলা শৈল—"মরুভূমে অভাগীর,
দিয়া অস্থি-প্রাণ বাছা ঢালিয়াছে প্রেমনীর
বরিষার মেঘ মত, সহি বুকে বজ্রাঘাত ;
ধর্ম্মরাজ্য তরে করি এইরূপে প্রাণ পাত।
বনমাতা হয় যেন হায় ! যোগ্যা মাতা তার।
স্বর্গে সে আসিবে তবে পুণ্য অঙ্কে শৈলজার।"
"কালি নিশীথিনী-অঙ্কে"—মূর্চ্ছাগতা উত্তরার
নাহি জ্ঞান ছয় দিন গিয়াছে বহিয়া আর,—
"কালি নিশীথিনী-অঙ্কে, বসি এই বাতায়নে
নবোদিত চন্দ্রকরে, প্রেম-উচ্ছ্বসিত মনে
মা গো ! তোর প্রেম কথা গাইল সঙ্গীত মত,
অপূর্ব্ব কল্পনা বলে সৃজি স্বর্গ শত শত।
ফলিল না একটীও ভাগে৷ হায় ! উত্তরার,
অভাগিনী তার মত কে আছে জগতে আর ?
বালকের ধূলা সৃষ্টি একই নিশ্বাসে হায় !
নিল মা গো ! উড়াইয়া নিদারুণ বিধাতায়।
বড় সাধ ছিল মনে যুদ্ধ অন্তে অভাগীরে
নিয়ে যাবে বনে তোর, মা গো ! তোর স্নেহ-নীড়ে।

ভাবে নাই, ভাবি নাই, হায়! হেন অনাথায়
আসিব মা অঙ্কে তোর!''—রুদ্ধ শোক নির্ঝরিণী
উথলিল যেই বেগে বক্ষে চক্ষে শৈলজার,
বুঝিল বিরাটবালা, কথা কহিল না আর
"রেখে গেছে অভিমন্যু ক্ষুদ্র প্রতিমূর্ত্তি ওর''—
চাপি শোক কহে শৈল—"মা গো! পুণ্যগর্ভে তোর;
পুত্র কোলে করি' তুই যাইবি আমার বনে।
এ অভিব বন-খেলা নিরখিব দুইজনে।
গৃহভূমি, বনভূমি, বাঁধিয়া প্রেম-বন্ধনে
নির্ম্মাইব ধর্ম্ম-রাজ্য, বসাইব সিংহাসনে
পুত্রে তোর, রাজলক্ষ্মী হবি তুই মা আমার।
সুখে, প্রজা সুখে, রহিবে না শোক আর।
"রবি অস্ত গেলে হায়!''—ফেলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস,
কহিতে লাগিল বালা চাপিয়া শোক-উচ্ছ্বাস,—
"রবি অস্ত গেলে হায়! দিবা কি থাকিতে পারে?
অস্ত গেলে শশধর, লয়ে যায় জ্যোৎস্নারে।
পাদপ হইলে ভস্ম, ছায়া কি থাকে কখন?
নির্ঝর হইলে শুষ্ক ধারা হয় অদর্শন।
প্রদীপ হইলে ভগ্ন, শিখা কি কখনো রয়?
বাঁচে কি নলিনী, যদি শুষ্ক হয় জলাশয়
কুরুক্ষেত্র-মহাঝড়ে তরু উত্তরার হায়।
গিয়াছে ভাঙ্গিয়া যদি শুকাইয়া এ লতায়,
আশীর্ব্বাদ কর মা গো! সমর্পিয়া ফল তার
করে মাতা সুভদ্রার, সুলোচনা, শৈলজার,
তরু পদ মূলে যেন করে সমর্পণ প্রাণ;
আনন্দের সহ যেন হয় হাসি তিরোধান।

তৃতীয়ার চন্দ্র যদি হলো অস্তমিত হায়!
অস্ফুট জ্যোৎস্না যেন সঙ্গে মিশাইয়া যায়।
হায় মা! হায় মা! বিধি"—দর্পণে পড়িল আঁখি,
মুহূর্ত্ত বিরাট-বালা নীরবে চাহিয়া থাকি—
"হায় মা! হায় মা! বিধি সে আশাও উত্তরার
বুঝি বিনাশিলা, মন কি কঠিন বিধাতার!
ওই মুখ, ওই চোক, ওই শুক্ল কেশ, হায়!
নিরখিয়া প্রাণনাথ চিনিবে কি উত্তরায়;"
উভয় নীরব রহে শোকবেগে কিছুক্ষণ।
উত্তরা কহিল পুনঃ পর-দুঃখে আর্দ্র মন—
"নাহি জানি কুরুক্ষেত্র—এই শোক-পারাবার—
ভাঙ্গিবে কপাল মা গো! আর কত উত্তরার!"
"হইয়াছে যুদ্ধ শেষ।"

"শেষ!"—চমকিল বালা।
"শেষ"—উত্তরিলা শৈল বিষাদিনী—"মহাজ্বালা
নিবিয়াছে জগতের; ভাস্মিয়া ক্ষত্রিয়-বন
নিবিয়াছে অধর্ম্মের যুগব্যাপী হুতাশন।
ছিল যেই স্নেহে সিক্ত অর্জ্জুনের বীর্য্যানল,
হরিলে কৌরব সেই অভিমন্যু স্নেহ-জল,
উদ্‌গীর্ণ করিল গিরি যে গৈরিক প্রস্রবণ
কাঁপাইয়া কুরুক্ষেত্র, আচ্ছন্ন করি গগন,
দুদিনে হইল ভস্ম দ্রোণাচার্য্য পরাক্রম;
দুই দিনে কর্ণ আর,—কর্ণ করে নাহি রণ,
শিশু-হত্যা-পাপে প্রাণ করিয়াছে বিসর্জ্জন।
এক দিবসের যুদ্ধে হত শল্য, দুর্য্যোধন।
কালি হইয়াছে শেষ, হইয়াছে অবসান

অধর্ম্মের দীর্ঘ দিবা, ভারত করি শ্মশান!
কৃপ, কৃতবর্ম্মা, আর দ্রোণ-পুত্র দুরাশয়,—
আছে মাত্র কৌরবের এই মহারথী ত্রয়।

উ। পাণ্ডব ও নারায়ণ?

শৈ। আছেন মঙ্গলে সব;
পরিণামে ধর্ম্মের মা। নাহি হয় পরাভব।

উ। মা সুভদ্রা?

শৈ। দেবী তিনি, তাঁর অমঙ্গল নয়
সম্ভব মা।

উ। সুলোচনা?

শৈলজা নীরবে রয়।
উত্তরা আকুল শোকে কহিল উচ্ছ্বাসে—"হায়!
তুই ও মা! গেলি চলি ফেলি তোর উত্তরায়।
আছিল হৃদয় তোর ক্রীড়া গোলকের মত
অভিমন্যু সমীরণে প্রপূরিত অবিরত।
হায়! নিদারুণ কাল কেমনে লইল হরি
সেই স্নেহ-সমীরণ গোলক বিদীর্ণ করি!
যেই শিশু-বৃক্ষ মা গো! হৃদয়ে করি রোপণ
পালিলি ষোড়শ বর্ষ, কুরুক্ষেত্র প্রভঞ্জন
উপাড়ি ফেলিল ভূমে কোমল হৃদয় তোর
ফেলিল উপাড়ি, তবু ছিঁড়িল না স্নেহ-ডোর
নীরবে রহিয়া বালা জিজ্ঞাসিল আরবার—
"কুশলে ত আছে বল পিতা ভ্রাতা মা আমার?"
নীরব রহিলা শৈল। সে নীরব সমাচার
পশিল বালিকা-প্রাণে, তুলিল কি হাহাকার!
অশ্রুবিন্দু নাহি দিল স্তিমিত নয়নে দেখা।

না হইল রূপান্তর মুখের একটী রেখা ;
করিতে সে শোকচিত্রে রেখাটী গভীরতর
না পারিল পিতৃ-শোক ভ্রাতৃ-শোক চিত্রকর !
হায় ! বিষধর যারে দংশিয়াছে একবার,
শত বিষধরে দংশি কি আর করিবে তার ?
হইয়াছে এক বজ্রে ভস্ম যেই উপবন,
কি আর করিবে তার শত বজ্র প্রহরণ ?
কেবল কহিল বালা—"হায় ! তবে উত্তরার
পিতার গৃহও শূন্য, হইয়াছে অন্ধকার !
সে বিরাট-রাজপুরী, বিরাট শ্মশানপ্রায়,
করিতেছে হাহাকার, করাল কাল ছায়ায় !
হায় বাবা ! হায় দাদা ! বড় আদরের ছায়া
ছিল যে উত্তরা, হায় ! কেমনে কাটিয়া মায়া
এক সঙ্গে পিতা পুত্র গেলে চলি পতি সনে,
ফেলি এই বালিকায় হেন অকরুণ মনে ?
হায় মা ! আছিল অঙ্কে উত্তর উত্তরা তোর।
উত্তর গিয়াছে চলি, উত্তরার স্বপ্ন ভোর !
সকলে মা ! গেল চলি"—চাহি শৈলজার মুখ—
"তথাপি বিদীর্ণ নাহি হইল আমার বুক !
ছয় দিন মৃতপ্রায় ছিলাম মূর্চ্ছিতা আমি,
তবু নাহি মরিলাম,—আমি কি পাষাণখানি !"

শৈ। জীবনের আশা বাছা ! ছিল কি তোমার আর
যোগস্থ হইয়া হরি জাগাইলা পুনর্ব্বার !

উ। কেন দয়াময় হরি অনাথিনী এ কন্যায়
বাঁচাইয়া, শুষ্কলতা অর্পিলা অনলে হায় ?

শৈ। তুমি কৌরবের লক্ষ্মী, আছে মা ! গর্ভে তোমার

একই অঙ্কুর মাত্র কৌরবের ভরসার
মানবের আশা-তরু, ধর্ম্মরাজ্য-ভিত্তিভূমি,
হবে তব পুত্র, হবে ধর্ম্ম-রাজ্য-লক্ষ্মী তুমি

উ। আছে ত কুশলে মাত! দেবর পঞ্চ আমার?

শৈ। পাণ্ডব, সাত্যকি, কৃষ্ণ বিনা কেহ নাহি
নিশীথে পশিয়া, মেষ-শালায় শার্দ্দূল মত,
অশ্বত্থামা পঞ্চ শিশু নিদ্রায় করেছে হত।
কালী নিশীথিনী অঙ্কে, হইয়াছে অভিনীত
অধর্ম্মের শেষ অঙ্ক, পাপপূর্ণ, শোকান্বিত
পড়িয়াছে যবনিকা, জ্বলিয়াছে কি শ্মশান
কুরুক্ষেত্রে।—নারায়ণ! কর পূর্ণ মনস্কাম!
এ অধর্ম্ম রাক্ষসের কবল হইতে নর
উদ্ধারিতে, দিল প্রাণ দেবতুল্য পুত্রবর।
আমাদের শোকে মা গো! জগত পাইবে সুখ;
ভুলি পত্নীপ্রেম, কর মাতৃপ্রেমে পূর্ণ বুক।"
বিস্মিতা, স্তম্ভিতা, ভীতা। উত্তরা নীরবে রয়
শোকাকুলা, চিন্তান্বিতা বদন গাম্ভীর্য্যময়,
হ'ল যেন মেঘময় শীতের বিশদাকাশ।
বহুক্ষণ এইরূপে ভাবিল, না বহে শ্বাস।
উঠি ধীরে ধীরে শেষে, কহিল—"মা! চল যাই।"

শৈল। কোথায়?

উ। মা! উত্তরার এক ভিন্ন স্থান, নাই——
পতির জ্বলন্ত চিতা।

কাঁপিয়া উঠিল বুক
শৈলজার দুরু দুরু; কহে অশ্রুপূর্ণ মুখ—
"পতির চিতায় প্রাণ সমর্পণ হ'তে আর

নাহি কি রমণী-ব্রত উচ্চতম, মা আমার ?"
"আছে"—স্থিরকণ্ঠে বামা কহি।। রাইল ধীরে—
"পালিব তা, মাখিয়া মা ! প।তপদ-ভস্ম শিরে।"
নীরবে শিবির হ'তে বাহিরল দুইজন
আর চলিল না পদ—ও কি দৃশ্য বিভীষণ !
তৃতীয় প্রহর নিশি ; জ্বলিতেছে অগণিত
চিতাকুরুক্ষেত্র-বক্ষে,—জ্বলিতেছে সংখ্যাতীত
চিতা বক্ষে ভারতের, জ্বলিতেছে অনিবার
ক্ষত্রিয়ের গৃহে গৃহে, বক্ষে বক্ষে অনাথার।
নিবিড় সূচিকাবিদ্ধ অমাবস্যা অন্ধকারে
জ্বলিতেছে চিতাশ্রেণী ; কুরুক্ষেত্র চিতাহারে
কালের জীবন্ত মূর্ত্তি করি যেন অভিনয়,
দেখাইছে কাল-গর্ভ বিরাট শ্মশানালয়।
যোজন যোজন ব্যাপী, স্থানে স্থানে নদীতীরে
জ্বলে রথীদের চিতা, প্রতিবিম্বে নদীনীড়ে
জ্বলিছে অনন্ত চিতা,—কি যে কি ভীষণ ছবি।
নদীগর্ভে অস্ত যেন হতেছে অনন্ত রবি !
হায় ! এক মহাচিতা ততোধিক বিভীষণ
যথায় হইল ভস্ম অনাথ সৈনিকগণ,—
অষ্টাদশ অক্ষোহিণী,—ক্ষুদ্র অগ্নি পারাবার,—
জ্বলিতেছে দূরে, মনে আতঙ্ক কার সঞ্চার।
মহা নরমেধযজ্ঞ হইয়াছে সমাপন,
নিশিশেষে ধীরে ধীরে নিবিতেছে হুতাশন
অনন্ত শ্মশান-ধূমে সমাচ্ছন্ন শীতাকাশ।
একটি নক্ষত্র নাহি হইতেছে পরকাশ।
ঘোর কৃষ্ণ নৈশাকাশ ; শোকেতে নক্ষত্র যত

পড়ি ধরাতলে যেন শোভিতেছে চিতামত।
মুক্তকেশী শোকাকুলা সংখ্যাতীত বীরনারী,
—সবিদ্যুৎ কাদম্বিনী,—বরষিয়া অশ্রুবারি
কাঁদি সারাদিন আম্র-পল্লব লইয়া করে,
অন্বেষিয়া মৃত পতি পুত্র পিতা সহোদরে,
যুড়িয়া সমর-ভূমি করিয়াছে হাহাকার,
লয়ে ছিন্ন বক্ষে ছিন্ন বক্ষ প্রাণ-প্রতিমার
শোকের বরিষা এবে হইয়াছে অবসান,
এখনো কাঁদিছে কেহ ভগ্নকণ্ঠ ভগ্নপ্রাণ,
আঁধার শিবিরে ধীরে। শকুনী শৃগালদল
ঘন নৈশ নীরবতা বিদারিয়া কোলাহল
করিতেছে স্থানে স্থানে, করিতেছে ছুটাছুটি ;
কত বিভীষিকা যেন আঁধারে উঠিছে ফুটি।
কাঁপিল বালিকা-বক্ষ, ধরি শৈলজার গলা'
রাখি বুকে মুখ, কহে বালিকা শোকবিহ্বলা—
"হায় মাত। ধীরে ধীরে নিবিছে এ চিতাগণ,
আমাদের বক্ষ-চিতা এরূপে কি নির্ব্বাপণ
হইবে মা ? হইবে মা! এইরূপে অবসান
আমাদের শোক-নিশি, হায়! জুড়াইবে প্রাণ ?"
"কয় চিতা আমাদের ?"—কহে শৈল সাশ্রুচক্ষে,—
"দেখ মা। অনন্ত চিতা ভারত-মাতার বক্ষে!
পুড়ি এই চিতানলে অধর্ম্ম তিমির রাশি,
নব-ধর্ম্ম উষা ওই আনন্দে উঠিছে ভাসি।
ওই কাকলির কলে উঠিছে মা! কৃষ্ণনাম
জুড়াতে জগত-প্রাণ, তোমার আমার প্রাণ
লয়ে উত্তরায় বক্ষে বনমালা ধীরে ধীরে

গেল পতি-চিতামূলে। দূর হিরণ্বতী-তীরে,
অশোক পাদপ-মূলে সে পবিত্র তীর্থধাম
প্রণমিলা, কি উচ্ছ্বাসে উছলিল ছুটি প্রাণ!
প্রিয় পুত্র লয়ে বক্ষে সুলোচনা পুণ্যবতী
লভিয়াছে নিরবাণ একই চিতায় সতী।
ত্রিদিব বীণার বক্ষে যেন পুণ্যময় গীত
হইয়াছে লয়, বীণা হইয়াছে অন্তর্হিত।
ব্যোম-বিহারিণী তরী হইয়া গগনোত্থিত,
আলোক সহিত যেন হইয়াছে অলক্ষিত।
নির্ব্বাপিত প্রায় চিতা! ক্ষীণালোকে নারায়ণ
দাঁড়াইয়া অন্তরালে করিলেন দরশন
উত্তরার শোক-ছবি, বিদীর্ণ হইল বুক,—
কি আলোকে, ও কে বসি, হায়! এ কাহার মুখ!
গিয়াছে বহিয়া যেন কত যুগ উত্তরার,
ঘটাইয়া কি বিপ্লব ক্ষুদ্র হৃদয়েতে তার!
নব যৌবনের সেই পুষ্পাকীর্ণ রঙ্গালয়ে
করিতেছে প্রৌঢ়তায় কি দারুণ অভিনয়!
বিশুষ্ক অস্ফুট ফুল, নিবিয়াছে আলোরাশি,
ফুটন্ত আনন্দোচ্ছ্বাসে শোক উঠিয়াছে ভাসি
হাসি ভরা, ক্রীড়া ভরা, সে চঞ্চলা সৌদামিনী,
হ'য়েছে গাম্ভীর্য্যভরা কি নিবিড়া কাদম্বিনী!
জ্যোৎস্না-প্লাবিতা সেই ফুটন্ত কুসুম লতা,
এবে শুষ্কা, অর্দ্ধদগ্ধা হায়! বজ্রাঘাতে যথা!

অশোক পদাপ মূলে শোকে দাঁড়াইয়া হরি,
অদৃশ্য, আধারে স্থির, বৃক্ষে শির রক্ষা করি,
ঘোর ঝটিকায় পূর্ণ যেন মহা জলধর,

রুদ্ধ করি সে বিপ্লব রহিয়াছে স্থিরতর।
অনিমিষ-নেত্রে কৃষ্ণ চাহি উত্তরার পানে ;
দেখে না উত্তরা, কহে উদ্দেশে আকুল প্রাণে,—
"কোথায় রহিলে পদ্ম-পলাশ-লোচন হরি!
এই শোক-পারাবারে দেও নাথ! পদতরী!
তোমার নয়ন সম ছিল যেই নেত্রদ্বয়,
ছিল তব রূপ সম যে রূপ মাধুর্য্যময়,
মাতা সুভদ্রার ছবি সেই মুখ মনোরম,
তোমার দেবত্বে মাখা পার্থ-বীর্য্যে হুতাশন,
বিধাতার পূর্ণ সৃষ্টি, স্বপ্ন-স্বর্গ উত্তরার,
এরূপে কি হ'ল ভস্ম? চিহ্ন রহিল না তার!
অর্জ্জুনের প্রাণ-পুত্র; প্রাণ-পুত্র সুভদ্রার,
গোবিন্দের পুত্র, শিষ্য, না, না, নাহি মৃত্যু তার
ঝলসিয়া চন্দ্রলোক কি গৌরবে প্রাণেশ্বর!
বিরাজিছ! শিরে কিবা কিরণ-কিরীটবর!
কি সুন্দর বীর বেশ! কিবা স্বর্গ মনোহর!
আনন্দে অপ্সরোগণ বর্ষিতেছে নিরন্তর
কি কুসুম সুবাসিত! কি সঙ্গীত সুকোমল
উথলিছে! বরষিছে কি অমৃত সুশীতল!
সতৃষ্ণ নয়নে নাথ! দেখিছ কি উত্তরায়
চিনিতে কি পার তারে? তার এই দশা হায়,
কেমনে রয়েছ চাহি? লও বুকে এক বার,
কহিয়া একটি কথা জুড়াও জীবন তার।
পৃথিবীতে ছয় মাস দিয়া তারে স্বর্গ সুখ,
কেমনে চলিয়া গেলে বিদীর্ণ করিয়া বুক!
প্রেমের মুকুল তব সঞ্চারিয়া এ লতায়,

কেমনে চলিয়া গেলে অকরুণ প্রাণে হায়!
ক্ষমা কর ছয় মাস; প্রসবিয়া সেই ফুল,
রাখি তব প্রতিরূপ, রক্ষা করি কুরুকুল,
ছয় মাস পরে,—নাথ! ছয় যুগ উত্তরার—
উত্তরা আসিবে অঙ্কে, স্বর্গে তার তপস্যার।
পতির চিতায় এই মৃত প্রাণ সমর্পণ
নহে মৃত্যু, অনাথার দীর্ঘ মৃত্যু এ জীবন।
কর আশীর্ব্বাদ, নাথ! এ অনন্ত মৃত্যু-ব্রত
হয় যেন উদ্‌যাপিত, হয় পূর্ণ মনোরথ!"

বসি আত্ম-হারা শৈল চাহি আকাশের পানে
সেই চন্দ্রলোক, চন্দ্র, নিরখিতেছিল ধ্যানে।
স্বপ্ন-উত্থিতার মত চিতা ভস্ম লয়ে করে,
উভয় ললাটে মাখি কহিল উচ্ছ্বাস-ভরে—
"কর আশীর্ব্বাদ, বৎস! তব বনমাতা ব্রত
হয় যেন উদ্‌যাপিত, হয় পূর্ণ মনোরথ!"
বিরাট, উত্তর, চিতা পার্শ্বে প্রণমিয়া, ধীরে
নীরবে উভয় শোকে চলিলা শূন্য শিবিরে।
এখনো অশোক-মূলে দাঁড়াইয়া নারায়ণ,
প্রস্তর মূরতি যেন অনিমিষ দুনয়ন।
আসিলেন ধনঞ্জয় সুভদ্রা জননী সঙ্গে,
বসিলেন চিতামূলে;—উত্তাল শোক তরঙ্গে
অর্জ্জুনের ভাসিতেছে শান্তি ছায়া; জননীর
অনন্ত অতলস্পর্শী শোক সিন্ধু এবে স্থির।
একটী লহরী মাত্র. তুলিল এক উচ্ছ্বাস,
পুত্রের শ্মশান-ছায়া; বহিল একটী শ্বাস।
কেবল একটী কথা কহিলেন ধনঞ্জয়—

"এইরূপে আমাদের হইল ভস্ম হৃদয়।"
"না না, নাথ!"—ভদ্রাদেবী উত্তরিলা কণ্ঠস্থির
"পবিত্রিত, বিগলিত, তরলিত প্রেমনীড়
এইরূপে আমাদের হইল কঠিন প্রাণ,
জুড়াতে জগত-প্রাণ, বিলাইতে কৃষ্ণনাম।
সুলোচনা-মাতৃপ্রেম, অভিমন্যু আত্ম-দান,—
নব ধর্ম্ম-রাজ্য ভিত্তি, চূড়া তার কৃষ্ণনাম।
সাঙ্গ বীরব্রত, লও ধর্ম্মব্রত শ্রেষ্ঠতর,
মাখি পুত্র-ভস্ম বুকে হও কর্ম্মে অগ্রসর।
পুত্রের সুযোগ্যা মাতা, পুত্রের সুযোগ্য পিতা,
হইব আমরা, যবে হইবে ধরা প্লাবিতা
এই নব ধর্ম্মামৃতে; দুঃখ রহিবে না আর
জগতের, হবে ধরা সুখ শান্তি পারাবার।
শুনিতে শুনিতে যেন বিশ্ব-কণ্ঠে কৃষ্ণনাম,
একই চিতায় লভি পতি পত্নী নিরবাণ!"
পুত্রের চিতার ভস্ম উভয়ে মাখিয়া বুকে,
যোগী যোগিনীর বেশে, চলিলা শিবিরমুখে।
হইল ঝটিকাপূর্ণ জলধর বিচলিত,—
হয়ে অগ্রসর কৃষ্ণ, হৃদয়েতে উদ্বেলিত
মাখিলেন সেই ভস্ম; ঊষার আকাশ পানে
চাহিয়া কহিলা শোক-প্রীতি-উদ্বেলিত প্রাণে—
"মানবের উষ্ণ রক্ত বিনা মানবের পাপ,
মানবের শোক বিনা মানবের পরিতাপ,
না হয় মোচন যদি; মানবের মুক্তি-পথ
রক্ত-সিন্ধু গর্ভে যদি, শ্মশানে দাবাগ্নিবৎ;
একই নির্ঘাতে নাথ! একই নিমিষে হায়!

কৃষ্ণের শোণিতে কেন ভাসালে না এ ধরায় ?
একই শ্মশান মত্ত্ব করি নাথ ! প্রজ্বলিত,
কৃষ্ণের হৃদয় কেন করিলে না সমর্পিত ?
এই অষ্টাদশ দিন হইয়াছে প্রবাহিত
যে শোণিত-পারাবার, কৃষ্ণের তপ্তশোণিত
প্রতি বিন্দু সে সিন্ধুর ; হা নাথ ! প্রতি শ্মশান
করিয়াছে ভস্ম আজি জীবন্ত কৃষ্ণের প্রাণ।
প্রতি রমণীর কণ্ঠ, অনাথার হাহাকার,
গান্ধারীর শোকোচ্ছ্বাস, শোক-ছবি উত্তরার,
অর্জ্জুনের উন্মত্ততা, সে বৈরাগ্য সুভদ্রার,
করিয়াছে কৃষ্ণ-প্রাণে শেলাঘাত অনিবার।
রাজসূয়ে বিনির্ম্মিত ধর্ম্মরাজ্য বাতাহত
পড়িল ভাঙ্গিয়া যবে বালির সৃজন মত,
বুঝিলাম তব ইচ্ছা, বিনা এই রক্ত দান,
এ অগ্নি পরীক্ষা বিনা, হইবে না নিরমাণ
ধর্ম্মরাজ্য ধরাতলে হইবে না কদাচিত
খণ্ড এ ভারতে মহাভারতরাজ্য স্থাপিত।
দিলাম অনলে ঝাঁপ, হৃদয় বিদীর্ণ করি
ঢালিলাম রক্ত-ধারা অষ্টাদশ দিন ধরি,
তথাপিও প্রাণাধিক কুমারের এ শ্মশান
জ্বালাবে কৃষ্ণের প্রাণে হায় নাথ ! অনির্ব্বাণ।
নিষ্পাপ মানব-পুত্র নাহি দিলে বলিদান
আত্মপ্রাণ, হবে না কি মানবের পরিত্রাণ ?
নাহি দুঃখ, তব প্রাণ মানবের মহাপ্রাণ,
তুমি সহিতেছ যদি, কৃষ্ণের হৃদয়ে স্থান
পাইবে না শোক ; কর পূর্ণ তব মনস্কাম।—

কর এবে ধরাতলে ধর্ম্মরাজ্য নিরমাণ !
ওকি দৃশ্য !”—নারায়ণ স্বপনে যেন নিদ্রিত
দেখিলেন কুমারের চিতা পুনঃ প্রজ্বলিত
হইল, ছুঁইল অগ্নি প্রভাত-নভঃমণ্ডল,
ছাইল সমরক্ষেত্র প্রজ্বলিত চতানল
উঠিল সে অগ্নি হ'তে ত্রিভুবন আলো করি
“মহাভারতের” মূর্ত্তি,—মাতা “রাজরাজেশ্বরী।
নব ধর্ম্ম-বেদি-মূলে বসিয়া দেবতাগণ—
আর্য্য অনার্য্যের—ধ্যানে ; বেদি-বক্ষে নিরুপম
নিষ্কামের মহামূর্ত্তি ; তদুপরি বিরাজিতা
জননী আনন্দময়ী, অতুলা প্রতিভান্বিতা।
বিদগ্ধ অধর্ম্ম মল, রক্তবর্ণ কলেবর ;
অর্দ্ধেন্দু-কিরীট শিরে, পাশাঙ্কুশ ধনুঃশর
—সমরাস্ত্র, শাসনাস্ত্র,—হইয়াছে শোভমান,
চারি ভুজে চারি দিকে ; ত্রিনেত্রে ত্রিকাল-জ্ঞান।
ধর্ম্ম-সম্রাজ্ঞীর মুখ, অনন্ত মহিমা ছবি,
ভাসিল প্রভাতাকাশে যেন শান্ত বাল-রবি।
অনন্ত মানব ব্যাপী ভবিষ্যত, বর্ত্তমান,
নয়নে আনন্দ-অশ্রু গাইতেছে কৃষ্ণনাম।
পূর্ণ জীবনের ব্রত ; মন প্রাণ উদ্বেলিত,
“মা ! মা !”—বলি নারায়ণ আনন্দাশ্রু বিগলিত,
পড়িলেন ধরাতলে মানব-প্রেমে মূর্চ্ছিত
কুমারের চিতাপার্শ্বে ;—পূর্ব্বাকাশ বিভাসিত
হইল প্রভাতালোকে, বাজিয়া উঠিল ধীরে
অনন্ত মঙ্গল বাদ্য, প্লাবিয়া আনন্দনীড়ে
কুরুক্ষেত্র সুমঙ্গল উঠিল আনন্দ গীত,

ধর্ম্মরাজ,—ধর্ম্মরাজ্য,—করি উচ্চে বিঘোষিত।
আসিলেন ভদ্রার্জ্জুন, উঠিলেন নারায়ণ,
আসিলেন ধীরে ধীরে শৈল সহ দ্বৈপায়ন।
অগ্রে কুমারের চিতা, পূরব গগন পানে
চাহি স্থির নারায়ণ রহিলেন যোগধ্যানে
পার্শ্বে স্থির ধনঞ্জয়, ভদ্রাদেবী মধ্যস্থলে
উভয়ের, তিন মুখ ভাসে প্রেম অশ্রুজলে।
তিনের গৈরিক বেশ, বুক চিতাভস্মে মাখা,
ভদ্রার গৈরিক আলুলায়িত কুন্তলে ঢাকা।
চিতার অপর পার্শ্বে জানু পাতি ধরাতলে
বসিয়াছে শৈল, শোভে কপোল ধারা-যুগলে।
পার্শ্বে স্থির দ্বৈপায়ন, কপোলে যুগল ধারা,
কহিলেন দেব-ঋষি প্রেমানন্দে আত্মহারা—
"কি ত্রিমূর্ত্তি অপার্থিব! ভারত—জগত—বাসি!
দেবগণ! ঋষিগণ! একবার দেখ আসি!
জ্ঞানদেব নারায়ণ; বলদেব ধনঞ্জয়;
মধ্যে ভক্তিদেবী ভদ্রা, সম্মুখে মহিমাময়
চিতা আত্ম-বিসর্জ্জন; জ্ঞান, বল, আত্মদান,
ভক্তির নিষ্কাম সূত্রে সম্মিলিত, সমপ্রাণ।
এই চতুর্ব্বর্গ, এই মানবের মোক্ষধাম,,—
দ্বাপরের অবতার পূর্ণ তব মনস্কাম!
পূর্ণকাম দ্বৈপায়ন, এই মহাতীর্থ ধাম
দেখিল নয়ন ভরি, দেখিল ভরিয়া প্রাণ।
নারায়ণ! জগন্নাথ! দেও শক্তি ধরি' ধ্যান,
আনন্দে গাইব তব এ মহাভারত গান।
শুনিয়া সে গীত, করি কৃষ্ণনামামৃত পান,

"মানব লভিবে মুক্তি, ধরা হবে স্বর্গধাম ”
গুরু দেব পদরজ শৈলজা লইয়া শিরে,
আ কুল কাঁদিয়া বালা কহিতে লাগিল ধীরে,—
"হে গুরো! কৃপায় তব, হা পুত্র! স্নেহেতে তোর,
অনার্য্য মাতার ভোর আজি নারী-জন্ম ভোর।
জগন্নাথ! জগৎপতে! আর্য্য অনার্য্যের হরি!
হে নীলমাধব! দেও পদাম্বুজ দয়া করি
পতিত অনার্য্যগণে, পতিতপাবন নাম
দেও বনপুত্র-মুখে, ধর্ম্মরাজ্যে দেও স্থান!"
নির্গুণ নবীন তৃণে অঙ্কুরিয়া দুটী ফুল,
একটী পড়িল ঝরি অকালে পুষ্প-মুকুল
তোমার পবিত্র অঙ্কে। নির্ম্মল কোরক আর
আছে তার প্রেম-বৃন্তে। এই কলি সুকুমার
ফুটাইয়া প্রেম-করে, হৃদয়েতে দলে দলে
লিখিও তোমার নাম পিতৃ-প্রেম-অশ্রুজলে।
দিও জ্ঞান, ভক্তি, বল! দিও শিক্ষা আত্ম-দান!
দিও পদাম্বুজ-ছায়া! ধর্ম্মরাজ্যে দিও স্থান!
শুনিতে শুনিতে যেন পুত্রমুখে কৃষ্ণনাম,
নবীনের হয় এই অপরাহ্ণ অবসান

সমাপ্ত।

রৈবতক উৎসর্গিত

পিতার চরণে,

কুরুক্ষেত্র উৎসর্গিত

চরণে মাতার,

প্রভাস পত্নী ও পুত্র

নির্ম্মলের করে

অর্পিলাম, নারায়ণ !

নির্ম্মাল্য তোমার।

রৈবতক কাব্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আদিলীলা, কুরুক্ষেত্র কাব্য মধ্যলীলা, এবং প্রভাস কাব্য অন্তিমলীলা লইয়া রচিত। রৈবতকে কাব্যের উন্মেষ, কুরুক্ষেত্রে বিকাশ, এবং প্রভাসে শেষ।

প্রভাস।

(কাব্য)

—:*:—

প্রথম সর্গ।

—:*:—

ছায়া।

নির্ম্মল আনন্দরাশি, নির্ম্মল আনন্দ হাসি,
প্রভাসের মহাসিন্ধু। আনন্দ নির্ম্মল,—
জলরাশি ; হাসি,—লীলা তরঙ্গ চঞ্চল।
অপরাহ্ণ—বসন্তের শুক্লা চতুর্দ্দশী।
আনন্দ রবির কর, আনন্দ সুনীলাম্বর,
প্রকৃতি আনন্দময়ী ষোড়শী রূপসী।
আনন্দের সচঞ্চল লীলা রত্নাকর।
আনন্দের অচঞ্চল লীলা নীলাম্বর।
নীলিমায় নীলিমায়, মহিমায় মহিমায়,

মিশাইয়া পরস্পরে,— মহা আলিঙ্গন!
মহাদৃশ্য!—অনন্তের অনন্ত মিলন!
নীলসিন্ধু, শ্বেতবেলা; বেলায় তরঙ্গ-খেলা;
দিতেছে বেলায় সিন্ধু শ্বেত পুষ্পহার,
গাইয়া আনন্দগীত, চুম্বি অনিবার।
সিন্ধুবক্ষে বেলা, যেন বিষ্ণুবক্ষে বাণী,
সান্ধ্য রবিকরে হাসে বেলা সিন্ধুরাণী।
বিচিত্র শিবিরশ্রেণী, শত সংখ্যাতীত,
বিচিত্র কেতনশিরে, শোভিতেছে সিন্ধুতীরে,
সিন্ধুমত সিন্ধুপ্রিয়া করি তরঙ্গিত।
আসিছে যাদবগণ—আসিয়াছে কত,—
গজপৃষ্ঠে, অশ্বে, রথে, নানা দিকে, নানা পথে,
কল্লোলিত সিন্ধুপ্রিয়া করি সিন্ধুমত।
কিছুদূরে মনোহর বঙ্কিম বেলায়,
নীল গগনের পটে অমল বিভায়,
কৃষ্ণের শিবিরশ্রেণী তুলি ঊর্দ্ধে শির
শোভিতেছে যেন দেব পবিত্র মন্দির।
শিবির-চূড়ায় স্বর্ণ-ধ্বজে নিরুপম,
নীল কেতনের বক্ষে, পীত সুদর্শন
কি লীলা সমুদ্রতীরে, সমুদ্র-অনিলে ধীরে,
করিছে মহিমাময়! সিন্ধু অবিরাম
অসংখ্য তরঙ্গ করে করিছে প্রণাম।
সুবর্ণ-পর্য্যঙ্ক অঙ্কে আনন্দরূপিণী
চারু উপধানে অর্দ্ধশায়িতা রুক্মিণী।
সত্যভামা পাশে বসি, নিরানন্দ মুখশশী;
সত্যভামা পার্শ্বে শোভা বিদর্ভ-সুতার,

দীপ্ত সন্ধ্যা পার্শ্বে যেন ফুল্ল জ্যোৎস্নার।
নির্নিমেষ নেত্র চারি, চাহিয়া অনন্ত বারি,
অনন্ত বারির ক্রীড়া অনন্ত সুন্দর,—
চিন্তাকুলা সত্যভামা, কুঞ্চিত অধর।
বিমুক্ত কবরীরাশি, পড়েছে পর্য্যঙ্কে ভাসি,
সুধাকর হ'তে যেন নীলামৃত ধারা;
সান্ধ্য গগনের মত স্থির নেত্র তারা।
সেই মুক্তকেশপটে সে রূপের খেলা,—
সন্ধ্যা-পটে বসন্তের অপরাহ্ণ বেলা।
উভয়ে নীরবে ধ্যানে, চাহিয়া সিন্ধুর পানে;
রুক্মিণীর দৃষ্টি,—দৃষ্টি শান্ত জ্যোৎস্নার।
সত্যভামা দৃষ্টি,—দৃষ্টি গাম্ভীর্য্য সন্ধ্যার।
চাহিয়া চাহিয়া মুগ্ধা বিদর্ভনন্দিনী—
"কি অনন্ত শোভা! দিদি!"—কহিলা রুক্মিণী।
"অপরাহ্ণ শেষে শান্ত সমুদ্র-হৃদয়
হইয়াছে সমুজ্জ্বল নীলমণিময়।
সিন্ধু যেন পুণ্যরাশি, কিরণ আনন্দ হাসি
সিন্ধুবক্ষে বসন্তের সান্ধ্য রবিকর,—
পুণ্যবক্ষে আনন্দের আলোক সুন্দর।
আনন্দ-মণ্ডিত, পুণ্যে পূর্ণিত অর্ণব,
চেয়ে দেখ!"—সত্যভামা নিস্পন্দ নীরব।
নিস্পন্দ নীরব চাহি চাহি কিছুক্ষণ
কহিলা রুক্মিণী—"দিদি! সৃষ্টির প্রথম
অনন্ত সলিলবক্ষে ছিলা নারায়ণ
ভাসমান,—দেখ সেই দৃশ্য নিরুপম!
দেখ সেই পারাবার! ভাসিতেছে বক্ষে তার

জ্যোতিরূপী নারায়ণ—সায়াহ্ন-কিরণ !
অনন্ত সলিল বক্ষে দেখ নারায়ণ !
হায় ! দিদি, আমাদের পতি নারায়ণ !
ওই পারাবার মত, হয় যদি পরিণত
আমাদের শিলাময় কঠিন হৃদয়
প্রেম-পারাবারে, হেন অনন্ত অক্ষয় !
এমনি নির্ম্মল প্রেম, এমনি অতল,
আনন্দ লহরীময়, এমনি শীতল !
আমাদের হৃদয়েতে তবে নারায়ণ
ভাসিতেন যেন ওই রবির কিরণ !”
আনন্দে রাণী বিহ্বলা, ধরি সত্যভামা-গলা
কহিলা উচ্ছ্বাসে ; দুই মুক্তা নিরমল
ভাসিল-রাণীর দুই নয়নে সজল।
দুই মুক্তা সমুজ্জ্বল, দুই বিন্দু অশ্রুজল,
ভাসিল নয়নে—প্রেম-সমুদ্র বিভব
রমণীর ;—সত্যভামা নিস্পন্দ নীরব।
সেই নেত্র ছল ছল, সে মুখ অরুণোজ্জ্বল
মেঘাচ্ছন্ন নিরখিয়া কহিলা রুক্মিণী,—
“এ কি, দিদি, কেন তুই এত বিষাদিনী ?
উৎসব আনন্দে প্রাণ, সকলের ভাসমান,
উৎসবে যাদবগণ উন্মত্ত অধীর ;
তোর মুখে কেন এই বিষাদ গভীর ?”
বিষাদ গম্ভীর কণ্ঠে উত্তরিলা রাণী,—
“সত্য, দিদি, কি অজ্ঞাত বিষাদে না জানি
ডুবিয়া যেতেছে যেন হৃদয় আমার,
যত ভাসাইতে প্রাণ চাহিতেছি, তত জ্ঞান

হইতেছে শিলাময় ; ডুবিছে হৃদয়
বিষাদ-সিন্ধুর গর্ভে নিরানন্দময়।
শুধু দিদি আজ নয়, প্রাণ নিরানন্দময়
বহু দিন, বহু দিন হৃদয়ে আমার
হইয়াছে কি যেন কি ছায়ার সঞ্চার।"

রুক্মিণী। কেন দিদি, কি ছায়া সে ? কেমনে সঞ্চার
হইল হৃদয়ে তোর ? কেন এ বিষাদ ঘোর ?
আমরা রাজার কন্যা, প্রেয়সী রাজার,
পতি নর-নারায়ণ-বিষ্ণু অবতার।
পুত্রগণ ইন্দ্রসম, রূপে গুণে নিরুপম ;
রূপ গুণ প্রেম তোর জগতে দুর্লভ।
তোর হৃদয়েতে ছায়া, এ কি অসম্ভব !

সত্য শুন নাই তুমি, দিদি, কত অমঙ্গল
ঘটিয়াছে যাদবের রাজ্যে অবিরল।
বলি নাই, কে বলিবে ? তোর প্রাণে ব্যথা দিবে,
নাহি চাহে কারো প্রাণ। সরল তরল
তোর প্রাণ, শিশিরাক্ত কামিনী কোমল,
পড়ে ঝরে পরশনে ; তোরে অকরুণ মনে
কে কহিবে অমঙ্গল দুঃখ-সমাচার ?
নিক্ষেপিবে শিলা প্রাণে যূথিকামালার ?
ত্রিদিবের কোমলতা, ত্রিদিবের প্রেমলতা,
ত্রিদিবের পবিত্রতা, এ মর্ত্যে কঠিন
কেমনে আসিলি তুই, ভাবি চিরদিন।
আছিস্ এ মর্ত্যে পড়ি, এই দেবীরূপ ধরি,
এ মাটির পৃথিবীর তুই কিছু নয়,
মাটির বাতাস তোর প্রাণে নাহি সয়।

রুক্মিণী বড় নিরাশ্রয়া আমি, বড়ই দুর্ব্বলা,
সত্য দিদি কিছু আমি, সংসারের নাহি জানি
আমার আশ্রয় তোর, সুভদ্রার, গলা।
দুই দিকে দুই জন, না থাকিলে অনুক্ষণ,
কবে এত দিনে, দিদি, এই লতা ক্ষীণা
যেতো শুকাইয়া অবলম্বন-বিহীনা।
কি ঘটেছে অমঙ্গল, কিছুই না জানি, বল!
কুশলে ত আছে বল পুত্রকন্যাগণ?
আশ্রমে আছেন ভাল ভর্ত্তা নারায়ণ?

সত্য। সকলে আছেন ভাল। কিন্তু অমঙ্গল
বহু দিন হ'তে, দিদি, ঘটিছে কেবল।
বহু দিন অনাবৃষ্টি; মহানদীচয়
হইয়াছে শুষ্কপ্রায়; মহাশব্দে বয়
ঝটিকা শর্করবর্ষী; নীহারে আবৃত
প্রদোষে প্রভাতে দিক; পড়ে অনিবার
উল্কারাশি যদুরাজ্যে বরষি অঙ্গার।
নাহি দিবাকর আর তেমন উজ্জ্বল;
ধূলি ধূসরিত যেন আদিত্যমণ্ডল
শ্যামল, অরুণ ভস্ম, বর্ণের বিকৃত
অবয়বে চন্দ্র সূর্য্য গগন আবৃত।
ঘন ঘন ভূমিকম্প।। ভূধর উদরে
কি ঘর্ঘর শব্দ! শুনি শরীর শিহরে।
মূষিকের উপদ্রব স্থান নির্ব্বিশেষ;
ঘুমালে যাদবগণ কাটে নখ কেশ।
গৃহ, পথ, সরোবর, বন, উপবন,
মৃত মূষিকেতে নিত্য পূর্ণ অগণন।

দিবা নিশি পশু পক্ষী, পালিতা সারিকা,
ডাকিছে বিকৃত কণ্ঠে, যেন বিভীষিকা
দেখিতেছে অনুক্ষণ ; বহে অনিবার
তপ্ত রুক্ষ বায়ু যেন করি হাহাকার।

রুক্মিণী দেখিয়াছি, শুনিয়াছি, আমি এ সকল।
কিন্তু দিদি, প্রাণে মম, ভাসে নাই তোর সম
কোনো অমঙ্গল ছায়া ; বিষাদে আঁধার
করে নাই কই, দিদি, হৃদয় আমার।
মঙ্গল ও অমঙ্গল, অনন্ত বিশ্বমণ্ডল,
যাঁহার সৃজন, তিনি মঙ্গল-নিদান।
তিনি দয়াময় প্রেমময় ভগবান।
আমরা এ ক্ষুদ্র জীব, কিবা শিব, কি অশিব,
কিবা সুখ, কিবা দুঃখ, আলোচনা তার,—
পতঙ্গের প্রগল্‌ভতা বিশ্ব বুঝিবার।
স্রষ্টার এমন সৃষ্টি, যে ভাবে করিবে দৃষ্টি,
দেখ মঙ্গলের ভাবে মঙ্গল সকল।
অমঙ্গল ভাবে দেখ সব অমঙ্গল।
কি মঙ্গল, অমঙ্গল, সুখ দুঃখ যাহা বল,
সকলি মানব মনে ; জগত কেবল
সুখময়, শোভাময়, অনন্ত মঙ্গল।
দিদি, ভ্রান্তি কর দূর, হয়েছে যাদবপুর,
হইয়াছে বসুন্ধরা অমঙ্গলময়
অনাবৃষ্টি হেতু ; দিদি, আর কিছু নয়।
হইবে সুবৃষ্টি যবে, ধনে ধান্যে পূর্ণ হবে
আবার যাদব-রাজ্য, হাসিবে আবার
বসুন্ধরা, হবে বিশ্ব সুখ-পারাবার।

সত্য। ভারত যুদ্ধের কালে ঘোর অমঙ্গল
ঘটেছিল এইরূপ শুনিয়াছি আমি।
ফলিল তাহার হায়! কি ভীষণ ফল!
যদুকুল ভাগ্যে, দিদি, কি আছে না জানি!

রুক্মিণী। ভারত-যুদ্ধের ফল ভীষণ এমন,
কে বলিল সত্যভামা?
ভারত-যুদ্ধের ফল, কি আনন্দ নিরমল!
ভারত ব্যাপিয়া শান্তি, ধর্ম্মের উত্থান,
ভারত ব্যাপিয়া উঠিতেছে হরিনাম।
জরাসন্ধ, শিশুপাল, অসংখ্য অবনীপাল,
অধর্ম্মের মহীরুহ, নাহি দুর্য্যোধন,
আপনার পাপানলে ভস্ম পাপিগণ।
কুতৃণ কুবংশগণ কাটি যথা অগণন,
সুতৃণে পূর্ণিত ক্ষেত্র করে আপনার,
হতেছে সুতৃণে পূর্ণ ভারত আবার!

সত্য। দেখেছি যা দুনয়নে, স্বপ্নে নহে, জাগরণে,
দেখিতে যদ্যপি তুমি, হৃদয়ে তোমার
হইত নিশ্চয় দিদি ভীতির সঞ্চার।
কত নিশি ঘোরতরা, সমাচ্ছন্ন বসুন্ধরা
নিবিড় তিমিরে, ঘোর কৃষ্ণ আবরণে,
দেখিয়াছি—স্মরিলেও ভয় হয় মনে!
দেখিয়াছি শয্যাকক্ষে, দেখিয়াছি এই চক্ষে,
মহামেঘ-প্রভা কৃষ্ণা নারী উন্মাদিনী,
মুক্তকেশী মহামেঘে কৃষ্ণা সৌদামিনী।
হাসিতেছে খল খল, দুনয়নে কি অনল
জ্বলিতেছে, অঙ্গে অঙ্গে মহিমা-স্বপন,

করে ধনু, পৃষ্ঠে তূণ, গর্ব্বিত বদন।
কি গর্ব্ব কুঞ্চিতাধরে, পীনোন্নত বক্ষোপরে!
কি গর্ব্ব চরণক্ষেপে, সৌন্দর্য্যে ভীষণ!
আসিত যাইত বামা উল্কার মতন।

রুক্মিণী। সত্যভামা! পরিহাস তোরে নিরন্তর
করিতে বাসেন বড় ভাল প্রাণেশ্বর।
নিশ্চয় এ তাঁর খেলা! তোর কক্ষ! অবহেলা
করিবে সে ত্রিদিবের, সাধ্য দেবতার
নাহি, দিদি, তুচ্ছ অপদেবতা কি ছার?
সে পবিত্র স্বর্গধাম প্রবেশিতে কাঁপে প্রাণ
পুণ্যের ভকতিভাত; করিবে প্রবেশ
পাপের কি সাধ্য বল সে পবিত্র দেশ!

সত্য। যে অশান্তি ঘোরতর হয়েছে সঞ্চার
যদুকুলে, গৃহে গৃহে,—এও লীলা তাঁর?
গৃহে গৃহে, কক্ষে কক্ষে, যাদবের বক্ষে বক্ষে,
বিধূনিত যে ভীষণ অশান্তি অনল,
পড়ে নাহি ছায়া তব হৃদয়ে সরল।
থাক উদাসিনী মত পতিধ্যানে অবিরত,
বালিকার মত তব হৃদয় তরল,
ন দি জ ন চারিদিকে কি যে হলাহল
জ্বলিতেছে নিরন্তর, জর্জ্জরিত কলেবর
কি বিদ্বেষে যাদবেরা, কি হিংসা অনল
কক্ষে কক্ষে, বক্ষে বক্ষে, জ্বলে অবিরল।
এ অনলে সুরাপান করিছে আহুতি দান
কি ভীষণ! নিরন্তর, বিনা হৃষীকেশ,
নর নারী সুরাপানে মত্ত নির্ব্বিশেষ।

কেহ কারে নাহি মানে, কেহ কারে নাহি জানে,
দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু, কিছু নাহি জ্ঞান,
নাহি লজ্জা ভয়, পাপে বদন অম্লান।
পরস্পরে কি বিদ্বেষ! ব্যভিচার কি অশেষ!
পিতাপুত্র পতিপত্নী পবিত্র বন্ধন
প্রবঞ্চনা ব্যভিচার করেছে ছেদন।
সত্য, বুঝি মূর্ত্তিমতী, সেই ভীমা রূপবতী,
ভ্রমিছে অশান্তি কক্ষে কক্ষে দ্বারকায়,
আচ্ছন্ন করিয়া পুরী বিশাল ছায়ায়!

রুক্মিণী। কি ভীষণ চিত্র দিদি! আঁকিলি নয়নে!
এও তাঁর লীলা, মম হইতেছে মনে।
কিন্তু তোর, এ কি ভ্রান্তি! ভারতের সে অশান্তি
লুকাইল স্বপ্ন মত লীলায় যাঁহার,
তিনি যাদবের পতি তিনি কর্ণধার।

দেখিবি যাদবগণ করি সুখে অতিক্রম
এ অশান্তি পারাবার, শান্তির বেলায়,
প্রভাস উৎসব অন্তে, যাইবে হেলায়।
ওই শুন কি তরঙ্গ, শুন কি তরঙ্গ-ভঙ্গ
হইতেছে আনন্দের শিবিরে শিবিরে,
সমুদ্র-তরঙ্গ-ভঙ্গ অনুকারি তীরে!
কোথাও অশান্তি ছায়া, কালের সে কালী কায়া,
দেখিস কি? শুনিস কি শ্রবণে এখন
কোথাও সে অশান্তির অস্ফুট নিস্বন?
তাঁহার লীলার তীর কে পাইবে? অশান্তির
তুই ভিন্ন লীলায় কি হবে পরাভব?—
কুরুক্ষেত্র ধ্বংস লীলা, প্রভাসে উৎসব?

বহুক্ষণ সত্যভামা রহিলা নীরবে
চাহি সান্ধ্য সিন্ধুপানে, নিমজ্জিতা যেন ধ্যানে
ধীরে ধীরে সন্ধ্যা আসি সিন্ধু নীলিমায়
মাখিছে নীলিমা আরো গভীর ছায়ায়।
"দিদি, যাহা কহ তুমি ; আমার হৃদয়-ভূমি"
কহিলেন সত্যভামা—"ছাইয়া সতত
সিন্ধু-বক্ষে ধীরে ওই সন্ধ্যা-ছায়া মত,
হইতেছে গাঢ়তর সেই ছায়া নিরন্তর ;
এই আনন্দের ধ্বনি শ্রবণে আমার
ধ্বনিতেছে যেন অশান্তির হাহাকার।
দেখ ওই সিন্ধু নীর, কেমন প্রশান্ত স্থির !
মুহূর্ত্তে, ঝটিকা তাহে হইলে সঞ্চার
দোলবে হইবে বিধূনিত পারাবার।
এই শান্তি যাদবের, এই ধ্বনি আনন্দের
শুনিতেছ, কোন দিকে দেয় দরশন
যদি মেঘ, উঠিবে কি ঝটিকা ভীষণ !"
নারায়ণ ধীরে ধীরে পশিলেন এ শিবিরে,
প্রশান্ত প্রসন্ন মূর্ত্তি ! আয়ত নয়ন
প্রশান্ত প্রসন্ন, যেন সায়াহ্ন গগন।
প্রণমিলা দুই রাণী পরশিয়া পা দুখানি,—
অগ্রে সত্যভামা, পরে বিদর্ভনন্দিনী,
অগ্রে উষা, পরে দিবা সুচারুহাসিনী,
নমিলা উদয়াচল পদতল নীলোজ্জ্বল,
শরতের সুপ্রভাতে ; বসিলা কেশব
পর্য্যঙ্কে, বসিলা দুই রমণী বিভব।
লইয়া পতির কর নিজ করে ক্ষুদ্রতর,

রক্তোৎপলে নীলোৎপল করিয়া স্থাপিত,
কহিলা রুক্মিণী—"নাথ। হইয়াছে ভীত
সত্যভামা! দয়াময়! দূর কর তাঁর ভয়,
অমঙ্গল অশান্তির ছায়া কি ভীষণ
করেছে আচ্ছন্ন তার হৃদয়-গগন।
উৎসবের এ উচ্ছ্বাসে, তাহার হৃদয়াকাশে,
একটিও আনন্দের নক্ষত্র উজ্জ্বল
ফুটে নাই, মেঘাচ্ছন্ন হৃদয় কেবল।"

স্মিতমুখ ইন্দীবর, কৌতুক কুঞ্চিতাধর,
"মহিষি!—কহিলা কৃষ্ণ—"বিচিত্র কি আর
নিত্য এই ভাব সত্যভামার তোমার।
বিধাতার এ মঙ্গল শান্তিপূর্ণ ধরাতল
শোভাময়, সুখময়, এই পুণ্যময়,
উৎসবের আনন্দের অনন্ত আলয়।
সুখশান্তি সুমঙ্গল, সত্যভামা, তুমি বল,
দেখেছে কি এ জীবনে কোথাও কখন?
পেচক আলোক নাহি দেখে কদাচন।
খুঁজি এই ভূমণ্ডল কোথা পাবে অমঙ্গল,
কোথায় অশান্তি পাবে সত্যভামা চায়;
যে চায় যেরূপ, রাণি! সেইরূপ পায়।
চন্দ্রে সে কলঙ্ক খোঁজে, কুসুমে কণ্টক,
জ্যোৎস্নায় মেঘছায়া, ত্রিদিবে নরক।
নাহি সাধ্য বিধাতার নির্দ্দোষ হবেন পার
এ জগতে একমাত্র পূর্ণ-নির্ব্বিকার—
সত্যভামা,—সত্যভামা,—সত্যভামা আর।"

রুক্মিণী। এ কৌতুক ত্যজ নাথ! করো না প্রাণে আঘাত,

আজি নহে সত্যভামা মানিনী তোমার
উঠিয়াছে প্রাণে তার বড় হাহাকার।
যাদবের অমঙ্গল, কি যে ঘন মেঘদল,
ছাইয়াছে স্নেহপূর্ণ হৃদয় তাহার ;—
তুমি যে যাদবপতি, অমঙ্গল তার ?
মুকুন্দ ফিরায়ে মুখ, কিবা মূর্ত্তিমতী দুঃখ।
দেখিলেন সত্যভামা, চাহিয়া নীরবে
আত্মহারা ঘোর কৃষ্ণ সায়াহ্ন-অর্ণবে !
পতির কৌতুকবাণী, চিন্তা নিমজ্জিতা রাণী
শুনে নাই! যেই জিহ্বা শ্লেষের আগুন
তপ্ত অঙ্গারের মত বর্ষণে নিপুণ,
অচল সে। রসরঙ্গে, রঙ্গের তরঙ্গ-ভঙ্গে,
যেই হৃদয়ের, কৃষ্ণ যেতেন ভাসিয়া,
সেই সিন্ধু স্থির, মেঘে রেখেছে ছাইয়া।
দীপালোকে সত্যভামা বসি, বিষাদিনী বামা,
শেষ সন্ধ্যা মত, দেহ অবিচল স্থির,—
দেখি গোবিন্দের মুখ হইল গম্ভীর।
নতমুখ, অন্য মন, শিবিরেতে কিছুক্ষণ
ভ্রমিয়া কহিলা দেব,—"শান্তি অমঙ্গল
সকলেই মানবের নিজ কর্ম্মফল।
সেই কর্ম্মফল রেখা,—উহাই অদৃষ্ট-লেখা—
মানব আপনি যদি না করে খণ্ডন,
কার সাধ্য সেই লেখা করিবে মোচন ?
রুক্মিণি! ফিরায়ে নেত্র, রাজসূয় যজ্ঞক্ষেত্র
একবার শান্তভাবে কর দরশন!
হায়! ভারতের সেই অশান্তি ভীষণ

রাজসূয় যজ্ঞস্থলে নিবারিনু কি কৌশলে!
বলি দিয়া অশান্তির দুই অবতার,
করিলাম শান্তির সে সাম্রাজ্য প্রচার!
কিন্তু কি হইল বল? অধর্ম্মী প্রচণ্ডানল
জ্বালাইয়া কুরুক্ষেত্রে, পতঙ্গের মত
হইল ভস্মিত, করি শ্মশান ভারত।
কত যত্ন করিলাম, জান তুমি অবিরাম
নিবারিতে কুরুক্ষেত্র, হইল নিষ্ফল,—
পূর্ণ অধর্ম্মের, রাণি! ধ্বংস কর্ম্মফল।
অধর্ম্মের যে উত্থান জ্বালাইল সে শ্মশান,
সে অধর্ম্ম যাদবের অস্থিমাংসগত,
বহিতেছে শোণিতের সঙ্গে অবিরত।
এ অশান্তি অমঙ্গল জানিও তাহার ফল;
কেমনে নিবারি,—কেন নিবারিব আমি?
নহে যাদবের, আমি মানবের স্বামী!"

"আমি মানবের স্বামী"—শিহরিয়া দুই রাণী
দেখিলা যোগস্থ মূর্ত্তি নীলমণিময়
দীপিতেছে দীপালোকে উর্দ্ধ নেত্রদ্বয়!
দূর ঝটিকার মত ও কি শব্দ অবিরত
আসিতেছে ভাসাইয়া আনন্দ-উৎসব—
মানবের হাহাকার, পক্ষী-কলরব!
কাঁপিতেছে ঘন ঘন ধরা ক্ষুদ্র দোলা সম,
রুক্মিণী ও সত্যভামা পতিপদতলে
পড়িলেন শয্যাভ্রষ্টা প্রকম্পন-বলে।
পতনে অর্দ্ধমূর্চ্ছিতা, ধরিয়া বিস্মিতা ভীতা
পতির চরণদ্বয়, উঠিলা কাঁদিয়া,

সমুদ্র-গর্জ্জন তাহা নিল ভাসাইয়া।
কাঁপে ধরা ঘন ঘন; জীমূত গর্জ্জন সম
গর্জ্জিতেছে মহাসিন্ধু ভীম বেশ ধরি;
কেবল যোগস্থ স্থির দাঁড়াইয়া হরি।

দ্বিতীয় সর্গ।

—*—

অভিশাপ।

অতীত প্রহর নিশি; মহর্ষি দুর্ব্বাসা
রৈবতক গিরি-কক্ষে বসি চিন্তাকুল;
বসি চিন্তাকুল পার্শ্বে ঋষি কতিপয়।
কক্ষের সঙ্কীর্ণ পথে প্রবেশি অজ্ঞাতে
বসন্তের নৈশানিল কাঁপাইছে ধীরে
এক ক্ষীণা দীপশিখা। কম্পিত আলোক
কাঁপাইয়া প্রাচীরেতে নানা অবয়বে
বিকৃত, বীভৎস, কৃষ্ণ ছায়া ঋষিদের,
দেখাইতে কক্ষ ক্ষুদ্র প্রেতভূমি মত।
আরম্ভিলা ঋষি এক—"মহর্ষি! যথায়
ভেদিয়া জীমূত রাজ্য, আবর্ত্ত ঋতুর,
তুলিয়া অনন্ত শির অনন্ত আকাশে
তুষারমুকুটসহ,—মণ্ডিত রজতে
শশধর শুভ্রকরে, তপ্ত স্বর্ণময়

উদয়াস্ত ভাস্করের কর পরশনে—
বিরাজেন হিমাচল, তুলিয়া মস্তক
প্রসারি অনন্ত ফণা নাগেন্দ্র যেমতি
অনন্ত, অনন্তব্যাপি ক্ষীরোদ সাগরে!
তাঁহার ছায়ায় আমি উত্তর ভারতে,
জাহ্নবী যমুনা শৈলসুতা অসংখ্যের
সরল কৈশোর লীলা করি দরশন,
দেখি শৈল অঙ্কে অঙ্কে নাচিয়া ঘুরিয়া
সেই ক্রীড়া, সেই লম্ফ প্রস্তরে প্রস্তরে,
শুনি সেই সুমধুর কৈশোর সঙ্গীত,
ভ্রমিয়াছি বহু বর্ষ।"

"ভ্রমিয়াছি আমি"—
কহিল দ্বিতীয় শিষ্য—"মহর্ষি! যথায়
পঞ্চমুখ বিনিঃসৃত সুধাস্রোত মত
সঙ্গীতের সুশীতল, নির্ম্মল শীতল
বহিতেছে পঞ্চনদ; শোভিতেছে পঞ্চ
নীলমণি হার বক্ষে পঞ্চনদ-ভূমি
প্রসবি ঐশ্বর্য্য ধৈর্য্য; হিমাদ্রি মুকুট
শোভে শিরে সুরঞ্জিত কাশ্মীর কুসুমে,
সিন্ধু বক্ষে পাদপদ্ম সদা ভাসমান,
বিষ্ণু পদাম্বুজ মত। ভ্রমিয়াছি আমি
শৈলে বিচিত্রিত, শৈল-প্রাচীরে রক্ষিত,
গান্ধারীর জন্মভূমি পবিত্র গান্ধার।"

কহিল তৃতীয় শিষ্য—"গুরুদেব! আমি
ভ্রমিয়াছি স্বর্ণপ্রসূ পূরব ভারত
মিথিলা, মগধ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, উৎকল;

শতমুখী শতভুজা জাহ্নবী যথায়,
শতমুখে শত ধারা সুধা সঞ্জীবনী,
শতভুজে রত্নরাশি, করিয়া বর্ষণ,
রেখেছেন সাজাইয়া নিকুঞ্জ নিখর
প্রকৃতির ফলে পুষ্পে, পাদপে লতায় ;
উত্তাল যৌবনগর্ব্বে শৈলজা যথায়
শতমুখে উচ্ছ্বসিত সিন্ধু বিচুম্বিয়া
ঢালিছেন প্রেমধারা বসুধা প্লাবিয়া।"
কহিল চতুর্থ শিষ্য—"ঋষিশ্রেষ্ঠ ! আমি
ভ্রমিয়াছি মরুভূমি মধ্য ভারতের।
যেই বিধি সৃজিলেন কমলে কণ্টক,
শশাঙ্কে কলঙ্ক, শমী হৃদয়ে অনল,
কামনা দুষ্পূরণীয় মানব হৃদয়ে,
সেই বিধি বুঝি হায় ! নিদারুণ মনে
হৃদয় করিল মরু ভারত মাতার !
রাখিল চাপিয়া বক্ষে বিন্ধ্য, আরাবলি,
ভীষণ কঠিন শৈল অচল যুগল !
কিংবা বুঝি ভ্রান্তি মম ;—বিন্ধ্য, আরাবলি,
বুঝি মাতৃস্তনদ্বয় ; হায় ! অবিরল
বহি চারি স্তন্যধারা অমৃত শীতল,
মহানদী, গোদাবরী, নর্ম্মদা, তপতী
পালিয়া সন্তানগণে যুগ যুগান্তরে,
হইয়াছে জননীর বিশুষ্ক হৃদয়,—
হায় ! নরাধম মোরা !" হইল সজল
ঋষির নয়নদ্বয়। কহিল কাতরে—
"মাতৃভক্তি, মাতৃপ্রেম দিয়া প্রতিদানে

করি নাই সে হৃদয় সজল শ্যামল!
হইল কেমনে হায়! ভারত-সন্তান
সহৃদয়, অহৃদয় মেঘের অধম?
নিদাঘে বসুধা-স্তন্য পান করি মেঘ,
বরিষায় সেই ঋণ করে পরিশোধ
অজস্র ধারায়।"

ঋষি কহিল পঞ্চম—

"ঋষীন্দ্র! দক্ষিণাপথ ভ্রমিয়াছি আমি,
রাম সীতা লক্ষ্মণের পদাঙ্ক অমর
অনুসরি; পত্নীপ্রেম, আত্মবিসর্জ্জন,
পতি প্রেমে, ভ্রাতৃ প্রেমে, কবি নিরীক্ষণ
চিত্রিত অমর বর্ণে, চিত্রপটে যেন,
অঙ্কে অঙ্কে পথে পথে দক্ষিণাপথের,
পবিত্র দণ্ডকারণ্যে, পম্পা সরোবরে;
শুনি অন্তরীক্ষে যেন সে করুণ গীত,
অমৃতবর্ষিণী সেই বীণা বাল্মীকির।
দেখিছি মলয়, নীল, অচল যুগল—
জননীর সুপবিত্র যুগল চরণ,
সম্মিলিত কুমারীতে, ভাসিতে সাগরে
আকন্ঠ, তরঙ্গ তুলি লীলা মহিমার;
সুপবিত্র স্বর্ণময় করি লঙ্কাপুরী
জননীর শ্রীচরণ রেণুর শৃঙ্খলে।
জননীর কটিতটে নীলমণি মালা
দেখিয়াছি কৃষ্ণা, আমি শুনেছি চরণে
কল্লোলিনী কাবেরীর শিঞ্জিনী শিঞ্জন।"

দুর্ব্বাসা। উত্তম। নীরব ঋষি, নীরব সকল

স্থির নেত্রে চাহিয়া দুর্ব্বাসা
কক্ষ প্রাচীরের পানে ; সেই মুখ পানে
চাহি শিষ্য পঞ্চ জন ;—নীরব সকল।

দুর্ব্বাসা। কি দেখিলে, কি শুনিলে ?

অবনত মুখ
করিলেন ঋষি পঞ্চ, রহিলা নীরব।

দুর্ব্বাসা। কি দেখিলে,—কি শুনিলে ?

প্রঃ শিষ্য। যোগীন্দ্র ! সকলে
দেখিয়াছি চক্ষে, কর্ণে শুনিয়াছি যাহা,
নাহি শক্তি, নাহি ভাষা, নিবেদিতে পদে।
যে অশান্তি, পূর্ব্ব ছায়া ঘোর ঝটিকার,
ছিল কুরুক্ষেত্র পূর্ব্বে ব্যাপিয়া ভারত
প্রলয়ের মেঘমত, ঝটিকা গর্জ্জন,
ভীষণ জীমূত মন্দ্র, সেই অশান্তির,—
ঈর্ষা ক্রোধ বিস্ফুরণ বিদ্যুদগ্নি মত
রাজ্যে রাজ্যে পরস্পরে, নগরে নগরে,
গৃহে গৃহে, নরে নরে,—ঘন বজ্রপাত,
রাজ্যে রাজ্যে সংঘর্ষণ, আকেন্দ্র ভারত
আসমুদ্র হিমাচল, করি প্রকম্পিত,—
আসিন্ধু অচল, দেব ! দেব ! আগঙ্গা গান্ধার,
সাধুদের হাহাকার, ঘোর হুহুঙ্কার
দুষ্কৃতের, অধর্ম্মের সে নৃত্য ভীষণ,—
নাহি আর। সে অশান্তি গিয়াছে সরিয়া
তিমিরা-রাক্ষসী যেন দিবাকর করে।
কুরুক্ষেত্র-ঝটিকায় গর্জ্জিয়া, বর্ষিয়া,
অসংখ্য অশনিপাতে করিয়া নিপাত

আপনার জন্মদাতা মহীপতিগণ,—
অধর্ম্মের সে করাল মহামেঘমালা
হইয়াছে নিঃশোষিতা আত্ম-বিনাশিনী।
ভীষণ ঝটিকা অন্তে প্রকৃতির মত
হাসিছেন মেঘমুক্তা ভারতজননী
কি মধুর শান্তি-হাসি! ভারত জননী
অশান্তির দাব-দগ্ধা, হইয়া শ্যামলা
আজি বিমণ্ডিতা কিবা শান্তি-জ্যোৎস্নায়
নিরমল সুশীতল! নীলাম্বু সাগরে
ভাসমানা নিত্য মাতা নীলাব্জ রূপিণী,
আজি ভাসিছেন কিবা শান্তির সাগরে
নিরমল সুশীতল নীলামৃতময়!
প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মরাজ্য। ব্যাপিয়া ভারত
এক মহারাজ্য ছত্র। ছায়ায় তাহার
খণ্ড উপরাজ্য গ্রাম লভিছে বিশ্রাম
শান্তির কোমল অঙ্কে; হতেছে চালিত
শান্তির সুখদ পথে উপগ্রহ মত।
নাহি হিংসা, নাহি দ্বেষ। সৌরশক্তি মত
করিয়াছে নব ধর্ম্ম প্রেমে শৃঙ্খলিত;
করিয়াছে কি উন্নতি-পথে সঞ্চালিত!
বাণিজ্যের রুদ্ধ স্রোত ছুটেছে আবার
প্লাবি ধনধান্যে ধরা; রুদ্ধ জ্ঞান-স্রোত
দর্শন বিজ্ঞান পক্ষে ছুটেছে আবার
লঙ্ঘি গ্রহ উপগ্রহ, রাজ্যে অনন্তের,
তত্ত্ব রত্নে পূর্ণ করি জ্ঞানের ভাণ্ডার,
এক সিন্ধু গর্ভে; এক স্বর্ণ সরসিজে,

বিরাজিত নব প্রেমে গলাগলি করি
ধনমাতা জ্ঞানমাতা,—চির বিরোধিনী—
আলিঙ্গিয়া নারায়ণে। শান্তি পারাবার
সেই সিন্ধু ; নব রাজ্য সেই শতদল ;
সেই নারায়ণ কৃষ্ণ। শান্তি পারাবার
গাইতেছে কৃষ্ণ নাম অনন্ত উচ্ছ্বাসে।
নব রাজ্য নীরজের অক্ষয় মৃণাল
কৃষ্ণনাম ; নব ধর্ম্ম মন্ত্র কৃষ্ণনাম।
আসমুদ্র হিমাচল ভারত কেবল
গাইতেছে কৃষ্ণ নাম আনন্দে বিহ্বল।
হাসিয়া বিকট হাসি কহিলা দুর্ব্বাসা—
"হায়! জড় মূর্খ নর! বুঝিলনা কেহ
কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধ লীলা দুর্ব্বাসার।
কৃষ্ণের কি সাধ্য, সেই হীন গোপালের,
এই মহা নরমেধ করে উদ্‌যাপন!
সাজি পাণ্ডবের দূত কতই কৌশলে
পেতেছিল ষড়যন্ত্র সন্ধির কারণ
প্রাণপণে! নারায়ণ দাঁতে তৃণ লয়ে
মাগিলেন পঞ্চ গ্রাম। "সূচ্যগ্র মেদিনী
নাহি দিব"—শুনিলেন মন্ত্র দুর্ব্বাসার।
ব্রাহ্মণের প্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষত্রিয় দাম্ভিক
পোড়াইয়া, আধিপত্য বেদ ব্রাহ্মণের
রক্ষিতে, করিয়া সেই যজ্ঞ নরমেধ
স্থাপিলাম এই শান্তি আসিন্ধু অচল—
কৃষ্ণের কি সাধ্য তাহা করিবে স্থাপন!
হা বিধাতঃ! তথাপি কি হইল প্রচার

সেই গোপালক-নাম! ইন্দ্র, চন্দ্র ছাড়ি
গোপালক, গোবর্দ্ধন, পূজিবে ভারত!—
এই মনস্তাপ হায়! সহিব কেমনে!"
কিছুক্ষণ ঋষিবর রহিয়া নীরবে
জিজ্ঞাসিলা—"কে করিল, করিল কেমনে,
এই পাপনাম, পাপ ধর্ম্মের প্রচার?"
কহিল প্রথম শিষ্য অবনত মুখে
সভয়—"মহর্ষি ব্যাস"—
আগ্নেয় ভূধর
গর্জ্জিল দুর্ব্বাসা ক্রোধে, ভীত শিষ্যপানে
চাহি কোটরস্থ ক্ষুদ্র নেত্রে প্রজ্বলিত—
"মহর্ষি!—মহর্ষি!—ব্যাস! ওরে মূর্খ কহ
কে ব্যাস? মহর্ষি নাম কে দিল তাহারে?"
"পরাশর পুত্র"—ভয়ে কহিল কাঁপিয়া
শিষ্য।
"পরাশর পুত্র"—গৈরিক এবার
ছুটিল আকাশ পথে, গর্জ্জিলা দুর্ব্বাসা—
"জিতেন্দ্রিয় পরাশর, তার পুত্র কভু
সম্ভবে কি ওরে মূর্খ—উড়ুম্বরে ফুল?
মহাঋষি পরাশর, তপস্যায় তাঁর
করিলি রে এই ঘোর কলঙ্ক অর্পণ!
লভিলি কি এই শিক্ষা দুর্ব্বাসার কাছে
দুরাচার?"
"দ্বৈপায়ন"—কহিল তখন
ভীত প্রকম্পিত শিষ্য। কহিলা দুর্ব্বাসা—
"বুঝিলাম এতক্ষণে কে মহর্ষি তোর,

কে সে ব্যাস। বুঝিলাম গর্ব্বে ধীবরীর
জনমিল দ্বীপে যেই জারজ সন্তান,
সে তোর মহর্ষি! মূর্খ। সেই তোর ব্যাস।
সেই পরাশরপুত্র! আর্য্য পরাশর
করিলেন বিসর্জ্জন তপস্যা তাঁহার
ধীবরীর পদ্মগন্ধে দ্বীপ বালুকায়!
অপূর্ব্ব এ নব ধর্ম্ম! মহর্ষি—ধীবর!
গোরক্ষক—নারায়ণ! প্রণব তাহার—
গোপ নাম! বেদ শাস্ত্র আছে কি তাহার?"
"ভগবদ্গীতা"—শিষ্য উত্তরিল ধীরে।
করিয়া দোহন উপনিষদ সকল
দ্বৈপায়ন কি যে দুগ্ধ, জ্ঞানের অমৃত,
করিলেন সঙ্কলন এই গ্রন্থে তাঁর
বলিতে না পারি প্রভু! সাজিয়া যোগিনী
বেড়াইয়া তীর্থে তীর্থে সুভদ্রা আপনি
করিছেন বিতরণ এই ধর্ম্ম-সুধা,—
কি আনন্দে উচ্ছ্বসিতা, কি প্রেমে বিহ্বলা!
পান করি সে অমৃত, গাই কৃষ্ণ নাম,
যাইতেছে গড়াগড়ি নরনারীগণ,
নয়নে কি প্রেম ধারা আনন্দ হৃদয়ে!—
না দেখিলে নেত্রে প্রভু না হবে প্রত্যয়।

দুর্ব্বাসা। আমার সে মহাগ্রন্থ!—নির্ব্বোধ তোমরা
শিখেছ ত; শিখিয়াছ বেদ ব্যাখ্যা মম
তোমরা কি এতকাল ছিলে নিদ্রাগত?

প্রঃ শিষ্য। না প্রভু; শুনিলে সেই মহাগ্রন্থ নাম,
সে অপূর্ব্ব ধর্ম্ম ব্যাখ্যা, হাসে নর নারী।

আর যাহা বলে দেব! কহিতে না পারি।
হাসিয়া ঈষৎ ঋষি কহিলেন ধীরে—
"হায় মূর্খ শিষ্যগণ! না জান তোমরা
বর্ত্তমান কত ক্ষুদ্র! কতই অসীম
ভবিষ্যত! নাহি চাহি বর্ত্তমান যশঃ,
ভবিষ্যত মহাকীর্ত্তি গাইবে আমার!
খদ্যোতের ক্ষুদ্রালোক নিকটে উজ্জ্বল।
কিন্তু ভাস্করের জ্যোতি দাঁড়াইয়া কাছে
কে পারে দেখিতে বল? কে পারে দেখিতে
হিমাদ্রির সে মহিমা বসি পদতলে?
কয়খানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ পুত্র ধীবরীর
করিয়াছে প্রণয়ন? দর্শন, বিজ্ঞান,
শ্রুতি, স্মৃতি, আয়ুর্ব্বেদ, জ্যোতিষ, পুরাণ,
সঙ্গীত, সাহিত্য, শিল্প, অঙ্ক, ইতিহাস—
আমার অনন্ত গ্রন্থ, অনন্ত মৈনাক
মহাকাল-সিন্ধু-বক্ষে রহিবে অচল;
ধীবরের তৃণ রাশি যাইবে ভাসিয়া।
আমার অনন্ত গ্রন্থ সাধিবে উদ্ধার
অনন্ত কালের তরে অনন্ত জীবের।"
কহিল স্বগত ধীরে শিষ্য একজন—
"অনন্ত জীবের সত্য,—অনন্ত কীটের
এই মহাগ্রন্থ স্তূপ সাধিবে উদ্ধার।
একখানি মাত্র হায়! পড়িতে তাহার
আমি এ জীবের দন্ত, ক্ষুদ্র বুদ্ধি খানি,
অনন্তকালের তরে লভেছে উদ্ধার।"
রহি মৌন কিছুক্ষণ মহর্ষি গম্ভীর

জিজ্ঞাসিলা—"শিষ্যগণ! কহ শুনি পুনঃ
তোমাদের ঘোরতর সেই অপমান
যাদব শিশুর হস্তে,—কৃষ্ণ ভুজঙ্গের
শিশু সর্প বিষধর।"

আনত বদনে
কহিল প্রথম শিষ্য—"প্রভুর আদেশে
গিয়াছিনু দ্বারকায় আমরা সকলে
গুপ্তচর। পুরদ্বারে যত শিশুগণ
খেলিতেছে অপরাহ্নে; দূরে আমাদের
নিরখিয়া, শিশু এক সাজায়ে গর্ভিণী
জিজ্ঞাসিল—"কহ ঋষি! করিয়া গণনা
কি প্রসব করিবে এ গর্ভিণী রমণী?"
খল খল শিশুগণ লাগিল হাসিতে।

দুর্ব্বাসা। উত্তম—তাহার পর?

প্রঃ শিষ্য। এই উপহাসে
হইয়া অধীর ক্রোধে লোহিত লোচনে
কহিলাম—"হে দুর্ব্বৃত্ত গর্ব্বিত বালক!
করিবে এ ছদ্ম নারী প্রসব মুষল।
গর্ব্বিত যাদব কুল হইবে নির্ম্মূল।"
বহু বর্ষ গত প্রভু! স্মরিলে তথাপি
সে নিগ্রহ অপমান হয় প্রবাহিত
ধমনীতে অগ্নি-স্রোত, দগ্ধ হয় প্রাণ।

দুর্ব্বাসা। মাভৈ মাভৈ বৎস! এক দিন আর
হও দগ্ধ! শিষ্যগণ! এক দিনে আর
ফলিবে এ অভিশাপ অক্ষরে অক্ষরে,
অদৃষ্টের লিপি সম বজ্রের নির্ঘাতে।

মুষল যাদবগণ করেছে প্রসব ;
অচিরে যাদব কুল হইবে নির্ম্মূল।
যাও চলি শিষ্যগণ নিশ্চিন্ত আশ্রমে !
কর গিয়া আপনার তপস্যা সাধন।

তৃতীয় সর্গ।

দুই ভগিনী।

ফুল্ল জ্যোৎস্নায় স্নাত শৈলমালা,
শেখর উন্নত নত
শোভিতেছে শান্ত রজত সাগরে
স্থির তরঙ্গের মত।
একটি শেখরে বসি একাকিনী
বাসুকীর ভগ্নী চারু ;—
সুমলয় বয় চুম্বি কুবলয়,
চুম্বি মুক্তকেশ চারু।
ফুল্ল শশধর, ফুল্ল নীলাম্বর,
চন্দ্র-নীলাম্বর তলে
চন্দ্র নীলাম্বর-নির্ম্মিত কুসুম,
নীলামৃত দলে দলে।
চন্দ্র-নীলাম্বরে বিস্তৃত সুন্দর
চাহিয়া অনন্ত প'নে,

আকর্ণ বিস্তৃত অনিমিষ নেত্রে,
জরৎকারু বসি ধ্যানে।
ফুল্ল শশধর, ফুল্ল নীলাম্বর,
চন্দ্র-নীলাম্বর তলে
নীল শৈলমালা নিষ্কম্প নীরব,
নীরবে মলয় চলে।
নীরবে শেখরে বিরল পাদপ
দাঁড়াইয়া স্থানে স্থানে,
স্থানে স্থানে গুল্ম বসিয়া নীরবে
চাহি চন্দ্রাকাশ পানে।
সস্মিতা প্রকৃতি অবগাহি অঙ্গ
জ্যোৎস্নায়, মুগ্ধপ্রাণে
রয়েছে চাহিয়া নিষ্কম্প নীরব
চন্দ্র নীলাম্বর পানে।
ফুল্ল শশধর, ফুল্ল নীলাম্বর,
নীলাকাশে ফুল্লতর
চন্দ্র ফুল্লতর উঠিল ভাসিয়া,—
কারুর হৃদয়েশ্বর।
সেই আকাশের সেই চন্দ্র কারু
দেখিছে বসিয়া ধ্যানে,
দেখিয়াছে কারু কৈশোরে যৌবনে
সেই চন্দ্র মুগ্ধপ্রাণে।
নীল, নীলতর, নিরাশা আকাশে
ফুল্ল, ফুল্লতর ধীরে,
হইয়াছে শশী; আজি ফুল্লতম;—
অতীত যৌবন তীরে

বসি অভাগিনী দেখিছে সে শোভা।
প্লাবিয়া হৃদয় তার,
প্লাবিয়া ভারত, কি মহা পূর্ণিমা
করেছে বিশ্বে সঞ্চার!
সেই পূর্ণিমায় লভিছে ভারত,
লভিছে জগতবাসী,
কি শান্তি শীতল! কেবল কারুর
হৃদয় কি অগ্নিরাশি!
অভিমান-স্ফীত হৃদয় পূর্ণিত
নিরাশা অনলে দহি
জ্বলিয়া, গলিয়া, ছুটিয়া, গর্জ্জিয়া,
গৈরিক ধারায় বহি
পড়িছে হৃদয়ে, অজস্র ধারায়,
কত ধারা অবিরত!
বিদীর্ণ বিক্ষত, বিদগ্ধ হৃদয়
আগ্নেয় ভূধর মত।
মানস আকাশে সেই পূর্ণ চন্দ্র,
সেই চন্দ্র করে চারু,
বিদীর্ণ সে গিরি, গৈরিক প্রবাহ
নীরবে দেখিছে কারু।
"দিদি"!—অকস্মাৎ নিবিড় নীরব
শেখরে উঠিল ভাসি,
নিবিড় নীরব জগতে ভাসিল,
কি যেন অস্ফুট বাঁশী!
সুদূর বিশ্রুত কি যেন সঙ্গীত
উঠিল স্মৃতিতে জাগি,

সুদূর বিস্মৃত কি সুখ-স্বপন
প্রাণের, কাহার লাগি।
ধীরে ধীরে ধীরে, সে অস্ফুট বাঁশী
বিশ্রুত জ্যোৎস্না-গীত,
বিস্মৃত-স্বপন, সুখের স্নেহের
শীতল সুধা-মণ্ডিত,
উঠিল ভাসিয়া ফুল্ল জ্যোৎস্নায়
কারুর নয়ন আগে,
শান্ত আকাশের শান্তিবালা যেন,—
কি শান্তি বদনে জাগে!
"কে তুমি? আকাশ হইতে কি তুমি
নামিলে এ গিরি শিরে?
কে তুমি? মানবী, কহ কিবা দেবী?"—
জিজ্ঞাসিল কারু ধীরে
বিস্ময়ে স্তম্ভিতা—"আকাশের দেবী?
কিংবা বনদেবী বল?
কিংবা শশাঙ্কের অঙ্ক-বিহারিণী
শান্তি সুধা নিরমল?"
"দিদি"—কি মধুর ডাকিল আবার
শান্তির ত্রিদিব লতা!
শান্তি সরোজিনী প্রভাত সমীরে
কহিল কি প্রেম কথা!
আবার বিস্ময়ে জিজ্ঞাসিল কারু—
"কেন দেবি! এলে তুমি,
অভাগিনী শৈল, ধরি তার রূপ
ছলিতে এ মরুভূমি।

সেও অভাগিনী, অভাগিনী আমি,—
নিষ্ঠুর বিধির খেলা!
জ্বালিল যে মরু উভয়ের প্রাণে,
নাহি তা'র সীমা বেলা।
রমণীর প্রাণে জ্বলে যেই মরু
অনির্ব্বাণ অনিবার,
জগতের মরু, শয্যা কুসুমের
হায় তুলনায় তার!
প্রান্তরের মরু, ম'রে এক দিনে,
প্রাণের সে মরু, হায়!
পলে পলে দহে, দহে তিল তিল,
পলে কত যুগ যায়!

সে মরু-দহনে দহিয়' দহিয়া
আমা'র সে শৈলফুল,
হয়েছে আকাশে ওই শান্তি তারা,
দেখ কি শোভা অতুল!
আমি সে দহনে দহিয়া দহিয়া
বসি নৈশাকাশ তলে,
ওই তারা পানে চাহিয়া চাহিয়া
ভাসি স্মৃতিস্রোতোবলে।"
"দিদি! দিদি! আমি সেই শৈল তব,
মরে নাই শৈল তোর"—
শৈলজা পড়িল গলায় কাকর
স্নেহের উচ্ছ্বাসে ভোর।
"ভগ্নী পুণ্যবতী, পুণ্যবান ভাই,
প্রেম পুণ্য পারাবার,

তোমাদের পুণ্যে শৈল পুণ্যবতী,
দিদি কি অভাগ্য তার ?
"তুই শৈল !—তুই আমাদের শৈল !
সেই ক্ষুদ্র স্নেহলতা !"
আটিয়া হৃদয়ে উন্মাদিনী কারু,
উচ্ছ্বাসে সরে না কথা ;—
"তুই শৈল ! সেই স্নেহের পুতুল, !"
—কাঁদে কারু শিশুপ্রায়—
"চাপি মুখখানি রাখ, দিদি ! রাখ !
হৃদয় যে ফেটে যায় !
"তুই সেই শৈল, স্নেহ-মন্দাকিনী,
আমার প্রাণের আধা।
দুই ক্ষুদ্র বীণা শৈল জরৎকারু,
এক স্বরে প্রাণে বাঁধা।
নাগরাজ-প্রেম সেই এক স্বর,
আমাদের একপ্রাণ ;
পিতৃমাতৃহীনা আমরা দুজন—
সে প্রেমে হয়নি জ্ঞান।
নাগরাজ মাতা, নাগরাজ পিতা,
নাগরাজ ভগ্নী, ভ্রাতা,
করুণ কিশোর প্রেমময় ভ্রাতা
আমাদের প্রাণদাতা।
বাঁচি সেই প্রেমে, নাচি সেই প্রেমে,
খেলি সেই এক খেলা,
সেই প্রেম বক্ষে দুদিকে দুজন
ঘুমায়েছি দুই বেলা।

সেই বুক হায়! শুষ্ক আধখানি
শৈল রে বিরহে তোর!
বিরহে রে তোর হইয়াছে শুষ্ক
আধখানি বুক মোর।
অর্দ্ধশুষ্ক বুকে আয় দিদি! আয়!
ডাক পুনঃ দিদি বলি,
দেখি এই মুখ, শুনি সেই কথা,
পাষাণ যাউক গলি।
দেখি নাই মুখ, শুনি নাই কথা,
হায়! দিদি! কত দিন!
আয় দিদি! আয়! আয় মুখে মুখ,
বুকে বুক করি লীন।"
"দিদি!—দিদি!—দিদি!—দিদি প্রেমময়ি!
ভগিনী জননীসমা!
অহো! দুটি প্রাণে দিয়েছি কি ব্যথা!
দিদি! কি করিবি ক্ষমা?"
কারুর চরণ ধরি দুটি করে,
ঊর্দ্ধনেত্রে দর দর—
"দিদি! দিদি!—ওমা!"—ডাকিছে শৈলজা;
ও কি কথা!—ও কি স্বর!
উন্মাদিনী কারু লইল তুলিয়া
বুকে সেই প্রেমলতা,
চুম্বিল বদন, চুম্বিল নয়ন,
কারুর না সরে কথা।
গলিল পাষাণ, গলিল জগত,
গলিলেন সুধাকর,

কি সুধা ঝরিল, জগত ভরিল,—
কারুর হৃদয়-সর।
মোহিত জগত, কারুর হৃদয়
হইল মোহিত ধীরে,
মুখ হ'তে মুখ পড়িল সরিয়া
শৈল বুকে সিক্ত নীরে।
তুলি মুখ—"দিদি! দিদি! মা আমার!"
ডাকে শৈল দর দর
তুলিয়া কারুর মূর্চ্ছিত বদন,
ভগ্নবৃন্ত ইন্দীবর।
"গুরুদেব! এ কি! কি হইল হায়!
হায়! কি করিলে হরি!"—
কাঁদিল শৈলজা, অবশ বদন
বাম অংসোপরে পড়ি।
"নাহি জানি নাথ! কোথায় তোমার
গোলোক আনন্দময়,
বুঝি এই প্রেম তব পদাম্বুজ,
সে গোলোক এ হৃদয়।"
যোগস্থা শৈলজা বসি কিছুক্ষণ
চাহি নীলাকাশ পানে,
ধীরে বুলাইল কারু মুখে কর,
সঞ্চারি তাড়িত প্রাণে।
ধীরে ধীরে কারু মেলিল নয়ন,
মুখ অঙ্কে শৈলজার।
রহিল চাহিয়া শৈল মুখ পানে
নীরব চিত্রিতাকার।

চাহিয়া চাহিয়া স্মৃতি, ধীরে ধীরে
উঠিল হৃদয়ে ভাসি,
উঠিল আকাশে আবার ভাস্কর
সরাইয়া মেঘরাশি।
উঠিয়া হৃদয়ে লইয়া শৈলেরে
কহে কারু কণ্ঠে স্থির—
"শৈল রে! আমরা কি ক্রীড়া-পুতুল
নিদারুণ নিয়তির!
আমাদের মত দুঃখী তিন জন
আছে কি জগতে আর?
আমাদের মত সুখী তিন জন?—
এত সুখ ছিল কার।
শৈশবে দুজনে মৃগশিশু মত
কাননে করি বিহার,
ছুটিতাম বনে মৃগশিশু সনে,—
এত সুখ ছিল কার?
নাচিলে শিখিনী পেখম খুলিয়া,
অঞ্চল করি প্রসার
নাচিতাম বনে আমরা দুজনে,—
এত সুখ ছিল কার?
কাননের শ্যামা গাইলে মধুরে,—
অনুকারি স্বর তার
গাইতাম সুখে শ্যামা বনবালা,—
এত সুখ ছিল কার?
সহকার পত্রে লুকাইয়া কুহু
ডাকিলে কোকিল আর,

ডাকিতাম পত্রে লুকায়ে আমরা—
এত সুখ ছিল কার?
সিন্ধুতীরে বসি মধ্যাহ্ন ছায়ায়,
ফুল্ল জ্যোৎস্নায় আর,
প্রস্রবণ পারে, প্রপাতের ধারে,
গাঁথিতাম পুষ্পহার,
গাইতাম গান, খেলিতাম খেলা,
কহিতাম কত কথা,
—কিশোর উচ্ছ্বাস—মুখে মুখে দুই
বন-কপোতিনী যথা।
নবীন কিশোর ভ্রাতা নাগরাজ
গলায় গলায় তাঁর
বেড়াতেম বনে, শেখরে শেখরে,—
এত সুখ ছিল কার?
তিন খণ্ড করি এক বনফল,
একই আহার আর,
খাইতাম সুখে অনাথ এ তিন—
এত সুখ ছিল কার?"
আকাশের পানে চাহি মুগ্ধ কারু,
শান্ত দু'নয়ন স্থির।
ধরি গলা শৈল আকাশের পানে,
চাহি দু'নয়নে নীর!
"একদিন বনে—পড়ে কি লো মনে?'
পুনঃ কারু কহে কথা,
"দেখিলাম এক সলতা পাদপ,—
বিশুষ্ক পাদপ, লতা!

চারিদিকে চারু শোভে বনস্থলী
পল্লবে কুসুমে ফলে,
এ পাদপ লতা ফল পুষ্পহীন,
ঝরে পত্র পলে পলে
শুষ্ক বৃক্ষলতা দেখি করুণায়
দুটি প্রাণ ছল ছল—
পড়ে কি লো মনে কতই করুণা,
ঢালিলাম কত জল?
আজি নাগরাজ সেই শুষ্ক তরু
আমরা সে শুষ্ক লতা।
ফলফুলহীন হায়! তিন জন!
বিশুষ্ক পল্লব যথা,
পড়িছে ভাঙ্গিয়া, পড়িছে ঝরিয়া,
দেহ-শোভা পলে পলে,
শুষ্ক তিন জন একই উত্তাপে,
একই নিরাশানলে!'
"নিরাশা! নিরাশা! নিরাশা কি দিদি!"
—শান্ত কণ্ঠে শৈল কহে—
'সুখের সংসারে হায়! এইরূপে
নরে মরীচিকা দহে!
সুভদ্রার প্রেম, দিদি! কৃষ্ণপ্রেম,
যাদের প্রাণের আশা,
সুধার সাগরে ডুবেছে যাহারা,
কি নিরাশা! কি পিপাসা!"
"অর্জ্জুনের প্রেম"—গ্রীবা বাঁকাইয়া
কহে মৃদু স্বরে কারু—

"অর্জ্জুনের প্রেম, নহে মরীচিকা ?
সে কি সরোবর চারু ।"
শৈল। আছে শৈশবের, আছে কৈশোরের,
আছে খেলা যৌবনের !
অর্জ্জুনের প্রেম যৌবনের খেলা
উন্মেষিত হৃদয়ের।
কিন্তু, দিদি ! খেলা নহে মরীচিকা,—
সুখের সোপান-স্তর ;
খেলিয়া খেলিয়া সোপানে সোপানে
উঠ উর্দ্ধে নিরন্তর !
পুতুল লইয়া খেলিয়া পূজিয়া,
খেলিতে পূজিতে শিখি
মানুষ-পুতুল লইয়া যৌবনে ;
খেলিয়া পূজিয়া দেখি
মানুষ-পুতুল ছাড়িয়া হৃদয়
অন্বেষ' পুতুল আর
সে পুতুল কৃষ্ণ, কৃষ্ণপ্রেম লক্ষ্য
জীবনের এ খেলার।
সে প্রেম-সাগরে হইবে নিবৃত্তি
আশার ও পিপাসার,
সে সুধা-সাগরে না উঠে গরল,
মরীচিকা নিরাশার।
"কৃষ্ণপ্রেম !"—যেন দংশিল ভুজঙ্গ,
শৈলেরে শিলায় ফেলি
দাঁড়াইল কারু, কুঞ্চিত অধর,
আকর্ণ নয়ন মেলি।

বিস্ফারিত নেত্রে চাহি শৈলজায়
"কৃষ্ণপ্রেম!"—কারু কহে
"সুধার সাগর কৃষ্ণপ্রেম, শৈল!
যে প্রেমে হৃদয় দহে!
কৃষ্ণপ্রেম-সুধা! দন্তে ভুজঙ্গের
সুধা তবে রহে বল!
সুধা তবে রহে আগ্নেয়-ভূধরে,
গৈরিক সুধা তরল!
যেই কৃষ্ণপ্রেমে জলিয়া পুড়িয়া
এরূপ হইনু ছাই!
যেই প্রেমশিখা এই ভস্ম মাঝে
জ্বলিছে, বিরাম নাই।
যেই প্রেমে জ্বলি উন্মাদিনী মত
ছুটিয়াছি বনে বনে!
ডুবিয়াছি জলে, পড়েছি অনলে,
পশিয়াছি ঘোর বনে!"

শৈল। তুমিই কি সেই উন্মাদিনী নারী
যাদব-পুরীতে ঘুরি,
ভীমা মুক্তকেশী বেড়া'তে নিশীথে
আতঙ্কে পূরিয়া পুরী?

কারু। আমি।

শৈল। তুমি।

কারু। আমি! আমি মুক্তকেশী,
ভীমা উন্মাদিনী আমি!
জ্বলি সে জ্বালায়—কি দারুণ জ্বালা
জানেন অন্তরযামী!—

মস্তকের মণি খুঁজিত ফণিনী
বেড়াইয়া কক্ষে কক্ষে,
দেখিতাম মণি কভু সত্যভামা,
কভু রুক্মিণীর বক্ষে।
দেখিতাম—চক্ষু পড়িত খসিয়া
কি উগ্র অনলে জ্বলি!
বহিত হৃদয় নয়নে ধারায়
কি উগ্র অনলে গলি!
সেই স্মৃতি, শৈল!—জ্বলিছে নয়নে,
পড়িছে হৃদয় গলি”—
দু’করে নয়ন চাপিয়া, শৈলের
হৃদয়ে পড়িল ঢলি।
উভয় নীরব—তরল অনলে
ভাসিছে শৈলের বুক।
বহে শান্তিধারা শৈলের নয়নে,
চাপি হৃদে সেই মুখ।
“কিন্তু দিদি! তুমি,—ঋষিপত্নী তুমি,
তুমি পুত্রবতী নারী!
জান তুমি দিদি! রমণীর প্রেম
পবিত্র জাহ্নবী-বারি।”—
কহে শৈল ধীরে। হাসি উচ্চ হাসি
কহে কাক্ক হাসি মুখে—
“শত রবি শশী, নক্ষত্র অশেষ
ভাসে না জাহ্নবী বুকে?”
শৈল। ভাসে প্রতিবিম্ব, জানে না জাহ্নবী,
যায় এক সিন্ধু পানে।

কারু। এক পারাবারে গতিই আমার—
কি গতি এ দগ্ধ প্রাণে!
পড়ে প্রতিবিম্ব জাহ্নবীর বুকে,
নাহি পড়ে এই প্রাণে।
এক প্রতিবিম্বে পরিপূর্ণ বুক
জাগ্রতে, নিদ্রায়, ধ্যানে।
ঋষিপত্নী আমি!—পুত্রবতী আমি!—
দিদি রে!—ছলনা সার,
আর্য্য ঋষি কভু অনার্য্যা নারীরে
করে কি বিবাহ আর?
"কৃপা করি তব হইলাম পতি"—
কহিলেন ঋষিবর,
এই ত বিবাহ! হইলেন ভ্রান্ত
শিশুসম নাগেশ্বর।
ছল-পতি ঋষি, এই ছলনায়
সাধিতে স্বকার্য্য তার;
ছল-পত্নী আমি, দিদি অনার্য্যের
করিতে রাজ্য উদ্ধার!
শৈল। দিদি! পুত্র তব?
কারু। রাধেয় দ্বিতীয়!
হরিয়া সতীত্ব কার
ঋষি দুরাচার আনিল কুমার,
অর্পিল করে আমার।
নিরাশ্রয় শিশু, নিরখিয়া মুখ
দ্রবিল হৃদয় মম,
সরল সুন্দর এ শিশু হীরক

পালিয়াছি খনি সম।
জানে শিশু আমি জননী তাহার;
নিরখি তাহার মুখ,
এ দগ্ধ হৃদয়ে পাই কি সান্ত্বনা!
কি আনন্দে ভরে বুক!
যেই দিন দিদি! নখ মাত্র মম
ছুঁইবেন ঋষিবর,
জানেন আপনি, হইবে চূর্ণিত
সে দিন অস্থি পঞ্জর।
শৈশবে কৈশোরে সিন্ধু নদ তীরে
বসিয়া দুজনে সুখে,
দেখিতাম রবি সহস্র হইয়া
ভাসিতে সিন্ধুর বুকে।
সেইরূপ দিদি! সহস্র হইয়া
ভাসে কৃষ্ণ এ হৃদয়ে,
ভাসে এই দেহে, ভাসে অঙ্গে অঙ্গে,
কৃষ্ণ শিরাস্রোতে বহে।
হৃদয়েতে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ নয়নেতে,
অধরেতে কৃষ্ণনাম,
শ্রবণেতে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ পরশনে,
নাসিকায় কৃষ্ণঘ্রাণ।
এই দেখ দিদি!"—নিষ্কোষিয়া অসি
করিয়া বক্ষে প্রহার—
"কৃষ্ণ বিনা, দিদি! এ দেহে, হৃদয়ে,

কিছু মম নাহি আর।"
বিজলীর বেগে শৈল সেই অসি
নিক্ষেপিল দূরে বলে,—
বহে রক্তধারা,—আত্মহারা শৈল
পড়ে কারু পদতলে,—
"দিদি! দিদি! ওমা তুমি প্রেমময়ি।
প্রেমস্বরূপিণী তুমি!
দেও কৃষ্ণপ্রেম ভগিনী কন্যায়
উদ্ধার এ বনভূমি!
দেখ পতি তব জগতের পতি,
খুলি নেত্র-আবরণ!
তিনি পতি তব, তিনি পতি মম,
তিনি নর-নারায়ণ!"

চতুর্থ সর্গ।

—:*:—

যোগানল।

এখন (ও) দুর্ব্বাসা ঋষি বসি সেই শৈল-কক্ষে
একাকী নীরব চিন্তাকুল।
দেখাইছে ক্ষীণ দীপ কাঁপি নৈশানিলে কক্ষে
ঋষিবরে প্রেত সমতুল।
ধীরে ধীরে পশি কক্ষে, নাগেন্দ্র বাসুকি, কারু
প্রণমিল চরণে ঋষির।

শুনিয়া চরণ শব্দ মুদিলেন নেত্র ঋষি,
হইলেন ধ্যানমগ্ন স্থির।
ছল ধ্যানে ঋষিশ্রেষ্ঠ রহি স্থির কিছুক্ষণ
মেলিলেন নেত্র ধীরে ধীরে,
সস্মিত বিকট মুখে কোটরস্থ যুগ্ম নেত্রে
চাহিলেন কারু বাসুকিরে।

দুর্ব্বাসা। তোমার বিলম্ব দেখি, এই সপ্ত দিবা নিশি
রহিয়াছি যোগে নিমজ্জিত,
যোগবলে আকর্ষিয়া আনিনু তোমারে আজি
করিবারে ব্রত উদ্যাপিত।
সসৈন্যে আগত তুমি?

বাসুকি। সসৈন্যে আগত আমি
কোথায় পাইব সৈন্য ঋষি!
যথায় হিমাদ্রি-সানু নীলাকাশে নীলতর
অভ্রভেদী রহিয়াছে মিশি,
যথায়-নীলাম্বু বেলা সিন্ধু সহ করে খেলা,
সিন্ধু, বেলা, আকাশে মিশিয়া,
আসিন্ধু আকাশ-তট ব্যাপিয়া ভারত-ভূমি
বহুবর্ষ আসিনু ভ্রমিয়া।
বেড়াইনু বনে বনে, হিমাচল, বিন্ধ্যাচল,
আরাবলি, মহেন্দ্র, মলয়;
নীল মণি আভরণ অঙ্গে অঙ্গে ভারতের
বেড়াইনু অনার্য্য আলয়।

দুর্ব্বাসা। কি দেখিলে? কি শুনিলে?

বাসুকি। শুনিলাম, দেখিলাম,
শুনি নাই, দেখি নাই, যাহা!

সাধ্যাতীত ! চিন্তাতীত ! মানব কল্পনাতীত !
মানবের কার্য্য নহে তাহা।
হায়! কুরুক্ষেত্র-পূর্ব্ব ভারতের সে অশান্তি !
এই শান্তি কুরুক্ষেত্র-পর !
সেই হিংসা, এই প্রেম ! সে অধর্ম্ম, এই ধর্ম্ম !
সে নরক, এ স্বর্গ সুন্দর !
আসিন্ধু অচল ব্যাপী পাণ্ডব সাম্রাজ্য-ছায়া
কি শীতল, কিবা পুণ্যময় !
নাহি সেই রক্ত স্রোত, প্রেম স্রোতে নর নারী
জুড়াইছে তাপিত হৃদয়।
সেই কুরুক্ষেত্র ঋষি ! দেখিয়াছ নেত্রে তব,
এই কুরুক্ষেত্র একবার
দেখ গিয়া নেত্র ভরি ! দেখিলে হইবে দ্রব
প্রেমহীন হৃদয় তোমার !
এ কুরুক্ষেত্রেও ঋষি ! রথী সেই নরদেহ,
রথে বসি ভদ্রা ধনঞ্জয়,
বর্ষিতেছে নিরন্তর কৃষ্ণ-প্রেমামৃত শর,
প্রেমে মত্ত দুইটি হৃদয় !
এ গাণ্ডীব কৃষ্ণ নাম, দেবদত্ত কৃষ্ণ নাম,
তূণ কৃষ্ণ-প্রেমামৃতে ভরা ;
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী তুচ্ছ, প্রেম-রণ-রঙ্গে
দেখ গিয়া মাতিয়াছে ধরা !

দুর্ব্বাসা। ইন্দ্রজাল ! ইন্দ্রজাল ! মুগ্ধ ইন্দ্রজালে ঘোর !
আর্য্য জাতি ব্যাপিয়া ভারত !
জরৎকারু যোগবলে ছিন্ন হবে ইন্দ্রজাল,
ক্ষুদ্র ঊর্ণনাভ জাল মত !

কিন্তু সেই পাপ নাম সরল অনার্য্য ভূমে
কেমনে পশিল বল হায় ?

বাসুকি। কৃষ্ণনাম পাপ নাম ! পুণ্য নাম তবে আর
আছে ঋষি কোথায় ধরায় ?
প্রেমে প্লাবি বৃন্দাবন, ভাসাইল ব্রজভূমি
শৈশবে কৈশোরে যেই নাম,
যৌবনে বিজয় মন্ত্র কুরুক্ষেত্রে যেই নাম,
যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিরস্ত্র নিষ্কাম।
ভারতের শান্তি-মন্ত্র, ভারতের রাজ্য-মন্ত্র
মুক্তি-মন্ত্র প্রৌঢ়ে ভারতের,
যেই সুপবিত্র নাম, সেই নাম পাপ নাম !
পুণ্য নাম তুমি পাপিষ্ঠের !
কেমনে সে নাম ঋষি ! পশিল অনার্য্য ভূমে ?—
কারু ! কারু ! শৈলজা আমার
প্রচারিয়া সেই নাম, পতিত অনার্য্য ভূমি
পুণ্যবতী করিছে উদ্ধার।

দুর্ব্বাসা। শৈলজা ! শৈলজা ! কে সে ? একটি রমণী ক্ষুদ্র
হইয়া কণ্টক তব পথে
রহিল জীবিত নাগ। প্রচারিতে সেই নাম
এ প্রত্যয় করি কোন মতে ?
"নরাধম ! দুরাচার ! নৃশংস মানব-পশু !"
—দাঁড়াইল গর্জ্জি নাগরাজ—
"এ মুহূর্ত্তে ভাঙ্গি গিরি পড়িল না শিরে তোর,
পড়িল না এ মুহূর্ত্তে বাজ।
পশুবৎ অত্যাচার করিতে রমণী প্রতি
আর্য্য ঋষিদের ধর্ম্ম জানি।

নারীহত্যা ধর্ম্ম তোর ; সরল অনার্য্যদের
মহাপাপ ওরে নর-গ্লানি !
অনার্য্যের দেবী নারী ; ধর্ম্ম রমণীর পূজা ;
কেশ মাত্র যেই নরাধম
পরশিবে রমণীর, ছুঁইবে তাহার ছায়া,
অনার্য্যের বধ্য সেই জন।
কে শৈলজা ? হায়, ঋষি ! শৈলজা ভগিনী মম,
প্রাণের পুতুল বাসুকির,"—
ক্রোধে রক্ত দুনয়নে বহিল যুগল ধারা
বাড়ব কুণ্ডের যেন নীর।
"হায় ! নিদারুণ বিধি, করি পিতৃমাতৃহীন
অকালে আমরা তিন জন,
অর্পিল আমার অঙ্কে দুই ভগ্নী, শিশু বৃক্ষে
দুই শিশু লতার মতন।
কারু ভগ্নী সহোদরা, শৈলজা পিতৃব্য-কন্যা,
আমি প্রাণ, তারা দুটি কায়া ;
হায় ! ঋষি প্রাণ দিয়া পালিয়াছি দুই কায়া,
প্রাণের অভিন্ন দুই ছায়া।
কিন্তু কি যে দুরাশায় দিনু ঝাঁপ, হায় ! আমি !
সেই মহা দুরাশা-অনলে
পোড়াইনু ভগ্নী দুটি ! সেই অনুতাপে ঋষি
কি যে অগ্নি এ হৃদয়ে জ্বলে।"—
দুর্ব্বাসা উচ্ছ্বাসে উঠিয়া কারু, ধরি বাসুকির গলা,
কহে—"দাদা ! দাদা ! পিতৃ সম !
হইও না আত্মহারা ! তোমার ভগিনী দুটি—
তাহাদের ভাগ্য নিরুপম।

তোমার এই মহাব্রতে নাহি দিত ঝাঁপ যদি
হইত কি ভগ্নী যোগ্যা তব ?
তাহাদের ততোধিক আছে কি জগতে সুখ ?"—
প্রেমোচ্ছ্বাসে উভয় নীরব।
বাসুকি। কারু ! কারু ! প্রাণাধিকে ! তুই এই প্রেমময়ী !
পুণ্যময়ী, পবিত্রতাময়ী !
কারু রে ! শৈলজা আর !—আমি তোরা দুজনের
ভ্রাতার কদাচ যোগ্য নহি।
ভেবেছিনু যে শৈলজা, আমি পাপিষ্ঠের ভয়ে,
বনলতা শুকায়েছে বনে ;
আজি সে শৈলজা দেবী, সে শৈলজা সন্ন্যাসিনী,
প্রেমধারা বহে দুনয়নে !
সে ধারায় বনভূমি হইতেছে পুণ্যভূমি,
হইতেছে অনার্য্য-হৃদয় ;
পশুতুল্য সে হৃদয় যাইতেছে প্রেমে গলি,
প্রেমে গলিতেছে শিলাচয়।
কহে শৈল কৃষ্ণ-কথা, গায় শৈল কৃষ্ণনাম,
কহে শৈল—'কহ কৃষ্ণ ! হরি !'
"হরে ! কৃষ্ণ ! হরে। কৃষ্ণ !" কহিয়া অনার্য্যগণ
যাইছে ভূতলে গড়াগড়ি।
গায় বৃদ্ধ কৃষ্ণনাম, গায় যুবা কৃষ্ণনাম,
কৃষ্ণনাম যুবতীর মুখে,
গায় কৃষ্ণনাম শিশু, নাচিয়া মায়ের কোলে,
লুকাইয়া মুখ মা'র বুকে !
বনের পাখীও যেন গাইতেছে কৃষ্ণনাম,
কৃষ্ণনামে নাচে মৃগ, শিখী,

বহিছে বন-নির্ঝর, মর্ম্মরিছে তরুগণ
কৃষ্ণনাম অঙ্গে যেন লিখি।
বনপুত্র পুত্রীগণ সাজিয়া গৈরিক বাসে,
কৃষ্ণ অঙ্গে লিখি কৃষ্ণনাম,
নাচিতেছে বাহু তুলি বেড়ি মম শৈলজায়,
অশ্রুজলে ভাসি অবিরাম।
ত্যজিয়া পতির শয্যা, ত্যজিয়া কোলের শিশু,
ছুটি পত্নী, ভগিনী, জননী,
পড়িয়া শৈলের পায়, কহে—"দে মা! কৃষ্ণনাম!
একবার দেখা নীলমণি!"
সাজি বনশিশুগণ শিশু কৃষ্ণ, গোপ শিশু,
শিরে চূড়া, অঙ্গে পীত ধরা,
বাম করে ক্ষুদ্র বেণু, পাচনি দক্ষিণ করে,
ফুল-অঙ্গ বনফুলে ভরা;
সাজি গোপী বনবালা—চারু বনফুল মালা—
বনফুল অঙ্গে চারুশীলা,
জলে, স্থলে, গিরি-শৃঙ্গে, গৃহে গৃহে, বনে বনে,
কি মধুর করে ব্রজলীলা!
কে বলে অনার্য্য দুঃখী, অনার্য্যের নাহি রাজ্য?
হিংস্র পশু অনার্য্য বর্ব্বর?
আজি কি আনন্দ-ভূমি হইয়াছে বনভূমি!
অনার্য্যের কি রাজ্য সুন্দর!
অনার্য্যের প্রেম রাজ্য, আমার শৈলজা রাণী,
রাজকর প্রেম-অশ্রু জল;
প্রেম-অশ্রুজলে রাণী শাসিতেছে বনভূমি,
নাহি হিংসা, নাহি অমঙ্গল।

রাজদণ্ডে গুরুতর হয় নাই প্রশমিত
যে অনার্য্য নৃশংস হৃদয়,
আজি সেই শিলা-বক্ষ, হইয়া দ্রবিত প্রেমে,
শীতল নির্ম্মল সুধাময়।
করিব সে দেবী হত্যা।—লুকাইয়া অন্তরালে
সেই দেবী দেখিয়া নয়নে,
শুনিয়া সে কৃষ্ণ নাম, দেখিয়া সে ব্রজলীলা,
মরিয়াছি আপনি মরমে।
এই দেবীকেই আমি করেছিনু নিয়োজিত
কিবা ঘোরতর মহাপাপে!
করি কণ্ঠ নিষ্পীড়িত চেয়েছি ত্যজিতে প্রাণ
সেই ঘোরতর পরিতাপে—
বাসুকি আপন কণ্ঠ পীড়িতেছে ব্যাঘ্রবৎ
আপনার লৌহময় করে,
কারু বিজলীর বেগে সরাইল কর কাঁদি'
"দাদা! দাদা" বলি উচ্চৈঃস্বরে।

বাসুকি। চাহিয়াছি কতবার পড়ি গিয়া পদতলে
আমার পালিতা শৈলজার,
মাগি ভিক্ষা ক্ষমা তার, মাগি কৃষ্ণনাম আর,
দ্রব করি পাষাণ আমার।
হায়! সেই পাপ স্মৃতি করিয়াছে শিলাময়
এই দেহ পাপের আধার,
জ্বালিয়াছে কি অনল হায়! চারিদিকে মম,
এ পদ সরেনি আমার।

দুর্ব্বাসা। কেবল সে পাপ নাম, কেবল সে নাম-গীত,
কেবল সে পাপ কথা আর,
যাহার তাহার মুখে, কত আর সহা যায়!
জ্বলি বুক হইল অঙ্গার!

আন নাই সৈন্য তবে!

বাসুকি। কোথায় পাইব সৈন্য

অনার্য্য ভাঙ্গিয়া নাগ-ভূমি

ছুটেছে প্রভাস মুখে, হরিনাম, কৃষ্ণনাম

বিনা আর কিছু নাহি শুনি।

দুর্ব্বাসা। নাহি দুঃখ নাগপতি! আমি ঋষি জরৎকারু,

যোগবলে ক্ষম দুর্নিবার

জ্বালাইয়া গৃহ-দ্বন্দ্ব, দেখেছ ক্ষত্রিয় কুল

কুরুক্ষেত্রে করিতে সংহার।

নাহি দুঃখ, যদুকুল যোগবলে সেই রূপে

গৃহ-দ্বন্দ্বে, করিব সংহার;

ভাসে বন কৃষ্ণ-প্রেমে,—ভাসিতেছে কৃষ্ণ পুরী

সুরা-প্রেমে মহাপারাবার।

বাসুকি। সুরা-প্রেম কৃষ্ণ-পুরে!

দুর্ব্বাসা। কৃষ্ণ-পুরে, নাগরাজ।

কৃষ্ণ-প্রেম,—ইন্দ্রিয় সংযম,—

কেবল পরের তরে; নিজ পুরে সুরা-প্রেম;—

এই তব নর-নারায়ণ।

আমার আদেশে কারু পাঠাইয়া নাগবালা

রূপসী যুবতী দ্বারকায়,

বিলাইল কৃষ্ণ-প্রেম—শ্রীবিষ্ণু! সুরার প্রেম,—

দ্বারাবতী মগ্নবতী প্রায়।

গোপনে যাইয়া কারু করিয়াছে নিরীক্ষণ,

সুরাসক্তি, রূপাসক্তি আর;

অনাসক্ত ধর্ম্ম-পুরী করিতেছে টল টল,

টল টল যুগ অবতার।

বাসুকি। নরাধম ! নরপশু। অরক্ষিতা অবলায়
কেমনে পাঠালি দ্বারকায়
পুরাইতে পাপতৃষা ? অনার্য্যের নারী দেবী ;
পণ্য নাহি জানে অবলায়।
কারু ! কারু ! এই পাপে কেমনে হইলি রত
নাগ-রক্ত করি কলুষিত—
কাঁপিতেছে থর থর মহাক্রোধে নাগরাজ
সাপটিয়া অসি কোষস্থিত।
দেখিলা ভগ্নীর মুখ কি যে নিরাশার ছবি !
কি যে স্মৃতি উঠিল ভাসিয়া !
নাগপুরে বাপীতীরে একদিন নিরাশায়
ছিল কারু এরূপে বসিয়া।
সে স্মৃতি বিজলী বেগে আলোকিল দূরাতীত
নাগরাজ বুঝিলা তখন
কেন সেই যদুপুরে গোপনে যাইতে কারু,
এই পাপে হ'ল নিমগন।
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি, জালবদ্ধ সিংহ মত
দাঁড়াইলা কক্ষে অধোমুখে ;
নিবিল এ ক্রোধানল ; নির্ব্বাপিত প্রতিহিংসা।
জ্বলিয়া উঠিল পুনঃ বুকে।
দুর্ব্বাসা। নাগরাজ ভ্রান্ত তুমি। জানি বিন্ধ্যাচল সম
অনার্য্যার চরিত্র অটল।
কার সাধ্য অনার্য্যার কলুষিবে সে চরিত্র,
কলুষিবে জাহ্নবীর জল !
দেখি অগ্নি-শিখা জ্ঞান পতঙ্গ উড়িয়া পড়ি
হয় আত্মঘাতী অগণন।

অপবিত্র অগ্নি-শিখা হয় কি ? যাদবকুল
আত্মঘাতী হইবে তেমন।
অনার্য্যার তীব্র সুরা, অনার্য্যার তীব্র রূপ,—
কামানলে মত্ত যদুকুল।
কামানলে ঈর্ষানল জ্বালায়েছি যেইরূপে,
যদুকুল হইবে নির্ম্মূল।
পারিলে না আনিতে কি তোমার আপন সৈন্য ?

বাসুকি। নাগ-সৈন্য হইয়া সজ্জিত,
প্রভাস যাত্রীর মত আসি' কালি সন্ধ্যাকালে
মহাবনে হবে একত্রিত।

দুর্ব্বাসা। । তোমার করে ছিল যেই কার্য্য ভার ?

কারু। হইয়াছে, হইবে সাধিত '

দুর্ব্বাসা। উত্তম ! পড়িবে পুনঃ ঊর্ণনাভ নিজ জালে
হবে কালি সবংশে নিহত।

বাসুকি। না, না, ঋষি ! নাগ-সৈন্য করিবে না অস্ত্রাঘাত
কৃষ্ণার্জ্জুন প্রতি সুভদ্রার ;
নখাগ্রও তাহাদের ছুঁইবে না।

দুর্ব্বাসা। কেন নাগ !

বাসুকি। এই তিন দেবতা আমার !
বিস্মিত নয়নে কারু, দুর্ব্বাসা বিস্মিত নেত্রে,
চাহিলেন বাসুকির পানে।
ঊর্দ্ধনেত্রে শৈল কক্ষে, শৈল প্রতিমূর্ত্তি মত,
নাগরাজ দাঁড়াইয়া ধ্যানে।

বাসুকি। শুন ঋষি জরৎকারু, শুন অভাগিনি কারু,
যেই স্বর্গ দেখেছি নয়নে

আসিতে আসিতে পথে, অদূরে সিন্ধুর তীরে,
দ্বৈপায়ন মহর্ষি আশ্রমে।
কি আশ্রম পুণ্যময়, শান্তিময়, প্রীতিময়,
আনন্দ-আলয় সুশীতল।
আমি হিংস্র বনপশু কেমনে কহিব তাহা,—
সে ত নহে এই ধরাতল।
সুনীল আকাশ-পটে, শ্যামল ধরার বক্ষে,
ধ্যান-মগ্ন শান্ত শৃঙ্গচয়,
শোভিছে চিত্রিতমত, নীল মণিময় পটে,
শ্যাম অঙ্গ মরকতময়।

কি শান্ত কানন-শোভা! কাননে কি মনোলোভা
পুণ্যনীরা সরসী, নির্ঝর!
জলচর, স্থলচর, হিংসক, হিংসিত, পশু
বেড়াইছে যেন সহোদর।
আশ্রমের পুণ্য লতা, আশ্রমের পুণ্য ফুল,—
ঋষিপুত্রকন্যা—নিরন্তর
খেলে পশু পক্ষী সহ, আলিঙ্গি শার্দ্দুল, সিংহ,
পশু পক্ষী যেন সহোদর।
অসংখ্য কুটীর দ্বারে, কাননছায়ায় বসি,
যেন শান্ত পবিত্র নির্ঝর
কহিতেছে শাস্ত্রকথা আর্য্য ও অনার্য্য ঋষি,
যেন প্রেমময় সহোদর।
যোগশৃঙ্গ-বক্ষে শোভে রজতের উত্তরীয়
সরস্বতী-স্রোত মনোহর,
দেখিলাম সেই শৃঙ্গে, সেই সরস্বতী-তীরে,
কি পবিত্র কুটীর সুন্দর!

যে পার্থের ভুজবলে, যে ভদ্রার পুণ্যবলে,
যে কৃষ্ণের দেবত্বে স্থাপিত
ক্ষাত্রিয়ের ধর্ম্মরাজ্য সেই তিন দেব মূর্ত্তি
এ ক্ষুদ্র কুটীরে বিরাজিত।
সেই রাজ্য-চন্দ্রালোক পশিল নিবিড় বনে,
—আমরা পতিত আর নহি—
কারু রে! যাহার প্রেমে, সেই শৈল তাঁহাদের
চরণ-সেবিকা প্রেমময়ী।
কুটীরের তিন কক্ষ,—সম্মুখের কক্ষে চিত্র,
সুভদ্রার তুলিতে অঙ্কিত,
শোভিতেছে কৃষ্ণলীলা; পশ্চাতের কক্ষ এক
শৈলজার চিত্রে সুশোভিত,—
পাতালে অনাথা বালা, রৈবতকে ভৃত্য বেশ,
বনে বনমাতা কুমারের,
প্রেমময়ী সন্ন্যাসিনী, বনভূমি উদ্ধারিণী,
অধিষ্ঠাত্রী দেবী কাননের।
শোভে অন্য কক্ষে চিত্র অভিমন্যু উত্তরার,—
এই কক্ষ শোকপারাবার:
পাষাণ যাইবে গলি' দেখিলে এ চিত্রাবলী,
মানবের কথা কি আবার!
সেই দুই শেষ চিত্র—সেই চক্রব্যূহ-শায়ী
মাতৃ-অঙ্কে বীরেন্দ্র কুমার!
আর সেই চিতা-চিত্র!—না, না, পারিব না আর,
কারু! কে কাটিছে অ মার।
সরল শিশুর মত কাঁদিতে লাগিলা শোকে
নাগরাজ করি হাহাকার;

কাঁদিল উচ্ছ্বাসে কারু ; কেবল রহিল শুষ্ক
কোটরস্থ নেত্র দুর্বাসার।
বাসুকি সপত্নী অনার্য্য আর্য্য ঋষিগণ মিলি যবে,
মিলি যবে ঋষি-শিশুগণ,
গায় সবে কৃষ্ণ-নাম সহ শৈল ভদ্রার্জ্জুন,
প্রেমের উচ্ছ্বাসে হৃতমন ;
হৃতমন প্রেমোচ্ছ্বাসে দাঁড়াইয়া মধ্যস্থলে
সেই কৃষ্ণমূর্ত্তি মহিমার।
কারু রে, সে প্রেমোচ্ছ্বাসে পাষাণ যায় রে গলি,
মানবের কথা কি আবার !
এক দিন সে সময় পশি তস্করের মত
সে নির্ম্মল পবিত্র কুটীরে,
প্রণত হইয়া ভূমে কক্ষে কক্ষে চিত্রাবলী
নমিয়াছি ভাসি অশ্রুনীরে।
অলক্ষিতে চতুষ্টয়—কৃষ্ণার্জ্জুন ভদ্রাশৈল—
নমিয়াছি দিনে শত বার ;
কি অদ্ভুত! কি অদ্ভুত! রেখাটিও পারে নাই
কাল তাহে করিতে সঞ্চার!
কি রহস্য!—এক দিন জিজ্ঞাসিনু ঋষি একে ;
তপস্বী কহিল ধীরে হাসি—
"যুবক! জান না তুমি পুষ্পটিও ত্রিদিবের
কখন হয় না শুষ্ক বাসি।
কৃষ্ণ নর-নারায়ণ ; নর-দেব, নারী-দেবী,—
তাঁহার বিভূতি তিন জন।
কালের অতীত তাঁরা, যায় যুবা! কাল বহি
প্রণমিয়া তাঁদের চরণ।"

যুবক ! যুবক ! আমি যুবক ! যুবতী তুই !
কাক ! এ ত মিথ্যা কথা নয় ।
নহে দেব, নহে দেবী, আমরা দুরাশা-মোহে
দেব-দ্বন্দ্বী মাত্র দুরাশয় !
কিন্তু আর হইব না। আর্য্য অনার্য্যের এই
সম্মিলিত মহারাজ্যে স্থান
মাগি' নিব ভ্রাতা ভগ্নী ; পতিতপাবন কৃষ্ণ !—
আনন্দে গাহিব কৃষ্ণনাম।
ভক্তির নির্ঝর শান্ত নাগরাজ দুনয়নে
বহিতেছে ধারা নিরন্তর ;
ভগিনীর নেত্র-সিক্ত ভকতির সে উচ্ছ্বাসে ;
শুষ্কনেত্র মাত্র ঋষিবর ।

দুর্ব্বাসা। নাগেন্দ্র ! কি ভ্রান্তি তব ! বুঝিয়াও বুঝিলে না
কত বার চক্র এ চক্রীর !
কুরুক্ষেত্রে নিঃক্ষত্রিয় হয়েছে ভারত-ভূমি ;
অনার্য্য তুলিয়া যদি শির
হয় এবে অগ্রসর লইতে ভারত রাজ্য,
কি করিবে একা যদুকুল ?
শিমুল পুষ্পের মত কোথায় যাইবে উড়ি !
ক্ষত্র জাতি হইবে নির্ম্মূল।
তাই এই ধর্ম্মরাজ্য, তাই এই প্রেমরাজ্য,
আর্য্য অনার্য্যের সম্মিলিত ;
গেছে ষট্‌ত্রিংশ বর্ষ, যায় আর কিছুকাল,
ক্ষত্র বংশ হইবে বর্দ্ধিত।
তখন খাণ্ডব শত জ্বলিবে অনার্য্য-ভূমে,
হবে শত ইন্দ্রপ্রস্থ আর ;

তখন এ ধর্ম্মরাজ্যে অনার্য্য ও ব্রাহ্মণের
চিহ্ন মাত্র রহিবে না আর।
অকস্মাৎ কি গর্জ্জন। ভূমিকম্প কি ভীষণ!—
নাগরাজ পড়িলা শিলায়।
মস্তক হইল ক্ষত, ছুটিল শোণিতধারা,
চাপি করে, থর থর কায়
কাঁপিতেছে ভ্রাতা ভগ্নী, ভয়ে কণ্ঠাগত প্রাণ;
প্রসারিয়া ক্ষুদ্র চনয়ন
কহিলা দুর্ব্বাসা—"নাগ! এ কক্ষে করিলে যেই
মহাসন্ধি, করিতে লঙ্ঘন
এখন উদ্যত তুমি! ক্রুদ্ধ তাহে ভূতনাথ,—
সেই ক্রোধে এই প্রকম্পন।
দেখিবে প্রমাণ আরো? আইস"—ইঙ্গিতে ঋষি
ডাকিলে, ভয়েতে জ্ঞানহৃত
চলিলা ভগিনী ভ্রাতা ঋষির পশ্চাতে, দুই
ক্রীড়নক সূত্রে আকর্ষিত।
পর্ব্বতশেখরে উঠি দেখিলা বিশাল হ্রদ;
হ্রদে ওকি দৃশ্য বিভীষণ!
গর্জ্জিছে পর্ব্বত গর্ভে কি ভীষণ অগ্নিসিন্ধু
ধূমরাশি করি উদ্গিরণ!
অগ্নি-সিন্ধু কি ভীষণ! কি গর্জ্জন! কি ঘূর্ণন!
অগ্নিশিখা শত সংখ্যাতীত,—
ভীমা অগ্নি-ভুজঙ্গিনী—ছুটিতেছে, গর্জ্জিতেছে,
অগ্নি-সিন্ধু করিয়া মথিত।
শতধা বিদীর্ণ করি যেন এই শৈল-গিরি
রুদ্ধ ক্রুদ্ধ অগ্নি-পারাবার

চাহিছে ছুটিতে বেগে নাশিতে আকাশতল,
ধরাতল করিয়া সংহার।
এই অগ্নি-হ্রদতীরে' নিশীথ আকাশ-তলে,
দুর্ব্বাসা প্রসারি ক্ষুদ্র কর
কহে—"দেখ নাগরাজ! জরৎকারু যোগানল!
ওই দেখ অনার্য্য-ঈশ্বর!"
হ্রদের অপর তীরে ছদ্ম-ভূতনাথ ধীরে
মহাক্রোধে করিয়া গর্জ্জন
কহিলেন—"নাগাধম! লঙ্ঘিবি প্রতিজ্ঞা তোর?
মম আজ্ঞা করিবি লঙ্ঘন?
পাণ্ডব কৌরব বংশ ভস্মীভূত কুরুক্ষেত্রে,
যদুবংশ মাত্র আছে আর,
প্রভাস উৎসব ক্ষেত্রে কালি গুপ্ত অস্ত্রে তুই
যদুকুল করিবি সংহার
জরৎকারু যোগবলে! করিবি অনার্য্য রাজ্য
আসমুদ্র অচল স্থাপিত!"
অগ্নির গর্জ্জন সহ মিশিল সে ভীম রব,
ভীম মূর্ত্তি হ'ল অন্তর্হিত।
ঘন ঘন কাঁপে ধরা; শৈল শৃঙ্গ কাঁপে ঘন,
সিন্ধু-গর্ভে যান-যষ্টি মত;
বাসুকি বিহ্বল ভয়ে, ভয়েতে বিহ্বলা কারু,
পড়িলা শিখরে মূর্চ্ছাগত।

পঞ্চম সর্গ।

—:*:—

মহাপান।

উদ্বেল আনন্দে, লীলায় উচ্ছল,
প্রভাসের সিন্ধু উঠিল ভাসি
মধুর বাসন্তী-পূর্ণিমা উষায়;—
হৃদয়ে অনন্ত মাধুরী রাশি।
উষার আলোকে উঠিল ভাসিয়া
সুদর্শন চূড়া, কৃষ্ণের শিবির;
"হরি বোল হরি! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! হরি!"—
গাইয়া আনন্দে অধীর
কণ্ঠ লক্ষ লক্ষ; লক্ষ লক্ষ যাত্রী
পড়িল সৈকতে প্রণমি শিবির;
"হরে! কৃষ্ণ! হরে!"—গায় প্রকম্পিত
করি মহাসিন্ধু প্রভাসের তীর।
গাইয়া, নাচিয়া, করতালি দিয়া,
আর্য্য ও অনার্য্য শিশু, নারী, নর,
ছুটে সিন্ধু পানে, ছুটে যেই রূপে
সৈকত-বালুকা বহে যবে ঝড়।
"হরে! কৃষ্ণ! হরে!"—গাইয়া গাইয়া
অবগাহে যাত্রী—শিশু, নারী, নর;
বিচিত্র বরণ, বিচিত্র বসন,
প্রভাসের আজি কি শোভা সুন্দর!

"হরে ! কৃষ্ণ ! হরে !"—বলি দেয় ডুব,
"হরে ! কৃষ্ণ ! হরে !"—ভাসিয়া কহে।
"হরে ! কৃষ্ণ ! হরে !"—গায় পারাবার,
হরে ! কৃষ্ণ !"—সিন্ধু অনিলে বহে।
করি সিন্ধু স্নান, অঙ্গে লিখি নাম,
বেড়িল শিবির যাত্রী অগণন,
আকুল হৃদয় করিতে দর্শন
নরচক্ষে সেই নর-নারায়ণ।
ধীরে ধীরে হরি হইলা উদয়
হইল উদয় দুই দিনকর।
এক সূর্য্যে দীপ্ত সিন্ধু প্রভাসের
অন্য সূর্য্যে মহাকালের সাগর।
চূড়াবদ্ধ কেশ,—মোহন মুকুট !
নীলমণি অংসে, উরসে আর,
শোভে গৈরিকের উত্তরীয় চারু ;
অঙ্গে অঙ্গে কিবা লীলা মহিমার।
করুণা মহিমা ললাটে নয়নে,
করুণা মহিমা উরস ভরা,
সুধাকর-সুধা করুণা-মহিমা
বহিতেছে যেন প্লাবিয়া ধরা।
কি সুদীর্ঘ দেহ, কণ্ঠ সুবঙ্কিম !
যাত্রী-সিন্ধুবক্ষে উঠিল ভাসি।
শ্রীমুখমণ্ডল, যেন সিন্ধু বক্ষে
আকণ্ঠ ভাস্কর ভাসিল হাসি
"হরে ! কৃষ্ণ ! হরে !"—যাত্রী লক্ষ লক্ষ
গাই এক কণ্ঠে প্লাবিয়া গগন,

পড়িল ভূতলে ভক্তিতে অধীর
সাষ্টাঙ্গে প্রণত প্রণমি চরণ।
অনন্ত তরঙ্গ ভুজে প্রণমিয়া
হইল পয়োধি প্রণত স্থির ;
এই মহাক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া একা
আপাদ ভাস্কর বক্ষে জলধির।
অনিমিষ নীল নীলাব্জ নয়ন,
আকর্ণ বিশ্রান্ত, প্রেমে ছল ছল,
চাহি বসন্তের নীলাকাশ পানে
নীলমণি মূর্ত্তি স্থির অবিচল।
তুলি লক্ষ শির প্রভাসের তীর,
লক্ষ শির তুলি প্রভাস-সাগর,
সেই দেব-মূর্ত্তি চাহি অনিমিষ,
চাহি অনিমিষ বিশ্ব চরাচর।
দেখে অনিমিষ ব্রজবাসিগণ—
ব্রজের গোপাল যশোদা-দুলাল,
শিরে শিখি চূড়া, অঙ্গে পীত ধড়া,
করেতে পাঁচনি, কণ্ঠে বনমালা!
ব্রজের কিশোরী দেখে অনিমিষ
ব্রজের কিশোর ত্রিভঙ্গ শ্যাম,—
কি মধুর হাসি, কি মধুর বাঁশী,
করিছে কি প্রেমে উদাস প্রাণ।
দেখে ক্ষত্রিয়েরা নেত্রে অনিমিষ
অর্জ্জুন-সারথি পাঞ্চজন্যধর,
রথ-চক্র মত মহা রণ-চক্র
করিছে চালন কি বিস্ময়কর!

অনিমিষ নেত্রে দেখে যোগিগণ
মহাযোগি-মূর্ত্তি যোগে নিমগন ;
দেখে অনার্য্যেরা নেত্রে অনিমিষ
দয়াময় হরি, পতিতপাবন !
দেখে যাদবেরা নেত্রে অনিমিষ,
দেখে কামাসক্ত সুরাসক্তগণ,
মহাকাল মূর্ত্তি দাঁড়ায়ে সম্মুখে
নব কুরুক্ষেত্রে ভীম দরশন।
সুভদ্রা শৈলজা সঙ্গে দুই জন,
চলিলেন হরি প্রসন্ন বদন
শত নর নারী দেয় গড়াগড়ি
পড়ি পাদপদ্মে, চলে না চরণ।
ভক্তি-অশ্রু-জলে প্রক্ষালি চরণ
ভিজিছে সৈকত পবিত্র নীরে,
গায় "কৃষ্ণ ! হরি !" নাচে ভক্তগণ,
মাখি সেই ধূলা ললাটে শিরে।
যেতেছেন হরি পবিত্র করিয়া
যেই ধূলারাশি, তাহাতে পড়ি
"হরি ! কৃষ্ণ ! হরি !" বলি নর নারী,
আর্য্য ও অনার্য্য, যায় গড়াগড়ি।
যেই খানে হরি, উঠিছে সেখানে—
"হরি ! কৃষ্ণ ! হরি ! পতিতপাবন !"
"জয় বনমাতা —সুভদ্রা জননী !"—
উঠে পুণ্যস্বর বিদারি গগন।
তোলে প্রতিধ্বনি যোজনে যোজনে
ব্যাপিয়া প্রভাস মত্ত যাত্রিগণ—

"জয় বনমাতা!—সুভদ্রা জননী!!
হরে! কৃষ্ণ! হরে! পতিতপাবন।"
কোথা বৃদ্ধা নারী কণ্ঠ জড়াইয়া
কহে "বুকে আয়! আয় নীলমণি!"
মাতৃপ্রেমে বৃদ্ধা উচ্ছ্বাসে কাঁদিয়া,
কহে—"আমি তোর যশোদা জননী।
বেঁধেছিনু তোরে, মেরেছিনু তোরে,
তাই ওরে নিরদয় ননীচোর
আসিলি ছাঁড়িয়া? আয় বুকে আয়!"—
কহে যশোদার ভাবেতে বিভোর।
কহে বৃদ্ধ কেহ নন্দ-প্রেমে ভোর
গলা জড়াইয়া—"গোপাল আমার!
কত কাল হায়! অশ্রু-স্রোত মম
যমুনার স্রোতে বহে অনিবার!"
শ্রীদাম সুদাম ভাবে ভোর কেহ
কহে ডাক—"ওরে ভাই রে কানাই!
বেলা হ'ল ভাই, চল গোষ্ঠে যাই!
তুই বিনা ভাই! যায় না গাই!"
গোপী-ভাবে ভোর যুবতী সকল
ছাড়ি পতি পুত্র, অবশ প্রাণ,
নাহি লজ্জা ভয় দিয়া আলিঙ্গন,
নাচে হাসে রাসে, গায় প্রেম-গান।
কহে—"পতি পুত্র নাহি পড়ে মনে,
তুমি প্রাণপতি তুমি প্রাণেশ্বর।
কত কাল হায়! জলিনু বিরহে,
জুড়াও এ প্রেম-পিপাসা-কাতর!

ওইত কালিন্দী, জিজ্ঞাস হে শ্যাম !
যমুনা-পুলিনে জিজ্ঞাস আর,
কত অশ্রুধারা ঝরিয়াছে হায় !
আমরা বিরহ-বিধুরা বালার :
দেও আলিঙ্গন জুড়াও এ প্রাণ !
দেও পাদপদ্ম হৃদয়োপর !"
ধরে পাদপদ্ম অনাবৃত বক্ষে,
শোভে পুষ্পপাত্রে ফুল্ল ইন্দীবর ।
কেহ বা বিবশা পড়িয়া চরণে,
অঙ্গে অঙ্গে কেহ, কেহ বক্ষোপর,
ভক্তির চরম প্রেমে আত্মহারা ;
আপনি কেশব প্রেমেতে বিভোর ।
বহে অশ্রুধারা রমণী-নয়নে,
বহে অশ্রুধারা নয়নে হরির,
"হরে ! কৃষ্ণ ! হরে !"—গায় নর নারী
নাচে আত্মহারা বহে নেত্রে নীর ।
দাঁড়াইলে কৃষ্ণ সলিল সমীপে,
ব্রজকিশোরীর ভাবে নারীগণ
দলে দলে দলে পড়ে সিন্ধুজলে,
কোথায় ভূষণ, কোথায় বসন !
আকক্ষ আবক্ষ সলিলে ডুবিয়া,
কহে যোড়করে—"ত্রিভঙ্গ শ্যাম !
কদম্বের ডালে বাজাও বাঁশরী,
ব্রজকিশোরীর জুড়াও প্রাণ !
লও কুল মান, যাহা আছে আর,
লও প্রেম, লও চরণে প্রাণ !"

ভাসে অনুরাগে অধীরা অবলা,
সাগর-তরঙ্গে কুসুম রাশি,
"হরে! কৃষ্ণ! হরে!"—গায়ে তীরে নীরে
নর নারী প্রেম-তরঙ্গে ভাসি।
চরণে পড়িয়া, গড়াগড়ি দিয়া,
কেহ কহে—"পিতা আমি পুত্র তব।"
কেহ কহে—"প্রভু! তব দাস আমি
যাবত জীবন চরণে রব।"
কেহ পুষ্পমালা পরায় গলায়,
চাঁচর চূড়ায় পরায় কেহ,
করে পদে, অঙ্গে, দেয় পুষ্পমালা,
চন্দনে চর্চ্চিত করিয়া দেহ।
কেহ দেয় করে সুমোহন বাঁশী,
কেহ দেয় করে পাঁচনি বাড়ি,
কেহ করে তুলি দেয় চারু শিঙ্গা,
ব্রজলীলা-রঙ্গে মত্ত নর নারী।
কোথায় বাৎসল্য তরঙ্গে ভাসিয়া
গায় নর নারী শৈশব লীলা,
গায় গোষ্ঠলীলা কোথায় আবার
সখ্য প্রেমোচ্ছ্বাসে দ্রবিয়া শিলা।
গায় রাসলীলা হইয়া তন্ময়
কান্ত ও মধুর প্রেমে বিহ্বল;
কোথায় বা গায় কুরুক্ষেত্র লীলা
শান্ত দাস্য প্রেমে নেত্র ছল ছল।
সকলেই দেখে আপন গলায়,
অঙ্কে, বক্ষে, কৃষ্ণ করিছে বিহার।

কারো পিতা, কারো পুত্র, কারো সখা,
কারো প্রাণপতি, প্রণয়ী কাহার।
এরূপে বাৎসল্য, শান্ত, দাস্য, সখ্য,
কান্ত ও মধুর প্রেমে ভাসমান
পবিত্র প্রভাস—নব বৃন্দাবন,
প্রেমে সিন্ধু আজ বহিছে উজান।
লক্ষ লক্ষ যাত্রী ব্যাপিয়া প্রভাস
প্রেমের সাগরে মত্ত ভাসমান,
করিতেছে পান অজস্র ধারায়,—
কিবা মহাসিন্ধু!—কি মহাপান!
মানব সিন্ধুর প্রেমের তরঙ্গে
ভাসিয়া ভাসিয়া করি দিবাতীত,
আসিলেন কৃষ্ণ ফিরিয়া শিবিরে,
জুড়ায়ে তাপিত, উদ্ধারি পতিত।
প্রেমের আবেশে আপনি অধীর
শিবিরের দ্বারে দাঁড়াইয়া হরি,
দেখিলা অনন্ত সিন্ধুর সৈকতে
মানব-সিন্ধুর অনন্ত লহরী।
অনন্ত যন্ত্রের অনন্ত সঙ্গীত
ছুটিছে মধুরে লহরে লহরে।
লহরে লহরে বক্ষে সঙ্গীতের
বহিছে ছুটিয়া—"হরে! কৃষ্ণ! হরে!"
নাহি তৃষ্ণা ক্ষুধা, নাহি অবসাদ,
আর্য্য কি অনার্য্য নাহি কিছু জ্ঞান,
গাইছে নাচিছে গলাগলি করি,
করিতেছে কৃষ্ণ-প্রেমামৃত পান।

যোগী সংখ্যাতীত বসি স্থানে স্থানে
ভক্তিপ্লুত কণ্ঠে করে গীতা গান,
কেহ বা যোগস্থ, সমাধিস্থ কেহ,
করে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান।
কুরুক্ষেত্র পূর্ব্বে অন্তর বিগ্রহে
যে বাণিজ্যে ক্ষেত্র ছিল মরুময়,
আজি সেই ক্ষেত্র মহারত্নাকর,
অনন্ত রত্নের অনন্ত আলয়।
আসিন্ধু অচল ব্যাপি মহাস্রোতে,
ঢালিয়াছে রত্ন সেই রত্নাকর
প্রভাসে অজস্র, বিপণমালায়
দিগন্ত সজ্জিত, কি শোভা সুন্দর!
বিহ্বল বিক্রেতা গায়ে কৃষ্ণনাম,
কৃষ্ণনাম ক্রেতা পাইছে বিহ্বল,
পণ্য কৃষ্ণনাম, মূল্য কৃষ্ণনাম,
কৃষ্ণ-প্রেম যেন বাণিজ্য সম্বল।
দেখিলেন হরি জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম,
তিন মহাস্রোতে করিয়া প্লাবিত
সমগ্র ভারত, আজি এ প্রভাসে
কৃষ্ণ-প্রেমার্ণবে হয়েছে মিলিত।
প্রণমি সাষ্টাঙ্গে আকুল উচ্ছ্বাসে
কহে শৈল দর দর দুনয়ন—
"দেখ নরনাথ! দেখ নারায়ণ!—
আর্য্য অনার্য্যের প্রেম সম্মিলন!
ত্রিযুগের হিংসা, কলহ, বিদ্বেষ,
তব প্রেম-স্রোতে গিয়াছে ভাসি।

দেখ ধর্ম্মরাজ্য !— প্রেম রাজ্য তব !
কি প্রেম !—কি শান্তি !—অমৃতরাশি !"
কহিলেন হরি প্রেমের উচ্ছ্বাসে
আকুল আনন্দে অধীর প্রাণ—
"এ যে প্রেম-রাজ্য ভদ্রা শৈলজার !
শৈল ! আজি মম পূর্ণ মনস্কাম।"
আকুল উচ্ছ্বাসে পড়িয়া চরণে
কহিলা উদ্ধব—"পূর্ণ মনস্কাম
উদ্ধবের আজি ! দেখিল এ লীলা,
বিদায় তাহারে দেও ভগবান !"
কহিলেন কৃষ্ণ—"উদ্ধব ! উদ্ধব !
এক মাত্র তুমি সখা দ্বারকায়।
সায়াহ্ন জীবনে একই সান্ত্বনা,
যাইও না তুমি ছাড়িয়া আমায়।
ব্রজের উচ্ছ্বাসে উদ্ধব ! আমার
আজি উচ্ছ্বসিত, উদ্বেলিত প্রাণ।
নাহি নন্দ পিতা, যশোদা জননী,
নাহি সখা মম শ্রীদাম সুদাম।
গোষ্ঠের সঙ্গিনী, বন-বিহারিণী
প্রেমের প্রতিমা কিশোরীগণ,
ভক্তিবিলাসিনী, নাহি মম আর
নাহি সে যমুনা, নাহি বৃন্দাবন।
ব্রজের সে খেলা সাঙ্গ বহু দিন,
সে প্রেম-স্বপন হইয়াছে শেষ।
সেই বনমালা গেছে শুকাইয়া,
বাজে না সে বাঁশী, নাহি সেই বেশ।

ছাড়ি-প্রেমময় বক্ষ যশোদার,
জনক নন্দের অঙ্ক প্রেমময়,
ছাড়ি প্রেমময় ব্রজের রাখাল,
ছাড়ি প্রেমময়ী কিশোরী-হৃদয়,
উদ্ধব! উদ্ধব! ছাড়িয়া আমার
প্রেমের প্রবাহ গাভী বৎসগণ,
ছাড়ি প্রেমময়ী যমুনা আমার,
প্রেম-পুষ্পময় ছাড়ি বৃন্দাবন,
কি মহা মরুতে দিয়াছিনু ঝাঁপ!
দুই ভুজ মম পার্থ দ্বৈপায়ন;
দুই ভুজ বলে জ্বালাইনু হায়!
কত কুরুক্ষেত্র খাণ্ডব ভীষণ!
সেই মরুভূমি, সেই বনভূমি,
আসিন্ধু হিমাদ্রি হইলে উদ্ধার,
অন্য দুই ভুজ লতা ভদ্রা শৈল
সৃজিয়াছে কিবা প্রেম পারাবার!
আজি চতুর্ভুজ মূরতি আমার
গদা পার্থ-বল' শঙ্খ গীতা আর,
সুভদ্রার বক্ষ শান্তি শতদল,
প্রেম মধুচক্র বক্ষ শৈলজার।
পূর্ণ আজি মম জীবনের ব্রত,
পূর্ণ দ্বাপরের নিয়তি কঠোর,
অধর্ম্মের কৃষ্ণপক্ষ ঘোরতর,
হইল নীরবে কুরুক্ষেত্রে ভোর।
আত্ম-বলিদান দিয়া অভিমন্যু
যেই শুক্লপক্ষ করিল সঞ্চার,

পবিত্র প্রভাসে হইল উদিত,
সুশীতল পূর্ণচন্দ্র পূর্ণিমার।
কি চন্দ্র শীতল! কি শান্তি জ্যোৎস্না!
কি ঘোর ঝটিকা অমাবস্যা পরে!
যেও না উদ্ধব ছাড়িয়া আমায়
এ মহা উচ্ছ্বাসে, নিষ্ঠুর অন্তরে!"
দেখিল উদ্ধব, দেখিল প্রভাস,
প্রভাস সিন্ধুর গর্ভে ভাসমান
কিবা পূর্ণচন্দ্র, মহাকাল গর্ভে
নব মহাধর্ম্ম যেন মূর্ত্তিমান।
দেখিল উদ্ধব, দেখিল প্রভাস,
আসিন্ধু অচল শান্তি জ্যোৎস্নার
ভাসিছে ভারত; ধর্ম্ম-শশধর
বর্ষিতেছে সুধা অনন্ত ধারায়!
দেখিল উদ্ধব, দেখিল প্রভাস
প্রভাস সাগর কত ক্ষুদ্রতর।
অভিন্ন আর্য্য ও অনার্য্য হৃদয়,
অনন্ত প্রেমের কি মহাসাগর!
কহিল উদ্ধব যোড়করে পুনঃ—
"কৃপাসিন্ধু! দাসে হইয়া নিদয়,
রাজনীতি মরুভূমিতে তাহার
একটি জীবন করিতেছ ক্ষয়!
দেখাইয়া তারে মূরতি কঠোর,
করেছ কঠোর হৃদয় তাহার
মহামরুভূমি! আজি সে মরুতে
একটি নির্ঝর হয়েছে সঞ্চার।

পান করি এই সুশীতল নীর
কি শান্তি জীবনে হয়েছে সঞ্চার,
পড়িয়াছে খসি নেত্র-আবরণ
কি স্বর্গ খুলেছে নয়নে আমার!
যাইব গোপাল! তব বৃন্দাবনে,
যমুনার তীরে যাইব তোমার,
ভ্রমি কুঞ্জে কুঞ্জে, যমুনা-পুলিনে,
শুনিব তোমার বাঁশীর ঝঙ্কার।
পিতা নন্দ তব, জননী যশোদা,
দেখিব তোমাব বিহর-বিধুর।
দেখিব শ্রীদাম দেখিব সুদাম,
সেই গোষ্ঠ-লীলা দেখিব মধুর।
যমুনা-পুলিনে বিরহ-বিধুরা
ব্রজের কিশোরী হারাইয়া শ্যাম,
দেখিয়া নয়নে, পড়িয়া চরণে,
চাহিব কাতরে তব প্রেম দান।
বিদায় এ দাসে দেও দয়াময়!
দিয়া পাদপদ্ম পাষাণ উদ্ধার।
কর এ দ্বাপরে!"—কাতরে কাঁদিয়া
পড়িল উদ্ধব চরণে আবার।
ব্রজের স্মৃতিতে কণ্ঠ উচ্ছ্বসিত
কহিলেন কৃষ্ণ করুণ-হৃদয়,—
"কে দেখিতে যায় বল না, উদ্ধব
উৎসবের অন্তে উৎসব আলয়?
কে-দেখিতে যায় বল রঙ্গালয়,
হইলে উদ্ধব! অভিনয় শেষ?

ব্রজের উৎসব হইয়াছে শেষ,
নাহি সেই গীত, নাহি সেই বেশ!
বহু দিন গত যবনিকা হায়!
পড়িয়াছে, আজ শূন্য রঙ্গালয়!
কি দেখিতে বল যাইবে উদ্ধব!
নাহি অভিনেতৃ, নাহি অভিনয়।
যে ক্ষুদ্র নির্ঝরে জন্মিলা জাহ্নবী,
রহিলা কি রুদ্ধ সেই নির্ঝরে?
উড়াইয়া শৈল, জুড়াইয়া মরু,
পতিতপাবনী মিশিলা সাগরে।
ক্ষুদ্র বৃন্দাবনে—ক্ষুদ্র নির্ঝরে—
গোপের গোপীর হৃদয়ে তরল
যে প্রেম-জাহ্নবী জন্মিলা উদ্ধব!
শতমুখী, করি অশান্তি অনল
নির্ব্বাপিত, ঘোর অধর্ম্মের শৈল
বলে কুরুক্ষেত্রে করি বিতাড়িত;
জুড়াই তাপিত, উদ্ধারি পতিত,
হইল প্রভাসে সাগরে মিলিত।
বিশ্ব চরাচর আজি বৃন্দাবন,
মহাকাল ধারা যমুনা তাহার,
নর নারী নন্দ, যশোদা জননী,
নর নারী গোপ-কুমারী কুমার।
ব্রজ, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস,—ত্রিভঙ্গ;
নবধর্ম্ম, মম কদম্ব শীতল;
নর নারী প্রেম, চারু বনমালা;
বাঁশী, বিশ্ব-কণ্ঠ বাজে অবিরল।

দেখ কি মধুর এই বৃন্দাবন !
　　কি মাধুরী এই যমুনা বয় !
দেখ কি ত্রিভঙ্গ ! কদম্ব সুন্দর !
　　শুন কি বাঁশরী মাধুরীময় !”
কহিল উদ্ধব—“পারিল না পার্থ
　　বুঝিতে, সহিতে, নর-নারায়ণ !
যেই বিশ্বরূপ, সে অনন্ত রূপ
　　কেমনে উদ্ধব করিবে ধারণ ?
যেই সৌর রাজ্যে, অনন্ত অসীম,
　　আদিত্য আপনি যান হারাইয়া,
কি বুঝিবে তাহা পতঙ্গ খদ্যোত,
　　ক্ষীণ ক্ষণস্থায়ী আলোক লইয়া ;
হায় ! বিনা শিক্ষা, বিনা সাধনায়,
　　না পারি লভিতে ক্ষুদ্র শিল্পজ্ঞান ;
বিনা শিক্ষা, আমি বিনা সাধনায়,
　　অনন্ত অচিন্ত্য পূর্ণ ভগবান
বুঝিব কেমনে ? লঙ্ঘিয়া কেমনে
　　অনন্ত জ্ঞানের মহাপারাবার,
দেখিবে তোমার চিদানন্দ রূপ ?—
　　এখনো উদ্ধব শিখেনি সাঁতার।
ভাষার, শিল্পের চিত্র, সঙ্গীতের,
　　রয়েছে অক্ষর, রয়েছে বিধান ;
অক্ষর বিধান আছে সেইরূপে
　　লভিতে অনন্ত তব তত্ত্বজ্ঞান।
আজি এ প্রভাসে পেয়েছি অক্ষর,
　　এ প্রভাসে আজি পেয়েছি বিধান,

বুঝিয়াছি তুমি জ্ঞানের অতীত,
ভক্তির অতীত নহ ভগবান !
তব ভক্তি-ক্ষেত্র, প্রেম ক্ষেত্র-তব,
যাব বৃন্দাবনে, ভজিব তোমায়।
তুমি হবে প্রভু, আমি হব দাস,
পরে পুত্র, তুমি পিতা করুণায়।
আমি পিতা মাতা কিছুদিন পরে,
তুমি ননীচোরা দুলাল আমার,
পরে প্রেমময় সখা দুই জন,
গোষ্ঠে গোষ্ঠে প্রেমে করিব বিহার।
তখন হইবে তুমি প্রাণপতি,
আমি প্রাণ-পত্নী হইব তোমার ;
তুমি যে রমণ, রমণী যে আমি,
এই জ্ঞান শেষে রবে না আর !
ভক্ত ভগবান, প্রেমিকা প্রেমিক,
হইব চিন্ময়, আনন্দময়,
রাস নিশি শেষে, চরণে বিদায়
লইল উদ্ধব, করুণাময়, !"
চরণে পড়িয়া, গড়াগড়ি দিয়া,
পবিত্র ধূলায় ধূসরিত কায়,
"হরে ! কৃষ্ণ ! হরে !"— গর্জ্জি বাহু তুলি'
উদ্ধব নাচিয়া নাচিয়া যায়।
"হরে ! কৃষ্ণ ! হরে !"— গর্জ্জিল প্রভাস,
ছুটিল উন্মত্ত নরনারীগণ
উদ্ধবে বেড়িয়া, নাচিয়া নাচিয়া,
ফুল্ল জ্যোৎস্নায়, অতুল নর্ত্তন !

"হরে! কৃষ্ণ। হরে!"—গায় দীন কবি,
প্রেমের উচ্ছ্বাসে আনন্দে বিহ্বল,
উদ্ধব! তাহারে নেও বৃন্দাবনে,
দেখ বক্ষ ভাসি বহে অশ্রুজল!
আমিও উদ্ধব! তোমার মতন
রাজনীতি মহা মরুতে পড়িয়া,
কাটাইনু এই একটী জীবন,
শত মনস্তাপে জ্বলিয়া পুড়িয়া!
প্রেম-পিপাসায় এ তাপিত প্রাণ
বড়ই কাতর, পিপাসাতুর;
উদ্ধব! আমায় নেও বৃন্দাবনে,
সেই ব্রজলীলা দেখিব মধুর।
চতুর্দ্দশ বর্ষ বসি এক ধ্যানে
দেখিয়াছি সেই লীলা চিন্তাতীত;
পাইয়াছি শান্তি মরুদগ্ধ প্রাণে,
হয় নাই তবু তৃষ্ণা নির্ব্বাপিত!
উদ্ধব! আমারে নেও বৃন্দাবনে!
সেই ব্রজলীলা দেখিয়া মধুর
জুড়াইব প্রাণ,—মরুদগ্ধ প্রাণ
বড়ই কাতর, বড় তৃষ্ণাতুর

ষষ্ঠ সর্গ।

—*—

প্রতিজ্ঞা।

"বনবালা! বনবালা! কত কাল আর
এই পিপাসা অনল
বহিব এ মরু-বুকে?—বহিব শোণিতে
এই অনল তরল?"—
অতীত প্রহর নিশি, ফুল্ল নীলাম্বরে মিশি'
হাসিতেছে বৈশাখের প্রফুল্ল চন্দ্রিমা;
নীলাম্বর নীলিমায়, উচ্ছ্বসিত মহিমায়,
ভাসিতেছে সেই হাসি পূর্ণ মধুরিমা।
বৈশাখের পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র সুধাধার,
সমুজ্জ্বল সে সুধায় প্লাবিত আকাশ;
প্লাবিয়া আকাশ অঙ্গ, শীতল সুধাতরঙ্গ
তুলিয়াছে সিন্ধুনীরে কি সুধা-উচ্ছ্বাস!
নারী-মুখ সুধাকর চাহি সেই শশধর,
রূপের সুধায় মুখ পূর্ণিত প্লাবিত;
প্লাবি মুখ নীলাম্বর, ঝরিতেছে সুধা-কর
চন্দ্র-দীপ্ত সিন্ধুতীর করি আলোকিত।
সিন্ধুতীরে শিলাসনে, বিস্ফারিত দুনয়নে,
বসি বামা, নারী-গর্ব্বে প্রদীপ্ত নয়ন;
নারীগর্ব্বে পূর্ণ মুখ, পূর্ণিত পীবর বুক,
শোভিছে বিদ্যুৎদীপ্ত মেঘখণ্ড সম।
অনার্য্যের সেনাপতি সাজিয়াছে রূপবতী,

কেশের উষ্ণীষ শোভে ললাট উপর ;
উষ্ণীষে চূড়ার শোভা চন্দ্রকরে মনোলোভা,
উরস্ত্রাণাবৃত উচ্চ উরস সুন্দর।
পৃষ্ঠে তূণ, শরাসন, নিদ্রিত ভুজঙ্গ সম,
কটিবন্ধে ক্ষীণ কটি শোভে ক্ষীণতর ;
খচিত কোষে ঝলসি নিতম্ব-বিলম্বী অসি,
শোভিছে সফণা ফণী তীব্র বিষধর।
শোভে ভুজে সুকুমার—মনমথের কণ্ঠহার—
রতন কঙ্কণ কিবা আদরে আবরি'!
সুপ্রকোষ্ঠে মনোলোভা, বিলোল বলয়-শোভা,
খেলে কর সঞ্চালনে কিবা লীলা করি!
কর্ণের কুণ্ডলদ্বয় খেলে কিবা লীলাময়!
সুগোল কোমল কণ্ঠে কণ্ঠী মনোহর ;
কোমল কৌষিক শোভা কি উরুতে মনোলোভা!
সুগোল চরণে শোভে মঞ্জীর মুখর।
রয়েছে ঈষদ হাসি অধর কোণায় ভাসি,
চাহি চন্দ্র পানে বামা বসি অবিচল,
চাহি সেই মুখ পানে, অধীর মদিরা পানে,
বসি শিলাতলে কহে সাত্যকি বিহ্বল।—
"বনবালা! বনবালা! কত কাল আর
এই পিপাসা অনল
বহিব এ মরুবুকে?—বহিব শোণিতে
এই অনল তরল?
কত কাল!—এক দিন নিদাঘ নিশীথে
শয্যা-কক্ষে, স্বপনে যেমন,
অপূর্ব্ব রমণী-মূর্ত্তি নীলিমা মাধুরী

দেখিলাম, মেলিয়া নয়ন।
নয়ন না পালটিতে চপলার মত
হইল অন্তর সুলোচনা।
ভাবিলাম স্বপ্নদেবী হইয়া কি মূৰ্ত্তিমতী
করিলেন আমারে ছলনা।
বিস্মিত ত্যজিয়া শয্যা, স্বপ্নে যেমন,
কক্ষ হইতে হইয়া বাহির
দেখিলাম, অশ্বপৃষ্ঠে অপূৰ্ব্ব কৌশলে
বায়বালা লঙ্ঘিল প্রাচীর।
বিস্মিত, স্তম্ভিত, ভীত, দেহ রোমাঞ্চিত,
দাঁড়াইয়া অচেতন প্রায়,
ভাবিলাম,—এ কি স্বপ্ন! কিংবা কোন দেবী
এইরূপে ছলিল আমায়!
একি দৃশ্য! কি রহস্য!—
চিন্তা সারানিশি,
দেখিলাম প্রভাতে উঠিয়া,
নহে স্বপ্ন, প্রাচীরের মূলে তুরঙ্গের
পদ-চিহ্ন রয়েছে পড়িয়া!
কে রমণী? কেন কক্ষে পশিয়া গোপনে
এই রূপে হ'ল অন্তর্হিত?
সেই অশ্ব-পদ-চিহ্ন হৃদয়ে আমার
হায়! যেন হইল অঙ্কিত।
বুকের উপর দিয়া তুরঙ্গ-বাহিনী
যেন বেগে গিয়াছে চলিয়া,
কি যেন মদির স্মৃতি, অজ্ঞাত উচ্ছ্বাস,
রূপ-স্বপ্ন, গিয়াছে রাখিয়া।

কি যেন দারুণ ব্যথা মরমে মরমে
অকস্মাত হইল সঞ্চার ;
কি যেন আবেশে দেহ হইল অবশ,
প্রাণে যেন কিবা হাহাকার !
কত দিন, কত নিশি, এই রূপে হায়।
বাণ-বিদ্ধ কপোতের মত,
কাটিলাম যাতনায়, দিবা অনাহারে,
যাতনায় নিশি অনিদ্রিত !
দেখিলাম কত বার, বিদ্যুৎবিক্ষেপী
নবীন নীরদময়ী বালা।
দাঁড়াইয়া কক্ষে মম, বিদ্যুৎবিক্ষেপে
অন্ধকার কক্ষ করি আলা।
ছুটিলাম উন্মত্তের মত কত বার
ধরিতে সে দীপ্তা কাদম্বিনী ;
ধরিলাম,—কিন্তু কই ? কক্ষ অন্ধকার
ছলিয়াছে ভ্রান্তি মায়াবিনী।
দিবা নিশি কত বার, হায় ! শত বার,
আরোহিয়া অট্টালিকা-শির,
দেখিতাম আত্মহারা নেত্রে অনিমিষ
সেই অশ্ব লঙ্ঘে কি প্রাচীর !
একদা নিশিতে যেন দেখিনু রমণী
সেই রূপে প্রাচীর লঙ্ঘিয়া,
বকুলে বাঁধিয়া অশ্ব, কৃষ্ণের প্রাসাদে
সশঙ্কিতা যাইছে চলিয়া।
ছুটিলাম হৃদয়ের আবেগের বশে
শরাসন-ভ্রষ্ট শর মত,

শুনি পদ-শব্দ মম অশ্বারূঢ়া বামা
উল্কাবৎ হ'ল অন্তর্হিত।
ছিল সুসজ্জিত অশ্ব নিকটে আমার,
অশ্ব-পৃষ্ঠে লঙ্ঘিয়া প্রাচীর
ছুটিনু, ছুটিল বেগে তুরঙ্গ যুগল
অন্ধকারে যেন দুই তীর
বায়ুগামী তুরঙ্গের ঘোর হ্রেষারব
ঘন ঘন উঠিছে ভাসিয়া
নৈশ নীরবতা বক্ষে, অশ্ব-পদাঘাতে
অগ্নি-কণা পড়িছে ছুটিয়া।
কিবা অশ্ব-সঞ্চালন! কত ক্ষুদ্র স্রোত,
কত বিঘ্ন, করি উল্লঙ্ঘন
ছুটিয়াছে বীরাঙ্গনা, বসি অশ্বে বামা
চারু শৈল প্রতিমা যেমন।
এইরূপে বহু ক্রোশ তুরঙ্গ যুগল
মহাবেগে করি অতিক্রম,
প্রসারিত পদোপরে অবসন্ন পড়ি,
অকস্মাত ত্যজিল জীবন।
এক লম্ফে পড়ি ভূমে ফিরাইয়া মুখ,
রাখি বক্ষে করোপরে কর,
দাঁড়াইয়া বীরবালা, যেন বনকুরঙ্গিণী
ব্যাধ অগ্রে সংগ্রাম-তৎপর।
আঁধার নির্ম্মলা নিশি, জ্বলিছে আকাশে
দীপালোক অসংখ্য নীরব;
সেই আলো অন্ধকারে মরি! কিবা রূপ!
ভূতলের অতুল বিভব!

বিমুক্ত কুন্তল পটে শোভিতেছে কিবা
স্বেদ-সিক্ত বদন সুন্দর।
শ্যাম চিত্র-পটে শিল্পী রেখেছে আঁকিয়া
যেন পূর্ণ নীল শশধর।
সমেখলা কটিবন্ধে, উচ্চ কটিতটে,
আঁধারে ঝলসে ভীমা অসি
অশ্ব-সঞ্চালন বেগে দীর্ঘ কৃষ্ণ বেণী
পীণ বক্ষে পড়িয়াছে খসি।
অশ্ব-সঞ্চালন-শ্রমে উঠিছে, পড়িছে,
লীলা করি উন্নত উরস;
তরঙ্গিত সরোবরে উঠিছে, পড়িছে,
ফুটোন্মুখ যুগ্ম তামরস!
বিস্মিত, স্তম্ভিত, চাহি নির্ভীক মূরতি
দাঁড়াইয়া দলিতা ফণিনী,
জিজ্ঞাসিনু,—'কহ তুমি দেবী কি মানবী?'
'কহিব না'—কহিল গর্ব্বিণী।
'কিবা জাতি?'—কহিব না।' কি নাম তোমার?"
'কহিব না'—সুদৃঢ় উত্তর।
'কেন এই নিশি-যান তব?'—'কহিব না।'
বজ্রকণ্ঠে কাঁপিল অন্তর।
'তবে গুপ্ত-চর তুমি ধরিব তোমায়;—
'ধর শক্তি যদি থাকে তব!'
'জান কি সাত্যকি আমি বীরচূড়ামণি?'
'জানি'—বামা রহিল নীরব।
'সিংহের সহিত ক্রীড়া।'—আমিও সিংহিনী।'
'খোল তবে অসি তীক্ষ্ণ ধার।'—

'খুলিব না, হান অসি ! পাতিয়াছি বুক !
কাপুরুষ ঘোষিবে সংসার।'
কি ঘোর সংকট ! কিবা মূর্ত্তি গরবিণী,
শিলা সম দাঁড়ায়ে নির্ভীক !
কি রূপ বিদ্যুৎপ্রভা ! ধাঁধিল নয়ন ;
ঘুরিতে লাগিল চারিদিক।
কি যেন মদিরা-স্রোত ছুটিল শোণিতে,
দেহ মম অবশ অধীর,
কহিলাম—'নারী-রত্ন ! মানিলাম পরাজয় ;
এইরূপ নহে অবনীর !
হৃদয় বিজিত ক্ষত রক্তজবা সম
রূপ-পাত্রে লও উপহার।'—
'লইলাম ;—এইখানে এমন সময়ে
পক্ষান্তরে মিলিব আবার !'
সগর্ব্বে ফিরায়ে মুখ চলিল মন্থরে,
কি গর্ব্বিত সুন্দর গমন !
কি গর্ব্বিত দেহভঙ্গি, রূপ-গরবের
অঙ্গে অঙ্গে তরঙ্গ কেমন !
রূপের তরঙ্গ-লীলা, চাহিতে চাহিতে,
মিশাইল নৈশ অন্ধকারে ;
অস্ত গেল চন্দ্র মম হৃদয়-আকাশে,
অন্ধকারে আবরি তাহারে।
আত্মহারা কিছুক্ষণ ভ্রমি, শিলাখণ্ডে
রাখি মম অবসন্ন শির,
বসিলাম ধরাতলে, অবসন্ন দেহে
শোণিত-প্রবাহ যেন স্থির।

চাহিলাম নীলাকাশ, দেখিলাম যেন
নিবিয়াছে তারকা সকল,
মূর্ত্তিমতী নিশাদেবী শোভিতেছে বামা,
নীলাকাশ করিয়া উজ্জ্বল।
সেই স্মৃতি করিতেছে অবশ হৃদয়,—
দেও সুরা-পাত্র, বনবালা!
অধর-মদিরা মাখি! জ্বলিল এ প্রাণে
নিদারুণ সেই স্মৃতিজ্বালা।"
ঢালি সুরাপাত্রে সুরা, পান করি বামা,
সাত্যকিরে করিল অর্পণ;
পান করি কহে—" হু! কিবা তীব্র সুরা!
তরল বিদ্যুৎ অনুপম!—
মিলিলাম পক্ষান্তরে, মিলিলাম আর
কত স্থানে, হায়! কত বার!
প্রহেলিকা স্বরূপিণী এখনো যে তুমি!—
পূরিল না পিপাসা আমার।
মন্ত্র-মুগ্ধ ফণী মত এই দীর্ঘ কাল
চলিয়াছি ইঙ্গিতে তোমার,
তোমার ইঙ্গিতে আমি করিয়াছি হায়।
কি নরক যাদব-সংসার!
তোমার ইঙ্গিতে হায়! স্থাপিনু গোপনে
দ্বারকায় শৌণ্ডিক-আলয়;
রাখিলাম লুকাইয়া দ্বারকা নগরে
সর্পী-সম শৌণ্ডিক নিচয়।
অনার্য্যার সুরা-সুধা, রূপ-সুধা আর,
গরলে গরল উগ্র মিশি,

উন্মত্ত যাদবকুল দুই মহাবিষ
হায়! পান করি অহর্নিশি!
অনার্য্যার প্রেমানল, অনার্য্যার সুরানল,
হিংসা-কুণ্ড করি প্রজ্বলিত,
পুড়িছে যাদবকুল; কৃষ্ণের শাসনে
হইল না অগ্নি নির্ব্বাপিত।
নাহি সে শৌণ্ডিকালয়, তথাপি গোপনে
করিতেছে দুই বিষ পান;
দ্বারকা অশান্তিপূর্ণ, না জানি ঘটিবে
যাদবের কিবা পরিণাম!
কহিলে—'অনার্য্য জাতি, যারা এক দিন
ছিল এই ভারত-ঈশ্বর,
হইয়াছে অন্নাভাবে হা অদৃষ্ট! তারা
হীনজীবী শৌণ্ডিক ইতর!
তুমি কুরুক্ষেত্র-জয়ী, করুণ-হৃদয়,
শ্রীকৃষ্ণের ভুজ অন্যতর;
অনার্য্যেরে দেও ছায়া! হও যদুপুরে
অনার্য্য-আশ্রয় তরুবর!
অনূঢ়া অনার্য্য-রাণী,—এই হেতু তার
কক্ষে নৈশ অভিসার।
দেও ভিক্ষা! যথাকালে দিবে পদে তব
জীবন, সর্ব্বস্ব, অনূঢ়ার।'—
দেও সুরাপাত্র!—আহা! কি তীব্র অনল!—
কাল পূর্ণ হয়েছে কি বল?
তাই কি প্রেরিলে পত্র? নাহি পারি আর
সহিতে এ পিপাসা অনল।"

আবার মদিরা পান, সুরা বিনিময়
দুই জনে আবার আবার ;
বিলোল কটাক্ষ সহ কি লীলা করিয়া
দেয় বামা পাত্র মদিরার !
কহিল রমণী,—কিবা কণ্ঠ প্রেমময় !
বিলাস-বিহ্বল মদিরায়,—
"বীরেন্দ্র ! এ দীর্ঘ কালে বল কি তোমার
এই ভ্রান্তি ঘুচিল না হায় !
তুমি আর্য্য-কুল-রবি প্রখর উজ্জ্বল,
পতিতা অনার্য্যা আমি আর,
আর্য্যের উদ্যান-ভৃঙ্গ,—তব বাঞ্ছনীয়
আছে কিবা আমি অনার্য্যার ?"
সুরা-শ্লথ কণ্ঠে মত্ত কহে যুযুধান,—
"নীলাব্জের লীলা নীলিমার
দেখি নাই যত দিন, ভাবিতাম মনে
তামরস ত্রিদিব শোভার।
শ্যামাঙ্গিনী অনার্য্যার রূপে যে মদিরা,
আছে যেই লালসা প্রখরা,
গৌরাঙ্গিনী আর্য্যবালা-রূপ জ্যোৎস্নায়
নাহি সেই লাবণ্য মুখরা।
অনার্য্যা কানন-বালা কানন-মদিরা,
বিদ্যুৎ-পূরিতা উগ্র সুরা,
উদ্যান দাড়িম্ব-সুধা আর্য্যা বামাঙ্গিনী,—
পুষ্প-সুধা কোমলা মধুরা।
প্রৌঢ় আমি, করিয়াছে তব রূপ প্রাণে
কি বিদ্যুৎ আবেগ সঞ্চার,

নব যুবকের মত আত্মহারা আমি,
প্রাণ মম মরু পিপাসার !
কে বলে যৌবন মাত্র প্রেমের সময় ?
পারে নদ মধ্যম জীবনে
দেখাতে কি সেই লীলা, তরঙ্গ উত্তাল,
খেলে যাহা সাগর-সঙ্গমে ?
প্রৌঢ়ে মম যে তরঙ্গ, উত্তাল উচ্ছ্বাস,
খেলিতেছে হৃদয়ে আমার,
যৌবনের সে উচ্ছ্বাস, ক্ষুদ্র জলক্রীড়া
বালকের তুলনায় তার ।।
প্রভাসের সিন্ধু সম অনন্ত অতল
আজি প্রেম-সাগর আমার ;
তব পূর্ণচন্দ্র-মুখ তীব্র আকর্ষণে
করিছে কি লহরী সঞ্চার !
দেও সুরা পাত্র,—সুরা চুম্বি প্রেমাবেশে
অহো ! কিবা সুধা তীব্রতরা
ঢালিয়াছে, প্রেমময়ি ! অধর তোমার !
কি আনন্দে ভাসিতেছে ধরা !
কি সুন্দর ! কি সুন্দর ! ওই মুখখানি !
মন্মথের কি লীলা-কমল
শোভিতেছে চন্দ্র করে ! ললাট, কপোল.
মাধুরীর স্বর্গ সমুজ্জ্বল !
মদিরাক্ত দুনয়নে কি অরুণ আভা
কি আবেশে হয়েছে পুলকিত
অরুণ আবেশময় কটাক্ষ বিলোল
কি তাড়িত করিছে সিঞ্চিত !

ছদ্মবেশে কিবা শোভা অঙ্গে মনোলোভা!
কি তরঙ্গ-রঙ্গ কালজয়ী!
এই দীর্ঘ কাল দেখি ক্রমে পূর্ণতর,
আজি পূর্ণতম প্রেমময়ী!
আজি সেই পূর্ণতায় অভুক্ত সুধার
প্রাণ মম হয়েছে বিকল।
এস প্রিয়ে! এস প্রিয়ে!"—বাড়াইল কর
সুরামত্ত সাত্যকি বিহ্বল।
বিজলীর মত কারু পড়িল সরিয়া,
দাঁড়াইল নিষ্কোষিয়া অসি।
জানু পাতি ভূমিতলে বসিয়া সাত্যকি
কহে—"ক্ষম প্রেয়সি! প্রেয়সি!"
কহে কারু—"এত দিনে বুঝিলে না তুমি,
নারীত্ব—সতীত্ব—অনার্য্যার
এমন সুলভ নহে, বন-ভুজঙ্গিনী
না দেয় মস্তক মণি তার
থাকিতে জীবন দেহে। হও অগ্রসর,
এই অসি হৃদয়ে তোমার
পশিবে আমূল, অসি পশিবে আমূল
এ গর্ব্বিত হৃদয়ে আমার!
স্থির হও! শুন তবে! এই প্রহেলিকা
যথাকালে খুলিব এখন,
ডাকিয়াছি সেই হেতু; শুধু তব তরে
এত দিন রেখেছি গোপন।
শুন তবে! এক দিন নৈশ অভিসারে
কৃতবর্ম্মা দেখিল আমায়,

কবি-অশ্ব-অনুসার ধরিল পাপিষ্ঠ,
পরাজিয়া যুদ্ধে অবলায়।
কহিল—'আমায় বর! দিব ভিক্ষা প্রাণ;
নহে প্রাণ সতীত্ব সহিত
হরিব,—খাইব মধু, করি নিষ্পীড়িত
এই পুষ্প সুধায় পূরিত।'
রক্ষিতে সতীত্ব,—প্রাণ তুচ্ছ অনার্য্যার,—
কহিলাম—"প্রণয়ী আমার
যদুকুল অবতংস বীরেন্দ্র শৌনেয়;
আমি নারী অস্পৃশ্য তোমার।"
কিবা উপহাস হাসি হাসি দুরাচার,
পশু সম করি ব্যবহার,
'সাত্যকি বীরেন্দ্র যদি'—কহিল হাসিয়া—
'কাপুরুষ জগতে কে আর?
মাগিলাম নিরুপায় সময় তখন,
মহা সত্য করিয়া কঠোর;
সেইকাল হবে পূর্ণ, পূর্ণ শশধর
গেলে অস্ত; হবে স্বপ্ন ভোর!"
পদাহত ফণীমত সাত্যকি উঠিয়া
গরজিল নিষ্কোষিয়া অসি—
"নহে আমি যুযুধান, কৃতবর্ম্মা-শির
এ নিশিতে নাহি পড়ে খসি!
করিলাম এ প্রতিজ্ঞা! আজি কাপুরুষ
শতবার ডাকিব তাহায়;
সাত্যকি কি কৃতবর্ম্মা রজনী প্রভাতে
রহিবে না প্রেয়সি! ধরায়।

"বিদ্যুৎ!" ডাকিল বীর, হ্রেষিয়া তুরঙ্গ
বন হ'তে আসিল ছুটিয়া;
সাত্যকি উঠিল লম্ফে, লুকা'ল বিদ্যুৎ
জ্যোৎস্নায় বিদ্যুৎ খেলিয়া।
বন হ'তে সেনাপতি তক্ষক আসিয়া
কহিল কারুর পদে প'ড়ি,—
"উৎসবের সন্নিকটে সৈন্য সুসজ্জিত,
নাগ-মাতা চল ত্বরা করি!"
কাঁপিয়া উঠিল ধরা, নাচিল সাগর,
পুনঃ প্রকম্পনে ঘোরতর,
আসিছে তরঙ্গমালা ভাসাইয়া বেলা,
অশ্বে কারু ছুটিল সত্বর।

সপ্তম সর্গ।

—:*:—

লীলা শেষ।

হাসিছে প্রভাস; নিশি দ্বিতীয় প্রহর;
মধ্য নীলাম্বরে পূর্ণচন্দ্র বসন্তের
করি সমুজ্জ্বল ঊর্দ্ধে আকাশ মণ্ডল,—
চারু চন্দ্রাতপ নীল অমৃতে রঞ্জিত,
নিম্নে মহাসিন্ধু নীলামৃতে তরঙ্গিত।
শিবির অনতি দূরে ধবল বেলায়—

যূথিকার পুষ্পাসন ধৌত চন্দ্রকরে,
বসি নর-নারায়ণ বেদি নীলোৎপলে,
মানব অদৃষ্টাকাশ করি সমুজ্জ্বল,
করি সমুজ্জ্বল মহাকাল পারাবার।
নীলমণিময় দেহ-তীর্থের অন্তরে
যেন শত পূর্ণচন্দ্র হইয়া উদিত,
করিতেছে নীলামৃত কৌমুদী নিঃসৃত
সুশীতল, সমুজ্জ্বল, পতিতপাবন,
আলোকিয়া চন্দ্র করে আলোকিত বেলা।
উপলে রাখিয়া পৃষ্ঠ, রাখি উর্দ্ধ শির,
আকর্ণ বিশ্রান্ত নেত্রে, করুণা নির্ঝর,
চাহি অনন্তের পানে প্রশান্ত বদন।
অঙ্গে অঙ্গে রাজ-বেশ, মস্তকে উষ্ণীষ,
জ্বলিতেছে চন্দ্রালোকে, পূর্ণচন্দ্র করে
জ্বলিতেছে ততোধিক ললাটে, বদন।
শৈলজা আসিয়া ধীরে প্রতিমা প্রীতির,—
প্রেমাশ্রুতে ছল ছল নেত্র ইন্দীবর ;
নীলামৃতে ছল ছল, গৈরিকে আবৃত,
শান্ত সুললিত দেহ ; বেণী অমসৃণ
বেষ্টিয়া মস্তক চারু, চূড়ায় সুন্দর
শোভিছে অসাবধানে ললাট উপর ;
শোভিছে গলায় ভক্ত-দত্ত পুষ্পমালা,
রত্নমালা কণ্ঠে যেন দেবী প্রতিমার ;—
আসি চন্দ্রালোকে ধীরে প্রণমিল শৈল
নারায়ণ পদাম্বুজে। অর্পিয়া চরণে
কণ্ঠস্থিত পুষ্পহার, রাখিয়া হৃদয়ে

দেবপদ কোকনদ, ভক্তির ত্রিদিবে,
বসিল শৈলজা ; যেন সন্ধ্যা নিরমলা
বসিল সুনীল শান্ত নীলাম্বর পদে।
"প্রাণনাথ ! হৃদয়ের এ পূর্ণ উচ্ছ্বাস,—"
কাতরে কহিল শৈল—"এই শৈলজার
প্রেম বরিষার পূর্ণ প্রবাহ উদ্বেল,
লও শান্তি-সিন্ধু পদে, পূরাও বাসনা !
মধ্য-উৎসবেতে বজ্র নিনাদের মত
শুনিল স্তম্ভিত যাত্রী,—'সমাপ্ত উৎসব।
কৃষ্ণের আদেশ,—যাত্রী যাবে রজনীতে
পঞ্চক্রোশ, আজ্ঞা নাহি করিবে লঙ্ঘন !
থামিল উৎসব সিন্ধু কল্লোল নিমিষে।
লীলা-গীত অর্দ্ধ তানে, বাদ্য অর্দ্ধ তালে,
থামিল, মৃদঙ্গে কর রহিল লাগিয়া।
নৃত্যশীল ঊর্দ্ধবাহু ভক্তবৃন্দ তব
বজ্রাহত দাঁড়াইল প্রতিমূর্ত্তি মত।
মুহূর্ত্ত, উৎসব ক্ষেত্র, নিষ্কম্প নীরব,
দেখিলাম চন্দ্রালোকে মহাচিত্র মত !
ব্যাপিয়া প্রভাস তীর উঠিল ভাসিয়া,
সেই নীরবতা বক্ষে, সমুদ্র গর্জ্জন
মুহূর্ত্ত ; মুহূর্ত্ত পরে যাত্রী হাহাকার
উঠিল ভাসিয়া প্লাবি জলধি-কল্লোল।
সৈকত ধূলায় পড়ি গড়াগড়ি দিয়া
কহিল কাঁদিয়া—'হরি ! দুটি দিন আর
ছিল সাধ নিরখিয়া পতিতপাবন
জুড়াইব প্রাণ, কেন হইলে নিদয় ?'

কহিল কাঁদিয়া—'মা গো ! তোরা দুইজন
এ পাপী সন্তানগণে দিয়া পদাশ্রয়
ল'য়ে চল বৃন্দাবনে, দেখা গোপালের
সে কিশোর লীলাভূমি পতিতপাবনী।
অবগাহি যমুনার সুশীতল নীরে,
আলিঙ্গিয়া সুশীতল কদম্ব তমাল,
কৃষ্ণ-পদে পবিত্রিত শ্যাম দূর্ব্বাদলে
—ব্রজাঙ্গনা প্রেমাশ্রুতে সিক্ত সুশীতল—
রাখি এ তাপিত বক্ষ, এ প্রেম পিপাসা
জুড়াইব, প্রাণ মা গো ! বড়ই আকুল।'
চলিল না পদ মম, সুভদ্রা আপনি
চলিলেন, ভক্তগণ বেষ্টিয়া তাঁহায়
সরল শিশুর মত নাচিয়া নাচিয়া,
গাইয়া গাইয়া নাম-গীত সুমধুর,
দুই নেত্রে প্রেম-ধারা, গিয়াছে চলিয়া
বড়ই আকুল প্রাণ তব শৈলজার !
আসিল ছুটিয়া রাখি চরণ যুগল
জুড়াইতে এ হৃদয়ে, আকুলতা তার।
উৎসবান্তে উৎসবের আলয়ের মত
করিতেছি হাহাকার এই পুণ্যভূমি,
এই নব কুরুক্ষেত্র, নব বৃন্দাবন।
প্রাণনাথ ! দীনবন্ধো ! তুমি দয়াময় !
করুণার সিন্ধু তুমি ! কেন এইরূপে
ভাঙ্গিলে উৎসব নাথ ! দিলে ব্যথা প্রাণে
ভক্তদের এইরূপে অকরুণ মনে ?"
রাখিয়া দক্ষিণ কর শৈলজার শিরে,

নারায়ণ স্নেহ-কণ্ঠে কহিলা—"বুঝিবে।"
সেই সুপ্রসন্ন মুখ প্রদীপ্ত শীতল,
আকর্ণ বিস্তৃত নেত্র, চাহিয়া চাহিয়া
কহিতে লাগিল শৈল—"পতিতপাবন!
সমস্ত পতিত জাতি করিলে উদ্ধার,
ভাসাইলে এ ভারত প্রেমের প্রবাহে!
আর্য্য ও অনার্য্য, নাথ! দুই মহাস্রোত
এ প্রেম-প্রবাহে আজি হইয়া পতিত,
সলিলে সলিল যেন হইয়া বিলীন,
ছুটিল কি সিন্ধু-মুখে শান্তি পারাবার!
আজি এ ভারত নাথ! বৈকুণ্ঠ তোমার,
তুমি নর-নারায়ণ, পূর্ণ সনাতন।
আজি ভদ্রা শৈলজার পূর্ণ মনোরথ!
এ পতিতা শৈলজার স্বজাতি কেবল
রহিল পতিত নাথ! তাহাদের প্রতি
হইলে নিদয় কেন? কেন নিবারিলে
এ দাসীরে নাগপুরে করিতে গমন,
শুনাইতে কৃষ্ণনাম সে পতিত বনে?
শৈলজার জন্মস্থান, জাতি শৈলজার,
রহিল পতিত নাথ! রহিল পতিত
শৈলজার পিতা-পুত্র-ভ্রাতা নাগপতি;
জরৎকারু, মাতা-কন্যা-ভগ্নী শৈলজার।
বনের সুস্বাদু ফল, বন নারিকেল,
বনবাসী ভ্রাতা মম; মূঢ় আবরণ,—
হৃদয় মধুর শস্যে মধুর সলিল।
ভগ্নী নিদাঘের নদী অন্তরসলিলা;

রমণীর অভিমান তপ্ত আবরণে
বহিতেছে প্রেম-ধারা নির্ম্মলা শীতলা।
আশার ও নিরাশার কি উগ্র অনল,
জ্বলিয়াছে তাহাদের কোমল হৃদয়ে
মহা বাড়বাগ্নি সম!—দয়াময় তুমি,
কেন তাহাদের প্রতি হইলে নিদয়?
আবার প্রসন্ন মুখে উত্তরিলা হরি
সস্নেহে—"বুঝিবে শৈল!"
চারু নেত্রে চারি
চাহি পরস্পরে স্থির পূর্ণচন্দ্রালোকে,—
প্রভাত শিশির সিক্ত চারি ইন্দীবর
চাহি পরস্পরে' শান্ত, স্থির, অবিচল।
দেখিল শৈলজা যেন কি প্রেম-উচ্ছ্বাস
উঠিল ভাসিয়া দেব-নেত্রে ছল ছল।
কহিলা কোমলতর কণ্ঠে নারায়ণ—
"বাসুকি ও জরৎকারু!"—শৈলজা প্রথম
শুনিল যুগল নাম কণ্ঠে কেশবের
এত দিনে, এতদূরে! কি কণ্ঠ মধুর!
কিবা প্রেম-বিগলিত! কহিল প্রেমিক
চির প্রেমিকের, যেন চির প্রেমিকার,
চির মধুময় নাম, চির প্রেমময়।
আশৈশব এই নাম শুনিয়াছে শৈল
প্রেমময়ী, শুনে নাই এমন মধুর!
মুহূর্ত্ত নীরব রহি কহিলেন পুনঃ—
"বাসুকি ও জরৎকারু!— ইহাদের সম
ভক্ত মম নাহি শৈল! এই ধরাতলে।"

ভগবন্! তব মুখে বড়ই মধুর
ভক্ত নাম!—ভক্ত তব, ভক্তের যে তুমি!
"প্রাণনাথ! লীলাময়! এ কি লীলা তব!"—
কাঁদিয়া পড়িল শৈল লুটা'য়ে চরণ।
"প্রাণনাথ! লীলাময়! এ কি লীলা তব!
বাসুকি ও জরৎকারু ভক্ত তব যদি
কেন তাহাদের এই অশান্তি অনলে
পোড়াইলে হায় নাথ! একটি জীবন?
চল নাথ! চল যাই পতিত পাতালে।
নাগপুর হবে তব নব ব্রজপুর;
বাসুকি শ্রীদাম সখা; শৈল জরৎকারু,
—হায়! নাথ! জরৎকারু মহা মরুভূমি,
চির প্রেম-পিপাসিনী চির উন্মাদিনী!—
হইবে ব্রজের গোপী; বহিবে যমুনা
সিন্ধুনদে সিন্ধুমুখে, গাইয়া গাইয়া
পতিতপাবন নাম; সাগর-সঙ্গমে
হইবে ব্রজের প্রেম অনন্ত অসীম।
হইল উদ্ধার নাথ! অহল্যার মত
পতিতা অনার্য্যা-ভূমি; হইল উর্ব্বর
উষর অনার্য্য-ভূমি; হইল শোভিত
মরুভূমি প্রেমপুষ্পে, প্রেম সরোবরে,
তব কৃপা-জাহ্নবীর প্রবাহে শীতল;
কেবল কি নাগভূমি রবে মরুময়?
কেবল কি নাগপতি, কারু কি কেবল,
হৃদয়ে বহিবে মরু? নিবিবে না হায়!
কেবল কি তাহাদের প্রাণের পিপাসা?"

"নিবিবে—নিবিবে—শৈল !"—ধীরে নারায়ণ
কহিলেন স্থিরকণ্ঠে গাম্ভীর্য্য-পূরিত—
"পূর্ণকাল ;—পূর্ণ ব্রত ;—পূর্ণ মনোরথ।"
সে মুহূর্ত্তে অকস্মাৎ যাদব শিবিরে
উৎসব-নিনাদ বক্ষে উঠিল ভাসিয়া
ঘোর হাহাকার ধ্বনি ; উঠিল কাঁপিয়া
শৈলজার বক্ষ ;—শান্ত স্থির নারায়ণ।
সে ভীষণ হাহাকার হইতেছে ক্রমে
অধিক অধিকতর, ধীরে দূরায়াত
মহা ঝটিকার মত। হইল অধীর
শৈলজার প্রাণ ;—শান্ত স্থির নারায়ণ!
"যদুনাথ!—জগন্নাথ!—বিপদভঞ্জন!
কর রক্ষা যদুকুল!"—ঊর্দ্ধশ্বাসে আসি
দারুক চরণতলে হইয়া পতিত
কহিল কাতর কণ্ঠে,—"উন্মত্ত সুরায়
সাত্যকি ও কৃতবর্ম্মা নিন্দি পরস্পরে,
সাত্যকির খড়্গাঘাতে হইয়াছে হত
কৃতবর্ম্মা। জ্বলিয়াছে হায়! ঘোরতর
অন্তর বিগ্রহানল। উন্মত্ত সুরায়
যদুকুল সে অনলে মরিছে পুড়িয়া
আঘাতিয়া পরস্পরে,—রক্ষ যদুকুল।"
অকস্মাৎ ভূমণ্ডল উঠিল কাঁপিয়া ;
দুলিল কণায় স্থিত ক্ষুদ্র মণিমত
ভুজঙ্গের। মুহূর্ত্তেক উঠিল ভাসিয়া
বিহঙ্গের কলরব, ভীত, নিদ্রোত্থিত ;
দূরস্থিত যাদবের মহা হাহাকার

হইল ভীষণতর ; মুহূর্ত্তেক পরে
হ'ল নিমজ্জিত মহাজলধি গর্জ্জনে।
করিয়া ভীষণতর সে ভীম নির্ঘোষ
উঠিল ঘর্ঘরধ্বনি গর্ভে বসুধার !
সংখ্যাতীত রথে যেন মত্ত দৈত্যগণ
মহাহবে ;—হইতেছে ভীম বেগে যেন
রথে রথে অস্ত্রে অস্ত্রে ভীম সংঘর্ষণ !
বিদীর্ণ করিয়া ধরা, রৈবতক গিরি,
দুর্ব্বাসা-আশ্রম-শৃঙ্গ, শত বজ্রনাদে
হইল বিক্ষিপ্ত কিবা ভীম বহ্নিরাশি !
কিবা দর্পে, কিবা বেগে ছাইল গগন !
নভঃস্থল, ভূমণ্ডল, উঠিল জ্বলিয়া
নীল রক্ত বৈশ্বানরে ;—কি ক্রীড়া ভীষণ,

আস্ফালন অনলের, ঘোর বিলোড়ন !
ঘন ঘন ভূকম্পন, ঘর্ঘর গর্জ্জন !
নিবিল সে বহ্নিরাশি। ধূম্র বিভীষণ
নিবিড় মেঘ-তরঙ্গে ছাইল গগন,
আবরিল পূর্ণশশী, করি নিমজ্জিত
অমাবস্যা-অন্ধকারে বিশ্ব চরাচর।
ভস্ম বৃষ্টি, ধাতু বৃষ্টি, বৃষ্টি সাগরের
হইতেছে মুহুর্মুহু মৎস্য নানাবিধ,—
যেন মহা তিমিঙ্গিল গিরি রৈবতক
প্রসারি ভীষণ মুখ করিতেছে বেগে
উৎক্ষেপিত বহ্নিরাশি। গিরি-অঙ্গ বাহি
পড়িছে গৈরিক ধারা অগ্নিধারা মত
মহাস্রোতে স্থানে স্থানে ; পড়িতেছে বেগে

প্রজ্বলিত ধাতু পিণ্ড, উল্কারাশি মত,
অস্ত্র-ভেদ্য অন্ধকারে, ভস্ম-বরিষণে।
যাদব শিবির-শ্রেণী মহা অন্ধকারে
উঠিল জ্বলিয়া মহা দাবানল মত
অকস্মাৎ ;—ছুটিলেন বেগে নারায়ণ,
দারুক শৈলজা সহ, ঘোর ভূকম্পনে
সাবধান দৃঢ় পদে, লইয়া উভয়ে,
অর্দ্ধ মূর্চ্ছাগত, ভুজ-বন্ধনে হেলায়
অতিক্রমি সে ভীষণ বৃষ্টি, অন্ধকার।
দেখিলেন নারায়ণ, দাবানল মাঝে
পতঙ্গ পালের মত মরিছে পুড়িয়া
যদুকুল, আঘাতিয়া হায়! পরস্পরে,
দূরাগত গুপ্ত অস্ত্রে হইয়া আহত।
দেখিলেন যদুকুল উন্মত্ত সুরায়,
নাহি জ্ঞান আত্ম-দ্রোহ, ভৌতিক বিপ্লব,
গুপ্ত শত্রু-আক্রমণ!! কি দৃশ্য ভীষণ!—
জ্বলিছে শিবির শ্রেণী ব্যাপিয়া যোজন!
যাদবের অস্ত্র-ক্রীড়া, অসি-বিঘূর্ণন,
রক্ত বিদ্যুতনিভ—ঝলসি নয়ন!
সেই ঘাত, প্রতিঘাত! সেই রক্তপাত!
ভস্ম বৃষ্টি, ধাতু বৃষ্টি আগ্নেয়াস্ত্র মত!
ক্ষিপ্ত ভুজঙ্গের মত অস্ত্র বরিষণ
গুপ্ত-শত্রু-করোৎসৃষ্ট! ঘোর অন্ধকার!
ঘন ঘন ভূকম্পন! ঘোর গরজন,
উল্লম্ফন, জলধির! ভীষণ নির্ঘোষ
বসুধার মহাগর্ভে! শৃঙ্গে পর্ব্বতের

ভীমারাবে ভস্ম, ধাতু, অগ্নি বরিষণ!
যাদবের হাহাকার ভৌতিক নির্ঘোষে
নিমজ্জিত; যাদবের ভীষণ সে রণ
কাষ্ঠপুতুলের ক্রীড়া-অভিনয় মত
হইতেছে প্রকটিত অগ্নির আলোকে।
আছিল উৎসবে, নাহি অস্ত্র সকলের,
তীরজাত এরকায়, মুষলে মুষলে,
প্রহারিছে পরস্পরে, হইতেছে হত
নাহি জ্ঞান গুপ্ত শরে, নহে এরকায়।
স্থিরনেত্রে নারায়ণ রহিলা চাহিয়া
সে ভীষণ মহাদৃশ্য! ক্রমে ক্রমে হত
হইল যাদবকুল, স্নেহের আধার
পুত্র, পৌত্র, ভ্রাতা, বন্ধু। রথী মহারথী
ভারতের অদ্বিতীয় হইল নিহত
তস্করের গুপ্ত অস্ত্রে, অস্ত্রে আপনার,—
রৈবতক শৃঙ্গমালা পড়িল ভাঙ্গিয়া
একে একে যথা এই মহা ভূকম্পনে।
নিবে যথা প্রলয়াগ্নি ভীম পরাক্রমে
নিঃশেষিয়া আত্মতেজ, নিবিল তেমতি
আত্মঘাতী যদুকুল। ধীরে ধীরে মহা
শ্মশান-অনল মত শিবির-অনল
নিবিল; নিবিল সেই বিপ্লব ভীষণ।
নিবিল সে গিরিশৃঙ্গ, গৈরিক প্রবাহ,
ভস্ম বৃষ্টি, ধাতু বৃষ্টি, মহা ভূকম্পন,
মহাকম্প জলধির। মাতা বসুন্ধরা
নাচিয়া তাণ্ডব নৃত্যে, হাসিয়া ভীষণ

অনল গৈরিক স্রাবে মহা অট্ট হাসি,
গর্জ্জিয়া ভীষণ মন্দ্রে, নৃমুণ্ডমালিনী
মহাকালী, যদুকুল-শোণিতে ভূষিতা,
হইলেন শান্ত ধীর। ধীরে ভয়ঙ্করী
প্রভাসের মহানিশি হইল প্রভাত।
বীভৎস স্বপন অন্তে প্রকৃতি যেমতি
খুলিলেন ভীত আঁখি, প্রথম আলোকে
প্রভাসের চারিদিকে উঠিল ভাসিয়া
চিন্তাতীত প্রকৃতির চিত্র ভয়ঙ্কর!

চারিদিকে ভস্ম স্তরে রয়েছে পড়িয়া
কত জলজীব-শব, ধাতুপিণ্ড কত,
মহা শৈল খণ্ড সহ নানা অবয়বে।
ভীমাকৃতি শৈল-শৃঙ্গ অমিত বিক্রমে
উৎপাটিত, উৎক্ষেপিত, হইয়া তাড়িত
শুষ্ক পত্র রাশি মত ক্রোশ ক্রোশান্তরে,
স্থানে স্থানে জলে স্থলে রয়েছে প্রোথিত
ক্ষুদ্র খণ্ড-গিরিমত গর্ভে বসুধার।
   সুদূরস্থ রৈবতক পর্ব্বতমালায়
কি অচিন্ত্য মহাশক্তি কি অচিন্ত্য ক্রীড়া
করিয়াছে অঙ্গে অঙ্গে! মৃৎপিণ্ডে যথা
অর্থহীন লক্ষ্যহীন ক্রীড়া বালকের।
কোথায় গগনস্পর্শী শৃঙ্গ মেঘ-প্রভা
হইয়াছে অন্তর্হিত মহামেঘ মত;
কোথায় বা নব শৃঙ্গ উঠিয়া আকাশে
শোভিছে দিগন্তব্যাপী মহামেঘ মত
প্রসারিয়া শৈল বপু; গৈরিকের ধারা,

কোথা জলধারা, কোথা প্রপাতের মত,
শোভিতেছে অঙ্গে অঙ্গে ; কোথায় গহ্বর
হইয়াছে গিরি ; গিরি হয়েছে গহ্বর।
সম্মুখে যে দৃশ্য—হায় ! মানব-নয়ন
না পারে দেখিতে ; দৃশ্য না পারে সহিতে
মানব-হৃদয় হায় ! ছিল যেই খানে
ক্রোশব্যাপী যাদবের উৎসব শিবির,
রহিয়াছে ক্রোশব্যাপী যাদব-শ্মশান।
বর্ষিত ভস্মের স্তরে, ভস্মে শিবিরের
প্রধূমিত স্থানে স্থানে,— রয়েছে পড়িয়া
বিকৃত যাদব-শব, দগ্ধ, অস্ত্রাহত :
কেশবের পুত্র, পৌত্র, রক্ত, মাংস, প্রাণ,
ধাতু শৈলখণ্ড সহ, কোথায় বা পড়ি
ধাতু শৈলখণ্ডতলে, অনন্ত শয়নে।
প্রভাস উৎসবক্ষেত্র শবক্ষেত্র এবে
যাদবের, প্রভাসের মহা পারাবার
এবে হায় ! যাদবের শোক-পারাবার !
"এই কি করিলে হরি !"—কাঁদিয়া দারুক
কহিল চরণে পড়ি। শান্ত কণ্ঠে হরি
উত্তরিলা, শান্ত নেত্রে চাহি অবিচল
প্রভাত আকাশ, স্থির—"দারুক ! দারুক !—
যাদবের কুরুক্ষেত্র ! হয়েছে সাধিত
সাধুদের পরিত্রাণ, দুষ্কৃত বিনাশ ;
ধরাতলে ধর্ম্মরাজ্য হয়েছে স্থাপিত।
যুগ শেষ !– লীলা শেষ"——

উঠিল কাঁপিয়া

ধরাতল। "লীলা শেষ"—উঠিল গর্জ্জিয়া
মহাসিন্ধু। "লীলা শেষ"—হইল অঙ্কিত
সুনীল আকাশপটে অরুণ আভায়
সুশীতল সমুজ্জ্বল। লভিয়া উদ্ধার
"লীলা শেষ" মহাকণ্ঠে গাইল মানব।
"লীলা শেষ"—দুষ্কৃতের ভীষণ শ্মশান
মহাকণ্ঠে কুরুক্ষেত্র গাইল প্রভাস।
"লীলা শেষ"—পাদপদ্মে হইয়া মূর্চ্ছিত
পড়িল দারুক শোকে। "লীলা শেষ"—শৈল
পড়িতে মূর্চ্ছিতা পদে লইলেন হরি
আপন ত্রিদিব বক্ষে,—পূর্ণ শৈলজার
তপস্যা, জীবনব্রত কোমল কঠোর।

অষ্টম সর্গ।

—•—

মহাপ্রস্থান।

ভারতের মহাদিবা, মহাদিবা জগতের
হইল প্রভাত ধীরে; হইল প্রহর;
দ্বিতীয় প্রহর ধীরে; নাহি দিবাকর।—
ধূম্র ভস্ম আবরণে আবরিত নভঃস্থল,
অদৃশ্য মধ্যাহ্ন-রবি, অদৃশ্য অম্বর।
ধূম্র ভস্ম আবরণে আবরিত পারাবার
গর্জ্জিতেছে প্রভাসের ঘোরাল ধূম্রল;

আবরিত বেলা-ভূমি ধূম্র ভস্ম আবরণে,
আবরিত চরাচর—নিস্তব্ধ নিশ্চল।
শিলাখণ্ডে, ধাতুখণ্ডে,—ভূগর্ভজ, সমুদ্রজ,—
নানা জীবে, দ্রব্যে নানা, সমাচ্ছন্ন তীর
ভস্মাবৃত, সমাচ্ছন্ন প্রান্ত জলধির।
রহিয়া রহিয়া ধরা কাঁপিতেছে মৃদু, গুরু,
প্রকম্পন অবিরল, অথবা বিরল;
যেন ক্রীড়াশীল শিশু দোলাইছে ক্রীড়া-দোলা,
কভু ঘন, বহুক্ষণ কখন নিশ্চল।
মহাশক্তি ধূমাবতী গরজি জলধি-মন্দ্রে,
রহিয়া রহিয়া নৃত্য করিতেছে ভীমা,
ধ্বংস করি দিবাকর, ধ্বংস করি চরাচর,
ক্ষুদ্র বেলাখণ্ডে যেন করিয়াছে সীমা।
কি যেন ঘটনা ঘোর, কি যেন গভীর শোক,
ঘটিবে যুগান্তকারী বক্ষে বসুধার।
মানবের ইতিহাসে, মানবের মহাকাব্যে,
এক মহাসর্গে হবে সমাপ্তি প্রচার।
কি যেন ঘটনা ঘোর, কি যেন গভীর শোক,
আসন্ন, চাপিয়া বক্ষে নারী ধূমাবতী
পড়ে আছে দীর্ঘাকার, একটি উপলখণ্ডে,
পাষাণে পড়িয়া যেন পাষাণ-মূরতি।
তার ক্ষুদ্র ইতিহাসে, জীবনের ক্ষুদ্র কাব্যে,
আসন্ন, সমাপ্তি; আজি হৃদয় তাহার
ধূম্রল ঘোরাল ওই মহাপারাবার।
কি তরঙ্গ, কি উচ্ছ্বাস! হাহাকার, কি নিশ্বাস!
কি মন্থন, বিলোড়ন! ফাটিতেছে বুক!

শিলায় চাপিয়া বুক বামা অধোমুখ।
দুই ধারা নয়নের হইয়া শতেক ধারা
পড়িছে পাষাণ বাহি ভস্ম বালুকায়,
নীরব রমণীপ্রাণ কাঁদে উভরায়।
সে নীরব হাহাকারে, হৃদয়ের আর্দ্র তাপে
পড়িছে গলিয়া যেন কঠিন পাষাণ,—
কি শীতল শিলা, কিবা করুণানিদান!
আলিঙ্গিয়া শিখাখণ্ড রমণী চাপিছে বুক
কোমল কপোল বামা, দারুণ ব্যথায়
আবরিয়া শিলাখণ্ড শত গুচ্ছে কেশরাশি
পড়ি ভিজিতেছে, সেই ভস্ম বালুকায়
নাগ-সেনাপতি বেশে এখনো সজ্জিতা বামা,
পৃষ্ঠে তূণ, কটিবন্ধ, কটিবন্ধে অসি;
"কারু!—কে ডাকিল মৃদু, ধীরে শিলা-পার্শ্বে আসি,
কারুর উত্তপ্ত প্রাণে অমৃত বরষি?
"দাদা! দাদা!"—বলি কারু, উঠি উন্মাদিনী মত
পড়িল গলায় স্নেহ-বক্ষে বাসুকির।
উচ্ছ্বাসে ছুটিল বেগে চারি নেত্রে নীর।
"দাদা! দাদা! কহ দাদা! বড়ই আকুল প্রাণ,
পেয়েছ কি তুমি দাদা! তাঁর দরশন?
খুঁজিয়াছি সারাদিন, খুঁজিয়াছি বেলা-ভূমি;
উন্মাদিনী নিশা অন্তে দিবা উন্মাদিনী!—
খুঁজিয়াছি জল স্থলে উন্মাদিনী আমি।
যাইতে ছুটিয়া বেগে পড়িয়াছি ভস্মস্তরে,
পড়িয়াছি শিলাখণ্ডে হায়! কত বার,
ক্ষত দেহ, পাই নাই দরশন তাঁর।

পেয়েছ কি তুমি দাদা ?"
"পেয়েছি।"—নিশ্বাস ছাড়ি
বাসুকি ভগিনী সহ বসিল শিলায়।
"পেয়েছ ! কোথায় তিনি ? কেমন আছেন কহ ?
আছেন ত নিরাপদে ?"—
"বিপদ তাঁহায়
পারে কি ছুইতে ?—"ঘোর মহা সিন্ধু পানে,
দুজনে রহিল চাহি উচ্ছ্বসিত প্রাণে।

বাসুকি। পেয়েছি দর্শন কারু—বহু অন্বেষণ পরে
রজতের মহামূর্ত্তি দূর সিন্ধুতীরে
দেখিনু উপলাসনে, উপলে রাখিয়া পৃষ্ঠ,
কি মহিমা মহাবক্ষে, সমুন্নত শিরে !
অঙ্গ অবিচল, স্থির, নিমীলিত দুনয়ন,
কিবা সুপ্ত সিংহ-শোভা, নিদ্রিত গৌরব !
শৌর্য্যের ও সৌন্দর্য্যের মূরতি নীরব !
ধবল গিরির শৃঙ্গে মহামেঘ-ছায়া মত
পড়িয়াছে শোকছায়া বদনে গভীর,
কপোল গভীরাঙ্কিত শুষ্ক অশ্রুনীর।
শৈলখণ্ড-অন্তরালে লুকাইয়া দেখিতেছি
এই দিবা-অন্ধকারে সে রূপ মহান,
হইলেন নারায়ণ ধীরে অধিষ্ঠান।
হিমাদ্রির পাদমূলে বিলোড়িত ঝটিকায়,—
সানুদেশে চিরশান্তি অবিচল স্থির ;
ভীষণ বিপ্লবে ঘোর নির্ম্মূলিত যদুকুল,—
যদুনাথ শান্ত, স্থির, মূরতি গম্ভীর,
মহাশোকে নেত্রে নাহি বিন্দু অশ্রুনীর।

'আর্য্য !—দেব !'—নারায়ণ ডাকিলেন স্থিরকণ্ঠে,
কি যেন সঙ্গীত আহা ! শুনিলাম কাণে ;
সেই নিশা ভয়ঙ্করী, এই ভয়ঙ্কর দিবা,—
কি শান্তি-আলোক-সুধা প্রবেশিল প্রাণে !
...ব মেলি নেত্র, কহিলেন—'হায় ! হরি !
এই কি করিলে ভাই ! জগতে অতুল
যদুকুল, হরিকুল, করিলে নির্ম্মূল !'

স্থিরকণ্ঠে নারায়ণ, উত্তরিলা—'হারকুল
হয়নি নির্ম্মূল, নাহি হইবে কখন,
যুগে যুগে হবে তার নিয়তি নূতন।
নব ক্ষেত্রে, নব ভাবে, যুগে যুগে আবির্ভূত
হবে তুমি, হব আমি, হইবে এমন
নব কুরুক্ষেত্র, নব প্রভাস ভীষণ !'
এরূপে দুষ্কৃত ধ্বংস যুগে যুগে অঙ্কে অঙ্কে
হবে বসুধার ; হবে সুকৃত উদ্ধার,
নব যমুনার কূলে, নব ধর্ম্ম-বৃক্ষ-মূলে,
নব বৃন্দাবনে, শুনি নব গীত আর।'
কহিলা রোহিণীসুত—'হরি ! এই লীলা তব
না পারি বুঝিতে ; প্রাণ আকুল আমার।
পুত্র-শোকে, পৌত্র-শোকে, ভ্রাতৃ-শোকে, বন্ধু-শোকে,
বিদীর্ণ হৃদয় মম ; করিলে সংহার
যদুকুল, এক জন নাহি বুঝি আর !
কিবা দিবা,—কি উৎসব ! কিবা নিশি, কি বিপ্লব !
যাদবের, বসুধার, হায় কি ভীষণ
অন্তর-বিগ্রহ ! ঘোর আত্ম-বিনাশন !
কি আনন্দে নিরানন্দ ! কি সুখে কি মহাশোক !

কি মঙ্গলে অমঙ্গল, অমৃতে গরল!
হইল কি রঙ্গালয় কি শ্মশানে পরিণত!
জ্বলিল নিকুঞ্জবনে কিবা দাবানল!
পুত্র গেল, পৌত্র গেল, ভ্রাতা গেল, বন্ধু গেল,
গেল হরিকুল, হরি! একি লীলা হায়!
ফুল গেল, ফল গেল, পত্র গেল, শাখা গেল,
ক্ষত দগ্ধ বৃক্ষ কেন রাখিলে আমায়?"
'রাখিয়াছি'— উত্তরিলা স্থিরকণ্ঠে নারায়ণ—
'রাখিয়াছি, তব. লীলা হয় নাই শেষ
ভারতে তোমার মাত্র লীলার উন্মেষ।
এ বৈরাগ্য, এই বল, এ সারল্য, এ গরল,
এ প্রেম-সাগর, এই বাড়ব আধার,
বৃন্দাবনে, মথুরায়, কুরুক্ষেত্রে, দ্বারকায়,
করিয়াছে ক্ষুদ্র ক্রীড়া; মহাক্রীড়া তার
নব ক্ষেত্রে, নব ভাবে, হইবে প্রচার।
ভারত জগত নহে। নহে এই পারাবার
এই জগতের সীমা। অন্য পারে তার
আছে মহারাজ্য চয় অনন্ত বিস্তার।
আছে বহু পারাবার, আছে বহু হিমাচল,
আছে বহু নদনদী কানন কান্তার;
আছে বহু নর জাতি, নানা বর্ণ, নানা বেশ,
মুষ্টিমেয় এই নর তুলনায় তার!
মুষ্টিমেয় এ ভারত তুলনায় পৃথিবীর,
মানবের তুলনায় এ ভারতবাসী।
পৃথিবীর মহাদেহ, মহাদেহ মানবের,
এরূপে রেখেছে ঢাকি ধূম্র ভস্মরাশি।

জ্ঞানের আলোক নাই ; শিল্পের সৌন্দর্য্য নাই ;
নাহি বাণিজ্যের সুখ ; ধর্ম্মের সান্ত্বনা :
পৃথিবীর দেহ বন, মানবের দেহ জড়,—
অহল্যা পাষাণ নহে কবির কল্পনা!
ভারত ভূতলে স্বর্গ, দেবতা ভারতবাসী
তুলনায়, পৃথিবীর ভারত-হৃদয়,
মানবের মহাশির, জ্ঞানের আলয়।
যেই শক্তি এ হৃদয়ে, যেই ধর্ম্ম এই শিরে,
হইল স্থাপিত, সুখে করিয়া গ্রহণ
সে শক্তি-বৈজয়ন্তী, সেই পুণ্য ধর্ম্মালোক
যাও দেশ দেশান্তরে, পতিতপাবন!
সৌরাষ্ট্রের উপকূলে সজ্জিত অর্ণবযান
আছে বহু দাঁড়াইয়া তব প্রতীক্ষায় ;
যাদবের পুণ্যভাগ, আছে সসজ্জিত তীরে,
কর দেব! মহাযাত্রা, উদ্ধার ধরায়!
এ ভারতে আমাদের এই যুগ-কার্য্য শেষ ;
সপ্ত দিবা নিশি পরে হবে অন্তর্হিত
দ্বারকা সমুদ্র-গর্ভে জল-বিম্ব মত।
কর দেব! মহাযাত্রা! পাষাণী অহল্যা মত,
তব পদ পরশনে লভিবে উদ্ধার
পৃথিবী, মানব জাতি ; মরু হবে জনপদ ;
হবে বন মহারাজ্য সম অমরার।
পশু সম নর নারী হবে দেবী দেবোপম,
যাবে শোক, পাবে পুত্র কন্যা সংখ্যাতীত ;
জগতের ইতিহাসে, পুণ্য পাত্রে জগতের,
হবে-হরিকুল, হরিকুলেশ পূজিত।

যাও দেব ! সিন্ধুগর্ভে নৃত্যশীল তরীমালা
অনন্ত কেতন করে ডাকিছে তোমায় ;
করিতেছে আবাহন নৃত্যশীল পারাবার
পূরবে, পশ্চিমে, নর উদ্ধার আশায়
কর দেব ! মহাযাত্রা ! উদ্ধার ধরায় !'
নারায়ণ নয়নেতে বহিতেছে দুই ধারা,
প্রেম-বিগলিত ধারা বক্ষে করুণার,
আত্মহারা বলরাম পড়িলা গলায়, বক্ষে,
আলিঙ্গিলা নীলাম্বর আলোক দিবার।
'দীনবন্ধো ! দয়াময় ! পতিতপাবন !'—
হলধর উচ্চ রবে কহিলা কাঁদিয়া—
"চলিলাম নারায়ণ ! বরষিয়া তব প্রেম
মানব মরুতে, নাম গাইয়া গাইয়া
মানবের মহাবনে, অধর্ম্মের অন্ধকারে,
পতিত মানব জাতি করিব উদ্ধার,
কৃষ্ণনাম ! হরিনাম করিব প্রচার।
ওই—'হরে কৃষ্ণ ! হরে !'—গাইতেছে পারাবার,
'হরে ! কৃষ্ণ ! হরে ! কৃষ্ণ !'—গায় তীরে তীরে
অনন্ত অজ্ঞাত দেশ অনন্ত অজ্ঞাত নর,
অনন্ত অজ্ঞাত-কণ্ঠে ভাসি অশ্রুনীরে।
গাইতেছে ভবিষ্যত—'হরে। কৃষ্ণ ! হরে ! কৃষ্ণ !
গাইতেছে মহাকাল—'হরে ! কৃষ্ণ ! হরে !'
গাইতেছে মহাবিশ্ব, মহাগ্রহ উপগ্রহ,
অনন্ত প্লাবিয়া প্রেমে—'কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! হরে !'
"কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! হরে ! হরে !—গর্জ্জিয়া নাচিয়া রাম
চলিলেন প্রেমানন্দে ছাড়ি বনমালী,

দুই বাহু ঊর্দ্ধে তুলি দিয়া করতালি !
আমাদের অন্বেষণে, ভ্রমিতেছে নাগ-সৈন্য
"জয় নাগরাজ !"—বলি করি উত্তোলন
শত অসি ; আক্রমিল শুনিয়া গর্জ্জন।
"তিষ্ঠ !"—বলি নারায়ণ প্রসারি দক্ষিণ কর
রহিলেন স্থিরনেত্রে চাহি সৈন্য পানে,
চিত্রাঙ্কিত মহামূর্ত্তি যেন মহাধ্যানে।
কারু ! বনচিত্র মত দাঁড়াইল নাগ সৈন্য,
উত্তোলিত শত অসি হইল অচল।
কহিলেন নারায়ণ—"বাসুকির কার্য্য শেষ।
বৎসগণ ! তোমাদের নব কার্য্যস্থল
সিন্ধুর অপর পারে সুন্দর শীতল।
শ্বেতবর্ণ মহাবল ওই নব নাগপতি,
কেতন সহস্র ফণা সহ সুদর্শন
উড়াইয়া, সিন্ধুমুখে কর তার অনুসার,
গাই আর্য্য অনার্য্যের গীত সম্মিলন"
দেখিলাম নাগ সৈন্য সজ্জিত প্রাচীর মত,
নারায়ণ-পাদপদ্মে পড়িল ভাঙ্গিয়া।
উঠিয়া, জলধি মন্দ্রে গাই—"হরে ! কৃষ্ণ ! হরে !"
অনুসরি হলায়ুধ চলিল ছুটিয়া।
কি মূর্ত্তি মহিমাময় চাহি আকাশের পানে
কপোলে যুগল ধারা, করুণা শীতল !
মূর্ত্তি নর-নারায়ণ ! চাহিনু পড়িতে পদে
ছুটিয়া, চরণ হায় ! হইল অচল।
হায় মহাপাপী আমি ! ঘুরিল মস্তক মম
কি মাদকে দেহ মম হইল পূরিত,

পড়িলাম ধরাতলে হইয়া মূর্চ্ছিত।
উচ্ছ্বসিত নাগপতি ভ্রমিতে লাগিলা ধীরে
অন্যমনে অধোমুখে মূরতি গম্ভীর।
চাহি সিন্ধু পানে কারু দুই নেত্র স্থির।
বাসুকি। মূর্চ্ছা অন্তে হায়! আর সেই মূর্ত্তি মহিমার
নাহি দেখিলাম, হায়! দেখিব কি আর?
দেখিবে কি পুণ্যালোক পাপ অন্ধকার?
দেখিব কি?—দেখিতেছি। দেখিতেছি নিরন্তর
এই ঘোর অন্ধকারে স্নিগ্ধ নীলোজ্জ্বল
সেই রূপ মনোহর, চন্দ্রদীপ্ত নীলাম্বর,
সেই প্রেমময় রূপ পবিত্র শীতল।
ভীত বীর ধনঞ্জয় শুনিয়াছি এই রূপে
দেখেছিল মহাবিশ্ব; করুণা-নিলয়
আমি দেখিতেছি রূপ আজি বিশ্বময়!
ওই দেখ সেই রূপ! চল কারু! চল যাই,
পড়ি গিয়া দুই জন চরণে তাঁহার!
যাইছে বাসুকি ছুটি, কহিল ধরিয়া কারু
স্থিরকণ্ঠে—"দাদা! ভ্রান্তি কর পরিহার!
আমাদের আজীবন-আশা আজি পরিপূর্ণ!
যেই আশা-বৃক্ষ-মূলে সেচিলাম জল
আজীবন, ফলিয়াছে আজি তার ফল।
কুরুক্ষেত্রে কুরুকুল, যদুকুল প্রভাসেতে,
করিয়াছে আত্মহত্যা। হইল উদ্ধার
এত দিনে নাগরাজ্য, সাম্রাজ্য তোমার।
পূর্ণ জীবনের ব্রত! পরিপূর্ণ মনোরথ।
চল যাই নাগপুরে, বসাব তোমায়

সিংহাসনে, পরাইব মুকুট মাথায়।
জীবনের আশা-স্বপ্ন করি চরিতার্থ সুখে,
ভারতে অনার্য্য রাজ্য করিব প্রচার।
পাবে কারু এত দিনে সীমা আকাঙ্ক্ষার।”
“কালি এ প্রভাস-ক্ষেত্রে অনার্য্যের যেই রাজ্য
হয়েছে স্থাপিত”—কহে বাসুকি বিহ্বল—
“তার কাছে তুচ্ছ রাজ্য, তুচ্ছ ধরাতল।
আমরা বনের পশু, কোথা পাব হেন রাজ্য ?
কোথা পাব সেই জ্ঞান, সে প্রেম অতুল ?
কারু রে! এখন তোর গেল না কি ভুল ?
রাতুল চরণদ্বয়, যে রাজ্য মহিমাময়,
চল যাই সেই রাজ্য করি অধিকার!
এমন সন্তাপ-হর রাজ্য এই ধরাতলে
আমরা পণ্ডিত নাহি পাইব রে আর!”
কাঁদিতেছে নাগরাজ! অন্তর-রোদন কারু
নিবারি পাষাণী মত কহিল আবার—
“ভুলিলে কি দাদা! কৃষ্ণ শত্রু যে তোমার।”
বাসুকি। শত্রু কৃষ্ণ!—না না, কারু! হায়! এ জীবনে আমি
ভাবি নাহি শত্রু কৃষ্ণ,—ভাবিব কেমনে ?
পিতার রক্ষিত, শিশু, আমার কৈশোর বন্ধু,
রণে, বনে, মিশিয়াছি জীবনে জীবনে!
দেখিয়াছি আকৈশোর তাহার সে দেব-রূপ—
পীতাম্বর, বনমালা, শিখিপুচ্ছ শিরে।
শুনিয়াছি দেবকণ্ঠ, নর-করুণার গীত,
বনের পাষাণ আমি ভাসি অশ্রুনীরে।
করিয়াছি আলিঙ্গন দেব-দেহ লীলাময়,—

কি অমৃতে প্রাণ মম হইত শীতল ;
বৃন্দাবনে, নাগপুরে, যমুনায়, সিন্ধুবক্ষে,
করিয়াছি কত ক্রীড়া আনন্দে বিহ্বল !
রাখি মুখ অঙ্কে মম ঘুমাইত শিশু মত,
আমি জননীর মত দেখিতাম মুখ,
কভু গলা জড়াইয়া অংসে মম রাখি মুখ,
সখ্য প্রেমে পরিপূর্ণ করিত এ বুক।
কখন নীলাব্জ-নেত্রে চাহিয়া অনন্ত পানে
দেখিত, কহিত ধর্ম্ম-সাম্রাজ্য-স্বপন ;
যাহার ছায়ায় আর্য্য অনার্য্যের এই স্বর্গ,
কালি করিলাম স্বর্গ প্রভাসে দর্শন।
বসিয়া চরণতলে, লয়ে বক্ষে পা দুখানি,
পাইতাম কি যে শান্তি, কি নির্ম্মল সুখ !
নর নারী প্রেম নহে মধুর শীতল তত,
যেই প্রেমে কভু মম উছলিত বুক।
অনার্য্যের রাজ্য-আশা, সুভদ্রার দেবী-রূপ,
কি কুক্ষণে এ হৃদয়ে হইল সঞ্চার !
জ্বালাইল অভিমান, সে অনলে ঘৃতাহুতি
দিল পাপী ঋষি, স্বর্গ হরিল আমার।
জ্বলি এই অভিমানে দেখি নাই সেই রূপ
এত কাল, যাই নাই নিকটে তাহার।
জানিতাম, দেখি যদি সেই দেব অংশুমালী,
অভিমান কুজ্ঝটিকা রবে না আমার।
দেখিলাম দ্বৈপায়ন আশ্রমে সে দেবরূপ,
দেখিলাম কালি আর্য্য অনার্য্য উৎসবে ;
দেখিলাম আজি আর্য্য অনার্য্যের মহাযাত্রা,

দেব-নেত্রে প্রেম-অশ্রু বহিতে নীরবে।
চাহিলাম পা দুখানি আবার লইতে বুকে,
পাপী আমি চলিল না চরণ আমার।
শত্রু মম দুরাচার সেই জরৎকারু ঋষি,
করিয়াছে কলুষিত পাপ পারাবার
আমাদের এ জীবন।—কি ভীষণ গত নিশি!
অন্ধকার, অগ্নি বৃষ্টি, ঘন ভূকম্পন।
কি ভীষণ আত্মহত্যা! নর-হত্যা নিরমম
গুপ্ত শরে! মহাপাপ,—সে ত নহে রণ।
পাপিষ্ঠের কি কৌশল। ভূগর্ভস্থ অগ্নি-শিখা,
মূর্খ আমি, ভেবেছিনু তার যোগানল।
বুঝি সেই রুদ্র ঋল, ছল নাম জরৎকারু,
সন্ধি, পরিণয়, হায়! সকলই ছল।

কারু। সকলই ছল দাদা! দুর্ব্বাসা তাহার নাম!
ছলনা সে রুদ্র মূর্ত্তি। হইয়া শিক্ষিত
শুনিয়াছি শিষ্য এক সাজি সেই রুদ্র বেশে,
অন্তরালে দুরাচার ছিল লুক্কায়িত!
খুলি নাই এত দিন এই প্রবঞ্চনা আমি,
খুলিলে এ ষড়যন্ত্র রহিত না আর,
হইত না অনার্য্যের সাম্রাজ্য উদ্ধার।

"দুর্ব্বাসা! দুর্ব্বাসা ঋষি!"—বাসুকি গর্জ্জিল ক্রোধে
"অভিশাপ-ব্যবসায়ী সেই দুরাচার।
ঋষিকুলে ধূমকেতু। ছলিল বনের পশু
এইরূপে।—প্রতিশোধ লইব তাহার।
নারায়ণ!—প্রায়শ্চিত্ত চরণে তোমার!"
ক্ষুব্ধ শার্দ্দূলের মত ছুটিল বাসুকি ক্রোধে,

মুহূর্ত্তেকে লুকাইল দিবা-অন্ধকারে।
রাখিয়া শিলায় বুক, রাখিয়া শিলায় মুখ,
ভাসিতে লাগিল কারু নয়ন-আসারে!

নবম সর্গ।

—:*:—

বীণা পূর্ণতান।

এইরূপে কিছুক্ষণ,—কে বলিবে কতক্ষণ?
এক ক্ষণে কত শোক কারুর হৃদয়ে!
এক ক্ষণে কত অশ্রু দুনয়নে বয়!
রাখিয়া পাষাণে বুক, রাখিয়া পাষাণে মুখ,
কারু ত পাষাণে প্রাণ করেছে অর্পণ।
গলিল না এ পাষাণ, কারুর নয়ন-জলে,
গলিল না সে পাষাণ একটী জীবন।
উঠি কিছুক্ষণ পরে, চাহি ধূমাবৃত ধরা,
কহিতে লাগিল কারু—"হায়! মা তোমার
বিদীর্ণ হইয়া বুক গত নিশি যেই রূপে
ছুটিল গৈরিক ধূম্র ভস্ম অনিবার,
অনিবার সেই রূপে, নহে এক নিশি, মাত!
একটী রমণী জন্ম, বিদীর্ণ হৃদয়
প্রেমের গৈরিক ধারা, অভিমান ধূম্ররাশি,
ঢালিয়াছে নিরাশার ভস্ম অগ্নিময়।

এই বরিষণ পরে আজি মা ! তোমার মত
ধূম্র ভস্মে সমাচ্ছন্ন হৃদয় আমার ;
কাঁপিছে তোমার মত হায় ! বারংবার !
কেন এ কম্পন ঘন, হা হত হৃদয় মম ?”
—চাপি দুই করে বামা বক্ষ আপনার—
“ওই সিন্ধোচ্ছ্বাস সম, কি উচ্ছ্বাস হৃদয়েতে
অজ্ঞাত ? অজ্ঞাত হায় ! এ কি হাহাকার ?
কৌশলে ক্ষত্রিয় জাতি হইয়াছে আত্মঘাতী,
ভারতে অনার্য্য রাজ্য হ’য়েছে স্থাপিত,
এই আনন্দের দিনে, কেন নিরানন্দ মনে ?
কেন প্রাণ এইরূপে হতেছে কম্পিত ?
কি যেন বিষাদে ঘোর, এই দিবসের মত,
করেছে হৃদয় মম ঘোর অন্ধকার,
কি যেন ঘটিবে আজি মহাশোক ঘোরতর,
করি বজ্রাহত ক্ষুদ্র হৃদয় আমার।
মরুতপ্ত হাহাকার কি যেন কহিছে কাণে—
‘দেখ্ ঘোরতর দিবা ! সিন্ধু ঘোরতর !
দেখ্ কিবা ঘোরতর রমণী-অন্তর !
ঘোরতরে ঘোরতর মিলাইয়া, মিশাইয়া,—
জীবনের ঘোর গীত ঘোরতর তানে,
দে রে ঝাঁপ !—নাহি শক্তি রমণীর প্রাণে ?’
আছে শক্তি,—দিব ঝাঁপ। কুশলে আছেন তিনি
শুনিলাম,—মনে আর নাহি মনস্তাপ।
একবার নিরখিব আমার সর্ব্বস্ব ধন,—
এত নহে নারী-জন্ম—ঘোর অভিশাপ !
শুনিয়াছি আজীবন শুনিলাম ভ্রাতৃমুখে,—

তুমি নারায়ণ, তুমি পতিতপাবন।
না জানি কি নারায়ণ, পতিতপাবন কিবা,
এই জানি—তুমি মম জীবন মরণ!
তুমি নয়নের আভা, তুমি রসনার সুধা,
তুমি মম শ্রবণের সঙ্গীত কেবল!
তুমি মম চির সুখ, তুমি মম চির দুঃখ,
সুখ দুঃখ মন্থনের অমৃত শীতল!
ধরার সৌন্দর্য্য শ্রেষ্ঠ, ধরার আলোক শ্রেষ্ঠ,
সুধা শ্রেষ্ঠ এ ধরার, পিপাসা যাহার,
সে কেমনে ঘোর দিনে, এই ঘোর সিন্ধু বক্ষে,
বিসর্জ্জিবে এই ঘোর জীবন তাহার?
নিরখিয়া সে সৌন্দর্য্য, নিরখিয়া সে আলোক,
নাথ! সেই রূপ-সুধা নেত্রে করি পান,
জীবন সৌন্দর্য্যময়, জীবন আলোকময়,
জীবন সে সুধাময়, করিবে প্রদান—
সুধাময়ে সুধা—পূর্ণ কর মনস্কাম!"
ছুটিল রমণী বেগে, উচ্ছ্বাসে উন্মত্ত বালা,
দেখিল অদূরে,—নিম্ব নিবিড় ছায়ায়,
আলোকিয়া অন্ধকার ওকি মূর্ত্তি মহিমার!
নিমীলিত নেত্র, যোগ-আসনে শিলায়!
অবলম্বি মহাবৃক্ষ, সমুন্নত মহাবপু,
প্রসন্ন বদন, দেহ অচঞ্চল স্থির,
স্থাপিত মূরতি যেন মহা সমাধির।
যোগিবেশ রাজর্ষির; নিমজ্জিত মহাধ্যানে;
পশ্চাতে ধূম্রল ব্যোম শোভে মহাপট।
পদতলে মহাদেবী শোভে সিন্ধুতট।

নীরব, নিস্পন্দ, ঘোর, স্তব্ধ বিশ্ব চরাচর ;
কেবল অনন্ত সিন্ধু মহাস্তুতি গীত
গাইতেছে মহাকণ্ঠে গাম্ভীর্য্য-পূরিত।
এক পল অপলক নেত্রে নিরখিল কারু
মহাযোগী মহাদেব ! মুহূর্ত্তেক পর
হইল সে মূর্ত্তি, দৃশ্য, কিবা রূপান্তর !
নিরখিল নাগপুর, নাগপুরে সরোবর,
চারু সরোবর-তটে কিশোর সুন্দর !
সজ্জিত মৃগয়া বেশে,—সজ্জিতা যেমতি কারু—
মদনমোহনরূপ প্রাণমুগ্ধকর।
কি সৌন্দর্য্য ! কি মহিমা ! কিবা বীর্য্য ! কি গরিমা !
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম দেহ, নবীন নিথর।
নবীন নীরদ অঙ্গে প্রতিভা বিদ্যুত রঙ্গে
খেলিতেছে, কি তরঙ্গ-লীলা করুণার !
কিশোরী কারুর প্রাণে কি নবীন সুখ-স্বপ্ন
জাগিল, করিল কিবা অমৃত সঞ্চার !
বাপীতটে উপবনে, নদীবক্ষে, গৃহকক্ষে,
কাননের অঙ্কে অঙ্কে, হ'ল অভিনীত
সেই-স্বপ্ন-নাটকের কত অঙ্ক মনোহর,
অঙ্কে অঙ্কে কি গর্ভাঙ্ক অমৃত পূরিত !
শেষ অঙ্ক—প্রত্যাখ্যান ! সেই ঘোর অপমান
সেই প্রতিজ্ঞা ! মরুময় একটী জীবন !
মুহূর্ত্তেক দাঁড়াইয়া সমস্ত জীবন কারু
দেখিল, যাপিল কারু হায় ! সেইক্ষণ।
প্রত্যাখ্যান !—সে প্রতিজ্ঞা !—গর্জ্জিয়া উঠিল জ্বলি
নির্ব্বাপিতপ্রায় সেই নারী অভিমান।

ছুটিল কাকুর শর,—হায়! উন্মাদিনী কাকু!—
শোকেতে উন্মাদ কবি, করুণানিদান!
ক্ষমিও তাহারে, প্রেমময় ভগবান!
যেই পদ কোকনদ, পূজে ভক্ত প্রেমময়
সুকোমল ভক্তি-পুষ্পে, প্রেম-অশ্রু জলে,
ভক্তদের মরমের সেই মর্ম্ম স্থলে,
কেমনে পাষাণ প্রাণে—না, না, পারিব না নাথ!
দেখ বুক ভাসিতেছে শোক-অশ্রু-নীরে!—
পড়িয়াছে সেই শর তোমার ভক্তের বুকে,
পড়িবে ভক্তের বুকে যুগযুগান্তর,
নিবিবে না এই ব্যথা, যুগ যুগান্তরে!
যুগে যুগে প্রাণনাথ। কবির হৃদয় মত
বিদীর্ণ হইয়া শরে ভক্তের হৃদয়,
এরূপে ধারায় শত, বহিবে হৃদয়-রক্ত,
ঝরিবে ধারায় শত অশ্রু শোকময়।
এরূপে আমার মত উচ্ছ্বাসে লইয়া বুকে
প্রেমময় শিশু পুত্র, পত্নী প্রেমময়ী,
কাঁদিয়াছে কত কবি, কাঁদিবে কতই আর
যুগে যুগে!—এ গভীর শোক কালজয়ী!
কাঁদিবেক যুগে যুগে কত নর কত নারী,
কবির নয়নজলে অশ্রু মিশাইয়া,
মম পত্নী পুত্র মত আকুল হইয়া।
নিতি নিতি প্রাণনাথ! ভকতের অভিমান,
যুগে যুগে মানবের নিষ্ঠুরতা আর,
করিবে কি এইরূপে ক্ষত দেহ সুকোমল,
জড় ব্যাধে ক্ষত মৃগশিশু সুকুমার?

যুগে যুগে এইরূপে না হইলে রক্তপাত,
হায়! নাথ! মানবের রক্ত কলুষিত
হবে না কি পবিত্রিত? গলিবে না পাপ শিলা?
হইবে না অধর্ম্মের অগ্নি নির্ব্বাপিত?
হইবে না ধর্ম্মের কি সাম্রাজ্য স্থাপিত?
নারায়ণ মেলি নেত্র—"কারু!"—সুপ্রসন্নমুখে
ডাকিলেন, সেই স্বর করুণা, শীতল।
পশিল কারুর প্রাণে, সে করুণা, সেই সুধা,
নিবিল সে অভিমান, সেই দাবানল।
"পাইয়াছ বহু দুঃখ, এস বক্ষে প্রেমময়ি!
উভয়ের লীলা শেষ, চল শান্তধাম!"
কহিলেন প্রেমপূর্ণ কণ্ঠে ভগবান।
"প্রাণনাথ!"—উন্মাদিনী পড়িল কাঁদিয়া বক্ষে,
জগতের সুশীতল সেই শান্তিধাম!
পরিতৃপ্ত প্রেম, কারু পূর্ণ মনস্কাম।
প্রেমে পরিপূর্ণ ধরা, গগন প্রেমেতে ভরা,
প্রেমামৃতে ভাসিতেছে বিশ্বচরাচর;
অনন্ত আলোকরাশি, অনন্ত সঙ্গীতে ভাসি,
উঠিতেছে,—কি সৌরভ! কি স্বর্গ সুন্দর!
সেই স্বর্গ মুগ্ধ প্রাণে, চাহিয়া চাহিয়া কারু,
করিতে করিতে সেই প্রেমামৃত পান,
মুদিল নয়ন ধীরে,—বীণা পূর্ণতান!
"কারু! কারু! কি করিলি!"—কাঁদি উচ্চে নাগরাজ
দূর হ'তে নিরখিয়া আসিলা ছুটিয়া।
"কারু! কারু! কি করিলি! হায়! কি করিলে হরি!"
পড়িলা চরণ তলে মূর্চ্ছিত হইয়া।

মুহূর্ত্ত মূর্চ্ছান্ত পরে, বাসুকি উন্মত্ত শোকে,
মুহূর্ত্তেকে সেই শর করি উৎপাটন
হানিল আপন বক্ষে, হানিতেছে পুনর্ব্বার,
কাড়িয়া লইয়া শর বেগে নারায়ণ,
করিলেন মহাসিন্ধু-গর্ভে বিসর্জ্জন।
বিনা মহাপারাবার, সেই মহা রক্ত আর
কে করিবে প্রক্ষালন, করিবে ধারণ?
রক্ত নারায়ণ!—মহা সিন্ধু নারায়ণ!
হরির চরণ-ক্ষত ভক্তের হৃদয়-ক্ষতে,
বাসুকি সে পাদপদ্ম, করিল ধারণ,—
কি মিলন পতিত ও পতিতপাবন!
কি মিলন অঙ্গে অঙ্গে, রক্তে রক্তে কি মিলন!
প্রেমে প্রেমে কি মিলন—ভক্ত ভগবান!
কিবা মহাবিনিময়! কিবা দান প্রতিদান!
এই মহাদান, এই মহা প্রতিদান,
যুগে যুগে মানবের মহা পরিত্রাণ।
এইরূপে রক্তে রক্তে, মাংসে মাংসে এইরূপে,
সিন্ধু-অঙ্গে মিশি জল-বিন্দু কলুষিত,
হয় বিন্দু পূর্ণকাম, হয় পবিত্রিত!
অশ্রুধারা দুনয়নে বহিতেছে দরদর
সেই ক্ষত সম্মিলনে; করি বিগলিত
সে অশ্রুতে পাদপদ্ম, পতিতপাবনী গঙ্গা
হইতেছে বাসুকির বক্ষে প্রবাহিত।
বাসুকি অধীর শোকে, বাসুকি অধীর প্রেমে,
প্রেম-শোক-সম্মিলনে অধীর হইয়া,
"হায়! কি করিলে হরি!—ক্ষম মুগ্ধ বালিকায়!"—

কাতরে শিশুর মত কহিলা কাঁদিয়া।
কণ্ঠ জড়াইয়া কারু, অংসোপরে রাখি মুখ,
কৌস্তভের মালা যেন বক্ষে সুশোভিত;
বাম করে ধরি তারে, রাখিয়া দক্ষিণ কর
নাগরাজ শিরে, প্রেম-অশ্রু-বিগলিত
প্রশান্ত প্রসন্ন মুখে কহিলেন নারায়ণ,—
"নাগরাজ! বৃথা শোক কর পরিহার!
যে জন যে ভাবে চায়, সে ভাবে আমাকে পায়,
স্ব ভাবে মানব করে মর্ম অনুসার।
ভ্রাতা ভগ্নী দুই জন, চাহিয়াছ শত্রুভাবে,
পাইয়াছ শত্রুভাবে আজি দুইজন;
আমাদের লীলা শেষ, পূর্ণ এই যুগ-ব্রত,—
ধরাতলে ধর্ম্মরাজ্য হয়েছে স্থাপন।"
"হায়! হরি! দুইজন"—বাসুকি কহিলা খেদে—
"কেন হইলাম শত্রু, চরণ কণ্টক?
করিলাম এ জীবন ভীষণ নরক?
মানব যে পাদপদ্ম পূজিয়াছে, পূজিতেছে,
পূজিবে অনন্তকাল, পুষ্পে সুকোমল;
মানব যে হরিনাম, আনন্দে করিয়া গান,
করিয়াছে, করিতেছে, প্রাণ সুশীতল;
আমরা সে পাদপদ্ম পূজি নাহি একদিন,
গাই নাই একদিন সেই হরিনাম,
আমরা সে পদাম্বুজে করিলাম হায়! নাথ!—
এই দেখ বাসুকির ফাটিতেছে প্রাণ!
আমরা তোমাকে শত্রু কেন ভাবিলাম?"
"ইহাও আমার লীলা!"—কহিলা যোগস্থ হরি

বাসুকির সর্ব্ব অঙ্গ উঠিল শিহরি।
কহিলা কাতরে—"হায়! এ কি লীলা হরি!
ভ্রাতা ভগ্নী দুইজন করিলাম সমর্পণ
যৌবন প্রভাতে এই দুইটি জীবন,
নারায়ণ! কেন নাহি করিলে গ্রহণ?
এই বনফুলে স্থান কেন করিলে না দান?
—হায়! অকরুণ হরি!—ক্ষুদ্র দূর্ব্বাদল
পায় স্থান তব পদে,—পতিতপাবন তুমি!—
পাইল না কেন কারু বাসুকি কেবল?
জগত পূজিছে পদ, জগত গাইছে নাম,
কি স্বর্গ প্রভাসে হায়! কালি দেখিলাম!
কেবল বাসুকি কারু না পূজিল সেই পদ!
না গাইল সুমধুর সেই হরিনাম!
না পাইল সুধাময় সেই স্বর্গে স্থান!
কারু বাসুকিরে হায়! না করিলে শত্রু তব,
বনের পতঙ্গ নাহি করিলে দাহিত
দাবানলে, ধর্ম্মরাজ্য হ'ত না স্থাপিত?"
"নাগরাজ! শত্রুমিত্র"—কহিলেন নারায়ণ
যোগস্থ ঈষদ হাসি—"কে বল কাহার?
আমি জগতের, এই জগত আমার!
ওই দেখ পারাবার—কি মহাশক্তির ক্রীড়া!
কি শক্তিতে মহাসিন্ধু দেখ বিধূনিত!
ওই দেখ কি তরঙ্গ! দেখ কি তরঙ্গ-ভঙ্গ!
কি তরঙ্গে তটভূমি আহত কম্পিত!
করি সংঘর্ষণে ফেনপুঞ্জ উদ্গিরিত!
জলরাশি মুহূর্ত্তেক না পারে থাকিতে স্থির

স্রোতোবলে,—স্রোত তবে শত্রু কি তাহার ?
তরঙ্গে তরঙ্গাঘাত, তটভূমে প্রতিঘাত,
উর্ম্মির কি শত্রু উর্ম্মি, শত্রু কি বেলার ?
এই ঘাত প্রতিঘাত আমার শক্তির ক্রীড়া,
এই ঘাত প্রতিঘাতে হতেছে স্থজিত
পলে পলে বসুন্ধরা, হইতেছে পলে পলে
প্রবাল মুকুতা রাশি স্থজিত বর্দ্ধিত।
এই ঘাত প্রতিঘাত চেতন জগতে আছে,
মানব-জগতে আছে এ ক্রীড়া আমার;
এই ঘাত প্রতিঘাত,—প্রভাস ও কুরুক্ষেত্র !

এ নহে তোমার ক্রীড়া, নহে দুর্ব্বাসার।
মানব মঙ্গল তটে অধর্ম্ম তরঙ্গায়িত—
পতিত ক্ষত্রিয় জাতি—হইয়া প্রহত,
প্রভাস ও কুরুক্ষেত্রে হইয়াছে হত।
এই ঘাত প্রতিঘাতে মানবের কি মঙ্গল
দেখিতেছ নাগরাজ হয়েছে সাধিত,
ধরাতলে ধর্ম্মরাজ্য হয়েছে স্থাপিত।
দুর্ব্বাসার ষড়যন্ত্র, আর্য্য অনার্য্যের সন্ধি,—
আমার নীতির ক্রীড়া নহে দুর্ব্বাসার;
তুমিও দুর্ব্বাসা মাত্র, নিমিত্ত তাহার।
আমি এই মহাবিশ্ব, এই বিশ্ব মম রূপ,
শক্তির নীতির মম মহা আবর্ত্তন !
এই আবর্ত্তন—সৃষ্টি, স্থিতি বিনাশন।"
এ কি কথা ! এ কি মূর্ত্তি !—বাসুকি বিস্ময়ে উঠি,
দেখিতে লাগিলা মূর্ত্তি বিস্ময়ে বিহ্বল !
শুনিতে লাগিলা কাণে সে কথা কেবল !

দেখিতে ধরিতে মূর্ত্তি নাহি পারে নর-নেত্র,
নাহি পারে সেই কথা করিতে ধারণ!
সে মূর্ত্তি অনন্ত, ভাষা অনন্ত-নিস্বন!
বাসুকি বিস্ময়ে কহে করযোড়ে—“জগন্নাথ!
অনন্ত শকতি তব! তবে কেন হায়!
ভ্রাতা ভগ্নী দুইজনে এ লীলা-শিখায়
পোড়াইলে অকরুণ? দাস অনুদাস করি
রাখিলে না কেন নাথ! চরণ-ছায়ায়?”
“নর-জন্ম, নরদেহ”—উত্তরিলা নারায়ণ—
“যুগে যুগে এই রূপে করিয়া গ্রহণ,
কত কুরুক্ষেত্র, কতই প্রভাস সহি,
সহি আমি কত নর-দুঃখ নিরমম!
কে আমার সুখী বল?—মাতা, পিতা, পত্নী, পুত্র?
সুখী কি যশোদা, নন্দ, ব্রজাঙ্গনাগণ?
আমার বাসুকি, শক্র, কেমনে হইবে সুখী?
কে আছে এমন মম ভক্ত প্রিয়তম?
মানব অধর্ম্ম ফলে জ্বলে যেই দুঃখানলে,
জ্বলি সেই দুঃখানলে সহ নিজ গণ,
না করিলে ধর্ম্ম রাজ্য ভূতলে স্থাপন;
আদর্শ, দর্পণ মত, না ধরিলে নর-চক্ষে,
দেখিতে বুঝিতে নাহি পারে নারায়ণ
ক্ষুদ্র নর; নাহি হয় উদ্ধার সাধন!
এইরূপে যুগে যুগে সহিত স্বগণ মম
—কেহ শক্র, কেহ মিত্র,—লভিয়া জনম
সাধুদের পরিত্রাণ, বিনাশ দুষ্কৃতদের,
সাধি আমি, করি ধর্ম্ম-সাম্রাজ্য স্থাপন।।

ত্রেতার রাবণ, আর দ্বাপরের দুর্য্যোধন,
দুর্ব্বাসা, বাসুকি,—অঙ্গ একই লীলার ;
ত্রেতার সে শূর্পণখা, দ্বাপরের জরৎকারু, ।
রূপে মুগ্ধা ভকতির প্রতিমা আমার !
এস সখে ! এস বুকে ! বড়ই কাতর প্রাণ
তব প্রেম-পিপাসায়, গাও হরিনাম !
এস বুকে ! আমাদের লীলা অবসান।"
নারায়ণ দুই নেত্রে বহিতেছে প্রেমধারা,
ঝরিছে কারুর বক্ষে ধারা অবিরাম,
দেখিলা বাসুকি,—প্রেমপূর্ণ ভগবান !
"কারু।"—উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ডাকিলা বাসুকি উচ্চে,
ডাকিল জলধি "কারু" কণ্ঠে উচ্চতর,
ডাকিল গগন "কারু" কণ্ঠে ঘোরতর।
ডাকিল সে ঘোর দিবা, সে প্রকৃতি ঘোরতরা
ডাকিল, ডাকিল উচ্চে বিশ্ব চরাচর,—
শুনিল না কারু, কারু দিল না উত্তর।
সেই প্রেমময় বক্ষে, সেই প্রেমময় মুখ
চাহি প্রেমানন্দ কারু নেত্রে দরদর
বহিয়াছে,—কারু কই দিল না উত্তর !
নিরখিলা নাগরাজ,—হইয়াছে প্রেমানন্দে
প্রেমসিন্ধু বক্ষে প্রেম-বিশ্ব সম্মিলিত !—
পড়িলা চরণতলে হইয়া মূর্চ্ছিত।

দশম সর্গ।

—:*:—

প্রায়শ্চিত্ত।

"—ও কি হাহাকার!
সুভদ্রে! সুভদ্রে! শুন ও কি হাহাকার!"—
ছুটিয়াছে উল্কা মত নৈশ অন্ধকারে
দ্বারকা-হস্তিনাপথে তুরঙ্গ যুগল,
মহাবনে ক্ষুরক্ষেপে তুলি প্রতিধ্বনি
নৈশ নীরবতা বক্ষে। ছুটিয়াছে বেগে,—
দিবা, রাত্রি, মহাবন, নগর প্রান্তর,
নাহি জ্ঞান অশ্বের কি অশ্ব-আরোহীর;
নাহি শ্রান্তি, নাহি নিদ্রা, নাহি তৃষ্ণা ক্ষুধা,
কত দিবা, কত রাত্রি। অশ্ব মুহুর্মুহু
পরিবরতিয়া পান্থশালায় কেবল
সাম্রাজ্যের স্থানে স্থানে চক্ষুর নিমিষে,
ছুটিয়াছে অশ্বারোহী,—পলকে প্রত্যেক,
অশ্বের প্রত্যেক পদ-বিক্ষেপে ত্বরিত,
করিছে নির্ভর যেন জীবন মরণ;
কি যেন ঘটনা মহা করিছে নির্ভর
অশ্বের গতিতে দ্রুত। ছুটিয়াছে অশ্ব
চাপি দন্তে দন্তালিকা ফেনিল বদনে
স্বেদসিক্ত; স্বেদসিক্ত আরোহিযুগল।
ছুটিয়াছে ঊর্দ্ধশ্বাসে অশ্বপাদুকায়
কানন-কঙ্কর পথে করি বিকীর্ণিত

অগ্নিকণা ঘন ঘন, ঘন বজ্রাঘাতে।
অকস্মাৎ নিজ অশ্ব করিয়া সংযত
কহিলেন ধনঞ্জয়—"ও কি হাহাকার!
সুভদ্রে! সুভদ্রে! শুন ও কি হাহাকার!"
নীরব নিশীথ! বন নিস্তব্ধ নীরব!
নীরব সুভদ্রা দেবী! নিশ্চল নীরব
সংযত যুগল অশ্ব! প্রকৃতি নীরব!
বুঝিলেন সব্যসাচী ভ্রান্তি আপনার।
আবার ছুটিল অশ্ব, পরাভবি বেগে
গাণ্ডীবীর গাণ্ডীবের শর ক্ষিপ্রগতি।
অতিক্রমি বহু পথ ফাল্গুনি আবার
সংযত করিয়া অশ্ব কহিলা কাতরে—
"সখে! সখে!—ও কে ডাকে? শুন ভদ্রা! শুন!
ও যে কণ্ঠ কেশবের!" নীরব কানন;
নীরব সুভদ্রা স্থির অশ্বে আপনার।
কেবল অশ্বের ক্ষুর বিক্ষেপ-নির্ঘোষে
ডাকিছে বিকল কণ্ঠে বনপক্ষী কোথা
ভগ্ননিদ্র; ভগ্ননিদ্রা কুরঙ্গ-শশক
ছুটিতেছে; করিতেছে শার্দ্দূল জৃম্ভণ।
আবার বুঝিলা ভ্রান্তি। ছুটিল আবার
যুগল তরঙ্গ বেগে ঘোর ঝড়বেগে।
অতিক্রমি বহু দূর আবার পার্থের
দাঁড়াইল অশ্ব, পার্থ কহিলা আবার—
"না, না, নহে ভ্রান্তি ভদ্রা! 'সখে! সখে!—বলি
কি করুণ কণ্ঠে শুন ডাকিছেন হরি!—
আসিতেছে দাস তব।"—করি কষাঘাত

ছুটিলেন ধনঞ্জয়, ছুটিলেন দেবী
উর্দ্ধশ্বাসে বহু দূর,—ভ্রান্তি পুনর্ব্বার!
না পারে চলিতে আর তুরঙ্গ যুগল,
বহিতেছে অঙ্গে স্বেদধারা দর দর,
বহিতেছে দর দর অঙ্গে আরোহীর।
চলিতেছে ধীরে অশ্ব ফেলি ঘন শ্বাস,
বঙ্কিম গ্রীবায় বল্গা করিয়া চর্ব্বিত
মুহুর্ম্মুহু, মুহুর্মুহু করিয়া আহত
বক্ষঃস্থল মুখে গর্ব্বে, করিয়া সতেজ
মুহুর্মুহু নাসারন্ধ্র, বিস্তৃত কুঞ্চিত।
নিবিড় তমিস্রা নিশি; নিবিড় কানন।
অশ্বপৃষ্ঠে পার্থ ভদ্রা উভয় নীরব,
অন্যমনা, বিষাদিত, চিন্তা-নিমজ্জিত।
ধীরে চলিতেছে অশ্ব। কহিলা ফাল্গুনি—
"কি নিবিড় অন্ধকার! কি ঘোরা রজনী!
কি ভীষণ মহাবন আবৃত তিমিরে!
কি যেন কি মহাশোক এই জগতের
হইয়াছে সংঘটিত! করেছে জগত
বিচূর্ণিত, পরিণত ঘোর অন্ধকারে;
করিয়াছে চন্দ্র সূর্য্য তারা নির্ব্বাপিত!
কি যেন কি মহাশোকে হৃদয়-জগত
বিচূর্ণিত; পরিণত নিবিড় তিমিরে;
জীবনের চন্দ্র সূর্য্য তারা নির্ব্বাপিত।
অন্ধকার! অন্ধকার! নিবিড় গভীর
অন্ধকার এ জগত! হৃদয় জগত
অন্ধকার, অন্ধকার নিবিড় গভীর!

শূন্য ! শূন্য ! সব শূন্য ! শূন্য এ জগত !
হৃদয়-জগত শূন্য ! শূন্য তুমি, আমি।
নাহি শক্তি দেহে মম, নাহি মম দেহ !
নাহি হৃদয়ের শক্তি, স্থিতি হৃদয়ের !
শক্তিহীন, দেহহীন, হৃদয়বিহীন,
কি যেন রয়েছি আমি !—স্বপন ! স্বপন ! ছায়া !
অন্ধকার ! অন্ধকার !"

শান্ত কণ্ঠে স্থির
কহিলেন ভদ্রাদেবী—"শোকে অভিভূত
হইও না এই রূপে ! হায় ! যাদবের
অনাথ শিশুর, আর নারী অনাথার
রয়েছে রক্ষণভার করেতে তোমার।"
"শোক ভদ্রা !"—শোকরুদ্ধ কণ্ঠে ধনঞ্জয়
কহিলেন—"শোক ভদ্রা ! শোক দুই বার
পাইয়াছি এ জীবনে। দুই বজ্রাঘাতে
বিদীর্ণ, বিচূর্ণ, শোকে হয়েছে হৃদয়
দুই বার, দুই ক্ষেত্রে। কুরুক্ষেত্রে—কোলে
জননীর মহাশয্যা সে মহাশিশুর !
আশ্রমে,—সে মহাশয্যা সাধ্বী বালিকার
মাতৃকোলে, এ পাষাণ পিতৃপদতলে !
আমাদের পদতলে করি সমর্পণ
প্রসূতি প্রসূত সদ্য শিশু নিরাশ্রয়,
কহিল কাঁদিয়া—'শেষ পূজা উত্তরার
লও বাবা ! লও মাতা ! এ পবিত্র ফুলে,
উত্তরার অশ্রুজলে। শোধিল উত্তরা
আজি তোমাদের ঋণ অনন্ত স্নেহের।

ওই ডাকিতেছে অভি বসিয়া বিমানে।
আনন্দে বিদায় দেও! জন্মজন্মান্তরে
শ্বশুর শাশুড়ী, যেন জনক জননী,
পাই তোমাদের,—বর দেও উত্তরায়!"
দুই করে, দুটি ফুলে, আলিঙ্গি চরণ
দুজনের, লুটাইয়া পড়িল চরণে।
কাঁদি উচ্চে তুলি বক্ষে অর্পিলাম যবে
তব অঙ্কে, দেখিলাম কি হাসি অধরে!
দেখিলাম অনাথার সে প্রথম হাসি!—
কি আনন্দ! কি মাধুরী চির-নিদ্রাগতা!"
কাঁদিয়াছি চিরদিন সেই দুই শোকে!
কাঁদিয়াছি প্রতিদিন। সে শোক-স্মৃতিতে
গোবিন্দের মহাবাক্য, গীতার সান্ত্বনা,
বীরত্বের সহিষ্ণুতা, দৃঢ়তা কঠোর,
গিয়াছে ভাসিয়া। প্লাবি ধৈর্য্যের বন্ধন,
উড়াইয়া তৃণবৎ ধৈর্য্য ঐরাবত,
বহিয়াছে শোকগঙ্গা পতিতপাবনী।
কিন্তু এই শোক, ভদ্রা! নহে সেইরূপ!
প্রভাস-উৎসব কথা শুনি জনরবে
আসিতেছিলাম, পথে সংবাদ ভীষণ
শুনি যেই দিন হায়! দারুকের মুখে
মিলিলাম আত্মহারা মথুরার পথে
তব সনে,—সেই দিন!—কত দিন আজি
নাহি জ্ঞান; মহাকাল এ মহাশোকের
—প্রলয়ের—নাহি সাধ্য করে পরিমাণ।
সে দিন হইতে এক অশ্রুবিন্দু মম

উঠেনি হৃদয়-উৎসে, বহেনি নয়নে
হয়েছে হৃদয় শুষ্ক, শুষ্ক দুনয়ন।
হইয়াছে মরুভূমি হৃদয়, নয়ন,
পরিপূর্ণ হাহাকারে, নিবিড় তিমিরে!
সেই ঘোর অন্ধকারে, ঘোর কৃষ্ণপটে
জীবনের,—হইয়াছে বিলুপ্ত তিমিরে
দৃশ্যাবলী জীবনের,—ভাসিছে কেবল
সেই দুই মহাশোক। তাহাতেও আজি
উঠিছে না হৃদয়েতে একটি উচ্ছ্বাস,
বহিছে না এক বিন্দু অশ্রু দুনয়নে।
সেই শোক-দৃশ্য আজি নিষ্প্রভ মলিন
কি অজ্ঞাত মহাশোকে! সুভদ্রে! সুভদ্রে!
হউক যাদব ধ্বংস, ধ্বংস চরাচর,
নাহি দুঃখ। নারায়ণ—প্রাণসখা মম—
আছেন কুশলে বল? বল একবার
পারিব সে পদাম্বুজ ধরিতে হৃদয়ে,
জুড়াইতে হৃদয়ের এই হাহাকার?"
"এ কি ভ্রান্তি প্রাণনাথ!"—উত্তরিলা দেবী
শান্ত স্থিরকণ্ঠে—"যিনি মঙ্গল-নিদান
জগতের, যিনি সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল,
সম্ভবে কি অমঙ্গল তাঁহার কখন?
মঙ্গল ও অমঙ্গল, সুখ দুঃখ আর,
জন্ম মৃত্যু, শোক শান্তি, লীলা মাত্র তাঁর;—
অনন্ত মঙ্গলপূর্ণ নিয়তি তাঁহার।
না থাকিলে অমঙ্গল, মঙ্গল কখন
বুঝিত কি ক্ষুদ্র নর? বুঝিত কি সুখ,

না থাকিত দুঃখ যদি ? মৃত্যু না থাকিলে,
পারিত বহিতে কি এ জীবনের ভার ?
আবির্ভাব তিরোভাব স্বয়ং তাঁহার
না থাকিলে, ভক্তি স্রোত বহিত উজান,
ধর্ম্মের উন্নতি-চক্র হইত অচল ?
হইত অচল জীব-চক্র উন্নতির
দুঃখ, মৃত্যু, অমঙ্গল না থাকিত যদি।
কর শোক পরিহার ! নিয়তি তাঁহার
সুমঙ্গল বিশ্বব্যাপী পালিবেন তিনি,
সুদর্শন নীতি-চক্রে পালিবে জগত,
পালিব আমরা ক্ষুদ্র চক্রে আপনার
সেই মহাচক্র-গর্ভে। ততোধিক আর
ক্ষুদ্র নর আমাদের নাহি অধিকার।

যত দিন ভক্তি প্রেম থাকিবে হৃদয়ে,
তাঁহার চরণাম্বুজ প্রেম সরোবরে
ভাসিবে সতত। প্রেমে চির অধিষ্ঠান—
প্রেম বৃন্দাবনে প্রেমময় ভগবান।"

একটি শীতল ধারা হৃদয় মরুতে
বহিল পার্থের ধীরে ; এক ক্ষীণালোক
উঠিল জ্বলিয়া দূরে ঘোর অন্ধকারে
সেই মহামরুভূমে। সেই ক্ষীণালোকে
দেখিলেন ধনঞ্জয় ভাবি আবর্ত্তন
নিয়তি চক্রের ক্ষুদ্র অস্ফুট রেখায়।
চলিলা নীরবে ধীরে। উঠিল ভাসিয়া,
নিশান্তে নীরবে ধীরে অস্ফুট আলোক
জ্যোস্নাচ্ছন্ন শশাঙ্কের। উঠিল ভাসিয়া,

কানন নীরবে ধীরে বিভীষিকাময়,
পার্থ ভবিষ্যত মত। উঠিল ভাসিয়া,
কাননের পথ মত, কর্ত্তব্যের পথ
অস্ফুট আলোকে ধীরে। ছুটিল আবার
তুরঙ্গ যুগল বেগে। করি অতিক্রম
কানন, প্রভাতে অশ্ব প্রভাস-প্রান্তরে
প্রবেশিল, ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল তখন।
ভস্মাচ্ছন্ন দিবালোক ধীরে ধীরে ধীরে
উঠিল ভাসিয়া। ধীরে উঠিল ভাসিয়া'
শিলা-ভস্ম-সমাচ্ছন্ন প্রভাস-প্রান্তর।
"ও কি শব্দ!"—দুই অশ্ব থামিল পলকে।
নহে ভ্রান্তি এই বার,—বিকট চীৎকার
পৈশাচিক, শুনিলেন ভদ্রাও এবার।
ছুটিল যুগল অশ্ব শব্দ লক্ষ্য করি
যেন এই ক্ষিপ্র শর লক্ষ্যে অন্যতম।
দেখিলেন ঋষি এক পড়িয়া ভূতলে
করিছে বিকৃত মুখে বিকট চীৎকার,
বক্ষে শিলাখণ্ড এক। চক্ষুর নিমিষে
অবতরি দুইজন, নিমিষে চক্ষুর
শিলাখণ্ড সব্যসাচী করিলা অন্তর।
"ওই আসে! ওই আসে!—কোথা যাব আমি?—
যায় প্রাণ পিপাসায়!" করিছে চীৎকার
চাহি শূন্য পানে ঋষি বিকৃত বদনে।
ছুটিলেন ভদ্রা দেবী; দূর নিরঝরে
প্রক্ষালিয়া ক্ষিপ্রকরে গৈরিক অঞ্চল,
আনিয়া শীতল বারি ঢালিয়া বদনে

ঋষির পিপাসাতুর। করি জল পান,
দ্বিগুণ বিকৃত মুখ করি মহাক্রোধে,
গর্জ্জিলা—"কে তোরা পাপী? সুভদ্রা, অর্জ্জুন!
দূর হও পাপীয়সি, ওরে দুরাচার!
চিনিস্ না দুর্ব্বাসায়, অভিশাপে যার
কুরুকুল যদুকুল হইল ভস্মিত?
দূর হও! দূর হও! পিপাসা! পিপাসা!"
লইয়া মস্তক অঙ্কে, বারি সুশীতল
আবার দিলেন ভদ্রা বিকৃত বদনে।
উঠিল চীৎকার পুনঃ—ওরে পাপীয়সি!
দূর হও! দূর হও ওরে দুরাচার!
এখনি করিব ভস্ম অভিশাপানলে!"
কহিলেন ভদ্রা দেবী কণ্ঠে করুণার—
"কর ভস্ম আমাদের ইচ্ছা হয়, দেব!
কেমনে যাইব চলি, ফেলিয়া তোমায়
এমন সময়ে হায়! দেও অনুমতি
সেবিব চরণ প্রভু! হও শান্ত স্থির,
পাবে শান্তি, সুমধুর গাও কৃষ্ণনাম!"
জতুস্তূপে অগ্নি যেন হইল পতিত,
গর্জ্জিল দুর্ব্বাসা ক্রোধে হইয়া অধীর—
"সে পাপীর ভগ্নী, ভগ্নীপতি সে পাপীর,
সেবিবে।—পবিত্র-অঙ্গ ছুঁইবে আমার!
দূর হও! দূর হও! মহর্ষি দুর্ব্বাসা
গাইবে সে পাপনাম!"—ঘোর অট্টহাসি
হাসিলা ঘৃণায় ঋষি প্রেতপুর মত—
"যোগানল যাঁর করি বিদীর্ণ ভূধর,

হ'য়ে উদ্গিরিত, কুল করিল ভস্মিত
যে পাপীর,দাবানলে পঙ্গপাল মত,
গাইবে তাহার নাম মহর্ষি দুর্ব্বাসা ?
দূর হও দুশ্চারিণি ! হব শান্ত, স্থির,
বল্ সেই যোগানলে হইয়াছে পাপী
ভস্মীভূত, কিংবা হত অস্ত্রে অনার্য্যের,
ঘৃণিত পশুর মত। বল্ ফলিয়াছে
দুর্ব্বাসার অভিশাপ,— বেদ-ব্রাহ্মণের
মহাশত্রু মহাপাপী মরেছে পুড়িয়া
বেদ-যজ্ঞানলে মম, গিয়াছে নরকে ;
তাহার সে ধর্ম্মরাজ্য গেছে রসাতলে !
শিলাখণ্ড পড়ি বুকে সে ঘোর নিশীথে
করেছে অচল দেহ। বড় দুঃখ মনে
নাহি পারিলাম হায় ! করিতে প্রদান
পূর্ণযজ্ঞে শেষাহুতি, করি পদাঘাত
পতিত শত্রুর শিরে শত শত বার।
ওই আসে ! ওই আসে !"—বিকৃত চীৎকার
আবার করিল ঋষি। —"জ্বলন্ত ভীষণ
নারকীর সুদর্শন-চক্র নরকের !
কোথা যাব ! কোথা যাব ! একে, একে, একে
নৃপতি বৈদিকদেব-পূজকের কাছে
গেলাম, আশ্রয় কেহ দিল না আমায়
ধর্ম্মভ্রষ্ট দুরাচার। সকলের করে
অর্ঘ্য সে পাপীর তরে ! সকলের মুখে
পাপনাম ! পাপনামে পূর্ণ ধরাতল !
ওই আসে ! ওই আসে !"—দুর্ব্বাসা আবার

করিল চীৎকার ঘোর,—"দিল না আশ্রয়
বিধর্ম্মী বৈদিক দেব-পূজক সকল।
অধর্ম্মে পূর্ণিত ধরা। যাইব বৈদিক
দেবতাগণের কাছে, মাগিব আশ্রয়।
যাব ওই চন্দ্রলোকে। এ কি চন্দ্রালোক!
কোথা শশধর? কোথা রোহিণী তাহার?
কোথায় জোৎস্না? এ কি! অদ্ভুত! অদ্ভুত!
এ চন্দ্রলোকের চন্দ্র শোভিছে পৃথিবী
কি সুন্দর! কি শীতল উৎস জোৎস্নার!
শিলাময়—শিলাময়—কি মরু বন্ধুর
এই চন্দ্রলোক! তপ্ত জ্বলন্ত আতপে
শৈলের উপরে শৈল, শৈল তদুপরে,—
বিদীর্ণ, উদ্গীর্ণ, মৃত আগ্নেয় ভূধর,
অনন্ত, অসংখ্য। নাহি চিহ্ন উদ্ভিজ্জের!
নাহি জীব! নাহি জল! কেবল প্রখর
মধ্যাহ্ন নৈদাঘ সূর্য্যে তপ্ত শৈল মরু!
যায় প্রাণ! কোথা যাব!—পিপাসা! পিপাসা!"
সিক্ত অঞ্চলের বারি সুভদ্রা আবার
ঢালিলেন। ধনঞ্জয় বিস্মিত, স্তম্ভিত,
দাঁড়াইয়া পার্শ্বে করি গাণ্ডীবে নির্ভর,
বীরবেশে, আত্মহারা। বসিয়া সুভদ্রা
উদাসিনী, মুক্তকেশী, গৈরিক বসনা,
অঙ্কে দুর্ব্বাসার শির,—মূর্ত্তি করুণার।
"ওই আসে! ওই আসে!"—ছাড়িল চীৎকার
আবার দুর্ব্বাসা ভয়ে। প্রলাপের মত
কহিতে লাগিল পুনঃ—"যাব সূর্য্যলোকে।

কোথায় আদিত্য জবা-কুসুম-সঙ্কাশ,
ধ্বান্তারি সর্ব্বপাপঘ্ন, দেব দিবাকর?
কোথায় তাহার রথ? সপ্তাশ্ব কোথায়?
সারথি অরুণ কোথা?—অনল! অনল!
ভয়ঙ্কর—ঘোরতর—অনল কেবল!
অনন্ত, অতল, অগ্নি-মহাপারাবার!
পর্ব্বতপ্রতিম অগ্নি-তরঙ্গ ভীষণ
ছুটিতেছে, গর্জ্জিতেছে! তরঙ্গে তরঙ্গে
কি আঘাত, প্রতিঘাত, বিরাট-গর্জ্জন,
অনলের অনিবার! শত বজ্রনাদ,
বালকের করতালি তুলনায় তার।
কি শক্তিতে চিন্তাতীত অগ্নি পারাবার
বিলোড়িত, বিমথিত, ঘোর আবর্ত্তিত!
কি অসংখ্য অগ্নিস্তম্ভ, অনন্ত গোলক,
অনল পৃথিবীরাশি শত সংখ্যাতীত,
হইতেছে মহাশূন্যে অগ্নি-প্রস্রবণে
উৎক্ষেপিত অনিবার কি বেগে ভীষণ,
কত ঊর্দ্ধে! হইতেছে উদ্ভিন্ন, বিদীর্ণ,
কি বিরাট মহাশব্দে! ভীম বজ্র-মন্দ্রে
সংখ্যাতীত পরিপূর্ণ করি মহাব্যোম
অনিবার! চিন্তাতীত, কল্পনা-অতীত,
ভয়ঙ্কর, ভয়ঙ্কর, দৃশ্য ভয়ঙ্কর!
কেমনে জলন্ত সেই অনলমণ্ডলে
যাইব! শিশুর ক্রীড়া-গোলক কেবল
তুলনায় ভূমণ্ডল! মধ্যাহ্ন উত্তাপ
নিদাঘের, তুলনায় তুষার শীতল!

কি উত্তাপ ! কি উত্তাপ ! যাইছে পুড়িয়া
রক্ত, মাংস, অস্থি, মজ্জা !—কি জ্বালা ! পিপাসা !”
যন্ত্রণায় দুর্ব্বাসার বিকৃত-বদন
হইল বিকৃততর। যন্ত্রণায় ঋষি
করিতেছে ছট্‌ফট্‌ ; তীব্র যন্ত্রণায়
রক্ত, মাংস, অস্থি, মজ্জা, হতেছে মথিত
ঘন ঘন। সুভদ্রার করুণ হৃদয়
গলিল, বহিল অশ্রু করুণ নয়নে,—
করুণার প্রেম-গঙ্গা সন্তাপ হারিণী।
কহিলেন—“পাবে শান্তি, লও কৃষ্ণনাম।”
“দূর হও ! দূর হও !”—দুর্ব্বাসা আবার
যন্ত্রণা-জড়িত কণ্ঠে করিল চীৎকার।—
“আবার, আবার, সেই নাম পাপিষ্ঠের
কলুষিত করি কর্ণ।—আবার, আবার,
শ্রবণ হইতে প্রাণ করিয়া দাহিত
তরল অনল-স্রোতে ! ওরে পাপীয়সি !
ব্যভিচারী দুরাচার হীন গোরক্ষক,
লইবে তাহার নাম মহর্ষি দুর্ব্বাসা ?
লইবে পবিত্র স্বর্গ নাম নরকের ?
পারিজাত পূতিগন্ধ মাখিবে সৌরভে ?
আসুক সে বিধর্ম্মার চক্র বিভীষণ,
খণ্ড খণ্ড দুর্ব্বাসার করুক এ দেহ,
করুক বিদগ্ধ, ভস্ম ; তথাপি—তথাপি—
তথাপি দুর্ব্বাসা নাহি লইবে সে নাম !
ওই আসে ! ওই আসে ! কি চক্র ভীষণ !
কি ঘূর্ণন ! কি গর্জ্জন। অগ্নি-উদ্গিরণ !

কোথা যাব! কোথা যাব! দেবতা বেদের
কোথা ইন্দ্র! কোথা রুদ্র! কোথায় বরুণ!
অশ্বিনীযুগল কোথা!—অদ্ভুত! অদ্ভুত!
অনন্ত— অনন্ত—নীলগর্ভে অনন্তের
ভ্রমিছে অনন্ত সূর্য্য, অনল গোলক,
অন্তহীন, দুনিরীক্ষ্য! কি চক্রে মহান,
সূর্য্যে সূর্য্যে মহাশূন্যে করিয়া বেষ্টন,
ভ্রমিতেছে কত গ্রহ! বেষ্টি গ্রহগণ
কত উপগ্রহ, কত চন্দ্র ভূমণ্ডল,—
ভ্রমিতেছে অনিবার! গতি আবর্ত্তন
মানব-কল্পনাতীত! সৌর রাজ্য কত,—
কত সৌর পরিবার,—শত, সংখ্যাতীত—
ভ্রমিতেছে নীলিমায় মহা অনন্তের,—
অশ্রান্ত, অভ্রান্ত! কিবা অনন্ত ভ্রমণ
অন্তরীক্ষে, কি অনন্ত চক্রে সংখ্যাতীত,
কি শক্তিতে, কি নীতিতে, অচিন্ত্য কৌশলে!

অসংখ্য জগত! সেই জগতে জগতে
কতই বিচিত্র সৃষ্টি! জড় চেতনের
কি বিচিত্র রঙ্গভূমি! জগতে জগতে
সৃষ্টি কত রূপান্তর! জগতে জগতে
রূপান্তর জীবে জীবে, উদ্ভিজ্জে উদ্ভিজ্জে,
কি বিচিত্র! কি বিচিত্র, জগতে জগতে,
উন্নতি ও অবনতি জড় চেতনের!
ভূর্লোক হইতে ওই পুণ্য দেবলোক,
—শোভাময়! শান্তিময়! চিদানন্দময়!—
মানব হইতে ওই পুণ্যাত্মা সকল,

—শোভাময়! শান্তিময়! চিদানন্দময়!—
কি অদ্ভুত বিবর্ত্তন জড় চেতনের
কত স্তরে, অধে, ঊর্দ্ধে, কি নীতি-শৃঙ্খলে,
দৃষ্টাতীত, জ্ঞানাতীত,! কই দেবলোকে
কোথা ব্রহ্মা, কোথা বিষ্ণু, কোথায় বা শিব,
বৈদিক দেবতাগণ? কাহার আশ্রয়
লইব? আশ্রয় আজি কে দিবে আমায়?
"ওই আসে! ওই আসে!"—আবার চীৎকার
করিল দুর্ব্বাসা ভয়ে। চাহি অধোমুখে
জননী করুণাময়ী, করিলেন ধীরে
সঞ্চালিত দুই কর,—দুই কোকনদ—
ঋষির বিকৃত ভীত বদন উপরে।
"কি অদ্ভুত! কি অদ্ভুত!"—বদন-বিকৃতি
ঋষির হইল দূর। কহিল উচ্ছ্বাসে—
"কি অদ্ভুত! কি অদ্ভুত নীলমণিময়
কি বিরাট দেববপু! বিরাট পুরুষ!
দ্যুলোক, ভূর্লোক, ওই অনন্ত আকাশ
ব্যাপিয়াছে সেই দেহ! গ্রহ, উপগ্রহ,
চন্দ্র, সূর্য্য, ধূমকেতু, অসংখ্য মণ্ডল
ভ্রমিতেছে চক্রে চক্রে সে বিরাট দেহে,
আদিহীন, অন্তহীন। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে,
মহাপারাবারে ক্ষুদ্র জলবিম্ব মত,
জন্মি জন্মি সেই দেহে হতেছে বিলীন!
এই কি সে বিশ্বরূপ? পরম নিধান
এ বিশ্বের, নিত্য, সত্য, অব্যয়, অক্ষয়?
অনন্ত সৃষ্টির স্রষ্টা? নিয়ন্তা নীতির?

এ অনন্ত কৌশলের অনন্ত-কৌশলী ?
এক, অদ্বিতীয় ? ভিন্ন শকতির নাম
বৈদিক দেবতাগণ ? অদ্ভুত ! অদ্ভুত !
সত্য কি এ নবধর্ম্ম ? সত্য বিশ্বরূপ ?
সত্য না না, মানিবে না, দুর্ব্বাসা কখন !"
আবার সুভদ্রা দেবী সঞ্চারিলা করু।।
"কি অদ্ভুত ! কি অদ্ভুত !"—বিস্ময়ে দুর্ব্বাসা
কহিতে লাগিল—"সেই বিরাট পুরুষ
হইল কি রূপান্তর ! কিরীটি-শোভিত,
শঙ্খচক্রধর, নীলকান্তি মনোহর,
রবিকর পীতাম্বর, মহাযোগীধর !
হে রাজর্ষি ! মহাদেব ! কে তুমি ? কে তুমি ?
দিবে না, দিবে না, না না, দুর্ব্বাসা তোমায়
পশিতে হৃদয়ে তার। পশিলে হৃদয়ে ?
কে তুমি ? কে তুমি ? কৃ—ষ্ণ ?"

সুমধুর নাম

গাইলেন ভদ্রা পার্থ। সুমধুর নাম
উচ্চারিতে ধীরে সেই বিকৃত বদন
হইল প্রশান্ত, স্থির। পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত !
পাপমুক্ত ঋষি চলি গেলা শান্তিধাম।

একাদশ সর্গ ।

—*—

স্বর্গারোহণ ।

এখন ঘোরাল দিবা, নাহি যেন দিবাকর।
কি যেন শোকের ছায়া ছাইয়াছে চরাচর।
কি যেন শোকের গীত গাইতেছে পারাবার।
কি যেন সমুদ্রানিল বহিতেছে হাহাকার।
শিলা-ভস্ম-সমাচ্ছন্ন, বিস্তীর্ণ শ্মশানপ্রায়,
বিস্তীর্ণ প্রভাস-ক্ষেত্র যত দূর দেখা যায়।
এখনো বিদীর্ণ সেই রৈবতক শৃঙ্গ-চয়
করিছে উদগীর্ণ ধূম্র সভস্ম গৈরিকময়
রহিয়া রহিয়া, যেন করি মুখ ব্যাদানিত
করিতেছে দৈত্যব্যূহ ক্রোধ-বাষ্প উদিগরিত।
এখনো উঠিছে কাঁপি রহিয়া রহিয়া ধরা,
হৃদয় রয়েছে যেন কি শোক আবেগে ভরা!
কি যেন শোকের দৃশ্য বিস্তীর্ণ প্রভাস তীর,
ভস্মাচ্ছন্ন ঘোর কৃষ্ণ! ঘোর কৃষ্ণ সিন্ধু-নীর।
ঘোর কৃষ্ণ আবরণে হইয়াছে একাকার!
অভিন্ন ধবল বেলা ঘোর কৃষ্ণ পারাবার।
নাহি চিহ্ন জীবনের, নাহি চিহ্ন জগতের!
যেন প্রলয়ের দিন,
জগত হয়েছে লীন
মহাকাল-মহাবক্ষে, মহাবক্ষে প্রলয়ের।

অগ্নিগিরি উদ্গারিত প্রস্তরে আহত, হত,
অনার্য্য পড়িয়া আছে স্থানে স্থানে শত শত ;
নাহি হিংস্র জীব-চিহ্ন, শৃগাল, বায়সগণ ;
কেবল উত্তপ্ত বায়ু স্বনিছে কি শোক-স্বন
মাখি ধূম্র ভস্ম অঙ্গে ! আহতের আর্ত্তনাদ
বহিয়া বহিয়া ধীরে শোকে ত্রাসে সবিষাদ !
কেবল সুভদ্রা পার্থ, শোকে ত্রাসে অভিভূত,
ভ্রমিছেন, করুণার অশ্রুতে নয়নাপ্লুত।
করি আহতের সেবা, হতে বর্ষি অশ্রুজল,
করুণার নদ নদী ভ্রমিছেন অবিরল।
আর চলিল না পদ ; কাঁপিয়া উঠিল প্রাণ ;
সম্মুখে উৎসব-ক্ষেত্র প্রভাসের,—কি শ্মশান !
যথায় যোজন ব্যাপী ছিল শিবিরের সারি,
আলোক-কুসুম-দামে নাট্যশালা অনুকারি,
দগ্ধ শিবিরের দণ্ড স্থানে স্থানে চিহ্ন তার
রহিয়াছে দাঁড়াইয়া, দগ্ধ বস্ত্রখণ্ড আর।
ভস্মাবৃত, শবাবৃত, প্রস্তর-গৈরিকাবৃত,
বিস্তীর্ণ মহাশ্মশান ধূম্রপুঞ্জে আচ্ছাদিত !
বিলাসের ভগ্ন, দগ্ধ, উপকরণের রাশি
আছে পড়ি শব সহ ; এখনো রয়েছে বাসি
বিলাস-কুসুম-দাম যাদবের যাদবীর
অঙ্গে অঙ্গে ভস্মাবৃত ; করে পান-পাত্র স্থির
এখন রয়েছে কারো ; রয়েছে বিলাস বেশ
ভস্মাবৃত ; ভস্মাবৃত বেণীবদ্ধ চারু কেশ।
রহিয়াছে অঙ্গে অঙ্গে রত্নময় আভরণ
যাদবের যাদবীর, শুষ্ক অলক্ত চন্দন।

পড়ি যন্ত্রী যন্ত্র করে, নর্ত্তকী অর্দ্ধেক নাচে ;
বক্ষে মৃতা প্রণয়িনী প্রণয়ী পড়িয়া আছে।
কেহ গদাহত, কেহ অস্ত্রাহত নিদারুণ,
কেহ বা প্রস্তরে,—অস্ত্রে প্রকৃতির অকরুণ।
ভ্রাতায় ভ্রাতায় যুঝি, কোথা ভ্রাতুষ্পুত্র সহ
আছে পড়ি দুই জন ; কোথা দৃশ্য শোকাবহ,—
দুই দ্বন্দ্বী মধ্যে আসি পত্নী, পুত্রী, ভগ্নী বলে
নিবারিতে দ্বন্দ্বযুদ্ধ, পড়িয়াছে মধ্যস্থলে।
দুই দিকে দুই কর রহিয়াছে প্রসারিত ;
কি করুণা, কাতরতা রয়েছে মুখে অঙ্কিত!
নিমিষে নিরখি দৃশ্য,—উর্দ্ধমুখে অশ্রুজলে,
করযোড়ে ধনঞ্জয় বসিলেন ধরাতলে
জানু পাতি। ভদ্রা দেবী,—হৃদয়ে শান্তির ধাম,—
দাঁড়াইলা করযোড়ে, অধরেতে কৃষ্ণনাম
অস্ফুট ঈষৎ ধীরে কাঁপিতেছে ওষ্ঠাধর,
উর্দ্ধমুখ শান্তিময়, স্থিরনেত্র ইন্দীবর।
রহিলেন দুই জন মূরছিত যোগস্থিত
মহাশোকে, স্থির দেহ, নয়ন অবিচলিত।
মহাশোকে অর্জ্জুনের করুণার পারাবার
উদ্বেলিত, অশ্রুধারা বহিতেছে অনিবার।
সুভদ্রার মহাশোক শান্তির সাগরে ধীরে
হইল বিলীন, নেত্র ছল ছল প্রেম-নীরে।
কিছুক্ষণ পরে উঠি কহিলেন ধনঞ্জয়—
"এ কি লীলা হরি! তুমি প্রেমময় দয়াময়।
দেখিয়াছি কুরুক্ষেত্র, সেই শোক-পারাবার ;
ক্ষুদ্র সরোবর, এব নহে যোগ্য তুলনার।

কুরুক্ষেত্র বীর-ক্ষেত্র, বীরের ত্রিদিব-ধাম;
প্রভাস উৎসব-ক্ষেত্র,— তার এই পরিণাম!
কুরুক্ষেত্রে এই রূপে বিকট মৃত্যু, বিলাস,
করে নাই নিরমম পরস্পরে উপহাস।
এরূপে অমৃতে তথা উঠে নাহি হলাহল।
এরূপে আমোদ-সুধা হয় নাই অশ্রুজল।
এই রূপে হাসি তথা হয় নাহি হাহাকার।
প্রমোদ নিকুঞ্জ বন হয় নাহি প্যারাবার।
পড়েছিল বীরগণ মহা মহীরুহ যথা;
ছিল না এরূপে তাহে জড়িতা রমণী লতা।
বসন্ত বাহারে তথা উঠেনি দীপক রাগ।
ছিল না কুসুম বনে লুকাইয়া তীব্র নাগ।
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধক্ষেত্র; এ ক্ষেত্র আত্মহত্যার;
কুরুক্ষেত্রে বীর্য্য ক্রীড়া; এ ক্ষেত্রে ক্রীড়া সুরার।
মানব, প্রকৃতি, মিলি করিয়াছে কি ভীষণ
দাবদগ্ধ, সুসজ্জিত সুরম্য প্রমোদ বন!
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধক্ষেত্র, ধর্ম্ম রাজ্য লক্ষ্য তার;
হরি! এইরূপে কুল করিলে কেন সংহার?"
কেবল কহিলা দেবী—"কর্ম্মফল! কর্ম্মফল!
এত দিনে ধর্ম্মরাজ্য দৃঢ়, স্থির, অবিচল!"
কিন্তু কই, কৃষ্ণ কই? ছুটিলেন দুইজন
দেখিলেন সম্মুখেতে বৃক্ষতল মনোরম।
একটি গৈরিক খণ্ড, একটি খণ্ড শিলার,
পড়েনি একটি ভস্ম,— বেলা-ভূমি পরিষ্কার।
শোভিতেছে বেলাখণ্ড যেন বেলফুলরাশি,
শোকের শ্মশানে যেন শান্তির শীতল হাসি।

বুঝিলেন দুই জনে দারুক, শৈল, কেশব,
এইখানে দাঁড়াইয়া দেখিলেন এ বিপ্লব।
সাষ্টাঙ্গে প্রণত ভূমে হইলেন দুই জন,
পাইলেন শোকে শান্তি পাতি বক্ষ অনুক্ষণ।
মহামরুদগ্ধ বুকে কি যেন তুষার জল
প্রবেশিল, দগ্ধ প্রাণ করি শান্ত সুশীতল।
ললাটে পরশি ভূমি প্রণমিয়া বহুবার,
মাখিয়া ললাট বক্ষে পূজ্য পদরজ আর,
চলিলেন দুই জন ঊর্দ্ধশ্বাসে বহুদূর,—
ও কে! জননীর অঙ্কে যেন শিশু, তৃষ্ণাতুর!

একটি রমণী অঙ্কে কখন রাখিয়া মুখ
করিতেছে ছট্‌ফট্‌, ভূতলে রাখিয়া বুক।
কখন উঠিয়া চাহি শূন্য পানে আত্মহারা
ছুটিছে উন্মাদ মত, দুনয়নে অশ্রুধারা।
"শৈলজে! শৈলজে!"—পার্থ কহি কণ্ঠে উচ্ছ্বসিত
ছুটিলেন, লইলেন হৃদয়েতে উদ্‌বেলিত
শৈলজায়; কহিলেন নেত্রে অশ্রু ছল ছল—
"কোথায় আছেন কৃষ্ণ? আছেন কুশলে বল?"
দাঁড়াইয়া নাগরাজ ছিল চাহি শূন্য পানে,
সুমধুর কৃষ্ণনাম যেমতি পশিল কাণে,
কহিলা আকুল কাঁদি,—"আহা কি মধুর নাম!
কে শুনা'ল জুড়াইল পাপীর তাপিত প্রাণ?
গাও নাম আরবার! গাও নাম শতবার!
সহস্র সহস্র বার! লও নাম, গাও আর!
গাও নাম পারাবার! গাও নাম সমীরণ!
গাও নাম চন্দ্র সূর্য্য! গাও গ্রহ অগণন!

এমন মধুর নাম, পতিতপাবন নাম,
এমন ত্রিতাপহর, শীতল শান্তির ধাম,
নাহি মর্ত্ত্যে, নাহি স্বর্গে। এমন মধুর নাম,
গাও মুখ! গাও চোক! গাও অঙ্গ! গাও প্রাণ!
গাও মুখ মধুস্বরে! গাও চোক অবিরাম
বরষিয়া প্রেমধারা! নামামৃত করি পান,
গাও প্রেমানন্দে তুমি গলিয়া, পাষাণ প্রাণ!
নামামৃতে মত্ত অঙ্গ নেচে নেচে গাও নাম!
হরে! কৃষ্ণ! হরে! কৃষ্ণ! হরে! কৃষ্ণ! হরে! হরে!
হরে! রাম! হরে! রাম! রাম! রাম! হরে! হরে!"
দুই বাহু উর্দ্ধে তুলি, দিয়া তালি অবিরাম,
নাচিতেছে নাগরাজ গাইয়া গাইয়া নাম
পাগল শিশুর মত, বহিয়া নয়নধারা
ভিজিতেছে বক্ষ, বেলা,—নাগরাজ আত্মহারা!
প্রেমানন্দে চিত্ত যেন হইয়াছে প্রপূরিত;
বহিতেছে অনিবার নেত্র পথে উদ্বেলিত।
সেই নৃত্যে, সে আনন্দে, সুভদ্রা ও ধনঞ্জয়
ভুলিলেন আত্মশোক, হইলেন তন্ময়।
সেই প্রেম! সে আনন্দ! সেই গীত! সে নর্ত্তন!
হইতেছে বাসুকির স্বেদ কম্প ঘন ঘন!
মহাভাবে রোমাঞ্চিত হইয়া দেহ অধীর
পড়িতে, আপন অঙ্কে ভদ্রা লইলেন শির।
মহাভাবে ভদ্রা, পার্থ, শৈল, আত্মজ্ঞানহীন
রহিলেন কিছু ক্ষণ, আত্মপ্রেমানন্দে লীন।
মহাশোক-স্রোতস্বতী ধনঞ্জয় সুভদ্রার
হইল বিলীন, পশি প্রেমানন্দ পারাবার।

ধীরে ধীরে বাসুকির উপজিলে বাহ্য জ্ঞান,
কহিলা শৈলজা—"দাদা! পূর্ণ তব মনস্কাম
যে দেবী আরাধ্যা তব, জীবন-স্বপ্ন তোমার,
চেয়ে দেখ তব শির অঙ্কে সেই সুভদ্রার।
যেই পার্থ শত্রু তব, দেখ পদতলে বসি
সেবিছেন পদ তব! কি প্রেমে কি অশ্রু খসি
পড়িতেছে পদে তব, পড়িছে বক্ষে তোমার!
হইয়াছে প্রেমানন্দ কি মহাশোকে সঞ্চার!
জ্বলিলে একটি জন্ম যেই প্রেম-পিপাসায়
কর পান সেই প্রেম অজস্র সুধা-ধারায়!
পতিতপাবনী ধারা এই মাতা জাহ্নবীর,
জুড়াইবে প্রাণ তব, জুড়ায়েছে পাপিনীর।"
"সুভদ্রা! সুভদ্রা! পার্থ।"—নাগরাজ সবিস্ময়
উঠিয়া রহিলা চাহি মূর্ত্তিবৎ, প্রীতিময়।
"সুভদ্রা।—জীবন স্বপ্ন! সুভদ্রা! পিপাসা মম!
একটি চরণ-রেণু ভাবিতাম স্বর্গ সম।
আমার আরাধ্য দেবী, আমার সর্ব্বস্ব ধন,—
তাঁর অঙ্কে মম শির, আমি পাপী নরাধম।
হায় মা! একটী জন্ম পুড়ি কিবা কামানলে
পূজিয়াছি পত্নীভাবে, চেয়েছি হরিতে বলে।
করিয়াছি কুরুক্ষেত্র, এ প্রভাস সংঘটিত;
কৌরব যাদব রক্তে করিয়াছি কর্দ্দমিত
এই কর, এই আত্মা,—সকলি লীলা তাঁহার!
আজি কোথা সে সুভদ্রা? সে বাসুকি কোথা আর?
স্বপন! স্বপন সব!—বিকট-স্বপন ঘোর!
সেই ঘোর অমাবস্যা আজি হইয়াছে ভোর।

আজি সেই পত্নীভাব মনে নাহি পড়ে আর ;
আজি তুই প্রেমময়ী মা আমার ! মা আমার !
কত প্রেম মুখে তোর, কত প্রেম অঙ্কে, বুকে !
সে অঙ্কে শিশুর মত বাসুকি ঘুমাবে সুখে।"
বাসুকি আবার অঙ্কে রাখি শিশুমত শির
কাঁদিতেছে ভিজিতেছে অঙ্ক ঝরি অশ্রুনীর।
"তুই মম কারু আজি ; তুই মম শৈল আর ;
তুই মম মাতা, পিতা, তুই মা ! কৃষ্ণ আমার !"
উচ্চারিতে কৃষ্ণনাম হ'ল পুনঃ ভাবাবেশ,
বাসুকি কহিল উঠি,—"মরি ! কি মধুর বেশ !"
চাহি সুভদ্রার পানে—"কি মোহন চূড়া শিরে
কাঁপিতেছে শিখিপুচ্ছ মলয়ে কি ধীরে ধীরে
কেশে ফুলমালা, পৃষ্ঠে কি মোহন পীতধড়া !
কি ত্রিভঙ্গ নীলকান্তি, অতরল সুধা ভরা !
কি মোহন পীতাম্বর ! গলে কিবা বনমালা !
চন্দন-চর্চ্চিত বুক কি প্রেমের নাট্যশালা !
শ্রীঅঙ্গের কি সৌরভ যেন পারিজাত রাশি
করপদ্মে বিম্বাধরে শোভে কি মোহন বাঁশী !
বাজিতেছে কি মধুরে ! ডাকিতেছে—'আয় ! আয়
এই যাই, এই যাই।"—ভাবাবেশে পুনঃ রায়
পড়িলা ভদ্রার অঙ্কে প্রেমানন্দে মুরছিত।
হইলেন চারি জন ভাবে জ্ঞান-বিরহিত।
গাইলেন তিন জন,—প্রেমে পুলকিত প্রাণ,—
আত্মহারা চাহি শূন্য, লীলাময় কৃষ্ণনাম।
বাসুকি মেলিলে নেত্র শুনিতে শুনিতে নাম,
কহিলেন ধনঞ্জয়—"নাগেন্দ্র ! আকুল প্রাণ,

কোথা কৃষ্ণ? কহ, তুমি পেয়েছ কি দেখা তাঁর?
কোথায় আছেন তিনি? পাইব কি হায়! আর
হৃদয়ে সে পদাম্বুজ? দেখিব নয়ন ভরি
নর-নারায়ণ রূপ, কহ দাসে দয়া করি।"
"কোথা কৃষ্ণ?" নাগরাজ উঠি পুনঃ আত্মহারা
পার্থে আলিঙ্গিয়া কহে বিস্ফারি নয়নতারা—
"কোথা কৃষ্ণ!" উচ্চ হাসি বাসুকি উঠিল হাসি,
সে হাসিতে কি আনন্দ, কিবা প্রেমসুধারাশি!
"কোথা কৃষ্ণ?—দেখিছ না কৃষ্ণ কোথা, ধনঞ্জয়?
বীরেন্দ্র চাহিয়া দেখ চরাচর কৃষ্ণময়!
কৃষ্ণ চন্দ্রে, কৃষ্ণ সূর্য্যে, কৃষ্ণ গ্রহে উপগ্রহে।
অনন্ত আকাশে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ সমীরণে বহে।
মেঘে কৃষ্ণ, বজ্রে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ দীপ্ত চপলায়;
কৃষ্ণ ভীম ভূকম্পনে, কৃষ্ণ ঘোর ঝটিকায়।
কৃষ্ণ অমা-অন্ধকারে, কৃষ্ণ ফুল্ল জ্যোৎস্নায়;
কৃষ্ণ, সিন্ধু-জলোচ্ছ্বাসে, কৃষ্ণ গৈরিক ধারায়।
কৃষ্ণ মহাশৈলাচলে, কৃষ্ণ ফুলে, কৃষ্ণ ফলে,
কৃষ্ণ জলে, কৃষ্ণ স্থলে, তুষারে, কৃষ্ণ অনলে।
বিলাস শয্যায় কৃষ্ণ, কুরুক্ষেত্র-রণাঙ্গনে।
প্রেমের কটাক্ষে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ অস্ত্র বরিষণে।
কৃষ্ণ শার্দ্দুলের দন্তে, কৃষ্ণ নারীবিম্বাধরে।
শোকের ক্রন্দনে কৃষ্ণ, প্রেমের সঙ্গীতস্বরে।
কোথা কৃষ্ণ, ধনঞ্জয়?—কৃষ্ণ মম এ নয়নে।
কোথা কৃষ্ণ, ধনঞ্জয়?—কৃষ্ণ মম এ শ্রবণে।
কোথা কৃষ্ণ, ধনঞ্জয়?—কৃষ্ণ মম এ অধরে।
কোথা কৃষ্ণ, ধনঞ্জয়?—কৃষ্ণ মম কণ্ঠস্বরে।

কৃষ্ণ মম রক্তে, মাংসে অস্থিতে, কৃষ্ণ মজ্জায়।
কৃষ্ণ মম এ হৃদয়ে, এ ক্ষতে দেখ না, হায়!"
বক্ষের সে অস্ত্রক্ষত উত্তেজিত বিস্ফারিত
হইয়া আবেগে, রক্ত হইতেছে প্রবাহিত।
রক্তজবা হ'তে যেন রক্ত চন্দনের ধারা
ঝরিতেছে পুষ্পপাত্রে; বাসুকির নেত্র-তারা
আবার উঠিল ভাসি প্রেমাশ্রুতে সুশীতল,
বিষ্ণু-পদে উপজিল যেন জাহ্নবীর জল
"কোথা কৃষ্ণ, ধনঞ্জয়!" করি অসি নিষ্কোষিত,
কহিলা নাগেন্দ্র পুনঃ—"কর বক্ষ বিদারিত!
দেখিব আমার সেই ননীচোরা নীলমণি;
পুষি তারে কি আদরে দিয়া প্রেম ক্ষীরননী।
কত শাসি, কত হাসি, সাজাই সে তনুখানি!
আমি তার পিতা নন্দ, যশোদা জননী আমি!
শ্রীদাম সুদাম আমি, কত খেলা খেলি সঙ্গে!
ব্রজের কিশোরী আমি, কত ক্রীড়া করি রঙ্গে!
কুঞ্জে কুঞ্জে জ্যোৎস্নায় বাজে কি মধুর বাঁশী!
কি প্রেম-যমুনা বহে কি অনন্ত প্রেমরাশি
ওই শুন বাজে বাঁশী, ওই ডাকে—'আয়! আয়!'
এই যাই, এই যাই।"—প্রেমে রোমাঞ্চিত কায়
ছুটিলা বাসুকি বেগে নাচি করতালি দিয়া,
ধরিলেন ধনঞ্জয় দুই বাহু প্রসারিয়া।
"যাক মান, যাক কুল! ছেড়ে দেও! ছেড়ে দেও!
জীবন যৌবন নাথ! নেও তুমি, সব নেও!"
কাঁদিতে কাঁদিতে ক্রমে ভাবাবেশে মূরছিত
হইলা পার্থের বক্ষে,—দুই বক্ষ সম্মিলিত

কি শক্রুর, কি কঠোর ! কিবা প্রেমানলে গলি
মিলিল, মিশিল যেন রবির কিরণে জ্বলি
মিলিল, মিশিল স্নিগ্ধ দুখানি কোমল ননী ;
চন্দ্র-করে যেন দুটি চন্দ্রকান্ত মণি-খনি।
দুই দিক হ'তে আসি দুই নদ বিপরীত,
মিলিল মিশিল মহাপারাবারে পবিত্রিত।
অর্জ্জুনের অংসোপরে মুগ্ধ শির বাসুকির।
বাসুকির অংসোপরে অর্জ্জুনের মুগ্ধ শির।
আলিঙ্গিয়া পরস্পরে দৃঢ় প্রেম আলিঙ্গনে
স্থির দুই বীরমূর্ত্তি, ধারা বহে দু-নয়নে।
নির্ব্বাপিত অগ্নি-গিরি-শেখর হ'তে শীতল
যেন নির্ঝরিণী ধারা বহিতেছে অবিরল।

"চেয়ে দেখ মা আমার !"—কহে শৈল মুগ্ধমন—
'আর্য্য অনার্য্যের আজি চির-প্রেম-সম্মিলন !
কি শোকের মরুভূমে,—কে লীলা বুঝিবে তাঁর ?—
উথলিল সুশীতল কি প্রেমের পারাবার !
পূর্ণ মনোরথ তোর, পূর্ণ মনোরথ মম,—
ধরাতলে ধর্ম্মরাজ্য হইল পূর্ণ স্থাপন !
আনন্দে পূর্ণিত প্রাণ, আয় মা ! হৃদয়ে আয়।
দে রে স্থান বুকে তোর এ ভগ্নীকে, বালিকায়।"
মূর্চ্ছিতা হইয়া শৈল পড়িলা ভদ্রার বুকে,
মূর্চ্ছিতা সুভদ্রা, বসি বুকে বুকে মুখে মুখে !
আর্য্য অনার্য্যের বীর্য্য, আর্য্য অনার্য্যের শক্তি,
আর্য্য অনার্য্যের প্রেম, আর্য্য অনার্য্যের ভক্তি,
আর্য্য অনার্য্যের ধর্ম্ম, কর্ম্ম আর্য্য অনার্য্যের,
এত দূরে—এইরূপে—মিশি মহাভারতের

সঞ্চারিল নবযুগ। নবযুগ-ইতিহাস
এইরূপে, এত দূরে,—মানব-অদৃষ্টাকাশ
করিয়া আলোক পূর্ণ,—খুলিল মহিমান্বিত,
ভারতে মহাভারত হইল পূর্ণ-স্থাপিত।
ব্রাহ্মণের ধর্ম্মগ্লানি, ক্ষত্রিয়-অধর্ম্ম আর,
অনার্য্যের সংঘর্ষণ, কাঁপাবে না ভিত্তি তার।
আর্য্য অনার্য্যের এই মহাশক্তি সম্মিলিত,
গঙ্গা যমুনার মত, কিছু দূর প্রবাহিত
হইয়া অমিশ্র স্রোতে, হইবে পূর্ণ মিশ্রিত,
করিবে ভারতভূমি শান্তি-বারি বিপ্লাবিত
সহস্র সহস্র বর্ষ। সে শান্তি-প্লাবিত তটে
ফলিবে কতই রত্ন, নীল নৈশাকাশ পটে
অনন্ত নক্ষত্র মত! কত কীর্ত্তি অতুলিত,
অমর, অনন্তস্পর্শী, হবে তাহে প্রতিষ্ঠিত,
অসংখ্য মৈনাক মত। মহাকাল-পারাবার
গাইবে সে কীর্ত্তি গীত, প্রণমিবে অনিবার।"
ভাঙ্গিল আনন্দ স্বপ্ন, জাগিল হৃদয় চাবি,
জিজ্ঞাসিল ধনঞ্জয় মুছিয়া নয়ন-বারি
আপনার—"নাগরাজ! কর আত্ম-সম্বরণ।
কহ দয়া করি, তুমি দেখেছ কি নারায়ণ?
দেখিতে সে পদাম্বুজ বড়ই আকুল প্রাণ।
কোথায় আছেন হরি? দেখেছ কি ভগবান?"
"দেখেছি"—বাসুকি ধীরে উত্তরিলা শান্ত, স্থির,
বহিতে লাগিল পুনঃ দুনয়নে প্রেম-নীর।
"দেখেছি, কিরীটি! আমি দেখেছি নয়ন ভরি
দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু, পতিতপাবন হরি!

দগ্ধ মরু দেখে যথা নিদাঘের নবঘন,
দেখিয়াছি আমি সেই নররূপী নারায়ণ।
এই শিলাসনে বসি এই নিম্ববৃক্ষতলা,
অঙ্কে বৃক্ষ কারু মম, প্রেমে জড়াইয়া গলা।
বড় পুণ্যবতী কারু। কি প্রেম-মূরতি খানি!
সেই পুণ্য, সেই প্রেম, কোথা পাব পাপী আমি!
মহাশক্র!”—নাগপতি কাঁদিতেছে শিশু সম—
“যাদব শোণিতে সত্য কলুষিত কর মম!
তথাপি কি ক্ষমা, দয়া! কহিলেন—‘এস ভাই!
এস বক্ষে!—লীলা শেষ,—শান্তিধামে চল যাই!’
পড়িলাম পদতলে, লইলেন তুলি বক্ষে,
কি প্রেম নয়নে চাহি, কি, ধারা বহিছে চক্ষে!
কি ত্রিদিব সেই বক্ষ! মরু বক্ষে কি অমৃত
ঝরিল অজস্র! প্রাণ হইল কি পবিত্রিত,
শীতলিত, কি দ্রাবিত! পাষাণ হইয়া জল
বহিতে লাগিল যেন নেত্রপথে সুশীতল!
হইলাম মূরছিত, দেখিলাম ধরাতল
শত চন্দ্রালোকে যেন হইয়াছে সমুজ্জল।
কি সঙ্গীত, কি সৌরভ, মধুর, মধুরতর,
উঠিল ভাসিয়া ধীরে, মনপ্রাণমুগ্ধকর!
কি সুন্দর পুষ্পরথ! রথ-শিরে সুদর্শন
কিবা চক্র সমুজ্জ্বল! স্তম্ভ-শিরে সুকেতন,
সুদর্শন চক্রাঙ্কিত, উড়িতেছে কি লীলায়!
কি লীলায় উঠিতেছে ধীরে রথ অমরায়!
রথে বসি নারায়ণ, অঙ্কে কারু বসি সুখে
গলা জড়াইয়া প্রেমে, বুকে বুকে মুখে মুখে

পরশিয়া ভাবাবেশে ; ভাবাবেশে চরাচর
গাইতেছে হরিনাম,—চরাচর কি সুন্দর !
গাইতেছে হরিনাম পারাবার কি মধুর !
গাইতেছে অন্তরীক্ষ, গাইতেছে সুরপুর !
ভাবাবেশে দেবাঙ্গনা নাচিয়া গাইয়া নাম,
বর্ষিতেছে সুবাসিত পুষ্পরাশি মুগ্ধপ্রাণ।
তরঙ্গে তরঙ্গে প্রেম, তরঙ্গে তরঙ্গে নাম,
প্লাবি বিশ্ব ছুটিয়াছে, গ্রহে গ্রহে অবিরাম।
সে প্রেম-তরঙ্গে রঙ্গে, সে নাম তরঙ্গে আর,
ভাসিয়া উঠিছে রথ ;—বিশ্ব শান্তি-পারাবার !
আমি রহিলাম পড়ি, হায় ! মহাপাপী আমি !
যাদবের সদ্য রক্তে কলুষিত মম পাণি !
না না নাথ ! জান তুমি, তুমি ত অন্তরযামী,
আমি বনপশু হীন, নহে আততায়ী আমি।
প্রকৃতির সে বিপ্লবে, সে নিশীথে বিভীষণ,
যাদব-শিবিরে পশি করেছি সম্মুখ রণ।
একটিও গুপ্ত শর, একটিও গুপ্তাঘাত,—
আমি করি নাই গুপ্ত এক বিন্দু রক্তপাত।
এই দেখ অঙ্গে অঙ্গে অস্ত্র-লেখা বাসুকির !
বাসুকি দুর্ব্বাসা নহে, বাসুকি অনার্য্য বীর।
তুমি বাসুকিরে নাথ ! করিয়াছ আলিঙ্গন
কত দয়া ! কত প্রেম ! নরহরি ! নারায়ণ !”
আরবার বাসুকির হইতেছে ভাবাবেশ,
কাঁপিতেছে দেহ, নেত্র হইতেছে নির্নিমেষ।
পুলকিত, রোমাঞ্চিত, হইতেছে কলেবর,
হইতেছে স্বেদোদ্গম, দুনয়নে দর দর।

বহিতেছে প্রেমধারা, কি যেন আনন্দ-নীরে
হইতেছে সিক্ত অঙ্গ, প্রাণ পরিপূর্ণ ধীরে।
বাসুকি আবিষ্ট কণ্ঠে কহে—"দেখ কি সুন্দর!
কি সুন্দর বৃন্দাবন! কি কদম্ব মনোহর!
কি জ্যোৎস্না! কি সুন্দরী যমুনা বহিছে হাসি!
কি পুষ্প-সৌরভ! কিবা বাজিছে মধুর বাঁশী।
কি প্রেমমূরতি শিশু, কি প্রেম-নয়নধারা!
গলা জড়াইয়া কারু প্রেমময়ী আত্মহারা!
ওই বাজিতেছে বাঁশী কি মধুরে—'আয়! আয়!'
এই যাই, এই যাই।"—বাসুকি ছুটিয়া যায়
দুই বাহু প্রসারিয়া; মহাভাবে প্রেমভরে
পড়িতে ধরায়, পার্থ ধরিলেন ক্ষিপ্রকরে।
রাখিলেন সুভদ্রার অঙ্কে শ্লথ মুগ্ধ শির;
বসিলেন শৈল, পার্থ, পদতলে বাসুকির
লয়ে বক্ষে পদতীর্থ। ভাবাবিষ্ট তিন জন
রহিলেন চাহি শূন্যে সেই প্রেম-বৃন্দাবন।
প্রেমাশ্রু নয়নে, প্রেম আনন্দে চিত্ত অচল,
শুনিলেন সেই বাঁশী, সেই যমুনার জল।
সুভদ্রার অঙ্ক-স্বর্গে শুইয়া আনন্দ মনে
মহাভাবে গেলা চলি বাসুকি সে বৃন্দাবনে।
কাঁপিল বসুধা যেন মহাভাবে বিকম্পিত;
গরজিল সিন্ধু যেন মহাভাবে উচ্ছ্বসিত।
ঘোরাল প্রকৃতি মূর্ত্তি; দিনে নাহি দিবাকর;
মহাভাবে সমাধিস্থ যেন বিশ্ব চরাচর।

দ্বাদশ সর্গ।

—*—

কর্ম্মফল।

রৈবতক যোগশৃঙ্গে, বিটপি-ছায়ায়,
বসিয়া মহর্ষি ব্যাস অজিন আসনে।
বসি চারিদিকে ধ্যান-মগ্ন ঋষি প্রায়
কুরঙ্গ, শশক, মেষ শার্দ্দুলের সনে।
অপরাহ্ণ শেষ। মহা আকাশ মণ্ডল
উপরে সুনীল শান্ত;—শান্তি-নিকেতন
যেন নারায়ণ বক্ষ যোগে অবিচল,
আবরি হিরণ্যগর্ভে অনন্ত ভুবন।
নিম্নে প্রভাসের সিন্ধু সুনীল উজ্জ্বল,
অনন্ত তরঙ্গ-ভঙ্গে শ্বেত পুষ্পাবৃত;—
যেন নারায়ণ বক্ষ লীলায় চঞ্চল,
প্রেমে উচ্ছ্বসিত, শ্বেত চন্দনে চর্চ্চিত।
কি ঘোর বিপ্লব পরে কি শান্তি সুন্দর
বিরাজিছে বসুধার বক্ষে সুশ্যামল!
কি ঘোর বিপ্লব পরে কি শান্তি সুন্দর
বিরাজিছে মহর্ষির বক্ষে সুশীতল!—
দেখিলেন ধনঞ্জয়, অজিন আসনে
বসি মহর্ষির পার্শ্বে শোকে উদ্বেলিত;
কি যেন শৈরিক বৃষ্টি, ভীম ভূকম্পনে,
করেছে হৃদয় রাজ্য ঘোর বিপ্লাবিত।

কহিলেন সব্যসাচী—"হায়! দেব! আমি
দেখিয়াছি দ্বারবতী;—সে অমরাবতী
করেছিল অনাথার হাহাকার বাণী,
অনাথার অশ্রুধারা, কি যে স্রোতস্বতী!
উৎসবের নাট্যালয়ে মধ্য অভিনয়ে
গিয়াছে চলিয়া যেন অভিনেতাগণ;
সজ্জিত আলোকে ফুলে সেই রঙ্গালয়ে
অনাথা রমণী শিশু করিছে ক্রন্দন!
দেখিলাম বজ্রসম কঠিন হৃদয়ে
সে শোকের সতীত্বের স্বর্গপুণ্যময়!

করি বজ্রাঘাত সেই পুরে নিরদয়
কহিলাম—'তিরোহিত হরি লীলাময়!'
কহিলাম—'সত্যভামা! করেতে তোমার
করেছেন সমর্পণ নর-নারায়ণ
ধ্বংস-শেষ কুলভার, শিশু অনাথার।
লও এই ভার—শোক কর সম্বরণ!
সপ্ত দিবানিশি পরে এই লীলাভূমি
দ্বারবতী সিন্ধুগর্ভে হবে নিমজ্জিত,—
বলেছেন লীলাময়। পুণ্যবতী তুমি
চল ইন্দ্রপ্রস্থে, শোক কর তিরোহিত!'
কি আলোকে রুক্মিণীর উঠিল ভাসিয়া
নিরুপম সেই রূপ! কি হাসি অধরে
ঈষৎ—ঈষৎ—শান্ত! উঠিল হাসিয়া
অরুণ গোলাপে সিক্ত শিশির শীকরে।
কি আনন্দ দুনয়নে প্রেম ছল ছল!
পতিপ্রাণা নববধূ প্রেম আবাহন

শুনেছে পতির যেন। অঙ্গ ঢল ঢল
অনুরাগে, অনুরাগে প্রফুল্ল বদন।
আবেশে অবশ দেবী গলা জড়াইয়া
পড়িলেন সপত্নীর বক্ষে স্বর্গোপম।
সেই হাসি, সে আনন্দ, রহিল ভাসিয়া
চিত্রে যেন ; ধীরে দেবী মুদিলা নয়ন।
পূর্ণিমা নিশান্তে চন্দ্রে জ্যোৎস্না যেমন,
মিশাইল পতিপদে সতীর জীবন।
সুপ্ত আনন্দের মূর্ত্তি পর্য্যঙ্কে রাখিয়া
পাদপদ্ম নিজশিরে করিয়া গ্রহণ,
সত্যভামা মহাশোকে কহিলা কাঁদিয়া,
—আনন্দের পদতলে শোকের ক্রন্দন,—
'তুইও দিদি! পাপিনীরে করি বিসর্জ্জন
এই শোক দাবানলে, গেলি চলি হায়!
কর আশীর্ব্বাদ! আজ্ঞা পালি নির্মম
দুজনার পাদপদ্ম দাসী যেন পায়!'
পতি দেব, পত্নী দেবী,"—শোকে ফাল্গুনির
রুদ্ধকণ্ঠ, দুনয়নে বহিতেছে নীর।
প্রেমে শোকে ছল ছল নেত্র মহর্ষির ;
চাহি জলধির পানে চারি নেত্র স্থির।
"মানব খাণ্ডবানল, ভীষণ শ্মশান,
দেখিয়াছি কুরুক্ষেত্রে ;"—কহিলা অর্জ্জুন—
"দেখিয়াছি হায়! দেব! প্রভাসে আবার
পৃথিবী গগনব্যাপী সেই চিতাগুন!
দেখিয়াছি আরবার ক্ষত্রিয়া রমণী,
—মাথায় মঙ্গলঘট সবারি পল্লব,—

গাইয়া মঙ্গলগীত, বিদ্যুৎবরণী
আরোহিতে সেই চিতা"—আবার নীরব
হইলেন মহেষ্বাস ; কহিলা কাঁদিয়া,
না পারি রাখিতে চাপি হৃদয়-উচ্ছ্বাস—
"কহ দেব। এইরূপে নির্ম্মম হইয়া
কেন করিলেন হরি স্বকুল বিনাশ?"

ব্যাস। স্মরি সেই মহাগীতা, মহাগীতাকার,
অর্জ্জুন! সম্বর শোক। জান ভগবান
এক, অদ্বিতীয়, সত্য ; বিশ্ববীজাধার ;
অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ; অব্যক্ত মহান্।
সচ্চিদানন্দের মহা আনন্দ উচ্ছ্বাসে
ছুটে মহাবিবর্ত্তন প্রবাহ যখন,—
অব্যক্তির মহাব্যক্তি, আলোক বিকাশ
বিদ্যুতের,—হয় ব্যক্ত বিশ্বের কারণ।
ক্রমে সূক্ষ্ম বিশ্ব, ক্রমে বিশ্ব স্থূলতর—
গ্রহ, উপগ্রহ, জীব,—হয় বিবর্ত্তিত।
ক্রমে স্থূল সূক্ষ্মে, সূক্ষ্ম কারণে অমর,
কারণ সচ্চিদানন্দে, হয় নিবর্ত্তিত।
তিনি বিশ্বরূপ ;—তিনি কারণে ঈশ্বর ;
সূক্ষ্মেতে হিরণ্যগর্ভ ; বিরাট আবার
স্থূল বিশ্বে। সৃষ্টি, স্থিতি, লয় নিরন্তর
হইতেছে বিবর্ত্তনে দেখ চক্রাকার!
দেখ ওই পারাবার! শান্তভাব তার
অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ভাব ভগবান্‌
মহাস্রোত,—বিবর্ত্তন ; এ বিশ্ব সংসার,—
ঊর্ম্মিমালা ; জীব,—জলবিম্ব কর জ্ঞান।

সিন্ধুগর্ভে স্রোতোবলে তরঙ্গ ফেনিল
জন্মি, জন্মি জলবিম্ব যথা অগণন,
মিশাইছে সিন্ধুগর্ভে,—সলিলে সলিলে ;
সিন্ধুর সলিল, শক্তি, থাকিছে তেমন।
তেমতি হিরণ্যগর্ভে—অব্যয়, অক্ষয়,—
বিবর্ত্তন কারণের প্রবাহে জন্মিয়া,
অনন্ত জগত স্থূল,—তরঙ্গ নিচয়,—
আবার হিরণ্যগর্ভে যাইছে মিশিয়া
কল্পে কল্পে মহাচক্রে, জন্মে জন্মে আর
জীবগণ বিবর্ত্তন চক্রে ক্ষুদ্রতম ;
কালারম্ভে এককর্ম্মী, এক কর্ম্ম আর,
এক মহাকর্ম্ম নীতি,—নীতি-বিবর্ত্তন।
এই মহাকর্ম্মচক্রে, আছে নিয়োজিত
জড় চেতনের কর্ম্ম-চক্র ক্ষুদ্রতর ;
কর্ম্মফলে জীবগণ হইয়া চালিত
হয় আবর্ত্তিত চক্রে জন্মজন্মান্তর।
কর্ম্মফলে জন্ম, পার্থ! মৃত্যু কর্ম্মফল ;
কর্ম্মফল সুখ দুঃখ। করিবে রোপণ
যেইরূপ বীজ, পাবে অনুরূপ ফল;
কুবৃক্ষে সুফল নাহি ফলিবে কখন।
জন্মিয়া সচ্চিদানন্দে, সৃজি চরাচর,
ছুটেছে সচ্চিদানন্দে চক্র বিবর্ত্তন।
সেই সৎ চিতানন্দে গতি নিরন্তর,
জড় চেতনের মহাধর্ম্ম সনাতন।
কর কর্ম্ম, এই গতি করি অনুসার,—
পাবে জন্ম, পাবে লোক, শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠতর।

কর কর্ম্ম, এই গতি প্রতিকূলে আর,—
পশুত্ব—জড়ত্ব—পাবে জন্মজন্মান্তর।
দেখ বিবর্ত্তন গর্ভে করে আকর্ষণ
জীবে জীব, জলে জল। হইবে অঙ্কিত
কর্ম্মফলে যে প্রকৃতি আত্মায় যখন,
সেইরূপ ক্ষেত্রে আত্মা হবে আকর্ষিত
জন্মান্তরে। কর ঊর্দ্ধে ইষ্টক ক্ষেপণ,
পৃথিবীর আকর্ষণ হইলে অতীত,
পড়িবে না; সেই গ্রহে করিবে গমন,
সেই গ্রহ আকর্ষণে হইবে পতিত।
থাকে পশু আকর্ষণ, প্রবৃত্তি জড়ের,
পশুত্বে জড়ত্বে তব হইবে জনম!
থাকে দেব আকর্ষণ, প্রকৃতি দেবের,
দেবলোকে, শ্রেষ্ঠলোকে, করিবে গমন।]
এইরূপে লভি গতি শ্রেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠতর,
হইলে জীবাত্মা সৎচিদানন্দময়,
মশাইবে রবিকরে বর্ণহীন কর,
হবে বিশ্ববারি মহাপারাবারে লয়।
এরূপে সচ্চিদানন্দে সৃষ্ট বিবর্ত্তনে,
এরূপে সচ্চিদানন্দে স্থিত চরাচর;
এরূপে সচ্চিদানন্দে লয় বিবর্ত্তনে
হইতেছে চরাচর কল্পকল্পান্তর।
কেন এই বিবর্ত্তন? কেন এ সংসার?—
তাঁর মায়া, তাঁর ছায়া, প্রকৃতি তাঁহার!
এই বিবর্ত্তন গতি,—জগত মঙ্গল,—
অনুকূলে প্রতিকূলে কর্ম্ম অনুসারে

ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপপুণ্য। এই কর্ম্মফল
জন্ম মৃত্যু মানবের, সুখ দুঃখ আর।
কেন প্রতিকূল কর্ম্ম করি আমি নর?—
চৈতন্যের বিম্ব আমি। আমি ইচ্ছাময়!
চেতনের চেতনত্ব করিছে নির্ভর
এ ইচ্ছার স্বাধীনত্বে জান ধনঞ্জয়!
এই বিবর্ত্তন গতি,—জগত মঙ্গল,—
কত প্রতিরোধ, হও অধর্ম্মে পতিত,
বিবর্ত্তন মহাশক্তি দিয়া কর্ম্মফল
যাইবে বহিয়া করি তোমায় পেষিত।
অধর্ম্মের অভ্যুত্থান দেখ কি ভীষণ
সেই কুরুক্ষেত্রে, এই প্রভাসে আবার।
ক্ষত্রিয়ের কর্ম্মফল হায়। নিরমম
কুরুক্ষেত্রে, এ প্রভাসে যাদবের আর!
ছুটিয়াছে বিবর্ত্তন,—মানব মঙ্গল,—
উড়াইয়া তৃণবৎ মত্ত ঐরাবত—
অধর্ম্মী ক্ষত্রিয় জাতি! কি শান্তি শীতল
ধর্ম্মরাজ্য ছায়াতলে লভিছে ভারত!

অর্জ্জুন। কিন্তু কর্ম্মফল-রেখা করিতে মোচন
নাহি কি পারেন হরি পতিতপাবন?

ব্যাস। পারেন—পতিত যদি আত্ম সমর্পণ
করে পাদপদ্মে তাঁর, পাণ্ডব যেমন।
পতিতের পাপকর্ম্মে প্রবৃত্তি তখন
থাকে না কৃপায় তাঁর। পুণ্যকর্ম্মফলে
পাপকর্ম্মফল-রেখা হয় বিমোচন,
অঙ্গারের রেখা যথা নিরমল জলে।

জন্মান্ধ দেখে না চন্দ্র। কর্ম্মান্ধ তেমন
দেখে না বিশ্বের কৃপাময় সুধাকর!
দেখিল না ক্ষত্রিয়েরা; আপন স্বজন
দেখিল না যাদবেরা, কর্ম্মান্ধ পামর।
এইরূপ কর্ম্মান্ধেরে না কর সংহার,
আপনার কর্ম্মপথ, কর্ম্মপথ আর
মানবের, করিবে সে কণ্টক-আধার;—
প্রভাস ও কুরুক্ষেত্র কৃপা পারাবার!
রাজসূয়ে ধর্ম্মরাজ্য হইয়া স্থাপিত
ছিল কত দিন বল? কত দিন বল
—থাকিতে ক্ষত্রিয়জাতি, যাদব পতিত—
থাকিত এ অট্টালিকা বালিতে চঞ্চল?
কুরুক্ষেত্রে ধর্ম্মরাজ্য হইয়া স্থাপিত,
হয়েছিল যাদবের পাপে সচঞ্চল
ভিত্তিমূল। হইয়াছে প্রস্তরে প্রোথিত
সেই ভিত্তি;—গাও, পার্থ। মানব মঙ্গল!

অর্জ্জুন। দেখিয়াছি, প্রভু, আরো দৃশ্য ঘোরতর!
আসিলাম কৃষ্ণাদেশে দ্বারবতী ছাড়ি
যবে নাগরিক সহ, কি যে ভয়ঙ্কর
ভূমিকম্পে, জলকম্পে সমুদ্রের বারি
প্লাবিল সে মহাপুরী তরঙ্গে ভীষণ,
বালকের ক্রীড়াপুরী যেন তীরস্থিত।
সিন্ধুগর্ভে, ধরাগর্ভে, কি ঘোর গর্জ্জন!
হইল মুহূর্ত্তে সেই পুরী অন্তর্হিত!
সেই মহা সাম্রাজ্যের চিহ্ন নাহি আর।
চিহ্ন মাত্র নাহি দেব! সে মহালীলার।

ব্যাস। তাঁহার সাম্রাজ্য পার্থ! লীলাস্থল নয়
ক্ষুদ্র দ্বারবতী, নহে ক্ষুদ্র বৃন্দাবন।
তাঁর রাজ্য, লীলাস্থল, মানব-হৃদয়।
তাঁর রাজ্য বিশ্বরাজ্য; তিনি নারায়ণ!
তাঁর রাজ্য, ধর্ম্মরাজ্য;—করিতে প্লাবিত
নাহি সাধ্য সমুদ্রের। কাল-পারাবার
চুম্বিয়া চরণ তট হবে প্রবাহিত,
লইয়া চরণরেণু মস্তকে তাহার।
কৌরবের রাজ্য, আর রাজ্য যাদবের,
বৃন্দাবন, ইন্দ্রপ্রস্থ, দ্বারকা, হস্তিনা,
কেবল নিমিত্ত মাত্র ধর্ম্ম সাম্রাজ্যের
অদ্ভুত নির্ম্মাণপথে,—অপূর্ব্ব মহিমা
মানব হইত ভ্রান্ত এ রাজ্য পার্থিব
থাকিলে পৃথিবীবক্ষে; পশ্চাতে তাহার
দেখিত না অন্ধ নর সে রাজ্য ত্রিদিব;
দেখিত না লীলাময় যুগ-অবতার।
নাহি সেই বৃন্দাবন; নাহি দ্বারবতী;
রহিবে না ইন্দ্রপ্রস্থ; রবে না হস্তিনা।
রবে সেই রাজ্য, রবে সে অমরাবতী।
ব্যাপিবে অনন্তকাল সে রাজ্য-মহিমা।
জগত,—ভারত মত,—ছায়ায় তাহার
পাইবে অনন্ত শান্তি, জুড়াইবে প্রাণ;
মানব অনন্তকাল লভিবে উদ্ধার,
প্রেমানন্দে সুমধুর গাই কৃষ্ণনাম।
বহিছে মহর্ষি-নেত্রে ধারা দর দর,
বহিতেছে দর দর নেত্রে ফাল্গুনির।

আত্মহারা কিছুক্ষণ চাহি স্থিরতর
অপরাহ্ণ সিন্ধুপানে, মূরতি গম্ভীর।

অর্জ্জুন। নিবেদিব হায়! দেব চরণে কেমনে
এ শোক-কাহিনী-শেষ? যেই মনস্তাপ
জ্বলিছে দাবাগ্নি মত মরমে মরমে
কেমনে দেখাব আমি, চিত্রিব সে পাপ?
লইয়া চতুর্দ্দশীর শশি-রেখা শেষ,—
হত-শেষ যদুকুল,—অনাথা রমণী,
অনাথ শিশু ও বৃদ্ধ,—পঞ্চনদ দেশ
করিনু প্রবেশ যবে, মহর্ষি। তখনি
আক্রমিল দস্যুগণ; করিল হরণ
রত্নরাজি, অশ্ব রথ; করিল হরণ
যাদব-রমণীরত্ন;—আমি নরাধম
সে দৃশ্যও ভগবন্! করেছি দর্শন!
যে গাণ্ডীব ছিল মম কার্ম্মুক ক্রীড়ার,
নাহি শক্তি সে গাণ্ডীবে করি জ্যারোপণ।
নাহি পড়ে অস্ত্র মনে; নাহি বল আর
কুরুক্ষেত্র-জয়ী ভুজে; হায়! অদর্শন
হইয়াছে সেই দেব-সারথি আমার,—
শক্তিরূপী নারায়ণ। নাহি প্রবাহিত
কুরুক্ষেত্র-জয়ী বীর্য্য ধমনীতে আর;—
করি শিলাময় চন্দ্র, রবি অস্তমিত।
হয়েছে গাণ্ডীব যেন যষ্টি স্থবিরের।
তাহাতে করিয়া ভর করিনু দর্শন
সে লুণ্ঠন, সে হরণ। হায় প্রবীণের
শুনিলাম হাহাকার, শিশুর রোদন!

দেখিলাম অধর্ম্মের যেই অভ্যুত্থান,
করি নাই কুরুক্ষেত্রে প্রভাসে দর্শন ;—
সুরামত্তা যাদবীরা, কামাসক্ত প্রাণ,
করিল তস্করগণে আত্মসমর্পণ।
দেখিতেছি এই দৃশ্য ; গাণ্ডীব বাহিয়া
পড়িতেছে অশ্রুধারা,—পড়িছে তরল
ফাল্গুনির মনস্তাপ ; রহিয়া রহিয়া
শেষ গৈরিকের ধারা তরল অনল,
পড়িছে বহিয়া ধীরে যেন নির্ব্বাপিত
আগ্নেয় ভূধর অঙ্গে, অঙ্গে ফাল্গুনির ;
দেখিতেছি এ নরক ;—দেব ! আচম্বিত
কি স্বর্গ উঠিল ভাসি নেত্রে এ পাপীর !
অশ্বপৃষ্ঠে দুই নারী,—দেবী কি মানবী !—
এ নরকে তারা-বেগে করিল প্রবেশ।
কি শান্তি প্রতিমা দুটি, কি করুণা ছবি !
পবিত্র গৈরিক বাহি পড়িয়াছে কেশ।
দুই পবিত্রতা মূর্ত্তি,—রয়েছে চাহিয়া
দস্যুগণ পাষাণের মূরতি যেমন ;
পাষাণ-প্রতিমা যেন আছে নিরখিয়া
পাপিষ্ঠা যাদবীগণ ;—অপূর্ব্ব দর্শন !
থামিয়াছে কোলাহল ; নীরব প্রান্তর ;
অনিশ্বাস নাসা ; প্রাণ যন্ত্র অবিচল।
কি যেন তাড়িত-স্রোত করিল সত্বর
চিত্রে পরিণত দেব ! সে লুণ্ঠন স্থল।
স্থবির রোরুদ্যমান রয়েছে চাহিয়া ;
রয়েছে রোরুদ্যম না চাহি শিশুগণ ;

রয়েছে চাহিয়া দস্যু, ভুজে আলিঙ্গিয়া
হৃতা নারী-রত্ন, করে লুণ্ঠনের ধন।
মধ্যস্থলে দুই অশ্ব স্থির, অবিচল ;
সুভদ্রা শৈলজা অশ্বে স্থিরা অবিচলা।
স্থিরনেত্রে চেয়ে আছে সে লুণ্ঠনস্থল ;
মেঘপৃষ্ঠে শরতের দুই শশিকলা।
মুহূর্ত্তেক পরে দেব ! চলিল ছুটিয়া
অনার্য্য তস্করগণ ; যদুকুল জায়া
ছুটিল পশ্চাতে,—এও আসিনু দেখিয়া !—
পাপের পশ্চাতে যেন কর্ম্মফল-ছায়া।
যাইতে ছুটিয়া এক যাদবী পাপিনী
ঈর্ষার হানিল বর্শা বক্ষে সুভদ্রার।
ছুটিল শৈলের অশ্ব, করুণারূপিণী
লইল পাতিয়া বর্শা বক্ষে আপনার !
তিরোহিত নারায়ণ ; ধ্বংস যদুকুল ;
নিমজ্জিত দ্বারবতী গর্ভে জলধির ;—
ততোধিক প্রাণ দেব ! হয়েছে আকুল
নিরখি পতন ঘোর যদু-রমণীর।
আসিল প্রভাসে ভদ্রা নিয়ে শৈলজায়
আহতা করুণাময়ী। করি অতিক্রম
দস্যুভূমি পঞ্চনদ, সাম্রাজ্য-ছায়ায়
প্রবেশিয়া পাণ্ডবের, করিয়া প্রেরণ
ধ্বংসশেষ, হতশেষ, যাদবী যাদব
ইন্দ্রপ্রস্থে প্রজাসহ, আসিনু হেথায়
জুড়াইতে হৃদয়ের এ ঘোর বিপ্লব
মহর্ষির কল্পতরু চরণ-ছায়ায়।

সহিত না প্রাণে মম আত্ম-বিনাশের
সেই মহা শোকদৃশ্য; ধৈর্য্য-বীর্য্য-চ্যুত
পারিত না ধনঞ্জয় সাহিতে উদ্ধার
যাদবের; তাই বুঝি ছিনু অনাহূত
প্রভাস উৎসবে! দেব! বালকের বল
নাহি ভুজে, নাহি ভগ্ন হৃদয়ে আমার।
রথী-হীন দেহ-রথ হয়েছে অচল,
অপার্থ হয়েছে পার্থ;—কি কর্ত্তব্য তার?

ব্যাস। গাণ্ডীবীর পরাভব, যাদবী হরণ,—
সকলি তাঁহার লীলা! মহিমা পূরিত
দুই ভাবি ইতিহাস, পার্থ! নিরুপম
এই দুই ঘটনায় হয়েছে সূচিত।

যাদবী হরণে আশু হইয়া মিশ্রিত
রক্ত আর্য্য অনার্য্যের, ব্যাপিয়া ভারত
কিছু দিন পরে হবে কি শান্তি স্থাপিত
ধর্ম্মরাজ্য-ছায়াতলে! আলোকি জগত
দর্শনের বিজ্ঞানের নক্ষত্র অমর
শান্তির আকাশে কত উঠিবে ভাসিয়া!
শিল্প বাণিজ্যের কুঞ্জে পিক মধুকর
সাহিত্যের, সঙ্গীতের, উঠিবে গাইয়া।
আর্য্য অনার্য্যের রক্ত হইয়া মিশ্রিত
কত নব জাতি, কত সাম্রাজ্য মহান
করিবে সৃজন পার্থ! যুগ যুগান্তর!
ভারতের মরুস্থান হবে রাজস্থান!
তরঙ্গে তরঙ্গে কত বিপ্লব ভীষণ
এই নব শক্তি-মূলে হইয়া প্রহত

হবে ভগ্ন, ওই সিন্ধু-তরঙ্গ যেমন ;
হৃদে কৃষ্ণ, ভুজে পার্থ, নব ধর্ম্মব্রত
রবে যত দিন পার্থ। এ মহাভারত
রহিবে অচল দৃঢ় হিমাচল প্রায়।
এই কালে কত রাজ্য জল-বিম্ববৎ
উঠিবে পড়িবে মহাকালের ক্রীড়ায়।
গাণ্ডীবীর গাণ্ডীবের নাহি কার্য্য আর
এ ভারতে ; নাহি কার্য্য ভারতে আমার।
আমরা সলিল-বিম্ব যে মহালীলার,
সেই লীলা শেষ, বিম্ব কি করিবে আর ?
এ আশ্রম সিন্ধু-গর্ভে হবে নিমজ্জিত ;
হিমাচলে মহাধ্যানে হব নিমগন।
রাখি বজ্রে ইন্দ্রপ্রস্থে, রাখি পরীক্ষিত
হস্তিনায়, কর মহাপ্রস্থান এখন
পঞ্চ ভ্রাতা, সহ ভোজ অন্ধক কুকুর—
হত-শেষ যদুকুল। লঙ্ঘি হিমাচল,
ক্রমে ক্রমে বহু-দেশ, জনপদ, পুর,
করিয়া লঙ্ঘন, এই মহাযাত্রীদল,
—অসংখ্য মানব জাতি, পশু নির্ব্বিশেষ,
পতিতপাবন নামে করিয়া উদ্ধার,
করি পশু নর, মহামরু মহাদেশ,—
হরিকুল,—যদুকুল,—স্রোত দুর্নিবার
'লোহিত সাগর' তীরে হবে উপনীত
সহস্র সহস্র বর্ষে, পশ্চিমে সুদূর।
খুলিবে কি ইতিহাস! করিবে পূরিত
কি অমৃতে, অমরত্বে, কি মরু বন্ধুর

হইয়া উত্তরবাহী করিবে স্থাপিত
সুপবিত্র যদুরাজ্য, পুণ্য যদুপুর,
পূরব দক্ষিণ তীরে 'লবণ সিন্ধুর'।
গিয়াছেন হলধর সহ হরিকুল
সিন্ধুর উত্তর তীরে করিতে কর্ষণ
মহা নবধর্ম্ম হলে। জগতে অতুল
কত আর্য্য মহারাজ্য করিবে স্থাপন
ত্রিকূলে ভূমধ্য সেই 'লবণ সিন্ধুর,
এই দুই যাত্রীদল! কতই জগত
নূতন নূতন তর! ব্যাপিয়া সুদূর
করিয়া আলোকময় নব ভবিষ্যত!"
সেই মহাভবিষ্যত যেন উদ্‌ঘাটিত
মহর্ষির দুনয়নে। কপোল বহিয়া
কি আনন্দধারা বক্ষ করিছে প্লাবিত!
কি মূর্ত্তি মহিমাময়! কি ধ্যানে বসিয়া!
কি যেন অদৃশ্য সূক্ষ্ম তাড়িত পরশে
হইল পবিত্র দেব-দেহ রোমাঞ্চিত।
"আসি মা!"—কহিয়া উঠি যেন ধ্যানবশে
চলিলেন; চলিলেন ফাল্গুনি বিস্মিত।

ত্রয়োদশ সর্গ।

—*—

ভবিষ্যৎ।

ধীরে বসন্তের সন্ধ্যা, প্রকৃতিরূপিণী ধীরে,
স্থষ্টির অন্তিম অঙ্ক করি অভিনয়,
মিশাইছে ধীরে ধীরে প্রভাস সিন্ধুর বক্ষে,—
সিন্ধু যেন নারায়ণ শান্তির আলয়।
সভস্ম গৈরিকাবৃতা শোভিতেছে বেলা-ভূমি,
ধূসর-বাসনা শান্তিময়ী উদাসিনী
সাষ্টাঙ্গে প্রণতা,—যেন মহানির্ব্বাণের গীত
শুনিতেছে সিন্ধু-কণ্ঠে যোগস্থা যোগিনী।
যেই শিলাসনে হরি হইলেন তিরোহিত
সেই শিলাপাদমূলে, শিলা অভ্যন্তরে,
বসিয়া সুভদ্রা দেবী উদাসিনী শান্তিময়ী,
প্রথম শিলায় শির রাখি ভক্তিভরে।
শৈলজা শায়িতা অঙ্কে, উদাসিনী শান্তিময়ী,
সৌন্দর্য্যের স্বপ্ন মুখ বক্ষে সুভদ্রার;
যোগস্থা যোগিনী শৈল নিমীলিত দুনয়ন,—
অধুজ স্তবকে মালা অপরাজিতার।
শিরদেশে দ্বৈপায়ন, পদতলে ধনঞ্জয়,
দাঁড়ায়ে মূরতি মত স্থির তিন জন,
শান্তিলীলামৃতে ভরা করুণা-ত্রিদিব মুখ,
করিছেন অনিমিষ নেত্রে দরশন।

মেলিল নয়ন শৈল ; শান্তির ঈষদ হাসি
ভাসিল অধর প্রান্তে, ভাসিল নয়নে,—
ভাসিল জ্যোৎস্না যেন সুনীল দর্পণে।
চাহি দ্বৈপায়ন প্রতি সজল নয়নে শৈল
কহিল—“করুণাময় ! করেছি স্মরণ
অন্তিমে, দুহিতা শিরে দেও শ্রীচরণ !—
দেও পাদপদ্ম পিত !”—কহিল চাহিয়া পার্থে—
“দেশ দেশান্তরে তুমি যেই অনাথায়
খুঁজিলে অধীর শোকে, ইন্দ্রপ্রস্থ সিংহাসনে
চাহিলে দুহিতা মত বসাইতে, হায় !
দেখ সে দুহিতা তব, মাতা সুভদ্রার অঙ্কে,
কি ছার খাণ্ডব রাজ্য তুলনায় তার ?
তোমার কৃপায় আজি পতি মম নারায়ণ !

যেই প্রেমগঙ্গা পদে জন্মিল তোমার,
পাইয়াছে নারায়ণ প্রেম-পারাবার !
পেয়েছ দুহিতা তুমি, আমি পাইয়াছি পতি,
হইয়াছে উভয়ের পূর্ণ মনস্কাম,
লও দুহিতায় বুকে, গাও কৃষ্ণনাম।”
“ম মা !”—কাঁদি উচ্চস্বরে, অর্জ্জুন অধীর শোকে
পড়িলেন সেই ক্ষুদ্র বক্ষে শৈলজার।
দুই ভুজে প্রেমভরে জড়ায়ে পার্থের গলা,
—শোভিল গলায় যেন নীলমণি-হার,—
আছে শৈল চাহি মাতৃ-মূর্ত্তি করুণার।
কহিলেন ধনঞ্জয়—“মা ! তোর এ ক্ষুদ্র বুক
অর্জ্জুনের শান্তিধাম, ত্রিদিব তাহার,
অর্জ্জুনের এই স্বর্গ, তুই মা করুণাময়ী

লইবি কি কাড়ি,—করি মরু এ সংসার ?
তিরোহিত নারায়ণ ; ধ্বংসশেষ যদুকুল ;
স্বপ্নশেষ দ্বারবতী, চিহ্ন নাহি তার ;—
বড়ই আকুল প্রাণ। মরুভূমি এ সংসার।
একই সান্ত্বনা তুই পার্থ সুভদ্রার।
তোর স্নেহে, তোর প্রেমে, ভুলিনু পুত্রের শোক,
ভুলিনু সংসার মা গো! দেখি তোর মুখ।
তোর স্নেহে, তোর প্রেমে, আশ্রম কুটীর খানি
হয়েছিল কি স্বর্গ মা। কি স্বর্গ এ বুক!
আমাদের এই স্বর্গ, আমাদের এই শান্তি,
হরিয়া কি যাবি তুই দিয়া নব শোক ?
পাইয়াছি পুত্রশোক, দিয়া এই পুত্রীশোক,
জীবন সন্ধ্যার শেষ হরিয়া আলোক ?
বড় সাধ ছিল,—তোরে, অভিরে, লইয়া বুকে,
শুইয়া ভদ্রার অঙ্কে, শিরে হৃষীকেশ
পাদপদ্ম, করিব এ জীব-লীলা শেষ।
কিন্তু পূরিল না সাধ : অভিমন্যু গেল চলি ;
অন্তর্হিত নারায়ণ ; তুই মা আমার
গেলে চলি এইরূপে, হায়! পার্থ সুভদ্রার
এ জগতে কে রহিল, কি রহিল আর ?
অস্তমিত প্রভাকর, জগতের যুগ-সূর্য্য,
অন্তর্হিত যদুকুল কিরণ তাঁহার।
একটি কিরণ-বিন্দু তুই কাদম্বিনী-বক্ষে
আছি আমি, তুই গেলে রব কোথা আর ?
যাবি যদি, নিয়ে চল তোর করুণার বক্ষে
যথা পুত্র, যথা কন্যা যাইবি আমার!"—

রুদ্ধকণ্ঠ বাষ্পে, কথা সরিল না আর।
শৈলজা সজলনেত্রে চাহি অর্জ্জুনের মুখ
কহিল—"এ শোক পিত! কর পরিহার!
শৈলের কি শুভ দিন! এমন কে আছে বল
এ জগতে ভাগ্যবতী মত শৈলজার!
শুয়েছে কি মহাতীর্থে, কি পবিত্র দেব-বুকে,
আসিয়াছে কি সুন্দর লয়ে পুষ্পরথ
তার পুত্র, পুত্রবধূ,—উত্তরা ও অভিমন্যু,—
আসিয়াছে পিতা মাতা,—কি পুণ্য জগত!"
নীরব, নয়ন স্থির, চাহিয়া অনন্তাকাশে
কিছুক্ষণ সে জগত, কহিল আবার—
"কেবল একটি ভিক্ষা চরণে তোমার।
ওই দেখ নিম্ব বৃক্ষ, পবিত্র ছায়ায় যার
হইলেন তিরোহিত নর-নারায়ণ,
এই কাষ্ঠে দারুমূর্ত্তি, অনার্য্য শিল্পীর করে
নীল মাধবের পিত! করিবে সৃজন।
এক পার্শ্বে জগন্নাথ, অন্য পার্শ্বে ধনঞ্জয়,
শান্তির প্রতিমা মধ্যে সুভদ্রা জননী,
অনন্ত করুণাময়ী পতিতপাবনী।
প্রভাস সিন্ধুর তীরে এই তিরোধান ক্ষেত্রে,
মন্দির গগনস্পর্শী করি বিনির্ম্মিত,
এই তিরোধান-শৈলে নির্ম্মাইয়া রত্নবেদি,
নবধর্ম্ম মহামূর্ত্তি করিবে স্থাপিত।
সেই মন্দিরের ছায়া পড়িবে এ সিন্ধু বক্ষে,
পড়িবে কালের বক্ষে, যুগ যুগান্তর;
অনন্ত মানব যাত্রী দেখি চূড়া সুদর্শন,

যাবে সিন্ধুযাত্রী মত, জন্ম জন্মান্তর
অনন্ত শান্তির তীরে ; কতই বিপ্লব ঘোর
তরঙ্গে তরঙ্গে আসি মন্দির-ভিত্তির
প্রহারিবে পাদমূলে ; হবে যুগে যুগে কত
স্থানান্তর, রূপান্তর, মূরতি, মন্দির।
এ মন্দির, এ মূরতি, নীল মাধবের, পিত!
অনার্য্যের করে তুমি করিবে অর্পণ ;
যুগে যুগে, বনে বনে, বিপ্লবের হুতাশনে,
রক্ষিবে পতিত, মূর্ত্তি—পতিতপাবন।
আর্য্যদের আছে জ্ঞান, আছে শাস্ত্র আর্য্যদের,
অনন্ত শাস্ত্র-শিক্ষক আছে ঋষিগণ ;
পতিত অনার্য্যদের কিছু নাই, কেহ নাই,
দিও তাহাদের মূর্ত্তি পতিতপাবন!
এই মন্দিরের ক্ষেত্র আর্য্যের ও অনার্য্যের
হইবে শ্রীক্ষেত্র, মহাসম্মিলন ধাম ;
অনার্য্য ব্রাহ্মণ-আর্য্য গাবে এক কৃষ্ণনাম,
আর্য্য ও অনার্য্য এক প্রেমে ভাসমান,—
প্রতিধ্বনি তুলি সিন্ধু গাবে হরিনাম।"
অর্জ্জুন উচ্ছ্বাসে মত্ত, কহিলেন—"মা! আমার!
অর্জ্জুন, অর্জ্জুন-পৌত্র, প্রপৌত্র তাহার,
করি শূন্য কোষাগার ইন্দ্রপ্রস্থ হস্তিনার,
পালিবে মা! তোর আজ্ঞা, প্রতিজ্ঞা আমার।
কেবল একটি ভিক্ষা,—বীরঘাতী ধনঞ্জয়,
অর্জ্জুন আকণ্ঠ বীর-রক্তে নিমজ্জিত ;
এ মহাবেদির বক্ষে বসাইলে এ পাপীরে,
এ পবিত্র বেদি মা গো! হবে কলুষিত।

অর্জ্জুনের পাপ নাম, অর্জ্জুনের পাপকীর্ত্তি,
এই ভস্মরাশি মত সিন্ধুতীরস্থিত,
অচিরে কালের সিন্ধু, পবিত্রিয়া ধরা বক্ষ,
একই উচ্ছ্বাসে যেন করে অপনীত।
মধ্য মূর্ত্তি জগন্নাথ, শৈলজা সুভদ্রা পার্শ্বে,
বিরাজিবে কাল-বক্ষে এ তিন মূরতি।
মধ্যে হরি হিমাচল, পার্শ্বে প্রেম-স্রোতস্বতী
বহিবে অলকানন্দা, মাতা ভাগীরথী।"
হইল মলিন মুখ শৈলজার, শৈল যেন
পাইল পরম ব্যথা, সজল নয়ন
কহিল কাতরে শৈল—"ধনঞ্জয় মহাপাপী !
কৃষ্ণ-সখা পাপী ! তবে পাপী নারায়ণ !
তাঁর রাজ্যে কত হত্যা ! কি জীব-শোণিত-সিন্ধু
হইতেছে তাঁর রাজ্যে নিত্য প্রবাহিত !
সেই মহাহত্যা-ক্ষেত্র তুলনায় কুরুক্ষেত্র,
অনন্ত সিন্ধুর কাছে বিন্দু পরিমিত।
যার ভুজবলে এই বিরাজিছে মহারাজ্য,
বিরাজিছে মহাশান্তি ব্যাপিয়া ভারত,
যাহার বীরত্ব গাথা, যার করুণার কথা,
গাইছে, অনন্ত কাল গাইবে জগত।
অধার্ম্মিক মহাপাপী আজন্ম শত্রুর প্রতি
রণক্ষেত্রে করুণায় শ্লথ কর যার,
আমি পতিতার প্রতি করুণার এ প্রবাহ,
পাপী সেই বলদেব, দেবতা আমার !"
ফিরায়ে মলিন মুখ, চাহি দ্বৈপায়ন প্রতি,
কাতরে কহিল শৈল—"কহ ভগবান !

দুহিতার এ কামনা, শিষ্যার অন্তিম আশা,
করিবে পূরণ তুমি, তুমি পূর্ণকাম।"
কহিলা—"তথাস্তু।" ।"—শান্ত কণ্ঠে ভগবান।
"আর এক ভিক্ষা প্রভু!"—কহিতে লাগিল শৈল
"একটি আশঙ্কা-ছায়া তব দুহিতার
পড়িয়াছে এ হৃদয়ে, কর অপসার!
সম্বরিলে নাগরাজ আপনার পুণ্যলীলা,
করি এই তীর্থে ক্রিয়া অন্ত্যেষ্টি তাহার,
ছিন্ন সংসারের শেষ বন্ধন আমার!—
চলিলাম নাগপুরে, অনার্য্যের অভ্যুত্থান
নিবারিতে,—কিন্তু লীলা কে বুঝিবে তাঁর?
শুনিলাম সেনাপতি তক্ষক গিয়াছে চলি
লুণ্ঠিতে যাদব-পত্নী, যাদব ভাণ্ডার,—
কি পাপের অভিনয় দেখিলাম আর!
এ পাপের পরিণাম—জ্বলিছে কি কুরুক্ষেত্র,
আর্য্যের ও অনার্য্যের, ভারতে আবার?
আবার অনার্য্য জাতি হবে, হিংস্র পশু মত,
উৎপীড়িত, বিতাড়িত, বিধ্বংসিত আর?
আবার কি নর-রক্তে যাবে ভাসি ধর্ম্মরাজ্য?
এই প্রেম, এই শান্তি, এই সম্মিলন
আর্য্যের ও অনার্য্যের, হইবে স্বপন?"
স্থিরনেত্রে দ্বৈপায়ন শৈলজার নেত্র পানে
চাহিলেন নির্নিমেষ। শৈলের নয়নে
চাহি শূন্যে লক্ষ্যহীন হইল অচল, স্থির;
শৈলজা যোগস্থা, শৈল প্রতিমা যেমন!
কহিলেন মহাযোগী—"ভারতের, জগতের,

দেখ মহাভবিষ্যত!—কি দেখিছ বল?"
উত্তরিল শৈল, স্থিরনেত্র ছল ছল,—
"বড়ই নিষ্ঠুর দৃশ্য ওই দেখিতেছি কাছে!
জলিয়াছে কি দারুণ সমর অনল!
পুড়িতেছে নাগজাতি তক্ষকের মহাপাপে,
পোড়ে যথা যজ্ঞানলে পতঙ্গের দল।
দগ্ধশেষ নাগগণ, কারুর পালিত পুত্র
মহর্ষি আস্তীক-পদে লইল আশ্রয়;
ঋষি অগ্রে অপহৃতা যাদবীর পুত্রগণ
করিল কি মহাসন্ধি, অমর অক্ষয়!
নিবি নাগ-যজ্ঞানল, কৃষ্ণ-প্রেমে চারি যুগে
হ'ল আর্য্য অনার্য্যের পূর্ণ সম্মিলন!
যে ধর্ম্মের শুক্ল পক্ষ প্রবেশিল কুরুক্ষেত্রে,
আজি পূর্ণমাসী তার শান্তি-নিকেতন!
শিরে পূর্ণচন্দ্র কৃষ্ণ; ভারত পূর্ণিমালোকে
সহস্র সহস্র বর্ষ যাইছে ভাসিয়া
অনন্ত উন্নতি-পথে, হৃদয়ে অভয় শান্তি,
সম্মিলিত মহারক্ত শিরায় বহিয়া।
আবার সে চন্দ্রালোক ছাইল অধর্ম্ম-মেঘে,
কর্ম্ম,—যাগ যজ্ঞ; ধর্ম্ম,—স্বার্থ নিরমম
আরবার জীব-রক্তে রঞ্জিত হইল ধরা,
যজ্ঞ-ধূম-সমাচ্ছন্ন ভারত-গগন!
স্বার্থক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে অন্তর বিগ্রহানল
জলিল আবার সেই ধ্বংস্র কি ভীষণ!
ভারতের মহাধর্ম্ম, ভারতের মহাশক্তি,
ভারতের মহারাজ্য হইল স্বপন!

হিমাদ্রির ছায়া-তলে, মানব হিমাদ্রি মত,
মিশ্রিত ক্ষত্রিয় কুলে, পুনঃ ভগবান
আসিল রাজর্ষি রূপে, ঘোষিলা ভৈরব কণ্ঠে
কি মহান কর্ম্মবাদ! কি ধর্ম্ম নির্ব্বাণ!
নিবিল বিগ্রহানল, নিবিল সে যজ্ঞ-ধূম,
নিবিল সে জীবরক্ত-প্রবাহ নির্ম্মম,
মহাকরুণার স্রোতে; বহিল ভারত প্লাবি
সেই করুণার স্রোত পতিতপাবন,
উদ্ধারি পতিত জাতি কত দেশ দেশান্তর,
সৃজি কত মহারাজ্য, উপরাজ্য কত!

মানব লভিল শান্তি সহস্র সহস্র বর্ষ;
হইল জগত কিবা স্বর্গে পরিণত!
কালে, দূর পর্য্যটনে, স্থানান্তরে রূপান্তর,
হইল যুগল ধর্ম্ম-স্রোত তিরোহিত।
পৃথিবীর পশ্চিমার্দ্ধ নিমজ্জিত অন্ধকারে
রহিল, রহিল অর্দ্ধ মানব পতিত।
সুদূর সিন্ধুর তীরে আসিলেন আরবার,
নব যদুকুলে, নব যদুস্থানে, হরি
শান্তিরস-অবতার; উদ্ধারিলা পশুভূমি;
ঘোর আত্ম-বলিদানে শিলা দ্রব করি।
সেই বলিদান-কাষ্ঠে জ্বলিল কি মহালোক!
দেখাইল পশুগণে দেবত্ব মহান;
এই করুণার স্রোতে তবু নর-মরুভূমি
ভিজিল না, দ্রবিল না পশুত্ব পাষাণ।
লোহিত সমুদ্র তীরে সেই মহামরুভূমে,
পাণ্ডব প্রস্থান স্থানে, আসিল আবার

সখ্যরস-অবতার, নব ধনঞ্জয় রূপে,
মরুভূমে ভোগবতী করিয়া সঞ্চার।
মহা নব কুরুক্ষেত্র জ্বলিল পৃথিবীব্যাপী,
পশিল সে দাবানল ভারতে পতিত,—
ধর্ম্মহীন, বলহীন, ভারত জীবনহীন,
অন্তর বিগ্রহ-বিষে পুনঃ জর্জ্জরিত।
তখন জাহ্নবী-তীরে, চারু নব বৃন্দাবনে,
আসিলেন গৌরহরি প্রেম-অবতার;
কি মধুর প্রেমরসে ভাসিছে ভারত ভূমি!
উথলিছে কি মধুর প্রেম-পারাবার!
কালা হইয়াছে গোরা, জীর্ণবাস পীতধড়া,
হয়েছে মোহন বাঁশী দণ্ড বৈরাগীর।
চন্দন হয়েছে ধূলা, প্রেমে-গোরা আত্মহারা,
নয়নে যুগল ধারা প্রেম-জাহ্নবীর!
'হরিবোল! হরিবোল!'—নাচে গোরা বাহু তুলি,
ধূলায় সোণার অঙ্গ যায় গড়াগড়ি।
কি মধুর ব্রজলীলা করিতেছে অভিনয়,
প্রেমের ভিখারী প্রেম অজস্র বিতরি।
'হরিবোল! হরিবোল!'—গাইতেছে নর নারী,
'হরিবোল! হরিবোল!'—গায় ভাগীরথী;
'হরিবোল! হরিবোল!'—গাইতেছে পশু পক্ষী,
'হরিবোল! হরিবোল!'—গায় জলপতি।
"হরিবোল! হরিবোল!"—কি আনন্দে শৈলজার
করিল হৃদয় ক্ষুদ্র পূর্ণ উদ্বেলিত!
কি প্রেম নয়ন-ধারা পড়িছে ভস্রার অঙ্কে।
করিয়াছে ক্ষুদ্র দেহ মাধুরী পূরিত!

"হরিবোল! হরিবোল!"—আবার গাইল শৈল,
"হরিবোল"—গাইলেন কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন;
গাইলেন পার্থ ভদ্রা"হরিবোল হরিবোল!"
ধীরে শান্তি-সন্ধ্যা শৈল মুদিল নয়ন।
"মা! মা!"—কাঁদি ধনঞ্জয় মূৰ্চ্ছিত পড়িলা বুকে;
পড়িতেছিলেন ধীরে ভদ্রা মূরছিত,
কহিলেন দ্বৈপায়ন—"সুভদ্রে! সম্বর শোক!
তব করে ধৰ্ম্মরাজ্য রয়েছে স্থাপিত।"
সুপ্ত-উত্থিতার মত সুভদ্রা তুলিলা শির,
রহিলা চাহিয়া স্থির শৈল মুখ পানে,—
নিদ্রা যাইতেছে শান্তি আনন্দ-স্বপনে যেন!
দাঁড়াইয়া দ্বৈপায়ন নিমজ্জিত ধ্যানে।
ধীরে বসন্তের সন্ধ্যা, প্রকৃতিরূপিণী ধীরে,
সৃষ্টির অন্তিম অঙ্ক করি অভিনয়,
ডুবিল সিন্ধুর গর্ভে, সিন্ধু স্থির অবিচল,
যেন নারায়ণ-বক্ষ শান্তির আলয়!
সভস্ম গৈরিকাবৃতা শোভিতেছে সান্ধ্য বেলা,
ধূসরবসনা শান্তিময়ী উদাসিনী
সাষ্টাঙ্গে প্রণতা,—যেন নিৰ্ব্বাণের গীত
শুনিতেছে সিন্ধু-কণ্ঠে যোগস্থা যোগিনী।
সিন্ধুবক্ষে জলোচ্ছ্বাস ভক্তির উচ্ছ্বাস মত,
উঠিল, আসিল বেদি মূলে ধীরে ধীরে
তরঙ্গে তরঙ্গে মৃদু; তরঙ্গে তরঙ্গে পড়ি
শৈলজার দীর্ঘ কেশ ভাসিতেছে নীরে।
ভক্তির তরঙ্গ মৃদু মূৰ্চ্ছিত পার্থের পদ
প্রক্ষালিছে, ধীরে পাদপদ্ম মহর্ষির;

প্রক্ষালিছে ভক্তিভরে শৈল বেদি-বিলম্বিত
পবিত্র চরণাম্বুজ সুভদ্রা দেবীর।
বসন্তের শেষ সন্ধ্যা তমসারূপিণী ধীরে
সৃষ্টির অন্তিম অঙ্ক করি অভিনীত,
ঢাকিল প্রভাস-সিন্ধু প্রভাস সিন্ধুর তীর,
তামস সাগরে বিশ্ব করি নিমজ্জিত।
ধ্যানস্থ আকাশ পানে চাহিয়া মহর্ষি স্থির;
মূর্চ্ছিত অর্জ্জুন বক্ষে পড়ি শৈলজার;
প্রীতির প্রতিমা স্থির চাহি শান্ত শৈল-মুখ,
চাহিয়া, চাহিয়া, ভদ্রা দেখিলা না আর।
যাও মা মানবী-দেবি! পূর্ণ ব্রত মা! তোমার!
যাও মা করুণাময়ি! পূর্ণ ব্রত মা! আমার!
চতুর্দ্দশ বর্ষ মা গো! এরূপে বসিয়া ধ্যানে,
দেখিয়াছি কৃষ্ণলীলা, এরূপে বিমুগ্ধ প্রাণে।
পাইয়াছি শোকে শান্তি; পাইয়াছি দুঃখে সুখ।
প্রেমে ঝরিয়াছে নেত্র; প্রেমে ভরিয়াছে বুক।
ফলিয়াছে বহু আশা; ফলে নাই বহু আর;
বহিয়াছি এ জীবন আশার ও নিরাশার।
গীত শেষ অপরাহ্ণে, সন্ধ্যা আসিতেছে ধীরে!
বসি ধ্যানমগ্ন এই জীবন-প্রভাস-তীরে।
সম্মুখে অজ্ঞাত সিন্ধু, ভাসে কৃষ্ণ-পদতরী!
এই তীরে সন্ধ্যা; ঊষা অন্য তীরে মুগ্ধকরী!

সমাপ্ত।

পরিশিষ্ট।

(১)

প্রভাস, অষ্টম সর্গ, ১৪৬ পৃঃ—

"শ্বেতবর্ণ মহাবল ওই নব নাগপতি,—
কেতন সহস্র ফণা সহ সুদর্শন
উড়াইয়া, সিন্ধুমুখে কর তার অনুসার,
গাই আর্য্য অনার্য্যের গীত সম্মিলন।"

মহাভারত—মৌষল পর্ব্ব, চতুর্থ অধ্যায়,—

"এই কথা কহিয়া মহামতি মধুসূদন অবিলম্বে নির্জ্জন বন প্রদেশে গমন করিয়া দেখিলেন, বলদেব যোগাসনে আসীন রহিয়াছেন এবং তাঁহার মুখমণ্ডল হইতে এক বৃহদাকার শ্বেতবর্ণ সর্প বিনির্গত হইতেছে। ঐ সর্পের মস্তক সহস্র সংখ্যক ও মুখ রক্তবর্ণ। সর্প দেখিতে দেখিতে বলদেবের মুখ হইতে বহির্গত হইয়া সমুদ্রাভিমুখে ধাবমান হইল। তখন সাগর, দিব্য নদী সমুদয়, জলপতি বরুণ এবং কর্কোটক, বাসুকী, তক্ষক, পৃথুশ্রবা, বরুণ, কুঞ্জর, মিশ্রী, শঙ্খ, কুমুদ, পুণ্ডরীক, ধৃতরাষ্ট্র, হ্রাদ, ক্রাথ, শিতিকণ্ঠ, উগ্রতেজা, চক্রমন্দ, অতিষণ্ড, দুর্ম্মুখ ও অম্বরীষ প্রভৃতি নাগগণ সেই সর্পকে প্রত্যুদ্গমন পূর্ব্বক স্বাগত প্রশ্ন ও পাদ্য অর্ঘ্যাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন।"

যদি ইহা রূপক না হয়, যদি ইহার অর্থ বলরামের কতিপয় নাগসহ সমুদ্রযাত্রা না হয়, তবে কি?

Tod's "Rajsthan" Chap. 11. Foot note.

"Arrian notices the Similarity of the Theban and the Hindu Hercules and cites as authority the ambassador of Seleucus, Megasthenes, who says 'He uses the same habit with the Theban; and is particularly wor-

shipped by the Saraseni, who have two great cities belonging to them, namely Methoras (Mathura) and Clisoboras'.

"Diodorus has the same legend with some variety. He says 'Hercules was born among the Indians' * * (Hari-cul-es) – lord of the race (cula) of Hari, of which the Greeks might have made the Compound Hercules. Might not a colony after the great war have migrated westward? The period of the return of the Heraclidæ, the descendants of Atreas (Atri is progenitor of Haricula), would answer: it was about half Century after the great war."

শ্রীকৃষ্ণের বংশের পুরাণের নাম "হরিবংশ"। তাঁহার কুলের নাম তবে হরিকুল। হরিকুলের নেতা বা ঈশ্বর— হরিকুলেশ; গ্রীক Hercules. প্রভাস লিখিবার সময় কবি মহাভারতের উপরোক্ত ইঙ্গিত ও গ্রীক ইতিহাস আলোচনা করিয়া যখন এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তখন অতি প্রাচীন গ্রীক ঐতিহাসিকেরা ও চিরস্মরণীয় টড ও যে এরূপ বলিয়া গিয়াছেন তিনি জানিতেন না।

(২)

প্রভাস—দ্বাদশ সর্গ ২২৮ পৃষ্ঠা—

"লোহিত সাগর তীরে হবে উপনীত
সহস্র সহস্র বর্ষে পশ্চিম সুদূর।
*　　　*　　　*
পূরব উত্তর তীরে লবণ সিন্ধুর"

মহাভারত মহাপ্রস্থানিক পর্ব্ব, প্রথম অধ্যায়,— "অনন্তর তাঁহারা (পাণ্ডবেরা) ক্রমে ক্রমে অসংখ্য দেশ, নদী ও সাগর সমুদয় সমুত্তীর্ণ হইয়া লোহিত সাগরের কূলে সমুপস্থিত হইলেন। * * * অনন্তর পাণ্ডবগণ দক্ষিণাভিমুখে গমন করিয়া লবণ সমুদ্রের উত্তর তীর দিয়া দক্ষিণ পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।"

Bible. Genesis, Chapter XI.

"And the whole earth was of one language, and of one speech.

2. And it came to pass, as they journeyed from the East that they found place in the land of Shenar."

পাণ্ডবদিগের মহাপ্রস্থান কল্যব্দানুসারে খৃষ্ট পূর্ব্ব ৩১০১ বৎসরে সঙ্ঘটিত হয় এবং বাইবল অনুসারে নোয়ার, বা টড মহোদয়ের মতে বৈবস্বত মনুর, সন্তানগণের পশ্চিমাভিমুখে অভিযান প্রায় সেই সময়ে অনুমিত হইয়াছে।

Chap. XII.

"Now the Lord had said unto Abram, Get thee out of thy country and from thy kindred, and from thy father's house, unto a land that I will shew thee.

2. And I will make thee a great nation and I will bless thee, and make thy name great and thou be a blessing.'

4. So Abram departed * * and Abram was seventy and five years old when he departed out of Harae.

আধুনিক পুরাতত্ত্ববিদ্‌দিগের গণনানুসারে মহাপ্রস্থান খৃঃ পূঃ ১৫০০ বৎসরে সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। যদি তাহা হয়, তবে দেখা যাইতেছে বাইবলানুসারে এব্রামের অভিযান খৃঃ পূঃ প্রায়ই সেই সময়ে অনুমিত হইয়াছে।

মহাভারতের মহাপ্রস্থানিক পর্ব্বের দ্বিতীয় অধ্যায়, যাহাতে দ্রৌপদী ও চারি পাণ্ডবের ক্রমান্বয়ে মৃত্যু বর্ণনা আছে, যে উপাখ্যান, তাহা পড়িলেই বোধ হয় উহা বাদ দিলে দেখা যায় যে, মহাভারতের দুইটি মহাঘটনার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া জগত-পূজ্য কবি মহাভারত শেষ করিয়াছিলেন।

(১) বলরামের আত্মা সর্পরূপে প্রভাস সমুদ্রাভিমুখে ধাবিত হইল

(২) পাণ্ডবগণ একটি কুক্কুর (যদুকুলের কুক্কুর শাখা) সহ "অসংখ্য দেশ নদী সাগর সমুদয় সমুত্তীর্ণ হইয়া লোহিত সাগরের কূলে" ও "লবণ সমুদ্রের উত্তর তীরে" গমন করিলেন।

এরূপে যদুকুলের বা হরিকুলের দুই শাখা জল ও স্থলপথে পশ্চিমাভিমুখ গমন করিবার ইঙ্গিত পাইতেছি। অন্য দিকে গ্রীক ইতিহাস খুলিলে দেখিতেছি পূর্ব্ব দিক হইতে জলপথে হিরাক্লিদি ও হারকিউলিস (হরিকুলেশ) গ্রীসে উপনীত হইতেছেন ; এবং ইহুদি ইতিহাস খুলিলে দেখিতেছি স্থলপথে এক দল ঈশ্বরানুগৃহীত বংশ পূর্ব্বদিক হইতে আসিয়া ঈশ্বর আদেশে ঈশ্বর প্রতিশ্রুত দেশান্বেষণ করিতেছেন। "লোহিত সাগরের" পূর্ব্ব তীরে মহম্মদের লীলা-ভূমি আরব্য দেশ, এবং "লবণ সমুদ্রের" বা ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্ব তীরে খৃষ্টের লীলা-ভূমি যুদিয়া, উত্তর তীরে গ্রীস। সংস্কৃতে যদু শব্দের উচ্চারণ ইহুদি শব্দের মত ; ইহুদিদের দেশের নাম যুদিয়া। খৃষ্ট ও কৃষ্ণ শব্দের উচ্চারণে ও অর্থে আশ্চর্য্য সাদৃশ্য। খৃষ্ট জন্মিবেন, তাহা ভারতীয় অঘোরী সন্ন্যাসীর মত পূর্ব্ব দিক হইতে সমাগত এক মহাপুরুষ পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, এবং তিনি যে জন্মিয়াছেন, তাহাও পূর্ব্ব দিক হইতে জ্ঞানীরা গিয়া প্রচার করেন। আরও দেখিতেছি কি গ্রীসে, কি যুদিয়ায়, কি আরবে, ভারতীয় প্রতিমা পূজার মত প্রতিমা পূজা প্রচলিত ছিল। পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ চেষ্টা করিলে এরূপ অনেক প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারিবেন। এ সকল সাদৃশ্যের মধ্যে কোনও রূপ ঐতিহাসিক তত্ত্ব আছে কি ? না থাকে কাব্যকারের ক্ষতি নাই। তাঁহার পথ মুক্ত। প্রভাসের করিব পক্ষে মহাভারতের দুইটি ইঙ্গিতই যথেষ্ট। এতদ্ভিন্ন শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পার্শ্বে বলদেবের ও সুভদ্রা দেবীর পূজা কেন, তাহাও চিন্তা করিবার বিষয়।

প্রকাশক।

অমিতাভ।

যাঁহার অমিত আভায় সার্দ্ধ দুই সহস্র বৎসর কাল-বক্ষ উদ্ভাসিত হইয়া রহিয়াছে, এবং এখনও ইউরোপ আমেরিকা পর্য্যন্ত যাঁহার আলোক বিকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে, সেই বুদ্ধদেব শাক্যসিংহকে আমি নমস্কার করি। তাঁহারই অন্যতর নাম অমিতাভ।

এ কাব্যখানির প্রণয়নসম্বন্ধে আমি পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থকারদের কাছে বিশেষরূপে ঋণী। তবে তাঁহারা প্রায় সকলেই বুদ্ধদেবকে অল্পাধিক অতিমানুষিক ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। আমি যথাসাধ্য তাঁহাকে মানুষিক ভাবাপন্ন করিতে যত্ন করিয়াছি। এ অবতারদিগকে মানুষিক ভাবে দেখিলে যেন আমার হৃদয় অধিক প্রীতি লাভ করে, তাঁহাদিগকে অধিক আমাদের আপনার বলিয়া বোধ হয়। বুদ্ধদেবের ধর্ম্মও সম্পূর্ণরূপে দর্শনমূলক ; অতএব তাঁহাকে অতিমানুষিক ভাবে চিত্রিত করিবার প্রয়োজনও বিশেষ নাই।

এই কাব্যের কয়েক অধ্যায় "জন্মভূমি" নামক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য "জন্মভূমি" "বঙ্গবাসী" প্রমুখ হিন্দু সম্প্রদায়ের মুখ-পত্রিকা। শুনিয়াছি উক্ত কয়েক অধ্যায় "বঙ্গবাসী" অধ্যক্ষগণের ও সাধারণ হিন্দু পাঠকগণের প্রীতিপদ হইয়াছিল। যদি তাহা সত্য হয়, তবে আমার পক্ষে ততোধিক সুখের ও সৌভাগ্যের কথা আর কিছুই হইতে পারে না। কারণ এ পর্য্যন্ত বুদ্ধদেব হিন্দুদিগের কাছে ঘোরতর বিদ্বেষভাজন ছিলেন বিদ্বেষ এতদূর যে, পশ্চিমদেশীয় হিন্দুগণ বুদ্ধদেবের নাম করিলেই তাঁহাদের সকল পুণ্য ক্ষয় হইবে বলিয়া বিশ্বাস করেন। ইংরাজী-

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও এরূপ বিশ্বাস প্রচলিত যে, বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম হইতে একটি স্বতন্ত্র ধর্ম্ম এবং এতাদৃশ বিপরীত মতাবলম্বী যে, ব্রাহ্মণগণ যষ্টির আঘাতে উঁহাকে ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। এ বিশ্বাসের যে মূল কি তাহা আমি বড় বুঝিতে পারি নাই।

প্রকৃত বৌদ্ধ ধর্ম্ম কি—তৎসম্বন্ধে বহু বৌদ্ধ সম্প্রদায়ভেদে ঘোরতর মতভেদ। শ্রীবুদ্ধদেব ক্ষীণবুদ্ধি মানবকে যেরূপ তাঁহার মহাধর্ম্ম বুঝিবার শক্তি দিয়াছেন, আমি সেরূপ এই কাব্যের শেষ অধ্যায়ে সঙ্কলন করিতে চেষ্টা করিয়াছি। বঙ্গ-সন্তানদের মধ্যে শ্রীমান্ শরচ্চন্দ্র দাসের মত কেহই বৌদ্ধদেশ পরিভ্রমণ করিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মের আলোচনা করেন নাই। তিনি এ অধ্যায়টিকে আদিষ্ট (inspired) বলিয়াছেন। তাহা যদি হয়, তবে বৌদ্ধ ধর্ম্মের সঙ্গে হিন্দুধর্ম্মের বিরোধ কোথায়?

বুদ্ধদেবের ধর্ম্মচক্র দর্শনের উপর প্রোথিত। তাহার দু'খানি প্রধান ইষ্টক,—কর্ম্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ। ইহা কি হিন্দুরা বিশ্বাস করেন না, এবং ইহা কি হিন্দুধর্ম্মের দুইটি মূল তত্ত্ব নহে? তবে একটি বিষয়ে হিন্দুধর্ম্মে ও বৌদ্ধধর্ম্মে আপাততঃ মতভেদ বলিয়া বোধ হয়। হিন্দুধর্ম্মের ভিত্তি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস। বুদ্ধদেব এ সম্বন্ধে নীরব। হিন্দুধর্ম্ম বলেন, কর্ম্মফল নিবন্ধন জন্মান্তর ও তজ্জনিত দুঃখ হউক, কিন্তু শ্রীভগবানের কৃপায় তাহা হইতে মুক্তিলাভ হইতে পারে।

"তেয়াগিয়া সর্ব্ব ধর্ম্ম লও তুমি একমাত্র
শরণ আমার।
করিও না শোক পার্থ? সর্ব্ব পাপ হ'তে আমি
করিব উদ্ধার।"

গীতা ১৭শ অধ্যায় ৬৬ শ্লোক।

বুদ্ধদেবের মতে কেবল সুকর্ম্মের দ্বারা কুকর্ম্মফল ক্ষয় হইলে পুনর্জন্মের এবং তজ্জনিত দুঃখের 'নির্ব্বাণ' হয়।

যাঁহারা বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা বলেন, বুদ্ধদেব ভগবৎ কৃপার কথা কিছুই বলেন নাই। অথচ শ্রীভগবান্ নাই, তাঁহার কৃপায় কিছুই হইতে পারে না, এমন কথাও তিনি বলেন নাই। যদি এ উভয়ে তিনি বিশ্বাসহীন হইতেন, তবে তাঁহার মত স্পষ্টবাদীর তাহা না বলিবারও বিশেষ কোন কারণ দেখা যায় না। তবে এ সম্বন্ধে নীরব থাকিবার কোনও কারণ ছিল কি?

আমরা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় দেখিতে পাই তাঁহার দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বর-বিশ্বাস-মূলক কর্ম্মপ্রধান ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি বজ্র-গম্ভীরকণ্ঠে বলিয়াছিলেন—

"ত্রিগুণো বিষয়া বেদাঃ নিস্ত্রৈগুণ্য ভবার্জ্জুন।"

কিন্তু দুই সহস্র বৎসর সেই মহাবাক্য লুপ্তপ্রায় হইয়া কর্ম্ম আবার বুদ্ধদেবের সময়ে নির্ম্মম জীবঘাতী বৈদিক যজ্ঞে পরিণত হইয়াছিল। কেন? মানুষ এত ক্ষুদ্র, মানব-হৃদয় এত দুর্ব্বল যে, সে "অবাঙ্মনসগোচর" ব্রহ্মকে ধারণ ও গ্রহণ করিতে পারে না। সে কেবল তাঁহাকে মানুষের অবয়বে গঠিত করে তাহা নহে, তাঁহাতে মানব-প্রকৃতিও আরোপ করে। মানুষ যেরূপ পূজায় পরিতৃপ্ত হয়, তাঁহাকেও সেরূপ পূজার দ্বারা পরিতৃপ্ত করিতে চাহে। বুদ্ধদেব বোধ হয় বুঝিয়াছিলেন যে, ঈশ্বরে ধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপন করিলেই ধর্ম্মের এরূপ শোচনীয় পরিণাম হইবে; মানুষ কষ্টসাধ্য প্রকৃত পুণ্যকর্ম্ম ছাড়িয়া সহজসাধ্য যাগ যজ্ঞকেই প্রকৃত ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিবে। বুদ্ধদেবের তিরোধানের সার্দ্ধ দুই সহস্র বৎসর পরে আজ আবার তাহাই হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন বুদ্ধদেব, অদৃষ্ট, অজ্ঞেয় অচিন্ত্য কোন বিষয়ের প্রশ্ন করিলে উত্তর দিতেন না। তাঁহার মতে,

ওরূপ বিষয় মনুষ্য-চিন্তার অতীত। ঈশ্বরও সেরূপ মানব-জ্ঞানের ও চিন্তার অতীত। অতএব ধর্ম্ম ঈশ্বর-বিমুক্ত হওয়া উচিত। এবংবিধ কোনও কারণে কি ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি নীরব ছিলেন? এই নীরবতাই ব্রহ্মতত্ত্ব-পিপাসু ভক্তি-প্রাণ ভারতে তাঁহার মহাধর্ম্মের অধঃপতনের ও অপলাপের কারণ।

কিন্তু ভগবৎকৃপায় মুক্তিলাভ—এ কথাটা কি, একবার চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলেন, মহাপাপীও একবার তাঁহার শরণ লইলে মুক্ত হইবে। খৃষ্টও তাহা বলেন। কিন্তু এ কথাটার অর্থ কি? মহাপাপী যদি কেবল একবার শ্রীভগবানের শরণ লইলেই মুক্ত হয়, তবে পাপের দণ্ড ও পুণ্যের পুরস্কার কোথায় রহিল? তবে এ শরণ লওয়ার কোন তাৎপর্য্য আছে কি? কিরূপে শ্রীভগবানের শরণ লইলে তাঁহার কৃপা পাওয়া যাইবে?

"মদ্ভক্ত, মদ্গত-চিত্ত, হও মম উপাসক,
কর নমস্কার।
যুক্তাত্মা, মৎপরায়ণ—এরূপ হইলে পাবে
একত্ব আমার।"

গীতা ৯ম অধ্যায় ৩৪ শ্লোক।

যে এরূপ ভাবে তাঁহাকে ভজনা করিতে পারে, তাঁহাকে ডাকিতে পারে, তাহার আর পাপে প্রবৃত্তি থাকিতে পারে না। সে ক্রমশঃ পুণ্যপথে অগ্রসর হইবে এবং তদনুরূপ তাহার পাপ কর্ম্ম-ফল ক্ষয় হইবে। এরূপে উহা সম্পূর্ণরূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, সে মুক্তি বা নির্ব্বাণ লাভ করিবে। অতএব কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া দেখিলে প্রচলিত হিন্দুমত ও বৌদ্ধমত প্রকৃত মুক্তি সম্বন্ধে যে বড় বিভিন্ন তাহা বোধ হয় না। গীতার বহুস্থানে নির্ব্বাণ ও মুক্তি অভিন্নরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবৎ হিন্দুদিগের সর্ব্বপ্রধান ভক্তিগ্রন্থ। তাঁহার দশম স্কন্ধের ২৪শ অধ্যায়ের "বঙ্গবাসী" কৃত বঙ্গানুবাদ হইতে নিম্নলিখিত শ্রীকৃষ্ণোক্তি উদ্ধৃত হইলঃ—

"জন্তু কর্ম্মবশেই জন্মগ্রহণ করে,-কর্ম্মবশেই লয় পায়, এবং কর্ম্ম-বশেই সুখ, দুঃখ, ভয় ও মঙ্গল লাভ করিয়া থাকে। আর যদি অন্যের কর্ম্মের ফলদাতা একজন ঈশ্বর থাকেন, তাহা হইলে তিনিও কর্ম্ম-কর্ত্তাকেই ভজনা করেন; কারণ যে কর্ম্ম না করে, তিনি তাহাকে ফলদান করিতে পারেন না। অতএব জীবগণকে যখন কর্ম্মেরই অনুবর্ত্তন করিতে হইতেছে তখন তাহাদের ইন্দ্রে প্রয়োজন কি? প্রাক্তন সংস্কার অনুসারে মনুষ্যদিগের ভাগ্যে যাহা বিহিত হই-য়াছে, তিনি তাহার কখনই অন্যথা করিতে পারেন না। মনুষ্য স্বভাবেরই অধীন, স্বভাবেরই অনুসরণ করিয়া থাকে। দেবতা, অসুর ও মনুষ্য সকলেই স্বভাবে অবস্থিত রহিয়াছে। জীব কর্ম্মবশে উচ্চ, নীচ দেহ লাভ করিয়া কর্ম্মবশেই পরিত্যাগ করিয়া থাকে। কর্ম্মবশেই শত্রু মিত্র বা উদাসীন হইতে দেখা যায়। সুতরাং কর্ম্মই ঈশ্বর। অতএব স্বভাবস্থ, স্বকর্ম্মকারী জীব কর্ম্মেরই পূজা করিবে।"

ইহাই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উক্তি। এবং ইহাই প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম্ম নহে কি? বুদ্ধদেব ইহার অধিক নিরীশ্বরবাদ কি কোথায়ও শিক্ষা দিয়াছিলেন?

আমরা আরও দেখিতেছি বুদ্ধদেব আমাদের দশাবতারের মধ্যে নবম অবতার। তিনিই শ্রীক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথরূপে পূজিত হইতেছেন। বঙ্গের কৃতী পুত্র রাজেন্দ্রলাল দেখাইয়াছেন শ্রীক্ষেত্রের অদ্ভুত জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরাম মূর্ত্তি, বৌদ্ধদিগের মধ্যে যে বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ নামক তিনটি মণ্ডল ছিল, তাহারই প্রতিরূপ মাত্র। তিনি প্রতিপন্ন করিয়াছেন বুদ্ধগয়ার সমীপবর্ত্তী বিষ্ণুপদ বুদ্ধপদ মাত্র। বুদ্ধ আমাদের বিষ্ণু অবতার, কাজেই উহা বিষ্ণুপদ। বৌদ্ধ

ধর্ম্মের "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি" মহাবাক্য, হিন্দুধর্ম্মের একটি মূলমন্ত্র। অতএব কে বলিল বৌদ্ধ ধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে নিরাকৃত হইয়াছে ? বুদ্ধ-মত সার্ব্বভৌম হিন্দুধর্ম্মের একটি মত মাত্র। এখন যেরূপ এক পরিবারে কেহ ব্রাহ্ম, কেহ বৈষ্ণব, কেহ শাক্ত দেখা যায়, প্রাচীন ভারতেরও এক পরিবারে কেহ ব্রাহ্মণ-মতাবলম্বী, কেহ বৌদ্ধ-মতাবলম্বী ছিলেন।

প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম বৌদ্ধমতে অনুপ্রাণিত। প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মে বৌদ্ধধর্ম্ম অনুপ্রবিষ্ট ও নিবিষ্ট। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীরা হিন্দুধর্ম্মের বহু-শাখার একটি শাখা বিশেষ। অতএব মানবজাতির তৃতীয়াংশেরও অধিক হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী।—ইহা একবার মনে হইলেও কোন্ মানব-হৃদয়, কোন্ হিন্দু-হৃদয়, হিন্দুধর্ম্মের মহত্ত্বে ও সার্ব্বভৌমত্বে স্তম্ভিত না হয়! এ পতিত অবস্থায়ও ভারত জগতের ধর্ম্মগুরু। এস হিন্দু-গণ! হিন্দুধর্ম্মের সেই বিশ্বরূপ একবার দর্শন করি এবং কোটি কোটি ভক্তিপ্লুত কণ্ঠে গগন কম্পিত করিয়া সেই হিন্দুধর্ম্মের স্তুতি গান করি—

"নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমোনমস্তে!
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।"

স্থিরচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মানবের উদ্ধারের জন্য তিনটি মহৎ পথ অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহার গীতায় দেখাইয়া দেন—জ্ঞান-পথ, কর্ম্মপথ ও ভক্তি-পথ। তিনি তিনেরই সামঞ্জস্য প্রতিপন্ন করিয়া যান। কিন্তু দুর্ব্বল মানব শ্রীভগবানের প্রতিভা কোথায় পাইবে? তাঁহার শিক্ষা কেমন করিয়া ধারণ করিবে? এ কারণে কালে সকল ধর্ম্মশিক্ষকের ধর্ম্ম-শিক্ষা মানবচরিত্রের বিকৃতি অনুসারে বিকৃত হইয়া পড়ে। ক্রমে

ভারতে সেই কৃষ্ণশিক্ষার অবনতি ঘটিয়া ধর্ম্ম কেবল আবার জীব-ঘাতী যাগযজ্ঞে পরিণত হইল। তখন শ্রীবুদ্ধদেব অবতীর্ণ হইয়া কর্ম্মপথ সম্প্রসারিত করিয়া যান। ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার নীরবতা নিবন্ধন, কালে তাঁহার পরবর্ত্তী বৌদ্ধ-যাজকগণ সে পথে ঘোরতর নিরীশ্বরত্ব ও জড়ত্ব উপস্থিত করিলে, শ্রীশঙ্করাচার্য্য অবতীর্ণ হইয়া জ্ঞানপথের সম্প্রসারণ সাধন করেন, এবং বৌদ্ধধর্ম্মের জড়ত্ব ঘুচাইয়া উহাকে তাঁহার সার্ব্বভৌম জ্ঞানবাদে বিলীন করেন। কালে তাঁহার শিক্ষাও মায়াবাদের কাষ্ঠবৎ কঠোরতায় পরিণত হইলে শ্রীচৈতন্য-দেব অবতীর্ণ হইয়া ভক্তিপথ সম্প্রসারিত করিয়া প্রেমে ধর্ম্মের সেই কঠোরতা ভাসাইয়া দেন। গীতামূলক সম্প্রসারিত এই তিন মতের সম্মিলনেই প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম। কালে ইহাতে, এবং জগতের সকল ধর্ম্মে, জড়ত্ব প্রবেশ করিয়া ভারতের ও জগতে ঘোরতর অশান্তি উপস্থিত করিয়াছে। আবার ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান ঘটিয়াছে। কাল পূর্ণ, এখন সেই মহা-প্রতিজ্ঞা আমাদিগের একমাত্র আশা—"সম্ভবামি যুগে যুগে।" এস! এই মহা আশা-স্রোতে জাতীয় তরণী ভাসাইয়া দিয়া তাঁহার আবাহনের জন্য আমর ভারত-সন্তানগণ অগ্রসর হই!

কলিকাতা
২৯ শে আষাঢ়
১৩০২ সন।

নবীন।

TO

The Hon'ble H. T. S. Cotton, E. S. I.,

Chief Secretary to the Government of Bengal
A member of the Bengal Legislative Council

AND

Formerly District Officer of

CHITTAGONG.

THE PLACE OF MY BIRTH.

I

RESPECTFULLY DEDICATE THIS VOLUNE.

As

A TRIBUTE OF GRATITUDE AND LOVE.

FROM

ITS PEOPLE

FOR HIS KIND AND SYMPATHETIC RULE

AND

Never-failing Interest in their Welfare.

অমিতাভ।

(২৩০০—২৪০০ কল্যাব্দে আবির্ভাব ও তিরোধান)

অবতার।

প্লাবি সপ্ত স্বর্গ, শান্তির ত্রিদিব,
বৈকুণ্ঠে বৈকুণ্ঠ-পতির শ্রবণে
জন্ম-জরা-ব্যাধি-মৃত্যু-হাহাকার
পশিল নরের করুণ স্বনে।
কাঁদিল তাঁহার করুণ হৃদয়,
ব্যথিত হইল কোমল প্রাণ,
কহিলা—"লভিব একজন্ম আর,
জগতের দুঃখ করিব নির্ব্বাণ।"
গাইল আনন্দে দেবতা সকল,
স্বর্গে, স্বর্গে, স্বর্গে ছুটিল গান,—
"লভিবেন হরি এক জন্ম আর
জগতের দুঃখ করিতে নির্ব্বাণ।"

(১)

শুভজন্ম।

হিমাচল পাদমূলে, শৈলজা "রোহিণী"-কূলে
ছিল যথা কপিল-আশ্রম,
নগর কপিলবস্তু, নরপতি শুদ্ধোদন,
শাক্য-রাজ্য শোভে নিরুপম।
শাক্য,-সূর্য্যবংশ-শাখা, প্রখর কিরণমাখা
সূর্য্য-রশ্মি লভি নির্ব্বাসন,
স্থাপিয়া শাকোট বনে পার্ব্বতীয় নব রাজ্য
'শাক্য নাম করেছে ধারণ।
হিমাবৃত হিমাচল উত্তরে মহিমাময়,
নীলাকাশে তরঙ্গে বিস্তৃত,
পশ্চিমে কোশল রাজ্য শাক্যদের পিতৃভূমি,
রাম-পদ-রজে পবিত্রিত।
মগধের পরাক্রান্ত সাম্রাজ্য পূরবে গর্ব্বে,—
প্রখর পূর্ব্বাহ্ণ পরাক্রম;
দক্ষিণে কাশী কোশল, ভারতের মহাতীর্থ
কাশী হৃদে করিয়া ধারণ।
তিন দিকে রাজ্য ত্রয়; উত্তরে হিমাদ্রিসুত
প্রকৃতির বীর পুত্রগণ;—
তথাপিও শাক্যরাজ্য গর্ব্বে মৈনাকের মত
আত্ম-স্থান করিছে রক্ষণ।
বৃদ্ধ রাজা শুদ্ধোদন; মহামায়া, প্রজাবতী,—
মহিষী-যুগল পতিব্রতা,

শঙ্করের অঙ্কে যেন পার্ব্বতী ও ভাগীরথী
পুণ্য-অঙ্কে প্রীতি, পবিত্রতা।
শাক্য-রাজ্য সুখে ভরা, ধন ধান্যে প্রেম পুণ্যে
পরিপূর্ণ দেশ মনোহর;
ধন ধান্যে, প্রেম পুণ্যে পরিপূর্ণ রাজপুরী;
পরিপূর্ণ রাজার অন্তর।
প্রেম পুণ্যে বিভাসিত শান্তির সুনীলাকাশে
তবু যেন হ'য়েছে সঞ্চার
কোথা ক্ষুদ্র মেঘখণ্ড, সুখ শান্তি জ্যোৎসনায়
পড়িয়াছে ছায়ার আঁধার।
পুত্রহীন শুদ্ধোদন; মায়াময়ী মহামায়া,
পুণ্যবতী প্রজাবতী তথা,—
উভয়ের শূন্য অঙ্ক, পুষ্পহীন পুষ্প-পাত্র
সুধাহীন সুধাকর যথা।
আসিল বসন্তোৎসব, ভাসিল কপিলবস্তু
ছয় দিন উৎসবে মগন,
দেখিলা সপ্তম দিনে, পূর্ণিমা-প্রভাতে সুখে,
মায়াদেবী অপূর্ব্ব স্বপন।—
চারি স্বর্গদূত আসি দেবীর পর্য্যঙ্ক খানি
হিমালয়ে করিয়া বহন,
সুবিশাল শালবনে নামাইল সসম্ভ্রমে,—
দিব্যালোকে উজ্জ্বল কানন।
সুররাণীগণ স্নান সুধাপূর্ণ সরোবরে
করাইল দেবীরে তখন;
পার্থিবতা গেল ভাসি, হইল পবিত্র দেহ,
কিরণ-প্লাবিত পুষ্পবন।

রজত শেখর-শিরে, স্বর্ণ প্রাসাদে শোভে
পুষ্পশয্যা চারু-পুষ্পাবৃতা;
নক্ষত্রখচিত-বাসে, স্বর্গীয় সৌরভে পুষ্পা
মায়াদেবী হইয়া সজ্জিতা
শুইলেন; দেখিলেন,— মাতঙ্গ তুষার-শ্বেত,
শুণ্ডে শ্বেতপদ্ম মনোহর,
প্রণমিয়া তিনবার, বিদারি দক্ষিণ পার্শ্ব
প্রবেশিল গর্ভে করিবর।
নিরমল চন্দ্র যেন পুষ্পবন-অন্তরালে,
ধীরে ধীরে হইল সঞ্চার;
কি আনন্দে, কি আলোকে, ভাসিল দেবীর প্রাণ!
ভাসাইল পতিত সংসা...

জাগিলেন মহামায়া! ডাকিলেন শুদ্ধোদন
স্বপ্ন-বেত্তা দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ;
কহে তারা—"মহারাজ! হইলেন পুণ্যবতী
মহারাণী,—কি শুভস্বপন!
থাকে গৃহাশ্রমে পুত্র হবে রাজ-চক্রবর্ত্তী,
একছত্র করিবে ভুবন,
যায় যদি ধর্ম্মাশ্রমে, দুঃখপূর্ণ জগতের
পাপভার করিবে মোচন।"
উৎসব আনন্দ রঙ্গে ছুটিল তরঙ্গ-রঙ্গে,—
মেঘ-ছায়া কোথা গেল ভাসি!
বসন্তের পৌর্ণমাসী, পূর্ণচন্দ্র হাসি হাসি,
উচ্ছ্বাসি ঢালিল সুধারাশি।
পঞ্চচত্বারিংশ বর্ষে হইলেন মায়াদেবী—
পুত্রবতী অপূর্ব্ব স্বপনে,

কি প্রীতি, কি পবিত্রতা, কি গাম্ভীর্য্য, সরলতা,
কি আনন্দ জননীর মনে !
জগতের দুঃখে সদা কাঁদিত মায়ের প্রাণ,
মায়ার মূরতি মহামায়া,
কহিতেন—"নারায়ণ লভি এক জন্ম আর
দুঃখী জীবে দেহ পদছায়া !"
এইরূপে কালপূর্ণ ! পৌষ-পূর্ণিমায় আসি
হ'লো পুষ্যানক্ষত্র মিলিত ;
পুলকে পূরিল প্রাণ, আনন্দে "লুম্বিনী বনে"
চলিলেন সঙ্গিনী সহিত।
আসিছেন ঋতুপতি মধুরে মন্থরে পুনঃ
মৃদু মৃদু ঢালি মধুরিমা !
প্রকৃতি মেলিছে আঁখি, ভাসিছে নির্ম্মলাকাশে
বসন্তের প্রথম নীলিমা।
প্রথম মলয়ানিলে ফুটেছে প্রথম ফুল,
ফুটেছে প্রথম কিসলয়।
প্রথম পাখীর গান, পুষ্পের প্রথম ঘ্রাণ,
কানন করিছে সুধাময়।
প্রথম বসন্তোন্মেষে দেবীর হৃদয়ে যেন
কিবা স্বর্গ খুলিল প্রথম,
অন্তরে বাহিরে দেবী দেখিলেন প্রেমালোক,
নারায়ণ প্রেম-প্রস্রবণ।
সে প্রেমে ভাসিল বুক, সে প্রেমে হাসিল মুখ,
সেই প্রেমে ভিজিল নয়ন ;
স্বর্গীয় সঙ্গীতে ভাসি স্বর্গীয় সৌরভ রাশি,
দশদিক ছুটিল তখন।

আনন্দে মূর্চ্ছিতা দেবী পড়িতে, ধরিলা করে
এক শাল-শাখা সুশোভন,
প্রসূত হইল পুত্র, ত্রিদিব-লতায় যেন
ফুটিল প্রসূন মনোরম।
যেই আনন্দের ধ্বনি উঠিল সে শাক্য-রাজ্যে,
প্রতিধ্বনি তুলি হিমালয়ে,
সহস্র সহস্র বর্ষ প্লাবি আজি বাজিতেছে
অর্দ্ধাধিক নরের হৃদয়ে।
চন্দ্র অন্তরালে মেঘ, হাসি অন্তরালে অশ্রু,
নিয়ন্তার কি সূক্ষ্ম নিয়ম!
এই আনন্দের মাঝে, সপ্তম দিবসে হায়!
মায়াদেবী মুদিলা নয়ন।
যাও মা করুণাময়ি! জগতের দুঃখভার
যুগে যুগে করিতে মোচন
প্রসবিয়া দেবপুত্র, অবতীর্ণা হও তুমি;
পূর্ণ তব নিয়তি এখন।
যাও মা করুণাময়ি! জরা-মৃত্যু দুঃখ-ভরা
এ জগত নহে তব স্থান;
আছে মানবের আশা, আবার আসিবে তুমি,
নরদুঃখে কাঁদিলে পরাণ।

---

(২)

ভবিষ্যৎ।

হিমাদ্রির চারু অঙ্কে পবিত্র আশ্রমে
যোগস্থ অসিত ঋষি; সিত জটারাশি
শোভিছে মস্তকে অতি বৃদ্ধ মহর্ষির,—
হিমানী-কিরীট ক্ষুদ্র শৃঙ্গে হিমাদ্রির!
দেখিলেন ধ্যানে ঋষি অপূর্ব্ব কুমার
হইয়াছে অবতীর্ণ কপিলনগরে,
অপূর্ব্ব আনন্দ প্লাবি আকাশমণ্ডল
পুলকিত পবিত্রিত করিছে ভূতল।
শূন্যে যোগবলে ঋষি রাজহংস মত
আসিয়া কপিলপুরে মনোরথ-গতি
কহিলেন—"নরপতি! আসিয়াছি আমি
তব নব জাত শিশু করিতে দর্শন;
পূরাও বাসনা মম।" সম্ভ্রমে নৃপতি
আনি পুষ্পনিভ শিশু চরণে ঋষির
রাখিলেন স্বর্ণাসনে, শোভিল তখন
স্বর্ণ পুষ্পপাত্রে স্বর্ণ পুষ্প নিরুপম।
"অদ্ভুত—অদ্ভুত শিশু!"—কহি ঋষিবর
ভক্তিভরে প্রদক্ষিণ করিয়া শিশুরে
রহিলা—নীরবে ধ্যান-মগ্ন অবিচল,
বহিতে লাগিল অশ্রুধারা অবিরল।
ভীত রাজা শুদ্ধোদন, বিস্মিত-অন্তর
অমঙ্গল ছায়াচ্ছন্ন, মেঘাচ্ছন্ন যেন
হইল প্রফুল্ল শশী, জিজ্ঞাসিলা ত্রাসে—

"একি ভাব ঋষিশ্রেষ্ঠ! কেন এ রোদন?
এ দীর্ঘনিশ্বাস কেন? এ অশ্রু নিশ্বাস
করিছে হৃদয়ে মম ঝটিকা সঞ্চার
ঘোরতর। কহ দেব! দেখিলে কি তুমি
অমঙ্গল এ শিশুর? কহ দয়া করি,
কাতর পিতার প্রাণ।"

মুছি, অশ্রুধারা
উত্তরিলা মহাযোগী,—"একি ভ্রান্তি তব!
অমঙ্গল!—মহারাজ! মঙ্গল-নিদান
শিশু তব, অমঙ্গল সম্ভবে কি তার?
নাহি কাঁদিতেছি আমি শিশুর কারণ;
আমার কারণ হায়! কাঁদিতেছি আমি।
করিবেন প্রবর্ত্তিত এই শিশু তব
ধর্ম্মচক্র এ জগতে,—এই শিশু তব
সর্ব্ব লোক হিত, সর্ব্ব লোক সুখ আর,
সাধিবেন মহাধর্ম্ম করিয়া প্রচার।
তাহার কল্যাণ মূলে, মধ্যেও কল্যাণ,
শেষেও কল্যাণ তার; শুদ্ধ, নিরমল
সেই ধর্ম্ম সনাতন;—শুদ্ধ, নিরমল
যথা নব বসন্তের আকাশমণ্ডল।
মানব পাইবে মুক্তি; হবে ব্যাধি-জরা-
পাপ-তাপ-মুক্ত জীব, জুড়াইবে ধরা।
রাগ-দ্বেষ-মোহ-দগ্ধ মানব হৃদয়ে
সুশীতল ধর্ম্মামৃত হইবে বর্ষিত,
হবে ধরাতল সুখ শান্তিতে পূর্ণিত।
উড়ুম্বর পুষ্প যথা ফুটে কদাচিত,

কত কল্পান্তরে নৃপ ! সেইরূপে হায় !
এ বুদ্ধ পুরুষোত্তম পুত্ররূপে তব
হইলেন অবতীর্ণ। হইবে উদ্ধার
সংসার-সমুদ্র-গর্ভে জীব নিমজ্জিত
লভিয়া নির্ব্বাণ-তরী, জীব সন্তাপিত।
বৃদ্ধ আমি ; জীবনের এই ক্ষীণ দীপ
হইবে নির্ব্বাণ আশু, কাঁদিতেছি আমি,
সেই বুদ্ধরূপ নাহি দেখিব নয়নে।
কাঁদিতেছি আমি সেই বুদ্ধ আরাধনা
ফলিল না ভাগ্যে মম। না শুনিব আমি
সেই সাম্য গীত, সেই শান্তির সঙ্গীত,
হবে যাহা প্রচারিত দেশ দেশান্তরে,
যুগ যুগান্তরে যাহা করিবে ঘোষিত
শৈল-বক্ষে শৈলমালা করিয়া অঙ্কিত।
কাঁদিতেছি আমি ;—যেই উৎস করুণার
প্লাবিয়া ভারতবর্ষ প্লাবিবে জগত,
আমি এক বিন্দু নাহি পাইব তাহার।
মন্ত্রশাস্ত্র বেদশাস্ত্র কহিছে আমায়
হইবেন বুদ্ধ এই কুমার তোমার।
সন্ন্যাস গ্রহণ করি জীবের উদ্ধার
সাধিবেন, করিবেন নির্ব্বাণ প্রচার।
হে রাজন্ ! দ্বাত্রিংশৎ লক্ষণ মহান
মহাপুরুষের, অনুব্যঞ্জনা অশীতি,
দেখ কুমারের দেব দেহে বিদ্যমান।
নহে নৃপতির এই লক্ষণ সকল।
তুচ্ছ রাজছত্র ; যেই ছত্র সুবিস্তার

স্থাপিবেন কাল-বক্ষে, অমর অক্ষয়,
ব্যাপী অর্দ্ধ ধরাতল, ছায়ায় তাহার
মানব লভিবে শান্তি—কি পুণ্য তোমার!
সিদ্ধ তব মনোরথ; সিদ্ধ মনোরথ
মানবের এতদিনে; ভক্তিপূর্ণ মন
রাখিও সিদ্ধার্থ নাম পিতা শুদ্ধোদন।
বিমাতা গৌতমী, দেবী মহা প্রজাবতী,
পালিবেন শিশু,—নাম হইবে গৌতম।
শাক্যকুলে জন্ম—নাম হবে শাক্য-মুনি।
মানবের দুঃখভার হরিতে আগত
যথাকালে শিশু—নাম হবে তথাগত।

মগ্না তপস্যায়, ধ্যানে, লভি মহাজ্ঞান,
[illegible] নাম—জ্ঞানীর চরম,
[illegible] অহিংসা পরম।
জগতে [illegible] নামত্রয়
অঙ্কিত [illegible] বক্ষে, অমর অক্ষয়!"
[illegible] পূর্ণ নামকরণ উৎসবে
আসিল দৈবজ্ঞ অষ্ট। অপূর্ব্ব লক্ষণ
নিরখি শিশুর দেহে, কহে সপ্তজন—
"থাকে গৃহাশ্রমে, হবে নৃপতি ধরার;
হইবে সন্ন্যাসাশ্রমে বুদ্ধ অবতার।"
কনিষ্ঠ কৌণ্ডিন্য কহে,—"কহিতেছি আমি;
জরাজীর্ণ, রুগ্ন, মৃত, ভিক্ষু যেই দিন
নিরখিবে শিশু, গৃহ ছাড়িয়া সে দিন
নিশ্চয় হইবে বুদ্ধ; করিবে মোচন
পৃথিবীর পাপ-তাপ, মোহ-আবরণ।"

নৃপতি-নয়নে অশ্রু উঠিল ভাসিয়া ;
ছায়ার উপরে ছায়া ভাসিল অন্তরে,—
গম্ভীর—গম্ভীরতর। রাখিলা প্রহরী,
এই চারি দৃশ্য পুত্র নাহি দেখে যেন।
হায়! মুগ্ধ নরপতি! ডাকেন যাঁহারে
অন্তর্যামী ভগবান, কে রাখিতে পারে
রুদ্ধ করি গৃহ-দ্বার সেই পুণ্যাত্মারে ?
করে জলধিরে যদি চন্দ্র আকর্ষণ,
পারে কি রাখিতে আহা! বালির বন্ধন!

(৩)

কৈশোর।

বিমাতা দেবীর স্নেহে বাড়িতে লাগিল শিশু,
বৈশাখের শুক্লপক্ষে যেন শশধর ;
কোন দেবমূর্ত্তি যেন দক্ষ দেব শিল্পকর
করিতে লাগিল ক্রমে পূর্ণ কলেবর।
মহোৎসবে বিদ্যারম্ভ করিলেন শুভক্ষণে
গুরু বিশ্বামিত্র সর্ব্বশাস্ত্রে সুনিপুণ।
কি আর শিখিবে শিশু, শিক্ষা দিতে জন্ম যার ?
শিখে কি সৌরভ-লাভ মন্দার-কুসুম ?
সর্ব্বশাস্ত্রে সুনিপুণ হইল কুমার আশু ;
ছিল যেন, সর্ব্বশাস্ত্র প্রচ্ছন্ন অন্তরে,

পুষ্পবৃক্ষে পুষ্প যথা বসেন্তর পরশনে
উঠিল ফুটিয়া যেন তারকা অম্বরে।
কত শিশু বিদ্যালয়ে! কপিল নগরে কত!
কিন্তু এই শিশু—এ ত নহে পৃথিবীর!—
শান্ত, স্থির, অচঞ্চল, কি মহিমা সমুজ্জ্বল
আলোকিছে স্বর্ণকান্তি, কি মূর্ত্তি প্রীতির!
ক্রীড়া-যুদ্ধে, মৃগয়ায়, নাহি সমকক্ষ কেহ,
নাহি সমকক্ষ অশ্ব, অস্ত্র, সঞ্চালনে;
কিন্তু ঘোর মৃগয়ায়, ঘোর যুদ্ধক্রীড়াঙ্গনে,
চকিতে থামিত শিশু, কি ভাবিত মনে।
মৃগের পশ্চাতে ছুটি আকর্ণ টানিয়া শর,
সে মুহূর্ত্তে প্রতিহার করিত কখন;
যাইতেছে অশ্ব ছুটি শুনি অশ্ব কষ্টশ্বাস
থামিত, হইত কভু স্বপ্নে নিমগন।
জগতের দুঃখ কিছু কুমার ত নাহি জানে,
দেখে নাই, শুনে নাই, ভাবে নাহি মনে,
তথাপি হৃদয়ে ধীরে ত্রিদিব করুণা-উৎস
হইতেছে সঞ্চারিত অজ্ঞাতে কেমনে!
একদিন নিরজনে মনোহর পুরোদ্যানে
সিদ্ধার্থ ভাবিতেছিলা বসি অন্য মন;
শুভ্র-মেঘ-খণ্ড মত রাজহংস শত শত
আনন্দলহরী পূর্ণ করিয়া গগন
যাইছে ভাসিয়া সুখে, হঠাৎ আহত বুকে
একটি কুমার-অঙ্কে হইল পতন।
উদ্ধার করিতে শর লাগিল কোমল করে,
কুমার বেদনা এই বুঝিলা প্রথম,

অধীর হইল প্রাণ, বহিল প্রথম এই
বিশ্বব্যাপী করুণার পুণ্য প্রস্রবণ।
করুণার অশ্রুজলে, করুণার পরশনে,
হইল বিগত ব্যথা, বাঁচিল মরাল ;
কুমার লইয়া বুকে, মুগ্ধা জননীর মত
চাহি ক্ষুদ্র মুখপানে রহে কিছু কাল।
কি মহিমা করুণার ! কাননের বিহঙ্গেও
বুঝে তাহা, কি মধুর করে প্রতিদান !
উভয়ে উভয় পানে নীরবে চাহিয়া, কিবা
করুণায় উভয়ের বিমোহিত প্রাণ !
আসি দেবদত্ত কহে— "কুমার, এ হংস মম,
মম শরে হ'য়ে হত পড়েছে ভূতলে।"
কুমার কহিলা ধীরে— "হতজীব হত্যাকারী
পায় যদি ভাই ! কোনো ধর্ম্মশাস্ত্র বলে,
যে দেয় জীবন তারে, সে কি তারে পাইবে না ?
হত নহে এই হংস, আহত কেবল,
আঘাতের ব্যথা ভাই ! আজি বুঝিয়াছি আমি,
হংসের ব্যথায় প্রাণ হয়েছে বিকল।
তোমারো ত আছে প্রাণ ; পাখীটির ক্ষুদ্র প্রাণে
বুঝ না কি, কি যে ব্যথা পেয়েছে বিষম ?
লও তুমি শাক্য রাজ্য, আমি নাহি চাহি তাহা ;
এ হংস আমার, আমি দিব না কখন।"
শাক্য-পুত্র দেবদত্ত, স্তম্ভিত বিস্মিত চিত্ত,
দেখিল, কুমার নহে,— মূর্ত্তি করুণার।
কিবা করুণার গীতি তাহারো হৃদয়ে আজি
প্রবেশিল, পরশিল হৃদয় তাহার।

ফিরিল নীরবে গৃহে ; উড়িল মরাল সুখে,
কলকণ্ঠে এ করুণা করিয়া প্রচার।
সিদ্ধার্থ রহিলা চাহি নীরবে আকাশ পানে,
হৃদয়ে প্রথম চিন্তা হইল সঞ্চার।
নীরবে বসন্তাকাশে নিদাঘের ক্ষুদ্র মেঘ
অলক্ষিতে ধীরে ধীরে উঠিল ভাসিয়া ;
সিদ্ধার্থ ভাবিলা বসি——কি ভাবনা নাহি জ্ঞান—
নীল সান্ধ্য নভঃপানে চাহিয়া চাহিয়া।
ভাবিলেন—"এ শরের ঈষদ পরশে হায় !
প্রাণে যদি এই ব্যথা লাগিল আমার,
জনকের অস্ত্রাগারে কি ভীষণ অস্ত্র রাশি !
না জানি কি ব্যথা হায় ! আঘাতে তাহার !
শুনিয়াছি ওই অস্ত্রে হইয়াছে কত যুদ্ধ,
হইতেছে কত যুদ্ধ নিত্য সংঘটিত !
কত লঙ্কা, কুরুক্ষেত্র, হইয়াছে—হইতেছে—
এই পৃথিবীর বক্ষে নিত্য অভিনীত !
উহু ! রোদন ধ্বনি, কি ভীষণ হাহাকার
উঠিতেছে মানবের জগত প্লাবিয়া !
হায় ! কি মানব অন্ধ ? করে ভোগ রাজ্য সুখ
মানবের বক্ষে এই অনল জ্বালিয়া ?"
বয়সের স্রোত সহ চিন্তা-স্রোত দুর্নিবার,
হইল বিস্তৃত ক্রমে, হইল গভীর।
রাজপুরী কোলাহল ছাড়িয়া যৌবনাগমে
চাহে বেড়াইতে যুবা কাননে নিবিড়।
একাকী কি চিন্তা মগ্ন রহিতেন কদাচিৎ,
ডাকিলেও সহচর, যুবা নিরুত্তর।

অন্তরে কি যেন ক্ষুধা! কি যেন পিপাসা প্রাণে!
বিলাসে বিতৃষ্ণা, রাজ্যে অতৃপ্ত অন্তর।
আজি শুভ হলোৎসব; সজ্জিত সহস্র হল
করিতেছে রাজপুর-ক্ষেত্র বিকর্ষিত।
সজ্জিত কৃষকগণ; হলোৎসবে রাজপুরী,
সুন্দর কপিলবস্তু, আনন্দে পূরিত।
সুমধুর মধু মাসে মধুরে প্রকৃতি হাসে
মাধুর্য্য মাখিয়া শ্যাম অঙ্গে নিরুপম।
আকাশে আনন্দ হাসে, অনিলে আনন্দ ভাসে,
আনন্দ পল্লব পুষ্প, বিহঙ্গ-কূজন।
প্রভাতে পূরবাকাশে আনন্দ অরুণ রাগে
উষার কোমল মুখ করেছে রঞ্জিত।
হলোৎসবে চারিদিকে উঠিতেছে নরকণ্ঠে
প্রভাত কাকলী সহ আনন্দ-সঙ্গীত।
সিদ্ধার্থও সুখী আজি; আনন্দের এ তরঙ্গ
পশিয়াছে প্রাণে, মুখে উঠিয়াছে ভাসি।
চাহিয়া চাহিয়া ওই কর্ষণ একাগ্র মনে,
ও কি ভাবনার মেঘ দেখা দিল আসি?
যুবক দেখিলা কষ্টে সুসজ্জিত পশুগণ
বহিছে সজ্জিত হল বিদারি ভূতল;
সজ্জিত কৃষকগণ, কিন্তু কষ্টে তাহাদের
হইয়াছে স্বেদোদ্গমে ললাট সজল।
কর্ষণে কর্ষণে কত মরিতেছে ক্ষুদ্র জীব,
সহিতেছে কি বেদনা হইয়া বিক্ষত,
উড়ি উড়ি পক্ষিগণ খাইতেছে নিরমম
মৃত কি জীবিত হায়! ক্ষুদ্র জীব কত!

এইরূপে জীবে জীবে হিংসিতেছে নিরন্তর,
চারিদিকে কি ভীষণ জীবন-সংগ্রাম !
আনন্দের আবরণে আরবি প্রকৃতি-দেবী
রেখেছেন কি অনন্ত ভীষণ শ্মশান !
অনন্ত জীবের দুঃখে কাঁদিল কোমল প্রাণ,
অলক্ষিতে অন্যমনা ছাড়ি সঙ্গিগণ,
ছাড়ি পুর-ক্ষেত্রসীমা সিদ্ধার্থ প্রান্তরে পশি
ভ্রমিতে লাগিলা একা স্বপনে যেমন।
নগর-উৎসব-ধ্বনি, পল্লীর আনন্দ-ধ্বনি,
প্লাবী, বিশ্বব্যাপী যেন কিবা হাহাকার,
জীবের কি দুঃখ গীতি, উঠিতেছে চারিদিকে !
গর্জ্জিতেছে চারিদিকে যেন পারাবার !
দেখিলেন জম্বু বৃক্ষ অদূরে বিস্তারি ছায়া,
আত্মহারা তরুমূলে বসিলা কুমার,
জন্মান্তর সংস্কার অজ্ঞাতে নিদ্রার মত
করিল সমাধিমগ্ন আনন্দ-আধার।
যাইতেছে পঞ্চজন মহর্ষি আকাশ-পথে,
অকস্মাৎ যোগাসন হইল অচল।
জম্বুবৃক্ষমূলে বসি দেখিলেন জ্যোতির্ম্ময়
নব যুবা, নিমীলিত নয়নযুগল।
শরীরে সূর্য্যের প্রভা, কনক কেশর আভা
বিমণ্ডিত বরবপু মহিমা-আলয়,
যোগাসনে যোগময় নিষ্কম্প তড়িত মত,—
ঋষিগণ মনে মনে মানিলা বিস্ময়।
"কে যুবা ? যাহার ধ্যানে আমাদের ধ্যান-প্রভা
করিল নিস্তেজ, যোগ-আসন অচল ?"—

ভাবি মনে ঋষিগণ দেখিলেন মহা ধ্যানে
বিষ্ণু-অবতার যুবা, শুদ্ধ নিরমল !
অজ্ঞান আঁধারে পূর্ণ হইয়াছে এ সংসার,
আবির্ভূত এ প্রদীপ নাশিতে আঁধার ;
যেই মহা ধর্ম্মবলে জগত পাইবে মুক্তি,
করিবেন নবযোগী সে ধর্ম্ম প্রচার !
ভক্তিভরে ঋষিগণ করি স্তবে প্রদক্ষিণ,
গ্রহে উপগ্রহ যথা, ধ্যানস্থ যুবায়,
গেলা চলি প্রীতি মনে ; রাজপুরে এই দিকে
উঠিয়াছে কোলাহল—"কুমার কোথায় ?"
অন্বেষণে সঙ্গিগণ, রাজ-অনুচরগণ,
আসি জম্বুবৃক্ষতলে হইল বিস্মিত ;
সবিস্ময় শুদ্ধোদন, আসিলেন সেইখানে,
ভাঙ্গিয়া আসিল পুরী, নগর সহিত।
অতীত মধ্যাহ্ন কাল ; তথাপিও স্থিরতর,
রহিয়াছে বৃক্ষছায়া, করি ছায়ান্বিত
ধ্যানস্থ কুমার-দেহ— রবিকরে চন্দ্র যথা,
হইয়াছে রবিকর যোগে পরাজিত।
দেখিলেন শুদ্ধোদন সোণার মূরতি পুত্র
স্থাপিত পাদপমূলে পবিত্র সুন্দর।
দেখিলেন শুদ্ধোদন ধ্যানস্থ নবীন যোগী,
ভাবিলেন এই পুত্র ! কভু নহে নর।
কি প্রীতি কি শান্তি মুখে ! কি প্রীতির স্বপ্নে সুখে
যেন নিমজ্জিত পুত্র, কি জ্যোতি নির্ম্মল !
কি প্রীতি কি পবিত্রতা, চন্দ্র চন্দ্রিকায় যথা,
করিতেছে দর্শকের পরাণ শীতল !

ভক্তিভরে শুদ্ধোদন, অশ্রুপূর্ণ সুনয়ন,
দেখিছেন, দেখিতেছে নর সংখ্যাতীত
নীরবে বেষ্টিয়া বৃক্ষ; নীরবে নিদাঘানিল
বহিতেছে, জম্বুবৃক্ষ স্থির অকম্পিত।
আপ্রভাত অপরাহ্ন, এরূপে বসিয়া ধ্যানে
করিলা কুমার ধীরে নেত্র উন্মীলিত।
উঠি ধীরে আত্ম-হারা, প্রণমিয়া পিতৃপদ,
কহিলা কাতর-কণ্ঠে করুণা-ব্যথিত,—
"পিত! হিংসাময় কৃষি কর তুমি পরিহার,
হয় পদে পদে জীব-হিংসা সংঘটিত।
পিত! জীবে কর দয়া। কর সর্ব্ব জীব সুখী
কর জগতের সুখে প্রাণ সমর্পিত।"

(৪)

অশোকোৎসব।

চিন্তান্বিত শুদ্ধোদন; চিন্তান্বিতা প্রজাবতী
কহিলা কাতরে—
"একি ধ্যান সিদ্ধার্থের? আমার সিদ্ধার্থ, নাথ!
রবে না কি ঘরে?
বড়ই ব্যাকুল আজি হইয়াছে প্রাণ।
কে শিখাল, কেমনে বা শিখিল এ ধ্যান?"
ঈষৎ হাসিয়া রাজা কহিল তখন—
"কে শিখাল তোমাকে এ অশ্রু বরিষণ?"

দেবী কহে—"দেও তুমি বিবাহ তাহার
হইবে সংসারী তবে সিদ্ধার্থ আমার।"
চিন্তান্বিত শুদ্ধোদন আসিলা সভায়,
সভাগৃহ সমাচ্ছন্ন চিন্তার ছায়ায়।
সমাচ্ছন্ন রাজপুরী, কপিল নগর।
সর্ব্বমুখে "রাজপুত্র করিবে না ঘর।"
চিন্তিত অমাত্যগণ কহিলা—"নৃপতি!
বাড়িতেছে ঔদাসীন্য ক্রমে দ্রুতগতি
কুমারের হৃদয়েতে করিয়াছি স্থির
আমরা অমাত্যগণ, না হ'তে গভীর
এই স্রোতস্বতী, বাঁধি বিবাহ-বন্ধন
করিব কৌশলে তার গতি নিবারণ।
সিদ্ধার্থের সপ্তদশ বৎসর অতীত।
যৌবন-উষায় এবে প্রেম উন্মেষিত।
নির্ম্মাব প্রমোদপুরী, প্রমোদ কানন;
রচিব সুখের স্বর্গ, প্রেমের স্বপন।
বিলাসে প্রণয়াবেশে, এ মৃগ মিথুন
রাখিব বিমুগ্ধ; রবে প্রহরী নিপুণ।
জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, দুঃখ, উদাসীন আর,
দিব না আসিতে পুর-পরিখার পার।"
ভাসিল ঈষদ্ হাসি নৃপতি-বদনে,
রবিকর-রেখা যেন মেঘাল গগনে।
কহিলেন—"হায়! এই বালির বন্ধন
করিবে কি তটিনীর গতি নিবারণ?
জন্ম যার হিমাচলে, হায়! গিত তার
কে পারে রোধিতে বল বিনা পারাবার?

তথাপি বিবাহ যদি তোমাদের মত,
কর আয়োজন, কর পূর্ণ মনোরথ।
কিন্তু কুমারের মত জান একবার,—
কিরূপ, কাহার কন্যা বাসনা তাহার।”
জিজ্ঞাসিলে রাজপুত্রে রাজ-অনুচর,
কহিলা—“উত্তর দিব সপ্তাহ অন্তর।”
গম্ভীর চিন্তায় মগ্ন হইলা কুমার।
ভাবিলেন দিবানিশি—“সংসারে আমার
নাহি তৃপ্তি ; যে ক্ষুধায় পিপাসায় প্রাণ
আকুল, বিলাসে নাহি হতেছে নির্ব্বাণ।
কেবল বাসনা, বসি বিজন গহনে
থাকি সেই নিরমল সুখের স্বপনে!
ভাবি—কোথা হ'তে আসি যেতেছে কোথায়
এই বিশ্ব চরাচর জলবিম্ব প্রায়?
ভাবি—এ ভীষণ হিংসা কেন পরস্পরে
জলে স্থলে, মহাশূন্যে জীবের অন্তরে?
ডুবি হিংসা-বহ্নিমাঝে, পরিয়া গলায়
পরিণাম পুষ্পহার কি হইবে হায়!
ধর্ম্মেও ভীষণ হিংসা। এই বলিদান,—
নিরমম এ হিংসা কি স্বর্গের সোপান?
এই নির্দ্দয়তা ধর্ম্ম?—মনে নাহি লয়।
না—না—এই নির্দ্দয়তা ধর্ম্ম কভু নয়।
আছে কোনো ধর্ম্ম, কোনো নীতি সনাতন,
করিবারে এই হিংসা-বহ্নি নির্ব্বাপণ।
যে চাহে কাটিয়া এই সংসার-বন্ধন
করিবারে সেই মহা ধর্ম্ম অন্বেষণ,—

করিয়া বিবাহ, ভোগ বিলাস সম্বল,
পরিবে সে শৃঙ্খলের উপরে শৃঙ্খল ?
না করিলে মনপ্রাণ সর্ব্বস্ব অর্পণ,
জীবের এ দুঃখ নাহি ঘুচিবে কখন।
এক প্রাণ দিব কারে—দুঃখ পারাবার
অনন্ত প্রাণীকে, কিংবা পত্নীকে আমার ?
যেমন আমার প্রাণ হিংসায় কাতর,
না হবে তেমন কেন পরের অন্তর ?
সঞ্চারিছে যেই শান্তি দয়ার নির্ঝর
মম প্রাণে, নর প্রাণে কেন নিরন্তর
বহিবে না, করিবে না শান্ত সুশীতল
হায়! হিংসানলে দগ্ধ এই ধরাতল ?
নরের এ দয়া বুঝি ধর্ম্ম সনাতন !
এই ধর্ম্মে হবে বুঝি হিংসা নির্ব্বাপণ !
যাব বনে—করিব না বিবাহ কখন—
মহাধ্যানে করিব এ তত্ত্ব অন্বেষণ।
থাকিলে সংসারে, ভোগ বিলাসে জড়িত
হইয়া এ আত্মা হবে পাপে কলুষিত।
কাটি জনকের স্নেহ, স্নেহ জননীর,
জীবদুঃখে দিব প্রাণ—করিলাম স্থির।”
সুসজ্জিত কক্ষে যুবা ভ্রমি কিছুক্ষণ
চিন্তামগ্ন পথহারা পথিক যেমন
আঁধার-প্রান্তরে দীপ করিল দর্শন।
প্রফুল্ল বদনে যুবা কহিল তখন—
“না—না—হইতেছে ভুল, যদি এ সংসার
ছাড়ে সবে, গৃহাশ্রম রহিবে না আর !

থাকি গৃহে এই ধর্ম্ম করিব সাধিত
শিখাব সাধিতে নরে হয়ে পবিত্রিত।
বিকার-সমুদ্রে ডুবি রব নির্ব্বিকার,
পঙ্কজ পঙ্কেই বাড়ে, জলে শোভে আর!
পূর্ব্ব মহাজনগণ ছিলেন সংসারে
অনাসক্ত, অগ্নিদেব যেমতি অঙ্গারে।
থাকিব সংসারে; সেই দয়ার নির্ঝরে
সুশীতল মম প্রাণ, নরের অন্তরে
এই সুশীতল উৎস করিয়া সঞ্চার
নিবাব হিংসার বহ্নি, জুড়াব সংসার।"
সিদ্ধার্থ সপ্তম দিনে, প্রফুল্ল অন্তর,
"করিব বিবাহ আমি"—করিলা উত্তর।
"রূপ কুল জন্ম গোত্র বিশুদ্ধ যাহার,
রূপসী বিদুষী নম্রা ঈর্ষা, নাহি যার।
মুখে প্রফুল্লতা বুকে করুণা আলয়,
হস্তে পর-সেবা, বাক্য মধুরতাময়।
স্নেহে মাতা ভগ্নী সমা, পতিপরায়ণা,
নাহি মনে প্রগল্‌ভতা, তর্কে অপ্রবণা।
দানে ধর্ম্মে অনাসক্ত, জ্ঞানে আত্মসম
সর্ব্ব-জীব, সেই নারী হবে পত্নী মম।"
চিন্তান্বিত নরপতি—হেন নিরুপমা
কোথায় মিলিবে কন্যা? দিলেন ঘোষণা,—
"শাক্য-কুমারীকে, মণি-কাঞ্চনে পূরিত,
করিবে "অশোক ভাণ্ড" সুখে বিতরিত
কুমার সপ্তম দিনে।" উৎসব-বাসরে
হাসিল সজ্জিত পুরী প্রফুল্ল অন্তরে।

সজ্জিত অশোক কক্ষ বিচিত্র বাসনে,
বিচিত্র কুসুমদামে, বিচিত্র ভূষণে।
বিচিত্র পুষ্পের বেদি ; পুষ্পেত কুমার
নবীন যৌবন-পুষ্পে ; দীর্ঘ পুষ্পহার
চারু নব যৌবনের শাক্য কুমারীর
বহিতে লাগিল ধীরে, যেন জাহ্নবীর
সলিলে কুসুমদাম চলেছে ভাসিয়া
পূজি কোনো দেব-পদ তরঙ্গে নাচিয়া।
কুমার সজ্জিত পুষ্পে, সজ্জিতা কুমারী,
সজ্জিত অশোক ভাণ্ড পুষ্পে সারি সারি !
কুমারের করে ভাণ্ড করিয়া গ্রহণ,
বিনিময় করি করে আত্ম সমর্পণ,
একে একে ভাণ্ড শিরে গেল বালাগণ,
গেল চন্দ্র-কিরীটিনী যামিনী যেমন।
কুমার অটল, স্থির, অবিচল মন,
স্বর্ণ দেবমূর্ত্তি যেন ;—এ কি দরশন !
কৌমুদী যামিনী-শেষে উঠিল কি ভাসি
উষার আলোকরাশি সুপ্রভাতে হাসি।
দণ্ডপাণি-সুতা গোপা অতি ধীরে ধীরে
প্রবেশিল দিবা যেন অশোক-মন্দিরে।
হাসিল সে রূপালোকে কক্ষ সুশোভন,
বসন্ত- প্রভাতে যেন কুসুম-কানন।
কুমার চাহিলা—চক্ষু ফিরিল না আর,
নিস্পন্দ রহিল চাহি বদন গোপার।
ভাসিয়া উঠিল জন্মান্তর-স্মৃতি মনে,
অঙ্কুরিল সুপ্ত বীজ বর্ষা সমাগমে।

কুমার দেখিলা স্বপ্ন,—যমুনার তীর,
কি সুন্দর বন, কিবা শোভা প্রকৃতির !
কিশোর গোপাল তিনি, কিশোরী গোপিনী
এই গোপা, কিশোরের প্রেমে উন্মাদিনী।
কি মধুর প্রেমলীলা ভক্তির চরম !
কি মধুর যুগলের আত্মবিস্মরণ !
গোপাও আপনা-হারা রয়েছে চাহিয়া,
নবোঢ়া যূথিকা যেন চন্দ্র নিরখিয়া।
কি অজ্ঞাত সুখে পূর্ণ দুইটি হৃদয়
হইল প্রথম,—সুখ পৃথিবীর নয় !
ভঙ্গ স্বপ্ন কুমারের, ভঙ্গ কুমারীর,
হইল, রহিলা চাহি পানে পৃথিবীর।
সলজ্জা কহিলা গোপা হাসি আধ আধ—
"যুবরাজ ! করিয়াছি কোন অপরাধ ?
করিলে বঞ্চিত, নাহি দিলে উপহার,
কেন হইলাম আমি ঘৃণার আধার ?"
"নহে ঘৃণা"—লজ্জাপূর্ণ কহিলা কুমার
"নিঃশেষ অশোক ভাণ্ড ; কিবা উপহার
দিব ভাবিতেছি মনে।" করিয়া মোচন
অঙ্গুরী গোপার করে করিলা অর্পণ।
ব্রীড়ার অরুণ রাগ কপোলে গোপার
ভাসিল, অঙ্গুরী গোপা খুলি আপনার
কহিলেন—"এ অঙ্গুরী করুন গ্রহণ
রত্ন বিনিময়ে এই তৃণ অকিঞ্চন।
আমি উপাসিকা, নহে বাসনা আমার
আভরণহীন কর দেখি আপনার।"

গেলা চলি গোপা বাণ-বিদ্ধা কুরঙ্গিণী ;
উঠিল কপিলপুরে আনন্দের ধ্বনি।

(৫)

বিবাহ।

সিদ্ধার্থ সপ্তম দিনে শাক্যকুল-ধর্ম্মমতে,
রঙ্গভূমে সজ্জিত বিস্তৃত
শিল্পে শৌর্য্যে যুবাবৃন্দে হেলায় করিলে জয়,
শাক্যগণ হইল বিস্মিত।
আজিন্ম বৈরাগ্য ভয়ে বিলাসে পালিত যুবা,
পিঞ্জরের বিহঙ্গ যেমন ;
কোথায় পাইল যুবা এ অপূর্ব্ব শৌর্য্য বীর্য্য,
এই শিল্প শিক্ষা নিরুপম
হায়! মূর্খ শাক্যগণ! কিবা অসম্ভব তার,
নারায়ণ অংশে জন্ম যার ?
শিখে কি কেশরী শৌর্য্য ? শিল্পবিদ্যা ইন্দ্রধনু ?
সঙ্গীত কোকিলে শিখে আর ?
"জয়, রাজপুত্র জয়!"— গাইল অনন্ত কণ্ঠ,
বামাগণ দিল হুলুধ্বনি,
বাজিল মঙ্গল-বাদ্য, গোপা দিলা বরমালা,
পুষ্পবৃষ্টি করিল রমণী।
বিবাহ-উৎসবে মত্ত হইল কপিলবস্তু
সপ্ত দিবা নিশি অবিরাম,

দানস্রোতে দরিদ্রতা গেল ভাসি, শাক্যরাজ্যে
হইল দুঃখের অবসান।
ঊনবিংশ বর্ষ যবে হইলেন রাজপুত্র
উদ্বাহ-শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত,
উড়িবে অনন্তাকাশে যে বিহঙ্গ মনসাধে
হইল পিঞ্জরে নিপতিত।
তথাপি রাজার মনে নাহি শান্তি, এ শৃঙ্খল
কাটে পাছে পাখী উদাসীন,
নির্ম্মলা রোহিণী তীরে নির্ম্মিলা প্রমোদ-পুরী
শিল্পী-স্বপ্ন নন্দন-প্রতিম।
বেষ্টিত নিবিড় বনে চারু শৃঙ্গে মনোহর
গ্রীষা-বর্ষা-হেমন্ত-নিবাস
হইল নির্ম্মিত চারু, মর্ম্মরের স্বপ্ন যেন
বিচিত্র তরঙ্গে পরকাশ।
উত্তরে অদূরে স্থির ধ্যানমগ্ন হিমাচল,
তুষার রজতে বিমণ্ডিত,
মিশেছে মহান্ শির মহান্ অনন্ত সনে,
যেন যোগ-আত্মা সমাহিত।
স্তরে স্তরে মহাবন, দিগব্যাপী শৈলবপু,—
স্থানে স্থানে মেঘে আচ্ছাদিত,
তুষার নির্ঝর ধারা শোভে শৈল বক্ষ বাহি,
যেন রজতের উপবীত।
হিমাচল পদতলে শোভিতেছে পুরী, যেন
পুষ্পপাত্র দেব-পদতলে,
তিন দিকে রোহিণীর, শশধরে বেষ্টি যেন,
মরকত মেখলা উছলে।

মধুর সঙ্গীত ধ্বনি বহে নির্জ্জনতা বক্ষে
সুবাসিত শৈল সমীরণ,
নাচিছে নর্ত্তকীগণ, পুষ্পোদ্যানে পুষ্পগণ,
বৃক্ষে শিখী তুলিয়া পেখম।
গোপার মধুর প্রেমে করিল প্রমোদ-পুরী
প্রেমের মাধুর্য্যে প্রপূরিত,
গোপায় প্রেমের স্রোতে বৈরাগ্য চলিল ভাসি,
সিদ্ধার্থ হইল নিমজ্জিত।
গোপা রূপবতী, গোপা গুণবতী, ধর্ম্মে মতি,
পতি-প্রেমে পূর্ণ মাতোয়ারা,
সিন্ধুগর্ভে নদী যেন, সিদ্ধা সাধিকার মত
পতি-পদে গোপা আত্মহারা।
নাহি অঙ্গে আভরণ, না আছে অবগুণ্ঠন,
দেখিয়া বিবশা লজ্জাহীনা,
একদা হাসিল সখী; হাসিয়া কহিলা গোপা
উচ্ছ্বাসে আলাপি কণ্ঠবীণা,—
"নারী-আভরণ ধর্ম্ম, নারীর সৌন্দর্য্য ধর্ম্ম,
ধর্ম্ম অবগুণ্ঠন তাহার।
সুসলিলা দীর্ঘিকার আছে কি অবগুণ্ঠন?
কি অবগুণ্ঠন চন্দ্রিকার?
ইন্দ্রিয় সংযত যার, বাক্য যার নিয়মিত,
চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ যাহার,
মন যার নিরমল স্বচ্ছ সরসীর জল,
আবরণে কি কাজ তাহার?
আর যার লজ্জা নাই, সম্ভ্রম শীলতা নাই,
চিত্ত যার নহে বশীভূত,

ইন্দ্রিয় দুর্দ্দমনীয়, শত অবগুণ্ঠনেও
সেই নারী সদা অনাবৃত!
আত্মবশ চিত্ত মম, পতিতে আমার প্রাণ,
চরিত্র দুর্ভেদ্য আবরণ,
হৃদয় অজেয় দুর্গ, তাহার রক্ষক ধর্ম্ম,
লজ্জা অবগুণ্ঠন বসন!"
গোপা আর সিদ্ধার্থের বিবাহ পবিত্র যোগ
গঙ্গা ব্রহ্মপুত্রের মিলন,
সিদ্ধার্থ আপনি কায়া, গোপা পুণ্যবতী ছায়া,
পতি-প্রাণে পশিল কেমন!
দুইটি শিশির বিন্দু যথা ফুল্ল পুষ্পদলে
সমীরণে হয় সংমিলিত,
দুইটি হৃদয় প্রেমে হইল মিশ্রিত তথা,
হইল বিস্মিত বিমোহিত।
রাজপুত্র এতদিন ছিলেন জীবন-পথে
পথিক একাকী অসহায়,
সঙ্গিনী সহধর্ম্মিণী মিলিল, পাইল তরু
শক্তি, সম-প্রাণতা, লতায়।
বুঝিলেন রাজপুত্র নৃশংস হিংসার মাত্র
রঙ্গভূমি নহে এ সংসার,
আছে তাহে প্রেমধারা নিরমল সুশীতল,
বনপথে আলো জ্যোৎস্নার!
ভাবিলেন বুঝি আছে দুঃখের ছায়ায় সুখ,
হাহাকার সঙ্গে আছে হাসি,
মরুভূমে আছে সর,— পতিপ্রাণা রমণীর
পতি-প্রেম স্বর্গ-সুধারাশি।

নবীন বৈরাগ্য মেঘ, গোপার প্রণয়ালোকে
হইল অদৃশ্য, আলোকিত ;
আশ্বস্ত হইল রাজা, হতভাগ্য শুদ্ধোদন
বিদ্যুতে হইলা প্রতারিত।

---

(৬)

গাথা।

মহাঝটিকার পূর্ব্বে প্রশান্ত প্রকৃতি মত,
শান্তির সুখদ ক্রোড়ে রাজপুরী নিদ্রাগত।
নাহি উদ্বেগের ছায়া, নাহি নিরানন্দাভাস,
রাজার হৃদয়ে,—যেন খচিত শারদাকাশ
আশা-তারকায় ভরা ; মাতা গৌতমীর প্রাণ,
কুসুমিত সরোবর,— পূর্ণ তাঁর মনস্কাম।
গোপার সৌন্দর্য্যে প্রেমে সিদ্ধার্থ মুগ্ধ, মোহিত,
বুঝিলেন বনহস্তী হইয়াছে শৃঙ্খলিত।
নাহি বৈরাগ্যের ছায়া সিদ্ধার্থের মুখে, প্রাণে,
সেরূপ সিদ্ধার্থ আর না থাকে বসিয়া ধ্যানে।
রূপের তরঙ্গ তুলি' রূপসী নর্ত্তকীগণ
নাচিতেছে, করিতেছে কণ্ঠ-সুধা-বরিষণ।
সুধার তরঙ্গ তুলি' নানা যন্ত্র একতানে
বাজে কলকণ্ঠ সব অমৃত ঢালিয়া প্রাণে।
নৃত্য গীতে নবপুরী মুখরিত মনোহর,
আলোকিত রূপে, পুষ্পে সুবাসিত নিরন্তর।
এই বিলাসের স্বপ্নে, গোপার বদন বুকে,

চাহি মুখ প্রেমমুগ্ধ একদা সিদ্ধার্থ সুখে
শুনিছেন একমনে বাঁশরী-স্বর-লহরী,—
বাজিতেছে বেণু কণ্ঠে এ কি গীত মুগ্ধকরী !
নীরব নিশীথ স্থির, নীরব নিদ্রিত পুর,
কক্ষান্তরে বাতায়নে সখী একা কি মধুর
আলাপিছে বেণু ! সখী কি বাজায় নাহি জানে,
কি যেন অভূতপূর্ব্ব বসিয়া অজ্ঞাত ধ্যানে
নিজে আত্মহারা বালা !—একি দেবমায়া হায় ।
সেই নৈশ বাঁশরীর মূর্চ্ছনায় মূর্চ্ছনায়
কি যেন বৈরাগ্য-সুধা করিতেছে সঞ্চারিত
নিদ্রিত জগৎ-প্রাণে, কুমার প্রাণে মোহিত ।
নিদ্রিতা গোপার মুখ বক্ষে, যুবা আত্মহারা,
না দেখে নয়নে আর। ধীরে নয়নের তারা
হ'লো নিমীলিত, বক্ষে ঢুলিয়া পড়িল মাথা,
শুনিতে লাগিল যেন বাঁশরীতে এই গাথা ।—

"জরা ব্যাধি দুঃখে ভরা হায় ! এইত্রিভুবন,
মরণ-অগ্নিতে দীপ্ত, অনাশ্রয়, অকিঞ্চন ।
কুম্ভগত ভ্রমরের মত হায় ! জীব আর,
মরণের হস্ত হ'তে নাহি কি উদ্ধার তার ?
শারদীয় অভ্রসম অনিত্য এ রঙ্গালয়,
জন্ম মৃত্যু নিরন্তর করিতেছে অভিনয় ।
বেগবতী নদী মত, চঞ্চল বিদ্যুৎপ্রায়,
মানব-জীবন দ্রুত কোথায় চলিয়া যায় ।
অজ্ঞান আঁধারে ঘোর তৃষ্ণায় পীড়িত নর,
কুম্ভকার-চক্র মত ঘুরিতেছে নিরন্তর ।
ইন্দ্রিয়ের সুখে মুগ্ধ হায় রে মানব মত,

জড়িত ব্যাধির জালে প্রলুব্ধ মৃগের মত।
বাসনা জ্বলন্ত বহ্নি; তাহার ইন্ধন ভোগ;
ভোগ সুখ স্বপ্ন সম, জলে চন্দ্র-ছায়া যোগ।
যৌবনে সুন্দর দেহ হ'লে জরা-ব্যাধ-গত
করে নর পরিহার, মৃগে শুষ্ক হ্রদ মত।
ফলিত পুষ্পিত চারু বৃক্ষ সম দেহ, হায়।
জরা আক্রমিলে হয় তড়িৎ-আহত-প্রায়।
কহ মুনে! মানবের কি আছে উপায় বল?
জরা দহে দেহ, যথা গুপ্ত বিষ বনস্থল।
হরে পরাক্রম বেগ, সুরূপ বিরূপ করে,
হরে সুখ, হরে শান্তি, ব্যাধি-দগ্ধ করে নরে।
কহ মুনে! মানবের কি আছে উপায় বল?
নির্ব্বাণ হইবে কিসে জরা-ব্যাধি-দুঃখানল?
শিশিরে তুষারপাতে প্রফুল্ল কমল প্রায়
হায়! দেহ, বল, রূপ—সকলি শুকায়ে যায়।
নিপতিত নদীবক্ষে বিশুষ্ক পত্রের মত,
এ সংসারে প্রিয়জন ভাসিয়া যায় সতত।
যে যায় সে যায় হায়! কেহ ত ফিরে না আর,
মিলন তাহার সহ নাহি হয় আরবার।
সকলি মৃত্যুর বশে, মৃত্যু বল বশে কার?
জন্ম-জরা-মরণের বিষে পূর্ণ এ সংসার।
ক'রেছিলে প্রণিধান সিদ্ধার্থ! কি মনে হয়—
উদ্ধারিতে এ সংসার? উপস্থিত সে সময়।"
চন্দ্রমা পশ্চিমাকাশে ডুবিতেছে ধীরে ধীরে,
ধীরে ধীরে ভাসিতেছে ঊষা পূর্ব্বাকাশ-শিরে।
বাঁশী-কণ্ঠে এ সময়ে শুনি এ অপূর্ব্ব গান,

নিদ্রিত কি জাগরিত সিদ্ধার্থের নাহি জ্ঞান।
বারেক ভাবিলা মনে—পৃথিবীতে এ সঙ্গীত
সম্ভবে না, শুনিতেছি স্বপ্নে ত্রিদিবের গীত।
শুনিলেন বিহঙ্গের অস্ফুট কাকলী গান।
বুঝিলেন নহে স্বপ্ন,—আকুল হইল প্রাণ।
হৃদয় করিল মুগ্ধ সঙ্গীত-সুধা-তরল,
জাগিল নিদ্রিত প্রাণে প্রচ্ছন্ন বৈরাগ্যানল।
আবার উঠিল বাজি বাঁশীতে মধুর গান,
শুনিতে লাগিল পুনঃ সিদ্ধার্থ উদাস প্রাণ।

গাথা।

১

এ বাঁশীর স্বর, মানব-জীবন!
সুধাময় অনিল-নিস্বন।
আনল-লহরী মত, জীবন বহে সতত,
ঝটিকা নিশ্বাস—কুস্বপন।

২

কোথায় হইতে আসি, কোথায় বা যায় ভাসি,
আদি অন্ত কোথায় কেমন?
শুধু দেখি অনিবার আসে যায় বার বার,
তাহে শান্তি পায় না কখন।

৩

এই ভোগ, এই সুখ, এই পরিজন-মুখ,
বাঁশরীর তরঙ্গ যেমন,
উঠ, উঠ, মায়াসুত! কাঁদিছে দুঃখে জগত,—
কি কাতর করুণ রোদন!

৪

এই দেহ সুকুমার, এই প্রেম পুষ্প-হার,
শুকাইবে, রবে না কখন।
অনিত্য এ সুখ ছাড়, নিত্য সুখ আবিষ্কার
কর তুমি, কর নিষ্ক্রমণ।

বসিলেন যুবরাজ উঠিয়া পর্য্যঙ্কোপরে,
অভিভূত, আত্মহারা সেই সঙ্গীতের স্বরে।
জীবনের পূর্ব্ব-কথা ভাসিয়া উঠিল মনে।
জীবনের উচ্চ লক্ষ্য দেখিলেন ভূনয়নে।
বুঝিলেন এ সংসার অনিত্য, কিছুই নয়,
এজীবন-দীপালোক জ্বলি নির্ব্বাপিত হয়।
সত্য বেণু-রব-মত মানব-জীবন হায়!
আইসে কোথায় হ'তে কোথায় ভাসিয়া যায়।
কিন্তু এ অনিত্য মাঝে অবশ্য আছে নিশ্চয়
কোনো নিত্য সত্যসুখ, মানব-শান্তি-আলয়।
যদি আমি পাই তাহা, পারি প্রদানিতে নরে,—
গম্ভীর চিন্তায় মগ্ন হইলেন ধ্যানভরে।

পুত্রের বিলাসে মুগ্ধ, শান্ত চিত্ত, ভ্রান্ত মন,
নিশাশেষে ও কি স্বপ্ন দেখিছেন শুদ্ধোদন?
দ্বিতীয় প্রহর নিশি, নীরব স্তব্ধ জগৎ;
জীবগণ নিদ্রা ক্রোড়ে অবিচল মৃতবৎ।
এমন সময়ে পুত্র ত্যজি রাজ আভরণ
পরিব্রাজকের বেশে করিতেছে নিষ্ক্রমণ।
পশ্চাতে মঙ্গলগীত গাইতেছে দেবগণ,
বাজিছে মঙ্গলবাদ্য আকাশে মধুর স্বন।
হৃদয় হইল শুষ্ক, কাঁপিয়া উঠিল বুক,

কহিলেন, স্বপ্নে ডাকি উচ্চৈঃস্বরে শুষ্কমুখ—
"কঞ্চুকি! কঞ্চুকি! ওরে ফাটে বুক দেখে আয়।
কাঁদাইয়া পুরবাসী সিদ্ধার্থ কোথায় যায়!"

---

(৭)

বৈরাগ্য।

দেখিলেন রাজপুত্র,— দিন দিন মায়াজালে
করিতেছে জড়িত সংসার;
যে বিলাস বিষবৎ ভাবিতেন পূর্ব্বে মনে,
এবে মুগ্ধ কুহকে তাহার।
বিলাসের বিষবৃক্ষ বাড়িতেছে দিন দিন,
হৃদয় করিছে আচ্ছাদিত।
আর না, এখন তারে সমূলে সুদৃঢ়-করে
করিবেন বলে উৎপাটিত।
হইলেন রাজপুত্র পুনঃ ধ্যান-নিমজ্জিত
ভয়ে প্রাণ কাঁপিল গোপার।
পুত্র-প্রাণ শুদ্ধোদন দেখিলেন, আশাকাশে
পুনঃ মেঘ হইল সঞ্চার।
গ্রীষ্ম বর্ষা হেমন্তের বিচিত্র প্রাসাদত্রয়
করিলেন নির্ম্মিত, সজ্জিত,—
রমণীর রূপালোকে, সঙ্গীতের সুধা-স্রোতে,
বিলোল বিলাসে প্রপূরিত।
ইন্ধন ইন্দ্রিয়-সুখে ঢালে রাজা কত মতে!
কিন্তু-পুত্র বিতৃষ্ণ সতত;
থাকে ধ্যানে অন্যমনে আনন্দপূর্ণ ভবনে,
পদ্মপত্রে নীরবিন্দু মত

একদিন সন্ধ্যাকালে,　　কুমার যাইতেছিলা
প্রমোদ-কাননে মনোহর ;—
পথি মধ্যে ও কি দৃশ্য !　　যাইতেছে বৃদ্ধ এক
জরা-জীর্ণ শীর্ণ কলেবর।
"সারথি !"—জিজ্ঞাসে যুবা—"কে এই দুর্ব্বল নর,
মাংসহীন শরীরে ভাসিয়া
উঠিয়াছে শিরা যত　　বৃক্ষের শাখার মত,
দন্তহীন, দৃষ্টিহীন, যাইছে চলিয়া ?
যষ্টিতে ক'রেছে ভর.　　তবু কাঁপে কলেবর,
শুক্ল কেশ স্খলিত চরণ।
কি কষ্টে যাইছে আহা !　　কি বিকৃত কলেবর !
লোল চর্ম্ম বিকৃত কেমন !"
সারথি কহিল ধীরে,—　　"কুমার ! হয়েছে বৃদ্ধ
হায় ! এই নর জীর্ণদেহ।
নিস্তেজ ইন্দ্রিয়গণ,　　নাহি বলবীর্য্য আর,
কে আর করিবে তারে স্নেহ ?
জীর্ণ বনকাষ্ঠ মত,　　হইয়াছে কার্য্যাক্ষম ;
তাই পুত্র পত্নী, পরিবার,
নাহি করে যত্ন আর,　　দুঃখী অনাথের মত
যায় এইরূপে দিন তার।"
সারথি !"—জিজ্ঞাসে পুনঃ　　কাঁদিল কোমল প্রাণ,
—"কুলধর্ম্ম ইহা কি তাহার ?
কিংবা জগতের ধর্ম্ম ?　　শীঘ্র বল, সত্য বল,
চিন্তিব ইহার প্রতিকার।"
"কুমার !"—সারথি　　কহে,—"নহে ইহা কুলধর্ম্ম,
জগতের ধর্ম্ম এইরূপ !"

কুমার জিজ্ঞাসে,—"তবে আমার গোপার দেহ,
হইবে কি এমনি বিরূপ ?"
"হায় ! রাজপুত্র !"—কহে সারথি—"এ জগতের
সকলেই জরার অধীন।
কিবা রাজা, কিবা রাজ্ঞী, রাজপুত্র, রাজবধূ,
জরাজীর্ণ হবে এক দিন।"
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি, কুমার কহিলা ধীরে,—
"আমরা কি অবোধ অজ্ঞান।
মাতিয়া যৌবন-মদে হায় ! নাহি ভাবি কভু
এই শরীরের পরিণাম।
সারথি ! ফিরাও রথ,—চল গৃহে ! যাইব না
প্রমোদ কাননে আজি আর।
জরা আক্রমিবে যারে এইরূপে একদিন
ক্রীড়ামোদে কি কাজ তাহার ?"

আর এক দিন যুবা যাইতে প্রমোদবনে
দেখি' পীড়াগ্রস্ত একজন,
জিজ্ঞাসিলা,—"এ কে নর ? এ ত নহে জরাগ্রস্ত,
তবে কেন বিবর্ণ শরীর,
শুষ্ক দেহ, ক্লিষ্ট মুখ, কষ্টে বহিতেছে শ্বাস,
যাতনায় বহে নেত্রনীর ?"
"হে দেব !"—সারথি কহে,—"জরা নহে, পীড়া এই,
জরার অধিক ক্লেশকর।
নিবিবে জীবন-দীপ, হরণ ক'রেছে তৈল
হায় ! পীড়া নিষ্ঠুর-অন্তর !"
কুমার কহিলা খেদে,—"স্বাস্থ্য তবে স্বপ্নক্রীড়া,
ব্যাধি-দশা এ কি ভয়ঙ্কর !

কে পারে দেখিয়া ইহা আমোদে হইতে রত ?
সারথি ? ফিরাও রথবর !"
আর এক দিন যুবা যাইতে উদ্যান পথে
দেখি দৃশ্য চিত্তবিদারক,
জিজ্ঞাসিয়া—"একি দেখি, খাটের উপর দেহ,
বস্ত্রাবৃত আপাদমস্তক !
কেন বা বহিয়া উহা নিতেছে ইহারা বল,
কেন বেড়ি' নর-নারী হায় !
করিতেছে আর্ত্তনাদ, করি' বক্ষে করাঘাত,
গড়াগড়ি দিতেছে ধূলায় ?
সারথি ! ত্বরায় ! কহ ! এ কি করে মম প্রাণ !
এ কি, বর্ষে আমার নয়ন !"
সারথি বিষাদে কহে,— "খাটের উপরে দেব !
হতভাগ্য মৃত একজন।
জীবখেলা শেষ তার, পত্নী, পুত্র, পরিবার,
পৃথিবীতে দেখিবে না আর।
ফুরায়েছে সুখভোগ, গৃহ তার অন্ধকার,
পরিজন করে হাহাকার !"
কুমার গম্ভীর মুখে কহিলা,—হায় রে ধিক্ !
জরাজর্জ্জরিত এ যৌবন !
ব্যাধি ভোগ্য দেহে ধিক্ ! অনিত্য জীবনে ধিক্ !
ধিক্ ভোগরত জ্ঞানিগণ।
নাহি থাকে জরাব্যাধি নাহি থাকে মৃত্যু যদি,
তবু দুঃখপূর্ণ এ সংসার।
সারথি ! ফিরাও রথ, যাব না উন্মাদ-পথে,
মুক্তি চিন্তা করিব ইহার।"

দেখি আর এক দিন পথে অপরূপ মূর্ত্তি
সারথিকে জিজ্ঞাসে কুমার,—
"বিনীত প্রশান্ত মূর্ত্তি কে ওই পুরুষবর
জীবন্ত মূরতি নম্রতার?
কষায়-বসন অঙ্গে হস্তে মাত্র ভিক্ষাপাত্র,
গতি কিবা প্রশান্ত সুধীর!
বদনে কি শান্তি, প্রীতি! অঙ্গে কি পবিত্র জ্যোতিঃ!
কি করুণা-পূর্ণিত শরীর।"
সারথি ভকতি-ভরে কহিল,—সন্ন্যাসী ইনি,
সংসার করিয়া পরিহার,
হইয়া সন্ন্যাস ব্রত. ইন্দ্রিয় করি, সংযত,
হয়েছেন বিনয়-আধার।
রাগ নাই, দ্বেষ নাই সংসার-কামনা নাই,
একমাত্র ভিক্ষান্নে জীবন
করেন যাপন ইনি; করেন প্রীতির নেত্রে
সর্ব্ব জীব সমান দর্শন।"
সাধু! সাধু! হে সারথি!"—কুমার প্রফুল্লমুখে
কহিলেন আনন্দিত মন,
"আমার জীবনপথ দেখিলাম এত দিনে;—
সন্ন্যাস প্রশংসে জ্ঞানিগণ।
আত্মহিত, পরহিত, জীবনের নিত্যসুখ,
সুমধুর ফল সুধাময়,
আছে এই পুণ্যপথে;—সারথি! ফিরাও রথ!—
এই পথ করিব আশ্রয়।'
দিন যায়, রাত্রি যায়, সিদ্ধার্থের হৃদয়েতে
বহিতেছে ঝটিকা প্রবল।

দিন যায়, রাত্রি যায়, প্রলয়-ঝটিকা-বেগ
দিনে দিনে বাড়িছে কেবল।
প্রভাত-অস্ফুটালোকে পুরোদ্যান-তরুমূলে
নিরজনে বসি' মূর্ত্তিপ্রায়,
প্রভাতের বাল-সূর্য্য জ্বালিয়া মধ্যাহ্নভাতি
সায়াহ্নের আঁধারে লুকায়।
সারাদিন ধ্যানে যুবা ভাবেন অনন্তমনে,
সীমা কিছু নাহি ভাবনার।
প্রাণের পিপাসা তাঁর মিটিবে না এ সংসারে,—
ছাড়িবেন তবে কি সংসার?
হায়! স্নেহময় পিতা, স্নেহময়ী মা গৌতমী,—
করিবেন কেমনে প্রহার
এমন দারুণ বজ্র, তাঁদের কোমল প্রাণে;
প্রাণে ক্ষুদ্র-যূথিকা গোপার?
হায়! পতিপ্রাণা গোপা অমৃত-বল্লরী মত
বেড়িয়াছে পতি-সহকার,
মিশায়েছে দেহে দেহ, মিশায়েছে প্রাণে প্রাণ,—
এই কি ললাট-লিপি তার?
গোপার দেবতা পতি গোপার তপস্যা প্রেম
পতিপূজা জীবনের ব্রত,
প্রেমরূপা প্রাণধারা ঢালিয়াছে অবিরল
সুশীতল নির্ঝরিণী মত।
একটি কঠোর কথা কহে নাহি কোন দিন,—
সিদ্ধার্থের ভিজিল নয়ন।
হায়! কি এ বজ্রানলে সেই প্রেমময়ী লতা
করিবেন সিদ্ধার্থ দাহন?

না—না, সন্ন্যাসের পথে দাঁড়াইয়া তিন জন—
বৃদ্ধ পিতা, মাতা, ওই আর
তাঁহার প্রাণের গোপা, তাঁহার প্রেমের গোপা,—
কিবা তিন মূর্ত্তি করুণার!
হায়! ইহাদেরে ঠেলি', ভূমে বজ্রাহত ফেলি,
যাইবেন সিদ্ধার্থ কেমনে?
দুই ধারা দর দর বহিতে লাগিল ধীরে,
সিদ্ধার্থের যুগল নয়নে!
তাদের পশ্চাতে হায়! কিন্তু একি দেখা যায়—
নরনারী অনন্ত অপার!
জরা-ব্যাধি-মৃত্যু-করে করিতেছে হাহাকার,
মাগিতেছে করুণা তাঁহার।
দুঃখপূর্ণ এ সংসারে থাকিবেন কোন্ প্রাণে,
সহিবেন দুঃখ নিদারুণ,
নর-নারী-হাহাকার শুনিবেন অনিবার
নির্ম্মম হৃদয়ে সকরুণ।
ধর্ম্ম—জীবহিংসা-যজ্ঞ! তাতেও অনন্ত জীব
নির্ব্বাক্ করিছে হাহাকার।
দীন-জীবে দুঃখ দিলে হায়! মূর্খ নর কেন
হবে দুঃখ নির্ব্বাণ তোমার?
"না—না, হিংসা নহে ধর্ম্ম, নহে ধর্ম্ম নির্দ্দয়তা,
নির্ব্বাণের এই পথ নয়,
আছে অন্য পুণ্য পথ, করি' আত্মবিসর্জ্জন
সেই পথ খুঁজিব নিশ্চয়।"
একদা একরূপে বসি' ভাবিছেন দয়াময়,
আনন্দের মহা কোলাহল,

উঠি, রাজ-অন্তঃপুরে ছাইল সমস্ত পুরী,
ছাইল নগর অবিরল।
আসি' এক অনুচর, কহে আনন্দের মূর্ত্তি—
"যুবরাজ! দেও উপহার।
আজি বড় শুভ দিন, চরিতার্থ নরপতি,
জন্মিয়াছে কুমার তোমার।"
চিত্রিতের মত চাহি রহিলেন রাজপুত্র
তার মুখ পানে অবিচল,
বিস্মিত সে গেলে চলি, সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি'
কহিলেন নয়ন সজল;—
"হায়! যেই সংসারের বন্ধন করিতে ছিন্ন
করিলাম সংকল্প এখন,
সুদৃঢ় বন্ধন আর হৃদয়ের হৃদয়েতে
সে সংসার করিল স্থাপন।
আর কিছু দিন হায়! থাকি যদি এ সংসারে,
বন্ধনের উপরে বন্ধন
জড়াইবে এ সংসারে; আর না, সময় এই—
মায়াজাল করিব ছেদন।

(৮)

মহানিশি।

অস্তে গেল ধীরে দিবা, আইল গোধূলি।
গোধূলি হইল অস্ত। বিভাবরী আসি
ঢাকিল কপিলবস্তু স্বচ্ছ অন্ধকারে।
সমুদ্র-কল্লোল মত সুদূর মধুর
নগর-আনন্দ-ধ্বনি পশিয়া শ্রবণে
ভাঙ্গিল যুবার ধ্যান। ছাড়িয়া উদ্যান
দেখিলেন যুবরাজ পশিয়া নগরে,—
আলোকে প্লাবিত পুর; বাদ্যে নিনাদিত।
রাজপথে দুই পার্শ্বে তরঙ্গ খেলিয়া
ছুটিছে আলোক-মালা, দেখাইয়া চারু
বিচিত্র পতাকাবলী, বিচিত্র তোরণ—
নির্ম্মিত পল্লবে পুষ্পে, আলোকে খচিত।
কদলী মঙ্গলঘট চিত্রিত সুন্দর
শোভিতেছে সারি সারি সজ্জিত আলোকে
পল্লবে কুসুম-দামে; শোভে দ্বারে দ্বারে
গবাক্ষে, অলিন্দে, ছাদে, আলোক রূপিণী
কুসুম-স্তবকময়ী আনন্দপ্রতিমা,
লীলাময়ী, হাস্যময়ী। বাজাইয়া বন্ধু,
বন্ধু-কণ্ঠে হুলুধ্বনি তুলিয়া পঞ্চমে,
অশ্বারূঢ় রাজপুত্রে করিছে বর্ষণ
পুষ্পকরে পুষ্পরাশি অজস্র ধারায়।

চ'লেছে তুরঙ্গ—রঙ্গে গ্রীবা ভঙ্গি করি
নাচিয়া নাচিয়া ; ধীরে নাচিয়া নাচিয়া
মস্তকে মঙ্গল-থালা মঙ্গল-রূপিণী
আনন্দে রূপসী-বৃন্দ করতালি দিয়া,
গাইয়া মঙ্গল-গীত যাইছে চলিয়া।
বাজিছে মঙ্গল-বাদ্য সম্মুখে পশ্চাতে
কুমারের, উঠিতেছে মঙ্গলের ধ্বনি
সংখ্যাতীত নরনারী-কণ্ঠে অবিরল।
শোভিতেছে রাজপুরী, পুরী কুমারের,
যেন মহা নাট্যশালা আলোক-সৃজন,
মণ্ডিত কুসুম-দামে পল্লবে, কেতনে,—
আনন্দ-সাগরে যেন উৎস আনন্দের!
সখাগণ, সখীগণ, মাতা প্রজাবতী
দেখাইলা পুত্রমুখ কুমারে তখন,—
আনন্দে অধীরা পুরী, অধীরা জননী।
ঢলাঢলি করি রঙ্গে, করি গলাগলি
করিতেছে হুলুধ্বনি পুরাঙ্গনাগণ,—
হাসির তরঙ্গ-ভঙ্গে কটাক্ষ ঢালিয়া।
দেখি সদ্য শিশুমুখ উঠিল কাঁপিয়া
কুমারের স্থির বক্ষ ; উঠিল কাঁপিয়া
দেখি কুমারের মুখ গোপার হৃদয়।
সুবর্ণ সংসার-পাত্রে জীবন্ত অমৃত
সিদ্ধার্থ দেখিলা যেন, হৃদয় তাঁহার
করি আকর্ষিত, করি প্লাবিত, কম্পিত।
সে হৃদয়-প্রকম্পন,—সিন্ধু প্রকম্পন
পূর্ণ-চন্দ্রোদয়ে যেন ; সে মুখ গম্ভীর,

ঝটিকা আসন্ন সেই গাম্ভীর্য্য সিন্ধুর—
দেখিল, বুঝিল গোপা; অমঙ্গল-ছায়া
ভাসিল আনন্দাকাশে; কাঁপিল হৃদয়।
বসিলেন রাজপুত্র স্বর্ণ-সিংহাসনে
খচিত বিবিধ রত্নে, কুসুম-মালায়,
সঙ্গীত-সুধায় পূর্ণ কক্ষে আলোকিত,
সজ্জিত পল্লবে পুষ্পে, চিত্রে, প্রতিমায়,—
পুষ্প-কিসলয়-ময়ী নর্ত্তকী-মালায়।
প্রেমভরা প্রাণভরা, কতই উচ্ছ্বাস
উঠিল রমণীকণ্ঠে, কণ্ঠে সারঙ্গের।
সেই সুধাধারা নাহি প্রাণে কুমারের
প্রবেশিল, পরশিল হৃদয় তাঁহার,
প্রসারিত পদ্মপত্রে যথা বারিধারা;—
কুমার উদাস প্রাণে রহিলা বসিয়া।
না শুনি সঙ্গীত যুবা, শুনিছে কেবল
জরা-মৃত্যু-প্রপীড়িত-জীব-হাহাকার।
না দেখি নর্ত্তকী-মুখ, দেখিছে কেবল
জরাজীর্ণ, রোগে শীর্ণ, মৃত, নিরন্তর;—
দেখিতেছে আর শান্তমূর্ত্তি যোগিবর।
"অনুসর। অনুসর!"—কহিছে কেবল
জলদগম্ভীর স্বনে যোগী নিরন্তর।
যুবক শুনিছে—'অনুসর! অনুসর!'
দ্বিতীয় প্রহর নিশি; উৎসব-কল্লোল
নিবিয়াছে, নিবিতেছে ধীরে পুরালোক।
আনন্দের অবসানে অবসন্ন পুরী
নিদ্রা যাইতেছে সুখে, গোপা নিদ্রাবতী;

কেবল এ রাজপুরে যুবা অনিদ্রিত।
গোপার সূতিকা-কক্ষে সিদ্ধার্থ কখন
দেখিছে পত্নীর মুখ অতৃপ্ত-নয়নে ;
সদ্যোজাত শিশুমুখ দেখিছে কখন
ত্রিদিব কুসুম ক্ষুদ্র ; উচ্ছ্বাসে অধীর
কখন শয্যায় বসি, কখন উঠিয়া
ভ্রমিতেছে চিন্তাকুল ধীরে কক্ষতলে।
গোপা দেখিছেন স্বপ্ন—কাঁপিতেছে ধরা,
বহিছে প্রলয় ঝড় করি বৃক্ষরাজি
উৎক্ষেপিত, ভূপতিত ; আকাশে নিষ্প্রভ
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহরাজি ; পড়িছে খসিয়া
বরিষার ফোঁটা সম নক্ষত্র সকল।
গোপার মুকুট ভগ্ন, ছিন্ন কেশজাল,
ছিন্ন মুক্তাহার ; গোপা ভগ্ন শয্যাতলে।
কাঙ্গালিনী আত্মহারা পড়িয়া ধরায়।
রাজার চামর ছত্র দণ্ড ভূপতিত
ছিন্ন ভিন্ন আভরণ সহ সিদ্ধার্থের।
নগরের দ্বার দিয়া হইল নির্গত
প্রজ্বলিত জ্যোতিঃপিণ্ড শান্ত সুশীতল,
নিবিড় তিমিরে পুরী করি নিমজ্জিত ;
উচ্ছ্বসিত মহাসিন্ধু, সুমেরু কম্পিত।
আতঙ্কে ভাঙ্গিল নিদ্রা, কাঁদি উচ্চৈঃস্বরে
কহে গোপা—"কহ নাথ! এ কি স্বপ্ন হায়!
শোকে, দুঃখে, ভয়ে প্রাণ ব্যাকুল আমার,
কি হবে আমার হায়! কহ দয়া করি।"
আশ্বাসি আকুলা গোপা, স্বপ্ন-বিবরণ

শুনিয়া ঈষৎ হাসি কহিলা কুমার—
"এ নহে কুস্বপ্ন গোপা। পুণ্যবতী তুমি
দেখিয়াছ পুণ্যময় পবিত্র স্বপন।
জন্ম জরা মরণের দুঃখভারে ধরা
দেখিয়াছ প্রকম্পিত, হবে দুঃখরাশি
উন্মুলিত, উৎপাটিত, বৃক্ষরাজি মত,
নবধর্ম্ম মহাঝড়ে। যেই মহালোক
হইল নির্গত এই রাজপুরী হতে,
আলোকিবে মানবের মোহ-অন্ধকার।
ছিন্ন করি মোহ-জাল আভরণ মত
স্বর্গীয় ভূষণে প্রিয়ে। হইব ভূষিত
আমরা, ত্যজিয়া ক্ষুদ্র ছত্রদণ্ড এই
হইব ত্রিলোক মধ্যে একছত্র পতি।
হইও না ভীতা গোপা! হও আহ্লাদিতা।
করিও না শোক, কর সুখ আহরণ।
এ নহে কুস্বপ্ন, মহা প্রীতি সুখে সুখী
হইব আমরা; সুখী হইবে জগৎ।'
ছাড়িয়া নিশ্বাস, সদ্যঃপ্রসূত প্রসূন
লইয়া হৃদয়ে গোপা হইলা নিদ্রিতা।
সেই ত্রিদিবের বক্ষে ত্রিদিব-কুসুম
করি বলে আকর্ষিত নেত্র কুমারের,
তুলিল কি নবোচ্ছ্বাস হৃদয়ে তাঁহার,—
সিদ্ধার্থ রহিলা চাহি চিত্রিতের মত।
বৈরাগ্যের শিলা বেগে চলিল ভাসিয়া
সেই উচ্ছ্বাসের স্রোতে; উঠিয়া কুমার
পর্য্যঙ্ক হইতে ধীরে ভ্রমিতে লাগিলা

অধোমুখে, অর্দ্ধালোকে কক্ষে নিরজনে,
স্রোতে নিপতিত মহা মহীরুহ মত।
বিসর্জ্জি জলন্তানলে গোপা স্বর্ণলতা,
সদ্যোমুকুলিত এই কুসুম-কোরক
ত্যজিবেন গৃহ!—হায়! পশুর অধিক
এই ঘোর নৃশংসতা! উচ্ছ্বাস-লহরী
ছুটিল বর্দ্ধিত বেগে, হইল শরীর
রোমাঞ্চিত, স্বেদসিক্ত, কাঁপিল হৃদয়!
ভ্রমিতে ভ্রমিতে ধীরে অধীর যুবক
আসিলেন কক্ষান্তরে—এ কি দৃশ্য হায়!
গভীরা রজনী; চারু কক্ষ আস্তরণে
সুষুপ্তা নর্ত্তকীগণ; স্তিমিত আলোক।
কেহ বা বিবস্ত্রা, কেহ বিচ্ছিন্না কবরী,
কেশজালে সমাচ্ছন্ন বিকৃত বদন।
কাহারো বিকট ভঙ্গী, ঘূর্ণিত নয়ন
ভীতিপূর্ণ, কেহ হাসি হাসিছে বিকট,
বকিছে প্রলাপ কেহ, কেহ কড় মড়
ঘর্ষিতেছে দন্তে দন্তে পড়িতেছে লালা
বদন হইতে কারো, শব্দ নাসিকার
কাহারো করিছে প্রাণে ভীতির সঞ্চার।
দেখি এ বীভৎস দৃশ্য সিদ্ধার্থের মনে
উপজিল মহা ঘৃণা। কহিলা কাতরে—
"হায়; কি ভীষণ দৃশ্য! যেই নারীরূপে
এইমাত্র ছিল এই কক্ষ আলোকিত,
মুহূর্ত্তে ঘটিল তার এই পরিণাম?
আনন্দের রঙ্গভূমি, উৎস উৎসবের

এইমাত্র ছিল, সেই কক্ষ মনোহর
মুহূর্ত্তে হইল এই ভীষণ শ্মশান ?
লোকে ইহাদের রূপ রতিতে মোহিত
রহিয়াছে চিরদিন ? ইহাই সংসার ?
হা ধিক্ ! মূর্খেরা হায় ! হয় অনুরক্ত
কর্দ্দম-পূরিত এই চারু চিত্রঘটে ;
হায় ! বরাহের মত হয় নিমজ্জিত
এ অশুচি-পঙ্কে ; মরে পতঙ্গের মত
আবর্জ্জনা প্রজ্বলিত এ অনলে পুড়ি।
কি ঘৃণ্য এ নরদেহ।" আবার তাহার
পড়িল নয়ন সুপ্তা রমণীমণ্ডলে,
এবার হইল মহা করুণা সঞ্চার
কুমারের হৃদয়েতে। কহিলা কাতরে—
"হায় ! ব্যাধজাল-বদ্ধ-কুরঙ্গিণীমত
ইন্দ্রিয়ের পাশে বদ্ধ অভাগিনীগণ ;
নিমজ্জিত মহামোহে, পঙ্কে নিমজ্জিত
বন-করিণীর মত। বাসনা-অনলে
হইতেছে ভস্মীভূত পতঙ্গিনী মত।
মহাসিন্ধু-গর্ভে ভগ্ন তরণীর মত
হইয়াছে মগ্নপ্রায় ; নাহি জানে হায় !
কৃষ্ণপক্ষ-শশি-সম জীবন যৌবন
হইতেছে ক্ষয় ; ভোগ-হলাহলে
আপনি মরিছে, পুড়ি, পুড়িছে জগৎ।
অসার শরীর সুখে হায় ! নিমজ্জিত
হইতেছে কি না পাপে ইহারা সকল।
কি ভীষণ পরিণাম হায় ! ইহাদের !

অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করি পূর্ব্বজ্ঞানিগণ
দেখাইতেছেন আত্ম-বলিদান-পথ;
কহিছেন—'শাক্যসিংহ! যাও সেই পথে,
কর মানবের এই দুঃখ বিমোচন।'
যাইব সে পথে আমি। কিন্তু বৃদ্ধ পিতা,—
অজ্ঞাতে ত্যজিলে পুরী হবে শেলাঘাত
তাঁহার করুণ-প্রাণে; পড়িয়া চরণে
যাইতে এ পথে আমি লইব বিদায়।"

—*—

(৯)

বিদায়।

অলক্ষিতে যুবরাজ কক্ষে জনকের
প্রবেশি নমিলা পদে। চকিত-নয়নে
দেখিলেন শুদ্ধোদন পুত্র গুণধর
দাঁড়াইয়া পদতলে পূর্ণচন্দ্র মত,
আলোকিয়া কক্ষ দেবরূপের প্রভায়।
"মহারাজ!—কহে পুত্র ধরিয়া চরণে—
"নাহি করিবেন খেদ, না দিবেন বাধা
দাসের কর্ত্তব্য-পথে। হে দেব! আপনি
ক্ষমিবেন পুরজন সহিত এ দাসে।
নিষ্ক্রমণকাল মম সমাগত এবে,
করুন এ আশীর্ব্বাদ যেন মনোরথ
হয় সিদ্ধ, হয় পূর্ণ তপস্যা আমার,
সিদ্ধার্থ—'সিদ্ধার্থ' নাম লভে ধরাতলে।"

পুত্রের প্রার্থনা পুত্রপ্রাণ নৃপতির
পশিল হৃদয়ে হায়! বজ্রের মতন।
পড়িতে নৃপতি অর্দ্ধ-মূর্চ্ছিত মায়ায়
ধরিলা কুমার; বৃদ্ধ সংবরি আঘাত
কহিলেন—"কহ বৎস! কোন্ প্রয়োজনে
ত্যজিবে সংসার? কহ কি অভাব তব?
রূপবতী, গুণবতী, লাবণ্য-প্রতিমা
গোপা বধূমাতা মম; নবজাত শিশু
নবোদিত শশধর; এই শাক্য-রাজ্য
বিস্তীর্ণ সুবর্ণ-প্রসূ, চারু লীলাভূমি
প্রকৃতির, বীরভূমি বীরের জননী।
অনুপম রূপ তব, নবীন যৌবন,
শিরীষ-কুসুম-সম দেহ সুকুমার।
পুষ্পাঘাতে যেই দেহ হয় প্রপীড়িত,
কঠোর সন্ন্যাস-ক্লেশ সহিবে কেমনে?
হা পুত্র জীবনাধিক! পাইয়া তোমায়
ভুলিয়াছি আমি তব জননীর শোক;
মুছিয়াছি রক্তধারা ক্ষত বজ্রাহত
সে বিদীর্ণ-হৃদয়ের, স্মৃতি জীবনের।
আশার আকাশে হায়! এ বৃদ্ধ বয়সে,
তুমি মাত্র ধ্রুবতারা, এই জীর্ণ-তরী
তোমাকে চাহিয়া মাত্র রয়েছে ভাসিয়া।
ডুবা'ও না তারে তুমি। এই জীর্ণ-গৃহ
করিও না ধরাশায়ী, একমাত্র বল,
এই আশ্রয়, তার করিয়া হরণ।"
হলো কণ্ঠরোধ শোকে; বহিতে লাগিল

দর দর অশ্রুধারা যুগল-নয়নে
বৃদ্ধ নৃপতির, নেত্রে সন্তপ্ত যুবার।
প্রথম শোকের বেগ করি সংবরণ
কহিলেন নরপতি—"কহ বৎস! কহ
কি দুঃখ তোমার, কেন ছাড়িবে সংসার?
সিদ্ধার্থ! কি চাহ তুমি? যাহা চাহ তুমি
দিব আমি। হায়! এই রাজকুল প্রতি,
এই বৃদ্ধ পিতা প্রতি, প্রজাবতী প্রতি
কর দয়া, ত্যজিও না অকালে সংসার,
ভাসা'ও না শাক্যরাজ্য অকূল সাগরে।"
কিছুক্ষণ অধোমুখে থাকিয়া নীরবে
কহিলেন রাজপুত্র—"চারি বর তবে
দেও দাসে দয়া করি; দিলে চারি বর
থাকিব সংসারে, গৃহ ছাড়িব না আর।
জরায় যৌবন-ফুল যেন না শুকায়; (১)
ব্যাধি যেন কভু নাহি পরশে আমায়; (২)
মৃত্যু যেন নাহি আসে নিকটে আমার; (৩)
পাই সে সম্পদ যাহা অক্ষয় অপার।" (৪)
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি নৃপতি বিষাদে
কহিলেন—"পুত্র! যাহা হইবার নহে,
পাইবার নহে যাহা চাহিতেছ তুমি।
কল্প কল্পান্তর করি তপস্যা কঠোর
না পায় যোগীরা যাহা, পাইব কোথায়?"
কহিলা সিদ্ধার্থ—"তবে দেও মহারাজ!
অন্য এক বর,—আমি ত্যজিলে সংসার
হবে না কাতর তুমি; সংসারে আধার

নাহি হয় যেন পিতঃ। প্রবৃত্তি আমার।"
এত দিনে নৃপতির পড়িল খসিয়া
নয়নের আবরণ! দিব্য চক্ষে আজি
দেখিলেন পুত্ররূপী নর-নারায়ণ।
বুঝিলেন যেই শশী জুড়াতে ধরায়
হতেছে উদিত আজি সাধ্য কিবা তাঁর
রোধিতে তাহার গতি! ক্ষুদ্র শুদ্ধোদন,
ক্ষুদ্র শাক্যরাজ্য হায়। তুলনায় তার,
সিদ্ধার্থ চাহিছে যেই রাজ্য পুণ্যময়।
মানবের মুক্তিপথে কেন শুদ্ধোদন
হইবেন এ কণ্টক এ বৃদ্ধ বয়সে?
কাতর নৃপতি তবে বিদীর্ণ-হৃদয়ে,
ছিন্ন করি মায়াপাশ, বাষ্পরুদ্ধ-স্বরে
কহিলেন—"হিতকর। মোক্ষ জগতের
ইচ্ছা তব; হও তুমি পূর্ণমনোরথ!"
প্রণমিলা পিতৃপদে পুত্র ভক্তিভরে।
সুপবিত্র পদতীর্থে পুত্রের মস্তক
প্রণত; পাদপদ্মে করপদ্মদ্বয়
কুমারের; করপদ্ম পুত্রের মস্তকে
জনকের; কুমারের চক্ষু ছল ছল,
জনকের অশ্রুধারা বহিছে ধারায়
বাতায়ন-পথে চাহি আকাশের পানে
বিভাসিত চন্দ্রকরে শান্ত-সুশীতল।
কি চিত্র মহিমাময়। ভূতলে ত্রিদিব!
কি মুহূর্ত!—কিবা যোগ—কি প্রেম মহান্!
কি মুহূর্ত! কি বিয়োগ! আত্ম-বলিদান!

এ মুহূর্ত্ত, এই যোগ, এ বিয়োগ আর,—
মানবের কি অনন্ত আশা-পারাবার।
চলিলা সিদ্ধার্থ-পুত্র, পড়িলা শয্যায়
সিদ্ধার্থ-জনক বৃদ্ধ বজ্রাহত প্রায়।

---

(১০)

মহানিষ্ক্রমণ।

অতীত নিশার্দ্ধ; মহা উৎসবের শেষে
নিদ্রা যাইতেছে পুরী; নিবিতেছে ধীরে
চারিদিকে দীপমালা; যাইছে ভাসিয়া
বসন্তের নীলাকাশে ফুল্ল তারাদল
বসন্তের, বহিতেছে বসন্ত-অনিল।
কি গম্ভীর শান্তিময় মূর্ত্তি প্রকৃতির
ভাসিতেছে চারিদিকে নিস্পন্দ নীরব।
পিতার চরণে পুত্র হইয়া বিদায়
চলিলা আপন পুরে, দেখিতে দেখিতে
সেই শান্ত নীলাকাশে লেখা নিয়তির;
সেই নীলাকাশ মত হৃদয়-আকাশ
শান্ত, নিরমল, স্থির, জ্যোৎস্নাপ্লাবিত।
দাঁড়ায়ে অলিন্দে স্থির, দেব-অবয়ব
রাখি বাতায়ন-বক্ষে, রহিলা চাহিয়া
সেই নীলাকাশ বক্ষে শান্তি অনন্তের
কিছুক্ষণ। দেখিলেন, বসি দেবগণ

নীলাকাশে নতকায় পূজিছে তাঁহায়
প্রীতিপুষ্পে ; মেলি শত তারকা-নয়ন
অপেক্ষিছে প্রীতিভরে তাঁর নিষ্ক্রমণ।
পুষ্যা নক্ষত্রের সহ মিশি সুধাকর
করিয়াছে মহাযোগ পুণ্যপ্রীতিময়
গাইছে অনন্ত বিশ্ব প্রীতির সঙ্গীত,
কহিতেছে এককণ্ঠে— "এই ত সময় !"
সুষুপ্ত ছন্দক ভৃত্যে করি জাগরিত,
কহিলা—"ছন্দক। যাও আন ত্বরা করি
সজ্জিত করিয়া অশ্ব 'কণ্টক' আমার।
আগত সময় মম, সিদ্ধ মনোরথ !"
স্বপ্নে যেন বজ্রাঘাত হইল মস্তকে,
বিস্ময়ে ছন্দক কহে—"কহ, যুবরাজ :
কোথায় যাইবে এই নিশীথ সময়ে !"
"ছন্দক !"—সিদ্ধার্থ ধীরে কহিলা গম্ভীরে—
"আজন্ম আমার প্রাণ যেই পিপাসায়
কাতর, জুড়াতে সেই পিপাসা আমার,
জুড়াইতে মানবের, জুড়াতে আমার
জরা-মরণের দুঃখ, করিতে সাধন
জগতের শিব শান্তি, করিতে পূরণ
জীবনের স্বপ্ন, আজি ত্যজিব ভবন !"
এই বার স্বপ্নে নহে, পড়িল জাগ্রতে,
ছন্দকের শিরে বজ্র, কহিল কাতরে—
"হেন নিদারুণ কথা আনিও না মুখে
যুবরাজ ! এই দেহ মৃণাল-কোমল,
এই স্বর্ণকান্তি রূপ মদনমোহন,

এ কি যোগ্য তপস্যার? শিরীষকুসুম
সহিবে কি দাবানল? কর পরিত্যাগ
এই দুরাকাঙ্ক্ষা হায়, আশ্রিত আমরা,
কর রক্ষা আমাদেরে দয়াবান তুমি!”
“ছন্দক!”—সিদ্ধার্থ খেদে করিলা উত্তর—
“কে সাধে এমন পত্নী প্রেম-নির্ঝরিণী,
সদ্যোজাত প্রাণপুত্র, পিতা স্নেহময়,
মাতা প্রজাবতী মাতৃপ্রেম ভাগীরথী,
পারে ত্যজিবারে? সাধে পারে ত্যজিবারে
ত্রিদিবপ্রতিম রাজ্য, প্রজা পুত্রোপম?
কিন্তু পত্নী, পুত্র, পিতা, মাতা, প্রজাগণ,
অনন্ত মানব জাতি, জন্ম জন্মান্তরে
সবে জরা-মরণের দুঃখ ঘোরতর
কেমনে সহিবে বল? নাহি অন্বেষিয়া
নরের উদ্ধার-পথ, পুড়িব স্বজন,
জ্বালি বিলাসের বহ্নি—এ ত নহে প্রেম?
প্রেম শিব, প্রেম শান্তি, প্রেম নিবারণ।
না,—ছন্দক! ত্যজি গৃহ যাব তপস্যায়!”
ছন্দক কহিল—“প্রভু! এক নিবেদন,—
মানব তপস্যা করে জন্ম জন্মান্তরে
যে সুখ সম্পত্তি তরে, পেয়েছ সকল
বিনা তপস্যায় তুমি। এ রাজ্য সুন্দর
লোকপূর্ণ, রত্নপূর্ণ; পুর মনোহর;
ফলে পুষ্পে সুশোভিত, বিহগ-কূজিত,
জলজ-কুসুম-পূর্ণ-সরসী ভূষিত
প্রমোদ-উদ্যান তব; কৈলাস প্রতিম

অট্টালিকা মনোহর ; চারু অন্তঃপুর
রতন-কিঙ্কিণী জালে তরঙ্গে শোভিত,
সঙ্গীতে সুন্দরীবৃন্দে,—বিলাসে পূরিত।
রাজপুত্র—রাজা তুমি, প্রথম যৌবন,
তরুণ কোমল দেহ, শশাঙ্ক বদনে
শোভিছে ভ্রমর-কৃষ্ণ কুঞ্চিত কুন্তল।
এখনও অপূর্ণ ভোগ-কামনা তোমার ;
অমর-পতির মত এ অমরাবতী
কর ভোগ, কর ভোগ-কামনা পূরণ।
মধ্য অঙ্কে অভিনয় করিও না শেষ
এইরূপে, রঙ্গভূমি করিয়া শ্মশান।
যৌবনান্তে, সম্ভোগান্তে করিও সন্ন্যাস
নিষ্কণ্টকে, কেহ নাহি করিবে বারণ।
হও ক্ষান্ত এইক্ষণ, রক্ষ পৌরজন।"
"ছন্দক, ছন্দক !"—যুবা কহিলা উচ্ছ্বাসে—
"অসার সম্ভোগ-সুখ অনিত্য অধ্রুব ;
চঞ্চল চঞ্চলা মত, রিক্তমুষ্টি সম
অসার, অস্থায়ী জল-বুদ্‌বুদের মত,
দুর্ভোগ্য স্বপনসম; দুস্পৃশ্য সফণ
সর্প-মস্তকের মত পূর্ণ মহাবিষে।
কে বল কখন কাম্য বস্তু উপভোগে
—কামিনী, কাঞ্চনে, রাজ্যে—তৃপ্তি কামনার
পাইয়াছে এ জগতে ? হায় ! এ সম্ভোগ,
মৃগ-তৃষ্ণিকার মত বাড়ায় পিপাসা,
অতৃপ্ত-কামনানলে দহে নিরবধি।
কোন কাম্যবস্তু নাহি করিয়াছি ভোগ—

সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য। কোন্ ভোগ-পুষ্পে
প্রমত্ত মধুপ মত করিনি চয়ন
ইন্দ্রিয়ের সুখমধু! কই তৃপ্তি কোথা?
মত্ত তিমিরের মত সম্ভোগ-সাগরে
কি ক্রীড়া না করিলাম হায়! এত দিন?
কই তৃপ্তি কোথা? ভোগ-পুষ্পে পুষ্পে
মত্ত মধুকরমত ঘুরিয়া ঘুরিয়া
অতৃপ্ত কামনানলে মরিতে পুড়িয়া
আসিনু কি ধরাতলে? মানব-জীবনে
নাহি শান্তি? নাহি সুখ? মানব-জীবন
কেবল কি মরীচিকা ভোগ-কামনার?
না, ছন্দক!—আছে শান্তি, আছে নিত্য সুখ,
ভোগ-দাবানল হতে হইতে উদ্ধার,
জন্ম-জরা-মরণের দুঃখ-পারাবার
হইতে উত্তীর্ণ হায়। আছে মুক্তি-পথ
খুঁজিব সে মুক্তি-পথ, খুঁজিব নির্ব্বাণ
এই দাবাগ্নির; ধরা করিব শীতল।
আন অশ্ব! হও তুমি সহায় আমার!
উড়িবে যে পাখী ওই অনন্ত আকাশে,
সোণার পিঞ্জরে তোর, সোণার শৃঙ্খলে
মিটিবে কি সাধ? দ্বার কর অনর্গল,
অনন্ত আকাশে আমি যাইব উড়িয়া!"
ছন্দক কাঁদিয়া কহে—"হায়। দেব! তবে
নিশ্চয় কি, এ সংসার শোকে ডুবাইয়া
যাইবে ছাড়িয়া তুমি?" "নিশ্চয় ছন্দক!"—
উত্তরিল দৃঢ়কণ্ঠে কুমার—"নিশ্চয়।

সুমেরুর মত দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আমার।
মস্তক উপরে বজ্র, তপ্ত লৌহ পথে
প্রজ্বলিত শৈলশৃঙ্গ হয় নিপাতিত,
তথাপি প্রতিজ্ঞা নাহি করিব লঙ্ঘন;
শত পত্নী, শত পুত্র, শত মাতা পিতা,
দাঁড়ায় সম্মুখে যদি, শত মায়া-বলে
করে অবরুদ্ধ পথ ছন্দক! প্লাবিত
করে নয়নের জলে, পূর্ণ হাহাকারে,
তথাপি প্রতিজ্ঞা মম পালিব নিশ্চয়।"
আর না, আনিতে অশ্ব চলিল ছন্দক।
পশিলা সিদ্ধার্থ গৃহে জনমের মত
দেখিতে গোপার, নব প্রসূনের, মুখ।
সূতিকা-আগারে ধীরে করিয়া প্রবেশ
দেখিলা জ্বলিছে মৃদু মন্দ দীপাবলী
মৃদু আলোকিয়া কক্ষ! কুসুম-শয্যায়
আলুলায়িত কুন্তলা, স্খলিত-বসনা,
নিদ্রা যাইতেছে গোপা, বক্ষে সদ্য শিশু,
—সোণার প্রতিমা বক্ষে সোণার কুসুম—
লইয়া আদরে যেন;—জিনি দীপদাম
করিয়াছে আলোকিত গৃহ দুই জন।
এ বার সিদ্ধার্থ-বক্ষ কাঁপিল না আর,
কেবল দুইটি বিন্দু অশ্রু দুনয়নে
আসিল, ভাসিল, ধীরে,—মায়ার চরণে
সিদ্ধার্থের সুশীতল শেষ উপহার।
দাঁড়াইয়া দ্বারে, শির রাখিয়া প্রাচীরে
অবসন্ন, দেহ স্থির, অবরুদ্ধ শ্বাস;

চাহিয়া চাহিয়া পত্নী পুত্র-মুখ পানে
হইলেন ধ্যান মগ্ন। শুনিলেন কর্ণে
জরা-ব্যাধি-ব্যথিতের ঘোর হাহাকার!
ঘোর দুঃখপূর্ণ ধরা,—কত নর নারী,
কত গোপা, কত শিশু, ব্যাপি ভবিষ্যত
পুড়িতেছে দুঃখানলে, দেখিলা নয়নে।
হ'ল মায়া অন্তর্হিত, অশ্রু নয়নের
শুকাইল দুনয়নে! যুবা আত্মহারা
আসিলেন গৃহ-দ্বারে যথায় ছন্দক
সজ্জিত 'কণ্টক' সহ, চিত্রিত উভয়
ছিল দাঁড়াইয়া শোকে নীরব নিশ্চল।
"কণ্টক! কণ্টক!"—অশ্বে ডাকিয়া আদরে,
উঠিলেন এক লম্ফে সিদ্ধার্থ আকুল,—
শ্বেত মেঘ-পৃষ্ঠে যেন শোভিল শশাঙ্ক
শরতের নিরমল! গ্রীবা বাঁকাইয়া
সুজাত-সুশুভ্র অশ্ব বেগে বায়ুগামী
প্রভুর আদরে গর্ব্বে নাচিয়া নাচিয়া
চলিল কোমল পদে ইঙ্গিতে নীরবে।

---

(১১)

নবীন সন্ন্যাসী।

গভীর নিশীথ এবে মহা প্রস্থাপনে
নিমজ্জিতা মহাপুরী! মহা উৎসবের

অবসাদে নিদ্রাগত পুরবাসিগণ
নিদ্রাগত দৌবারিক দুয়ারে দুয়ারে।
ভাবে নাই স্বপনেও উৎসব নিশীথে
নির্ম্মম হৃদয়ে সদ্যঃপ্রসূত প্রসূতি
হায় রে! যাইবে ছাড়ি এরূপে কুমার।
এই মহাপুরে বৃদ্ধ নৃপতি কেবল
জাগিতেছে শোকে অর্দ্ধ-জাগ্রত-মূর্চ্ছিত,
ভাসিতেছে অনিবার নয়নের জলে।
কোমল চরণক্ষেপে নীরবে গম্ভীরে
চলিয়াছে ধীরে অশ্ব, চলিয়াছে ধীরে
ছন্দক পশ্চাতে শোকে গম্ভীর নীরব,
বহিতেছে অশ্রুধারা বক্ষে দর দর।
পূর্ণচন্দ্র-প্রভ অশ্বে, পূর্ণচন্দ্র শত
জিনি' রূপে অশ্বারোহী বসিয়া নীরবে—
নাহি খেদ, নাহি দৈন্য, নাহি শঙ্কা ভয়,
নাহি মায়া মমতার রেখা মাত্র মুখে।
প্রফুল্ল প্রসন্ন মুখ, হৃদয়-গগন
নৈশ গগনের মত শান্ত সমুজ্জ্বল।
দেখিল ছন্দক যেন অগ্রে কুমারের
চলিয়াছে দেবগণ পুষ্প বরষিয়া,
বাজাইয়া দেববাদ্য, আনন্দ সঙ্গীতে
পরিপূর্ণ করি নৈশ ভূতল গগন।
শুনিল ছন্দক যেন পশ্চাতে কাতরে
মূর্ত্তিমতী শাক্যলক্ষ্মী বিমুক্ত-কবরী
কাঁদিছে বিবশা শোকে, কাঁদিতেছে পুরী।
অতিক্রমি পুরী রাজপুত্র মুহূর্ত্তেক

দেখিলেন রাজপুরী। নীরবে গগনে
উঠিতেছে শশধর, রজত-সলিলে
প্লাবিত করিয়া ধরা, শাক্য-রাজপুরী।
"যুবরাজ! যুবরাজ!" বাষ্পরুদ্ধ স্বরে
কাঁদিয়া ছন্দক উচ্চে কহিল কাতরে—
"শৈশবের মাতৃকোল, খেলার প্রাঙ্গণ
কৈশোরের, যৌবনের চারু রঙ্গভূমি,
বৃদ্ধ পিতা, বৃদ্ধ মাতা, প্রেমের প্রতিমা
গোপা শাক্যকুলশোভা, সদ্যোজাত শিশু,
ভাসাইয়া ডুবাইয়া, শোকের সাগরে
কোথায় চলিলে হায়! দেখ রাজপুরী
নিরমল জ্যোৎস্নার শ্বেত শুভ্র বাসে
কাঁদিতেছে হায়! নব বিধবার মত।"
কুমার প্রফুল্লমুখে কহিলা—"ছন্দক
এ কি ভ্রম তব! দেখ দেবদেবীগণ
বরষি ত্রিদিব-পুষ্প অমল ধবল,
পুষ্পাবৃত, পবিত্রিত, করিয়াছে পুরী।
মানব মঙ্গল গীত গাইছেন সবে
আনন্দে আকাশে বসি; পূজিছেন সবে
বসাইয়া পদ্মাসনে বৃদ্ধ পিতা মাতা,
প্রজাবতী, গোপা, নব-প্রসূত নন্দন।"
আবার আনন্দে অশ্ব চলিল নাচিয়া
নবোদিত চন্দ্রালোকে। চলিতে চলিতে
অতিক্রমি রাজ্যসীমা, অতিক্রমি ক্রমে
ক্রোড্যদেশ, মল্লদেশ, রজনী প্রভাতে
প্রবেশিল বেণুবনে অনামার তীরে।

(১২)

যৌবনে যোগিনী।

ধীরে মহানিশি হতেছে প্রভাত
কপিল নগরে ধীরে,
প্রস্থাপন ছায়া যাইছে সরিয়া,—
ভাসি গোপা অশ্রুনীরে
কি করুণ কণ্ঠে উঠিল কাঁদিয়া—
"কোথা যাও প্রাণনাথ!"
সহচরিগণ উঠিল জাগিয়া,—
একি কণ্ঠ অকস্মাৎ।
আবার আবার কাঁদিতেছে গোপা—
"কোথা যাও প্রাণনাথ!"
সখীদের প্রাণ উঠিল কাঁপিয়া,—
কক্ষে যেন বজ্রাঘাত।
ছুটিল গোপার শয়নের কক্ষে—
শাক্য-বধূ নিদ্রাগতা,
হৃদয়েতে শিশু, শোভিতেছে যেন
পুষ্পিতা সুবর্ণলতা।
নয়নের জলে ভাসে মুখ বুক,
বুকের শিশুটি আ'র,
বরিষার জলে ভাসিছে যূথিকা
সকোরক সুকুমার।
যত ডাকে সখী, তত কাঁদে গোপা—
"কোথা যাও প্রাণনাথ!"

ততই চাপিয়া শিশুটি হৃদয়ে,
করে গোপা অশ্রুপাত।
কি শোক-স্বপন ! জাগাইল সখী
মুখে বুকে দিয়া হাত।
নয়ন মেলিয়া কহে গোপা কাঁদি—
"প্রাণনাথ ? প্রাণনাথ !"
"কোথায় কুমার ?"—জিজ্ঞাসে সখীরা,
গোপা কহে—"প্রাণনাথ !"
"কোথায় কুমার ?"—মহাকোলাহল,
হ'ল শিরে বজ্রাঘাত।
"কোথায় কুমার ?"—মহাকোলাহল
উঠিল শয়ন ঘরে,
"কোথায় কুমার ?"—মহাকোলাহল
উঠিল কপিলপুরে।
"কোথায় কুমার ?"—উষার কাকলী
তুলিল নিষাদধ্বনি ;
"কোথায় কুমার ?"—প্রভাত-সমীর
জিজ্ঞাসিছে স্বনি' স্বনি'।
"কোথায় কুমার ?"—জননী গৌতমী
ভূতলে মূর্চ্ছিতা পড়ি ;
"কোথায় কুমার ?"—ছুটে পদাতিক,
অশ্বারোহী অশ্বে চড়ি।
খোঁজে ঘরে ঘরে, নগরে নগরে;
খোঁজে বন উপবন,
শেখরে, গহ্বরে, প্রাচীরে প্রান্তরে,—
নিশান্তে এ কি স্বপন !

"কোথায় কুমার ?"—চিহ্ন নাহি তার,
গেল দিবারাত্রি চলি ;
বিষাদের দিবা, রাত্রি বিষাদের,
কিছু ত গেল না বলি।
"কোথায় কুমার ?"—আসিল ছন্দক,
উঠিল কি হাহাকার।
"কুমার সন্ন্যাসী"—অশ্রু-স্রোতে বহি
ছুটিল এ সমাচার।
সপ্ত দিবানিশি শাক্য-রাজ্যে কেহ
ছুঁইল না অন্ন জল,
সপ্ত দিবানিশি প্লাবি শাক্যরাজ্য
হাহাকার অশ্রু-জল।
সপ্ত দিবানিশি মাতা প্রজাবতী
মূর্চ্ছিতা ধরাশায়িতা ;
সপ্ত দিবানিশ গোপা অভাগিনী
মূর্চ্ছিতা ধূলি-লুণ্ঠিতা।
সপ্ত দিবানিশি বৃদ্ধ নরপতি
নীরব নিশ্চল স্থির ;
নিদ্রিত জাগ্রত কেহ নাহি জানে,
নেত্রে নাহি বিন্দু নীর।
উন্মাদিনী মত বিবশা মহিষী
আসি কহে —"হায়, নাথ !
"সিদ্ধার্থ এরূপে আমাদের বুকে
করিল কি বজ্রাঘাত !
"দিদি মায়াদেবী বড় ভাগ্যবতী,
"গিয়াছেন আগে চ'লে ;

আমি পাপীয়সী রহিলাম হায়!
"পুড়িতে এ বজ্রানলে।
"বৃদ্ধ দুই জনে ফেলি এইরূপে
"পুত্র যদি গেল চলি,
"যাইব আমরা পশ্চাতে তাহার
"সংসার চরণে দলি।
"যে পথে সে গেছে যাব সেই পথে,
"রব সে যেখানে রবে;
"ছায়ার মতন রব সঙ্গে তার,
"পরাণ শীতল হবে।"
বাষ্পাকুল-কণ্ঠে বিষাদ গম্ভীর
কহে নরপতি খেদে—
"হায়! রাণি, নর-নির্ব্বন্ধের স্রোত
"কে পারে রাখিতে বেঁধে?
"বাঁধিতে সে স্রোত কি দৃঢ় বন্ধন
"না বাঁধিনু দুই জন!—
"এই শাক্য রাজ্য, প্রমোদ প্রাসাদ,
"গোপা নারীরত্নোত্তম!
"সংসার বন্ধনে দৃঢ়তম যাহা—
"অপত্য স্নেহের হার,
"তাতে ও ত শেষে বাঁধিনু মাহষি!
"বাকি কি আছিল আর?
"এ বন্ধনরাশি, সমষ্টি তৃণের,
"নিল উড়াইয়া বলে
নির্ব্বন্ধের স্রোত; গিয়াছে ভাসিয়া
"সিদ্ধার্থ সে স্রোতোজলে।

"যে দিন শুনিনু মায়াদেবী মুখে
"অপূর্ব্ব গর্ভ-স্বপন,
"জানিনু সে দিন সিদ্ধার্থ আমার
"নহে পুত্র কদাচন।
"যে দিন দেখিনু দেহে কুমারের
"অপূর্ব্ব দেব লক্ষণ,
জানিনু সে দিন সিদ্ধার্থ আমার
"নহে পুত্র কদাচন।
"যে দিন শুনিনু বৃদ্ধ ঋষি মুখে
"পুত্রের ভাবী জীবন,
"বুঝিনু সে দিন সিদ্ধার্থ আমার
"নহে পুত্র কদাচন।
"যে দিন দেখিনু শিশু বৃক্ষমূলে
"মহাধ্যানে অচেতন,
"বুঝিনু সে দিন সিদ্ধার্থ আমার
"নহে পুত্র কদাচন।
"যে দিন শুনিনু সিদ্ধার্থ ফিরিল
"দেখি জরা, ব্যাধি, শব,
"সে দিন বুঝিনু সিদ্ধার্থ নিশ্চয়
"মম পুত্র অসম্ভব।
"বুঝি নারায়ণ পতিতপাবন
"আমি পতিতের ঘরে
"জনমিলা পুনঃ এই নররূপে;
"নরের উদ্ধার তরে।
"মায়াদেবী বুঝি দৈবকী তাহার,
"যশোদা জননী তুমি,

"কপিলনগর হইবে এবার
"নব বৃন্দাবন-ভূমি।
"জীব-দুঃখে, দেবি! লইল মস্তকে
"যে পুত্র এ দুঃখ ভার,
"বৃদ্ধ পিতা মাতা ভাসাইতে দুঃখে
"কাঁদিল না প্রাণ তার?
"কাঁদে যার প্রাণ দেখিলে কীটের (ও)
"বিন্দু মাত্র রক্তপাত;
"পিতা, মাতা, পত্নী, সদ্য-শিশু শিরে
"সে কি করে বজ্রাঘাত?
"না না, কুমারের অচিন্ত্য নিয়তি
"নিয়াছে অচিন্ত্য পথে
"নিস্ফল এ শোক, গিয়াছে কুমার
"নরের উদ্ধার-ব্রতে।
"কি সাধ্য আমরা হীন ক্ষুদ্র জীব
"যাব দেবপথে তার
"কি সাধ্য পতঙ্গ করিবে লঙ্ঘন
"হেন মহা পারাবার?
"কেবল ধর্ম্মেতে পতিত তাহাকে
"করিব, হইব আর।
"সন্ন্যাসীর প্রিয়ে! জান না কি নাহি
"পিতা মাতা পরিবার।"
"চল তবে নাথ!"—কহে কাঁদি মাতা—
"চল যাই কোন বনে।
"এ গৃহ-শ্মশানে থাকিব না আর
"পুড়ি এই হুতাশনে।

"নয়নের মণি হারায়েছি আমি,
"নয়নে না দেখি আর।
"শ্রবণের শক্তি গিয়াছে আমার
"শুনি শুধু হাহাকার!
"হাহাকার প্রাণে মরীচিকা মত
"উঠিতেছে অনিবার।
"প্রাণে নাহি প্রাণ হৃদয়ে হৃদয়
"আমাতে এ আমি আর।
"কেমনে বহিব জীবন বিহীন
"হায়! এই দেহভার?
"গৃহের আলোক, প্রাণের অ'লোক,
"নিবেছে হায়! আমার।"
কহে নরপতি ধীরে শোকাতুর—
"আছে বল কোন বন,
"গেলে যেই বনে এ দারুণ জ্বালা
"হবে রাণি! নির্ব্বাপণ।
"আপন নিয়তি পালিতে কুমার
"গিয়'ছে, আসিবে ফিরে।
"আমরাও চল পালি আমাদের
"নিয়তি আনতশিরে।
"পায় যদি পুত্র নরের উদ্ধার
"সাধন করিতে পথ,
"আসিবে অবশ্য করিতে উদ্ধার
"আমাদেরে, পালি ব্রত।
"সেই আশাপথ চাহিয়া চাহিয়া
"থাকি চল দুই জন।

"সিদ্ধার্থ আমার হইবে সিদ্ধার্থ,—
"পুত্র নর-নারায়ণ!
"যেই সিংহাসনে বসিবে কুমার.
"তুচ্ছ শাক্য-সিংহাসন,
"তার তুলনায়, তুচ্ছ ধরা-রাজ্য ;
"পুত্র নর-নারায়ণ!
"হায়! কি দেখিবে সেই পুণ্যাসন
"এই বৃদ্ধ দুই জন?
"সেই পণ্য রাজ্যে পিতা মাতা তোর
"পাবে স্থান ক্ষুদ্রতম?
"জন্ম, জরা, ব্যাধি, মরণ হইতে
"সিদ্ধার্থ! যদি নিষ্কৃতি
"লভে নর-নারী; তোর পিতা মাতা
"পাবে না কি তোর প্রীতি?
নৃপতির দর-দর বিগলিত
বহিল নয়ন-বারি;
রহিলা নীরবে চাহি শূন্যপানে।
করে অশ্রু অপসারি
কহিলা—"গৌতম! যাও ত্বরা করি
যথায় ধূলায় পড়ি
"সোণার প্রতিমা পুত্রবধূ গোপা
"যাইতেছে গড়াগড়ি!"
সপ্ত দিবানিশি, দিনে কত দিন!
নিশিতে কতই নিশি!—
শোকে অচেতনা দীনা হীনা গোপা
ধরায় অধীরা মিশি।

কেবল হৃদয়ে হৃদয়-প্রসূন,
রেখেছে চাপিয়া বলে,
পতির সে প্রিয় বসন ভূষণ
প্রক্ষালি নয়নজলে।
শোকের ঝটিকা বহিয়া বহিয়া
ডুবায়ে ভাসায়ে তরী,
কর্ণধার-হীনা—বিস্মৃতি-সাগরে,
এবে শান্ত বেগ ধরি
বহিতেছে; গোপা উঠি ধীরে ধীরে
রত্নময় বেদি' পরে
পতির প্রেরিত বসন মুকুট
স্থাপিলা ভকতি-ভরে।
খুলি আপনার বসন ভূষণ,
কাটিয়া অলক-দাম,
যৌবনে যোগিনী সাজিয়া করিলা
বেদি-পদমূলে দান।
কাটিতে কবরী কাঁদি উচ্চৈঃস্বরে
গৌতমী ধরিয়া করে
কহিলেন—"মা গো! দেখি এই রূপ
কেমনে রহিব ঘরে?
"পুত্র গেছে চলি, আছে পুত্রবধূ—
"তুইও যোগিনী হবি?
"বৃদ্ধ দুটি প্রাণ রাখিবে কেমনে
"দেখি এ বিষাদ-ছবি?
"তুই পুত্র এবে, পুত্রবধূ তুই,
"একই সান্ত্বনা-ছায়া

"থাক তুই বুকে, মা গো! বাঁচাইয়া
"প্রাণশূন্য দুই কায়া।"
শান্ত বিষাদের মূরতি গম্ভীরা
কহে গোপা ভগ্নস্বরে—
"থাকিবে মা! গোপা, রবে চিরদিন
"তোমাদের স্নেহাগারে।
"সহকার-ভ্রষ্ট, বল্লরীর মত
"রবে এই বেদি-মূলে,
"তোমাদের পদ পুণ্যছায়া তলে,
স্নেহ-গঙ্গা-উপকূলে!
"জীব দুঃখে মা গো! এরূপে কাতর
"কাঁদে যার পতিপ্রাণ;
"এই রাজ্য-সুখ ত্যজে যে করিতে
"জীব-দুঃখ-নিবারণ;—
"সে কি মা। মানব? মানবীর স্বামী?
সে যে মানবের গতি!
পিতা দেব-পিতা, তুমি দেব-মাতা,
গোপার মা দেব-পতি।
হেন দেব-পতি সন্ন্যাসী-ভিখারী,
সহধর্ম্মিণীর তাঁর
সেই ধর্ম্ম বিনা, সেই বেশ বিনা,
কি আছে বল মা আর?
বনে বনে কিবা কঠোর সন্ন্যাস
সাধিবেন মম স্বামী!
বিলাস-ভবনে এই বেদি-মূলে
সাধিব সন্ন্যাস আমি!

তিনি নারায়ণ, তাঁহার সন্ন্যাস
 উদ্ধার করিতে নরে ;
আমি ক্ষুদ্র নারী, আমার সন্ন্যাস
 তাঁহার চরণ তরে।
পূজি এই বেদি, পূজি তোমাদের
 চরণ ত্রিদিব মম,
সাধিব সন্ন্যাস ; আশীর্ব্বাদ কর
 হয় ব্রত উদ্‌যাপন।

---

(১৩)

প্রব্রজ্যা।

সিদ্ধার্থ একক,—ঊর্দ্ধে নীরব আকাশ
বসন্তের নিরোপম সুনীল বিস্তৃত ;
নিম্নে হিমালয়সুতা নির্ম্মল-সলিলা
'অনোমা' সুনীলা ধারা নীরবে বাহিতা।
নীরব আম্রকাননে অনোমার কূলে
সিদ্ধার্থ একক ;—দাসদাসী অনুচর
ছিল শত সংখ্যাতীত বেষ্টিয়া যাহারে,—
নক্ষত্রে বেষ্টিয়া শশী ; ছিল অট্টালিকা
সুখ-সম্ভোগে পূরিত ;—আজি সে একক !
রাজপুত্র, যুবা, দেহ শিরীষ-কুসুম
সুকুমার সুকোমল, অভাব-উত্তাপ

আজি সে একক এই বিপুল সংসারে,
অনন্ত আকাশতলে, আশ্রয়বিহীন ;
সুচিকুরে সুবাসিত সজ্জিত মস্তক
এবে কেশহীন ; রত্ন কারুকার্য্যময়
বসন ভূষণ চারু শোভিত যে দেহে,
এবে ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড কর্কশ মলিন।
হায়! রাজপুত্র এই ভিখারীর বেশে
কোথা যাবে, কোন্ পথে, যাইবে কেমনে ?
মানবের অন্নদাতা মাগিবে কেমনে
অন্ন-জল ; অন্নজল কে দিবে তাহারে ?
কিছুক্ষণ বসি যুবা আম্রবৃক্ষমূলে
অনোমার উপকূলে ঊষার আলোকে,
চাহিয়া প্রশান্ত মুখে নব বসন্তের
নব দিবসের চারু নয়ন-উন্মেষ,
ভাবিলেন ;—দেখিলেন অতীতের পটে
সুখের কৈশোর, ক্রীড়া নব যৌবনের,—
পূরব গগনে ক্রীড়া নব দিবসের ;
ঊষাস্বরূপিণী গোপা ; অঙ্কেতে তাহার
শিশুর সে সদ্য মুখ, ঊষার কুসুম
সদ্য সিক্ত নিরমল ; প্রভাত আকাশ
জনকের জননীর পবিত্র হৃদয়
স্নেহ-নীলামৃতে ভরা অনন্ত অসীম।
নয়ন হইল সিক্ত, হইল হৃদয়
সিক্ত উচ্ছ্বাসের শান্ত করুণ প্রবাহে।
ধীরে ধীরে অতীতের পট মনোহর
হইল অন্তর ; ধীরে হইল অন্তর

উষার মাধুরী শোভা, দেখিল যুবক
নবরবিকর-দীপ্ত আকাশের মত
অনিশ্চিত ভবিষ্যত অনন্ত বিস্তৃত,
পথহীন, ছায়াহীন, মরুভূমি মত ;—
এই মহা মরুভূমে সিদ্ধার্থ একক।
দেখিলা মরুর প্রান্তে সিদ্ধার্থ কেবল
চারু উপবন এক ; শীতল ছায়ায়
শান্ত সরোবর তীরে জরাব্যাধিহীন
অনন্ত মানব শান্তি লভিছে নির্মল।
ও কি মরীচিকা ? হায় ! অতিক্রমি মরু
কোন্ পথে, কত দিনে, যাইবে কেমনে
সিদ্ধার্থ সে উপবনে ? ছুটিল যুবক
চাহি উপবন পানে প্রফুল্ল বদনে
বেগে কারামুক্ত বন-বিহঙ্গের মত।
পূরবদক্ষিণ- মুখে নবীন সন্ন্যাসী
চলিলেন, নাহি জ্ঞান কোথায়, কেমনে।
পদে পদে পদতল রক্ত-শতদল
হইতেছে ক্ষত তৃণে, মৃত্তিকায় দৃঢ়,
নাহি জ্ঞান ; বহিতেছে স্বেদ দরদর।
পথে শাক্যী পদ্মা, ঋষি রৈবত-আশ্রমে
লইয়া আশ্রয় ক্রমে "বৈশালী" নগরে
হইলেন উপনীত নবীন সন্ন্যাসী।
আরাড়কালাম ঋষি শিষ্যগণে ডাকি
কহিলেন—"দেখ ! দেখ ! অপরূপ রূপ !
কি আকৃতি মনোহর মনোমুগ্ধকর !"
তিন শত শিষ্য সুখে বেষ্টি ঋষিবরে

করিতেছে অধ্যয়ন। প্রণমি চরণে
সিদ্ধার্থ শিষ্যত্ব তাঁর করিলা গ্রহণ।
সমগ্র দর্শন-শাস্ত্র করি সমাপন
দেখিলা সিদ্ধার্থ, জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি
নির্ব্বাণের পথ নাহি সাধ্য দর্শনের
করে প্রদর্শন। ছাড়ি বৈশালী সুন্দরী
অতিক্রমি ভাগীরথী নিরাশ-হৃদয়ে
পশিলেন "রাজ-গৃহে", পুরী মগধের।
সৌন্দর্য্যে, ঐশ্বর্য্যে শৌর্য্যে ভারতে অতুল
রাজগৃহ, সুসজ্জিত রাজগৃহ সম
মনোহর শোভাময়! দক্ষিণ সীমায়
নীলাকাশে তুলি নীল বপু শিলাময়
শোভে পঞ্চ শৈল, পঞ্চ-প্রহরী ভীষণ
বেষ্টি চক্রাকারে সেই গিরিব্রজপুর
জরাসন্ধ নৃপতির খ্যাত রাজধানী,—
দ্বাপরে ভারত-বক্ষ কৃষ্ণছায়া যার
করেছিল সমাচ্ছন্ন সবজ্র-জলদ।
শৈলসুতা সরস্বতী চারু নির্ঝরিণী,
বহি বহু নির্ঝরের সুধা সুশীতল,
বহিতেছে, তর তর শৈল, পাদ-মূলে
ভক্তি যথা দেবপাদমূলে প্রবাহিতা।
দেখিলেন শাক্যসিংহ রহিয়াছে পড়ি
ভগ্নশেষ রাজপুর, যথা ভস্মরাশি
শ্মশানে কঙ্কালসহ; রহিয়াছে পড়ি
সেই মহারঙ্গভূমি; মৃত্তিকা মসৃণ
সে মহাক্ষেত্রের; আর রহিয়াছে পড়ি

শৃঙ্গবাহী সে প্রাচীর, কারাগারে যার
অশাতি নৃপতি ছিল রুদ্ধ পরাক্রমে।
আরোহি পাণ্ডব শৈল দেখিলা কুমার,
খুলিয়া প্রকৃতি দেবী কি শোভা-ভাণ্ডার
রেখেছেন চারিদিকে ললিত ভৈরব!
ভীষণ গগনস্পর্শী শৈল-ছায়া-তলে
এক দিকে রাজগৃহ পুষ্পোদ্যান সম
শোভিতেছে নিরুপম;—ক্ষুদ্র পুষ্প বৃক্ষ,
বিশাল বিটপিচয়, বসন্তে পুষ্পিত,
সংখ্যাতীত রাজবর্ত্ম বঙ্কিম সরল
সুপ্রশস্ত ছায়ান্বিত, চারু ক্ষুদ্র পথ
উদ্যানের সুরঞ্জিত চারু হর্ম্ম্যাবলি
নানাবর্ণ অয়বে শোভিতেছে যেন
বিচিত্র কুসুমচয়, শোভিছে দীর্ঘিকা
উদ্যানের অঙ্কে অঙ্কে, শ্যাম মনোহর,
মরকত বিমণ্ডিত আরশীর মত।
চারি দিকে যত দূর যাইতেছে দেখা
শ্যাম সমতল ক্ষেত্র, চারু আচ্ছাদিত
বসন্তের নীলাকাশে মহা চক্রাকারে।
স্থানে স্থানে আম্রবন শোভিছে সুন্দর,
শোভিছে সুন্দর স্থানে স্থানে গ্রামাবলি,—
শ্যামল সাগরে শ্বেত শ্যাম দ্বীপপুঞ্জ
ক্ষুদ্র মনোহর। ফেণপুঞ্জ শ্যামার্ণবে
স্থানে স্থানে পালে পালে শোভিছে গোপাল।
বসন্তের নীলাকাশে ছায়াপথ মত
শোভিতেছে পুণ্যস্রোত নদ "পঞ্চানন"

অমিতাভ।

দক্ষিণে শ্যামল ক্ষেত্রে ঘুরিয়া ফিরিয়া,
লুকাইয়া, প্রকাশিয়া; উত্তরে দক্ষিণে
শোভিতেছে শৈলদ্বয়, উভয় একক
প্রাচীন কৃষ্ণাভ উচ্চ দেবালয় মত!
অস্তমিত দিনমণি; দেখিলা কুমার
নীরব, নির্জ্জন, স্থির, শান্ত প্রকৃতির
শ্যাম বক্ষে সন্ধ্যা ধীরে মাখিতেছে ছায়া
শান্তিময়ী সুগভীরা সুকোমল করে।
নীরব, নির্জ্জন, স্থির বিশ্বচরাচরে,
নীরব, নির্জ্জন, স্থির শৈলের শেখরে,
সিদ্ধার্থ একক সান্ধ্য গগনের তলে!
প্রকৃতির শান্তমূর্ত্তি করিল সঞ্চার
সিদ্ধার্থের হৃদয়েতে শান্তি সুশীতল,
হইলা সিদ্ধার্থ ধীরে ধ্যানে নিমজ্জিত।

কুমার প্রভাতে ধীরে ভিক্ষাপাত্র করে
নতশির, ছিন্নবাস, পশিলা নগরে।
কুজ্ঝটিকা-ঢাকা স্বর্ণগিরিশৃঙ্গ মত
সুদীর্ঘ, উন্নত, দেব-মহিমা-মণ্ডিত
নবীন সন্ন্যাসী মূর্ত্তি, বিস্তৃত নয়ন
কমল-কোরক নিভ, বিস্তৃত ললাট
প্রভাত-গগনসম শান্ত সমুজ্জ্বল,
বিস্তৃত উরস অংস, নাগরিকগণ
দেখিয়া হইল মুগ্ধ   গৃহকার্য্য গৃহী,
পথিক গন্তব্য স্থান, বণিক বিক্রয়,
মাতা স্তন্যপায়ী শিশু, শিশুগণ ক্রীড়া,
ছাড়িয়া রহিল চাহি চিত্রাপিত মত

উঠিল নগরে ক্রমে মহাকোলাহল ;
মহাসমারোহে পথ হইল পূর্ণিত ;
যোগীর চলিতে সাধ্য নাহি এক পদ !
উচ্চৈঃস্বরে নারীগণ আকুল কাঁদিয়া ;
কেহ কহে—"নাহি জানি জনক জননী
কেমন পাষাণ এর, এমন সুন্দর
সোণার পুতুল হায় ! করিল সন্ন্যাসী ।
কেহ কহে—"পিতা মাতা থাকিলে কি আর
এমন সন্তান পারে হইতে সন্ন্যাসী ?"
কেহ কহে—"না থাকুক জননী ইহার,
হইব জননী আমি, প্রাণান্তে আমার
সন্ন্যাস করিতে আর দিব না কখন ।"
"বাছা ! বাছা !" বলি কাঁদে কেহ গলা ধরি,
কেহ কাঁদি পদতলে যায় গড়াগড়ি ।
নরপতি বিম্বিসার প্রাসাদ-শেখরে
উঠি দেখিলেন,—নেত্র ফিরিল না আর ।
ভাবিলেন,—একি চন্দ্র ? ইন্দ্র দেবরাজ ?
কিংবা বিন্ধ্যাচলের এ অধিষ্ঠাত্রী দেব ?
কিংবা দেব বৈশ্বানর ? মানবে সম্ভব
নহে কদাচিত এই রূপ অপরূপ !
ভিক্ষান্তে পাণ্ডব শৈলে ফিরিলা সন্ন্যাসী
শুনি নরপতি, সেই অপরাহ্নে তথা
আসিলেন পারিষদ রাখিয়া পশ্চাতে !
দেখিলেন বিম্বিসার নবীন সন্ন্যাসী
বসিয়া স্বস্তিকাসনে গিরিগুহাদ্বারে
ধ্যানমগ্ন ; দেখিলেন শৈল-বেদিকায়

স্বর্ণ-দেবমূর্ত্তি যেন রয়েছে স্থাপিত।
কিছুক্ষণ পরে যোগী মেলিল নয়ন
প্রণমিলা শৈলস্থিত রাতুল চরণে—
রক্ত শতদল মূলে নীল সরোবরে
শরতের পূর্ণচন্দ্র পড়ি সমুজ্জ্বল।
কহিলেন বিম্বিসার—"যোগিবর! তব
নিরখি এ দেবরূপ, দুর্ল্লভ যৌবন,
মুগ্ধ এ মগধ, মুগ্ধ মগধ-ঈশ্বর।
সোণার যৌবনে তব দেখিয়া সন্ন্যাস,
প্রথম বসন্তে ঘোর শিশির সঞ্চার।
নিদারুণ, হাহাকারে পূর্ণ মম পুরী,
আকুল হৃদয় মম! আইস যুবক
ত্যজিয়া নিষ্ঠুর এই অকাল সন্ন্যাস
কর রাজসুখ ভোগ এই রাজ্যে মম।"
উত্তরিল শাক্যসিংহ ধীরে"—মহারাজ!
হউন চিরায়ু, সুখে করুন পালন
এই রাজ্য চিরদিন অমরপ্রতিম।
নাহি চাহি রাজ্য, সুখ; নাহি শান্তি আমি;
হয়েছি সন্ন্যাসী আমি শান্তি কামনায়।"
সবিস্ময়ে বিম্বিসার কহিলা আবার—
"এ কি কথা! সুকুমার, অতি সুকোমল
পুষ্প নিভ এই দেহ সহিবে কেমনে
দারুণ সন্ন্যাস-দাহ? না, না, ত্যজি এই
কঠিন প্রস্তরাসন, জনশূন্য বন,
চল রাজপুরে মম। অশান্তি গৃহের
করে থাকে যদি শান্তি-প্রয়াসী তোমায়,

দিব শান্তি, বসি অর্দ্ধ সিংহাসনে, মম
কর কামভোগ, তব পূরাও বাসনা।"
সিদ্ধার্থ ঈষৎ হাসি কহিলা—"নৃপতি!
হউক কুশল তব! কামের প্রয়াসী
নহি আমি; কামভোগ যা ছিল আমার
আছে কার ধরাতলে? রাজ্য সুখভরা,
সুখভরা রাজপুরী, পিতা পুণ্যবান্,
পুণ্যবতী মাতা, প্রেম-পূর্ণ স্রোতস্বতী
নিরুপমা পত্নী, নবপ্রসূত কুমার,
কত সুখৈশ্বর্য্য আর নাহি পড়ে মনে।
কামভোগে সুখশান্তি থাকিলে নিশ্চয়
পাইতাম আমি, হায়! দিতাম কি ঝাঁপ
অকালে অকূল এই সন্ন্যাস-সাগরে।
নরনাথ! সুধা যদি ফলে গৃহশাখে,
কে যায় খুঁজিতে তাহা হন বনান্তরে?
নাহি কামে সুখ ভূপ! বৃক্ষফল মত
হয় কাম বৃন্তচ্যুত, অস্পৃশ্য, গলিত।
উড়াইয়া মানবের পরম মঙ্গল
ঝটিকার মত কাম যায় মিশাইয়া
করি দেহ জরাজীর্ণ, মৃত্যু-কবলিত।
হয় যদি বেগবান্, ঝটিকার মত
কার সাধ্য করে জয়? অনন্ত অসংখ্য
কাম, কে পারে কখন লভিতে সকল?
রহিল অলব্ধ যদি একটিও হায়!
দগ্ধ করে মনঃপ্রাণ; হয় লব্ধ যদি
কোথা তৃপ্তি? লবণাক্ত সলিলের মত

বাড়ায় পিপাসা কাম, করে প্রতারিত
মহামরুভূমে কাম মরীচিকামত।
প্রাচীন মগধপুরী দেখ ধ্বংসশেষ
পড়ি তব পদতলে,— অতৃপ্ত কামের
কি আদর্শ বিভীষণ গিরিব্রজপুর
জরাসন্ধ নৃপতির! এই স্বর্ণপ্রসূ
বিস্তৃত মগধ রাজ্যে রাজ্যের কামনা
পূরিল না; অষ্টোত্তরশত নরপতি
দিয়া বলিদান যজ্ঞে করিবে প্রচার
সাম্রাজ্য, ছুটিল বেগে অতৃপ্ত কামনা
মহাস্রোতস্বতী মত গ্রাসিতে ভারত।
পরিণাম তার ওই ক্ষুদ্র মল্লভূমি,
এই ধ্বংস রাজপুরী! কামী মানবের
করাল কালের স্রোতে সাক্ষী ও শিক্ষক।
কি ভীষণ! বসি শৃঙ্গে শুন নরনাথ!
কামভোগী নরনারী কিবা হাহাকার
করিতেছে জন্ম-জরা-ব্যাধির পীড়নে।
আছে কোন ধর্ম্মপথ দুঃখী জীবগণ
এই দুঃখার্ণব হ'তে করিতে উদ্ধার,
লভিতে উদ্ধার মম; খুজিব সে পথ।
ছাড়িয়াছি শাক্য-রাজ্য, শাক্যরাজপুরী
সুখ সম্ভোগের খনি, লভিতে সে বোধ;
সেই জ্ঞান মহাধর্ম্ম করিতে প্রচার।"
বিম্বিসার নৃপতির চক্ষু-আবরণ
পড়িল খসিয়া, জ্ঞান হইল উদয়।
করযোড়ে নরপতি কহিলা কাতরে—

"চাহে তুই ভিক্ষা দাস, লভিলে সে বোধ,
বুদ্ধদেব দেখা দিয়ে এই দাসে তব
করিবে উদ্ধার, আর রহি কিছু দিন
এই শৈলে চরিতার্থ করিবে এ দাসে।"
রহিলেন শাক্যসিংহ। কিছু দিন পরে
মহামারী উপদ্রব বৈশালী নগরে
উঠিল জ্বলিয়া, বনে দাবানল মত ;
হাহাকারে পরিপূর্ণ হইল নগর।
কালের সে ভীমক্রীড়া করিতে বারণ
কত মুনি, কত ঋষি, যাগ যজ্ঞ কত
করিলেন কত মতে, বারিবিন্দু নাহি
হইল পতিত সেই ভীমদাবানলে।
তখন বৈশালীবাসী করিল স্মরণ
নবীন সন্ন্যাসী সেই অপূর্ব্ব দর্শন,
লইল শরণ পদপঙ্কজে তাঁহার
করুণহৃদয় যোগী সুসজ্জিত পথে
পল্লবে কুসুমে, ঘটে, মঙ্গল-সঙ্গীতে,
অতিক্রমি ভাগীরথী পশিলে নগরে
হইল অচীরে শান্ত সেই মহাব্যাধি,
সলিল-প্রবাহে যেন ক্রীড়া অনলের—
মানবের শক্তি-সিন্ধু অনন্ত অতল!
ফিরিয়া পাণ্ডব শৈলে, শিষ্য সপ্তশতে
প্রতিষ্টিত রামপুত্র রুদ্রকের কাছে
লভিলেন শাক্যমুনি সমাধি যুগল।*

* নৈবসংজ্ঞান ও অসংজ্ঞায়তন।

কিন্তু দেখিলেন নহে নির্ব্বাণের পথ
এ সমাধি, চলিলেন পঞ্চ শিষ্য সহ
পুণ্যতীর্থ গয়াধামে খুঁজিতে সে পথ।

---

(১৪)

সাধনা।

মনোহর গয়াধাম পুণ্যতীর্থ ভারতের।
বক্ষে পুণ্য গয়শৈল করিয়া ধারণ
শোভিতেছে চারু গয়া, অচলা অহল্যামত
ধরি বক্ষে শ্রীরামের পবিত্র চরণ।
শোভে গয়া ফল্গুতীরে, অন্তর-সলিল নদ
প্রথম শরতে বক্ষ প্লাবিত পূর্ণিত;
অহল্যার ভক্তিস্রোত উছলি নয়নপথে
বহিছে পাষাণ-বক্ষ করিয়া দ্রবিত।
সুপবিত্র গয়শৈলে অধিষ্ঠিত শাক্যমুনি
উদয়-অচল-শিরে অংশুমালী মত,
নিরখিয়া শরতের শান্তিময়ী ফল্গু-শোভা
চিন্তিতে লাগিলা ধ্যানে নির্ব্বাণের পথ।
একদা ভাবিলা মনে—"ভুলেছি ইন্দ্রিয়-সুখ,
হয়েছি অতীত আমি কাম্য কামনার;
কিন্তু সে ইন্দ্রিয়গণ রহিয়াছে ভোগক্ষম,
ভোগক্ষম এ শরীর ইন্দ্রিয়-আধার।
কেমনে পাইব জ্ঞান? কেমনে পাইব অগ্নি
শুষ্ক কাষ্ঠে শুষ্ক কষ্ঠ না করি ঘর্ষণ?

শুষ্কদেহে শুষ্ক মন করি যদি সংঘর্ষণ,
তবে বুঝি জ্ঞান-অগ্নি পাব দরশন।
কঠোর তপস্যানলে পোড়াইব দেহ মন,
অনলে কাঞ্চন হয়ে নির্ম্মল তরল,
তপঃ-ক্লেশে ক্লিষ্ট মন পাবে শক্তি অলৌকিক,
সংঘর্ষণে হয় মণি পবিত্র উজ্জ্বল।”
একদিন চিন্তাকুল ভ্রমিতে ভ্রমিতে ধীরে
নীল নৈরঞ্জনা-তীরে শারদ উষার
আসিলেন রম্য-বনে, নিবিড় পাদপ শ্রেণী
আচ্ছাদিয়া বনভূমি ধ্যানমগ্ন প্রায়।
শরতে শ্যামল পত্রে শ্যামল লতিকাপুঞ্জে
সাজাইয়া স্থানে স্থানে কুঞ্জ মনোহর,
শরতের চারু পুষ্পে, পুষ্পের সৌরভে চারু,
শীতল শারদানীলে, কিবা প্রীতিকর!
উচ্চ শাখে নানা পাখী গাইছে প্রভাতি গান
করি স্বর-লহরীতে দিগন্ত-প্লাবিত,
কোথা পত্র আবরণে ঢাকি ক্ষুদ্র অবয়ব
গাইতেছে ক্ষুদ্র পাখী কি শান্তি-সঙ্গীত।
শরতের নব তৃণে সুশ্যামল তরুতল;
স্থানে স্থানে সুশ্যামল শোভে গুল্মবন,
নীরব নিশ্চল স্থির, বসি যেন যোগাসনে
গভীর সমাধি-মগ্ন বনযোগিগণ।
যত দূর যায় চক্ষু, শস্যক্ষেত্র নবশ্যাম,—
শ্যাম মরকতে ধরা যেন বিমণ্ডিত!
প্রান্তরের প্রান্তভাগে শোভিতেছে নানা গ্রাম,
শোভে গ্রাম তরুবিম্ব নদীক সজ্জিত।

শোভিতেছে বনভূমি স্বচ্ছ নৈরঞ্জনা-তীরে।
তীরদ্রুম লতাকুঞ্জ প্রতিবিম্বি নীরে
নীলাঞ্জনা নৈরঞ্জনা বহিতেছে তর তর,
শান্তির সঙ্গীত মৃদু গাহি ধীরে ধীরে।
প্রস্তর-সোপানশ্রেণী নামিয়াছে স্তরে স্তরে,
ঘনীভূত প্রীতিধারা যেন কাননের,
প্রীতি প্রবাহিণী বক্ষে; শোভে তীরে শোভে নীরে
সুশীতল যোগাসন নীল উপলের।
তটিনীর অন্য তীরে নীল আকাশের পটে
নীলতর শৈলশ্রেণী তরঙ্গ খেলিয়া;
বক্ষে বক্ষে যোগ কক্ষ, সানুতে সানুতে শৃঙ্গে
যেন মহাযোগাসান রেখেছে পাতিয়া।
কিবা বন শান্তিময়! প্রত্যেক বৃক্ষটি যেন,
পবিত্র উপলাসন, সোপান সুন্দর,
শৈলবক্ষ, শৈলসানু, সিদ্ধার্থে কহিছে ডাকি—
এই খানে ধ্যানমগ্ন হও যোগিবর!
এই শান্তিময় বনে, শান্তিময়ী নদীতীরে,
শান্তি-ছায়া-তরুতলে পাতি তৃণাসন,
হইলেন ধ্যানমগ্ন ছয় বৎসরের তরে,
কঠোর তপস্যা ব্রত করিতে সাধন।
কখন বদরি এক, কখন একটি তিল,
কখন তণ্ডুল এক করিয়া আহার,
ক্রমে ঘোর তপস্যায় হইলেন অনশন,
প্রাণের আশ্রয় কিছু রহিল না আর।
প্রবল ইচ্ছার বলে করিলেন নিগৃহীত
শরীর, ইন্দ্রিয়গ্রাম, যেন পুষ্পবন

কুসুমিত সুবাসিত, লাগিল দলিতে বলে
অমিত বিক্রমে গর্ব্বে প্রমত্ত বারণ।
শরীর ইন্দ্রিয়ক্রিয়া হইলে নিরুদ্ধ ক্রমে,
হেমন্ত তুষারস্রাবী নিশীথেও তাঁর
বক্ষ ও ললাট বাহি বহিতে লাগিল স্বেদ,
যেন তপ্ত গৈরিকের ধারা অনিবার।
সাধিয়া নিগ্রহ-যোগ, আস্ফালন ধ্যান-মগ্ন
হইলেন শাক্যসিংহ; মনোবৃত্তি বল
কুম্ভকে করিয়া লয় রহিলেন অচৈতন্য,
সুবর্ণ মূরতি মত নিস্পন্দ নিশ্চল।
পূর্ণ অবরুদ্ধ শ্বাস, রুদ্ধ মুখ কর্ণ পথ,
কুম্ভবৎ বায়ুপূর্ণ হইয়া শরীর,
কুম্ভিত বাতাস বেগে আঘাতি কপাল শির
করিল চৈতন্য লয়, প্রাণযন্ত্র স্থির।
এ সময় এক দিন দেখিলেন শাক্যসিংহ
দিব্যরূপা নারী এক বর্ষি অশ্রুজল
কহিছে—"হা পুত্র তব ফলিল না আশা-লতা,
"অসিত ঋষির বাক্য হইল নিষ্ফল!
"না তুমি হইলে বুদ্ধ, না করিলে রাজ্যভোগ,
"করিলে জীবন ক্ষয় অকরুণমনে;
"শোকে বিদরিছে বুক, বনের কুসুম মত
"বনে জন্মি পুত্র! তুমি শুকাইলে বনে!"
জিজ্ঞাসিলা শাক্যসিংহ—"রমণী? কে তুমি কহ
"কাতরা বিবশা শোকে, সিক্ত দুনয়ন,
"কবরী আলুলায়িত, দেহ ধূলা-বিলুণ্ঠিত,
"পুত্র পুত্র বলি মাতঃ! করিছ রোদন?"

কাতরা রমণী কহে—"তোমার জননী আমি,
"আমি মায়া দেবী, আমি ত্রিদিব ছাড়িয়া
"আসিনু আকুলা শোকে, তোমার নিষ্ফল ব্রত,
"তোমার জীবন শূন্য মূরতি দেখিয়া।"
আশ্বাসি মায়েরে যোগী—কহিলা দয়ার্দ্র স্বরে—
"ভয় নাহি, তব গর্ভে জনম আমার
"হবে না নিষ্ফল, নাহি হইবে নিষ্ফল বাক্য
"অসিত ঋষির—শোক কর পরিহার।
"হব আমি বুদ্ধ মাতঃ! হয় যদি ধরাতল
"বিদীর্ণ শতধা, হয় সুমেরু প্লাবিত,
"চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা হয় যদি ভূপতিত
"মরিব না, নাহি ব্রত করি উদ্‌যাপিত।"
জননী গেলেন চলি স্বপনের ছায়ামত,
হইলেন শাক্যসিংহ যোগে দৃঢ়তর
নিমজ্জিত দিবানিশি একাসনে একধ্যানে,
লঙ্ঘিতে তপস্যা-বলে সমুদ্র দুস্তর।
ক্রমে ক্রমে বাহ্য জ্ঞান, হল পূর্ণ তিরোধান,
সিদ্ধার্থ অন্তর জ্ঞানে শুদ্ধ অবস্থিত,
নিশ্চল নিস্পন্দ দেহ, পূর্ণ অবরুদ্ধ শ্বাস,
বনে যেন বনদেব-মূরতি স্থাপিত।
দিন যায়, রাত্রি যায়; ঋতু যায়, বর্ষ যায়;
এইরূপে ছয় বর্ষ হইল অতীত।
কত বর্ষা, কত শীত, কত গ্রীষ্ম খরতর,
কত ঝড়, কত বজ্র, নাহিক সম্বিত।
মাংসহীন কলেবর হইল দুর্ব্বল কৃশ।
নাসিকার পথে তৃণ করালে প্রবেশ

হইত বাহির কর্ণে ; নয়ন-কোটর মগ্ন ;
সে কাঞ্চন-কান্তি এবে অস্থিমাত্র শেষ।
পিশাচ ভাবিয়া মনে গোপাল রাখালগণ
করিত বিকৃত অঙ্গে ধূলি বরিষণ ;
কেহ মৃত ভাবি মনে, ঘৃণায় যাইত দূরে ;
পলাইল নিরাশায় শিষ্য পঞ্চ জন।
যত কাষ্ঠ হয় শুষ্ক ততই প্রখরতর
হয় যথা অগ্নি ; হয় ততই উজ্জ্বল
গৃহের প্রদীপ যথা, যতই অদৃশ্য, লীন,
নিবিড় তিমিরে হয় শূন্য ধরাতল।
যতই শরীর শুষ্ক, যতই তিমিরাচ্ছন্ন
হলো বিশ্ব চরাচর, নিষ্ক্রিয় শরীর,
ততই অন্তর জ্ঞান যোগীর উঠিল জ্বলি ;
আকাশ ব্যাপিল শিখা সে জ্ঞান-বহ্নির।
সেই ব্যাপ্ত জ্ঞানালোকে যোগী দেখিলেন বিশ্ব,
বিশ্বের অনন্ত তত্ত্ব, সৌন্দর্য্য অসীম।
কিন্তু নির্ব্বাণের পথ,—কই, কোথা ? নাহি চিহ্ন !
হইল যোগীর আশা নিরাশায় লীন।
এই আশা, মহা-আশা, সিদ্ধার্থের, মানবের,
ফলিল না ছয় বর্ষে, ফলিবে কি আর ?
কি সাধনা আছে আর, কিরূপে সাধিলে তাহা
সেই মহাজ্ঞান তত্ত্ব হইবে সঞ্চার।
নিরাশার সহচর সন্দেহ অজ্ঞাত পদে
যোগীর মানস-প্রান্তে হয়ে সঞ্চারিত,
ক্রমশ মেঘের মত হয়ে ঘন বিস্তারিত,
করিল সে জ্ঞান-সূর্য্য ক্রমে আবরিত।

নিষ্ফল দর্শন, যোগ,—সিদ্ধার্থ ভাবিলা মনে,—
বৃথা এ শরীর মাত্র করিলেন ক্ষয় ;
সংসার ছাড়িয়া বৃথা অকূলে দিলেন ঝাঁপ,
না মিলিল কূল তার, মিলিবার নয়।
সংসার মোহন বেশে তখন উঠিল ভাসি
খুলিয়া অনন্ত শোভা নয়নে তাঁহার।
সে ঐশ্বর্য্য, সে সৌন্দর্য্য, গৃহের অপার সুখ,
সে সুখে অপার শান্তি প্রেমেতে গোপার।
একে একে পূর্ব্বস্মৃতি সান্ধ্য তারকার মত
হৃদয় আকাশে ধীরে ফুটিল তাঁহার ;
ফুটিয়া উঠিল আর পিতার সে শোকছবি,
শোকছবি গৌতমীর, দুঃখিনা গোপার।
থাকিতেও পতি গোপা অনাথার সমধিক ;
থাকিতেও পিতা হায়! অনাথ রাহুল,
আছে কি বাঁচিয়া তারা ? আছে কি একটি আলো
রাজপুরে ? রাজোদ্যানে একটিও ফুল ?
সিদ্ধার্থ করুণপ্রাণ, উছলিল সে করুণা,
সিদ্ধার্থ কি হায়! তবে ফিরিবেন ঘরে ?
পিতার সে স্নেহ-স্বর্গে, মাতার সে স্নেহ-বক্ষে,
ভার্য্যার সে উদ্বেলিত প্রেমের সাগরে।
আবার ভাবিলা মনে—জনক জীবনে মৃত,
স্নেহময়ী জননীর বিদীর্ণ হৃদয়,
অনাথা দুঃখিনী গোপা, অনাথ অঙ্কের শিশু,
করিলাম, করিলাম এ শরীর ক্ষয়,
শেষে কি ফিরিতে ঘরে, ফিরিতে সে রাজপুরে,
সেই নাট্যশালা হায়! করিয়া শ্মশান ?

জন্ম-জরা-মৃত্যু-পূর্ণ ফিরিতে সংসারে পুনঃ ?—
মানব-দুঃখের হায়! নাহি কি নির্ব্বাণ?
তাহাতে বা কি সান্ত্বনা, কিবা শান্তি, কিবা সুখ?
কি সান্ত্বনা জরা-ব্যাধি-মরণের করে?
কিন্তু তপস্যায় হায়! কোথায় উদ্ধার পথ?—
ঝুলিতেছে সেই কর মস্তক উপরে!
এই তপস্যার ক্লেশ! এই ক্লেশে এই মৃত্যু!
বনে বন্যপশুদের হইয়া আহার,
কি ফল ফলিবে হায়!—আন্দোলিত সিদ্ধার্থের
হৃদয়ে কামনা পুনঃ হইল সঞ্চার।
ধীরে ধীরে সেই কাম বাড়িল, হইল ধীরে
মূর্ত্তিমান্ সেই মূর্ত্তি কত মনোহর!
পার্শ্বে কত মনোহরা রূপে নারী নিরুপমা,
ফুলধনু, ফুলতূণে পঞ্চ ফুলশর।
মধুর ঈষদ হাসি বাসন্তী জ্যোৎস্নারাশি
পরকাশি বনে, কহে—কি কণ্ঠ বীণার!—
"সৌন্দর্য্য ঐশ্বর্য্য, যশঃ গৌরব, বিলাস, আর,
যাহা চাহ দিব, যোগ কর পরিহার!
কিবা সুখ তপস্যায়, গেল ছয় বর্ষ হায়!
শরীর কঙ্কাল-শেষ, ওষ্ঠাগত প্রাণ।
দেখ মম পঞ্চ শর, দেখ মম পঞ্চ শক্তি,
কত সুখ পারে তারা করিতে প্রদান!"
ধরি ফুলধনু হাসি, জানু পাতি ফুল গুণ
দিয়া নিক্ষেপিলা চারু পঞ্চ ফুলশর,
শরত জ্যোৎস্নায় মিশি সৃজিল পঞ্চ ষোড়শী,
রূপে ছায়াময়ী যেন জ্যোৎস্না সুন্দর;

প্রথমা হাসিয়া কহে—"দেখ চেয়ে যোগিবর
কুসুম-তরঙ্গে অঙ্গ নির্ম্মিত, সজ্জিত ;
বাসন্তী জ্যোৎস্নারূপ ; কণ্ঠ কোকিলের স্বর ;
নিশ্বাস মলয়,মম সুরভি পূরিত ।
আকাশনিবিড় কেশ তারকায় বিভূষিত,
তারকা বলয়, কণ্ঠে তারকার হার,
পূর্ণচন্দ্র কিরীটিনী, আমায় বরণ কর
জগতের এ সৌন্দর্য্য হইবে তোমার ।"
দ্বিতীয়া ঝলকে হাসি, কহে—"দেখ শাক্যসিংহ !
রতনে নির্ম্মিত অঙ্গ, রতনে খচিত,
কষিত কাঞ্চন-কান্তি তুলিয়াছে কি তরঙ্গ,
রতন-আভায় দেখ দিক উজ্জ্বলিত ।
হৃদয় হীরকখনি, প্রবালে মুকুতা দন্ত,
পদ্মরাগে নীলমণি যুগল নয়ন ;
রতন-কিরীট শিরে ; বরণ আমায় কর,
ঐশ্বর্য্য এ জগতের করিব অর্পণ ।"
মধুরে তৃতীয়া কহে অমৃত বরষি—"দেখ
অকলঙ্ক রূপ মম অমল ধবল ।
কত কণ্ঠ একতানে বাজে এই কণ্ঠে মম,
বরষে অমৃতধারা অমল তরল
এই কণ্ঠ কালজয়ী, সর্ব্বব্যাপী, অবারিত,
কেমন সৌরভ দেখ নিশ্বাসে আমার ।
কণ্ঠ-সুধাময়ী আমি, আমায় বরিলে যোগি !
জগতের যশোরাশি হইবে তোমার !"
চতুর্থী সগর্ব্বে কহে—"এই দেখ রূপ মম
নৈদাঘ ভাস্কর-তেজে দীপ্ত সমুজ্জ্বল ।

কেমন উন্নত গ্রীবা, কেমন উন্নত বক্ষ,
ঝলসে কিরীটি শিরে রবির মণ্ডল।
ঝলসে কিরীটি করে অপার্থিব রত্নময়,
কত ক্ষেত্রে কত মতে কত নারীনর
মাগে এ কিরীটি মম মৃত্যুমুখে, এস যোগি।
পরাব মুকুট শিরে দুর্লভ সুন্দর!"
পঞ্চমা আবেশময়ী কুন্তল-আলুলায়িতা
কুসুম-শয্যায় অৰ্দ্ধশায়িতা সুন্দরী,
অৰ্দ্ধ-অনাবৃত বক্ষ, অৰ্দ্ধ-নিমীলিত আঁখি.

কি মধুর হাসি সিক্ত বিম্বাধরে মরি!
কুসুমে খচিতা বামা, এক করে চারু বীণা—
তুলি'ছে মূর্চ্ছনা মৃদু কি আবেশময়!
সুরা-পাত্র অন্য করে, আবেশ কটাক্ষে কহে—
"আইস বিলাস-সুখে পূরিব হৃদয়।"
দাঁড়াইয়া কামদেব, দাঁড়াইয়া রতিদেবী,
রতির কুসুমকায় কুসুমের পাশ;
কহে কাম—"শাক্যসিংহ, চেয়ে দেখ এতাধিক
আছে মানবের আর কিবা অভিলাষ?
কি চাহ? সকলি চাহ, দিবে প্রাণপত্নী মম
বাঁধিয়া কুসুমদামে করেতে তোমার।
এই নির্ব্বাণের পথ, দেখিছ কি দুঃখরেখা?
যাও ঘরে ফিরে, যোগ কর পরিহার!"
যোগিশ্রেষ্ঠ অবিচল হিমাদ্রি-সানুর মত,
কহিলেন দেখি কামক্রীড়া সুনিপুণ—
"ওরে! প্রবঞ্চক মার! আমি চিনিয়াছি তোরে,
প্রলোভন ধনু তোর; অনুরাগ গুণ।

চিনি পঞ্চশর তোর,—সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য, যশঃ,
চিনি আমি ; চিনি আর গৌরব, বিলাস ;
চিনি তাহাদের শক্তি, চিনি তোর পত্নী রতি,
আপনি মোহিনী, তার করে মোহ-পাশ।
করি এই কাম্য পঞ্চে প্রথমেই প্রলোভিত,
পরে ক্রমে অনুরাগ করিয়া সঞ্চার,
তস্করের মত কাম প্রবেশে মানব-মনে ;
করে কাম্য-সুখে রত, মোহ পরে তার।
মোহের বন্ধনে পড়ি না দেখে দুর্ব্বল নর
রতির পশ্চাতে জরা, ব্যাধি, মৃত্যু আর,
কি ভীষণ ছায়াত্রয় ! কি গভীর দুঃখময় !
কি গভীর দুঃখে নর করে হাহাকার !
আমি এই মোহপাশ কাটিয়াছি বহুদিন ;
আসিলি কি তুই পুনঃ ছলিতে আমায় ?
বিফল করিতে মম এ দীর্ঘ তপস্যা-ফল,
ওরে দুরাচার ! নাহি চিনিলি আমায় !”
জ্বলিল সংযমানল, ছুটিল নয়ন পথে
সে বহ্নি, হইল ভস্ম মুহূর্ত্তেকে কাম,
শোকাকুলা রতিসহ মোহিনী ষোড়শী পঞ্চ
সে অগ্নিতে ছায়া যেন হলো তিরোধান।
সম্বরিলে সেই বহ্নি দেখিলেন শাক্যসিংহ
দাঁড়ায়ে অদূরে এক মূর্ত্তি বিভীষণ,
শরীর কঙ্কাল-সার, লেলিহান মহাজিহ্বা,
আসিছে গ্রাসিতে যেন বিস্তারি বদন।
“দূর হও ! দূর হও !”—যোগী কহিলেন ডাকি—
“চিনিয়াছি তোরে মৃত্যু বীভৎস-আকার !

জানি কাম, মৃত্যু আর, বিঘ্ন তপস্যার পথে,
জিনিয়াছি কাম, তোরে জিনিব এবার।”
কহে মৃত্যু ঘোর কণ্ঠে—“পারিবে না শাক্যসিংহ!
দুই দিন পরে আমি আসিব আবার।”
হলো মৃত্যু অন্তর্হিত। “আসিব দু’দিন পরে”—
ধ্বনিতে লাগিল ধ্বনি কর্ণে অনিবার।
আসিলে দু’দিন পরে শাক্যসিংহ কোন মতে
করিবেন পুনঃ তার গতি নিবারণ?
৬ দিন পরে আর থাকিবে না এ শরীর,
শরীর বিহনে প্রাণ রবে না কখন।
আবার নিরাশা আসি ছাইল মানসাকাশ,
হইলেন চিন্তান্বিত সিদ্ধার্থ এবার,
করিবেন কি উপায়? ভাবিলেন হায়! বুঝি
মানবের নহে সাধ্য মানব-উদ্ধার।
এমন সময়ে যেন আলোকি আকাশশূন্য
আসিলেন ধীরে ইন্দ্র নামিয়া ধরায়,
সুন্দর ত্রিতন্ত্রী করে শোভিতেছে রত্নময়;
বিস্ময়ে সিদ্ধার্থ চাহি চিত্রার্পিতপ্রায়।
ত্রিতন্ত্রীর একতার ছিল শ্লথ, বাজিল না;
এক তার গেল ছিঁড়ি টানিলে বিষম;
সুন্দর হইলে বাঁধা বাজিল তৃতীয় তার,
করিয়া যোগীর কর্ণে সুধা বরিষণ।
চলি গেলা দেবরাজ; বুঝিলেন শাক্য যোগী
শরীর বিলাসে শ্লথ, কিংবা নিষ্পীড়িত,
করিলে তপস্যা সিদ্ধি হইবে না কদাচিত,
করিতে হইবে এই দেহ সঞ্জীবিত।

(১৫)

সিদ্ধি।

ধীরে পোহাইল নিশি। উষা ধীরে ধীরে
বরষি কোমল করে সুধা সঞ্জীবনী
বাঁচাইল চরাচর। ইচ্ছা ধীরে ধীরে
সঞ্জীবনী সুধা-ধারা করিয়া সঞ্চার
বাঁচাইল সিদ্ধার্থের দেহ অচেতন
অস্থিশেষ; শাক্যসিংহ মেলিলা নয়ন।
দেখিলেন ছয় দীর্ঘ বৎসরের পরে
কত মনোহরা উষা! কত মনোহরা
আকাশ-নীলিমা, চারু বসুন্ধরা শ্যামা!
দেখিলেন বনশোভা কত রূপান্তর
হইয়াছে ছয় বর্ষে! ক্ষুদ্র তরুগণ
হইয়াছে মহীরুহ; অঙ্কুরিতা লতা
হইয়াছে বসন্তের পুষ্পে সুশোভিতা।
বৃক্ষরাজি, গুল্ম, লতা, বিস্তৃত বর্দ্ধিত
হইয়াছে চারিদিকে; কিন্তু সিদ্ধার্থের
রূপ যৌবনের হায়! চারু রঙ্গভূমি
সেই দেহ,—হইয়াছে কি দশা তাহার!
নাহি শক্তি সিদ্ধার্থের অঙ্গ আপনার
চিনিতে, করিতে কর পদ প্রসারিত,
সর্ব্ব কলেবর যেন লৌহ-বিনির্ম্মিত।
ছিল পঞ্চ শিষ্য, তারা গিয়াছে চলিয়া
দেখিয়া নিষ্ফল যোগ,—সিদ্ধার্থ একক

নিরাশ্রয়, অসহায়, সদ্য শিশু মত।
বহুদিনে বহুকষ্টে অঙ্গে ভর করি
নৈরঞ্জনা-তীরে ধীরে করিয়া গমন
করিলেন স্নান ছয় বৎসরের পরে,—
অনলে অমৃত যেন হইল বর্ষণ।
ছয় বৎসরের জীর্ণ গৈরিক বসন
তেয় গিয়া পরিলেন শবের বসন
তীরস্থিত শ্মশানের, বসিলেন এক
পাদপের ছায়াতলে নৈরঞ্জনা-তীরে
নান্দিকপতির কন্যা সিদ্ধমনোরথা
আসিলা 'সুজাতা' ধীরে পায়সান্ন শিরে
স্বর্ণপাত্রে, বনদেবে দিতে উপহার।
ও কি মূর্ত্তি তরুতলে? ও কি বনদেব
কঠোর তপস্বি-বেশে সম্মুখে তাহার?
ভক্তিতে ভরিল বুক; নমিয়া ভূতলে
পায়সান্ন পদাম্বুজে দিয়া উপহার
কহে করযোড়ে বামা—"করিয়া মানস
পায়সান্নে বনদেব পূজিবে এ দাসী।
সিদ্ধ তার মনোরথ। দাসীর এ পূজা
কৃপা করি বনদেব। করুন গ্রহণ।"
সিদ্ধার্থ কহিলা—"সাধ্বি! সামান্য তপস্বী
নহি বনদেব আমি। অনাহারে আমি
করিয়াছি এই বনে তপস্যা কঠোর
কত বর্ষ নাহি জানি। ক্ষুধায় আকুল
আজি প্রাণ; করিলাম সাদরে গ্রহণ
তব পায়সান্ন ভদ্রে! করি আশীর্ব্বাদ,

সর্ব্ব মনোরথ তব হউক পূরণ।"
কিছুদিন এইরূপে অন্নে সুজাতার
হইলে সবল যোগী, কিছু দিন আর
নিকট 'গোচর' গ্রামে ভিক্ষা আহরণ
করিলেন, হইলেন ক্রমে যোগক্ষম।
জগতের মহাদিন হইল প্রভাত,—
মহাদিন সিদ্ধার্থের। করি প্রদক্ষিণ
সাত বার, সাত বার করিয়া প্রণাম
সে অশ্বত্থ মহাবৃক্ষে, পূর্ব্ব যোগাসনে
পাতি তৃণ সুশ্যামল, অগ্র অন্তর্মুখ
বহির্মুখ মূল,—ভিক্ষালব্ধ তৃণরাশি—
হইলেন শাক্যসিংহ যোগস্থ আবার।
পূর্ব্বমুখ ঋজুকায়, নত অংসযুগ,
বীরাসন, শোভে অঙ্কে করোপরে কর,—
স্বর্ণপুষ্পপাত্রে চারি পদ্ম মনোহর!
জটার কিরীট শিরে নেত্র নিমীলিত,
অনিশ্বাস নাসা, কর্ণ শ্রবণরহিত,
দেহ অবিচল-ধ্রুবনক্ষত্রের মত!
বাহ্যজ্ঞান তিরোহিত, প্রণিধান-বলে
আহরিত, স্মৃতিবল হইল উন্নীত!
স্থির মনাকাশে স্থির জ্যোতিষ্কের মত
মহান্ সংকল্প স্থির হলো প্রকটিত—
"শরীর হউক শুষ্ক, অস্থি মাংস লয়,
যাবৎ নির্ব্বাণ জ্ঞান না হয় উদয়,
এ শরীর এ আসনে রহিবে নিশ্চয়।"
পাদপ নিষ্কম্প স্থির, নিস্তব্ধ কানন,

নীরব কাকলী-গীত, নিশ্চল পবন,
স্থির নৈরঞ্জনা-স্রোতঃ স্থির প্রভাকর
পূর্ব্বাচল শিরে; স্থির বিশ্বচরাচর।
হইল জগত শান্ত গাম্ভীর্য্যে মণ্ডিত,
অজ্ঞাত আশায় যেন হৃদয় পূরিত।
মার পরাজিত; চিত্ত স্থির অবিচল
যেন স্নিগ্ধ নিরমল দর্পণ উজ্জ্বল।
উদ্ভাসিত চিত্ত জ্ঞান প্রদীপ্ত শিখায়,
রবিকরে দীপ্ত স্বচ্ছ দর্পণের প্রায়।
নিরুদ্ধ ইন্দ্রিয়গ্রাম; চিত্তবৃত্তিচয়
নিরুদ্ধ নিশ্চল, দেহ রুদ্ধদেবালয়।
সবিতর্ক সবিচার, ধ্যানেতে প্রথম
হইলা নিবিষ্ট যোগী,—লাগিলা ভাবিতে
কিবা সত্য, কি অসত্য, নিত্য ও অনিত্য
নিত্যের সহিত কিবা সম্বন্ধ আত্মার।
দেখিলা উভয় নিত্য জড় ও চেতন;
উভয় সম্বন্ধহীন। উপজিল মনে
নিবিকার নির্ব্বিতর্ক সমাধি দ্বিতীয়।
দেখিলেন জড় পরিবর্ত্তনের স্রোতে
হইতেছে রূপান্তর নিত্য অবিরাম,—
হইলেন জড়ে প্রীতিবিরাগবিহীন;
উপজিল নিষ্প্রীতিক সমাধি তৃতীয়।
ক্রমে সুখ-দুঃখ-বীজ হইল নির্ম্মূল,
নির্বীজ, চতুর্থ ধ্যানে। উঠিল ভাসিয়া
মেঘমুক্ত চন্দ্রমত আত্মার স্বরূপ
চিত্তের দর্পণে জ্ঞান-আলোকে তখন।

সমস্ত দিবস ধ্যানে হইল অতীত।
আসিল পূর্ণিমানিশি। বহিতে লাগিল
অজস্র ধ্যানের স্রোতঃ। প্রথম প্রহরে
অপূর্ব্ব আলোক চিত্তে হইল সঞ্চার
অজ্ঞান আঁধার নাশি। দেখিলেন যোগী
এই প্রজ্ঞালোকে, যেন খনিগর্ভে মণি,
অতীত তিমিরে পূর্ব্ব জন্ম আপনার;
সুগতি দুর্গতি হেতু বুঝিলেন আর।
বহিল ধ্যানের স্রোতঃ। মধ্যম প্রহরে
দেখিলেন যোগী তাঁর নাহি জন্মভূমি,
নাহি নাম, নাহি গোত্র, নাহি বর্ণ, জাতি,
পূর্ব্ব জ্ঞানীদের বংশে জনম তাঁহার।
প্রাণীদের পূর্ব্বজন্ম অসংখ্য প্রকার
দেখিলেন দিব্যজ্ঞানে। শর্ব্বরীর শেষে
ভাবিলেন জগতের এত দুঃখ কেন?
কি মূল তাহার?
পুনঃ বসিলেন ধ্যানে
জগতের সর্ব্ব দুঃখ বিনাশের তরে।
দেখিলেন বহিতেছে বেগে অবিরত
সংসারে দুঃখের স্রোতঃ, জীব অবিরত
জন্মিয়াছে, জন্মিতেছে, মরিতেছে পুনঃ;
পুনর্জন্ম; পুনর্মৃত্যু; জন্ম মরণের
আবর্ত্তনে করিতেছে জীব হাহাকার
না পাই উদ্ধারপথ। ভাবিলেন যোগী
কেন জরা-মরণের এই আবর্ত্তন?
বহিল ধ্যানের স্রোতঃ। বুঝিলেন যোগী

দুঃখের কারণ (১) জন্ম ; জন্মের কারণ
(২) কর্ম্মফল ; কর্ম্মফল উপজে চেষ্টায় (৩)
শারীরিক মানসিক ; চেষ্টার কারণ
(৪) সুখ-তৃষ্ণা , বুঝিলেন সুখ-দুঃখ-বোধ (৫)
তৃষ্ণার কারণ ; সুখ-দুঃখ-অনুভব
জন্মায় ইন্দ্রিয় (৬) গণ ; তাহার কারণ
জগতের সহ মন ইন্দ্রিয় (৭) সংযোগ।
জগতের রূপ রস গন্ধ মনোহর (৮)
এই সংযোগের হেতু! গন্ধ রূপ রস ;—
সমস্ত জগত,—সূক্ষ্মপরমাণু জাত,
করে প্রকটিত নানারূপে এক (৯) জ্ঞান।
বুঝিলেন সংস্কার এ জ্ঞানের মূল ;
সংস্কার ভ্রমজ্ঞান অবিদ্যা-সম্ভূত।
নহে সত্য রূপ রস,—একে দেখে যাহা
সুরূপ সুন্দর, অন্যে দেখে তা বিরূপ।
এ অসত্য রূপ রস ভাবে সত্য নর
অবিদ্যার মোহে ঘোর, আমিও আমার—
এই অহঙ্কার-জ্ঞানে হ'য়ে প্রতারিত।
বুঝিলেন মহাযোগী, হইলে নিরোধ
অহঙ্কার, ভ্রমজ্ঞান হ'লে তিরোহিত,
জানিলে অসত্য রূপ রস জগতের,
হইবে না মুগ্ধ তাহে ইন্দ্রিয় ও মন,
করিবে না পাপকর্ম্মরত মুগ্ধ নর।

---

(১) জাতি। (২) ভব। (৩) উপাদান। (৪) তৃষ্ণা। (৫) বেদনা। (৬) স্পর্শ। (৭) ষড়ায়তন। (৮) নামরূপ। (৯) বিজ্ঞান।

পাপকর্ম্ম-ফলে জন্ম হইবে না আর ;
জরা-ব্যাধি-মরণের হইবে নির্ব্বাণ।
ধীরে ধীরে মহানিশি হইল প্রভাত।
অরুণ-উদয় সহ উঠিল ভাসিয়া
অরুণের মত এই নির্ব্বাণের জ্ঞান
যোগীর হৃদয়াকাশে। এত কাল পরে,
ছয় দীর্ঘ বৎসরের তপস্যার পরে,
পূর্ণ আজি মনোরথ। যেই জ্ঞান তরে
হইলেন রাজপুত্র সন্ন্যাসী ভিখারী,
করিলেন ছয় বর্ষ তপস্যা কঠোর
অলৌকিক চিন্তাতীত, করিলেন ক্ষয়
মনোহর কলেবর,—তরু কুসুমিত :
সহিলেন অনাহারে, অঙ্গে অনাবৃত,
ছয় শীত, ছয় গ্রীষ্ম, ছয় বরিষার
ঘোরতর বরিষণ; সে দুর্ল্লভ জ্ঞান
হইয়াছে প্রকটিত হৃদয়ে তাঁহার।
হৃদয়ে তাঁহার আর নাহি চঞ্চলতা,
নাহি আশা, নাহি তৃষ্ণা, নাহি অনুরাগ,
নাহি অবিদ্যার ছায়া ; হৃদয় তাঁহার
নির্ব্বাত নিষ্কম্প মহাশান্তিপারাবার।
নাহি কর্ম্মফল-রেখা পুনর্জন্ম বীজ,
তাহার জীবন-পথে, দুঃখের দাহন।
জন্মের নির্ব্বাণ, আর নির্ব্বাণ মৃত্যুর,
হইয়াছে সর্ব্বরূপ দুঃখের নির্ব্বাণ।
নির্ব্বাণের জ্ঞানালোকে হৃদয় তাঁহার
সুশীতল সমুজ্জ্বল। কত জন্মান্তরে,

কত জন্মমৃত্যুচক্রে করিয়া ভ্রমণ,
সহিয়া অশেষ দুঃখ অশেষ যোনিতে,
কত সাধনায় হায়! কত তপস্যায়
নির্ব্বাণের পূর্ণবুদ্ধি আয়ত্ত তাঁহার,—
সিদ্ধার্থ সিদ্ধার্থ আজি, বুদ্ধ অবতার,
সে অশ্বত্থ বোধিদ্রুম! মহাকাল-স্রোতঃ
ছুটিল পবিত্র নাম গাইয়া গাইয়া
মহাভবিষ্যত-গর্ভে অনন্ত অসীম,
অসংখ্য মানব-প্রাণে,—সুপ্ত, অনাগত,—
বরষি নির্ব্বাণ-সুধা অজস্রধারায়
বহিল পবিত্র নাম পুণ্য সমীরণ;
ভাসিল সে নাম প্লাবি বিশ্বচরাচর।
শুনিলেন বুদ্ধদেব নক্ষত্রে নক্ষত্রে
হইতেছে নাম গীত, স্বর্গে দেবগণ
গাইতেছে নামগাথা, করিছে বর্ষণ
অজস্র কুসুমরাশি, সুধা নিরুপম।
পুলকে ভরিল প্রাণ, পুলকে পূরিত
হইল শরীর শীর্ণ, পলকে পলকে
হইতে লাগিল সেই দেহ সঞ্জীবিত।
বহুক্ষণ এ পুলকে থাকি নিমজ্জিত,
অমৃত শশাঙ্ক-গর্ভে,—স্থির অবিচল,
ধীরে ধীরে বুদ্ধদেব মেলিলা নয়ন,
মেলিলা অরুণ-আঁখি দিবস যেমন।
প্রভাত শর্ব্বরী; ধীরে অরুণে রঞ্জিত
হইতেছে পূর্ব্বাকাশ,—নবধর্ম্মালোকে
মানব-অদৃষ্টাকাশ হতেছে উজ্জ্বল।

বৃক্ষে বৃক্ষে বসি সুখে প্রভাত-কাকলী
গাইছে বিহঙ্গচয়, আনন্দে মানব
বসি যেন নবধর্ম্মবৃক্ষের ছায়ায়
গাইছে নির্ব্বাণগাথা ; নবধর্ম্ম-মত
বহিতেছে প্রভাতের নব সমীরণ
ধীর, শান্ত, সুশীতল ; নির্ব্বাণের সুখে
পূর্ণ যেন জীবগণ, বিশ্বচরাচর।

---

(১৬)

প্রচার।

সপ্ত দিবা সপ্ত নিশি বোধিতরুমূলে
রহিলেন বুদ্ধদেব পূর্ণনিমজ্জিত
নির্ব্বাণের মহানন্দে অনন্ত অসীম,—
অনন্ত আলোক-সিন্ধু শান্ত সুশীতল।
নির্ব্বাণ-আনন্দালোক গর্ব্ভে চরাচর
দেখিলেন বুদ্ধদেব যেন ভাসমান,
জরা-মরণের দুঃখ হয়েছে বিলীন।
নির্ব্বাণ-আনন্দগীত জড় অচেতন
গাইতেছে গ্রহে গ্রহে ; আসি দেবগণ
ধরাতলে, নির্ব্বাণের আনন্দে অধীর,
করিতেছে অভিষিক্ত সে আনন্দ-নীরে
তাঁহার চরণাম্বুজে, বোধিতরুবরে,
শত শত স্বর্ণকুম্ভে ; হতেছে প্রণত

বার বার পুণ্যক্রম করি প্রদক্ষিণ।
সপ্তাহ দ্বিতীয় দেব-নেত্রে নির্নিমেষ
চাহিয়া আতলশীর্ষ সেই পুণ্যক্রম
হইল অতীত সুখে। সপ্তাহ তৃতীয়
ভ্রমিতে ভ্রমিতে সেই পুণ্যতরুতলে
নির্ব্বাণ-আনন্দে মগ্ন হইল অতীত,
চাহিয়া চাহিয়া স্নেহসজলনয়নে
তরুবরে। সুপবিত্র ছায়ায় যাহার
তাঁহার সকল আশা হইল সফল,
লভিলেন বুদ্ধ-জ্ঞান, সুখ নির্ব্বাণের,
নাহি চাহে প্রাণ যেতে ছাড়িয়া তাহারে
চতুর্থ সপ্তাহে বনে ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া,
সপ্তাহ পঞ্চম ষষ্ঠ নানা তরুমূলে,
সপ্তাহ সপ্তম নীল নৈরঞ্জনা-তীরে
তারায়ণ তরুতলে তারায়ণ বনে,
নির্ব্বাণের উপভোগে হইল অতীত।
নাহি ক্ষুধা, নাহি তৃষ্ণা, পূর্ণ সিন্ধুমত
নির্ব্বাণ-সুধায় পূর্ণ হৃদয় তাঁহার
শান্ত, স্থির, অবিচল। হইলে অতীত
এরূপে সপ্তাহ সপ্ত, উরুবিল্বপথে
যাইতে উৎকলবাসী বণিকযুগল,
'এপুর' 'ভল্লিক' ভ্রাতা, চক্র শকটের
হইল প্রোথিত ভূমে; খুঁজিতে সহায়
নিরখিল সৌম্যমূর্ত্তি তারায়ণমূলে।
ভক্তিভরে উপহার দিল খাদ্য নানা
মধু ইক্ষুখণ্ড সহ; ইক্ষুখণ্ড মধু

করিলেন বুদ্ধদেব আনন্দে গ্রহণ;
লভিলেন তৃপ্তি করি ক্ষুধা নিবারণ।
দিন যায়, রাত্রি যায়। বসিয়া একাকী
তারায়ণ তরু-তলে ভাবিলেন মনে—
"এরূপ নির্জ্জনবাস যোগ্য কি আমার?
পাইয়াছি যেই ধর্ম্ম দুর্ব্বোধ গম্ভীর,
কে বুঝিবে এই ধর্ম্ম, করিবে গ্রহণ?
আমার নির্ব্বাণধর্ম্ম,—তৃষ্ণার বিরোধ,
শ্রুতি-স্মৃতি-বিপরীত,—এই আর্য্যভূমে
শ্রুতিতে প্লাবিত, কাম্যকর্ম্মে প্রণোদিত,
কে শুনিবে, কে বুঝিবে, করিবে গ্রহণ?
না বুঝে, অবজ্ঞা ঘোর করিবে নিশ্চয়!
শ্রুতিজাত কামনার স্রোতে খরতর
ভাসিছে ভারতভূমি; করিয়া কামনা
স্বর্গভোগ, সুখভোগ, রাজ্য, ধন, যশঃ,
করে যাগ যজ্ঞ নর; তারা কি কখন
করিবে কঠোর যজ্ঞ কামনা-নিরোধ?
বুঝিবে কি কামনার নির্ব্বাণই সুখ?
অসম্ভব, অসম্ভব। নিশ্চয় আমার
উচিত নির্জ্জনবাস। নির্ব্বাণের সুখে
করিব নির্জ্জনে এই দেহের নির্ব্বাণ।"
দেখিলেন বুদ্ধদেব বহিতেছে বেগে
করাল কালের স্রোতঃ অনন্ত অসীম।
অনন্ত অসংখ্য জীব ডুবিয়া ভাসিয়া,
ভাসিয়া ডুবিয়া পুনঃ, শত শত বার,
সহিয়া অশেষ দুঃখ জরা-ব্যাধি-করে,

জলিয়া ইন্দ্রিয়-সুখ-কামনা-অনলে,
করিতেছে হাহাকার। সংসারের ভয়ে
ভীত এক দিকে, অন্যদিকে সংসারের
তৃষ্ণায় ব্যাকুল। ঘোর লবণসলিল
যত করিতেছে পান, তৃষ্ণায় আকুল
হইতেছে প্রাণ। এই আবর্ত্তনে
পড়িয়া মানবজাতি, না পাইয়া পথ,
করিতেছে হাহাকার। চাহিয়া চাহিয়া
কৃতাঞ্জলি তাঁর পানে করুণ নয়নে
মাগিছে করুণা ভিক্ষা; কহিছে কাঁদিয়া,
আগত ও অনাগত জীব সংখ্যাতীত—
"হায় কিবা খেদ! অনন্ত মানব সদা
সহিতেছি এই দুঃই জরা-মৃত্যু-করে!
ভগবান্ বোধিজ্ঞান লভিয়া সম্যক্,
লভিয়া নির্ব্বাণতত্ত্ব, হায়! মনোনীত
করিলা নির্জ্জনবাস। হৃদয় তাঁহার
দ্রবিল না; হইল না দয়ার সঞ্চার
জীবদুঃখে ঘোরতর; জীবের উদ্ধার
হইল না,—জীবে দয়া কে করিবে আর?
ভগবন্! দয়াময়! কর দয়া জীবে!
মায়াসুত! কর দয়া মায়া সুতগণে!
দুঃখের-নির্ব্বাণ-বুদ্ধি লভিয়া জগতে
তুমি বুদ্ধদেব; জীব করিতে উদ্ধার
আসিয়াছ যথাকালে, তুমি তথাগত;
জীবের উদ্ধারপথে গতি তব শুভ,
সুগত তোমার নাম। কর দয়া জীবে!

তোমার নির্ব্বাণ—ধর্ম্ম করিয়া প্রচার,
করিয়া উদ্ধার জীব, কর সিদ্ধ তুমি
জীবের সর্ব্বার্থ, দেব ! হউক সফল
তোমার সিদ্ধার্থ নাম। যাউক ভাসিয়া
কালগর্ভে তব নাম করি বিতরণ
নির্ব্বাণ-অমৃত জীবে যুগ যুগান্তর।"
এই হাহাকার, এই ভিক্ষা করুণার
দ্রবিল হৃদয়; দৃঢ় প্রতিজ্ঞা-বন্ধন
করিল শিথিল; বুদ্ধ করিলেন স্থির
করিবেন নবধর্ম্ম জগতে প্রচার।
কিন্তু হায় ! উপদেশ কাহাকে প্রথম,
করিবেন ? শ্রদ্ধাবান বিনয়ী তেমন,
হৃদয় অপক্ষপাতী, মোক্ষ-অভিলাষী,
কে আছে শুনিবে ধর্ম্ম, শুনিয়া বুঝিবে,
বুঝিয়া করিবে তাহা গ্রহণ, ধারণ ?
কোথায় এমন পাত্র ? হইল স্মরণ
রামপুত্র রুদ্রকেরে। কোথায় এখন
রামপুত্র ? বুদ্ধদেব বসিলেন ধ্যানে;
দেখিলেন সপ্তদিন হইল অতীত
রামপুত্র কালগত। আরাড়কালাম
তখন পড়িল মনে। কোথায় সে এবে ?
আবার বসিয়া ধ্যানে দেখিলা স্বগত
তাহার জীবনলীলা হইয়াছে শেষ
তিন দিন। বুদ্ধদেব ছাড়িয়া নিশ্বাস
কহিলেন—"তবে ধর্ম্ম কহিব কাহারে ?"
তখন পড়িল মনে শিষ্য পঞ্চজনে।

কোথায় তাহারা ? ধ্যানে দেখিলেন বুদ্ধ
আছে তারা মৃগদাবে * বারাণসীধামে।
যাইবেন বারাণসী করিলেন স্থির
শিষ্য পঞ্চে নবধর্ম্মে করিতে দীক্ষিত।
চলিলেন বারাণসী, ছয় বর্ষ পরে
ত্যজি নৈরঞ্জনা-তীর, ত্যজি বোধিদ্রুম,
ত্যজি মহাতীর্থ সেই পবিত্র কানন
মানবের ; মানবের আশা সুখতারা
চলিল করিতে দুঃখ-রজনী প্রভাত।
পথশ্রান্ত রবিতাপে আছেন বসিয়া
শীতল ছায়ায় বুদ্ধ ; বৃদ্ধ আজীবক
দেখিল সে সৌম্যরূপ যাইতে চলিয়া।
অপূর্ব্ব মুখশ্রী, সেই কান্তি শরীরের,
দেব-আভা দুনয়নে, দেখি আজীবক
হইল বিস্মিত, মুগ্ধ ; বসিল তথায়।
সম্ভাষণ অন্তে বৃদ্ধ কহে—"আয়ুষ্মন্ !
তোমার ইন্দ্রিয়গ্রাম, কান্তি বদনের,
গাত্রবর্ণ দেখিতেছি পবিত্র নির্ম্মল
গৌতম ; কাহার শিষ্য কহ তুমি শুনি ?
এ আশ্চর্য্য ব্রহ্মচর্য্য শিখিলে কোথায় ?"
জলদপ্রতিমকণ্ঠে বুদ্ধ উত্তরিলা—
"হয়েছি সম্বুদ্ধ আমি একক, ব্রাহ্মণ !
করিয়াছি পাপক্ষয়, হয়েছি নির্ম্মল।"
জিজ্ঞাসে ব্রাহ্মণ—"তবে আচার্য্য কি তুমি ?"

---

* বর্ত্তমান শরনাথ।

"অহমেব"—বুদ্ধদেব করিলা উত্তর।
"জিন তুমি ?"—ক্রোধে বিপ্র করিল জিজ্ঞাসা।
"জিন আমি, সর্ব্বপাপ করিয়াছি জয়।"—
হইল উত্তর তেজে। বৃদ্ধ আজীবক
ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, গর্ব্বী ; গর্ব্বে, অভিমানে,
পড়িল আঘাত দৃঢ় ; সমধিক ক্রোধে
জিজ্ঞাসে—"এখন তুমি যাইবে কোথায় ?"
উত্তর—"যাইব কাশী। অন্ধে দিব চোক ;
অমৃত-দুন্দুভি আর শুনাব বধিরে।
হয় নাই ইহলোকে যে ধর্ম্ম প্রচার,
করিব সেখানে সেই ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত
দুঃখের নির্ব্বাণ-দ্বার করি উদ্‌ঘাটিত !"
কাশীবাসী অন্ধ। কাশী-নিবাসী বধির।
মহাতীর্থ কাশীধামে ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তন!—
জ্বলন্ত অনলে ঘৃত হইলে পতিত।
ব্রাহ্মণ উন্মত্ত ক্রোধে, শুভ্র ভ্রূযুগল
করিয়া কুঞ্চিত মুখ করিয়া বিকৃত,
হাসিয়া বিকট হাসি চলিল কহিয়া—
"এ পথ তোমার, আর এ পথ আমার।"
যাহতে উত্তরে বিপ্র, যাইবেন বুদ্ধ
সেই পথে, ক্রোধে বিপ্র চলিল দক্ষিণে।
চলিলেন বুদ্ধ। ক্রমে ভাগীরথী-তীরে
হইলেন উপনীত। কহিলা নাবিকে—
"দয়া করি কর পার।" কহিল নাবিক—
"দেও পণ্য, করি পার।" কাতরে সুগত
কহিলেন—"পণ্য আমি পাইব কোথায় ?

দীন হীন ভিক্ষু আমি ; দিতে মূল্য আমি
অক্ষম একটি ভগ্ন পাত্র মৃত্তিকার।"
কহিল নাবিক পুনঃ—"পণ্যজীবী আমি ;"
স্ত্রী পুত্র আমার আছে ; করিব না পার
নাহি দেও পণ্য যদি।" আকাশে তখন
যাইছে বলাকাশ্রেণী, অঙ্গুলি নির্দ্দেশ
করিয়া কহিলা বুদ্ধ—"বলাকার মালা
ওই দেখ যাইতেছে নদী অতিক্রমি !
দিয়াছে কি পণ্য তারা ? যোগবলে বৎস !
আকাশের পথে আমি হই যদি পার
কোথা পাবে পণ্য তব ?" হাসিলা ঈষদ।
সেই হাসি, সেই মূর্ত্তি,—চক্ষু নাবিকের
খুলিল, প্রণত পদে হইয়া নাবিক,
যিনি করিবেন পার সংখ্যাতীত জীব
এই ভব-ভাগীরথী, আনন্দে তখন
তাঁহাকে করিল পার ভক্তিতে অধীর।

বহুদেশ জনপদ করি অতিক্রম
হইলেন উপনীত বারাণসীধামে.
ভারতের মহাতীর্থ। অর্দ্ধচন্দ্রাকারে
শোভিতেছে কাশী নীলা ভাগীরথীতীরে
নীলাকাশে অর্দ্ধ শশী। হর্ম্ম্য শত শত,
সোপান-চরণ জলে করি নিমজ্জিত,
দাঁড়াইয়া সমাধিস্থ মহাযোগী মত
ভস্ম আচ্ছাদিত দেহ। শান্তি প্রতিবিম্ব
পড়ি শান্ত সলিলেতে, দুইটি ত্রিদিব
বিকাশিছে কিবা শান্তি পবিত্রতাময়।

দেবালয়, বিদ্যালয়, শতসংখ্যাতীত
শোভিতেছে স্থানে স্থানে। যোগী শত শত,
পণ্ডিত, সন্ন্যাসী, বিপ্র, আছে নিমজ্জিত
অধ্যয়নে, কিংবা নানা শাস্ত্র আলাপনে।
ঢাক, ঢোল, কাংস্য, ঘণ্টা, করতাল রবে
পরিপূর্ণ কাশীধাম, লোক-কোলাহলে।
সোপান, সৈকত, জল, স্থল, রাজপথ
আচ্ছন্ন মানবে, নানা বাসে বিচিত্রিত।
সোপানে, সৈকতে, জলে বক্ষ নিমজ্জিত,
কত কণ্ঠে, কত স্তোত্র হইতেছে গীত
কত নরনারী-কণ্ঠে; মন্থরে বহিয়া
যাইছেন ভাগীরথী বহি পুষ্পভার,
অগুরুচন্দন পুষ্পগন্ধে সুবাসিত।
ধর্ম্মকোলাহলে পূর্ণ বারাণসীধামে
বুদ্ধ করিলেন স্থির করিতে প্রচার
নবধর্ম্ম ভেরী-রবে, দুন্দুভি-নির্ঘোষে।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে দেব আসি মৃগদায়ে
দেখিলেন পলাতক শিষ্য পঞ্চজন।
দেখি দূরে কহে তারা—"ব্রত ভঙ্গ করি
আসে শাক্য, হইয়াছে তপস্যা নিষ্ফল।"
আসিলে নিকটে বুদ্ধ, মহিমা-মণ্ডিত
দেখি সেই শান্ত মূর্ত্তি, করুণ নয়ন
জ্ঞানদীপ্ত, নিরখিয়া কহি এক স্বরে—
"গুরুদেব! গুরুদেব!" হইল প্রণত।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যাদেবী ধূসরা যোগিনী,
ধূসরা কুন্তলা বালা, ধীরে নিশীথিনী

উপাসিকা কুলনারী, নীলমণিময়
পুষ্পপাত্রে মনোহর শ্বেতপুষ্পনিভ
লইয়া নক্ষত্ররাশি, অনন্তরূপিণী
আসিলেন মহাতীর্থে। ধীরে আরতির
কোলাহল নীরবিল, হইল নীরব
চরাচর, কাশীধাম সুষুপ্ত নীরব।
দ্বিতীয় প্রহর নিশি; নক্ষত্র-খচিত
অনন্ত গগনতলে বসি যোগাসনে
চাহিয়া অনন্ত নৈশ গগনের পানে
কহিলেন বুদ্ধদেব—"আয়ুষ্মন্‌গণ!
করিও না তর্কজালে বিক্ষিপ্ত আমায়।
কি চাহ তোমরা? চাহ হিত? চাহ সুখ?
দুঃখের নির্ব্বাণ? কাল করিও না ক্ষয়।
হইয়াছি বুদ্ধ আমি; পাইয়াছি আমি
নির্ব্বাণের মহাবুদ্ধি; পেয়েছি নির্ব্বাণ।
আইস তোমরা বৎস! করিব প্রদান
সে অমৃত, সেই ধর্ম্মে করিব দীক্ষিত।
তোমরা হইবে বুদ্ধ; জরা জন্ম আর
হইবে না; ব্রহ্মচর্য্য পূর্ণ তোমাদের।"
করযোড়ে পঞ্চ শিষ্য বসি পদতলে
শুনিল সে ধর্ম্ম-চক্র; হইল দীক্ষিত
নবধর্ম্মচক্রে; নিশি হইল প্রভাত।

সে দিন হইতে শত শত নরনারী
পবিত্র নির্ব্বাণ-ধর্ম্মে হইল দীক্ষিত,—
পণ্ডিত, নির্ধন, ধনী, মূর্খ, গৃহী, যোগী,
শুনি মনোমুগ্ধকর উপদেশ-গাথা।

দিন দিন যশোরাশি হইল বিস্তৃত
চারিদিকে, বারাণসী করি বিপ্লাবিত।
বর্ষা অন্তে বহু শিষ্যে হইয়া বেষ্টিত
চলিলা মগধে পুনঃ। আছেন বসিয়া
একদিন 'গন্ধহস্তি' পর্ব্বতে গয়ায়
সহ শিষ্য, দার্শনিক পণ্ডিত কাশ্যপ
অগ্নিহোত্র সুবিখ্যাত বসিয়া নিকটে।
অদূরে উঠিল জ্বলি ঘোর দাবানল।
গৌতম চাহিয়া সেই ভীম অগ্নি পানে
কহিলা—"কাশ্যপ! দেখ বেগে দাবানল
জ্বলিতেছে কি ভীষণ! হায়! নরনারী
যত দিন থাকে মোহে অবিদ্যা-অধীন,
দহে চিত্ত তাহাদের কামনা-অনলে
এইরূপে, জগতের গন্ধ রূপ রস
যত করে অনুভব, সুখের কামনা
বাড়ে তত, তত দুঃখ হয় ঘনীভূত;
তত জন্ম-মৃত্যু-চক্রে হয় আবর্ত্তিত!
আমার নির্ব্বাণ-ধর্ম্ম-মন্দিরের দ্বার
ইন্দ্রিয়সংযম; শান্তিপূর্ণ অভ্যন্তর।
এই দ্বারে প্রবেশিলে বহ্নি বাসনার
নাহি পারে উত্তেজিত করিতে হৃদয়।
ইন্ধনবিহনে অগ্নি হয় নির্ব্বাপিত।
ইন্দ্রিয়ে না যোগাইলে বিষয়-ইন্ধন
কামনার দাবানল হয় নির্ব্বাপিত,
কাশ্যপ! মানব শান্তি লভে অবিচল,
কামনা নির্ব্বাণে হয় দুঃখের নির্ব্বাণ।"

কাশ্যপ লইল দীক্ষা। চলিলেন বুদ্ধ
রাজগৃহে মগধের মহারাজধানী।
যষ্টিবনে শিষ্যসহ আছেন বসিয়া
লোকারণ্যে, বিম্বিসার মগধ সম্রাট
বসি সসম্ভ্রমে পার্শ্বে। কহিলা কাশ্যপে—
"কাশ্যপ! বৈদিক ধর্ম্ম তেয়াগিলে,কেন,
কহ শুনি।" করযোড়ে কহিলা কাশ্যপ—
"স্বর্গ অপবর্গ আর ইন্দ্রিয় সুখের
কামনা যে ধর্ম্মে প্রভু করে উদ্দীপিত,
সে ধর্ম্মে কেমনে হবে কামনা-নির্ব্বাণ?
কামনার দাস শান্তি পাইবে কেমনে?
তুচ্ছ নর, গুরুদেব! আপনি জলধি?
হয়েন অশান্ত, বক্ষে বহিলে ঝটিকা।"
নবধর্ম্মে বিম্বিসার হইলা দীক্ষিত,
হইলা দীক্ষিত দুই ব্রাহ্মণ-কুমার
খ্যাত 'সরিপুত্র' 'মোদগল্যায়ন' আর।
এই দীক্ষা চতুষ্টয়, দীক্ষা সম্রাটের,
করিল মগধরাজ্য পূর্ণ বিপ্লাবিত।
মগধ সাম্রাজ্য গর্ভে হইল স্থাপিত
বৌদ্ধধর্ম্ম-মহাধ্বজা, উড়িল আকাশে
বৌদ্ধধর্ম্ম-বৈজয়ন্তী ঝলসি গগন।

সংসার শ্মশান

মগধের বেণুবনে উপবিষ্ট বুদ্ধদেব
শিষ্যসহ, গুল্মমধ্যে যেন তরুবর।
শৈশবের সহচর আসি পিতৃ-দূত কহে
প্রণমি চরণে, করি কৃতাঞ্জলি কর,—
"হায় দেব! কত দূত পাঠাইলা পিতা তব,
কেহ না ফিরিল রাজ্যে, গেল প্রব্রজ্যায়।
আসিয়াছে এই দাস তোমার শৈশব সখা,
পাষাণে বাঁধিয়া বুক লইতে তোমায়।
"বাজিতেছে ধর্ম্মভেরী—দেশ দেশান্তরে তব,
বাজিবে না শুধুই কি কপিলনগরে?
ধর্ম্মের আলোক তব ছুটিয়াছে রাজ্যে রাজ্যে,
শাক্যরাজ্য রহিবে কি নিবিড় তিমিরে?
ধর্ম্মের অমৃত তব সংখ্যাতীত নর নারী
করিয়াছে, করিতেছে, পান অনিবার;
কেবল কি শাক্য জাতি পাইবে না সেই সুধা,
জনক, জননী, পত্নী পাইবে না আর?
আকুল সে শাক্যরাজ্য, আকুল কপিলবস্তু,
আকুল জননী তব, জনক আকুল;
আকুল গোপার প্রাণ পাইতে সে ধর্ম্মসুধা,
সোণার পুতুল শিশু আকুল রাহুল।
রাজার জীবন-দীপ হায়! নির্ব্বাপিত প্রায়;
নৃপতি নির্ব্বাণ পূর্ব্বে দেখিতে কাতর

তোমার পবিত্র মুখ ; কাতর ত্যজিতে দেহ
তব ধর্ম্মামৃত পান করি, যোগিবর !
"তুমি করুণার সিন্ধু, মাগিছে করুণা তব
তোমার জনক বৃদ্ধ জীবন-সন্ধ্যায়।
মাগিতেছে শাক্যপুরী, মাগিতেছে শাক্যরাজ্য,
তোমার করুণা ভিক্ষা আকুল তৃষ্ণায়।"
মধুর বসন্তকাল, মলয় অনিল ধীরে
বহিছে মধুরে মধু ঢালিয়া ধরায়
সে মধুর পরশনে ফুটিয়াছে ফুলরাশি,
ছুটিয়াছে সুধাস্রোত বিহঙ্গগলায়।
আকাশের নীলিমায় ভাসিতেছে কি মাধুরী,
ভাসিতেছে কি মাধুরী বসুধা শ্যামায় !
কি মাধুরী চন্দ্রকরে, কি মাধুরী সরোবরে,
বহিতেছে কি মাধুরী তটিনীধারায় !
বসন্ত-পরশে বিশ্বে ভাসিতেছে কি পুলক,
সাধকের দেহে যেন দেব-পরশনে !
বিশ্বের হৃদয়ে যেন হইয়াছে সঞ্চারিত
নির্ব্বাণের মহাসুখ বসন্তের সনে ;
পথে নির্ব্বাণের স্রোতে ভাসাইয়া বহু রাজ্য
আসিলেন বুদ্ধদেব কপিলনগরে,
নগর-বাহিরে বনে রহিলেন শিষ্যসহ,
ছুটিল নগরবাসী আকুল অন্তরে।
নীরব আনত মুখে, ভিক্ষাপাত্র হেম করে,
গৈরিকে আবৃত হেম-বপু জ্যোতির্ম্ময়,
জটার কিরীট শিরে, কাঞ্চন শেখরে যেন
হইয়াছে শরতের মেঘের উদয়।

খচিত স্ববর্ণ যানে, রতন মুকুট শিরে,
মণ্ডিত রতনজালে যে নগরে হায়।
বেড়াইত রাজপুত্র, আজি এই দীন বেশে
ভিক্ষা করি দ্বারে দ্বারে ভ্রমিছে তথায়।
নগরের নরনারী কাঁদিয়া আকুল শোকে
বেষ্টিয়া ভিক্ষুকে, ভিক্ষা কে দিবে তাঁহারে ?
নরনারী-অশ্রুজলে ভিজিতেছে ভিক্ষা-পাত্র,
হইল কপিলবস্তু পূর্ণ হাহাকারে।
অতি বৃদ্ধ নরপতি দাঁড়াইয়া রাজদ্বারে
দেখিছেন এ পবিত্র শোক-অভিনয়,
অচল হৃদয়-যন্ত্র, অচল নিষ্প্রভ নেত্র,
বহিতেছে ধীরে ধীরে অশ্রুধারাদ্বয়।
স্থগম্ভীর পাদক্ষেপে ধীরে ধীরে অতি ধীরে
প্রীতির পবিত্র মূর্ত্তি আসিলে দুয়ারে,
চাপিয়া রাখিতে আর না পারিয়া শোকোচ্ছ্বাস,
রোদন করিয়া বৃদ্ধ কহিলা কুমারে—
"সিদ্ধার্থ!—সন্ন্যাসি!—প্রভু! কেন ভিক্ষা পথে পথে ?
এই ক'টি সন্ন্যাসীর যোগাতে আহার
অক্ষম কি শুদ্ধোদন ?" গৌতম বিনীতকণ্ঠে
কহিলেন—"মহারাজ! বংশের আমার
এই ভিক্ষাবৃত্তি ধর্ম্ম।" চাপি শোক শুদ্ধোদন
কহিলেন—"আমাদের গৌরব জনম
রাজবংশে,—সূর্য্যবংশে; কেহ ত কখন আর
করে নাহি এই বংশে ভিক্ষা আচরণ।"
আবার বিনীতকণ্ঠে কহিলেন বুদ্ধদেব—
"মহারাজ! রাজবংশে জন্ম আপনার।

দীন ভিক্ষাব্যবসায়ী পূর্ব্ব বুদ্ধদের বংশে
যোগবলে জন্ম আমি লভেছি আবার।
দুর্ল্লভ পৈতৃক ধন পাইয়াছি আমি যাহা,
আনিয়াছি প্রীতিভরে দিতে উপহার।"
প্রসারিত ভিক্ষাপাত্র নৃপতি লইয়া করে,
চলিলেন অন্তঃপুরে লইয়া কুমার।
নবীন সন্ন্যাসী ধীরে আসিছেন অন্তঃপুরে,—
কহিলেন প্রজ্ঞাবতী শোকে উচ্ছ্বসিত,—
"হায়! নৃপতির করে এইরূপে ভিক্ষাপাত্র
দিলেন বিধাতা!"—রাণী হইলা মূর্চ্ছিত।
বসি বুদ্ধ ধরাতলে, অঙ্কেতে মূর্চ্ছিতা মাতা,
ডাকিলেন "মা! মা!" বলি কণ্ঠে করুণার।
মায়ের ভাঙ্গিল মূর্চ্ছা, ধীরে মেলিলেন আঁখি,
কহিলেন স্বপ্নে যেন—"হৃদয়ে আমার
কে ঢালিল এই সুধা, কে ডাকিল মা মা বলি
আমার সিদ্ধার্থ মত, এ ছল কাহার?
সাত বর্ষ, সাত যুগ, যেই ভীম দাবানল
জ্বলিছে আমার এই বুকে অনির্ব্বাণ,
তাহাতে অমৃত-বারি কে ঢালিল মা মা বলি,
আসিল কি পুত্র মোর জুড়াইতে প্রাণ?
এ যে সিদ্ধার্থের কণ্ঠ, এ যে সিদ্ধার্থের মুখ,
সিদ্ধার্থের স্নেহভরা যুগল নয়ন,
যশোদা দুঃখিনী আমি, কে চিনিতে পারে আর
সেই চোক সেই মুখ আমার মতন?
কে তুমি কহ না, দেব! আমার পুত্রের রূপ
ধরিয়া আসিলে তুমি ছলিতে আমায়?

আমার অনাথা বধূ, যৌবনে যোগিনী গোপা,
কে তুমি আসিলে বল ছলিতে তাহায় ?
পুত্র মোর বনে বনে কি কঠোর তপস্যায়
অনাহারে অনিদ্রায় কাটিছে জীবন,
পুত্রবধূ গৃহে বসি কি কঠোর তপস্যায়
কাটিছে জীবন পতি-ধ্যানে নিমগন।
মহারাজ ! মহারাজ ! ধ্বংস কর রাজপুরী,
ধ্বংস কর বিলাসের প্রাসাদ উদ্যান !
কুমারের বন গৃহ ! বধূর প্রাসাদ বন !—
কত দিন সবে আর মায়ের পরাণ !
না—না—এ ছলনা নহে, এ যে সিদ্ধার্থের মুখ,
সিদ্ধার্থের এই চোক, সোণার বরণ।
মহারাজ ! মহারাজ !" বসিয়া বিবশা রাণী—
"আমার সিদ্ধার্থ এ যে, এ ত দেব নয় !
ফেলে দাও ভিক্ষাপাত্র, আন রাজ-আভরণ,
তাহার এ বেশে মম বিদরে হৃদয় !"
সিদ্ধার্থ নীরব স্থির ; শুদ্ধোদন কহে শোকে—
"হায় ! রাণি ! বৃথা শোক কর পরিহার !
তোমার সিদ্ধার্থ দেখ লভিয়াছে দেবজন্ম,
দেখ নর-নারায়ণ কুমার তোমার।
তুচ্ছ রাজ-আভরণ ওই গৈরিকের কাছে,
জটার কিরীট কাছে মুকুট রাজার ;
ওই ভিক্ষাপাত্র কাছে কোন রাজকোষ আছে
করিবেক বিনিময় স্থান আপনার।
পাইয়াছে যেই রাজ্য পুত্র তব অনশ্বর,
স্থানে কালে সীমা নাহি হইবে তাহার।

পাইয়াছে যেই ধন সর্ব্বদুঃখনিবারণ,—
চাহ সেই রাজ্যে স্থান, সেই ধন আর।
লইয়াছি ভিক্ষাপাত্র, ভিক্ষাপাত্র লও তুমি,
সিদ্ধার্থ! তোমার বৃদ্ধ বৃদ্ধা পিতা মাতা
মাগে এই ভিক্ষাপাত্র, কাটিয়া মায়ার পাশ
দেও ভিক্ষাপাত্র!—পুত্র! হও পরিত্রাতা!"
"দিলাম।"—গম্ভীরে ধীরে কহিলেন বুদ্ধদেব—
"কিন্তু পিতঃ! সহিবে না সন্ন্যাস-দাহন
ওই জরাজীর্ণ-দেহে; পালিবে আদেশ মম,—
রাজসিংহাসনে হবে তোমরা শ্রামণ।"
দাঁড়াইয়া শিষ্যগণ, শাক্যরাজ-পরিবার,
চারিদিকে পুরবাসী অনুচরগণ।
কিন্তু গোপা?—কোথা গোপা? ভূতলে পাতিয়া বুক
নিজ কক্ষে পুণ্যবতী ধ্যানে নিমগন।
সখী কহে—"উঠ সখি! কত বৎসরের পরে
কুমার আসিলা ঘরে, করি দরশন
অপরূপ দেবরূপ,—কি মহিমা-বিমণ্ডিত!—
চল সখি! একবার জুড়াও জীবন।"
"না সখি!"—কহিলা গোপা অধরে আনন্দ-হাসি,—
"সফল যদিও দীর্ঘ তপস্যা আমার,
আমার হৃদয়নাথ! আসিবেন এই খানে,
এই খানে পদাম্বুজ পূজিব তাঁহার!"
সিদ্ধার্থ, সশিষ্য দুই, আসিলেন ধীরে ধীরে,
দেব অংশুমালী যথা কক্ষেতে উষার।
সভক্তি উঠিয়া গোপা দেখিল সে দেবরূপ;
হইল প্রণত পদে পড়ি দীর্ঘাকার।

দেখিলেন বুদ্ধদেব গোপার যোগিনী-বেশ,
শিরে জটাভার, অঙ্গে গৈরিক বসন।
সিংহাসনে পুষ্পাবৃত বসন ভূষণ তাঁর;
পবিত্র সন্ন্যাসক্ষেত্র বিলাস-ভবন।
নীরব নিস্পন্দ স্থির বুদ্ধদেব, শিষ্যদ্বয়;
নীরব নিস্পন্দ গোপা ধরি পদমূল,—
দিবার প্রতিমা যেন দিবাকর-পদতলে;
অষ্টম বর্ষীয় শিশু নীরব 'রাহুল'।
গোপা দেখিলেন যেন নবীন সন্ন্যাসী ধীরে
পশিলেন অন্ধকার হৃদয়ে তাঁহার,
নিবিড় তিমিরাচ্ছন্ন যেন ভগ্ন দেবালয়ে
ধীরে ধীরে চন্দ্রকর হইল সঞ্চার।
যেই রাজপুত্র-মূর্ত্তি ছিল হৃদে অধিষ্ঠিত,
হইল মোহন মূর্ত্তি ধীরে অন্তর্হিত;
সন্ন্যাসীতে রূপান্তর হইয়া সে মূর্ত্তি ধীরে,
হৃদয়ের পদ্মাসনে হইল স্থাপিত।
কিন্তু ওই শান্ত স্থির অমিতাভ দেবরূপ,
ওই নর-নারায়ণ, পতি কি গোপার!
জগতের পতি তিনি, ছুঁইতে তাঁহার পদ,
মানবী গোপার কিবা আছে অধিকার!
বুঝি তাঁর পরশনে হইতেছে কলুষিত
সে পবিত্র পদাম্বুজ,—উঠিলা শিহরি।
মনে করিলেন স্থির লইবেন অধিকার,
লভিবেন ভবার্ণবে সেই পদতরী।
সোণার পুতুল শিশু নীরব নিস্পন্দ স্থির;
বিস্ময়ের ক্ষুদ্র মূর্ত্তি রয়েছে চাহিয়া,

চুম্বিয়া ললাট গোপা, চম্পককলির পত্র,
লইলেন ধীরে রাজবসন খুলিয়া।
চিরিয়া গৈরিকাঞ্চল পরাইলা উত্তরীয়,
কেশে চারু ক্ষুদ্র চূড়া বাঁধিলা সুন্দর,
সুন্দর সন্ন্যাসী শিশু সাজাইয়া রাহুলেরে
আনন্দে কহিলা গোপা অশ্রু দরদর—
"রাহুল! পিতার কাছে মাগ গিয়া পিতৃধন!"
বিস্ময়ে জিজ্ঞাসে শিশু কাঁদ কাঁদ স্বর—
"কে আমার পিতা মা গো! আছে কি পিতা আমার?
কই ত পিতায় মা গো! দেখিনি কখন?"
অশ্রু দর দর গোপা কহিলা—"সন্ন্যাসীদেব
তোমার জনক, ওই কর দরশন!
অনন্ত অমৃত ধন আছে বৎস! তাঁর কাছে,
দিতেছেন অকাতরে নরে দয়াধার;
তোমাকে আমাকে তাহা অবশ্য দিবেন তিনি,
মাগ গিয়া পিতৃধন চরণে পিতার।"
রাহুলে লইয়া বুকে বসিলেন জানু পাতি
পতি-পদতলে গোপা, মূর্ত্তি করুণার।
রাহুল কাঁদিয়া কহে—"দেও পিতঃ! 'পিতৃধন।'"
নীরব নিস্পন্দ বুদ্ধ শিষ্যদ্বয় আর।
ছুটিয়া আসিল কক্ষে রাজপরিবারগণ,
বৃদ্ধ রাজা রাণী সহ, করি হাহকার,
আবার আবার শিশু—দেও পিতঃ! পিতৃধন!"
কহিছে কাঁদিয়া, অশ্রু বহিছে গোপার।
দিব পিতৃধন বৎস! পালিব পিতার ধর্ম্ম
দিব সপ্ত রত্ন"—বুদ্ধ কহিলা গম্ভীরে,

"সারিপুত্র ! ভিক্ষাপাত্র,—আজ্ঞা মাত্র দিল শিষ্য
পত্নী পুত্র করে পাত্র ভাসি অশ্রুনীরে।
প্রজাবতী-পুত্র নন্দ বর-বেশে সুসজ্জিত
ছিল দাঁড়াইয়া, কালি বিবাহ তাহার।
ছিঁড়িয়া সুচারু বেশ, লইয়া উন্মত্তমত
শিষ্যের গৈরিক এক, ভিক্ষাপাত্র আর,
বসিয়া গোপার পার্শ্বে, কহে—"নন্দ ভ্রাতা তব,
তাহাকে ভ্রাতার ধনে দেও অধিকার।"
নীরব নিস্পন্দ বুদ্ধ কহিলেন ধীরে ধীরে—
"পূর্ণ অধিকার নন্দ দিলাম তোমায় !
কিন্তু এ প্রতিজ্ঞা কর, বৃদ্ধ পিতা বৃদ্ধা মাতা
যত দিন নরলোকে রবেন জীবিত,
রহিবে নিকটে তুমি, পালিবে পুত্রের ধর্ম্ম,
পবিত্র নির্ব্বাণ-ধর্ম্মে হইয়া দীক্ষিত।"
কাঁদিয়া কহিল নন্দ—এমন নিষ্ঠুর কথা,
আনিও না মুখে, তুমি দয়া-পারাবার।
জীবে দয়া ধর্ম্ম তব, নন্দ বড় ক্ষুদ্র জীব,
নারায়ণ ! তারে দয়া হবে না তোমার ?
আজি হ'তে নন্দের যে তুমি পিতা, তুমি মাতা,
তুমি রাজ্য, তুমি ধন, সর্ব্বস্ব তাহার।
আছে বহু পরিজন সেবিবারে পিতা মাতা,
রবে নন্দ সঙ্গে, পদ সেবিতে তোমার।"
চাহিয়া গোপার প্রতি কহিলেন তথাগত—
"বৃদ্ধ পিতা মাতা নাহি লভেন নির্ব্বাণ
যত দিন, রবে তুমি সেবিতে চরণ গোপা !
হবে গৃহ তব পুণ্য তপস্যার স্থান।"

গোপা অবনতমুখে শুনিলেন এ আদেশ,
একটিও রেখা নাহি হ'লো রূপান্তর,
তাঁহার প্রশান্ত মুখে; কেবল লইয়া বুকে
কহিলা রাহুলে, চুম্বি ললাট সুন্দর—
"যাও বৎস প্রাণাধিক! যাও জনকের সনে,
পুণ্যের পশ্চাতে যেন সুখ নিরমল,
পতি যার নারায়ণ, পুত্র মা গো! দেবশিশু,
সিদ্ধ তার নারীজন্ম, তপস্যার ফল।"
চলিলেন বুদ্ধদেব পশ্চাতে রাহুল, নন্দ,
দাঁড়াইয়া কক্ষে সব নীরব স্তম্ভিত,
উদ্বেল উচ্ছ্বাসে শাক্য যুবা বৃদ্ধ শত শত
বুদ্ধের চরণ-প্রান্তে হইল পতিত।
যুবা বৃদ্ধ শত শত লইল নির্ব্বাণ ধর্ম্ম,
চলিল পশ্চাতে বন্যা-তরঙ্গের মত!
গোপার বিলাস-কক্ষ হইল কি মহাতীর্থ!
হইল কি বৈরাগ্যের ক্ষেত্রে পরিণত!
বন্যার কল্লোলমত ব্যাপিয়া বিশাল পুরী
ব্যাপিয়া কপিলবস্তু উঠিল রোদন;
শত শত নরনারী করিতেছে হাহাকার,
কেবল গোপার স্থির প্রশান্ত বদন।
কিছুদিন মহাযোগী থাকিয়া কপিলবনে
করিলেন প্রতিদিন পিতৃ দরশন;
কহিলেন নব ধর্ম্ম; পাইলা নির্ব্বাণামৃত
সংখ্যাতীত নর নারী, পিতা শুদ্ধোদন!

* * * *

কিছু দিন পরে বুদ্ধ শুনিলেন কৌশাম্বীতে

অন্তিম শয্যায় বৃদ্ধ নৃপতি শায়িত।
আসিয়া কপিলপুরে শাক্যকুল-শেখরবি
দেখিলেন হইতেছে ধীরে অস্তমিত।
পুত্ররূপী নারায়ণ নিরখিয়া নরপতি
অন্তিমে হইল চিত্ত শান্তিতে পূরিত,
আনন্দাশ্রু দুনয়নে, হইলেন নরপতি
অনন্ত নির্ব্বাণ-সুখে ধীরে নিমজ্জিত।
পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিলেন লোকনাথ,
ধীরে সেই চিতাবহ্নি হইলে নির্ব্বাণ,
আসি শাক্য-নারীগণ কহে কাঁদি শোকাকুলা—
"দাসীদেরে পদপ্রান্তে দেও প্রভু! স্থান।"
একে একে শাক্যগণ লইয়া সন্ন্যাসব্রত
লইয়াছে সবে নব ধর্ম্মের আশ্রয়,
অনাথারমণী-পূর্ণ হইয়াছে শাক্যপুরী,
হয়েছে কপিলবস্তু অনাথা-আলয়।
নাহি রাজা, কে করিবে ইহাদের ধর্ম্ম রক্ষা?
বুদ্ধদেব শুনিলেন ভিক্ষা করুণার।
সৃজিলেন সুপবিত্র শুদ্ধ সন্ন্যাসিনীসঙ্ঘ,
হইলেন গোপাদেবী অধিষ্ঠাত্রী তার।
মহাবন বিহারেতে রাখি শিষ্যশিষ্যাগণ,
নির্জ্জন কৌশাম্বী-শৃঙ্গে, শান্তিময় স্থান,
হইলা সমাধিমগ্ন; হইল কপিলবস্তু,
ত্রিদিবপ্রতিম শাক্য-সংসার শ্মশান।

লোক-শিক্ষা।

কৌশাম্বীর মনোহর মুকুল পর্ব্বতে,
নিরখিয়া প্রকৃতির শোভা সন্তস্নাতা,
সমেঘ-বিদ্যুৎ-বারি মণ্ডিতা ভূষিতা,
কাটাইয়া বর্ষা ধ্যানে নির্ব্বাণের সুখে
নিরজনে, চলিলেন করিতে প্রচার
নব ধর্ম্ম নব বলে পুনঃ তথাগত
নব শরতের সহ। "একনালা" গ্রামে
যাইতেছে ভরদ্বাজ ভূস্বামী ব্রাহ্মণ
বহু হল সহ ক্ষেত্রে, ভিক্ষাপাত্র করে
দাঁড়াইলা বুদ্ধদেব দুয়ারে তাহার
নতমুখে। ক্রোধে বিপ্র হইয়া অধীর
কহিল—"শ্রমণ! দেখ করিয়া কর্ষণ
বহু শ্রমে ভূমি, বীজ করিয়া বপন
উৎপন্ন করিয়া শস্য, করি আহরণ,
করি আমি আপনার জীবনধারণ।
বিনা শ্রমে এ সংসারে আহার কাহারো
নাহি মিলে। তব সুস্থ বলিষ্ঠ শরীর
বলী বলীবর্দ্দ মত, কেন অকারণে
তবে তুমি অপরের হও গলগ্রহ?
কর্ষণ করিয়া ভূমি করগে বপন,
বীজ তাহে, মিলিবেক যথেষ্ট আহার।"
বুদ্ধ অবনতমুখে উত্তরিলা ধীরে—

"ব্রাহ্মণ! আমিও ভূমি করিয়া কর্ষণ
বহুশ্রমে, তাহে বীজ করিয়া বপন,
উৎপন্ন করিয়া শস্য করি তা আহার।"
বিস্মিত ব্রাহ্মণ কহে,—"কৃষিজীবী তুমি!
দেখিতে পাই না কই চিহ্নও তাহার।
কোথায় বলদ তব, কোথা বীজ, হল?"
"বিশ্বাস আমার বীজ,"— বুদ্ধ উত্তরিলা—
"আমার শস্যের ক্ষেত্র মানব হৃদয়।
ধর্ম্ম মম হল, জ্ঞান বলদ আমার,
নির্ব্বাণ আমার শস্য অমর অক্ষয়।"
খুলিল নয়ন; পদপ্রান্তে ভরদ্বাজ
পড়িয়া মাগিল দীক্ষা, লইলা সন্ন্যাস।
একদা 'অলাবী' বনে দস্যুর কুটীরে
আছেন সমাধিমগ্ন। আসি দুরাচার
কহিল—"কে তুমি এই কুটীরে আমার?
দূর হও, নহে প্রাণ বধিব এখন।"
মেলিয়া নয়ন বুদ্ধ চাহি দস্যুপানে
চাহিলেন। "ও কি জ্যোতি নয়নে ইহার!"—
ভাবিতে লাগিল দস্যু—"নহে মানবের
এই মূর্ত্তি। দস্যু আমি হৃদয় আমার
কঠিন প্রস্তর সম, হইয়া দ্রবিত
সে পাষাণে যেন মূর্ত্তি হতেছে অঙ্কিত।"
কহিলা প্রকাশ্যে দস্যু—"সাধু তুমি যদি,
কহ মানুষের কিবা ধন শ্রেষ্ঠতম?
তাহার কি কার্য্যে সুখ? কি জীবন শ্রেষ্ঠ?
স্বাদু কিবা শ্রেষ্ঠতম? প্রশ্নের আমার

না দেও উত্তর যদি ধরি পা দু'খানি
গঙ্গার অপর পারে দিব ফেলাইয়া
ওই মাংসপিণ্ড তব।" করুণার হাসি
হাসিয়া কহিলা বুদ্ধ—"করিয়াছ তুমি
বহু জীবহত্যা ভাই! পেয়েছ কি সুখ?
পাইবে কি তাহা তবে বধিয়া আমায়?
কুটীর হইতে হায়! দুর্ব্বল নশ্বর
তব বলবান দেহ। ধ্বংস হবে দেহ
যখন আসিবে মৃত্যু, কে রবে কুটীরে?
পাপকর্ম্ম-ফল মাত্র লইয়া তোমার
যাবে তুমি একা চলি, রহিবে কুটীর।
তোমার প্রশ্নের ভাই! দিতেছি উত্তর—
ধর্ম্ম মানবের ভাই! সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধন।
ধর্ম্মপালনেই সুখ, সত্য শ্রেষ্ঠ স্বাদু,
জ্ঞানীর জীবন শ্রেষ্ঠ।" জিজ্ঞাসিল ব্যাধ—
"কিরূপে করিব জন্ম-ক্লেশ অতিক্রম?
কিরূপে হইব পার জীবন-সাগর?
কিরূপে হইব শুদ্ধ, দুঃখের অতীত?"
উত্তরিলা বুদ্ধদেব—"কর্ম্মফলে জন্ম;
কর্ম্মফলনাশে জন্ম-ক্লেশ হবে দূর।
জীবন-সমুদ্র পার হবে ধর্ম্মবলে।
চেষ্টায় হইবে তব দুঃখ তিরোহিত।
জ্ঞানলাভে হবে প্রাণ পবিত্র শীতল।"
আবার জিজ্ঞাসে ব্যাধ—লভিব কিরূপে
জ্ঞান, ধন, যশঃ, বন্ধু? কি করিলে আর
পরকালে কেমনে লভিব নির্ব্বাণ?

উত্তরিলা পুনঃ বুদ্ধ—"করিলে বিশ্বাস
ধর্ম্মে ভক্তিসহকারে পাবে জ্ঞানালোক,
কর্ত্তব্যসাধনে পাবে ধন, সত্যে যশঃ
সুপবিত্র নিরমল, পাবে বন্ধু প্রেমে।
ক্ষমা, সত্য, বদান্যতা, দৃঢ়তা, সংযম,
যে লভিবে, পরকালে দুঃখের দাহন
হবে তার নির্ব্বাপিত; করিবে সে জন
জন্ম-জরা-ব্যাধি-মৃত্যু-চক্র অতিক্রম।"
ব্যাধের হৃদয়ে ধীরে উঠিল জ্বলিয়া
জ্ঞানালোক,—দীপালোক নিবিড় আঁধারে
গৃহান্তরে; ভিক্ষুবেশ করিয়া গ্রহণ
ছুটিল সে নব ধর্ম্ম করিতে প্রচার।
একদিন বুদ্ধদেব শ্রাবস্তিনগরে
আছেন সশিষ্য বসি পবিত্র বিহারে।
মৃত শিশু বুকে কৃষ্ণাগৌতমী জননী
আসি শোকাতুরা কহে—"নর-নারায়ণ!
অতুল ঐশ্বর্য্য মম হউক অঙ্গার!
বৈজয়ন্ত সম পুরী হউক চূর্ণিত!
দেও বাঁচাইয়া মম বুকের সন্তান,
একমাত্র শিশু মম। একমাত্র ধন
চাহি তব পদে ভিক্ষা। দয়াময় তুমি
কর দয়া এ দাসীরে! আছে মা তোমার।
পুত্রহীনা মার দুঃখ কে ঘুচাবে আর?
দেহ এই ক্ষুদ্র প্রাণ! দেও দুই প্রাণ!
নহে তব পদতলে লও প্রাণ আর!"
দেখিলেন বুদ্ধদেব করুণ নয়নে

কি গভীর পুত্রশোক! ভাবিলেন মনে—
"হায়! মায়াবদ্ধ জীব কি দুঃখ দারুণ
সহে এইরূপে! সহে জন্ম-জন্মান্তরে!"
কহিলেন—"মাতঃ! জানি ঔষধ ইহার।
অচিরে করিব তব শোক নিবারণ।"
আনন্দে মায়ের প্রাণ উঠিল নাচিয়া,
শুষ্কহৃদে প্রবাহের হইল সঞ্চার।
আনন্দ-অশ্রুতে ভাসি ধূলি-ধূসরিতা
পড়িল চরণে পুনঃ আনন্দে বিবশা।
কহিলেন, বুদ্ধদেব—"উঠ মাতঃ! যাও,
আন গিয়া মুষ্টিমেয় সরিষা কেবল!"
সামান্য সরিষা! হায়! দ্বিগুণ অধীর
হইল আনন্দে প্রাণ কৃষ্ণাগোতমীর।
চলিল সে রুদ্ধ শ্বাসে; আছে স্তূপাকার
সরিষা তাহার গৃহে। কহিলেন দেব,—
"সর্ষপ সে গৃহ হ'তে আনিও কেবল,
যেই গৃহে কেহ মাতঃ। মরেনি কখন।"
মৃত পুত্র বক্ষে কৃষ্ণা মাগিল সরিষা
গৃহে গৃহে, কিন্তু হায়! মিলিল না গৃহ
যেইখানে মৃত্যু নাহি করেছে প্রবেশ,
জ্বালায়েছে শোকানল। হইল অতীত
নিষ্ফল ভিক্ষায় দিবা। ধীরে সন্ধ্যাদেবী
আসিলেন; আসিলেন ধীরে নিশীথিনী।
অবসন্না শোকাতুরা নির্জ্জন প্রান্তরে
বসিল উদাস প্রাণে। খুলিল তাহার
জ্ঞানের নয়ন ধীরে। দেখিল জগত

নিশীথিনী-ছায়া মত কৃষ্ণা ভয়ঙ্করী
মৃত্যুছায়া-সমাচ্ছন্ন। কত শত পুত্র
মরিয়াছে, মরিতেছে। কত পুত্র চিতা
জ্বলিছে মানব-বক্ষে, শত সংখ্যাতীত,
ওই মহানগরের দীপালোক মত।
ধীরে ধীরে নিশীথিনী হইল গভীর;
নিবিল সে দীপালোক। মৃত পুত্র ক্রোড়ে
উদাসিনী আছে বসি পূর্ণ আত্মহারা।
দৈববাণী মত কণ্ঠ কহিল গম্ভীরে—
"দেখ মাতঃ! হায়! ওই দীপালোক মত
মানব-জীবনালোক জ্বলি কিছুক্ষণ,
যায় মিশাইয়া পুনঃ গভীর আঁধারে
আপনার কর্ম্মফলে। কর্ম্মফলে তব
গিয়াছে চলিয়া পুত্র। যাইবে আপনি,
আপনার কর্ম্ম-চক্র কর অনুসার।"
সৌম্য দেবমূর্ত্তি কৃষ্ণা দেখিল নয়নে
আলোকিয়া অন্ধকার। দিয়া বিসর্জ্জন
মৃত পুত্র, সন্ন্যাসিনী হইল তখন।
স্থূলবুদ্ধি নব শিষ্য স্বর্ণকারে এক
কহিলেন সারিপুত্র—"চিন্ত অপবিত্র
জগতের যাবতীয় বিষয় সকল
ঘৃণিত হৃদয়ে তুমি, হইবে উজ্জ্বল
সে ঘৃণা হইতে ধর্ম্ম-অনুরাগ তব
ধূমান্তে অনল যথা।" গেল চারি মাস
শিষ্যের সে স্থূল জ্ঞান রহিল তেমন।
বুদ্ধদেব দিয়া তারে সুচারু বসন,

সুরুচি আহার আর, রাখিলেন কাছে।
এক দিন অপরাহ্ণে ভ্রমিতে ভ্রমিতে
আসিলেন রম্য এক সরোবর-তীরে।
শত শত শতদল সুনীল সলিলে
ফুটিয়াছে, ফুটিয়াছে পবিত্র হৃদয়ে
যেন শত পুণ্য-আশা। একটি তাহার
করিয়াছে সরোবর সৌন্দর্য্যে উজ্জ্বল।
বুদ্ধ কহিলেন - "বৎস! থাক নিরখিয়া
ওই ফুল্ল ফুলপানে।" নেত্রে অবিচল
রহিল চাহিয়া শিষ্য, দেখিতে দেখিতে
শুকাইল শতদল সন্ধ্যা-সমাগমে,
ঝরিতে লাগিল দল ঝরিল সকল।
কহিলেন বুদ্ধদেব—"দেখ। ভিক্ষু দেখ!
সৌন্দর্য্যের পরিণাম! পরিণাম আর
এ সুন্দর শরীরের, এই জগতের,—
অনন্ত সৌন্দর্য্যাধার! সকলি অসার!
তেয়াগিয়া অনুরাগ এই অসারের
কর সার অনুষ্ঠান, পাইবে নির্ব্বাণ।"
নয়ন লভিল ভিক্ষু। এতদিন পরে
স্থূল জ্ঞানে ধর্ম্মভাব উঠিল জাগিয়া।
 দুই শিষ্য ছোট বড় পথিক দু'ভাই।
ছোটটি নির্ব্বোধ বড়। শিক্ষা ছয় মাসে
হলো না একটি শ্লোক। দুঃখে বড় ভাই
কহিল—"তোমার কিছু হইবে না আর!
কর ত্যাগ মঠ তুমি!" কিন্তু ছোট ভাই
বৌদ্ধধর্ম্ম প্রাণ তার, ছাড়িল না মঠ।

নিমন্ত্রণে বড় ভাই আর এক দিন
নিমন্ত্রিল শিষ্যগণ ছাড়িয়া তাহারে।
মনোদুঃখে ছোট ভাই কহিতে লাগিল—
"হায়! আমি ভ্রাতৃস্নেহ হ'তেও বঞ্চিত
হইনু, কি কাজ তবে থাকিয়া এ মঠে!
হ'ব রত দান ধ্যানে হয়ে গৃহবাসী।"
একদা প্রত্যুষে মঠ যাইতে ছাড়িয়া
দেখিল সে বুদ্ধদেব দাঁড়াইয়া পথে।
কহিল চরণে পড়ি—"ভ্রাতার আদেশে
ছাড়ি মঠ যাইতেছি হইতে সংসারী।"
কহিলেন দেব—"ছোট পথিক গ্রহণ
করিয়াছ ধর্ম্ম তুমি নিকটে আমার।
ভ্রাতার কথায় কেন ছাড়িবে এ মঠ?
এস তুমি, কর বাস নিকটে আমার।"
নিয়া বাসগৃহে তাকে করুণানিদান,
শুভ্র বস্ত্রখণ্ড এক করিয়া প্রদান,
কহিলেন—"বস্ত্রখণ্ড কর সঙ্ঘর্ষণ
দুই করে, কহ আর—মলিনতা মম
চিত্তের হউক দূর!" বস্ত্রখণ্ড যত
করিল ঘর্ষণ তত হইল মলিন।
ভাবিতে লাগিল ভিক্ষু—"শুভ্র বসনের
ঘটিল হায় রে পরিবর্ত্তন কেমন!
বস্ত্র-শুভ্রতার মত হায়! পৃথিবীর
সকলি অনিত্য, হায়! সকলি অসার!"
বৈরাগ্য উঠিল ভাসি হৃদয়ে তাহার।
বুদ্ধদেব এই শুভ মুহূর্ত্তে আসিয়া

কহিলেন—"হইয়াছে কলঙ্কিত বৎস!
শুভ্র বাস, নহে তব বিষয় চিন্তার।
কাম-চিন্তা মহাপাপ কলঙ্ক বিষম
রহিয়াছে চিত্তে তব কর বিদূরিত!
ধূলি ত কলঙ্ক নহে কলঙ্ক এ কাম!
সাধু যারা এ কলঙ্ক করিয়াছে দূর।
ধূলি ত কলঙ্ক নহে কলঙ্ক এ ক্রোধ
সাধু যারা, এ কলঙ্ক করেছে মোচন।
ধূলি ত কলঙ্ক নহে, কলঙ্ক এ মোহ।
সাধু যারা এ কলঙ্ক হইয়াছে পার।"
এত দিন জড়-জ্ঞানে ছোট পথিকের
পশিল জ্ঞানের জ্যোতি, হইল উজ্জ্বল।
রাজগৃহ শৈল মূলে "কুণ্ড সপ্তধারা"।
মগধের রাজলক্ষ্মী বিম্বিসার রাণী
আসিলেন ক্ষেমাদেবী স্নান অভিলাষে।
"সপ্ত ধারা" ঢালিতেছে সুধা সপ্তধারা
নিরমল সুশীতল পুণ্যধারা মত।
উপরে বিহারে বসি ধর্ম্ম সুধারাশি
ঢালিছেন বুদ্ধদেব অনন্ত-ধারায়
নিরমল সুশীতল নরনারী প্রাণে
সংখ্যাতীত; নরনারী শত সংখ্যাতীত
লইতেছে অভিনব ধর্ম্মের আশ্রয়।
ভক্তির সে স্রোতে ভাসি রাণী আত্মহারা,
পরিহরি বহুমূল্য বসন ভূষণ
পরিয়া গৈরিক বাস হইলা দীক্ষিতা।
রাজরাণী হইলেন দীনা ভিখারিণী!

সমুদ্র-কল্লোল মত ঘোর কোলাহল
উঠিল মগধরাজ্যে, ছাইল ভারত,
হইল প্রচার-স্রোতে প্লাবন সঞ্চার।
মগধ, অযোধ্যা প্লাবি, প্লাবি পঞ্চনদ,
ভাসাইয়া দাক্ষিণাত্য, মিশিল সাগরে
প্লাবন-প্রবাহ বেগে, নিল ভাসাইয়া
শ্রুতিজাত-জীবঘাতী যজ্ঞ নিরমম।
ভ্রমিয়া প্লাবন-মুখে দেশদেশান্তরে,
উড়াইয়া তর্ক-স্রোতে তৃণরাশি মত
প্রতিযোগী-প্রচলিত নানাধর্ম্ম যত,
চতুশ্চত্বারিংশৎ বর্ষ করিয়া প্রচার
নবধর্ম্ম ; নবধর্ম্ম করিলা স্থাপিত
আসমুদ্র-হিমাচল বক্ষে ভারতের।
আসিলেন মনোহর মুকুল পর্ব্বতে
কৌশাম্বীর, ভগ্নদেহ শ্রমে অবসাদে,
বরিষার চতুর্ম্মাস করিতে যাপন।
একদিন তথাগত ডাকি শিষ্যগণে
কহিলেন—"ভিক্ষুগণ! ধর্ম্ম চক্র মম
যতনে করিয়া শিক্ষা, করিয়া সাধন,
লভ নিরবাণ সবে ; করিবা প্রচার
কর এই জগতের দুঃখের নির্ব্বাণ ;
ইহলোক পরলোক নির্ব্বাণ-সুধায়
শান্তিময় সুখময় কর মানবের।
ভিক্ষুগণ। তথাগত থাকিবে না আর
দীর্ঘকাল এ জগতে ; মাসত্রয়ে আর
হবে নির্ব্বাপিত জন্ম, লভিবে নির্ব্বাণ।

দেহ জীর্ণ, আয়ু পূর্ণ, পূর্ণ মনস্কাম,
জীবনের ব্রত,—দেও বিদায় এখন।"
বিস্মিত ব্যথিত শিষ্যমণ্ডলী অধীর,
অকস্মাৎ বজ্রাহত রহিল চাহিয়া
মৃতবৎ মুখপানে। শিষ্য প্রিয়তম
আনন্দবিষাদে কহে—"একি কথা প্রভু!
কেমনে এ সঙ্ঘ তব যাইবে ছাড়িয়া
অকালে, অনাথ করি এই ভিক্ষুগণ,
করিয়া অনাথ এই তাপিত মানব?
এখনো মানবজাতি হয়নি উদ্ধার।
সংখ্যাতীত নর নারী তৃষিত অন্তরে
চেয়ে আছে দয়াময় তব মুখপানে।
সঙ্ঘের কি সাধ্য সুধা করিয়া বর্ষণ
জুড়াবে তাদের প্রাণ? কি সাধ্য তৃণের
সাধিবে হিমাদ্রি-ব্রত? ক্ষুদ্র জলবিন্দু
মহাপারাবার ব্রত করিবে সাধন?
সঙ্ঘের কুটীর, অবলম্বন বিহীন,
আপনি পড়িবে ভাঙ্গি ভারে আপনার।
কহ দেব! এ সঙ্ঘের কি হবে উপায়?"
"আনন্দ!"—কহিলা বুদ্ধ কণ্ঠে করুণার—
"এই জীর্ণ ভগ্ন দেহ কি করিবে আর
সঙ্ঘের? আমার যাহা ছিল করিবার
করিয়াছি, আমার যাহা ছিল কহিবার
কহিয়াছি, দিয়াছি যা আছিল দিবার।
বড় ভ্রান্ত যে আমায় ভাবে সঙ্ঘ-নেতা;
আমার অধীন সঙ্ঘ, রক্ষিতে তাহায়

পারি আমি,—আমি তাহা ভাবিনি কখন।
আমার অশীতি বর্ষ বয়সের ভারে
ভাঙ্গিয়া পড়িছে দেহ! বৎস! রাখ যদি
সাবধানে ভগ্ন যান থাকে কিছু কাল;
থাকিবে এ দেহ যদি রাখি সাবধানে।
কিন্তু আমি সমাধিস্থ থাকি যতক্ষণ
থাকি সুস্থ, অসমাধি বড় ক্লেশকর।
আপনি আপন পথ, বৎস! অতএব
আপনি দেখিয়া লও, করিও না আর
নির্ভর এ ভগ্ন তৃণে। সত্যের আলোকে
তোমরা জীবন-পথে হও অগ্রসর।
সত্যকে আশ্রয় কর। আশ্রয় দ্বিতীয়
করিও না এ সঙ্ঘের। মরিবে শরীর;
মরিবে না শিক্ষা মম। সেই শিক্ষাশ্রয়
কর যদি এ সঙ্ঘের, হইবে অমর
এই সঙ্ঘ; হবে সঙ্ঘ নির্ব্বাণ-নির্ঝর"
"চলিলেন সত সত্য প্রভু কি ছাড়িয়া
ভিক্ষুগণে—এই দাসে"—উঠিল কাঁদিয়া
আনন্দ আকুল শোকে। কণ্ঠে সকরুণ
কহিলেন বুদ্ধদেব—"কহিয়াছি আমি
জন্মিলেই মৃত্যু বৎস! ফুটে যদি ফুল
শুকাইবে, জলবিম্ব উঠিলে মিশিবে।
কাহারো মৃত্যুর করে নাহি পরিত্রাণ
এই বিশ্বে, বৃথা শোক কর পরিহার।
শোকীর নির্ব্বাণে বৎস! নাহি অধিকার!"
নিভৃতে কাশ্যপে ডাকি কহিলা—"কাশ্যপ!

করিব তোমার সঙ্গে বস্ত্র বিনিময়।
তোমাতে রহিব আমি, রহিবে আমাতে
তুমি বৎস! প্রতিনিধি হইয়া আমার,
চালাইবে সঙ্ঘ তুমি।" পড়িয়া কাশ্যপ
দীনভাবে পদতলে করিল স্বীকার।
আনন্দে চলিলা কুশীনগরে তখন
বর্ষা অন্তে তথাগত লভিতে নির্ব্বাণ।
পথে চণ্ড চণ্ডালের হইলে অতিথি
দিল সে মাংসান্ন ভিক্ষা,—ভিক্ষা প্রত্যাখ্যান
নহে ধর্ম্ম শ্রমণের,—করিয়া গ্রহণ
হইয়া পীড়িত, কুশীনগরে আসিয়া
শুইলেন শালবনে অন্তিম শয়নে।
মদ্গাল্লী ও সারীপুত্র লভেছে নির্ব্বাণ।
লভেছে নির্ব্বাণ গোপা, গৌতমী, রাহুল।
দেখিলেন বুদ্ধদেব জীবলীলা শেষ—
শেষ জন্ম; ইচ্ছিলেন নির্বাণ ধীরে
আসিল পবিত্র নিশি মহানির্ব্বাণের।

---

(১৯)

মহানির্ব্বাণ।

বসন্তের পৌর্ণমাসী। নির্ম্মল আকাশে
বসন্তের পূর্ণচন্দ্র। ভাসিতেছে ধরা
নিরমল সুশীতল চন্দ্রিকা সাগরে।
অবলম্বি সুবিশাল শাল তরুবর

বসি যোগাসনে স্থির, বনদেব মত,
জটার কিরীট শিরে, মুদিত নয়ন ;
বন-অবসরে খণ্ড জ্যোৎস্না নির্ম্মল
পড়িয়াছে দেব-অঙ্গে, প্রশান্ত নয়নে,
সুবর্ণ দর্পণে যেন,—বর্ণে সুবর্ণের
উজ্জ্বল কান্তিতে বন করি সমুজ্জ্বল।
নীরবে আনন্দ বসি তৃষিত নয়নে
দেখিছে সে দেবরূপ ভক্তিতে বিহ্বল !
উন্মেষি আকর্ণ-শ্রান্ত প্রশান্ত নয়ন
চাহি ফুল্ল চন্দ্রপানে কণ্ঠে গদগদ
কহিলা—"আনন্দ ! দেখ, যদি কেহ কহে
চণ্ডের মাংসান্নে মৃত্যু ঘটিল আমার,
পাইবে সে বড় ব্যথা। কহিও চণ্ডেরে—
সুজাতার অন্নে বুদ্ধ হইলাম আমি.
লভিলাম নিরবাণ অন্নেতে তাহার
বড় পুণ্যবান চণ্ড। এই দুই জন
সিদ্ধার্থের হিতকারী সুহৃদ পরম।
যাও বৎস ! শিষ্যগণে কর সমবেত,
জীবনের শেষ কথা কহিব আমার।"
ধীরে ধীরে শিষ্যগণ হইল মিলিত,
ভক্তি বিষাদের যেই ছায়া সুগভীর
পড়িয়াছে হৃদয়েতে ভাসিছে বদনে,
হইল গভীরতর ফুল্ল চন্দ্রালোকে।
প্রণমি চরণে সবে বসিল নীরবে
চারিদিকে শান্ত স্থির, চাহিয়া নীরবে
সেই দেব মুখপানে নেত্রে অবিচল।

এখনো চাহিয়া দেব ফুল্ল চন্দ্রপানে।
সচেতন দুই চন্দ্র, পূর্ণ জ্ঞানালোকে,
চাহি স্থির অচেতন এক চন্দ্র পানে।
অচেতন চন্দ্রালোকে দীপ্ত ধরাতল,
সচেতন চন্দ্রালোকে, অনন্ত অতল।
কহিলেন শান্ত স্থির কণ্ঠে—"ভিক্ষুগণ!
পূর্ণ মম জীব-চক্র, কর্ম্ম-চক্র আর
এত জন্মে এত যুগে : আবর্ত্তিত আর
জন্ম-জরা-মৃত্যু-চক্রে হইব না ঘোর
দুঃখপূর্ণ, উপস্থিত নির্ব্বাণ আমার।
শিখাইনু যেই ধর্ম্ম, করিনু প্রচার,
অনুষ্ঠিয়া ভক্তিভরে, শিখাইয়া নরে,
লভিও নির্ব্বাণ-সুধা : নির্ব্বাণ-সলিলে
ভাসাইও পরিতপ্ত এই ধরাতল।
সে মহানির্ব্বাণ-ধর্ম্ম সংক্ষেপে এখন
কহিব—জীবন শেষ, শক্তি মম শেষ,—
জীবনের শেষ শিক্ষা, শেষ কথা মম
নির্ম্মল হৃদয়-পটে কর মুদ্রাঙ্কিত,
মর্ম্মর-ফলকে শ্বেত, অমর অক্ষরে।
শ্রুত এই মহাগ্রন্থ, হৃদয়ে অঙ্কিত,
হবে তোমাদের শ্রুতি; তোমাদের স্মৃতি,
স্মৃতিশাস্ত্র এ ধর্ম্মের; এ ক্ষুদ্র নির্ঝর
হবে কালে পরিণত মহাপারাবারে
প্লাবি এই ধরাতল নির্ব্বাণ-সুধায়।"
নীরব নিস্পন্দ বন, নিস্পন্দ নীরব
ধরাতল,চরাচর; নিস্পন্দ নীরব

বহিতেছে বসন্তের শান্ত সমীরণ।
নীরব গগনে শশী, নক্ষত্র নীরব,
নীরব প্রকৃতি নৈশ, হৃদয় নিশ্চল,
শুনিতে নির্ব্বাণ-ধর্ম্ম নির্ব্বাণসময়ে
নির্ব্বাণ-দাতার মুখে,—নির্ব্বাণ নির্ঝর।
কভু চন্দ্রপানে চাহি, কভু শিষ্যপানে,
মহিমা-মণ্ডিত মুখে, শান্ত দুনয়নে,—
জ্ঞান-দীপ্ত সুধাকর,—লাগিলা কহিতে
নারায়ণ দেব-কণ্ঠে, করিয়া প্লাবিত
নৈশ নীরবতা শান্ত পবিত্র সঙ্গীতে,
জ্ঞানালোকে চন্দ্রালোক করি সমুজ্জ্বল।

১

"কে সৃজিলা এই বিশ্ব ? সৃজিলা কেমনে ?—
ভিক্ষুগণ ! জ্ঞানাতীত জগতকারণ।
তর্জ্জনী ক্ষেপণ করি, মহাপারাবার
চাহিও না পরিমাণ করিতে কখন ?

২

"কেন এই বিশ্ব ? বিশ্ব আদি কি অনাদি ?
ভিক্ষুগণ ! চাহিও না জানিতে কখন।
কেন আমি নর ? আমি আদি কি অনাদি ?—
নাহি জানি, কি জানিব বিশ্বের কারণ !

৩

"যে করে এ প্রশ্ন, আর যে দেয় উত্তর,—
জানিও উভয় ভ্রান্ত। যুগ যুগান্তর,—
পারে নাহি নর-জ্ঞান করিতে উত্তর।
পারিবে না নর-জ্ঞান যুগযুগান্তর।

৪

"প্রচ্ছন্ন সে মহাতত্ত্ব মানব-নয়ন
দেখিবে না। আবরণ পর আবরণ
মানবের জ্ঞানবলে হবে উত্তোলিত ;
রবে তবু আবরণ পর আবরণ।

৫

"এই দেখি—আছি আমি, আছে চরাচর,
সংখ্যাতীত চন্দ্র সূর্য্য, গ্রহ সংখ্যাতীত।
সংখ্যাতীত সম্মিলিত জড় ও চেতন
হইতেছে নিত্য কর্ম্ম-চক্রে আবর্ত্তিত !

৬

"এই দেখি—চক্রাকারে ভ্রমে ঋতুগণ ;
ভ্রমে দিবা নিশি পক্ষ ; গ্রহ সংখ্যাতীত
চক্রে চক্রে মহাশূন্যে করিছে ভ্রমণ,
করিয়া অনন্ত মন্ত্রে অনন্ত প্লাবিত।

৭

"এই দেখি—জন্মে চক্রে বীজেতে অঙ্কুর,
অঙ্কুরেতে বৃক্ষ, বৃক্ষে ফুল, ফুলে ফল,
ফলে পুনঃ বীজ ; জলে জন্মে বাষ্পরাশি,
বাষ্পে জন্মে মেঘ, পুনঃ মেঘ হয় জল।

৮

"হইতেছে মহাচক্রে নিত্য আবর্ত্তিত
জড়-চেতনের সিন্ধু অনন্ত অতল ;
এই মহাসিন্ধু-গর্ভে বিশ্ব চরাচর
জলবিম্ব মত উঠি' হইতেছে জল।

৯

"এই দেখি—চক্রে জীব জন্মি নিরন্তর
সেই মহাসিন্ধু-গর্ভে আবর্ত্তনময়,
করি জরা-ব্যাধি-ভোগ দুঃখ নির্যাতন,
সেই মহাসিন্ধু-গর্ভে হইতেছে লয়।

১০

"এই চক্র ধর্ম্ম-চক্র। এই আবর্ত্তন
জগতের মহাধর্ম্ম। সৃষ্টি স্থিতি লয়
হইতেছে সংঘটিত এই আবর্ত্তনে
নিরন্তর, সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তিময়।

১১

"এই ঘোর আবর্ত্তনে পড়ি জীবগণ
সহিছে অশেষ দুঃখ, জন্ম-ব্যাধি-জরা-
মরণের লৌহ-করে জন্মজন্মান্তর,
করিতেছে হাহাকার ব্যাপী এই ধরা।

১২

"অতএব ভিক্ষুগণ! হৃদয়ে অঙ্কিত
কর চারি আর্য্য-সত্য অমর রেখায়—
আছে দুঃখ,—আছে এই দুঃখের কারণ,—
দুঃখের নিরোধ আছে, নিরোধ উপায়।

১৩

"আছে দুঃখ—হায়! এই মানব-জীবন
দুঃখের প্রবাহ ক্ষুদ্র। দুঃখ জনমের,
দুঃখ শৈশবের, ঘোর দুঃখ যৌবনের
দুঃখ জরা-বার্দ্ধক্যের, দুঃখ মরণের।

১৪

"মানব-জীবন নহে-ঝটিকা আশার,
নিরাশার মেঘমালা, মন্দ্র বেদনার,
বিয়োগের অশ্রু, বজ্রক্রীড়া বিপদের,
অশান্তির অতৃপ্তির ঘোর হাহাকর।

১৫

"সৌন্দর্য্যে, ঐশ্বর্য্যে বীর্য্যে, গৌরবে ও প্রেম
কোথা তৃপ্তি ? হায় মৃগতৃষ্ণিকা কেবল !
যত পাই তত চাই ; প্রাণে অনিবার
আকাঙ্ক্ষার অতৃপ্তির ঘোর দাবানল।

১৬

"কেন এই দুঃখ ? কিবা কারণ তাহার ?
কেন জীব সহে এত দুঃখ ঘোরতর ?
দুঃখের কারণ জন্ম। না হলে জনম
সহিত না জীব এত দুঃখ নিরন্তর।

১৭

"কেন জন্ম ? কি কারণে জন্মে জীবগণ
সংখ্যাতীত রূপে, সংখ্যাতীত অবস্থায় ?
ভিক্ষুগণ। কর্ম্মফল জন্মের কারণ,
কর্ম্মফলে অবস্থার রূপান্তর হায় !

১৮

"সুরাসুর, নর এই বিশ্বচরাচর
সকলেই কর্ম্মরত, জড় ও চেতন।
কর্ম্মফলে কেহ সুর, কেহ বা অসুর,
কেহ নর, কেহ কীট ঘৃণিত অধম।

১৯

"কর্ম্মফলে কেহ এই ধরার ঈশ্বর,
কেহ দীন হীন পথে পড়ি অনশন;
কেহ জ্ঞানী, কেহ মূর্খ; কেহ কদাকার,
কেহ মনোমুগ্ধকর রূপে অনুপম।

২০

"পাবে পশুজন্ম, কর কর্ম্ম পশুমত;
পাবে দেবজন্ম কর কর্ম্ম দেবোপম;
সুরলোকে কর কর্ম্ম অসুরের মত,
অসুর, তির্য্যক, জন্ম করিবে গ্রহণ!

২১

"ভিক্ষুগণ! সতে সত, অসতে অসত,
এই বিশ্বে জলে করে আকর্ষণ জল।
পুণ্যকর্ম্ম পুণ্য-জন্ম, পাপ-জন্ম পাপ,
সমযোনি আকর্ষণ করে কর্ম্মফল।

২২

"জগতের এই নীতি,—করিবে রোপণ
যেইরূপ বীজ, ফল ফলিবে তেমন।
শস্যে শস্য; আম্রে আম্র; মাকালে মাকাল;
কুবীজে সুফল নাহি ফলিবে কখন।

২৩

"অতীতের কর্ম্মফলে লভিয়া জনম,
বর্ত্তমান কর্ম্মফলে করে রূপান্তর
অতীতের কর্ম্মফল; রূপান্তর ফলে
লভে ভাবি-জন্ম, উচ্চ কিংবা নীচ, নর।

২৪

এইরূপে কর্ম্মফলে জন্মজন্মান্তরে
অনন্ত অসংখ্য যোনি করিয়া ভ্রমণ
সহে জীব দুঃখ ঘোর; নাহি সাধ্য কারো
এই কর্ম্মফল-ভোগ করিবে বারণ।

২৫

"গ্রহ-উপগ্রহ-গতি অলঙ্ঘ্য যেমন,
অলঙ্ঘ্য জলের যথা ভাটা ও জোয়ার,
অলঙ্ঘ্য যেমন দিবা-নিশি-বিবর্ত্তন,
এই কর্ম্মফল-গতি অলঙ্ঘ্য অপার।

২৬

"বুঝিলে কি ভিক্ষুগণ! জন্ম কর্ম্মফলে,
কিন্তু কেন কর্ম্ম? কর্ম্ম করি কি কারণ?
কর্ম্মের কারণ,—সুখতৃষ্ণা দুর্নিবার।
সুখ-আকাঙ্ক্ষায় করে কর্ম্মে নিমগন।

২৭

"নির্ম্মম নিদাঘ-তাপে প্রতপ্ত কৃষক,
শীতল মর্ম্মর-হর্ম্ম্যে ধরার ঈশ্বর,
বণিক সমুদ্র-গর্ভে, রণ-গর্ভে বীর,
সুখের তৃষ্ণায় কর্ম্মে রত নিরন্তর

২৮

"পশু, পক্ষী, কীট, স্থলচর, জলচর,
আহারের আশ্রয়ের করি নিরন্তর
অন্বেষণ ভ্রমিতেছে সুখ আকাঙ্ক্ষায়;
সুখ আকাঙ্ক্ষায় হিংসা করে পরস্পর।

২৯

"কেন এই সুখ-তৃষ্ণা ? জীবের হৃদয়ে
এই সুখ-তৃষ্ণা কিসে হয় সঞ্চারিত ?
সুখ-দুঃখ-অনুভব তৃষ্ণার কারণ।
সুখে তৃপ্ত হয় মন, দুঃখেতে ব্যথিত।

৩০

"জগতের সহ মন-ইন্দ্রিয়-সংযোগ
এই অনুভব-হেতু। না জানে উন্মাদ
সুখ দুঃখ ; নাহি শুনে বধির সঙ্গীত
সুমধুর ; জিহ্বা-হীন নাহি জানে স্বাদ।

৩১

"কেন জগতের সহ হয় এ সংযোগ
মন ইন্দ্রিয়ের নিত্য ?—আছে, ভিক্ষুগণ !
জগতের রূপ, রস, গন্ধ মনোহর ;
মন ও ইন্দ্রিয় তাহে করে আকর্ষণ।

৩২

কেন চাহি ওই নারী—বড় রূপবতী,
করিয়েছে রূপে মন ইন্দ্রিয় মোহিত।
কেন চাহি ওই ফল ?—রসে সুধাময়।
কেন চাহি ওই ফুল ?—সুগন্ধ-পূরিত।

৩৩

"সত্যই কি রূপ তবে আছে রমণীর ?
ফলে রস, ফুলে গন্ধ ?—নাহি জানি আমি।
উন্মাদের নাহি রূপ-রস-গন্ধ-জ্ঞান,
আমার হ'তেছে জ্ঞান, এই মাত্র জানি।

৩৪

"কেন হয় হেন জ্ঞান ?—আছে সংস্কার
জন্মগত, জাতিগত। যে মাংস আমার
ঘটাইল এই মৃত্যু ; পরম দুর্লভ
চণ্ডাল চণ্ডের তাহা, সুস্বাদু আহার।

৩৫

"জাতিভেদে, জীবভেদে কত রূপান্তর
রূপ-রস-সুগন্ধের এই সংস্কার।
অতএব নহে সত্য রূপ, গন্ধ, রস ;
ভ্রান্তিবশে ভাবি সত্য, মোহে অবিস্তার।

৩৬

"বুঝিলে কি ভিক্ষুগণ! দুঃখের কারণ
এই ভ্রান্তি ; এইভ্রান্ত রূপ-রস-জ্ঞান
উপজি সুখের তৃষ্ণা, করে কর্ম্মে রত
কর্ম্মফলে জন্ম ; জন্ম দুঃখের নিদান।

৩৭

"এই ভ্রান্তি হ'লে দূর হবে তোমাদের
দুঃখের নিরোধ, জন্ম হইবে না আর।
কিসে দূর হবে ভ্রান্তি ?—আছে কোন পথ
এ ভ্রান্তি হইতে নর লভিতে উদ্ধার ?

৩৮

আছে অষ্ট পথ—শুদ্ধ দৃষ্টি নিরমল,
সত্য বাক্য, সুসঙ্কল্প, সাধু ব্যবহার,
পুণ্য কর্ম্ম ; সাধু উপজীবিকা সুন্দর,
শুদ্ধ স্মৃতি, অবিচল সত্য ধ্যান আর।

৩৯

"হিংসা চৌর্য্য, পিশুনতা, যথেচ্ছা আচার,
মিথ্যাচার পরুষতা, বিরুদ্ধভাবিতা,
মিথ্যা মনোযোগ, মিথ্যা দৃষ্টি, প্রাণি-বধ,—
এই দশ শীলা জন্মদুঃখপ্রসবিতা।

৪০

"ভিক্ষুগণ! এক দিকে ইন্দ্রিয়ের সুখ,
অন্যদিকে ব্রহ্মচর্য্য দেহ-নিষ্পীড়ন
পরিহরি, মধ্যপথ করি অনুসার,
কার অষ্টপথে চিত্ত-নৈর্ম্মল্য সাধন,

৪১

"হও ধ্যানে অগ্রসর। ভাতিবে "বিবেক,"
উঠিবে ধ্যানের যবে প্রথম সোপানে,
হইবে অবিদ্যা দূর, দেখিবে তখন
কি অনিত্য, কিবা নিত্য অলৌকিক জ্ঞানে।

৪২

"উঠিবে ধ্যানের যবে দ্বিতীয় সোপানে,
হইবে "একোতিভাব।" অনন্ত সত্ত্বার
দেখিবে প্রবাহ-লীলা! প্রবাহে প্রবাহে
হইতেছে উর্ম্মিমত জন্ম বারংবার।

৪৩

"বহুজন্ম হবে জ্ঞান বহু পুষ্প মত,
একই সত্ত্বার সূত্রে গাথা পুষ্পহার,
জন্মান্তর কর্ম্মফলে; ফল রূপান্তরে
বিভিন্ন যোনিতে জন্ম বিভিন্ন প্রকার।

৪৪

"আরোহিলে সমাধির সোপানে তৃতীয়
জন্মিবে উপেক্ষা জড়ে ; হবে বিদূরিত
সুখ-দুঃখ জ্ঞান ; আত্মা অস্পন্দ অক্রিয়,—
'উপেক্ষক,' হবে পূর্ণ আসক্তি-অতীত।

৪৫

"আরোহিলে সমাধির সোপানে চরম,
হইবে নির্ব্বাণ তব অহঙ্কার-জ্ঞান ;
হইবে নির্ব্বাণ জন্ম-মৃত্যু-আবর্ত্তন ;
হবে বুদ্ধ ভিক্ষুগণ ! লভিবে নির্ব্বাণ।

৪৬

"কর্ম্ম নাই, জন্ম নাই, নাহি মৃত্যু আর !
সুখের তৃষ্ণায়, দুঃখ তাড়নায় আর,
নহে বিচলিত ; আত্মা শান্তাকাশ মত
অনন্ত, অসীম, শান্ত, শান্তি-পারাবার !

৪৭

"নির্ব্বাণের পথে সঙ্ঘ দিকপ্রদর্শক।
ভিত্তি ধর্ম্ম-চক্র ; চারি অক্ষর প্রাচীর
চারি আর্য্য সত্য ; অষ্ট স্তম্ভ অষ্ট পথ ;
সাধনার দুইকক্ষ— ভিক্ষু ভিক্ষুণীর।

৪৮

"ঊর্দ্ধে উচ্চ চারি তল,—চারি সমাধির।
শিরে পূর্ণচন্দ্রনিভ চূড়া সুদর্শন,—
নির্ব্বাণ সুধার সিন্ধু,—দেবলোকাতীত
শান্তির তুষিতস্বর্গ বুদ্ধ-নিকেতন।

৪৯

"বুদ্ধ, ধর্ম্ম, সঙ্ঘ—এই ত্রিরত্নে শরণ
লও ভিক্ষুগণ! লভ নিরবাণ আর!
পশিয়া গহন বনে ভূধরে সাগরে
বুদ্ধ, ধর্ম্ম, সঙ্ঘ, কর নির্ব্বাণ প্রচার।"

নীরব পূর্ণিমা-নিশি; নিস্পন্দ নীরব
ঊর্দ্ধে পূর্ণচন্দ্র, নিম্নে সুপ্ত ধরাতল।
ফুরাইল শেষ কথা; ধীরে বুদ্ধদেব
হইলা নীরব, ধীরে মুদিলা নয়ন।
ভিক্ষুগণ এককণ্ঠে ভক্তি-উচ্ছ্বসিত
গাইল, সে মহাবন করিয়া ধ্বনিত—
"বুদ্ধং মে শরণম্।
ধর্ম্মং মে শরণম্।
সঙ্ঘং মে শরণম্।"
মহাকথা, মহাকণ্ঠ, শান্ত সুগভীর
নৈশ নীরবতাসহ মিশাইল ধীরে।
মিশাইল ধীরে পুণ্য-জ্যোৎস্নার সহ
নির্ম্মল উজ্জ্বলতর পূর্ণ জ্ঞানালোক;—
সমাধিস্থ বুদ্ধদেব লভিলা নির্ব্বাণ।
মহাতরু-তলে মহামূর্ত্তি নির্ব্বাণের
সমাধিস্থ, উদ্ভাসিত মহামহিমায়
পূর্ণিমার নিশীথের ফুল্ল চন্দ্রকরে,
হইল স্থাপিত যেন মহা যোগাসনে।
বসন্তের সমুজ্জ্বল পূর্ণচন্দ্র-কর
হইল উজ্জ্বলতর, শান্তির অমৃত

ভাসিল সে চন্দ্রকরে, চলিল বহিয়া
বসন্তের নৈশানিলে, উঠিল ভাসিয়া
চন্দ্রদীপ্ত গগনের নৈশ নীলিমায়,
বসন্তের চন্দ্রদীপ্ত শ্যামল ধরায়।
শিষ্যগণ এককণ্ঠে ধ্বনিল—"নির্ব্বাণ!"
ধ্বনিল "নির্ব্বাণ" স্থির স্তব্ধ শালবন।
"নির্ব্বাণ" ধ্বনিলা শশী, নৈশ নীরবতা।
ধ্বনিল অনন্ত বিশ্ব—"নির্ব্বাণ! নির্ব্বাণ!"
মহাশোকে পরিপূর্ণ হইল হৃদয়
শিষ্যদের—সেই শোক শান্ত, সুগভীর,—
অবাত বিক্ষুব্ধ সিন্ধু। একে, একে, একে
শিষ্যগণ ধীরে ধীরে আসিয়া নিকটে
করিল প্রণাম শেষ, করিল গ্রহণ
শেষ পদধূলি, আর সে দেব-মূরতি
নিরখিল শেষ এই জনমের মত।
ধূনিত কার্পাসে নব করিয়া আবৃত,
সুসিক্ত সুরভি তৈলে, করিল স্থাপিত
দেব-দেহ সুচন্দন কাষ্ঠের চিতায়।
অস্ত গেল পূর্ণচন্দ্র মিতাভ নশ্বর;
অস্ত গেলা আলোকিয়া অশীতি বৎসর
পূর্ণচন্দ্র অমিতাভ ধর্ম্ম জগতের।
শিষ্যগণ, ভারতের নৃপতিমণ্ডল,
পুষ্পাবৃত ভস্মরাশি করিলা স্থাপিত
দেশদেশান্তরে; দন্ত করিলা স্থাপিত
সিন্ধুর অপর পারে সিংহলের পতি,
মন্দির গগনস্পর্শী করিয়া নির্ম্মাণ।

অনন্ত মর্ম্মর-কাব্যে সেই দেবলীলা
ভারতের অঙ্কে অঙ্কে হ'ল প্রতিষ্ঠিত,
মানবের মহাতীর্থ, জগত-বিস্ময়।
যাও দেব! লীলা শেষ। এসেছিলে তুমি
একবার যমুনার তীরে পুণ্যবতী,—
দেখিয়াছি সেই লীলা কোমল কঠোর!
আসিলে আবার তুমি কপিলনগরে
শৈলপতি হিমাদ্রির পুণ্য পাদমূলে,—
দেখিলাম এই লীলা আত্মবিসর্জ্জন,—
রাজপুত্র মহাযোগী! আসিলে আবার
সরল মানব-শিশু জর্দ্দানের তীরে,—
দেখিয়াছি সেই লীলা আত্ম-বলিদান।
আরবের মরুভূমে, অমৃত-নির্ঝর
আবার আসিলে তুমি,—নাহি ভাগ্য মম
দেখিব সে লীলা তব। আসিয়া আবার
পতিতপাবনী-তীরে পতিতপাবন
পাষাণ করিলে দ্রব প্রেম-অশ্রুজলে।
ভাসি প্রেম-অশ্রু-জলে, বড় সাধ মনে,
দেখিবে কাঙ্গাল কবি সে লীলা করুণ,
প্রেমময়! এই আশা করিও পূরণ!

সমাপ্ত।

সূচনা।

—*—

সকল ধর্ম্মের ভিত্তিভূমি অবতারবাদ। ঈশ্বরের পুত্রই বল, [illegible] বল, সকলই ঈশ্বর হইতে [illegible] —— ঈশ্বরের অবতার। ভগবান শ্রীকৃষ্ণোক্ত অবতার-তত্ত্ব এইরূপঃ—

যখন যখন ঘটে, ভারত। ধর্ম্মের গ্লানি,
অধর্ম্মের অভ্যুত্থান, আপনাকে সৃজি [illegible]মি।
সাধুদের পরিত্রাণ. বিনাশ দুষ্কৃতদের,
করিতে সাধন.
স্থাপন করিতে ধর্ম্ম, করি আমি যুগে যুগে
জনম গ্রহণ।

গীতা ৪— ৭।৮

ভগবান শ্রীখৃষ্টোক্ত অবতার-তত্ত্ব এইরূপ—

"জাতিতে জাতিতে"— যিশু কহিলা উত্তর—
রাজ্যে রাজ্যে, ঘটিবেক রণ ঘোরতর।
ভূমিকম্প, মারিভয় দুর্ভিক্ষ্য অনল
ছাইবেক স্থানে স্থানে অবনী মণ্ডল।
তোমরা হইবে হত, স'বে অত্যাচার,
হইবে আমার তরে ঘৃণার আধার।
তবে নর পরস্পরে হবে হিংসান্বিত,
করিবে বিশ্বাস ভঙ্গ, হইবে ঘৃণিত।
হবে লোক মিথ্যাধর্ম্ম-শিক্ষকে বঞ্চিত,
অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব, প্রেম নির্ব্বাপিত।

ধ্বংসের ঘৃণিত মূর্ত্তি যবে দেবালয়
বিরাজিবে আসিবেন মানব-তনয়।

মেথু, ২৪ অ ৭—২৭।

অতএব কৃষ্ণোক্তি ও খৃষ্টোক্তিতে কিছুই বিভিন্নতা নাই। কই, ইহাতে এমন ত কিছু নাই যে কৃষ্ণোক্ত অবতার কেবল ভারতবর্ষে এবং খৃষ্টোক্ত মানব-তনয় কেবল ইহুদি দেশে জন্ম গ্রহণ করিবেন। এতৎ সম্বন্ধে মহম্মদের মত কি জানিনা। বোধ হয় তিনিও এমন কিছু বলেন নাই যে ঈশ্বরের দূত কেবল আরব দেশেই আবির্ভূত হইবেন। কৃষ্ণ এবং খৃষ্ট উভয়েরই মতে যখন যেখানে ধর্ম্মের অধঃপতন এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান ঘটিবে, তখন সেখানে ঈশ্বরের অবতার জন্ম গ্রহণ করিয়া সাধুদিগের পরিত্রাণ ও দুষ্কৃতদিগের বিনাশ সাধন করিয়া ধর্ম্ম সংস্থাপন করিবেন। ঠিক এরূপ অবস্থাতেই বর্ত্তমান জগতের ধর্ম্মগুরু সকল—কৃষ্ণ ও বুদ্ধদেব ভারতে, খৃষ্ট ইহুদি দেশে, মহম্মদ আরবে এবং চৈতন্যদেব বঙ্গদেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অতএব সকল ধর্ম্মাবলম্বীরা যে কেন এই মহাপুরুষদিগকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া মানিবেন না, তাহা একবার চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। অন্ধ, জড়বুদ্ধিসম্পন্ন মানবের এই এক ভ্রান্তিতেই জগত আজি পর্য্যন্ত ধর্ম্মবিদ্বেষে পরিপূর্ণ। এই এক ভ্রান্তি নিবন্ধনই পৃথিবী কতবার নরশোণিতে প্লাবিত হইতেছে, এবং ধর্ম্ম কি ঘোরতর অধর্ম্মে পরিণত হইতেছে। হায়! ধর্ম্মের প্রকৃত অর্থ কি, মানুষ কি তাহা কখনই বুঝিবে না?

যদি কিঞ্চিন্মাত্রও কেহ বুঝিয়া থাকে তবে ভারতীয় আর্য্য-ধর্ম্মাবলম্বীরা। ইহাদের ধর্ম্মের একটী আদি মন্ত্র—

"যে যথা আমাকে চাহে, তাকে তথা ভজি আমি।
পার্থ! সর্ব্বরূপে নর মম পথ অনুগামী।"

গীতা ৩—১১।

তাঁহারা কোন ব্যক্তি বিশেষের ধর্ম্মমত অনুসরণ করেন না। অতএব তাঁহাদের ধর্ম্মের নাম নাই। তাহার একমাত্র প্রকৃত নাম মানব-ধর্ম্ম। সত্যই ইহার প্রাণ, মনুষ্যত্ব ইহার লক্ষ্য। মনস্বী মানব মাত্রই ইহার শিক্ষক, সর্ব্ব অবস্থার মানবই ইহার অধিকারী! শিক্ষিত, অশিক্ষিত, সকলেরই মনুষ্যত্বপথে অগ্রসর হইবার জন্য অবস্থানুযায়ী সোপানশ্রেণী নিয়োজিত রহিয়াছে। কৃষ্ণোক্ত অবতার তত্ত্বানুসারে কৃষ্ণ, বুদ্ধ, খৃষ্ট, মহম্মদ, চৈতন্য সকলই আর্য্যধর্ম্মাবলম্বীদের কাছে অবতার স্বরূপ পূজনীয়।

এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া আমি মেথু-প্রণীত খৃষ্ট-মাহাত্ম্য হইতে সংক্ষেপে খৃষ্টদেবের সরল ভক্তিপ্রাণ জীবনী ও ধর্ম্ম উদ্ধৃত, ও কবিতায় অনুবাদিত, করিয়া প্রকাশ করিলাম। অবশিষ্ট ধর্ম্মগুরু চতুষ্টয়ের এরূপ জীবনী প্রকাশ করিবার আশা রহিল। তাহা পূর্ণ হইবে কি না তাঁহারাই জানেন।

খৃষ্ট।

১ম অধ্যায়।

ইহুদি প্রদেশে জন্মিলা "জোসেফ",
ভার্য্যা "মেরী" শুদ্ধমতী।
স্বামীর সহিত না হ'তে মিলন,
হইলেন পুত্রবতী।
ন্যায় পরায়ণ জোসেফ তখন
চিন্তিলেন মনে মনে,
লোক কলঙ্কিনী না কা'র তাঁহাকে
বর্জ্জিবেন সঙ্গোপনে।
এমন সময়ে ঈশ্বরের দূত
কহিল স্বপনে তাঁয়—
"করিওনা ভয় করিতে গ্রহণ
জোসেফ তব ভার্য্যায়।
পরমাত্মা জাত হবে পুত্র তাঁর,
রেখো তাঁর যিশু নাম,
মানব সকল পাপ হতে তিনি
করিবেন পরিত্রাণ।"

জাগিলা জোসেফ, পালিলা দূতাজ্ঞা,
নিলা ভার্য্যা পুণ্যবান।
গেলা বেৎলেহেম নগরে সভার্য্য
করিতে রাজস্ব দান।
দীন সূত্রধর,— মিলিলনা স্থান
পান্থশালে তথাকার।
অশ্বশালে তবে রহিলা দুজন,
জন্মিল তথা কুমার।
সূতিকা-বসনে করিয়া জড়িত,
জননী সদ্য কুমার
রাখিলা অশ্বের আহার পাত্রেতে,
মিলিলনা স্থান আর।
ছিল সে নিশিতে মেষের প্রহরী
যথায় রাখালগণ,
আসি স্বর্গ দূত ঝলসি গগন,
ঘোষিলা খৃষ্ট জনম।
ঈশ্বরের গুণ গাইল আনন্দে,
বহু স্বর্গ দূত মিলিয়া সকল,—
"স্বর্গে ঈশ্বরের অত্যুচ্চ গৌরব,
ধরাতলে শান্তি, মানবে মঙ্গল।"
মেষপালগণ জনক জননী
করিল শিশু দর্শন
সেই অশ্বশালে; কহিল সকলে
করেছে যাহা শ্রবণ।
ঈশ্বরের গুণ গৌরব গাইয়া
গেল চলি নিজ স্থান,

অষ্টম দিবসে, জোসেফ শিশুর
রাখিলেন যিশুনাম।

২য় অধ্যায়।

ইহুদী প্রদেশে হিরডের রাজ্যে
করিলে জন্ম গ্রহণ
এইরূপে যিশু; পূর্ব্বদিক হ'তে
দেখ! আসি জ্ঞানিগণ
কহিলা—"কোথায় ইহুদীর রাজা
জন্মিলেন যেই জন?
আসিনু পূজিতে, পূর্ব্বদিকে তাঁর
নক্ষত্র করি দর্শন।"
শুনিয়া হিরড হইলেন ভীত,
ভীত নাগরিকগণ,
ডাকি পুরোহিত জিজ্ঞাসিল—"কোথা
লভিবে খৃষ্ট জনম?"
"বেৎলেহেম্ গ্রামে"— কহিল তাহারা—
"রয়েছে শাস্ত্রে লিখিত।"
জিজ্ঞাসিলা রাজা জ্ঞানীদেরে,—"কবে
হইল তারা লক্ষিত?"
সেই নগরেতে প্রেরিয়া তাদেরে
কহিলা নৃপতি সবে—

"অন্বেষিয়া শিশু পাইলে, আসিও,
আমিও পূজিব তবে।"
চলিল তাহারা ; চলিল সে তারা
করি পথ প্রদর্শিত,
রহে স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া যথা
ছিল শিশু বিরাজিত।
দেখি তারা স্থির, আনন্দে অধীর
হইল সে জ্ঞানিগণ।

প্রবেশিয়া গৃহে মাতার সহিত
করিল শিশু দর্শন।
হইয়া প্রণত পূজিল তাঁহাকে,
খুলিয়া রত্ন ভাণ্ডার
করিল অর্পণ স্বর্ণ, সুসৌরভ,
নানাবিধ উপহার।
ঈশ্বর-আদিষ্ট হইয়া স্বপনে
না যাইয়া পুনর্ব্বার
হিরডের কাছে, গেল অন্য পথে
দেশে চলি আপনার।
কহিল জোসেফে স্বপনে তখন
ঈশ্বরের আজ্ঞাবহ—
"উঠ, লও শিশু, পালাও মিশরে,
তাহার জননী সহ।
থাকিবে তথায়, যাবত আদেশ
না আনি দ্বিতীয় আর।
খুজিবে শিশুকে নৃপতি হিরড
করিতে বিনাশ তার।"

উঠিয়া জোসেফ পলাল নিশীথে
প্রসূতি শিশু সহিত।
রহিল তথায়, যত দিন রাজা
হিরড ছিল জীবিত।
হিরড যখন দেখিল জ্ঞানীরা
করিয়াছে উপহাস।
করিল রাগান্ধ, দুই বছরের
অনধিক শিশু নাশ।
মরিলে হিরড, স্বপ্নে স্বর্গদূত
আদেশিলে পুনর্ব্বার,
আসিল জোসেফ লয়ে পত্নী পু
দেশে ফিরি আপনার।
শুনিল যখন হিরডের পুত্র
হইয়াছে অধিপতি,
গেলিলি প্রদেশে, "নেজারত" গ্রামে
করিল ভয়ে বসতি।

---

৩ অধ্যায়।

জুডিয়ার বনে দীক্ষা গুরু 'জন'
হয়ে তবে উপনীত।
করিলা প্রচার— "কর অনুতাপ,
স্বর্গ রাজ্য উপস্থিত"।
উষ্ট্র লোমে তাঁর নির্ম্মিত বসন;
চর্ম্ম কটিবন্ধ আর

আছিল কটিতে ; পঙ্গপাল, মধু,
ঋষির ছিল আহার।
'জেরিউজিলাম', সমস্ত 'জুডিয়া,'
সমস্ত 'জর্ডান' বাসী,
হইল দীক্ষিত "জর্ডানের" জলে
নিবেদিয়া পাপ রাশি।
যবে বহুতর ভণ্ড ধর্ম্মচারী
আসিল হ'তে দীক্ষিত,
কহিলেন জন— "ভুজঙ্গের বংশ !
কে করিল সতর্কিত,
ভাবী-ক্রোধানল হইতে এরূপ
করিতে রে পলায়ন ?
দেখি, অনুতাপ- উপযোগী ফল
কর সবে প্রদর্শন।
'এব্রাহেমের সন্তান আমরা'—
ভেবো না মনে কখন।
পারেন ঈশ্বর সৃজিতে প্রস্তরে
এব্রাহেম সুতগণ।
সকল বৃক্ষের মূলেতে কুঠার
হইয়াছে নিপতিত,
কুফল পাদপ হতেছে কর্ত্তিত,
অনলেতে নিক্ষেপিত।
সলিল সহায়ে, অনুতাপে আমি
করিতেছি দীক্ষাদান,
আমার পশ্চাতে আসিছেন যিনি—
তিনি মহা শক্তিমান,

নহি যোগ্য আমি করিতে বহন
চরণ পাদুকা তাঁর,—
করিবেন তিনি অনলে দীক্ষিত,
পবিত্র আত্মায় আর।
হস্তে কুলা, ভূমি করি পরিষ্কার,
তুলি শস্য শস্যাগারে,
পোড়াবেন তুষ, অনির্ব্বাণ অগ্নি
জ্বালাইয়া এ সংসারে।"
গেলিলি হইতে আসিলেন যিশু
দীক্ষাতরে, কহে 'জন'—
"তুমি কি আসিলে আমার নিকট ?
আমি তব শিষ্যোপম !"
উত্তরিলা যিশু— "এরূপে উভয়
করিব ধর্ম্ম সাধন।"
হইয়া দীক্ষিত সলিল হইতে
উঠিলেন যেই ক্ষণ,
খুলিল ত্রিদিব, কপোতের মত
পরমাত্মা এল নামি ;
হ'লো দৈববাণী— "প্রিয় পুত্র এই,
যাহে অতি প্রীত আমি।"

---

৪ অধ্যায়।

প্রেরিলেন পরমাত্মা যিশুরে তখন
মহারণ্যে, পাপহস্তে পরীক্ষা কারণ।

চল্লিশ দিবস নিশি করি অনাহার
হইলে ক্ষুধিত, কহে পাপ-অবতার—
"ঈশ্বরের পুত্র যদি তুমি, আজ্ঞা কর
হউক উপল রাশি রুটি মনোহর।"
উত্তরিলা যিশু "নহে রুটিতে কেবল,
ঈশ্বরের বাক্যে নর বাঁচিবে সকল।"
তখন পাপিষ্ঠ তাঁকে করিয়া উত্থিত,
করি এক মন্দিরের চূড়ায় স্থাপিত,
হাসি দুরাচার তবে কহে কুতূহলে—
"ঈশ্বরের পুত্র যদি, পড় ভূমিতলে।"
উত্তরিলা যিশু স্থির—"প্রভু তিনি তব,
নাহি লবে ঈশ্বরের পরীক্ষা মানব।"
অতি উচ্চ শৈল শৃঙ্গে তুলি পুনর্ব্বার,
দেখাইয়া ধরারাজ্য, গৌরব তাহার,
কহে—"এ সকল রাজ্য অর্পিব তোমায়
কর যদি পূজা মম পড়িয়া ধরায়।"
যিশু উত্তরিলা—"দূর হও, দুরাচার!
ঈশ্বর—ঈশ্বর মাত্র উপাস্য আমার।"
চলি গেল সয়তান, স্বর্গ দূতগণ
আসিয়া করিল তাঁর মহিমা কীর্ত্তন।
যখন শুনিলা যিশু কারারুদ্ধ 'জন'
চলি গেলা গেলিলিতে বিষাদিত মন।
ছাড়ি 'নেজারত' গেলা সমুদ্রের তীর।
অন্ধকারে ছিল যারা, ভেদিয়া তিমির
দেখিল আলোক রাশি; হইল সঞ্চার
আলোক মৃত্যুর রাজ্যে, ছায়াতে তাহার।

করিলেন একত্রিংশ বর্ষে প্রচারিত—
"কর অনুতাপ; স্বর্গ রাজ্য উপস্থিত।"
বেড়াইতে সিন্ধুতীরে 'এণ্ড্রু' ও 'পিটার'
দেখিলা দুভাই জাল করিছে বিস্তার
কহিলা—"পশ্চাতে মম এস ভ্রাতৃদ্বয়;
নর-মৎস্যধারী আমি করিব নিশ্চয়।
চলিল পশ্চাতে তারা, 'জেম্‌স্‌' আর 'জন'
আরো দুই জাল-জীবী মিলিল তেমন।
ভ্রমিতে লাগিলা তবে গেলিলি নগরে
ধর্ম্ম উপদেশ দিয়া প্রতি ধর্ম্ম-ঘরে,
ধরাতলে স্বর্গ রাজ্য করিয়া প্রচার,
আরোগ্য করিয়া রোগ বিবিধপ্রকার।
দেশ দেশান্তর হতে আসিতে লাগিল
কত রোগী, কত লোক পশ্চাতে ছুটিল।

---

৫ অধ্যায়।

দেখি লোকারণ্য যিশু, করিয়া গমন
করিলেন এক উচ্চ গিরি আরোহণ।
তথায় খুলিয়া মুখ, বসিয়া নির্জ্জনে,
এই রূপে দিলা শিক্ষা নিজ শিষ্যগণে—
"ধন্য দীনাত্মারা, স্বর্গ রাজ্য পাবে দীন,
ধন্য শোকার্ত্তেরা তারা পাইবে সান্ত্বনা;
ধন্য বিনয়ীরা, ধরা হইবে অধীন,
ধন্য পুণ্য-পিপাসীরা, পূরিবে বাসনা।

ধন্য দয়াবান্, দয়া পাইবে তাহারা,
ধন্য নির্ম্মলাত্মা, তারা দেখিবে ঈশ্বর,
ধন্য এই ধরাতলে শান্তি-প্রদাতারা,
ঈশ্বর-সন্তান নাম পাবে শ্রেষ্ঠতর।
ধন্য যাঁরা পবিত্রতা তরে উৎপীড়িত,
স্বর্গ-রাজ্য তাহারাই পাইবে নিশ্চিত।
তোমরাও ধন্য স'বে আমার কারণ
কত মিথ্যা অপবাদ, কত উৎপীড়ন।
কর জয় জয়কার, হও আনন্দিত,
স্বর্গে প্রতিদান তার পাবে আশাতীত।
তোমাদের পূর্ব্ব-গামী যত জ্ঞানিগণ
সহিয়াছে এইরূপে ঘোর উৎপীড়ন।
লবণ এ পৃথিবীর তোমরা সকল।
লবণের লবণত্ব হলে অপনীত,
কিসে হবে লবণিত? তখন কেবল
ফেলে দেয় লোকে, করে চরণে দলিত।
আলোক এ পৃথিবীর তোমরা ধরায়।
গিরি শৃঙ্গে যে নগর লুকান না যায়।
জ্বালি দীপ লোক নাহি রাখে লুকায়িত;
রাখে দীপাধারে, গৃহ হয় আলোকিত।
তেমনি আলোক তব হউক উজ্জ্বল
মানব নয়নে, তব সুকার্য্য সকল
দেখিয়া তাহারা যেন গা'য় পুলকিত
স্বর্গস্থিত ঈশ্বরের গৌরব-সঙ্গীত।
আসি নাই আমি ধর্ম্ম করিতে সংহার।
সাধনা, সংহার নহে, উদ্দেশ্য আমার।

আমি কহিতেছি সত্য, পৃথিবী আকাশ
যত দিন না হইবে লুপ্ত অপ্রকাশ,
যত দিন না হইবে সর্ব্বার্থ-সাধন,
ধর্ম্মের কণাও লুপ্ত হবে না কখন।
এক ক্ষুদ্র ধর্ম্মনীতি লঙ্ঘিবে যেজন,
লঙ্ঘিতে শিখাবে, স্বর্গ পাবে না কখন;
সাধিবে আপনি, পরে শিখাবে যে জন,
স্বর্গ-রাজ্যে হইবে সে প্রতিষ্ঠাভাজন!
আমি কহিতেছি সত্য, ধার্ম্মিকতা তব
শ্রেষ্ঠতায় যদি নাহি করে পরাভব
ধর্ম্মব্যবসায়িগণ, 'ফেরেশি' অধম,
স্বর্গ-রাজ্য তোমরাও পাবে না কখন।
শুনেছ প্রাচীন মুখে,—'করোনা হনন;
যে করিবে হত্যা, দণ্ড পাইবে সেজন।'
আমি কহিতেছি, ক্রোধ করিবে যেজন
অকারণে, হইবে সে দণ্ডের ভাজন।
অপরে নির্ব্বোধ মাত্র যদি কেহ বলে,
নিশ্চয় সে হবে দগ্ধ নরক অনলে।
অতএব বেদিমূলে আনি উপহার,
হয় কোনো মনোবাদ স্মরণ তোমার,
ফেলি উপহার গিয়া মনের মিলন
করিয়া ভ্রাতার সহ, পূজিও তখন।
সত্বর করিবে তব বিবাদ ভঞ্জন,
পাছে শত্রু কারাগারে করে নিপতন।
আমি কহিতেছি সত্য, হবেনা উদ্ধার,
যতদিন সর্ব্বস্ব স্ব হবেনা তোমার!

তোমরা প্রাচীন কাছে করেছ শ্রবণ—
'করিওনা পরদার তোমরা কখন।'
আমি কহিতেছি, কাম নেত্রে যেই জন,
অন্য রমণীর প্রতি করে নিরীক্ষণ
ব্যভিচার বাসনায়, পূর্ণ পরদার
করেছে সে কলুষিত হৃদয়ে তাহার।
করে যদি পাপ তব দক্ষিণ নয়ন,
করিও নিক্ষেপ তাহা করি উৎপাটন।
মঙ্গল একটী অঙ্গ হয় বিনাশিত,
না হইয়া সর্ব্ব দেহ নরকে পতিত।
শুনিয়াছ—'যে করিবে পত্নীর বর্জ্জন,
বিবর্জ্জন-পত্র তারে করিবে অর্পণ।'
আমি কহিতেছি—বর্জ্জে যে নিজ কামিনী
বিনা ব্যভিচার দোষে, তাহাকে স্বৈরিণী
করে সেইজন; সেই বর্জ্জিতা বামার
যে করে বিবাহ, তার ঘটে পরদার।
কহিয়াছে প্রাচীনেরা—'করিয়া গ্রহণ
শপথ ঈশ্বর নামে, করোনা লঙ্ঘন।'
তোমরা স্বর্গের নামে শপথ গ্রহণ
করিও না, স্বর্গ ঈশ্বরের সিংহাসন;
কিংবা পৃথিবীর নামে,—তাঁর পদাসন।
কিংবা পুণ্যতীর্থ নামে,—নগর তাঁহার।
কিংবা উপলক্ষ করি মস্তক তোমার।
একটী মস্তক-কেশ করিতে তোমার
শ্বেত কিংবা কৃষ্ণ, বল আছে সাধ্য কার?
কেবল কহিবে কথা "হাঁ, না" মাত্র সার

ইহার অধিক যাহা পাপের আধার।
শুনিয়াছ—'নেত্র বিনিময়েতে নয়ন,
দন্ত বিনিময়ে দন্ত করিবে গ্রহণ।'
আমি তোমাদের কহি—পাপে কদাচিত
হইও না প্রতিদ্বন্দ্বী; কেহ অনুচিত
তোমার দক্ষিণ গণ্ডে প্রহারিবে যবে,
বাম গণ্ড ফিরাইয়া দিও তারে তবে।
এক খানি বস্ত্রতরে যে চাহে বিচার,
দিওতারে অন্য বস্ত্রখানিও তোমার।
বল ক্রমে এক ক্রোশ নিবে যেই জন,
তার সঙ্গে দুই ক্রোশ করিবে গমন।
যেজন চাহিবে ভিক্ষা, করিবে প্রদান;
করিওনা ঋণপ্রার্থী জনে প্রত্যাখ্যান।
শুনেছ—'বাসিবে ভাল প্রতিবেশিগণ,
আপন শত্রুরে ঘৃণা করিবে তেমন।'
আমি কহিতেছি—সবে বন্ধুর সমান
শত্রুকে বাসিও ভাল। করিও প্রদান
অভিশাপ বিনিময়ে আশীর্ব্বাদ আর,
ঘৃণা বিনিময়ে সবে দিও উপকার।
ঈর্ষা করে যেই জন, করে অত্যাচার,
মাগিও ঈশ্বর কাছে মঙ্গল তাহার।
স্বর্গে যেই পিতা তব করেন বিহার,
হ'তে পার যেন সবে সন্তান তাঁহার।
পাপী, পুণ্যবানে দেয় তাঁর রবি কর।
সাধু অসাধুকে বর্ষে তাঁহার অম্বর!
যে আমারে বাসে ভাল, ভালবাসি তারে,

কি মহত্ত্ব ? তা'ত করে যত দুরাচারে।
আপন ভ্রাতারে করি প্রীতি সম্ভাষণ
কি মহত্ত্ব ? করে নাকি নরকুলাধম ?
অতএব হও পূর্ণ, পূর্ণ সনাতন
তোমাদের স্বর্গস্থিত পিতার মতন।

---

৬ অধ্যায়।

"লোকের সমক্ষে, লোকে দেখাবার তরে,
সাবধান ! করিও না কোনরূপ দান ;
তাহা হ'লে পাইবেনা কোনো পুরস্কার,
তোমাদের স্বর্গস্থিত জনকের স্থান।
করোনা দুন্দুভি-ধ্বনি কর যবে দান,
করে যথা পাইবারে লোকেতে সুনাম
ধর্ম্মগৃহে, রাজপথে, ভণ্ড দুরাচার ;—
পাবে তারা তাহাদের যোগ্য পুরস্কার।
যখন করিবে দান, যেন সাবধান,
দক্ষিণ করের কার্য্য নাহি জানে বাম।
গোপনে করিলে দান, জনক তোমার
দিবেন প্রকাশ্যে তিনি পুরস্কার তার।
কর যবে উপাসনা, ভণ্ডের মতন
করিও না ধর্ম্মগৃহে, রাজ পথে আর,
দাঁড়াইয়া, আকর্ষিতে লোকের নয়ন,—
পাবে তারা তাহাদের যোগ্য পুরস্কার।
প্রবেশি আপন কক্ষে, রুদ্ধ করি দ্বার,

কর উপাসনা তব অদৃশ্য পিতার।
গোপনে দেখিয়া তাহা জনক তোমার
প্রকাশ্যে দিবেন তিনি পুরস্কার তার।
কর যবে উপাসনা মূর্খদের মত
করিও না পুনরুক্তি, ভাবে তারা মনে,
এক কথা তারা যদি কহে বারংবার
অবশ্য পশিবে তাহা ঈশ্বরশ্রবণে।
তোমাদের কি অভাব ক্ষুদ্র মূর্খ নর,
চাহিবার আগে তাহা জানেন ঈশ্বর।
বাক্য-আড়ম্বর নাহি করিয়া অসার
এই রূপে উপাসনা করিও তাঁহার—
'আমাদের পিতঃ! স্বর্গে বিরাজিত,
পবিত্র তোমার নাম।
তোমার এ রাজ্য; স্বর্গে যথা, মর্ত্ত্যে
হও তুমি পূর্ণকাম।
দেও আমাদের দৈনিক আহার,
ক্ষম আমাদের ঋণ,
আমরা যেরূপে ক্ষমি আমাদের
ঋণগ্রস্ত দীনহীন।
করিও না লোভে পতিত কখন,
পাপ হ'তে কর ত্রাণ,
তোমারই রাজ্য, গৌরব বিভব,
চিরদিন ভগবন্।"
মানুষের দোষ যদি কর পরিহার,
ক্ষমিবেন তব দোষ জনক তোমার।
মানুষের দোষ নাহি কর পরিহার,

ক্ষমিবেনা তব দোষ জনক তোমার।
করিও না উপবাস ভণ্ডদের মত
হয়ে বিষাদিত, ক'রে মুখ কদাকার,
জানাইতে লোকে তারা উপবাস-ব্রত—
পাবে তারা তাহাদের যোগ্য পুরস্কার।
কর যবে উপবাস তোমরা বদন
করিও ঘৃতৈলসিক্ত, মুখ প্রক্ষালন।
তব উপহাস যেন লোকে নাহি জানে,
করিবে গোপনে তব জনকের নামে।
গোপনে দেখিয়া তাহা জনক তোমার,
প্রকাশ্যে দিবেন তিনি পুরস্কার তার।
করিওনা পৃথিবীতে অর্থের সঞ্চয়
কাটে কীটে, করে যথা তস্করে হরণ।
স্বর্গেতে সঞ্চিত অর্থ, নাহি কাটে কীটে,
না পারে তস্করে তাহা হরিতে কখন।
যেখানে করিবে তুমি অর্থের সঞ্চয়,
সেখানে তোমার মন রহিবে নিশ্চয়।
দেহের আলোক নেত্র, এক-দৃষ্টি যদি
হয় নেত্র, হবে তব দেহ দীপ্তিময়।
হয় সেই দৃষ্টি যদি পাপ নিরবধি,
হবে অন্ধকারপূর্ণ দেহ সমুদয়।
অন্তর-আলোক যদি হয় অন্ধকার,
সেই অন্ধকার কিবা ভীষণ আবার!
করিতে দাসত্ব দুই প্রভুর কখন
নাহি পারে কোন জন, নিশ্চয় সে জন
একেরে বাসিবে ভাল, ঘৃণিবে অপরে;—

পারিবে না সেবিবারে ধন ও ঈশ্বরে।
জীবনের চিন্তা নাহি করিও কখন,—
কি খাইবে, কি পরিবে, কি করিবে পান।
অশন হইতে শ্রেষ্ঠ নহে কি জীবন ?
বসন ও দেহ তব নহেত সমান ?
ওই দেখ আকাশের বিহঙ্গ নিচয়,
না বুনে, না কাটে শস্য, না করে সঞ্চয় ;
যোগান স্বর্গীয় পিতা তাদের আহার,—
তোমরা মানবগণ কত শ্রেষ্ঠ তার।
চিন্তা করি কে বাড়াতে পারে কলেবর
এক হস্ত ? বস্ত্র তবে কেন চিন্তাপর ?—
দেখ প্রান্তরের ফুল, জনমে কেমন !
নাহি করে শ্রম তারা, না বুনে বসন ;
আমি কহিতেছি, তবু রাজা 'সলেমান'
ছিল না সজ্জিত গর্ব্বে একটি সমান।
আজ আছে, কালি হয় উনুনে পতিত
যেই তৃণ, তাকে যদি করেন ঈশ্বর
এরূপে ভূষিত, তবে তোমায় ভূষিত
করিবেন ততোধিক, অবিশ্বাসী নর।
অতএব চিন্তা নাহি করিও কখন
কি খাইবে, কি পরিবে, কি করিবে পান।
—সংসারীও চাহে তাহা;—জানেন ঈশ্বর
এ সব অভাব তব ; করিবেন দান।
সর্ব্বাগ্রে ঈশ্বর-রাজ্য, পবিত্রতা তাঁর,
অনুসর ; পাবে অন্য অভাব তোমার।
অতএব কল্যতরে তোমরা কখন

ভাবিওনা ; কল্যতরে চিন্তা কর দূর।
কল্য আপনার চিন্তা করিবে আপনি।
আজিকার মত পাপ রয়েছে প্রচুর।

---

৭ অধ্যায়।

"করোনা বিচার, পাছে হও বিচারিত।
বিচার করিবে যথা, পাবে তথোচিত।
যেই পরিমাণে তুমি করিবে প্রদান,
সেই পরিমাণে তুমি পাবে প্রতিদান।
ভ্রাতার চক্ষের তিল কর দরশন!
আপন চক্ষের তাল দেখনা কখন!
কেমনে কহিবে তুমি ভ্রাতায় তোমার—
'দেও নেত্র-তিল আমি করি উৎপাটন
তোমার নয়ন হতে।' দেখ পরিষ্কার
তোমার নয়নে তাল রয়েছে তখন!
আগে তব নেত্র হতে, ভণ্ড দুরাচার!
আপন নয়ন-তাল কর বিমোচন ;
ভ্রাতার নয়ন-তিল তবে পরিষ্কার
দেখিয়া, পারিবে তাহা করিতে মোচন।
কুকুরে পবিত্র যাহা দিওনা কখন ;
শূকরে মুকুতা নাহি করিও অর্পণ,
পাছে তাহা পদতলে করিয়া দলিত,
ফিরিয়া তোমার দেহ করে বিদারিত।
চাহ,—তবে তোমারে তা' হবে প্রদানিত,

খোঁজ,—তবে তোমরা তা' পাইবে নিশ্চিত,
কপাটে আঘাত কর,—হবে উদ্‌ঘাটিত।
যে চাহে, সে পায় ; নহে যে খোজে, নিষ্ফল ;
যে করে আঘাত, পায়, দ্বার অনর্গল।
তোমাদের মধ্যে আছে কে এমন নর,
পুত্র যদি চাহে অন্ন, অর্পিবে পাথর ?—
কিংবা চাহে মৎস্য যদি, দিবে বিষধর ?
তোমরা মানব পাপী আপন সন্তানে
দেও যদি এইরূপ দ্রব্য প্রীতিকর,
দিবেন ত্রিদিবস্থিত পিতা তোমাদের,
প্রার্থনাকারীকে দান কত শ্রেষ্ঠতর।
তুমি অপরের কাছে চাহ যেই মত,
কর অপরের প্রতি,—ইহা নীতিগত।
প্রবেশ সঙ্কীর্ণ দ্বারে ; জানিও নিশ্চিত
বিস্তীর্ণ কপাট, পথ অতীব বিস্তৃত
বিনাশের ; সেই দ্বারে, সেই পথে, নর
ধ্বংসপুরে সংখ্যাতীত পশে নিরন্তর।
সংকীর্ণ অপরিসর জীবনের দ্বার ;
অতি অল্প লোক পায় সন্ধান তাহার।
কপট শিক্ষক দেখি করিও না ভুল ;
মেষ চর্ম্মাবৃত তারা ক্ষুধিত শার্দ্দুল।
ফল দেখি তাহাদের পাবে পরিচয়,
কণ্টকে না ফলে দ্রাক্ষা ফল সুধাময়।
এরূপে সুবৃক্ষে জন্মে সর্ব্বত্রে সুফল।
তেমতি কুবৃক্ষে জন্মে কুফল সকল।
সুবৃক্ষে কুফল নাহি ফলে কদাচিত ;

কুবৃক্ষেও নাহি ফলে সুফল নিশ্চিত।
যেই বৃক্ষে নাহি করে সুফল ধারণ,
কাটি লোক করে তাহা অনলে ক্ষেপণ।
অতএব কহি আমি লইবে নিশ্চয়
পাদপের এক মাত্র ফলে পরিচয়।
'প্রভু! প্রভু!'—আমাকেই ডাকিলে কেবল,
স্বর্গরাজ্য কেহ নাহি পাইবে কখন।
সে যাইবে স্বর্গে, কার্য্যে করিবে যেজন
স্বর্গস্থিত জনকের অনুজ্ঞা পালন।
'প্রভু! প্রভু! তব নামে'—ক'বে বহুলোকে—
করেছি আশ্চর্য্য কার্য্য, কহিয়াছি কত?'
তাদেরে কহিব আমি—'নাহি চিনি আমি,
দূর হও নরাধম পাপাচারী যত!'
যেজন এ শিক্ষা মম করিবে শ্রবণ,
যেজন করিবে তাহা কার্য্যেতে পালন,—
করেছিল শৈলশৃঙ্গে গৃহের নির্ম্মাণ
যেইজ্ঞানী, সেই তার উপমার স্থান।

বরষিল বর্ষা, প্লাবিল প্লাবন,
বহিল তুমুল ঝড়,
আঘাতিল গৃহ, পড়িল না তবু
প্রস্তরে স্থাপিত ঘর।
যেজন এ শিক্ষা আর করিয়া শ্রবণ
করিবেনা কদাচিত কার্য্যেতে পালন,—
করেছিল বালুস্তরে গৃহের নির্ম্মাণ
যে নির্ব্বোধ, সেই তার উপমার স্থান।

বরষিল বর্ষা,　　　প্লাবিল প্লাবন,
　　বহিল তুমুল ঝড়,
আঘাতিল গৃহ,　　　পড়িল ভূতলে,—
　　কি পতন ঘোরতর
এরূপে করিলে যিশু শিক্ষা সমাপন
　　হইল সমস্ত শ্রোতা বিস্ময়মগন।

---

৮ অধ্যায়।

পর্ব্বত হইতে নামি প্রফুল্লিতমন,
আদেশে আরোগ্য রোগী করি বহুজন,
উঠিলা অর্ণবযানে শিষ্যের সহিত,
হইল প্রচণ্ড ঝড়ে সিন্ধু বিধূনিত।
তরঙ্গে তরঙ্গে তরী নিমজ্জিতপ্রায়,
নিরুদ্বিগ্ন তরীবক্ষে যিশু নিদ্রা যায়।
শিষ্যেরা ভাঙ্গিলে নিদ্রা, করি তিরস্কার।
করিলা ঝটিকা শান্ত, স্থির পারাবার।
ভূতগ্রস্ত বহু নর করিয়া উদ্ধার
অন্যতীরে, আসিলেন ফিরিয়া আবার।
পাপী নরাধম সহ করিতে ভোজন
বসিলা স্বশিষ্য সহ; দেখি শত্রুগণ
হাসিতে লাগিল; যিশু কহিলা তখন—
"নীরোগীর চিকিৎসায় নাহি প্রয়োজন।
"চাহি আমি দয়া, নাহি চাহি বলিদান,
"আমি আসিয়াছি পাপী করিবারে ত্রাণ।"

জিজ্ঞাসে 'জনের শিষ্য—"আমরা সকল
করি উপবাস, কেন তব শিষ্যদল
নাহি করে প্রভু!" যিশু উত্তরিলা হাসি—
"বরযাত্রী কখন কি থাকে উপবাসী?
"যেই দিন সেই বর হবে অন্তর্হিত,
"করিবেক উপবাস তারা সমুচিত।
"পুরাণ বস্ত্রের ছিদ্রে নূতন কাপড়
"তালি দিলে, হয় ছিদ্র আরো বৃহত্তর।
"রাখিলে পুরাণ পাত্রে মদিরা নূতন,
"ভাঙ্গি পাত্র হয় সুরা ভূতলে পতন।
"নব সুরা নব পাত্রে করিলে সঞ্চয়,
"হইবেনা ভগ্ন, হবে রক্ষিত উভয়।"
বাঁচাইয়া মৃতে, অন্ধে করি চক্ষুদান,
মূকে দিয়া বাক্য, পাপী করি পরিত্রাণ,
ভ্রমিতে লাগিল যিশু নগরে নগরে,
প্রচারিয়া ধর্ম্মরাজ্য প্রফুল্ল অন্তরে।
বহুলোক সমাগম করি দরশন,
দয়ায় হইল তাঁর সকরুণ মন,
বিচ্ছিন্ন রক্ষকহীন মেষপাল মত,
ভ্রমিতেছে পন্থহারা ভ্রান্ত নর যত।
"কি প্রচুর শস্য!"—শিষ্যে কহিলা কাতরে—
"কৃষক কয়টী মাত্র, কে সঞ্চয় করে?
"শস্যের ঈশ্বর কাছে মাগ, বৎসগণ!
"করুক এ শস্যে তাঁর কৃষক প্রেরণ।"
ডাকিয়া দ্বাদশ শিষ্যে করিলা আদেশ,—
"পন্থহারা মেষপালে করিয়া প্রবেশ

"করগে প্রচার—স্বর্গরাজ্য উপস্থিত,
"উদ্ধারি পীড়িত, মৃত করিয়া জীবিত।
"লইওনা সোণারূপা দ্বিতীয় বসন,
"যে যেমন ভোগী, হয় কর্ম্মীও তেমন।
"যথা দেখ শ্রদ্ধাবান্ তিষ্ঠিও তথায়,
"অশ্রদ্ধাবানের স্থান ত্যজিবে ত্বরায়।
"যেতেছ তোমরা ব্যাঘ্রমধ্যে মেষ মত,
"ভুজঙ্গ হইবে জ্ঞানে, কর্ম্মে পারাবত।
"ঘোরতর নির্যাতন সহিবে যখন,
"কি করিবে, কি কহিবে, ভেবোনা কখন।
"আছেন পিতার আত্মা অন্তরে সবার,
কহিবেন তিনি, যন্ত্র তোমরা তাঁহার।
"হবে তোমাদের প্রতি ঘোর উৎপীড়ন,
"সহিও, পাইবে তবে মুক্তি শিষ্যগণ।
"প্রচ্ছন্ন যা' আছে, তাহা হবে প্রকাশিত,
"অজ্ঞাত যা' আছে জ্ঞানে হইবে বিদিত।
"করিতেছি অন্ধকারে যে ধর্ম্মে দীক্ষিত,
"আলোকে করিও তাহা জগতে ঘোষিত।
"কহিতেছি যাহা কর্ণে, মুখে সবাকার
"গৃহচূড় হ'তে তাহা করিও প্রচার।
"যাহারা শরীর তব করিবে সংহার
"তাদেরে তোমরা ভয় করোনা কখন;
"সাধিবে বিনাশ যারা দেহ ও আত্মার
"নরকেতে, তাহারাই ভয়ের কারণ।
"দেখেছ চড়ই পাখী কত ক্ষুদ্র প্রাণী,
"পয়সায় দু'টা মিলে; কহিতেছি আমি

"ঈশ্বরের অনিচ্ছায় বৎস! কদাচিত
"তাহারাও ধরাতলে না হয় পতিত।
"তোমাদের মস্তকেতে আছে যত চুল,
"তাহাও জানেন তিনি নাহি তাহে ভুল।
"করিওনা ভয় তবে, মানব সন্তান
"চড়ুই পাখীর চেয়ে কত মূল্যবান।"
কহে একজন—"তব মাতা ভ্রাতাগণ
দেখ দাঁড়াইয়া ওই চাহে দরশন।"
তার মুখ চাহি যিশু করিলা উত্তর—
কে আমার মাতা? কারা মম সহোদর?"
শিষ্যদের প্রতি কর করিয়া বিস্তার
কহিলেন—"মাতা ভ্রাতা ইহারা আমার।
যাহারা পালিবে ইচ্ছা স্বর্গীয় পিতার,
তাহারাই মাতা ভ্রাতা ভগিনী আমার।"

---

৯ অধ্যায়।

তীরস্থ অর্ণবযানে করি আরোহণ
সমাগত লোকগণে করি সম্বোধন
কহিলা একদা যিশু—"শুন বৎসগণ।
জনৈক কৃষক শস্য করিল বপন!
পথপার্শ্বে যত শস্য হইল পতন,
পাখীগণ আসি তাহা করিল ভক্ষণ।
কতক বন্ধুর ক্ষেত্রে হয়ে অঙ্কুরিত
মূলহীন, রবিকরে হইল দাহিত।

কণ্টকিত ক্ষেত্রে কিছু হইয়া পতিত,
মরিল হইয়া সব কণ্টকে আবৃত।
কতক সুক্ষেত্রে পড়ি করিল প্রদান
সুফল সহস্রগুণ, বহুমূল্যবান্।
শুনি স্বর্গরাজ্য-কথা না বুঝে যে জন,
তার চিত্ত পন্থ-পার্শ্ব-ক্ষেত্রের মতন।
শস্যরূপ শিক্ষা নাহি হ'তে অঙ্কুরিত,
পাপ বিহঙ্গেরা তাহা করে বিনাশিত।
আনন্দে ধর্ম্মের কথা করিয়া গ্রহণ,
উৎপীড়ন-ভয়ে যারা না করে পালন,
বন্ধুর ক্ষেত্রের মত তাদের হৃদয়,
ধর্ম্মের শস্যের স্থায়ী মূল নাহি হয়।
অর্থের কুহকে আর সংসার চিন্তায়,
যাহার হৃদয়ে ধর্ম্ম স্থান নাহি পায়,
জঙ্গলে কণ্টকাকীর্ণ ক্ষেত্রের মতন,
ধর্ম্মের সুফল তাহে জন্মে না কখন।
শুনিয়া ধর্ম্মের কথা বুঝে যেই জন,
দৃঢ়তা সহিত চিত্তে যে করে গ্রহণ,
উর্ব্বর ক্ষেত্রের মত তাহার হৃদয়
সুফল সহস্রগুণ প্রসবে নিশ্চয়।"
আবার কহিলা যিশু—"কৃষী এক জন
সুশস্য সুক্ষেত্রে তার করিল রোপণ।
ভৃত্যগণ যবে তার হইল নিদ্রিত,
কুশস্য শক্ররা আসি করিল রোপিত।
যখন জন্মিল তৃণ দেখি সবিস্ময়,
সুশস্য কুশস্য ক্ষেত্রে জন্মেছে উভয়,

ভৃত্যেরা প্রভুর কাছে সমাচার দিয়া
জিজ্ঞাসিল, কুশস্য কি ফেলিবে তুলিয়া।
নিবারি কহিলা প্রভু—'কুশস্য এখন।
তুলিতে, সুশস্য পাছে কর উৎপাটন।
থাকুক এখন, যবে কর্ত্তনসময়
আসিবে, তুলিয়া আগে কুশস্য নিচয়,
বাঁধিয়া অনলে তবে পুড়ি সমুদয়,
সুশস্য গোলায় মম করিও সঞ্চয়।'
কৃষক ঈশ্বর-পুত্র, ক্ষেত্র ধরাধাম,
সুশস্যের বীজ ধর্ম্ম-রাজ্যের সন্তান ;
সয়তান সেই শত্রু, কুশস্য-নিচয়
তাহার সন্তানগণ পাপী দুরাশয়।
প্রলয় কর্ত্তন-কাল, স্বর্গদূতগণ
প্রেরিয়া ঈশ্বর-পুত্র, করি আহরণ
পাপিগণ অনলেতে করিবে অর্পণ,
উঠিবে রোদনধ্বনি দন্তের ঘর্ষণ।
শোভিবে পুণ্যাত্মা স্বর্গে সূর্য্যের মতন,—
আছে যার কর্ণ, ইহা করুক শ্রবণ।"

---

১০ অধ্যায়।

ভ্রাতৃজায়া সহ 'হিরদের' ব্যভিচার
নিন্দিলে মহর্ষি 'জন', হিরদ তাঁহার
কারাগারে কাটি শির, করিলা প্রেরণ
অশ্বপৃষ্ঠে, উপপত্নী 'হিরদা' সদন।

শুনিয়া নৃশংস বার্ত্তা তরী-আরোহণে
চলি গেলা শিষ্য সহ যিশু এক বনে।
পাঁচটী রুটীতে মাত্র,—অদ্ভুত এমন,—
করাইলা নর পঞ্চসহস্র ভোজন!
হাঁটি সিন্ধুবক্ষে তরী করি আরোহণ,
নানাদেশ দেশান্তর করিলা ভ্রমণ,
সর্ব্বত্রে নূতন ধর্ম্ম করিয়া প্রচার,
অলৌকিক বহু কার্য্য সাধি বারংবার।
কহিলা একদা লোকে—"মুখে যাহা যায়,
তাহাতে মানুষ নাহি করে কলুষিত;
মুখ হ'তে আসে যাহা, মানুষ তাহায়
করে কলুষিত মাত্র, জানিও নিশ্চিত।
মুখে যাহা যায়, তাহা প্রবেশি উদরে
হয় ধ্বংস; আসে যাহা মুখ হ'তে আর,
হৃদয় হইতে তাহা জানিও নিঃসরে;—
মানব হৃদয় সর্ব্ব পাপের আধার।
দেবনিন্দা, চুরি, মিথ্যা, হত্যা, পরদার,—
হৃদয় হইতে হয় উত্থান সবার।
যেই বৃক্ষ নহে মম পিতার রোপিত,
নিশ্চয় জানিও তাহা হবে উৎপাটিত।
অন্ধের পরিচালক সেই অন্ধগণ,
তোমরা তাদের কাছে যাবেনা কখন!
অন্ধলোক করে যদি অন্ধেরে চালিত,
নিশ্চয় উভয় কূপে হইবে পতিত।"
কহিলে বিপক্ষগণ—"ঈশ্বরকুমার
যদি তুমি, চিহ্ন তবে দেখাও তাহার",

কহিলেন যিশু—"ওরে ভণ্ড নরাধম !
আকাশের চিহ্ন সব করিয়া দর্শন
সুদিন কুদিন পার করিতে বিচার,
পড়িতে কালের চিহ্ন পার নাকি আর ?
পাপীরাই করে শুধু চিহ্ন অন্বেষণ,
তাহারা দেখিতে চিহ্ন পারে না কখন।"
জিজ্ঞাসিলা শিষ্যে—"কহ কে আমি ? পিটার !"
উত্তরিল—"তুমি খৃষ্ট, ঈশ্বর-কুমার।"
"নহে তব কথা ইহা, স্বর্গীয় পিতার।
করিওনা ইহা জনসমাজে প্রচার।"—
উত্তর করিলা যিশু। সে দিন হইতে
কহিতে লাগিলা শিষ্যে, হইবে সহিতে
ধর্ম্মযাজকের করে ঘোর অত্যাচার,
ঘটিবে তাদের করে নিধন তাঁহার।
কহিলেন শিষ্যগণে—"পশ্চাতে আমার
যে যাবে, আসুক করি আত্ম-পরিহার।
যে রক্ষিবে প্রাণ, তাহা হারাইবে, হায় !
যে হারাবে মম তরে, পাইবে তাহায়।
লভিয়া সকল বিশ্ব, হারালে আত্মায়
পাপের অতল গর্ত্তে, কি লাভ তাহায় ?
পিতার গৌরবে পুত্র হয়ে উপনীত,
স্বর্গদূতগণ সহ হইয়া বেষ্টিত,
এইরূপে স্বর্গরাজ্যে করি অধিষ্ঠান,
কর্ম্ম-অনুসারে ফল করিবেন দান।"
একদা করিয়া যিশু গিরি আরোহণ,
মহান্ মূরতি এক করিলা ধারণ।

প্রদীপ্ত ভাস্কর মত ভাতিল বদন,
অমল আলোক মত শোভিল বসন।
পূর্ব্ব-ধর্ম্মশিক্ষকেরা করিয়া বেষ্টন,
করিতেছে তাঁর সহ সুখে আলাপন।
আসিয়া একটি মেঘ অমল উজ্জ্বল,
দেখিতে, দেখিতে, দেখ ঢাকিল সবল।
মেঘ হতে দৈববাণী হইল তখন—
"এই মম প্রিয়পুত্র, প্রীতির ভাজন।"
শুনি ভয়ে শিষ্যগণ পড়িল ধরায়।
যিশুকরস্পর্শে উঠি বিস্ময়ে তথায়
দেখিল একক যিশু, কিছু নাহি আর।
নিষেধিলা ইহা নাহি করিতে প্রচার।
একদা জিজ্ঞাসে শিষ্য—"তাঁহার মতন
না পারে আরোগ্য কেন করিতে সাধন,
তাদের আদেশে পীড়া না হয় অন্তর।"
"অবিশ্বাস হেতু;"—যিশু করিলা উত্তর—
"আমি কহিতেছি, তব বিশ্বাস অন্তরে
থাকে যদি এক ক্ষুদ্র শস্যপরিমাণ,
যদ্যপি আদেশ কর ওই গিরিবরে—
'হও স্থানান্তর!' উহা তেয়াগিবে স্থান।"

---

১১ অধ্যায়।

জিজ্ঞাসিল শিষ্যগণ এক দিন আ",
"স্বর্গরাজ্যে শ্রেষ্ঠতম আসন কাহার?"

একটি শিশুকে ডাকি অঙ্কে বসাইয়া
কহিলেন শিষ্যগণ শিশুকে চাহিয়া,—
"না হ'লে তোমরা ক্ষুদ্র শিশুর মতন,
স্বর্গরাজ্যে পারিবেনা পশিতে কখন।
যে হবে বিনীত এই শিশুর মতন,
সেই জন স্বর্গরাজ্যে হবে শ্রেষ্ঠতম।
এরূপ একটি শিশু যে করে গ্রহণ
মম নামে, আমাকেও পাবে সেই জন।
যে হিংসে একটী শিশু, হয় সেই জন
গলায় বাঁধিয়া শিলা সমুদ্রে পতন।
ঘৃণিওনা শিশুদেরে, স্বর্গে শিশুযত
স্বর্গস্থ পিতার মুখ নিরখে সতত।
মনে কর, কারো যদি থাকে শত মেষ,
তাহার একটি করে অপথে গমন,
ফেলি উনশত, করি অরণ্যে প্রবেশ,
রক্ষক কি নাহি করে তার অন্বেষণ ?
সেইরূপ ইচ্ছা নহে স্বর্গীয় পিতার,
এরূপ একটী শিশু হউক সংহার।
তোমার ভ্রাতায় যদি করে অপরাধ,
উভয়ে মিলিয়া মিটাইও মনোবাদ।"
জিজ্ঞাসিল শিষ্য—"দোষ আপন ভ্রাতার
ক্ষমিব কি সাতবার, কিংবা কত বার ?"
যিশু কহিলেন—"এই আদেশ আমার,—
সাতবার ! ক্ষমিবে তা' সাত শতবার।
এই হেতু স্বর্গরাজ্য সে রাজার মত
লইত যে ভৃত্যদের হিসাব সতত।

ভৃত্য এক হলো দশসহস্র মুদ্রায়
দায়ী নৃপতির কাছে ; শোধের উপায়
নাহি কিছু। আদেশিলা নৃপতি তখন
পত্নীপুত্র সহ তার বিক্রীর কারণ।
পদতলে পড়ি ভৃত্য, অশ্রু ছলছল,
কহে—'ধৈর্য্য ধর প্রভো ! শোধিব সকল।'
নৃপতির মনে হ'ল দয়ার সঞ্চার,
তখন সমস্ত ঋণ ক্ষমিলা তাহার।
কিন্তু সে ভৃত্যের কাছে ভৃত্য অন্যজন
ধারিত পয়সা শত, তাহার কারণ
ধরিয়া গলায় তার, করিয়া প্রহার,
কহিল—'এখন দিবি ধারিস্ যে ধার।'
পায় পড়ি অশ্রুপূর্ণনেত্র ছলছল
সে কহিল—'ধৈর্য্য ধর, শোধিব সকল।
মানিল না দুরাচার, সেই অভাগারে
করিল ঋণের তরে বন্দী কারাগারে।
শুনিয়া নৃপতি ক্রোধে আরক্ত নয়ন
কহিলেন—'ওরে দুষ্ট পাপী নরাধম !
করিনু যেরূপ দয়া আমি তোর প্রতি,
না করিলি তুই অন্য প্রতি রে তেমতি।'
ক্রোধে আজ্ঞা দিল রাজা করিতে পীড়ন
যত দিন ঋণ তার না করে মোচন।
নিজ ভ্রাতৃদোষ নাহি ক্ষমিবে যেজন
স্বর্গস্থ পিতার কাছে পাইবে তেমন।"
একদা জিজ্ঞাসে আসি যুবা একজন—
"কিসে, শ্রেষ্ঠ প্রভো পাব অনন্ত জীবন ?"

উত্তরিলা—"আমি শ্রেষ্ঠ, কহিলে কি মতে ?"
এক ভিন্ন শ্রেষ্ঠ নাহি দ্বিতীয় জগতে।
তিনিই ঈশ্বর, চাহ অনন্ত জীবন,
দশ-আজ্ঞা সমুদয় করগে পালন।"
যুবা কহে—"পালিয়াছি সেই সমুদয়
যৌবন হইতে আমি, বাকি কিবা আর ?"
কহিলেন—"যাহা আছে করিয়া বিক্রয়,
দিয়া দরিদ্রকে, এস পশ্চাতে আমার।"
শুনি যুবা গেল চলি খেদান্বিতমন,
কারণ আছিল তার বহুতর ধন।
তখন কহিলা যিশু চাহি শিষ্যগণ—
"ধনীলোক স্বর্গরাজ্য পাবে না কখন
যায় যদি উষ্ট্র, ক্ষুদ্র সূচীরন্ধ্রপথে,
ধনী স্বর্গে পারিবে না যেতে কোন মতে।
মমতরে সর্ব্বস্ব যে করিবে বর্জ্জন,
পাইবে সহস্রগুণ, অনন্ত জীবন।"
কহিলেন পুনঃ—"শুন। গৃহী একজন
একদা করিল বহু লোক নিয়োজন।
কেহ প্রাতে, কেহ বেলা দ্বিতীয় প্রহরে,
চতুর্থ প্রহরে কেহ নিয়োজিত করে।
সন্ধ্যাকালে সকলেরে সমান বেতন
পয়সা, পয়সা, গৃহী করিল অর্পণ।
প্রভাত হইতে যারা করিয়াছে শ্রম
তাহারা কহিল—'তব বিচার কেমন!
সমস্ত দিনের বোঝা, রৌদ্র খরতর,
সহেছি আমরা শ্রম করি নিরন্তর।

চতুর্থ প্রহরে যারা হলো নিয়োজিত,
তাদের সমান ভাবে পাওয়া কি উচিত ?"
উত্তারল গৃহী—'ভাই ! কি বল অযথা ?
তোমাদের সঙ্গে মম এই ছিল কথা,—
পয়সা বেতনে কর্ম্ম করিবে আমার।
পাইয়াছ, গৃহে যাও, কি ক্ষতি তোমার ?
করিবারে ব্যয়, যথা বাসনা আমার,
আমার অর্থ, কি মম নাহি অধিকার ?
আমি ভাল,—এই হেতু, ইহার কারণ,
পাপে পূর্ণ তোমাদের হয় কি নয়ন ?"

---

১২ অধ্যায়।

ফিরিলেন রাজধানী ;* অলিভ পর্ব্বতে পথে
বিশ্রাম করিয়া কিছুক্ষণ ;
প্রবেশিলা নগরেতে, সবৎসা গর্দ্দভী এক
করিয়া আনন্দে আরোহণ।
আসি বহুতরলোক দিল পথে বিছাইয়া
অঙ্গের বসন আপনার ;
কেহ বৃক্ষশাখা কাটি, পল্লবে ছাইল পথ,
করে সবে জয় জয়কার।
প্রবেশিয়া দেবালয়ে, যাহারা বিক্রয় ক্রয়
করিতেছে, দিলা তাড়াইয়া ;

---

* জেরিউ-জিলাম।

ভাঙ্গিয়া বিপণি সার, করি সব চুরমার
দ্রব্য সব দিলা ছড়াইয়া।
কহিলেন—"গৃহ মম মন্দির উপাসনার;
নহে ইহা তস্কর-বিবর।"
অন্ধ চক্ষু, পঙ্গু পদ, লভিল পরশে তাঁর;
যাজকেরা বিস্মিত অন্তর।
কহি বহু প্রহেলিকা, কহিলা যাজকগণে—
"স্বর্গরাজ্যে সেই রাজা মত,
যে পুত্রের বিবাহের, করি বহু আয়োজন,
ডাকিবারে নিমন্ত্রিত যত,
পাঠাইলা ভৃত্যগণ, কিন্তু কেহ আসিল না;
তুচ্ছ করি নিমন্ত্রণ তাঁর,
কেহ গেল কৃষিক্ষেত্রে, কেহ গেল বিপণিতে
কেহ ভৃত্য করিল সংহার।
রাগান্ধ হইয়া রাজা, প্রেরি সৈন্যগণ তবে;
তাহাদের করিয়া সংহার,
ভস্মিয়া নগর সব, কহিলেন ভৃত্যগণে—
'নিমন্ত্রিত অযোগ্য আমার।
যাও সবে রাজপথে, পথিক ডাকিয়া আন।'
ভাল মন্দ আসিল তখন।
দেখিলেন একজন, বিবাহের উপযোগী
পরিধান করেনি বসন।
জিজ্ঞাসিলা নরপতি— 'বিবাহের বস্ত্র বিনা
কেমনে করিলে আগমন?'
আজ্ঞা দিলা—'বাঁধি তাকে ফেলে দেও অন্ধকারে
দন্তে দন্তে করুক ঘর্ষণ।'

এইরূপে স্বর্গরাজ্যে হইবে আহূত বহু,
কিন্তু অল্প হবে মনোনীত।”
চিন্তিল যাজকগণ, যিশুকে করিবে কিসে
আপনার কথায় জড়িত।
কহে তবে একজন— “জানি প্রভো! সত্য তুমি,
ঈশ্বরের সত্য পথ আর
শিখাইছ আমাদেরে, মানুষে কর না গ্রাহ্য
ভয় তুমি করনা কাহার।
কহ তবে আমাদেরে— নৃপতিকে রাজ-কর
আমাদের দেওয়া কি উচিত?”
উত্তরিলা— “ওরে ভণ্ড! আমায় করিতে কেন
চাহ, বল, বিপদে পতিত?
দেখি কিসে দেও কর?” দেখাইলে মুদ্রা এক,
জিজ্ঞাসিলা যিশু পুনর্ব্বার—
“অঙ্কিত এ মূর্ত্তি কার?” “নরপতি কৈসরের।”
—দিল সবে উত্তর তাহার।
উত্তর করিলা যিশু— “কৈসেরর যাহা, সবে
কর তাহা কৈসরে অর্পিত।
ঈশ্বরের যাহা আর, ঈশ্বরে কর অর্পণ।”
যাজকেরা হইল বিস্মিত।
নীতিব্যবসায়ী * এক ছল করি জিজ্ঞাসিল—
“আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে, বল
কোন নীতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ?” উত্তর করিল যিশু
নেত্রদ্বয় প্রীতি-ছলছল—

* আইনব্যবসায়ী।

"আত্মা, মন, হৃদয়ের সহিত করিবে প্রেম
ঈশ্বরের, বিধাতা তোমার ;—
এই নীতি আদি নীতি, এই নীতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।
সমতুল্য দ্বিতীয় তাহার—
আপনার মত ভাল বাসিবে প্রতিবাসীকে।
এই দুই নীতির উপর,
সমুদয় ধর্ম্মশাস্ত্র, সমস্ত ধর্ম্মশিক্ষক,
করিতেছে সকলি নির্ভর।
উপস্থিত শিষ্যগণে, সমাগত সমারোহে
কহিলেন যিশু অনন্তর—
"মুসার * আসনে, দেখ, বসিয়াছে যাজকেরা,
তাহাদের-অন্ধ অনুচর ;
শিক্ষা তারা দিবে যাহা পালন করিও তাহা ;
কিন্তু করিও না কদাচন
তাহারা করিবে যাহা ; কারণ, জানিও, তারা
কহে যাহা, করেনা কখন।
গুরুতর ভার তারা, মানুষের স্কন্ধোপরে
ক্লেশকর করিবে স্থাপিত।
নিজে তারা করিবেনা, চালাইতে সেই ভার,
একটী অঙ্গুলী সঞ্চালিত।
দেখাইতে মানুষেরে করে তারা কর্ম্ম, আর
করিবারে উদর পূরণ।
ভোজনে, কি দেবালয়ে, সর্ব্বত্র দেখিবে তারা
করে উচ্চ আসন গ্রহণ।

---

* খৃষ্টের পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মপ্রচারক।

হাটে মাঠে চাহে তারা সর্ব্বত্রে সকলে মিলি
"প্রভো! প্রভো!" ডাকুক্ কেবল।
তোমাদের এক মাত্র খৃষ্ট প্রভু অদ্বিতীয়;
ভ্রাতা মাত্র তোমরা সকল।
পৃথিবীর কোনো নরে, পিতা বলি তোমাদের
ডাকিও না তোমরা কখন,
তোমাদের এক মাত্র পিতা তিনি অদ্বিতীয়,
স্বর্গে তাঁর পবিত্র আসন।
তোমাদের মধ্যে বড় যেই জন, হইবে সে
তোমাদের ভৃত্য অনুগত,
যে ভাবে—'উন্নত আমি' নিশ্চয় সে হবে নত,
নত যে, সে হইবে উন্নত।
রে ধর্ম্মযাজকগণ! ওরে ভণ্ড নরাধম!
তোদের ঘটিবে পরিতাপ!
মানুষের স্বর্গদ্বার তোরাই করিস্ রুদ্ধ,
করিস্ রে স্বর্গ অপলাপ!
আপনি যাবিনা তোরা, তাদেরেও নাহি দিবি
স্বর্গ রাজ্যে করিতে প্রবেশ;
রে ধর্ম্মযাজকগণ! ওরে ভণ্ড নরাধম।
তোদের ঘটিবে ঘোর ক্লেশ!
অনাথা বিধবাদের করিস্ সর্ব্বস্ব গ্রাস,
ধর্ম্মের করিয়া মিছা নাম।
এহেতু তোদের, ওরে! ঘটিবে অধিকতর
নরকেতে বাস অবিরাম।
একটি শিষ্যের তরে খুঁজিস্ সসিন্ধু ধরা,
যদি বা মিলিল একজন,

তাহাকে তোদের চেয়ে | করিস্ দ্বিগুণতর
নরক-সন্তান, নরাধম!
রে ভণ্ড যাজকগণ! পাইবিরে পরিতাপ!
দিস্ যত তুচ্ছ উপহার;
দয়া, ভক্তি, ন্যায়, নীতি, করিস্ না কদাচিৎ
ঈশ্বরের নামে অনুসার!
দিস্ উপহার তাহে নাহি ক্ষতি, কিন্তু বল
এ সবে কি নাহি প্রয়োজন?
অন্ধ শিক্ষকগণ! মশাটি গিলিতে কষ্ট,
কিন্তু উষ্ট্র করিস্ ভক্ষণ।
রে ধর্ম্মযাজকগণ! ওরে ভণ্ড নরাধম!
তোদের ঘটিবে পরিতাপ!
তোদের ভোজনপাত্র বাহিরেতে পরিষ্কার,
অন্তরেতে পরিপূর্ণ পাপ!
রে ধর্ম্মযাজকগণ! ওরে ভণ্ড নরাধম!
পরিতাপ পাবি ঘোরতর!
শ্বেত সমাধির মত, বাহিরে সুন্দর তোরা,
কদর্য্যেতে পূর্ণিত অন্তর।
তেমতি বাহিরে তোরা ধার্ম্মিক, পূর্ণিত কিন্তু
পাপ প্রবঞ্চনায় হৃদয়।
রে ধর্ম্মযাজকগণ! ওরে ভণ্ড নরাধম।
পরিতাপ পাইবি নিশ্চয়!
ধর্ম্ম প্রচারকদের সমাধি নির্ম্মাণ করি,
কত মতে করিস্ সজ্জিত;
কহিস্—এদেরে হত্যা পূর্ব্ববর্ত্তীদের মত
করিস্ না তোরা কদাচিত।

থাক সাক্ষী, ইহুদিরে যাহারা কহিল হত্যা,
তোরাই ত তাদের সন্তান,
ভুজঙ্গ! বৃশ্চিক-বংশ! নরক হ'তে তোরা
কেমনে পাইবি পরিত্রাণ?
আমি যেই জ্ঞানিগণ, শিক্ষক, যাজকগণ,
প্রেরিব তোদের শিক্ষাতরে,
বধিবি তাদেরে তোরা কিংবা করি বেত্রাঘাত
তাড়াইবি নগরে নগরে।
মন্দিরে, বেদির আগে, পুণ্যাত্মাগণের তোরা
যত রক্ত করেছিস্ পাত,—
পূর্ব্ব পুরুষের পাপ পূর্ণ কর! এ পুরুষে
ঘটিবেক সে অভিসম্পাত।
হায়! হত রাজধানি! শিক্ষকগণেরে তুমি
কর হত্যা, প্রহার প্রস্তর।
কুক্কুট-জননী যথা করে নিজ পক্ষতলে
একত্রিত শাবকনিকর,
হায়! আমি কতবার চাহিয়াছি করিবারে
একত্রিত তোমার সন্তান।
কিন্তু কেহ আসিল না! ওই দেখ গৃহ তব
শূন্য আজি, যেন মরুস্থান!
যতদিন না কহিবে— 'ধন্য সে, প্রভুর নামে
আগমন করে যেই জন!'
আমি কহিতেছি শুন, ততদিন আর তুমি
পাইবে না মম দরশন।"

---

১৩ অধ্যায়।

মন্দির হইতে পুনঃ অলিভ পর্ব্বতে
করিলে গমন,
জিজ্ঞাসিল শিষ্যগণ—"কহ, তুমি পুনঃ
আসিবে কখন ?
জগতের অন্ত যবে হইবে সাধিত,
কি লক্ষণ সেই কালে হবে প্রদর্শিত ?"
"জাতিতে জাতিতে"—যিশু করিলা উত্তর—
"রাজ্যে রাজ্যে ঘটিবেক রণ ঘোরতর।
ভূমিকম্প, মারিভয়, দুর্ভিক্ষ, অনল,
ছাইবেক স্থানে স্থানে অবনীমণ্ডল।
তোমরা হইবে হত, স'বে অত্যাচার।
হইবে আমার তরে ঘৃণার আধার।
তবে সবে পরস্পরে হবে হিংসান্বিত,
করিবে বিশ্বাস ভঙ্গ, হইবে ঘৃণিত।
হবে লোক মিথ্যাধর্ম্মশিক্ষকে বঞ্চিত,
অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব, প্রেম নির্ব্বাপিত ;
ধ্বংসের ঘৃণিত মূর্ত্তি যবে দেবালয়
বিরাজিবে, আসিবেন মানব-তনয়,—
পূরব আকাশে যথা হইয়া উদিত,
বিদ্যুৎ পশ্চিমাকাশ করে আলোকিত ;
সে দারুণ বিপ্লবের অন্তে প্রভাকর
হইবে তিমিরাবৃত, নাহি দিবে কর
নিশানাথ, তারাগণ পড়িবে খসিয়া,

স্বর্গের শকতি সব উঠিবে কাঁপিয়া।
তখন আকাশে চিহ্ন হবে প্রদর্শিত
মানবের তনয়ের, হবে বিষাদিত
সমস্ত মানব জাতি। দেখিবে তখন—
মানব-তনয় গর্ব্বে করি আরোহণ
স্বর্গীয় মেঘের পৃষ্ঠে আসিছে আবার,
অতুল গৌরবান্বিত, শকতি-আধার!
সেই দিন, সেই দণ্ড নাহি জানে নর;
নাহি জানে স্বর্গবাসী—জানেন ঈশ্বর!
সতত প্রস্তুত থাক, এমন সময়,
জানিবে না, আসিবেন মানব-তনয়।
প্রভু আসি দেখিবেন যেই ভৃত্য তাঁর
কার্য্যরত, তাহাকে দিবেন পুরস্কার।
দেখিবেন যেই ভৃত্য স্বকার্য্য ভুলিয়া,
দুষ্কার্য্যে, আমোদে রত, তাহাকে কাটিয়া
প্রেরিবেন দুরাচার পাপীর সদন,
উঠিবে রোদনধ্বনি দন্তের ঘর্ষণ।
স্বর্গরাজ্য জানিও সে কন্যাদের প্রায়
দীপ হস্তে ছিল যারা বর-প্রতীক্ষায়।
বুদ্ধিমতী পাঁচজন দীপের সহিত
তৈলাধারে নিল তৈল করিয়া সঞ্চিত।
বুদ্ধিহীনা পাঁচজন, প্রদীপ কেবল
নিল সঙ্গে, না লইল তৈলের সম্বল।
বরের বিলম্ব দেখি শুইল সকল,
নিশীথে আসিল বর, হলো কোলাহল।
যাদের ছিলনা তৈল গিয়াছে নিবিয়া

দীপাবলী, তৈল তরে চলিল ছুটিয়া।
অন্য পঞ্চ কন্যা তবে বরের সহিত
চলিল বিবাহে, দ্বার হইল রোধিত।
কহে অন্য পঞ্চ কন্যা আসিয়া আবার—
'প্রভু! প্রভু! আমাদেরে খুলে দেও দ্বার'
উত্তরিল ফিরাইয়া বর মুখখানি—
'সত্য কহি তোমাদের নাহি চিনি আমি।'
থাক প্রতীক্ষায় তাই, মানব-তনয়,
নাহি জান, আসিবেন কেমন সময়।
স্বর্গরাজ্য জানিও সে প্রভুর মতন
যে গেল সুদূর দেশে করিতে ভ্রমণ।
এক ভৃত্যে পঞ্চমুদ্রা, দিলা অন্যে আর
দুই মুদ্রা, অন্যে এক, যথা শক্তি যার।
প্রথম, দ্বিতীয় করি বাণিজ্য মুদ্রায়
করিল দ্বিগুণ বৃদ্ধি; তৃতীয় ধরায়
রাখিল পুতিয়া সেই মুদ্রা আপনার।
স্বগৃহে ফিরিলে প্রভু, যাহা ছিল যার
দেখাইল ভৃত্যগণ। প্রথম দুজনে
কহিলেন প্রভু প্রীতিপ্রফুল্লিত মনে—
'উত্তম বিশ্বস্ত ভৃত্য! করিয়াছ বেশ'
'প্রভুর আনন্দরাজ্যে করহ প্রবেশ।'
তৃতীয়ে কহিলা— দুষ্ট! অলস! আমার
না করিলি ব্যবহার উচিত মুদ্রার'
'কেড়ে লও মুদ্রা। আছে দশ মুদ্রা যার
কর সমর্পণ উহা করেতে তাহার!
যার আছে, সে পাইবে আরো, সমীচীন;

যার নাই, সে হইবে আরো দীনহীন।
আঁধারে অকৃতি ভৃত্যে কর বিসর্জ্জন !
উঠিবে রোদনধ্বনি, দন্তের ঘর্ষণ !
আসিলে মানব-পুত্র দেবের সহিত,
গৌরবের সিংহাসনে হবে অধিষ্ঠিত।
সমস্ত মানব জাতি হবে একত্রিত।
অজ মেষ করি বাম দক্ষিণে স্থাপিত
রাখালের মত, প্রভু কহিবেন তবে
দক্ষিণ পার্শ্বেতে স্থিত মেষপাল সবে—
'আসৃষ্টি হয়েছে যেই রাজ্য নিয়োজিত
তোমাদের তরে, তাহে হও অধিষ্ঠিত।
ক্ষুধাতুর যবে আমি, যোগালে আহার।
তৃষ্ণাতুর যবে, দিলে নীর সুধাসার।
অজানিত ছিনু আমি, করিলে গ্রহণ।
বস্ত্রহীন ছিনু যবে, যোগালে বসন।
ছিলাম পীড়িত যবে, সেবিলে আমায়।
ছিনু কারাগারে, দেখা করিলে তথায়।
কহিল পুণ্যাত্মাগণ—'একি কথা হায় !
আমরা এরূপে কবে সেবিনু তোমায় ?
কহিলেন প্রভু—'এক নিকৃষ্ট ভ্রাতার
করিয়াছ সেবা যবে, করেছ আমার।'
কহিবেন বাম পার্শ্ব স্থিত অজদলে—
'দূর হও নরকের অনন্ত অনলে !
ক্ষুধার্ত্ত ছিলাম আমি, দিলিনা আহার।
তৃষ্ণাতুর ছিনু আমি দিলিনা আসার।
অজানিত ছিনু, নাহি করিলি গ্রহণ।

বস্ত্রহীন ছিনু, নাহি যোগালি বসন।
ছিনু রুগ্ন, বন্দী, নাহি করিলি দর্শন।
কহিবে তাহারা—'প্রভু! একি কথা হায়!
কখন এরূপে নাহি সেবিনু তোমায়?'
কহিবেন প্রভু—'এক নিকৃষ্ট ভ্রাতার,
কর নাই সেবা যবে, করনি আমার।'
লভিবে অনন্ত দণ্ড ইহারা তখন।
লভিবেক পুণ্যাত্মারা অমর জীবন।"

---

১৪ অধ্যায়।

প্রধান যাচকগণ, অধ্যাপকগণ আর,
সর্ব্বোচ্চ যাচক গৃহে হইয়া মিলিত,
ভাবিতে লাগিল সবে, করিবে কি ষড়যন্ত্রে
যিশুর বিনাশ, নবধর্ম্ম বিলোপিত।
যিশুর দ্বাদশ শিষ্য, তাহাদের একজন *
যাজকগণের কাছে আসিয়া তখন
কহিল—'কি দিবে বল, আমি তোমাদের করে,
করি যদি কোনমতে যিশুকে অর্পণ?'
তখন হইল স্থির ত্রিংশৎ মুদ্রা মাত্র
পাবে সেই অবিশ্বাসী তার পুরস্কার।
খুঁজিতে লাগিল পাপী সুযোগ সে দিন হ'তে,
শত্রু হাতে সমর্পণ করিতে তাঁহায়।

---

* জুডা'স ইস্কেরিয়াট।

জুড়িয়ার পর্ব্ব এক হলো এবে উপস্থিত,
কহিলেন শিষ্যগণে—প্রবেশি নগরে,—
"কহ কোনা গৃহস্থেরে, উত্তীর্ণ আমার কাল,
কাটাব উৎসব শিষ্য সহ তার ঘরে।"
সেরূপ হইল স্থির, আসিল উৎসব-সন্ধ্যা,
বসিলেন শিষ্যসহ করিতে আহার।
উৎসর্গ করিয়া রুটী, ভাঙ্গি শিষ্যগণে দিয়া
কহিলেন—"খাও! ইহা শরীর আমার!"
লইলেন প না পাত্র, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ
করি বহু, কহিলেন—"কর সবে পান।
নবধর্ম্মে মম রক্ত! ইহা হইতেছে পাত,
পায় যেন বহু নর পাপে পরিত্রাণ।
আমি কহিতেছি শুন, আমার পিতার রাজ্যে
যতদিন ইহা আমি নাহি করি পান
তোমাদের সনে, বৎস! এই দ্রাক্ষ্যা-রস আর
করিবনা পান আমি, গাও বিভু-গান!"
সকলে গাইল গীত, উৎসব হইল শেষ,
অলিভ পর্ব্বতে পুনঃ করিয়া গমন
কহিলা—"আমার প্রতি আজি এই নিশাকালে
হইবে বিরক্ত সবে।" 'পিটার' তখন
কহিল—"সমস্ত লোক হয় যদি, আমি নাহি
হবো কদাচিৎ।" বিভু কহিলা তাহায়—
"এ রাত্রি, কুক্কুট নাহি ডাকিতে, নিশ্চয় তুমি
তিনবার অস্বীকার করিবে আমায়।"
পিটার কহিল—"আমি মরি যদি তব সনে,
তথাপিও করিবনা আমি অস্বীকার।"

কহিল সকল শিষ্য সেইরূপ; গিয়া তবে
স্থানান্তরে কহিলেন শিষ্যে পুনর্ব্বার—
তোমরা এখানে থাক, আমি গিয়া ওইখানে
নিরজনে উপাসনা করি একবার।"
পিটার সহিত তিন শিষ্য মাত্র নিলা সঙ্গে,—
চিত্ত চিন্তাভারাক্রান্ত, বিষাদ-আধার।
কহিলেন তাহাদেরে— "মৃত্যুর ছায়ার মত
ঘোরতর বিষাদের ছায়া অন্ধকার,
আমার হৃদয় আজি ছাইয়াছে, বৎসগণ।
তোমরা এখানে থাক প্রহরী আমার।"
গিয়া কিছু দূর তবে প্রণত হইয়া ভূমে
কহিলেন—"পিতঃ মম! যদি সম্ভাবিত,
এ বিষাদ-পাত্র মম,— মম ইচ্ছামতে নহে,—
তব ইচ্ছা হয় যদি, কর অপনীত!"
শিষ্যত্রয় নিদ্রাগত; কহিলেন—"পারিলেনা
পিটার! একটি ঘণ্টা জাগিতে কেবল?
জাগ, কর উপাসনা, লোভে যেন নাহি পড়;
আত্মার ত ইচ্ছা, কিন্তু শরীর দুর্ব্বল!"
কিছু দূরে গিয়া পুনঃ করিলেন উপাসনা—
"পিতঃ মম! আমি ইহা না করিলে পান,
যদি এই পাত্র কভু নাহি হয় অপনীত,—
হে পিতঃ! হউক পূর্ণ তব মনস্কাম!"
ফিরি দেখিলেন পুনঃ নিদ্রাগত শিষ্যগণ,
আবির্ভূত ঘোর নিদ্রা তাদের নয়নে।
ছাড়িয়া তাদেরে গিয়া করিলেন উপাসনা
সেরূপে তৃতীয়বার বসি নিরজনে।

ফির আসি অনন্তর কহিলেন শিষ্যগণে—
"নিদ্রা যাও, কর দূর শ্রান্তি যথোচিত!
উত্তীর্ণ হয়েছে কাল, মানব-তনয় দেখ,
হইয়াছে পাপীদের করে সমর্পিত।
উঠ, কর পলায়ন। ওই দেখ উপস্থিত,
আমাকে যে শত্রুকরে করিল অর্পণ।"
কহিতে কহিতে কথা, আসিল সে শিষ্য তথা,
যষ্টি তরবারি করে বহু লোকগণ।
তখন নিকটে আসি বিশ্বাসঘাতক শিষ্য,
কহি—"জয়! জয় প্রভু!" চুম্বিল চরণ।
যিশু কহিলেন—"ভাই! কেন আসিয়াছ বল?"
লোকেরা ধরিয়া তাঁকে চলিল তখন।
যিশুর পক্ষীয় কেহ নিষ্কাশিত করি অসি,
যাজকের ভৃত্য একে করিয়া প্রহার,
কাটিয়া ফেলিল কাণ যিশু কহিলেন তাকে—
"কোষে রাখ তুমি ভাই, অসি আপনার!
যাহারা ধরিবে অসি, মরিবে অসির সহ;
মনে কি কর না তুমি আমি এইক্ষণ
চাহিলে পিতার কাছে, দ্বাদশ স্বর্গীয় সৈন্য
করিবেন তিনি এই মুহূর্ত্তে প্রেরণ?"
কহিলেন লোকগণে— "যষ্টি তরবারি সহ
ধরিবারে তস্কর কি আসিলে হেথায়?
বসি সঙ্গে মন্দিরেতে নিত্য দিনু শিক্ষা আমি,
কেহ ত তখন নাহি ধরিলে আমায়?"
প্রধান যাজক গৃহে, অধ্যাপকগণ সহ
সমবেত প্রাচীনেরা, নিল সেই স্থান

যিশুকে ধরিয়া বলে; চলিল পিটার পিছে,
বসি ভৃত্যদের মাঝে দেখে পরিণাম।
ছিল বহু মিথ্যা সাক্ষী, কেহ নহে অগ্রসর,
অবশেষে অন্বেষণে মিলিল দুজন।
কহে তারা—"এই ব্যক্তি মন্দির করিয়া ধ্বংস
বলেছিল তিন দিনে করিবে সৃজন।"
প্রধান যাজক উঠি কহে—"কেন নিরুত্তর?
কি কহে ইহারা?" যিশু মৌন ভাবে রয়।
আবার যাজক কহে— "ঈশ্বরের নামে আমি
জিজ্ঞাসি—তুমি কি খৃষ্ট, ঈশ্বর-তনয়?"
উত্তর করিলা তবে যিশু—"কহিয়াছ তুমি।
আমি কহি, অনন্তর করিবে দর্শন
মানব-তনয় বসি শক্তির দক্ষিণ পার্শ্বে
আসিতে স্বর্গীয় মেঘে করি আরোহণ।"
কহিল যাজক ক্রোধে, অঙ্গের বসন ছিঁড়ি—
"করিয়াছে দেবনিন্দা করিলে শ্রবণ।
সাক্ষীর কি প্রয়োজন? কি দণ্ড করিবে বল?"
"প্রাণদণ্ড"—উত্তরিল তাহারা তখন।
তখন সকলে মিলি, থুথু দিল মুখে তাঁর,
পাপীগণ নানামতে করিয়া প্রহার,
কহিল বিদ্রূপ করি— "কহ খৃষ্ট! ভবিষ্যত;
কহ কে মারিল চড় পৃষ্ঠেতে তোমার?"
পিটার বাহিরে বসি; তথা এক নারী আসি
কহিল—"যিশুর সঙ্গে দেখেছি ইহায়।"
পিটার তাদের কাছে অস্বীকার করি কহে—
"নাহি জানি এইরূপ কেন কহ হায়!"

গেলে বহির্দ্বারে পুনঃ আসিয়া রমণী অন্য
কহিল—"যিশুর সঙ্গে দেখেছি ইহায়।"
শপথ করিয়া তবে অস্বীকার করি পুনঃ
কহিল পিটার—"আমি চিনিনা তাঁহায়!"
গেলে চলি কিছু দূর, কহিল পথিকগণ;—
"কথায় পড়েছে ধরা, এও একজন।"
কহে পুনঃ দিব্য করি—"না চিনি তাহাকে আমি।"
ভাসিল রজনীশেষে কুক্কুট-কূজন।

---

১৫ অধ্যায়।

প্রভাতে যাজকগণ, করিয়া বন্ধন,
শাসনকর্ত্তার * হস্তে করিল অর্পণ।
বিশ্বাসঘাতক শিষ্য দেখি পরিণাম,
অনুতাপে ত্রিংশ মুদ্রা করি প্রতিদান,
কহিল—"বিশ্বাস-ঘাতী আমি পাপাধম;
করিয়াছি নির্দ্দোষীকে বিপদে অর্পণ।"
যাজকেরা কহে—"তাহে আমাদের ক্ষতি
আছে কিবা? দেখ তুমি তোমার সদ্গতি।"
ফেলাইয়া দিয়া মুদ্রা, শিষ্য দুরাচার।
উদ্বন্ধনে আত্মপ্রাণ করিল সংহার।
কহে যাজকেরা—"করা কোষেতে সঞ্চয়
এই মুদ্রা,—রক্তমূল্য—নীতিসিদ্ধ নয়।"

---

* পন্‌টিয়াস্ পাইলেট।

পরামর্শ অন্তে, তাহে হয়ে ভূমি ক্রীত,
বিদেশীর সমাধিতে হলো নিয়োজিত,—
রক্তভূমি নামে তাহা এখনো বিদিত।
শাসনকর্তার আগে দাঁড়াইয়া স্থির—
জিজ্ঞাসিলা দণ্ডদাতা—"ইহুদি জাতির
তুমি কি নৃপতি?" যিশু করিলা উত্তর—
"কহিয়াছ তুমি।" জিজ্ঞাসিলা অতঃপর—
"কি কহিছে যাজকেরা?" যিশু নিরুত্তর।
হইলা শাসনকর্ত্তা বিস্মিত অন্তর।
বিচার আসনে তবে বসিলা যখন,
করিলা তাঁহার ভার্য্যা সংবাদ প্রেরণ।—
"দেখেছি কুস্বপ্ন আমি, করোনা কখন
সেই ধার্ম্মিকের এক কেশ পরশন।"
এ উৎসবে প্রজাদের ইচ্ছায় ভূপালে
একজন বন্দী মুক্ত করিত সে কালে।
আনিয়া তস্কর এক জিজ্ঞাসে তখন—
"যিশুকে, কি তস্করকে, করিবে মোচন?"
দুরাত্মা যাচকদের কথায় তখন
কহিল সকলে—"কর যিশুকে নিধন।"
বিচারক তস্করকে করিয়া মোচন,
করিলা যিশুকে 'ক্রুশ' শূলে সমর্পণ।
কক্ষান্তরে নিয়া কাড়ি অঙ্গের বসন,
পরাইল রক্তবাস মিলি সৈন্যগণ।
কাঁটার মুকুট গড়ি দিয়া শিরোপর,
করে দিয়া তৃণযষ্টি, যতেক পামর
জানু পাতি ভূমে কহে উপহাস করি—

"দেখ ইহুদির রাজা! কি শোভা আ মরি!"
অঙ্গে দিল থুথু সবে, কেড়ে নিয়া তাঁর
করের সে যষ্টি, শিরে করিল প্রহার।
এইরূপে উপহাস করি কিছুক্ষণ
কাড়িয়া লইল পুনঃ আরক্ত বসন।
পরাইয়া পুনর্ব্বার আপন বসন
নিল ধরি, ক্রুশ শূলে করিল অর্পণ।
বধ্যভূমে পিপাসায় হইলে কাতর,
দিল তিক্তমিশ্র 'সির্কা' নিষ্ঠুর বর্ব্বর।
পাপীরা তাঁহাকে শূলে করিয়া অর্পণ,
লইল বণ্টন করি অঙ্গের বসন।
লিখে দিল অপবাদ মস্তক উপরে—
"যিশু, ইহুদির রাজা" উপহাস ক'রে।
দক্ষিণে ও বামে তাঁর তস্কর যুগল
দিল শূলে সেই সঙ্গে। নেত্র ছলছল
"ক্ষমা কর,"—কহে যিশু চাহি উর্দ্ধ পানে—
"কি করে ইহারা, পিতঃ! কিছুই না জানে।"
পথিক যাইতে করি গালি বরিষণ,
উপহাস করি করে জিজ্ঞাসা—"কেমন
মন্দির করিয়া ধ্বংস নির্ম্মাতে আবার
পার তিন দিনে, কর রক্ষা আপনার।
ঈশ্বরের পুত্র যদি, আইস নামিয়া।"
প্রধান যাজকগণ কহিল হাসিয়া—
"করিলেন ত্রাণ পর, কিন্তু আপনার
করিবারে পরিত্রাণ, নাহি সাধ্য তাঁর।
ইহুদির রাজা যদি, নামিয়া এখন

আসুন, বিশ্বাস সবে করিব তখন।
ঈশ্বরে বিশ্বাসবান্, ঈশ্বর-তনয়!
ঈশ্বর করুন্ রক্ষা।দেখি এ সময়।”
দুই পার্শ্বস্থিত সেই যুগল তস্কর,
তাহারাও দিল গালি মুখের উপর।
অতঃপর ষষ্ঠ ঘণ্টা হইতে নবম
অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইল ভুবন।
কহিলা নবমে যিশু কাঁদি উভরায়
“হা নাথ! হা নাথ! কেন ত্যজিলে আমায়!”
কহিল দর্শকগণ শুনি হাহাকার,—
“দেখি আসে কি না, নাম করিছে যাহার!”
তিক্ত বারি সিক্তবস্ত্র করিয়া স্থাপন
যষ্টি অগ্রে, দিল মুখে কোন নরাধম।
দ্বাত্রিংশ বয়সে পুনঃ কাঁদি উভরায়
সেইরূপ, প্রাণত্যাগ করিলেন হায়!
মন্দিরের যবনিকা হলো বিদারিত,
গিরি চূর্ণ, বসুন্ধরা হইল কম্পিত।
কহিল দর্শকগণ ভয়ে প্রকম্পিত—
“ঈশ্বরের পুত্র এই বুঝিনু নিশ্চিত।”
ধনী এক শিষ্য আসি মাগি কলেবর
নির্ম্মল বসনে তাহা করি আচ্ছাদিত,
এক শৈল কক্ষে তাহা করিয়া রক্ষিত,
স্থাপিল প্রবেশদ্বারে প্রকাণ্ড প্রস্তর।
কেবল রমণী দুটি রহিল বসিয়া
তিতিল প্রস্তর নারী-শোকাশ্রু ঝরিয়া!
রবিবার নিশি শেষে দেখিল রমণী

ঘোরতর ভূমিকম্পে কাঁপিছে মেদিনী।
স্বর্গ হ'তে দেবদূত নামি একজন
সরায়ে উপলখণ্ড, করিল আসন।
বিদ্যুতপ্রতিম জ্যোতিঃ অঙ্গে ঝলঝল,
পরিধেয় বস্ত্র শোভে তুষার ধবল।
কহিলেন—"চেয়ে দেখ রমণীযুগল,
যিশু গিয়াছেন স্বর্গে, শূন্য কক্ষতল।"
একাদশ শিষ্যগণ আকুলহৃদয়
নির্দ্দিষ্ট পর্ব্বতে এক লইল আশ্রয়।
কহিলা তথায় যিশু দিয়া দরশন—
"পাইয়াছি সর্ব্বশক্তি আমি, শিষ্যগণ!
পিতা, পুত্র পরমাত্মা নামেতে দীক্ষিত
করিয়া মানবজাতি, কর প্রচারিত
মম শিক্ষা; যতদিন রবে চরাচর,
তোমাদের সঙ্গে আমি রব নিরন্তর।"

সমাপ্ত।

PREFACE.

"I asked for several men I had known well here. Many of them were drowned and the tales of the survivors were pitiful. Wealthy Talukdars were wandering about aimlessly. One man who had 12,000 "aris" of paddy (about 2850 maunds) in his godown had been drowned with all his family, a large one. Nothing was standing of his houses, even the mud plinth had been washed away, and the clods lay strewn over the neighbouring fields. The only remnant of the once comfortable homestead was the timber posts, on which the godown had stood. In this village as in Raja-khali, Ujantia, and Pekua, there are very few men surviving, and practically no women or children. There is therefore, but little present need of relief."

DIARY OF MR. C. G. H. ALLEN,
Settlement Officer, Chittagong,
Ajent the Chittagong Cyclone
of the 2nd October, 1897.

ভানুমতী।

প্রথম অধ্যায়।

—*—

কমলে কামিনী।

শরৎ কাল। প্রকৃতির লীলাভূমি চট্টগ্রামের দক্ষিণাঞ্চল প্রাতঃ-সূর্য্যের মৃদুলকিরণে হাসিতেছিল। পশ্চিমে অনন্ত সাগরের নীলা-রাশি; পূর্ব্বে বৃক্ষপল্লব সমাচ্ছন্ন শ্যামল পর্ব্বতমালা। উভয়ের মধ্যে নাতিবিস্তৃত দীর্ঘায়ত হরিৎশস্যক্ষেত্রখচিত তটভূমি। তাহার স্থানে স্থানে নিবিড় তরুকাননশোভিত ছনুয়া, বড় ঘোনা, বড় বাঁকিয়া, পেকুয়া, গণ্ডামারা প্রভৃতি গ্রামাবলীর বর্ষাবিধৌত শ্যামকান্তি। উত্তরে বর্ষার পর্ব্বতপ্রবাহে পূর্ণকলেবর শঙ্খনদের ও দক্ষিণে মাতা মুহুরী নদীর বিশাল রজতধারা। বালসূর্য্যের তরলসুবর্ণকরে মণ্ডিত হইয়া এই দৃশ্যাবলী যে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল, তাহা কবির কল্পনাতীত, এবং চিত্রকরের চিন্তাতীত। কিঞ্চিৎ দক্ষিণে সমুদ্র-গর্ভে কুতুবদিয়া, মহেষখালী, সোনাদিয়া প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জ বিশাল

মরকতখণ্ডের মত ভাসিতেছিল। কুতুবদিয়ার উত্তরপ্রান্তস্থিত "বাতিঘর" একটি গগনস্পর্শী তালবৃক্ষের মত, মহেষখালীদ্বীপস্থ আদিনাথ পর্ব্বত মরকতস্তুপের মত, এবং তাহার শেখরস্থ আদি-নাথের মন্দির প্রকাণ্ড হীরকখণ্ডের মত, নীলাকাশপটে শোভা পাইতেছিল। সোনাদিয়া বা স্বর্ণদ্বীপের ভূম্যধিকারী অনাথনাথ সমুদ্রতীরসংলগ্ন বজরারছাদে বসিয়া, গাম্ভীর্য্যপূর্ণহৃদয়ে প্রকৃতির এই মহাশোভা সন্দর্শন করিতেছিলেন,—

সম্মুখে অনন্ত সিন্ধু ; সুনীল সলিলরাশি,
রবির সুবর্ণ-করে বিকাশি সুনীল হাসি,
নাচিতেছে, গাহিতেছে দিয়া সুখে করতালি
তরঙ্গে তরঙ্গে, তীরে ফেনপুষ্পমালা ঢালি।
অনন্ত সিন্ধুর সেই অনন্ত অস্ফুট গীত
কি যেন অনন্ত স্মৃতি করিতেছে জাগরিত—
অতীত ও অনাগত, সুখ-দুঃখ-বিজড়িত,
সিন্ধু-নীলিমায় যেন রবিকর সংমিশ্রিত।
সুনীল আকাশ দূরে সিন্ধু সহ নীলতর
মিশিয়াছে মহাচক্রে—সম্মিলন কি সুন্দর!
খেলিছে তরঙ্গমালা,— শিরে ফেনপুষ্পরাশি,—
সমুদ্রমন্থনে যেন অমৃত উঠিছে ভাসি।
নীলাকাশ বিশ্বরূপ— অনন্তের মহাভাস,
তরলহৃদয়-সিন্ধু, তরঙ্গ-অনন্তোচ্ছ্বাস।

প্রৌঢ় অনাথনাথ স্তম্ভিতভাবে, ভক্তিপ্রপূরিতহৃদয়ে, এই মহাদৃশ্য দর্শন করিতেছিলেন, এবং মনে মনে ভাবিতেছিলেন, সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্ত্তা যে উভয় অনন্ত, সর্ব্বব্যাপী ও অসীমশক্তিসম্পন্ন, এই সিন্ধুগর্ভে বসিয়া, সিন্ধু ও আকাশ দর্শন করিলে যেমন হৃদয়ঙ্গম হয়,

এমন আর কিছুতেই হয় না। তিনি মাধবাচার্য্যের "জাগরণ" বা চণ্ডীকাব্য সর্ব্বদা পড়িতেন ও তাহার গীত শুনিতে বড় ভালবাসিতেন। শরৎপ্রভাতে এই সমুদ্রশোভা দেখিতে দেখিতে দূরে তরঙ্গভঙ্গে যে ফেনরাশি উদ্গীর্ণ হইতেছিল, উহা তাঁহার যেন একটি কমলকানন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, এবং সেই কমলবনে যেন তিনি শ্রীমন্তের মত সেইরূপ শিশু সহ ক্রীড়াশীলা একটি অপূর্ব্ব কামিনীও দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয় ভক্তিতে পূর্ণ হইল তিনি তখন উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে সিন্ধুতীর মুখরিত করিয়া এবং তাঁহার সুকণ্ঠে সিন্ধুনিনাদ প্লাবিত করিয়া স্থানীয় কবি ৺শ্যামাচরণের একটি গীত গাহিতে লাগিলেন —

১

অপরূপ অতি শুন নরপতি,
কালীদহের জলে দেখেছি নয়নে,
পদ্মেতে পদ্মিনী, জিনি সৌদামিনী,
হেরিলাম কামিনী কমল-বনে।

২

বঙ্কিম-নয়নী জিনিয়া হরিণী,
কেশবেণী ফণী, বিদ্যুৎ-বরণী,
ধরি' করিবরে ধনী গ্রাস করে,
ক্ষণেকে উদ্গার করিছে বদনে।

৩

ক্ষণে দেখি জলে, ক্ষণেকে কমলে,
চঞ্চলা লুকায় ক্ষণেকে অঞ্চলে,
চপলা চমকে ক্ষণে কুতূহলে,
ক্ষণে গজরাজ নিক্ষেপে গগনে।

কিন্তু এ কি ভ্রম। এ কি তাঁহার ভক্তিপ্রণোদিত কল্পনামাত্র ? না, তিনি যেন সত্য সত্যই সেই ফেনপুঞ্জের মধ্যে শিশু সঙ্গে ক্রীড়াশীলা একটি রমণীমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। মূর্ত্তি তরঙ্গপৃষ্ঠে নাচিয়া নাচিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছে, এবং ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট—স্পষ্টতর হইতেছে। ক্রমে তাঁহার মনে আর কোনও সন্দেহ রহিল না। তিনি বিস্মিত ও আত্মহারা হইয়া দেখিতে লাগিলেন। তরঙ্গফেনায় প্রচ্ছন্ন একখানি ক্ষুদ্র নৌকা, যাহা এতক্ষণ দেখা যাইতেছিল না, ক্রমে ক্রমে দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল ? তিনি দেখিলেন, ক্ষুদ্র তরীর ক্ষুদ্র কর্ণখানি ধরিয়া যেন গৌরী স্বয়ং তরঙ্গে তরঙ্গে তরী সহ নাচিতেছেন, এবং নৌকার ছাদের উপর যে একটি ক্ষুদ্র শিশু নির্ভয়ে বসিয়া আছে, তাহাকে থাকিয়া থাকিয়া এক হস্তে আলিঙ্গন করিতেছেন ও তাহার ক্ষুদ্র মুখখানি চুম্বন করিতেছেন। তরীর অন্য প্রান্তে বসিয়া একটি পুরুষ ও নারী দাঁড় টানিতেছে। নৌকা আরও নিকটে আসিলে তিনি দেখিলেন,—

কিশোরী বালিকা সোণার পুতুল,
দুই হাতে হাল চাপি বক্ষে ধরি,
হেলিছে দুলিছে উঠিছে পড়িছে
তরঙ্গে তরঙ্গে কি লীলা করি।
নাচিছে তরণী, নাচিছে তরুণী,
এই উঠিতেছে, পড়িতেছে এই,
মোচার খোলার মত ক্ষুদ্র তরী
এই দেখি আছে, এই দেখি নেই।
এই তরী-আগা উঠিল আকাশে,
হেলিয়া সম্মুখে হা'লে ভর করি'

চুম্বিল কিশোরী শিশুর বদন
বাম করে তারে হৃদয়ে ধরি।
এই তরী-পাছা উঠিল এবার,
তরঙ্গে দ্বিতীয় আরোহণ করি,
পড়িল সরিয়া। কিশোরী কৌশলে
তরী-কর্ণ বক্ষে সাপটি ধরি।
আরক্ত বসনে আঁটা ক্ষীণ কটি,
মুক্ত কেশরাশি কেতন মত
উড়িছে পশ্চাতে সমুদ্র-অনিলে
সৌন্দর্য্যের লীলা করিয়া কত।
গৌর বরণে, আরক্ত বসনে,
সদ্যঃস্নাত লীলাময়ী অলকায়,
শারদ রবির প্রভাত কিরণ
ঝলসিছে, শোভা নাহি এ ধরায়।
তরঙ্গ-আঘাতে ক্ষুদ্র তরী যবে
ফেনরাশিগর্ভে হয় নিমজ্জিত,
কক্ষে বক্ষে হাল চাপিয়া কৌশলে,
দুই ভুজে শিশু করিয়া উত্থিত,
কভু শূন্যে তুলি দেখে তার মুখ,
কভু বক্ষে রাখি চুম্বে আদরিণী;
বোধ হয় মনে, এ নহে মানবী,—
সত্য কালীদহে "কমলে কামিনী"।

নৌকা ক্রমে আরও নিকটস্থ হইলে রমণীকণ্ঠের গীতধ্বনি যেন অনাথনাথের কর্ণে প্রবিষ্ট হইল। ধ্বনি ক্রমে পরিস্ফুট হইতে লাগিল; কিছুক্ষণ পরে তাঁহার বোধ হইল, যেন সমুদ্রের জীমূতগর্জ্জনের সঙ্গে মিশিয়া একটি বাঁশী বাজিতেছে; কণ্ঠ

এত উচ্চ, এমন মধুর, এমন প্রাণস্পর্শী। মরুসদৃশ সেই নির্জ্জন সমুদ্রগর্ভে একখানি তরী, তাহাতে শিশু সঙ্গে সেই ক্রীড়াময়ী কিশোরীমূর্ত্তি, এবং সেই কিশোরীর কণ্ঠে এই গীত। গীতের সঙ্গে সঙ্গে তরঙ্গ নাচিতেছে, তরণী নাচিতেছে, তরুণী নাচিতেছে, এবং দুই দাঁড়ে তাল রাখিতেছে। সাগরানিল রহিয়া রহিয়া স্বরলহরী বহিয়া প্রবাহিত হইতেছে। থাকিয়া থাকিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে সমুদ্রকপোত পক্ষসঞ্চালনে করতালিবৎ শব্দ করিয়া উড়িতেছে ও বসিতেছে, এবং তরঙ্গপৃষ্ঠে শ্বেত পদ্মফুলের মত শোভা পাইতেছে। দূর হইতে ইহারা ফেনরাশির সঙ্গে মিশিয়া তাঁহার চক্ষে কমলকাননের ভ্রান্তি সঞ্চারিত করিয়াছিল। অনাথনাথ একমাত্র কর্ণসর্ব্বস্ব হইয়া সেই সঙ্গীত শুনিতে লাগিলেন।

"কেঁদ না কেঁদ না বাছা কাতর অন্তরে ;
আমি এই চলিলাম অভয় দিতে বিজয়বসন্তেরে।
আমি আছি সদা,
ভক্তের প্রেমে বাঁধা,
(তা কি তুমি জান না হে ?)
আমি মশানে করেছি রক্ষা সাধু শ্রীমন্তেরে।"

অনাথনাথের হৃদয়ে যে ভাবতরঙ্গ উঠিতেছিল, এই গীতে তাহা চরিতার্থ হইল। তাঁহার হৃদয়-বীণা ও কিশোরীর হৃদয়-বাঁশী প্রকৃতির অপূর্ব্ব শোভায় নিনাদিত হইয়া একই তানে বাজিতেছিল। তাঁহার আবার ভ্রান্তি হইল; তিনি ভাবিলেন, এই তরুণী সত্য সত্যই শ্রীমন্তের বিপদসঞ্চারিণী এবং মশানে রক্ষাকারিণী "কমলে কামিনী"।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

—*—

মুক্তকেশী।

নৌকা তাঁহার বজরার নিকটস্থ হইলে অনাথনাথ দেখিলেন, হালে দুর্গাপ্রতিমার মত একটি অনিন্দ্যসুন্দরী ত্রয়োদশ কি চতুর্দ্দশ বৎসরের বালিকা, এবং তাহার সম্মুখে নৌকার ছাদের উপর বসিয়া চারি পাঁচ বৎসরের একটি অতি সুন্দর শিশু। দুইটিই স্নেহমণ্ডিত মাধুর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি। কোমলতা. স্নেহ ও লাবণ্য, উভয়ের দেহ হইতে ঝরিয়া পড়িতেছিল। দেখিলেই বোধ হয়, উভয়ের মধ্যে যেন ভ্রাতা ভগ্নীর মত স্নেহসম্পর্ক। যে দু' জন দাঁড় টানিতেছিল, অনাথনাথের তাহাদিগকে স্বামী স্ত্রী বলিয়া বোধ হইল, এবং উভয়ের উৎকট দাম্পত্যপ্রেমালাপ শরতের দক্ষিণানিল এইরূপে তাঁহার কর্ণে আনিতে লাগিল।

স্বামী। না, সম্মুখে যদি বজরা দেখিয়া থাক, উহা স্থানীয় জমিদারের হইবে। নৌকা তাহার কিঞ্চিৎ দূরে উত্তরে লাগাও।

স্ত্রী। তোর যেমন বুদ্ধি, উত্তরে কেন, দক্ষিণে লাগাও।

স্বামী। দক্ষিণের বাতাস। দক্ষিণে লাগাইলে আমাদের নৌকার বাতাস ও রান্নার ধোঁয়া জমিদারের বজরায় যাইবে, তিনি বিরক্ত হইবেন।

স্ত্রী। এখন বুঝি দক্ষিণের বাতাস? অন্ধ কি সাধে। বাতাস যে উত্তর দিক হইতে বহিতেছে, তাহাও টের পাইতেছ না? আর কোথাকার জমিদার যে তাহার ভয়ে আমরা উত্তর দিকে নৌকা লাগাইব? লাগা নৌকা দক্ষিণদিকে।

বালিকার মুখ ম্লান হইল, সে সভয়ে নৌকা দক্ষিণ দিকে লাগাইতেছিল, এমন সময়ে অনাথনাথের নৌকার মাঝি ও ভৃত্যগণ গর্জ্জন করিয়া নৌকা উত্তর দিকে লাগাইতে বলল্।

স্ত্রী। ওরে নবাব সিরাজদ্দৌলার বেটারে! ওদের হুকুম মত নৌকা লাগাইতে হবে!

"কি! থাক্ মাগি!"—বলিয়া বজরা হইতে ভৃত্যগণ লাফাইয়া ডাঙ্গায় পড়িতেছিল। অনাথনাথ তাহাদিগকে নিষেধ করিলেন।

রমণী তখন তাহার স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিল,—"আমাকে ইহারা গালি দিতেছে, মারিতে আসিতেছে, আর তুই ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া আছিস্। অন্ধ আর কাহাকে বলে?"

স্বামী। আমি ত তখনই দক্ষিণ দিকে নৌকা লাগাইতে নিষেধ করিয়াছিলাম।

স্ত্রী। তুই নিষেধ করিয়াছিলি না আমি নিষেধ করিয়াছিলাম? আমি বলিয়াছিলাম না উত্তরের বাতাস বহিতেছে, নৌকা দক্ষিণে লাগান ভাল হইবে না? আমারই দোষ, সর্ব্বদা আমারই দোষ, আমি মন্দ।

শেষ কথা কটি রমণী তাহার বদনব্যাপী বিপুল নাসিকা হইতে নির্গত করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে নৌকার 'পালা' পুতিতে লাগিল এবং বলিতে লাগিল,—"এখনও ধর্ম্ম আছে; এখনও চন্দ্র সূর্য্য উদয় হয়। আমি ভাল মানুষের মত কথাটি বলিলাম, তার জন্য তাহারা এত গালি দিল, মারিতে আসিল। তার উপর স্বামীর এই গালি ও তিরস্কার। হা ঈশ্বর! তুমি ইহার বিচার করিবে। আমি মন্দ, আমার জিহ্বা বিষ, আর সকলের জিহ্বায় অমৃত।"

পালাপোতা হইলে উঠিয়া গিয়া বালিকাটিকে এক প্রস্থ প্রহার করিল,—"লক্ষ্মীছাড়ি! আমার খাস, আমার কথা শুনিস না। আমি

বলিলাম, নৌকা উত্তর দিকে লাগা, তুই দক্ষিণ দিকে লাগাইলি কেন? বালিকা চুপ করিয়া মার খাইল। রমণী নাসিকাপথে ক্রন্দন করিতে করিতে—যেন সমস্ত জগৎ তাহার প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছে,—'ছহির' মধ্যে গিয়া শয্যা লইল। বজরার মাঝি মাল্লারা এই দৃশ্য দেখিয়া হাসিতে লাগিল।

বালিকা অশ্রুমোচন করিয়া ছহির মধ্যে গিয়া তাহার পায়ে ধরিয়া সাধিতে লাগিল,—উঠ মা, নৌকাতে কিছুই খাবার নাই, কি রাঁধিব মা? গোপাল এখনই খিদেয় কাঁদিতে আরম্ভ করিবে; জমিদারের বজরার কাছে খেলা করিলে দু' পয়সা পাইতে পারিব।"

স্ত্রী। আমি যাইতে পরিব না, আমার শরীরে সুখ নাই। এক দিকে খাটিতে খাটিতে মরি; দিন রাত্রি অষ্ট-প্রহরের মধ্যে এক মুহূর্ত্তও অবসর পাই না; আমার সোণার শরীর মাটি হইল। তাহার উপর এই গাল।

স্বামী নৌকার 'পাছায়' বসিয়া তাম্রকূট সাজিতে সাজিতে নেপথ্যে ইহার টিপ্পনী করিয়া বলিতেছেন, "খাটুনির মধ্যে যাহা হইতেছে এই। মেয়েটি সমস্ত দিন বাজি করে, তাহার পর রাঁধে, তাই বাপ বেটা দুটো খাইতে পায়!"

পতিপরায়ণা পত্নী এই টীকা শুনিতে পাইলেন না; মাঝিরা শুনিল ও হাসিয়া উঠিল!

দাম্পত্যপ্রেমের এই মধুর অভিনয় হইতেছে, এমন সময় বজরা হইতে এক জন ভৃত্য ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমরা কি বাজিকর?" বৃদ্ধা উত্তর করিল,—"হাঁ। হুজুর কি অনুগ্রহ করিয়া আমাদের বাজি দেখিবেন?" ভৃত্য বলিল,—"দেখিবেন, তোমরা শীঘ্র আইস।"

বেদেনী ঠাকুরাণী তখন অশ্রুজল মোচন করিয়া নৌকার

ভিতর হইতে পূর্ব্ববৎ মধুর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দিবে কি?" তাহার স্বামী বলিল,—"বাবুর যাহা খুসি দিবেন। তাহা কি আবার জিজ্ঞাসা করিতে হয়?" বেদেনী তখন আবার জীমূতমন্দ্রে গর্জ্জন করিয়া কহিলেন,—"তুই আবার আমার সঙ্গে লাগতে আসিলি, আমি বাবু টাবু চিনি না, এই খাটিয়া আসিয়াছি, যদি বাবু হয়, দুই টাকা দেয় ত খেল্‌ব।

অনাথনাথ স্বীকৃত হইলেন, বেদেনীর মন তখন বড়ই প্রসন্ন হইল। সে আট গণ্ডার বেশী কখনই পায় নাই, তাহাতে দুই টাকা। তার উপর বাবুকে সন্তুষ্ট করিলে টাকাটা সিকাটা আরও কোন্ দিবেন না? তখন সে মধুর কণ্ঠে "এই আমরা আসিতেছি" বলিয়া শয্যা ত্যাগ করিয়া, সাজ সজ্জা করিতে লাগিল।

আর পাঁচ মিনিট পরে ঢোল বাজাইয়া তাহারা বজরার সম্মুখে উপস্থিত হইল। বালক বালিকা দুটি রাধাকৃষ্ণবেশে সজ্জিত হইয়া এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছিল। বালিকার হাত ধরিয়া বালক আনন্দে নাচিতে নাচিতে আসিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে মাথার চূড়া নাচিতেছে। ঢোলের শব্দ শুনিয়া সমস্ত দ্বীপের নরনারী ও বালকবালিকাগণ ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিল। দেখিতে দেখিতে লোকারণ্য হইল, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, খেলা আরম্ভ হইল। প্রথম বাজিকর নিজে কয়েকটি অদ্ভুত কৌশল দেখাইল। বেদেনীর খাটুনির মধ্যে মন্দিরাবাদন, এবং বালকবালিকা যে বেদের সঙ্গে সঙ্গে গান করিতেছিল, সময়ে সময়ে তাহার সঙ্গে তাঁহার অপূর্ব্ব কণ্ঠের যোগদান। তাহা না দিলেই ভাল হইত। বেদের খেলার সময়ে বালিকা ঢোল বাজাইতেছিল। তাহার পর সে ও বালক ধড়াচূড়া ও মুকুট খুলিয়া ব্যায়াম করিতে আরম্ভ করিল। সে ব্যায়াম দেখিয়া দর্শকগণ

বিস্মিত হইলেন। তাঁহাদের বোধ হইল, রমণীর দেহ নবনীত-ময়; তাহাতে অস্থি নাই। সেই নবনীতাঙ্গে অদ্ভুত শক্তি ও কৌশল। এক একটি ব্যায়াম দেখিতে দেখিতে অনাথনাথের হৃদয়ে তাহার জীবনের জন্য আশঙ্কা উপস্থিত হইতে লাগিল। তাঁহার চক্ষে জল আসিল; কিশোরী কখন চরণে মহিষের বক্রশৃঙ্গ বাঁধিয়া বহু ঊর্দ্ধে দুই খুঁটার মধ্যে টাঙ্গান দড়ির উপর দিয়া শিশুটিকে অঙ্কে লইয়া দ্রুতবেগে হাঁটিয়া যাইতেছে, কখন বা দড়ির উপর স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া এক এক পা সংাইয়া নাচিতেছে। কখন বা শিশুটিকে ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া লুফিয়া লইয়া তাহার মুখচুম্বন করিতেছে। অনাং এতক্ষণে বুঝিতে পারিলেন যে কিরূপে তরঙ্গে দোলায়মান তরীর হালে দাঁড়াইয়া সে "কমলে কামিনী"র অভিনয় করিতে পারিয়াছিল। কখন সে বেদ্বিয়ার নাভিস্থ একটি উচ্চ বাঁশের উপর উঠিয়া, কখন এক পা, কখন এক হস্ত, কখন বক্ষঃ কক্ষ পৃষ্ঠমাত্র স্থাপন করিয়া নিরালম্ব নিরাশ্রয়ভাবে দীননয়নে তাঁহার দিকে চাহিয়াছে। কখন সে চিৎ হইয়া ক্ষুদ্র দেহলতাটিকে একটি চক্রে পরিণত করিয়া এবং বৃক্ষের উপর শিশুটিকে দণ্ডায়মান রাখিয়া, মাটি হইতে একটি ক্ষুদ্র দুয়ানি গোলাপসন্নিভ অধরোষ্ঠে তুলিয়া লইতেছে। তাহার সেই স্বেদাক্ত, কুসুমকোমল মুখখানি দেখিয়া, অনাথনাথের হৃদয় করুণায় উচ্ছলিয়া উঠিল বালিকা তাঁহার এই করুণভাব লক্ষ্য করিতেছিল, এবং এক একবার তাঁহার দিকে সস্নেহ করুণ কাতরদৃষ্টিতে দেখিতেছিল। তাহার পর বালিকা এক আম্রের আঁটি পুতিল। কিঞ্চিৎ পরে সে আঁটিতে বৃক্ষ হইল; আরও কিছু পরে তাহাতে আম্র ফলিল। সকলে দেখিল, প্রকৃত আম্রের ডাল ও তাহাতে আম্রের ফল। সর্ব্বশেষে বাজিকর একটি ক্ষুদ্র শিবির প্রস্তুত করিল, তাহার ভিতর সেই বালিকা প্রবেশ করিল। কিছুক্ষণ পরে বাজিকর

বাহির হইয়া আসিয়া সম্মুখের আবরণ উন্মোচন করিল। দর্শকগণ সবিস্ময়ে দেখিল, বালিকা নয়ন মুদ্রিত করিয়া নিশ্চল স্বর্ণপ্রতিমূর্ত্তির মত একখানি তীক্ষ্ণধার তরবারির অগ্রভাগের উপর বসিয়া আছে।

কিশোরী তখন অবলম্বন বিহীনা,
মুদ্রিত নীলাব্জনেত্র বসি শূন্যাসীনা।
বিমুক্ত কবরী আলুলায়িত কুঞ্চিত,
করিয়াছে গ্রীবা অংস উরস আবৃত।
কেশ-অন্তরালে চারু মুখ অনিন্দিত,
শোভিতেছে পূর্ণচন্দ্র মেঘরেখাঙ্কিত।
ঈষৎ হেলিয়া গ্রীবা পড়িয়াছে বামে,
মাধুরী বসিয়া যেন করুণার ধ্যানে।
শোভিতেছে দেহলতা রক্তবাসাবৃতা,
সন্ধ্যার রক্তিমা যেন মেঘরেখাঙ্কিতা।
অবশ যুগল কর পড়ি অযতনে,
যেন অঙ্কপুষ্পপাত্রে চর্চ্চিত চন্দনে।
ক্রমে আরও মেঘাচ্ছন্ন হ'তেছে আকাশ,
বহিতেছে আরও বেগে সমুদ্রবাতাস।
কুঞ্চিত অলক কৃষ্ণ উড়িতেছে ধীরে,
তুলিয়া হিল্লোল নীল সরসীর নীরে।
মেঘাচ্ছন্ন সিন্ধুবেলা পর্ব্বত, কানন,
ঢোলের গম্ভীর শব্দ সমুদ্রগর্জ্জন,
গাম্ভীর্য্যপূর্ণিত বাজিকরের সঙ্গীত,
সোণার প্রতিমা শূন্যে বসিয়া মূর্চ্ছিত
নিরাশ্রয়া, দীনাহীনা, চেতনবিহীনা,
কি করুণা, কাতরতা, কিবা মধুরিমা,

ভাসিছে নিশ্চল মুখে দেহ অবয়বে,
কি যেন করুণা ভিক্ষা করিছে নীরবে !
শিশুটি সে মুখ পানে চাহি অবিরল,
গাহিছে করুণকণ্ঠে নেত্র ছল ছল।

বাজিকর কিছু ক্ষণ পরে তরবারিখানিও সরাইয়া নিল, এবং অনাথনাথের দিকে চাহিয়া গদগদ কণ্ঠে বলিল,—"ভানুমতি !"

অনাথনাথ এবার কাঁদিয়া ফেলিলেন, দর্শকমণ্ডলী স্তব্ধ, নীরব, নিশ্চল।

তৃতীয় অধ্যায়।

—*—

অনাথা।

কয়েক দিন হইতে বড়ই গরম পড়িতেছিল। শরৎকালে এমন গ্রীষ্ম কেহ কখনও অনুভব করে নাই। সে উত্তাপও কেমন এক রকমের। প্রকৃতির কেমন এক প্রকার নির্ব্বাত-নিষ্কম্প ভাব। বসুন্ধরা যেন কি এক প্রকার সূক্ষ্ম প্রতপ্ত বাষ্পাকীর্ণা। সমুদ্রে সামান্য হিল্লোলমাত্র লক্ষিত হইতেছিল না। পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাকালে সমুদ্রতীরে ভ্রমণ করিবার সময়ে, অনাথনাথ যেন স্থানে স্থানে গন্ধকের গন্ধ পাইয়াছিলেন। প্রাতঃকাল হইতে মেঘ হইতেছিল। বেলা প্রহরাতীত হইলে সমুদ্রগর্ভ হইতে যেন ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ মেঘের পর মেঘ উঠিতে লাগিল, এবং কেমন শিক শিক করিয়া বাতাস বহিতে লাগিল। তিনি সেই ঋতুঅনুচিত গ্রীষ্ম অনুভব করিয়াই একটি দুর্য্যোগের আশঙ্কা করিতেছিলেন। এখন এই মেঘ দেখিয়া তাঁহার আশঙ্কা বদ্ধমূল হইল। অতএব এই

মেঘের গতিক না বুঝিয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিবেন না, স্থির করিয়া, তিনি এক জন ভৃত্যের দ্বারা সেই বালিকা ও শিশুটিকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বেদেনী নৌকায় ফিরিয়া ইতিমধ্যে তাহার মধুময় চরিত্রের আর একটি পালা অভিনয় করিতেছিল। অনাথনাথ ভানুমতীকে ২৲ টাকা পুরস্কার দিয়াছেন। আরও কিছু বেশী চাহিতে বেদেনী তাহাকে অপূর্ব্ব মুখভঙ্গী করিয়া, এবং তাহার কোটরস্থ চক্ষু ঠারিয়া, ইঙ্গিত করিয়াছিল। বালিকা কি যে করুণ স্নেহদৃষ্টিতে অনাথনাথের মুখের দিকে চাহিয়া হাত পাতিয়া রহিয়াছিল, সে ইঙ্গিত লক্ষ্য করে নাই কিংবা তাহার অর্থ বুঝে নাই। এই অপরাধে নৌকায় ফিরিয়া সে আর এক প্রস্থ মার খাইয়াছে। বেদেনী,—"পোড়ামুখি! দেখিলি না বাবুটি বোকা। ॥• গণ্ডার জায়গায় ২৲ টাকা দিল, তাহার উপর আবার ২৲ টাকা বকসিস্। চাহিলে আরও কিছু দিত। বোকা না হইলে কি বাজি দেখিয়া চখের জল ফেলে" এই বলিয়া তিনি আবার শয্যা লইলেন। বালিকা চক্ষু মুছিয়া শিশুটির হাত ধরিয়া খাদ্য আনিতে বাজারে যাইতেছিল, এমন সময় ডাক পড়িল। বেদেনীর মেজাজের আগুনে যেন জল পড়িল। সে বুঝিল, বোকা বাবুটির কাছে আরও কিছু পাওয়া যাইবে। তখন সাদরে বালিকাকে বলিল—"মা! তোরা যা! আমি বাজার করিতে যাইতেছি, কিন্তু বাবু হইতে আরও ২৲ টি টাকা না লইয়া ফিরিস না। বাবু বড়লোক।"

বালক বালিকার সজল চক্ষু যেন আনন্দে হাসিল। তাহারা দুই জনে বাবুর বড় ভক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার মুখে যে করুণা, যে দয়া ও যে স্নেহ দেখিয়াছিল, এমন তাহারা দেখে নাই। এমন স্নেহপূর্ণ মধুর কথা তাহারা শুনে নাই। তাহারা

আবার তাঁহাকে দেখিবে, আবার তাঁহার কথা শুনিবে, অতএব তাহাদের আর আনন্দের সীমা রহিল না। বজরার মধ্যে প্রবেশ করিলে তাহার বহুমূল্য সজ্জায় প্রথম তাহাদের চক্ষে ধাঁধাঁ লাগিল। অনাথনাথ তাহাদের গায়ে হাত দিয়া কতই আদর করিলেন। তাহার পর তাঁহার স্ত্রী,—তাহারা ভাবিল, "ইনি কি মানুষ?" তিনি স্বয়ং লক্ষ্মীপ্রতিমা। মাতৃস্নেহ যেন তাঁহার মুখ হইতে জ্যোৎস্নার মত ঝরিতেছে। এমন সুন্দরী, এমন স্নেহশীলা, তাহারা কখনও দেখে নাই। তিনি তাহাদিগকে একেবারে বুকে লইয়া মুখ চুম্বন করিলেন। দরিদ্র বেদের ছেলে মেয়েকে এত দূর দয়া, এত দূর স্নেহ কি মানুষে করিতে পারে? তাহার পর তাঁহাদের একটি পুত্র,—সেটি কি ছেলে, না শরৎকালের প্রভাতকিরণমণ্ডিত কুসুমরাশি? তাহার সেই আয়ত চক্ষু, সরল স্নেহ-ভরা মুখ, এবং সর্ব্বশেষ তাহার সেই মধুর কথা। সে তাহার পিতার একটি ক্ষুদ্র প্রতিচিত্রের মত। সে একেবারে ছুটিয়া আসিয়া বালিকার গলা জড়াইয়া তাহার কোলে বসিয়া কত মধুমাখা কথায় তাহার বাজির প্রশংসা করিতে লাগিল। তাহার নাম অমিয়। উভয়ের একই বয়স। শীঘ্র উভয়ের মধ্যে গাঢ় বন্ধুতা জন্মিল। অনাথনাথের পুত্রের খেলার ভাণ্ডার খুলিয়া গেল। দুই শিশু চিরপরিচিত বন্ধুর মত খেলিতে লাগিল। শিশুর মত সরল সমদর্শী বুঝি মহাযোগীও নন। তাই বুঝি মহর্ষি খৃষ্ট বলিয়াছেন,—

"দেও ওই শিশুদের আসিতে নিকটে মম।
স্বর্গ রাজ্য তাহাদের, যারা শিশুদের সম।"

নৌকাতে নানাবিধ খাদ্য ছিল। অনাথনাথের পত্নী বড় আদরে দুটিকে খাওয়াইলেন। তাঁহাদের দুজনের দয়া তাঁহাদের জমিদারিতে প্রবাদের মত প্রসিদ্ধ। তাঁহারা প্রজাদিগকে

সন্তানের মত স্নেহ করিতেন। তাহাদের সুখে সুখী, তাহাদের দুঃখে দুঃখী হইতেন, এবং দুঃখের উপশম করিতে প্রাণপণে যত্ন করিতেন। প্রজারা তাঁহাদিগকে দেবতার মত পূজা করিত। এই দরিদ্র দেশে প্রজাভূম্যধিকারীর এই সম্পর্ক নিয়ম ছিল। এখন জটিল আইন ও আইন-ব্যবসায়ীদের কল্যাণে তাহার ব্যতিক্রম হইয়া উঠিলেও, এখনও দুই এক স্থানে, বিশেষতঃ বুনিয়াদি জমিদারে, দৃষ্ট হয়।

বালকবালিকা আহার করিলে অনাথনাথ বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার নাম কি?"

উত্তর। ভানুমতী।

প্রশ্ন। তোমার অন্য কোন নাম নাই?

উত্তর। জানি না।

প্রশ্ন। এই বেদে কি তোমার পিতা?

উত্তর। না।

প্রশ্ন। তোমার পিতা তবে কে?

উত্তর। জানি না।

প্রশ্ন। তোমার মাতা কে?

উত্তর। জানি না।

বালিকা অধোমুখে অতিশয় করুণ বিষণ্ণ ভাবে উত্তর দিতেছিল।

প্রশ্ন। তুমি কোথায় ইহাদের সহিত মিলিত হইলে?

উত্তর। জানি না।

প্রশ্ন। তুমি কেন ইহাদের সঙ্গে মিলিত হইলে?

উত্তর। অদৃষ্ট।

অনাথনাথ শুনিলেন, বালিকা বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে তাঁহার শেষ প্রশ্নের উত্তর দিল। তিনি বুঝিলেন যে, তাঁহার প্রশ্নে বালিকার

র্মস্থলে আঘাত করিয়াছে, এবং তাহার মনে গভীর শোকের সঞ্চার করিয়াছে। তাঁহার মুখ গম্ভীর হইল। তাঁহার ত্নীর নয়ন সজল হইল। অনাথনাথ আর তাহার পরিচয় লইবার চষ্টা না করিয়া, তাহাকে একটী গান গাইতে বলিলেন, এবং নিজে হারমোনিয়মের কাছে গিয়া বসিলেন।

বালিকা। কি গাইব বাবা?

অনাথ। তুমি কি কীর্ত্তন জান মা?

উত্তর। জানি

বালিকার 'বাবা' সম্বোধনে অনাথনাথের কর্ণে, এবং তাঁহার 'মা' সম্বোধনে বালিকার কর্ণে যেন অমৃত সঞ্চারিত হইল। দুটী প্রাণ যেন সেই অমৃতের সঙ্গে দ্রবীভূত, মিশ্রিত হইয়া গেল। বালিকা হারমোনিয়মের সঙ্গে অতি কোমল করুণ কণ্ঠে স্থানীয় কবি ত্রিপুরাচরণ রায়ের একটি গীত গাইতে লাগিল,—

১

বাছারে জীবন-জুড়ানে! এস বস কাছে!
বেঁধে দি ধড়া চূড়া,
ও বাপ! গোষ্ঠের বেলা ব'য়ে গেছে!

২

বেণু স্বরে ডাকছে বলাই,—
আয় আয় আয় রে কানাই,
তুই বিনে যে যায় না রে গাই।
তোর পানে চেয়ে আছে।

৩

বাছা রে। তোর মার মাথা খা,
গহিন বনে যাস্‌নে একা।
তুই বিনে প্রাণ যায় না রাখা,
তোর মুখ চেয়ে বাঁচে।

মাতৃপ্রেমের উচ্ছ্বাসে অনাথনাথের পত্নীর নয়ন অশ্রু-জলে ছল ছল করিতে লাগিল। অনাথনাথ বলিলেন,—"তুমি মা পদাবলী জান?"

উত্তর। জানি।

হারমোনিয়মে মধুর পদাবলীর প্রাণদ্রবকর সুর বাজিয়া উঠিল। বালিকা তাহার সঙ্গে কণ্ঠ আরও কোমল আরও করুণ করিয়া, গাইতে লাগিল,—

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
আগুনে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া-সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল।
ইত্যাদি।

এবার অনাথনাথের চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিল। গীত শেষ হইলে তিনি আত্মহারা হইয়া বজরার গবাক্ষপথে অনন্ত সমুদ্রের দিকে চাহিয়া রহিলেন। এ গীত যে প্রেমের উচ্ছ্বাস, সে অনন্ত প্রেম-সমুদ্র যেন তাঁহার হৃদয়ে তরঙ্গ তুলিয়া ক্রীড়া করিতেছিল। কিন্তু তাঁহার সরলা পত্নী পদাবলীর এই উচ্চ প্রেমের ভাব গ্রহণ করিতে পারিতেন না। তাঁহার মাতৃপ্রাণে মাতৃপ্রেমের সরল ভাব প্রীতিপ্রদান করিত। তিনি বলিলেন, "মা! তুই শ্যামা বিষয়ের গান জানিস?" বালিকা এক একবার তাঁহার মাতৃপ্রেমপূর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া, এক একবার সমুদ্রের দিকে চাহিয়া, গাইতে লাগিল,—

"মা! আমি তোর কি করেছি?
শুধু তোরে জনম ভরে মা বলে মা! ডেকেছি।
চিরজীবন পাষাণীরে!
ভাসালি আঁখি-নীরে,

চিরজীবন দুখানলে দলেছি।
আঁধার দেখে ত্রাসেতে
চাহিলাম তোর কোলে যেতে,
আমারে ত কোলে তুলে নিলি না;—
মা-হারা শিশুটির মত,
কেঁদে বেড়াই অবিরত,
নয়নের জল মুছায়ে ত দিলি না,—
সন্তানেরে ব্যথা দিয়ে,
যদি মা, তোর জুড়ায় হিয়ে,
ভাল ভাল তাই তবে হোক,
অনেক দুঃখ সয়েছি।"

বালিকা তাহার করুণকণ্ঠে ভৈরবীরাগিণীর চিত্তদ্রবকরী মূর্চ্ছনা খেলাইয়া তাঁহার মুখের দিকে কাতর ছল ছল বিস্মিত নয়নে চাহিয়া "মা" বলিয়া গাইতেছিল। অনাথনাথের পত্নীর হৃদয় মাতৃপ্রেমোচ্ছ্বাসে আকুল হইল। তাঁহার ফুল্ল-কোকনদসন্নিভ কপোল বহিয়া দুই প্রেমধারা বহিতে লাগিল। গীত শেষ হইলে তিনি ছুটিয়া গিয়া বালিকাকে বক্ষে লইয়া কাঁদিয়া বলিলেন,—"মা! আমি তোর মা! আমি তোকে বুকে বুকে রাখিব, তোকে মেয়ের মত রাখিব, তুই আমাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিবি না।" বালিকাও কাঁদিতে লাগিল।

অনাথনাথেরও অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। বেদে শিশুটিও সজল চক্ষে তাঁহার পত্নীকে বলিল,—"মা! তুমি দিদিকে লইয়া যাও। দিদির বড় দুঃখ। দিদিকে মা বড় মারে।"

বালিকার মাথা অনাথনাথের পত্নীর বুকে। বালিকা শিশুটিকে বক্ষে লইয়া সজলনয়নে ঈষৎ হাসিয়া বলিল,—"হারে গোপাল! তুই আমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিবি?"

উত্তর। পারিব। তুমি ত আর মার খাইবে না। এই মা যে এমন করিয়া তোমায় আদর করিবে।"

অনাথনাথের শিশুও এমন সময়ে গোপালের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, বালিকাকে জড়াইয়া ধরিয়া ও সস্নেহে তাহার মুখ পানে চাহিয়া বলিল,—

"গোপালও যাইবে, আমার সঙ্গে খেলিবে, আমাকে বাজি দেখাইবে। আমিও তোমাকে গোপালের মত আদর করিব। কেমন দিদি! যাইবে? বল, যাইবে"

বালিকা তাহাকে বুকে তুলিয়া লইয়া তাহার মুখ বহুবার চুম্বন করিল, এবং তাহার চক্ষের জলে সে ক্ষুদ্র মুখখানি সিক্ত গোলাপ ফুলটির মত করিয়া তুলিল।

অনাথনাথের পত্নী আবার বলিলেন,—"সত্যি মা! তুই যাবি?"

বালিকা অঞ্চলে নয়নের জল মুছিয়া বলিল, "মা"—সেই মা সম্বোধনে সে কি মধুরতা, কি প্রাণের আবেগই ঢালিল! বলিল,—মা! এমন করুণাসাগর দেবদেবীতুল্য পিতা মাতা পাইব, তাঁহাদের চরণসেবা করিব, অভাগিনীর পক্ষে ততোধিক সৌভাগ্য কি হইতে পারে? কিন্তু মা, এই অন্ধ পিতার ও পাগলী মাতার উপায় কি হইবে? তাহাদিগকে এ সাগরে ভাসাইয়া কেমন করিয়া যাইব?"

অনাথনাথ সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন,—"কি! বাজিকর অন্ধ!"

বালিকা বলিল, "অন্ধ। অভ্যাসবশতঃ তিনি এমন কঠিন বাজি সকল এমন সুচারুরূপে করেন।"

চতুর্থ অধ্যায়।

—*—

রণরঙ্গিণী।

দ্বিতীয় প্রহর বেলা। আকাশমণ্ডল
ঘনকৃষ্ণ মেঘাচ্ছন্ন। কৃষ্ণ ঘোরতর,
উঠিতেছে সিন্ধুগর্ভ হইতে উত্তাল
মেঘের পশ্চাতে মেঘ; মহাদৈত্য মত,
মেঘের পশ্চাতে মেঘ ছুটিতেছে বেগে।
মহাকালী প্রকৃতির যেন মহাসেনা
ছুটিয়াছে মহাহবে প্রচণ্ড বিক্রমে।
কি যেন ভীষণ যুদ্ধ বিপ্লব ভীষণ
আসন্ন করিতে বিশ্ব দলিত পেষিত!
অল্প অল্প বৃষ্টিধারা; থাকিয়া থাকিয়া
সবেগে বহিছে বায়ু উড়াইয়া ধারা;
ছুটাইয়া বেগে সিন্ধুগর্ভে ঘোরতর
কৃষ্ণমেঘছায়াচ্ছন্ন তরঙ্গের পর
তরঙ্গ বিশালতর লহরে লহরে।
স্তম্ভিতা প্রকৃতি-বক্ষে কি যেন উচ্ছ্বাস,
ঘোর বিশ্বসংহারক হইতে নির্গত
চাহিতেছে মহাবাতে মহা বরিষণে,
সিন্ধুর তরঙ্গভঙ্গে, ভীষণ গর্জ্জনে।

অমিয়কে কোলে লইয়া অনাথনাথের পত্নী একটি গবাক্ষের কাছে বসিয়া বিস্তৃতনয়নে আকাশের দিকে চাহিয়া আছেন। অনাথনাথও বিস্তৃতনয়নে অধোমুখে গম্ভীরভাবে বজরার বক্ষে

ধীরে ধীরে পাদচারণ করিতেছিলেন, এবং থাকিয়া থাকিয়া গবাক্ষপথে চাহিয়া, পত্নীর সঙ্গে কি 'গুরুতর পরামর্শ করিতেছিলেন। তাঁহারা কেহই যে প্রকৃতির সেই ভীষণ ভাব অবলোকন কি লক্ষ্য করিতেছিলেন, তাহা বোধ হইল না। বজরা যে তরঙ্গাঘাতে টলিতেছিল, সেই টলন যে তাঁহারা অনুভব করিতেছিলেন, কি সেই তরঙ্গাঘাত যে তাঁহাদের কর্ণে প্রবেশ করিতেছিল, এমন বোধ হইতেছিল না। শিশু অমিয়ও যেন তাহার কিছু বুঝিতেছে না। সে কেবল তাহার জননীর চিবুক ধরিয়া একবার তাঁহাকে বলিতেছিল, "হাঁ মা! উহাদিগকে আমাদের সঙ্গে লইয়া চল।" অন্যমনস্কা জননীর কাছে কোনও উত্তর না পাইয়া আবার কাতরভাবে তাহার পিতাকে বলিতেছিল, "হাঁ বাবা! তুমি উহাদের সঙ্গে লইয়া চল, উহাদের বড়' দুঃখ। কিন্তু কেমন করিয়া লইয়া যাইবেন? অজ্ঞাতকুলশীলা একটি বালিকাকে লইয়া গিয়া কি করিবেন? সে কি উপস্থিত জীবন ছাড়িয়া অন্য জীবন গ্রহণ করিবে? তাঁহারা কি তাহাকে সুখী করিতে পারিবেন? বালিকাটিই বা কে? তাঁহারাও এই বিষয়েরই পরামর্শ করিতেছিলেন। প্রকৃতির বক্ষের মত তাঁহাদের হৃদয়ও কি এক অজ্ঞাত উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইতেছিল। সেই রুদ্ধ উচ্ছ্বাস যেন অশ্রুতে এবং আবেগতরঙ্গময়ী ভাষায় প্রকাশিত হইতে চেষ্টা পাইতেছিল। শেষে একটি পরামর্শ স্থির করিয়া সেই বেদে ও তাহার প্রেমময়ী ভার্য্যাকে ডাকাইলেন। তখন দর্শকগণ চলিয়া গিয়াছে। সমুদ্রতীরে জনমানবের চিহ্ন মাত্র নাই।

বেদে প্রৌঢ়, দেখিতে যেন ভালমানুষ; আর বেদেনী তাহার ঠিক বিপরীত। তাহার গোবরের বর্ণ, স্থূল অঙ্গ, চক্ষু কোটরস্থ, নাসিকা বিপুল, কিন্তু অগ্রভাগের উপর দিয়া যেন কি একটা বিপ্লব চলিয়া গিয়াছে। মুখের এমনি এক বিকট ভঙ্গী যে,

বজরার মধ্যে অমিয় তাহাকে দেখিয়া ভীত হইয়া তাহার মায়ের কোলে লুকাইল।

অনাথনাথ বেদেকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভানুমতী কি তোমার মেয়ে?" সে উত্তর করিল,—"না"।

বাবু ডাকিয়াছেন শুনিয়া, বেদেনী তাঁহার প্রতি বড় প্রসন্না হইয়া আসিয়াছিল। সে মনে করিয়াছিল, তাহার ছেলে মেয়ের উপর বোকা বাবুটির একটা ভালবাসা হইয়াছে। তাহার সূচ্যগ্রবৎ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। অনাথনাথের প্রশ্নমাত্রই সে বুঝিতে পারিল যে, ভানুমতীর উপর অনাথনাথের বিশেষ চক্ষু পড়িয়াছে, এবং তিনি তাহাকে কোনরূপ বিশেষ আনুকূল্য করিবেন। সে যদি তাহার কন্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে না পারে, কিংবা তাহার উপর কোনরূপ বিশেষ অধিকার দেখাইতে না পারে, তবে সে সেই আনুকূল্যের ভাগ পাইবে না। অতএব সে বেদের উত্তরে মহা চটিয়া গেল। তাহার মেজাজটা স্বভাবতই পঞ্চমে বাঁধা থাকে, উহা একেবারে সপ্তমে উঠিল। সে সেই অপূর্ব্ব সানুনাসিক স্বরে তাহার অযোগ্য স্বামীকে তিরস্কার করিয়া বলিল,—"আহাম্মকের কথা শুন? তোর মেয়ে নয় ত কার মেয়ে রে?" তার পর অনাথনাথের পালা। সে তাঁহার দিকে তাহার বিকট মুখ ফিরাইয়া এবং তাহার একটা বিকট ভঙ্গী করিয়া বলিল,—"আমার মেয়ে নহে ত কি তোমার মেয়ে? তোমার কথা শুনে যে গা জ্বালা করে।" তাহার পর আবার হতভাগ্য স্বামীর পালা—"কাণা না হ'লে কি এমন কথা বলে?" তাহার পর সে বুঝিল যে, কেবল তিরস্কার করিলে—বাবু বিশ্বাস করিবেন না। 'আহাম্মক' স্বামীর উত্তরটা কাটাইয়া দিতে হইবে। তখন সে বলিল,—"বাবু! তুমি ইহাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিও না। ওর বুদ্ধিশুদ্ধি কিছুই নাই, তাতে আবার কাণা! এই যে

চোখ দেখছ, এতে কিছুই দেখিতে পায় না। আমি হাড় কালী করিয়া, খাটিয়া, উহাকে খাওয়াই, তাহাতে উহার চলে। ও 'না' বলিল কেন, তা জান? মেয়েটি আমার পূর্ব্ব স্বামীর! তাই ওর মেয়ে নয় বলিয়াছে।" তখন আবার স্তম্ভিত স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিল,—"ওকে আপনার মেয়ে বলিতে যেন ওঁর লজ্জা হয়, পোড়া কপাল আমার! আমি এমন কাণার হাতেই পড়িয়াছি। আমার শরীরটা জ্বলিয়া কাল হইয়া গেল।" ক্রমে সানুনাসিক স্বর বর্দ্ধিত হইয়া কৃত্রিম রোদনে পরিণত হইল, এবং অঞ্চলের দ্বারা কোটরস্থ চক্ষু দুটি মার্জ্জিত হইতে লাগিল।

অনাথনাথ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন,—"কই, মেয়েটি ত তোমাদের মেয়ে—বলিল না। সে ত বলিল, তাহার মা বাপ কে, সে জানে না।"

একে বারে শিমুলস্তূপে অগ্নি বিক্ষিপ্ত হইয়া ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। বেদেনী ক্রোধে অধীরা হইয়া চীৎকার করিয়া বলিল,—"কি! সেও আমার মেয়ে বলিয়া বলে নাই! তারও আমাকে মা বলিতে লজ্জাবোধ হয়, পোড়ারমুখী! আমি আসি, তুই কোন্ বাদশাজাদী, আমি এখনই ঝাটার চোটে পরিচয় লইব।"

রমণীরত্ন উঠিয়া যাইতেছিলেন, অনাথনাথ যাইতে নিষেধ করিলেন। তিনি কিঞ্চিৎ কর্ত্তৃত্বভাবের সহিত বলিলেন,—"যাইও না, বৎস! তুমি সকাল হইতে মেয়েটিকে দু'বার মারিয়াছ।"

সেই কণ্ঠ শুনিয়া ও সেই কর্ত্তৃত্বভাবাপন্ন মুখ দেখিয়া সে কিছু ভীত হইল, এবং বসিয়া বলিল,—"মারিব না? মারিব না? এমন পোড়াকপালী মেয়েও গর্ভে ধরিয়াছিলাম। আমাকে যেখানে সেখানে গাল খাওয়ায়—ওর জন্যে আমার যেখানে

থানে গঞ্জনা!' বেদেনী সানুনাসিক স্বরে কাঁদিতে লাগিল, ং চক্ষু মুছিতে লাগিল।

অনাথনাথের পত্নী মনে করিলেন, অভাগিনী যে পোড়া- ালী, তাহার আর সন্দেহ নাই। এমন দেবীতুল্য মেয়ে না লে এমন পাপিনীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে?

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া অনাথনাথ আবার সেইরূপ গম্ভীরকণ্ঠে লিলেন,—"তোমার মেয়ে হউক, আর যার মেয়ে হউক; মেয়েটিকে দেখিয়া অবধি তাহার প্রতি আমার বড় স্নেহ ইয়াছে। মেয়েটিকে আমাকে দিতে হইবে। তোমরা াকা চাও দিব, জায়গা চাও, আমার এ জমিদারীতে জায়গা দিব। াড়ী ঘর করিয়া দিব,— তোমরা যাহাতে আর এ ব্যবসা না করিয়া এক জন ভাল গৃহস্থের মত থাকিতে পার।"

বেদে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইল। সে মেয়েটিকে বড় ভালবাসিত! অনাথনাথ জমিদার। তিনি মেয়েটিকে যখন এরূপ করিয়া চাহিতেছেন, তখন তাহাকে কত সুখেই রাখিবেন! তাহার নিজেরও বাড়ী, ঘর, জায়গা জমী করিয়া দিবেন। অন্ধের প্রতি ইহার অপেক্ষা দয়া আর কি হইতে পারে? সে আনন্দে অধীর হইল, এবং কৃতজ্ঞতাসূচক গদগদকণ্ঠে বলিল,—"অন্ধ ভিখারীর প্রতি বাবুর এই দয়া! বাবুকে ঈশ্বর আরও বড়মানুষ করুন! বাবুর সোণার কলম রূপার দোয়াত হউক!" তাহার আর বাক্য সরিল না।

বেদেনীও হাতে চাঁদ পাইল। সে বাবুটিকে আরও বোকা সাব্যস্ত করিল। সে মনে মনে সঙ্কল্প করিল, এ চাঁদ পূর্ণিমার, চাঁদ, সোণার চাঁদ করিতে হইবে। সে রুক্ষ কণ্ঠে বলিল,—"ভাল দয়া! আমার পেটের মেয়েটি, আমার সাত রাজার ধনটি, এঁকে দিব, আর উনি আমাকে একটা ঘর আর একটু জমী দিবেন।

কাজ নাই ওঁর দয়ায়। আমরা গরিব মানুষ, গতর খাটাইয়া খাইব। আমার মেয়ে থাকিলে আমি বাজি করিয়া কত টাকা পাইব। আমি লাখ টাকা পাইলেও আমার মেয়ে দিব না।" এই বলিয়া সে গাত্রোত্থান করিল।

অনাথনাথ বুঝিলেন, এ সহজ পাত্রী নহে। তাহার সঙ্গে শিষ্টালাপে চলিবে না। তখন তিনি চক্ষু রাঙ্গা করিয়া ক্রোধাকুল কণ্ঠে বলিলেন,—"বটে! তবে আমি তোকে লাখ টাকা খাওয়াইতেছি। তোর মত পাপিষ্ঠার এরূপ কন্যা কখনও হইতে পারে না। ভানুমতী আমাকে নিজে বলিয়াছে, তাহার পিতা মাতা নাই। আমি তাহাকে জোর করিয়া লইয়া যাইব।"

বেদেনী এতক্ষণে বুঝিল, লোকটা তত বোকা নহে। আরও বুঝিল যে, গতিকটা ভাল নহে। আর ভানুমতীকে তাহার কন্যা বলিলে চলিবে না। তখন সে পটপরিবর্ত্তন করিয়া বড় প্রসন্নমুখে বলিল,—"বাবু আপনি বড় লোক; আপনি রাগ করিবেন না। আসল কথা,—মেয়েটি বড় সুন্দরী দেখিয়া বাজি শিখাইবার জন্যে অনেক টাকা দিয়া এক জন বৈরাগীর কাছ থেকে আমার পূর্ব্ব স্বামী কিনিয়া লইয়াছিল। আমার টাকার কি হইবে?"

অ। কত টাকা?

বে। ঢের টাকা।

অ। কত?

বে। ৫০০৲ টাকা।

অ। বেশ কথা; আমি তাহা দিব।

বে। তার পর তাহাকে এই ২০ বৎসর খাওয়াইয়াছি,—পরাইয়াছি। আমার সে খরচের টাকা কে দিবে?

অনাথনাথ এবার একটুকু হাসিলেন; কারণ, মেয়েটির বয়স

১৫।১৬ বৎসরের বেশী হইতে পারে না। তথাপি তিনি বলিলেন,—"আচ্ছা, তাহাও আমি দিব।"

বে। তার পর এই ২০ বৎসর তাহাকে বাজি শিখাইয়াছি। আমার সে টাকা কোথায় পাইব?

অনাথনাথ তাহার জন্যেও টাকা দিতে স্বীকার করিলেন।

বে। তার পর সে আমাদের সঙ্গে থাকিয়া বাজি করিলে—সে আরও ৩০ বৎসর বাজি করিতে পারিবে,—সে টাকাটা একবার হিসাব করিয়া দেখ।

অনাথনাথ তাও হিসাব করিয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন।

বে। তার পর এ সব টাকা আমাকে দিতে হইবে। তাহার উপরে অন্ধকে দয়া করিয়া তুমি যেরূপ বাড়ী ও জায়গা জমী দিবে বলিয়াছ, তাহা তো দিবেই।

এতক্ষণে এ পাপিষ্ঠার প্রাপ্য তালিকার শেষ হইল দেখিয়া, অনাথনাথ হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। তাঁহার বক্ষ হইতে একটা গুরুভার নামিয়া গেল; কারণ তিনি বালিকাকে এই পিশাচীর হস্ত হইতে যেরূপে হউক উদ্ধার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন।

এমন সময়ে প্রবলবেগে ঝড় বহিতে আরম্ভ হইল। সঙ্গে সঙ্গে বেগে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। সমুদ্র ও আকাশ ভয়ঙ্কর আকৃতি ধারণ করিল। বজরা উলট পালট হইতে লাগিল। আকাশে বিকটাকার ঘনকৃষ্ণ মেঘখণ্ডের পর ঘনকৃষ্ণ মেঘখণ্ড ভীষণবেগে ছুটিতেছে। মধ্যে মধ্যে মেঘবিচ্ছেদে আকাশ দেখা যাইতেছে। আকাশের সেই নীলকৃষ্ণ বিচিত্র আকৃতি এবং ঝড়ের ঘূর্ণ্যমান-ভাব লক্ষ্য করিয়া অনাথনাথ বুঝিলেন যে,—একটা ভীষণ ঘূর্ণবাত্যা (cyclone), যাহা তিনি ২।৩ দিবস যাবৎ আশঙ্কা করিতেছিলেন, তাহা আগত প্রায়। তিনি ব্যস্ত হইলেন, এবং কাল উপস্থিত কথার একটা স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়া তাহাদিগকে টাকা, বাড়ী ও জমি

দিবেন বলিয়া, বেণেনীকে বিদায় করিয়া বলিলেন,—ঝড় বেশী হইলে তোমরা আমার কাছারীতে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিও।” তাহারা চলিয়া গেলে, তিনি তাঁহার বজরার বন্ধনাদি দৃঢ়তর করিতে লাগিলেন। তিনি এই সময়ে শুনিলেন যে, বালিকা তাঁহার নৌকায় বসিয়া আকাশ ও সমুদ্রের সম্মিলনের দিকে চাহিয়া—আর এক জন স্থানীয় কবির রচিত গীত গাহিতেছে।

১

কি ভীষণ রণে, দেখ ত্রিভুবনে,
নাচে কালী রণরঙ্গিণী।
কালী বল, কালী বল,
নাচে কাল-বক্ষে কাল-কামিনী ;
নাচে কালী কাল-কলনী।

২

নিশ্চল পুরুষ বক্ষেতে তামসী
নাচিছে প্রকৃতি, করে ধ্বংস-অসি,
ছিন্ন শির, কি রুধির
প্লাবে শ্যাম অঙ্গ,—শ্যাম-অবনী!

৩

দুই কর লয়, দুই বরাভয়;
—লয় বিনা সৃষ্টি স্থিতি নাহি হয়,—
সদা শিব, ঊর্দ্ধগ্রীব,
দেখ ধ্বংস-মূলে স্থির আপনি।

৪

প্রকৃতি উলঙ্গ।—মাতা বিবসনা,
ললাটে অনল, অঙ্গার-বরণা,

চারি ভুজ, ত্রিনয়ন,
ও মা! ধ্বংসরূপে সুর্ব্বব্যাপিনী।

৫

জরা ব্যাধি আদি বিকৃতা বিঙ্করী,
নাচে রণ-রঙ্গে ধ্বংস-সহচরী,
অট্ট হাস কি উল্লাস,
ধরা শ্মশানে নৃমুণ্ডমালিনী।

৬

জন্মে চণ্ড মুণ্ড সৃষ্টি-বিবর্ত্তনে,
রক্তে পশুবীজ রক্তবীজ সনে,
কদাকার, দুরাচার
নাশি', সৃজিলে মানব, জননি।

৭

ঘোর অমানিশি, হৃদে ওমা! আসি
নাচ, রক্তবীজ—কাম ক্রোধ গ্রাসি',
চণ্ড—ক্রোধ, মুণ্ড—দ্বেষ,
নাশি', কর সুর-রাজ্য অবনী।

পঞ্চম অধ্যায়।

—*—

দুর্গা।

অপরাহ্ণ ৩টা হইতে প্রকৃত ঘূর্ণবাত্যা (cyclone) বহিতে আরম্ভ হইল। ঝড় ঘুরিয়া ঘুরিয়া, থাকিয়া থাকিয়া, এরূপ বেগে বহিতে লাগিল, এবং তরঙ্গে অনাথনাথের বজরা তীরে এরূপ

আহত হইতে লাগিল যে, আর উহাতে থাকা তিনি নিরাপদ মনে করিলেন না। তিনি বজরা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার নিকটবর্ত্তী কাছারি-বাটীতে যাইবেন, স্থির করিলেন; কিন্তু যাইবেন কিরূপে? এরূপ ঝড় ও বৃষ্টি হইতেছে যে, বজরা হইতে মুখ বাহির করিবার সাধ্য নাই। কি করিবেন, ভাবিতেছেন, এমন সময়ে ঝড়ে বজরার গবাক্ষ উড়াইয়া লইতে লাগিল, এবং ভীষণ বিক্রমে ঝড় বজরার মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। তখন আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া সম্মুখে বসন বিছানা যাহা পাইলেন, তাহার দ্বারা তাঁহার স্ত্রীকে আবৃত করিয়া ও আপনি ক্রোড়স্থ শিশু পুত্র সহ আবৃত হইয়া বজরা হইতে অতি কষ্টে অবতীর্ণ হইলেন, এবং কাছারির দিকে চলিলেন। তিনি তাঁহার স্ত্রীকে বাম হস্তে জড়াইয়া ধরিয়াছিলেন, কিন্তু সাধ্য কি, এক পা অগ্রসর হইবেন? ঝড়বেগ তাঁহাদিগকে এক দিকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। গায়ের আবরণ ও চর্ম্ম পর্য্যন্ত ভেদ করিয়া বৃষ্টিধারা বন্দুকের গুলির মত শরীরে প্রবেশ করিতে লাগিল। তাঁহারা কাঁপিতে লাগিলেন, কাঁদিতে লাগিলেন, শেষে চলিতে না পারিয়া বসিয়া পড়িলেন। সিন্ধুগর্জ্জনে ও ঝটিকাগর্জ্জনে কর্ণ বধির হইয়া যাইতেছিল। তাঁহাদের বোধ হইল, যেন মহাবিক্রমে ধরা প্লাবিত করিতে সিন্ধু ঘোর গর্জ্জন করিয়া আসিতেছে। ইতিমধ্যেই—এই ৩টা ৩॥০ টার সময়ই,—প্রায় চারি দিক সন্ধ্যার মত অন্ধকার হইয়া উঠিয়াছে। অবিরল বৃষ্টিধারায় যে ক্ষীণালোক আছে, তাহাতেও কিছুই দেখিতে দিতেছে না। তাঁহার ভৃত্য ও মাঝিগণ আসিয়া তাঁহাদিগকে ধরিল, এবং জড়াইয়া লইয়া হাহাকার করিতে করিতে তাঁহাদিগকে জড়পদার্থের মত লইয়া চলিল। কাছারি, গ্রাম, পাহাড়, সমুদ্র, কিছুই দেখা যাইতেছিল না। বৃষ্টি এরূপ বেগে পড়িতেছিল

যে, চক্ষু মেলিবার সাধ্য ছিল না। চক্ষে যেন কঙ্কর প্রবিষ্ট হইতেছে, ঝড়ের বেগে নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতেছে। তাঁহারা কেবল গর্জ্জনমাত্র লক্ষ্য করিয়া এবং উহা পশ্চাতে রাখিয়া, অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহার কাছারি-বাটী সমুদ্রের তীরে বসিলেও চলে। তথাপি ঝড়ের বেগে ঘুরিয়া ফিরিয়া, পড়িয়া, উঠিয়া, প্রায় এক ঘণ্টাকাল পরে, তিনি মৃতবৎ পত্নীপুত্র সহ কাছারিতে উপস্থিত হইলেন। সেখানে যাইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে প্রাণ আরও শুকাইয়া গেল। [কাছারির গৃহ সকল নরনারী ও শিশুতে, কোলাহল ও ক্রন্দনধ্বনিতে, এরূপ পরিপূর্ণ যে, সেখানে দাঁড়াইবার স্থান নাই, কথা কহিবার সাধ্য নাই। তিনি বুঝিলেন যে, প্রজাদের ঘর বাড়ী সকলই পড়িয়া গিয়াছে। তাহারাও তাঁহার মত অর্দ্ধমৃতঅবস্থায় কাছারিতে আশ্রয় লইয়াছে। অনাথনাথকে দেখিয়া তাহারা সকলেই প্রথমে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া হাহাকার করিয়া উঠিল। সকলে বলিতে লাগিল,—"বাবা! বাড়ীঘর পড়িয়া গিয়াছে! আমাদের কি উপায় হইবে?" কেহ বলিতেছিল,—"ওরে বাড়ী ঘর যাক্, এখন জান্ থাকিলে হয়।" কেহ—"আমার ছেলে কোথায় গেল," কেহ বা—"মেয়ে কোথায় গেল"—কেহ বা "আমার বুড়া মা-বাপ কোথায় গেল"—বলিয়া হাহাকার করিয়া কাছারি হইতে তাহাদের অন্বেষণে উন্মত্তের মত ছুটিয়া যাইতেছে। অনাথনাথের কাছারি ও ছোট ছোট ঘর সকল পড়িয়া গিয়াছে, কেবল কয়েকখানি বড় ঘর আছে, কিন্তু ঝড়ের প্রত্যেক আঘাতে সশব্দে এরূপ কম্পিত হইতেছে যে, তাহাও যে বহুক্ষণ থাকিবে, এমন বোধ হইল না। অনাথনাথ পত্নীপুত্রসহ আর্দ্র বসনাদি ত্যাগ করিয়া কাছারিস্থ ভৃত্যাদিগের পরিধেয় বস্ত্র পরিধান করিয়া একখানি তক্তপোষের উপর বসিলেন। প্রজাদিগের এই দুরবস্থা

দেখিয়া তখন তিনি আপনার বিপদ ভুলিয়া গেলেন। তাঁহার প্রথম ভাবনা হইল, সেই অনাথা বালিকা ভানুমতীর জন্যে। তিনি বজরা ত্যাগ করিবার সময়ে বেদেদিগকেও কাছারিতে আশ্রয় লইতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু সকল ঘরে ঘরে অনুসন্ধান করাইয়া তাহাদের কোনও খবর পাইলেন না। তিনি সমবেত লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"তোমরা যদি কেহ সেই বেদেদের কি তাহাদের পুত্রকন্যা দুটিকে এখানে আনিতে পার, আমি ১০০৲ টাকা পুরস্কার দিব।" কেহই সাহস করিল না। এক জন বলিল,—"কর্ত্তা! তাহারা কি এতক্ষণ আছে? কোন্ কালে সে ছোট নৌকা খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাসিয়া গিয়াছে।" তিনি ক্রমে পুরস্কারের অঙ্ক বাড়াইলেন। কিন্তু সকলে নীরবে শুনিল। তিনি তখন নিজে যাইতে চাহিলেন। তাঁহাকে তাহারা বলে ধরিয়া রাখিল। বলিল,—"কর্ত্তা কি পাগল হইলেন? কোথাকার বেদে, তাহাদের জন্যে আপনার প্রাণটা দিবেন?" তিনি প্রকৃতই আত্মহারা হইয়াছিলেন। তিনি তাহাদের ছাড়াইয়া, তাঁহার পত্নী পুত্রের রোদনে কর্ণপাত না করিয়া ছুটিলেন; কিন্তু গৃহের প্রাঙ্গণেই ঝড়ের বেগে এরূপ ভাবে পড়িয়া গেলেন যে, আর চলিবার শক্তি রহিল না। তাঁহাকে আবার তাঁহার ভৃত্য ও প্রজারা ধরিয়া গৃহে আনিয়া বসন পরিবর্ত্তন করাইল। তিনি বসিয়া, উহাদের কি হইল; কাছারি হইতে দূরবর্ত্তী প্রজাদের কি হইল, ভাবিতে ভাবিতে কাঁদিতে লাগিলেন। কিন্তু ৫টার সময় ঝড় ও বৃষ্টির বেগ এরূপ বর্দ্ধিত হইল, এমন অন্ধকার হইয়া উঠিল যে, তাঁহার কণ্ঠ শোকে রুদ্ধ হইল।

ঘোর অন্ধকার ঘোরা নিশীথিনী
যেন অপরাহ্ণ হইল আমার;

অভ্রান্ত কালের অভ্রান্ত গতিতে
যেন ঘোর ভ্রান্তি হইল সঞ্চার।
ঘোর গরজন, ঘুঁরিয়া ঘুরিয়া,
ভৈরববিক্রমে ঝটিকা ঘূর্ণিত ;
রহিয়া রহিয়া, আসিছে যাইছে,
আঘাতে পৃথিবী করিয়া কম্পিত।
ভীষণ আঘাত সহিতে না পারি,
হইতেছে যেন ঘন ভূকম্পন ;
ঘোর হুহুঙ্কার, ঝড় বৃষ্টি মিলি,
ধরাধ্বংসকারী করিতেছে রণ।
ঝড়ের গর্জ্জন, সিন্ধু-আস্ফালন,
কি ঘোর আরাব উঠিছে ভাসি !
যেন ঘোরারাবী, মহারৌদ্রী কালী,
নাচিছে তাণ্ডব ঘোর অট্টহাসি।
ঝলকে ঝলকে, সে ভীষণ হাসি,
ঝলসি বিদ্যুতে জলদ-নীলিমা,
ভাসে স্তরে স্তরে, ঘোর কৃষ্ণাকাশে,
দেখাইয়া কিবা ধ্বংসমূর্ত্তি ভীমা।
সমুদ্রের গর্ভে উঠিছে জ্বলিয়া
বাড়বাগ্নি মত অনলরাশি ;
রুদ্ধ ক্রোধানল, বক্ষ বিদারিয়া,
বসুধার যেন উঠিছে ভাসি।
সে ভীম আলোকে, বক্ষে জলধির
কি মহাবিপ্লব দেখায় ভীষণ,
পর্ব্বত-প্রতিম কি তরঙ্গমালা
করিছে ফেনিল সিন্ধু বিলোড়ন !

ঝটিকার সনে যেন মহাসিন্ধু
মাতিয়াছে মহা প্রলয়-আহবে ;
অসংখ্য কামান, বজ্র সংখ্যাতীত,
গর্জ্জিতেছে যেন অবিরাম রবে।
উচ্চ গৃহাবলী, মহা মহীরুহ,
পড়িছে ভাঙ্গিয়া তৃণযষ্টি মত ;
পড়িছে অসংখ্য রথ রথী যেন,
ভৌতিক সংগ্রামে হইয়া হত।
কোথাও পতিত গৃহ, গৃহস্থিত
অনলে হঠাৎ উঠিছে জ্বলিয়া ;
করিছে ঝটিকা, কি কৌতুকক্রীড়া,
অগ্নিশিখা মেঘে মেঘে মাখাইয়া।
ঘন ঘন ঘোর ঝটিকা-গর্জ্জন,
গুলিধারা মত বৃষ্টিবরিষণ ;
ঘন ভূকম্পন, মেঘ স্তরে স্তরে
ঘন ঘন স্থায়ী বিদ্যুৎস্ফুরণ
মেঘে তরঙ্গিত অগ্নি ঘোরাকাশে,
অগ্নি নীলাম্বুধি-গর্ভে তরঙ্গিত ;
গৃহের পতন, বৃক্ষ-উৎপাটন,
ভৈরব আরাবে বিশ্ব বিলোড়িত।

আজ কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী। কালি কালীপূজা। অনাথনাথের কর্ণে ভানুমতীর সেই গীত যেন কি ভীমকণ্ঠে ধ্বনিত হইতে লাগিল ;—

"কি ভীষণ রণে, দেখ ত্রিভুবনে, নাচে কালী রণরঙ্গিণী।"

তাঁহার বোধ হইল, যেন সেই মহামেঘপ্রভা সৃষ্টিসংহারিণী ধ্বংসরূপিণী মহাশক্তি সৃষ্টি সংহার করিয়া তাণ্ডব নৃত্য করি-

তেছেন। সেই ঘোর অন্ধকার তাঁহারই বর্ণ; সেই ঝটিকা তাঁহারই গতি ও নৃত্য। ঝটিকার রহিয়া রহিয়া সেই ভীষণাঘাত, তাঁহারই অসি প্রহার; তাঁহারই পদদলনে সিন্ধু বিলোড়িত হইয়া, অগ্নি উদ্গিরণ করিতেছে। মেঘস্তরে যে আলোক দেখা যাইতেছে, ইহা তাঁহার নেত্রানল, এবং বারিধারা তাঁহারই লোলজিহ্বাবিগলিত রুধিরধারা। অনাথনাথ বুঝিতে পারিলেন যে, ঘূর্ণবাত্যায় সহস্র সহস্র লোক, সংহারকারিণীর গ্রাসে পতিত হইয়া, তাঁহাকে রুধিরপ্লাবিতা নরমুণ্ডমালিনী সাজাইতেছে। সমুদ্রে ও আকাশে আলোকরাশি দেখিয়া সকলের মনে সমধিক আতঙ্ক উপস্থিত হইল। এ আলোক কিসের, কেহই স্থির করিতে পারিতেছিল না। কয়েক দিবস যাবৎ যেরূপ দারুণ গ্রীষ্ম পড়িয়াছিল, অনাথনাথ যেরূপ গন্ধকের গন্ধ অনুভব করিয়াছিলেন, এখনও ঝটিকা যেরূপ গন্ধকের গন্ধ বহিয়া আনিতেছিল, তাহাতে তাঁহার বোধ হইল, ভূগর্ভস্থ গৈরিকাগ্নি সমুদ্রে নির্গত হইতেছে। আকাশেও তিনি লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, প্রজ্বলিত গৃহাগ্নিতে মেঘমালা স্তরে স্তরে রঞ্জিত হইতেছে। স্থানে স্থানে যেন বিদ্যুদালোকে মেঘস্তর বহুক্ষণ পর্য্যন্ত আলোকিত করিয়া রাখিতেছে, এবং ঝটিকার ভীষণ ক্রীড়া ভীষণতর করিয়া তুলিতেছে। ৫টার সময় হইতে ঘোরতর অন্ধকার হইয়াছিল। ৬টার সময়ে ঠিক যেন অমাবস্যার নিশীথের মত অন্ধকার হইল; এবং দক্ষিণ দিক হইতে এরূপ ভীষণ বেগে ঝড় বহিতে লাগিল যে, আর তাঁহাদের ঘরে থাকা অসাধ্য হইয়া উঠিল। যে কাছারীঘরে তিনি আশ্রয় লইয়াছিলেন, তাহাতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পার্ব্বত্যবৃক্ষের ২০০ খুঁটি ছিল। কিন্তু তথাপি গৃহখানি প্রত্যেক আঘাতে মড় মড় শব্দে কাঁপিতে লাগিল। প্রত্যেক আঘাতের পর ঝটিকা আবার ঘুরিয়া আসিয়া যেন বল-সঞ্চয় করিতে একটু

বিরাম লইয়া, আবার সমধিক বিক্রমে আঘাতের পর আঘাত করিতেছে। যেন থাকিয়া থাকিয়া শত সহস্র মত্ত বারণ গৃহের দক্ষিণ দিকে এক সঙ্গে আক্রমণ করিতেছে। বাঁশের নিবিড় দৃঢ় বেড়া ভেদ করিয়া বন্দুকের গুলির মত বৃষ্টির ফোঁটা তাঁহাদের গায়ে পড়িতে লাগিল, এবং গৃহ জলপূর্ণ করিয়া ফেলিল। দারুণ শীতে দাঁতে দাঁত লাগিয়া কাঁপিতে লাগিল। শিশু পুত্রটির জন্যে তিনি বিশেষ চিন্তান্বিত হইলেন। কিন্তু ঘর যেরূপ কাঁপিতেছে, তবং প্রত্যেক আঘাতে পড়-পড় হইতেছে, দক্ষিণ দিকে যেন শত সহস্র কামানের গোলা বর্ষিত হইতেছে—অনাথনাথ আর এ ঘরে থাকা নিরাপদ মনে করিলেন না। কি করিবেন, ভাবিতেছেন. এমন সময়ে অন্য গৃহস্থিত লোকের আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলেন। অন্য দুই এক খানি ঘর, যাহা এতক্ষণ ঝড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহাও পড়িয়া গেল। তখনই এই ঘরের লোকও আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল,—"ঘর পড়িতেছে, ঘর পড়িতেছে, বাবু! বাহির হউন!" এবং জনতা পরস্পরকে দলিত করিয়া বাহিরের দিকে ছুটিল। কত লোক পড়িয়া গেল, তাহাদের উপর দিয়া কত লোক চলিয়া গেল।

অনাথনাথ পুত্রটিকে বুকে লইয়া ও পত্নীকে বাম করে জড়াইয়া বহির্গত হইলেন; আর তখনই ঝড়ে ২০০ বৃহৎ কাঠের খুঁটি মধ্যভাগে তৃণবৎ ভাঙ্গিয়া গৃহখানি ভূতলশায়ী করিল। কয়েক জন ঘর চাপা পড়িয়া মরিল, কয়েক জন মৃত্যুমুখে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। সে আর্ত্তনাদ ঝড়ে উড়িয়া গেল, কেহ শুনিল না। আর শুনিবেই বা কে? ঝটিকার ও সিন্ধুর মিশ্রিত ভৈরব-নিনাদে পৃথিবী যেন কাঁপিতেছে, বিদীর্ণ হইতেছে। যাহারা বাহির হইয়া আসিয়াছে, তাহারাও "হা ঈশ্বর। হা আল্লা।" রবে আর্ত্তনাদ করিতেছে। কিন্তু কার আর্ত্তনাদ কে শুনে? তখন সকলেই আত্ম-

রক্ষার জন্যে, আত্মীয়রক্ষার জন্যে ব্যাকুল। এ দিকে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে; বৃষ্টিধারাও এরূপ বেগে পড়িতেছে যে, চক্ষু মেলিবার সাধ্য নাই; শরীরের অস্থিতে পর্য্যন্ত যেন সে ধারা প্রবেশ করিতেছে, এবং দারুণ শীতসঞ্চার করিতেছে! তাহাতে রহিয়া রহিয়া শিলাবৃষ্টিও হইতেছে। লোকে পতিত বৃক্ষের ডালের নীচে, পতিত গৃহের চালের নীচে, যে যেখানে পারিল, আশ্রয় লইল। অনাথনাথও সপরিবারে এক খানি চালের নীচে গেলেন, এবং পুত্রটিকে বুকে লইয়া পতিপত্নী সেই বিপদভঞ্জন মধুসূদনকে ডাকিতে লাগিলেন। তখন এরূপ গাঢ় অন্ধকার যে, হস্ত প্রসারিত করিলেও দেখা যাইতেছিল না। কেবল অন্ধকারে হামাগুড়ি দিয়া হাতড়াইয়া, পতিত চালের আশ্রয় লইয়াছিলেন। কেবল কখন কখন সমুদ্রগর্ভে সেই ভীষণ অগ্নিশিখা, কখন কখন স্থায়ী বিদ্যুৎপ্রদীপ্ত ঘনকৃষ্ণ মেঘস্তর মাত্র দেখা যাইতেছিল, এবং সেই আলোকে ভীষণ সংহারক্রীড়া নেত্রগোচর হইয়া হৃদয়ে আরও ভীতি সঞ্চারিত হইতেছিল। পতিপত্নী উভয়ে জীবনের আশা বিসর্জ্জন দিয়া, কেবল শিশুটিকে রক্ষা করিতে শ্রীভগবানকে ডাকিতেছিলেন।

রাত্রি অনুমান এক প্রহরের সময়ে সমুদ্র যেন ক্রমে ভীষণ হইতে ভীষণতর, এবং নিকট হইতে নিকটতর হইতে লাগিল। তখন অনাথনাথ প্রথম হইতে যে সমুদ্রপ্লাবনের আশঙ্কা করিতেছিলেন, তাঁহার সেই আশঙ্কা আরও গুরুতর হইল। ঝড় তখন পশ্চিম সমুদ্রের দিক হইতে বহিতেছে বুঝিয়া, সে আশঙ্কায় তাঁহার কণ্ঠ তালু শুকাইয়া গেল। এ আশঙ্কা মনে উদিত হইবামাত্রই চারি দিকে লোকেরা "গর্কি! গর্কি" বলিয়া হাহাকার করিয়া উঠিল, এবং "চালে উঠ! গাছে উঠ!" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। অনাথনাথও পত্নী পুত্রকে লইয়া একটা চালের

উপর উঠিলেন, এবং তখনই অন্ধকার ভেদ করিয়া একটি প্রকাণ্ড সমুদ্রতরঙ্গ আসিয়া তাঁহাদিগকে গুরুতর আঘাত করিয়া মস্তকের উপর দিয়া চলিয়া গেল, এবং চালাখানি সেই সঙ্গে ভাসাইয়া নিল। অনাথনাথ একখানি উড়ানি দ্বারা তাঁহার পত্নী পুত্রকে আপনার দেহের সঙ্গে দৃঢ়রূপে বাঁধিয়াছিলেন। মুহূর্ত্ত পরে দ্বিতীয় এক তরঙ্গ আসিয়া সে চালাখানি উল্‌টাইয়া দিল, এবং তাঁহাদিগকে ডুবাইয়া ভীষণ বেগে ভাসাইয়া লইয়া চলিল। অনাথনাথ খুব বলিষ্ঠ পুরুষ ও সন্তরণপটু ছিলেন। জলরাশির উপর ভাসিয়া উঠিয়া দেখিলেন, তাঁহার সেই লক্ষ্মী-স্বরূপা পতিপ্রাণা পত্নী নাই। তরঙ্গে উড়ানি ছিন্ন করিয়া তাঁহাকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে তাঁহার হৃদয় যেন ঝটিকা অপেক্ষাও বিরাটশব্দ করিয়া বিদীর্ণ হইল; তিনি ডুবিয়া গেলেন। আবার যখন উঠিলেন, তখন একখানি কাষ্ঠ বেগে ভাসিয়া আসিয়া তাঁহাকে ও তাঁহার বক্ষঃস্থ পুত্রটিকে ভীষণ আঘাত করিল। আঘাতে উভয়ে চীৎকার করিলেন। সেই মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ ঝড়ে ভাসিয়া গেল। তিনি বাম হস্তে পুত্রকে ধরিয়া সন্তরণ করিতেছিলেন, কিন্তু দক্ষিণ হস্তে ও বক্ষে এরূপ ব্যথা অনুভব করিলেন যে, পুত্রকে ও আপনাকে রক্ষা করিবার আশা তিনি ত্যাগ করিলেন। তাঁহার দেহেও যেন মূর্চ্ছা সঞ্চারিত হইতেছিল। তিনি সেই অর্দ্ধমূর্চ্ছিতাবস্থায় চীৎকার করিয়া ডাকিয়া বলিলেন,—"কেহ যদি আমার পুত্রটিকে রক্ষা কর; আমার সমস্ত বিষয় তাহাকে দিব।" এমন সময়ে দৈববাণীর মত তাঁহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইল,—"বাবা! ভয় নাই, তুমি যাকে রক্ষা কর। আমি অমিয়কে রক্ষা করিব।" অনাথনাথ কেবল বলিলেন,—"মা! তুই কে? তুই কি সত্যই 'কমলে কামিনী দুর্গা'?" এমন সময়ে কর্দ্দমময় তৃতীয় এক তরঙ্গ আসিয়া তাঁহাকে আহত করিল।

নাকে মুখে কর্দ্দমাক্ত জল প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার নিশ্বাস বন্ধ করিয়া ফেলিল। অনাথনাথ মূর্চ্ছিত হইলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

—*—

রণক্ষেত্র।

চৈতন্য লাভ করিয়া অনাথনাথ দেখিলেন, এক কাষ্ঠখণ্ড জড়াইয়া ধরিয়া তিনি তাহার উপর মৃতবৎ পড়িয়া আছেন। তিনি সম্পূর্ণ বস্ত্রহীন। ধীরে ধীরে উঠিয়া কাষ্ঠখণ্ডের উপর বসিলেন। কর-পদ সঞ্চালন করিয়া দেখিলেন, কর্দ্দমাবৃত দৃঢ়-ভূমি। একি সমুদ্র বেলা, না সমুদ্রগর্ভস্থ কোনও চূড়াভূমি? তখন আকাশ নির্ম্মল। সেই ঘটনার চিহ্নমাত্র নাই। কদাচিৎ কোথাও দুই এক খণ্ড মেঘ নীল-সমুদ্রের চড়ার মত দেখা যাই-তেছে। সেই ঘোর ঘূর্ণঝটিকাও নাই। কেবল থাকিয়া থাকিয়া শ্রান্ত পবনদেবের নিশ্বাসের মত এক একবার বাতাস বহিয়া যাইতেছে, এবং তাঁহার আর্দ্র দেহে দারুণ শীতসঞ্চার করিতেছে। কৃষ্ণা-চতুর্দ্দশীর আকাশে অনন্ত নক্ষত্ররাজি ফুটিয়া আছে। নক্ষত্রের অবস্থান অবলোকন করিয়া অনাথনাথ বুঝিলেন, দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে। চারি দিক শান্ত, স্থির, নীরব—নিশ্চল। অনাথনাথের আবার ভানুমতীর সেই গীত মনে পড়িল;—

"কি ভীষণ রণে, দেখ ত্রিভুবনে, নাচে কালী রণরঙ্গিণী!"

সেই তাণ্ডবনৃত্যের পর এই শান্তি। অনাথনাথ সেই ভীষণ ঝড় ও সেই ভীষণ দৃশ্য সকল তবে স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন?

না ;—তিনি উলঙ্গ ; পত্নীপুত্রহারা ; অজ্ঞাত স্থানে নিপতিত ও শীতে কম্পিত ; স্বপ্নই বা হইবে কেন ? তিনি কাঁদিতে লাগিলেন এবং মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"হায় মা! তোর এ কি বিচিত্র পটপরিবর্ত্তন ! সেই ঘূর্ণাবাত্যার পর এই শান্তি! সেই ঘোর অট্টহাসির পর এই মৃদু হাসি! সেই ঘোর উল্লম্ফনের পর এই নিশ্চল ভাব! সেই সৃষ্টি-সংহারিণী মূর্ত্তির পর এই মোহিনী রূপ! হায় মা! তুই আমার সেই পতিপ্রাণা পত্নী এবং পিতৃপ্রাণপ্রতিম শিশু পুত্রটিকে গ্রাস করিয়া তোর মোহিনী শোভা দেখিবার জন্য কি হতভাগ্য আমাকে জীবিত রাখিলি!" তিনি এবার উচ্চৈঃস্বরে প্রাণ খুলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ এরূপ কাঁদিলেন, এবং বহুক্ষণ এরূপ ভাবিলেন। সেই রোদন, সেই চিন্তা, যে কখনও এরূপ অবস্থায় পতিত হয় নাই, সে কেমন করিয়া বুঝিবে? অনেকক্ষণ তাঁহার হৃদয়েও যেন ঘূর্ণবাত্যা বহিল। অনেকক্ষণ রোদনের পর সেই বাত্যা বর্ষণ শেষ হইয়া হৃদয় কিছু শান্তভাব ধারণ করিলে, তিনি ভাবিলেন, তিনি যেরূপ রক্ষা পাইয়াছেন, তাঁহার পত্নী ও পুত্র সহ সেই দুর্গতি-হারিণী দুর্গারূপিণী ভানুমতীও ত রক্ষা পাইতে পারে। এই ক্ষীণ আশার সঞ্চারে হৃদয়ে ও দেহে ক্ষীণ শক্তিরও সঞ্চার হইল। তিনি চারি দিকে কতকগুলি চঞ্চল আলোক দেখিলেন। এ সকল কিসের আলোক? এ কি কোনও রূপ ভৌতিক আলোক? সিন্ধু-সৈকতে তরঙ্গাভিঘাতে লবণাম্বুকণারাশি বিক্ষিপ্ত হইয়া যে আলোক উৎপন্ন করে, একি সেইরূপ কোনও আলোক এই ঘূর্ণঝটিকার পর সমুদ্র-গর্ভে কিংবা সৈকতে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে? কিছুক্ষণ মনোনিবেশ পূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিলে অনাথনাথের বোধ হইল, যেন আলোকের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ছায়া দেখা যাইতেছে। আরও কিছুক্ষণ দেখিলে তাঁহার নিশ্চয় বোধ

হইল, যেন মানুষ আলোক লইয়া কি দেখিতেছে। ক্রমে ক্রমে দূর হইতে যেন মানুষের অস্ফুট আর্ত্তনাদও তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল। তাঁহার মত কি তবে আরও কেহ সমুদ্র-তরঙ্গে ও ঝটিকায় তাড়িত হইয়া আহত অবস্থায় এখানে পড়িয়া আছে? তাহাদের মধ্যে কি তাঁহার পত্নীপুত্র ও সেই অনাথা বালিকা থাকিতে পারে না? এ সন্দেহে তাঁহার শরীরে আরও বল সঞ্চারিত হইল। তিনি সেই উলঙ্গ অবস্থায় সে সকল আলোক লক্ষ্য করিয়া দক্ষিণ দিকে চলিলেন। কয়েক পদ যাইবার পর তাঁহার পায়ে কি যেন ঠেকিল। তিনি স্বচ্ছ অন্ধকারে বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন,—একটি মৃত মানবদেহ। এইরূপে পদে পদে মৃত মানব ও গো, মহিষ, ছাগ, পালিত পশু-পক্ষীর দেহ তাঁহার চরণে ঠেকিতে লাগিল। একটি দেহে পা পড়িবামাত্র ক্ষীণকণ্ঠে রোদনব্যঞ্জক চাৎকার উঠিল, কণ্ঠ স্ত্রীলোকের। অনাথনাথ চমকিয়া এক পা সরিলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কে?" উত্তরে একটি যবনী নাম শুনিলেন। সে ক্ষীণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—"আমি কোথায়?" অনাথনাথ উত্তর করিলেন,—"বলিতে পারি না।" তখন "হা আল্লা!" বলিয়া রমণী একটি বেদনাব্যঞ্জক দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। অনাথনাথ তাহাকে উঠিতে বলিলেন। সে আর উত্তর দিল না।—তিনি নিজে বসিয়া তাহাকে উঠাইতে গিয়া দেখিলেন, সেও তাঁহার মত উলঙ্গ। তাহাকে অতি কষ্টে তুলিয়া বসাইলে সে যেরূপ ভাবে পড়িয়া গেল, তাহাতে অনাথনাথ বুঝিলেন, তাহার জীবন শেষ হইয়াছে। যাইতে যাইতে কোথাও শিশুর ক্রন্দন, কোথাও রমণীর রোদন, কোথাও পুরুষের আর্ত্তনাদ শুনিতে লাগিলেন। অনাথনাথের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। তিনি একটি আলোকের

দিকে ছুটিলেন। সে আলোকটি এবং সে আলোকধারীকে আনিয়া তিনি এই আর্ত্তনাদের কিছু সাহায্য করিতে পারেন কি না, দেখিবেন। কিন্তু আলোকের নিকট গিয়া যাহা দেখিলেন, তাঁহার শরীর শিহরিয়া উঠিল। দেখিলেন, এক জন মুসলমান একটা বাঁশের "বোঁধা" * জ্বালাইয়া মৃত ব্যক্তির দেহ হইতে বস্ত্র অলঙ্কার ইত্যাদি অপহরণ করিতেছে। এক স্থানে ২।৩টা লোক একটা কাষ্ঠের সিন্দুক লইয়া টানাটানি করিতেছে। কেহ কেহ থালা, ঘটী বাটি ইত্যাদি নানাবিধ দ্রব্য কুড়াইতেছে। অনাথনাথ বুঝিলেন যে, এ সকল মৃতদেহ ও দ্রব্যাদি সমুদ্র-প্লাবনে ভাসিয়া আসিয়াছে, এবং এ সকল তস্কর নিকটস্থ কোনও গ্রামবাসী। এক জনকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ কোন্ স্থান?" সে এক বিকট হাসি হাসিয়া বলিল,—"দেখছ না, তোমার শ্বশুর-বাড়ী। এই যে এক শাশুড়ী পড়ে আছে।" এই বলিয়া সে একটা কর্দ্দমাক্ত স্ত্রীলোকের দিকে ছুটিল, এবং তাহাকে উলঙ্গ করিয়া তাহার বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি খুলিয়া লইতে লাগিল। হাতের সোণার বালা খুলিবার জন্য সবলে টানিলে স্ত্রীলোকটি সংজ্ঞালাভ করিয়া যাতনায় চীৎকার করিয়া উঠিল। তখন পাপিষ্ঠ তাহার মাথায় এক লাঠি প্রহার করিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিয়া আবার বালা টানিতে লাগিল। অনাথনাথ আর সহিতে পারিলেন না। তাঁহার দেহে মত্তমাতঙ্গ-বল সঞ্চারিত হইল। তিনি ছুটিয়া গিয়া তাহারই হাতের লাঠি কাড়িয়া লইয়া তাহাকে আঘাত করিলেন। সে হাতের "বোঁধা" ফেলিয়া চীৎকার করিয়া পলায়ন করিল, এবং তাহার চীৎকার শুনিয়া আরও কয়েক জন তাহার পথ অনুসরণ করিল। অনাথনাথ সেই হতভাগিনীকে মা! মা!

---

* অনেকগুলি বাখারি একত্র বাঁধা, এ অঞ্চলে বোঁধা বলে।

বলিয়া ডাকিলেন। কিন্তু কোনও উত্তর না পাইয়া বুঝিলেন, হতভাগিনীর দুঃখ-যন্ত্রণার শেষ হইয়াছে। তিনি সেই বোঁধার আলোকে খুঁজিয়া একখানি বস্ত্র কুড়াইয়া লইয়া তাহার লজ্জা নিবারণ করিলেন, এবং যাহারা জীবিত অবস্থায় রোদন করিতেছিল, তাহাদের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কি শুশ্রূষা করিবেন? কেহ সমুদ্রের লবণজল পান করিয়া দারুণ পিপাসায় জল চাহিতেছে। তিনি ভাল জল কোথায় পাইবেন? কেহ বলিতেছে,—"আমি কোথায়", কেহ "আমার পুত্র কোথায়", কেহ "আমার পতি কোথায়?" তিনি কি উত্তর দিবেন? কেহ উলঙ্গ অবস্থায় শীতে কাঁপিতেছে, বসন চাহিতেছে। ভাসিয়া আসিয়া স্থানে স্থানে যে সকল বসন পড়িয়া আছে, তিনি কুড়াইয়া আনিয়া দিলেন। এক দিকে স্থানে স্থানে এই হাহাকার, অন্য দিকে স্থানে স্থানে তস্করদিগের আনন্দোচ্ছ্বাস, কোথাও বা অপহৃত বস্তু লইয়া কাড়াকাড়ি, মারামারি। হাতের বোঁধাও জ্বলিয়া গেল। অন্ধকারে কোথায় যাইবেন, কি করিবেন? অনাথনাথ একখানি কাষ্ঠের উপর অবসন্ন অবস্থায় বসিয়া আপনার অবস্থা ভুলিয়া এই হতভাগ্যদের অবস্থা দেখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তখন আবার সেই বালিকার গীত যেন শূন্য হইতে তাঁহার কাণে বাজিতে লাগিল;—

"কি ভীষণ রণে, দেখ-না নয়নে, নাচে কালী রণরঙ্গিণী!"

ধীরে ধীরে রাত্রি প্রভাত হইতে লাগিল। উষার প্রথম আলোকেই সেই ভীষণ রণরঙ্গিণীর সংহারক্রীড়া ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতে লাগিল। তিনি পর্ব্বতশ্রেণীর পাদমূলে সমুদ্র-প্লাবনে ভাসিয়া আসিয়াছেন। শত শত নর-নারী, শিশু, যুবক, বৃদ্ধ,—মৃত বা অর্দ্ধ-মৃত অবস্থায় স্থানে স্থানে পড়িয়া আছে। সহস্র সহস্র গো মহিষ ছাগ প্রভৃতি গৃহপালিত পশু পক্ষী, ভগ্ন গৃহখণ্ড

ও গৃহস্থের নানাবিধ সম্পত্তি—সিন্দুক, পালঙ্ক, তৈজসপত্র, কাপড়, বিছানা পড়িয়া আছে। স্থানটি যেন একটি ভীষণ রণ-ক্ষেত্র। রণরঙ্গিণী প্রকৃতি যেন মানুষের সঙ্গে ভীষণ যুদ্ধ করিয়া একটি মহাপ্রলয় সাধিত করিয়াছেন। তিনি বুঝিলেন, সমুদ্র-তরঙ্গ এ পর্য্যন্ত আসিয়া পর্ব্বত-মালায় প্রতিহত হইয়া ঝড়ের পর সরিয়া গিয়াছে, এবং পশ্চাতে এই ভীষণ দৃশ্য রাখিয়া গিয়াছে। যত দূর চক্ষে দেখা যাইতেছে, সমস্ত স্থানে ক্রোশের পর ক্রোশ কেবল নর, পশু, পক্ষীতে এবং ভগ্ন গৃহখণ্ড ও গৃহস্থিত দ্রব্যাদিতে আচ্ছন্ন। স্থানে স্থানে তাঁহার মত দুই এক জন নর-নারী স্তম্ভিত অবস্থায় বসিয়া আছে। পশ্চাতে একখানি ঝটিকাবিধ্বস্ত গ্রাম দেখা যাইতেছে। অনাথনাথ উঠিয়া সেই গ্রামের দিকে চলিলেন। দেখিলেন, বৈরাগীর মত একটি লোক কয়েক জন রমণী ও বালক বালিকাকে লইয়া গ্রামের দিকে যাইতেছে। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাবাজি। এ কোন্ স্থান?" বৈরাগী বলিল,—"বাবা! এ গ্রামের নাম চম্বল। ইহাতে আমার একখানি ক্ষুদ্র আখড়া আছে। গৃহাদি পড়িয়া গিয়াছে। ইহারা নানা স্থান হইতে ভাসিয়া আসিয়াছে। দেখি, যদি চাল তুলিয়া তাহার নীচে আশ্রয় দিয়া ইহাদের জীবন রক্ষা করিতে পারি। হরি হে! তোমার একি লীলা!"

অনাথনাথ বিস্ময়-বিকৃত কণ্ঠে বলিলেন,—"চম্বল!" বাবাজি স্থিরকণ্ঠে কহিলেন—"চম্বল।"

সপ্তম অধ্যায়।

—০—

প্রকৃতির কুরুক্ষেত্র।

সুবর্ণদ্বীপ সমুদ্র-তীরে। তাহার পশ্চিমে অনন্ত নীল ফেনিল দিগন্তপ্রসারিত মহা-পারাবার। তাহার পূর্ব্ব ও উত্তরে বিস্তীর্ণ মহেশ-খালি ও কুতুবদিয়া দ্বীপ-শ্রেণী। তাহার পূর্ব্বে প্রায় দুই ক্রোশ প্রশস্ত সমুদ্র-শাখা এবং তাহার পূর্ব্বতীরে চম্বল-গ্রাম। ক্রোশদ্বয়ব্যাপী গ্রামের পূর্ব্বে চম্বল-গিরিমালা। অনাথনাথ তবে কি সেই স্বল্পক্ষণের মধ্যে সমুদ্রতরঙ্গে এতদূর ভাসিয়া আসিয়াছেন? এত গ্রাম, প্রান্তর, বিশেষতঃ একটি সমুদ্র-শাখা—তিনি কেমন করিয়া ভাসিয়া আসিলেন? তাই তিনি চম্বল নাম শুনিয়া স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইয়াছিলেন। প্রায় ১০ দশ ক্রোশ ব্যবধান ঝটিকা-তাড়িত-সমুদ্র-প্লাবনে ভাসিয়া আসিয়া এরূপে গিরি-পাদমূলে পতিত হইয়া জীবিত থাকা ত সামান্য বিস্ময়ের কথা নহে। একি স্বপ্ন? একি কোনও অপদেবতার খেলা? একি আরব্য-উপন্যাস? এরূপ অদ্ভুত ঘটনা কি কেহ কখন শুনিয়াছে, না শুনিলে বিশ্বাস করিবে? তাঁহার কি মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে? এরূপ অদ্ভুত ব্যাপার ত সত্য হইতে পারে না? বৈরাগীর সঙ্গে সাক্ষাৎ, তাহার মুখে গ্রামের পরিচয় কি বিকৃত মস্তিষ্কের কল্পনামাত্র? তাহা কেমন করিয়া হইবে? ঝটিকাবিধ্বস্ত হতভাগ্য নরনারী, বৈরাগীকে যে এখনও দেখা যাইতেছে। সে তাঁহাকেও তাহার আখড়ায় যাইতে বলিয়াছিল, কিন্তু গ্রামের নাম চম্বল শুনিয়া তিনি বিস্ময়ে এমন অভিভূত ও অন্যমনস্ক হইয়াছিলেন যে, তাহার কথার উত্তর পর্য্যন্ত দেন নাই। তিনি আরও দেখিলেন,

বহুবিস্তীর্ণ শবক্ষেত্রের মধ্যে তাঁহার মত আরও জীবিত লোক আছে। তাঁহার সম্মুখে কেহ কেহ আত্মীয়স্বজনের অন্বেষণ করিতেছিল। তাহাদের মুখে শুনিলেন, তাহারাও তাঁহার মত কেহ মহেশখালি, কেহ কুতুবদিয়া, কেহ বহুদূরস্থ অন্যান্য গ্রাম হইতে ভাসিয়া আসিয়াছে। তাহাদের মুখেও অদ্ভুত রক্ষার গল্প শুনিলেন। তখন তিনি নীলিমমণ্ডিত শান্ত প্রভাত-গগনের দিকে ভক্তি-উচ্ছ্বসিতনয়নে চাহিয়া বলিলেন,—"কৃপাসিন্ধো! বিপদভঞ্জন! তুমি আমাকে যেরূপে রক্ষা করিয়াছ, আমার পতিপ্রাণা সরলা পত্নীকে ও আমার সুকুমার শিশু সহ সেই অনাথাকে কি সেরূপ রক্ষা কর নাই?" দর দর ধারায় তাঁহার কপোল বহিয়া অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল।

তিনি তাহাদের অন্বেষণে চলিলেন। রাত্রিতে যে বীভৎস দৃশ্য দেখিয়াছিলেন, উষালোকে যাহা আরও স্ফুটতর হইয়াছিল, এখন দিবালোকে তাহার ভীষণ ছবি ভীষণতর হইয়া চারি দিকে ভাসিয়া উঠিয়াছে। তিনি দেখিলেন,—

যত দূর যাইতেছে নয়নেত্রে দেখা—
আসমুদ্র গিরিতল—কালি সন্ধ্যাকালে
ছিল যাহা জনাকীর্ণ পল্লীতে প্রান্তরে
শ্যামশস্যসমাচ্ছন্ন, ছিল সুশোভিত
পাদপে, পল্লবে, গৃহে, চারু সরোবরে,—
রজনী-প্রভাতে এবে—বিস্তীর্ণ শ্মশান।
নাহি বাস-চিহ্ন, নাহি চিহ্ন পাদপের;
যত দূর যাইতেছে নয়নেত্রে দেখা—
শবাকীর্ণ প্রেতভূমি, মহারণভূমি!
শবের পশ্চাতে শব, শবের উপরে!

সম্মুখে পশ্চাতে শব, দুই পার্শ্বে শব।
শরতের শস্যক্ষেত্র—শবক্ষেত্র এবে—
সারি সারি, স্তরে স্তরে, শব রাশি রাশি।
পশুপক্ষিশব সহ শব মানবের,
কীট পতঙ্গের শব; শব সংখ্যাতীত
শস্যক্ষেত্রে, সরোবরে, প্রাঙ্গণে, প্রান্তরে।
ভগ্নগৃহ-চালে শব, শব চাল-তলে,
ভূপতিত বৃক্ষগণ শব-সমাবৃত—
কত শব ডালে ডালে, শিকড়ে শিকড়ে!
নরনারী ফল যেন, শিশুগণ ফুল,
বিজড়িত ডালে ডালে বিচিত্র বসন
পাদপের, শোচনীয় কালের কেতন।
ভাসিতেছে সরোবরে, প্লাবনে পূর্ণিত—
শবরাশি অগণিত শব অজানিত।
শবে ক্ষুদ্র গৃহ গড় হয়েছে পূর্ণিত—
নর, ছাগ, গো, মহিষ, পড়ি স্তরে স্তরে!
যেই দীর্ঘ রাজপথ উত্তরে দক্ষিণে
গিয়াছে বহিয়া ভেদি' এই ধ্বংসভূমি,
করি অবরোধ সেই সমুদ্র-প্লাবন
হইয়াছে সমাচ্ছন্ন শবে অগণিত,
জালে যেন মৎস্যগণ। রয়েছে পড়িয়া
মহাকালী-কণ্ঠভ্রষ্ট মুণ্ডমালা মত,—
নাহি তিল মাত্র স্থান নিক্ষেপিতে পদ।
স্থানে স্থানে কি করুণ দৃশ্য শোকময়!
কোথাও সন্তান বক্ষে পড়িয়া জননী,
মাতৃস্তন শিশুমুখে; কোথাও পড়িয়া

শিশু ভ্রাতা ভগ্নী দুটি গলায় গলায়!
গলায় গলায়, বুকে বুক, মুখে মুখ,
পড়িয়া কোথাও পতিপত্নী প্রেমময়ী;
কোথা পুত্র, পৃষ্ঠে বৃদ্ধ জনকজননী!
কটিসহ দৃঢ়াবদ্ধ পত্নী সহ পড়ি
কোথাও শোকের ছবি প্রণয়ি-যুগল।
হায়! হতভাগ্য যুবা বাঁচাইতে প্রাণ
প্রেয়সীর, এইরূপে আপনার প্রাণ
করিয়াছে বিসর্জ্জন! অনিন্দ্যসুন্দর
যৌবনের প্রস্ফুটিত রূপ মনোহর
এখনো মৃত্যুর ছায়া করে নি হরণ।
প্রেম-আলিঙ্গনে যেন রয়েছে নিদ্রিত
যৌবনের সুখ-স্বপ্নে, হৃদয়ে হৃদয়,
মুখে মুখ, বেষ্টি গ্রীবা দুই ভুজলতা!
রমণীর কর্দ্দমাক্ত দীর্ঘ কেশরাশি
আবরিয়া উভয়ের উরস বদন,
করিতেছে হায়! যেন লজ্জানিবারণ।
কোথাও মুমূর্ষু জীব মৃত্যুযন্ত্রণায়,
লবণাক্তজলপানে ঘোর পিপাসায়
করিতেছে ছট্‌ফট্‌! মৃত্যুমুখে কেহ
পতি, পত্নী, পুত্র তরে করে হাহাকার।
কোথাও বা নরনারী প্রেমমূর্ত্তি মত
নগ্ন, কর্দ্দমাক্ত, শির জানু-মধ্যে রাখি
রয়েছে বসিয়া স্তব্ধ, যেন বজ্রাহত।
কালের কি কুরুক্ষেত্র নয়ন নিমেষে
হইয়াছে সংঘটিত, নর চিন্তাতীত!

মানবের কুরুক্ষেত্র তুলনায় তার

বালকের ক্রীড়াভূমি ক্ষুদ্র—ক্ষুদ্রতর!

অনাথনাথ এই শোচনীয় চিত্তবিদারক দৃশ্য অতিক্রম করিয়া চলিলেন। কোথায়, কি জন্যে যাইতেছেন, কিছুই জানেন না। যাইতে যাইতে আর্ত্তের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন! স্থানে স্থানে ভাসিয়া আসিয়া যে বসন পড়িয়া আছে, তাহা কুড়াইয়া লইয়া নগ্নের নগ্নতা নিবারণ করিলেন। শব-স্তূপের নীচে পড়িয়া যাহারা জীবিত অবস্থায় হাহাকার করিতেছিল, তাহাদিগকে বহু কষ্টে উদ্ধার করিতে লাগিলেন, এবং মুমূর্ষুকে শ্রীভগবানের নাম শুনাইয়া শান্তি দিতে লাগিলেন। জীবিতদিগকে নানারূপ সান্ত্বনার কথা, আশার কথা বলিলেন। কিন্তু ক্ষুধিত ও পিপাসিতকে কি দিবেন? আহার্য্য কোথাও কিছু নাই। পানীয় জলও অপ্রাপ্য। অসংখ্য পুষ্করিণী আছে। কিন্তু সমস্তই সমুদ্র-সলিলে প্লাবিত হইয়া ঘোর লবণাক্ত এবং নানাবিধ প্রাণীর মৃতদেহে পরিপূর্ণ হইয়াছে। ক্রোশের পর ক্রোশ ব্যাপিয়া আবাসের কোনও চিহ্নমাত্র নাই। এরূপ অবস্থা হইয়াছে যে, কেহ দেখিলে বিশ্বাস করিতে পারেন না,—এ মহাশ্মশানক্ষেত্র সন্ধ্যাকালে সমৃদ্ধিশালী গ্রামে সজ্জিত ছিল। কোথাও একটী বৃক্ষ পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছিল না; ঝটিকাবেগে সমস্ত বৃক্ষ ধরাশায়ী হইয়াছে। কোথাও বা এক স্থানের বৃক্ষ অন্য স্থানে, এক গ্রামের বৃক্ষ আর এক গ্রামে উড়িয়া গিয়াছে। কোন বৃক্ষ কোথায় ছিল, অনেক স্থানে তাহা স্থির করিবার সাধ্য নাই। গৃহস্থদের বাড়ীর গৃহের চিহ্নমাত্রও নাই,—চাল, বেড়া, খুঁটি কোথায় উড়িয়া গিয়াছে। এমন কি, বাড়ীর ভিত্তি পর্য্যন্ত জলবেগে এরূপ বিলীন হইয়া গিয়াছে যে, কাহার বাড়ী কোথায় ছিল, তাহাও চিনিবার উপায় নাই। এই সকল

গ্রামে অনাথনাথের পরিচিত বহু সমৃদ্ধিশালী লোক ছিলেন। তাঁহাদের বাড়ী কাল সন্ধ্যার সময় ধনধান্যে ও বহু পরিবারে পরিপূর্ণ ছিল। আজ প্রাতে সে সকল আবাসের কোথাও বা দু একটা ভগ্ন খুঁটির শেষভাগ, কোথাও বা পুষ্করিণীটি মাত্র অবশিষ্ট আছে! পরিবারের মধ্যে কেহ বা বাড়ীতে স্থানে স্থানে, কেহ বা বাড়ীর বাহিরে স্থানে স্থানে, জলাশয়ে, গড়ে, মৃত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। কেহ বা ভাসিয়া গিয়াছে। গ্রামের শত শত লোকের মধ্যে ২।৪।১০ জন তাঁহার মত দৈবানুগ্রহে রক্ষা পাইয়াছে। তাহারা শূন্য ভিটায় মৃত, পত্নী, পুত্র, মাতা পিতাকে লইয়া হাহাকার করিতেছে। সকলেরই মুখে একই কথা"হা ভগবান! সকলেই গিয়াছে। আমাকে কেন রাখিলে?" রাশি রাশি অপরিচিত জনের মৃত দেহ কাহার বাড়ীতে আসিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। হিন্দুর বাড়ী মুসলমানের শবে আচ্ছন্ন, মুসলমানের বাড়ী হিন্দুর শবে পরিপূর্ণ! এই অপরিচিত লোকদের মধ্যে যাহারা অনাথনাথের মত জীবিত আছে, তাহাদেব কেহ বা জানুর মধ্যে মাথা দিয়া কর্ত্তব্যবিমূঢ় আত্মহারা জড়পিণ্ডের ন্যায় বসিয়া আছে। অনাথনাথ জিজ্ঞাসা করিলে অবনত মস্তক তুলিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতেছে, কোনও উত্তর দিতেছে না। তাহাদের বাহ্যজ্ঞান যেন তিরোহিত হইয়াছে। অন্য জীবিত জীব জন্তুর চিহ্নমাত্র নাই। তাহাদের অগণিত শব মানব-শবের সঙ্গে পড়িয়া রহিয়াছে।

অনাথনাথ আপনার অবস্থা ভুলিয়া গেলেন। প্রথম কিছু ক্ষণ এই শোকাবহ দৃশ্য দেখিয়া কাঁদিতেছিলেন। কিন্তু কত দেখিবেন, কত কাঁদিবেন? দেখিতে দেখিতে মনে আতঙ্ক উপস্থিত হইল ও নয়নের জল অজ্ঞাতে শুকাইয়া গেল। স্বপ্নপরিচালিত

লোকের মত যথাসাধ্য আর্ত্তের সেবা করিতে করিতে তিনি লক্ষ্যহীন ভাবে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

এই ভীষণ শবক্ষেত্রে সমস্ত দিন পর্য্যটন করিয়া অনাথনাথ তাঁহার পত্নী, পুত্র ও সেই বালিকাকে জীবিত কি মৃত দেখিতে পাইলেন না। পূর্ব্বাহ্নের পর মধ্যাহ্ন আসিল, মধ্যাহ্নের পর অপরাহ্ণ আসিল। অপরাহ্নের পর সন্ধ্যার ছায়ায় সমুদ্র ও বেলাভূমি ছাইতেছিল। এ সময়ে তিনি সমুদ্রসৈকতে উন্মত্তের মত ভ্রমিতেছিলেন। সমুদ্রবেলা অবিরাম তরঙ্গাঘাতে অন্য সময় কেবল চঞ্চল ফেনমালায় শোভিত থাকে! আজি অচঞ্চল শবমালায় যেন মুণ্ডমালী সাজিয়াছে। নানা জীবজন্তুর অচঞ্চল শবমালার সঙ্গে সচঞ্চল ফেনমালা কি ভীষণ ক্রীড়া করিতেছে! শবরাশির সঙ্গে এখানেও ভগ্ন গৃহ ও গৃহস্থের উপকরণ এবং কোথাও ভগ্ন নৌকাখণ্ড সকল পড়িয়া আছে। কাল অপরাহ্ণে যে সমুদ্রগর্ভ অনাথনাথ নানাবিধ অর্ণব-যানে খচিত দেখিয়াছিলেন, আজ তাহা কেবল ভাসমান মৃতদেহে পরিপূর্ণ দেখা যাইতেছে। অকস্মাৎ তাঁহার কর্ণে সেই গীতধ্বনি প্রবেশ করিল,—

"কি ভীষণ রণে দেখ না নয়নে নাচে কালী রণরঙ্গিণী।"

একি তাঁহার ভ্রান্তি? তিনি ত সমস্ত রাত্রি ভানুমতীর সেই গান শুনিয়াছেন। ঘোরারাবপূর্ণ প্রলয়ের মধ্যে তিনি অবিরাম ঘোরারাবী মহারৌদ্রী প্রলয়কারিণীর সেই রূপ নয়নে দর্শন করিয়াছেন, হৃদয়ে অনুভব করিয়াছেন। তাঁহার সেই ঘোরা ভীষণ মূর্ত্তি তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। তিনি সমস্ত রাত্রি সেই গীত শুনিয়াছেন, সেই মূর্ত্তি প্রত্যক্ষবৎ দেখিয়াছেন। এ নিশ্চয় তাঁহার ভ্রান্তি। কিন্তু আবার তিনি সেই গীত শুনিলেন। ক্রমে যত অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ততই স্ফুটতররূপে সেই শান্ত সায়াহ্নে সমুদ্র-নিনাদে মিশ্রিত সমুদ্রানিলে বাহিত

সেই মধুর গাম্ভীর্য্যময় রমণীকণ্ঠ শুনিতে লাগিলেন। সম্মুখে বেদের ক্ষুদ্র পট-গৃহের মত একটি কি যেন দেখিতে পাইলেন। বুঝিলেন, ঝটিকার পর কেহ এই ক্ষীণ ক্ষুদ্র আশ্রয় নির্ম্মাণ করিয়াছে। তাঁহার ক্রমে বোধ হইল, সেখান হইতে সেই গীতধ্বনি উত্থিত হইতেছে। তিনি ঊর্দ্ধশ্বাসে তদভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

অষ্টম অধ্যায়।

ভগবতী।

আশায়, আনন্দে, সেই আনন্দাশা-মিশ্রিত উৎসাহে, তাঁহার হৃদয়ে কি এক নব বলের সঞ্চার হইয়াছে। নিকটবর্ত্তী হইলে, কণ্ঠ যে ভানুমতীর, সে যে গীত গাহিতেছে, তাহার আর সন্দেহ রহিল না। অনাথনাথ দেখিলেন, প্লাবনের ভাসা কাপড় ও যষ্টি কুড়াইয়া বালিকা একটি ক্ষুদ্র আশ্রয় নির্ম্মাণ করিয়া তাহার অভ্যন্তরে বসিয়া শান্ত, বিষণ্ণ, গম্ভীর, উদাস কণ্ঠে দিঙ্মণ্ডল কি এক গম্ভীর্য্যে পূর্ণ করিয়া গাইতেছে—

দুই কর লয়, দুই বরাভয়,
লয় বিনা সৃষ্টি স্থিতি নাহি হয়,
সদা শিব ঊর্দ্ধগ্রীব,
দেখ ধ্বংস-মূলে স্থির আপনি।

এই মহা ধ্বংসক্ষেত্রই ধ্বংসকারিণীর ধ্বংসমূর্ত্তির প্রকৃত ব্যাখ্যার স্থল। গীত শুনিয়া অনাথনাথের হৃদয় ভক্তিতে অচল হইল। গীত ক্রমে বন্ধ হইল। ক্রমে সমুদ্র-নিনাদে সেই স্বরলহরী মিশিয়া

গেল। কিছু ক্ষণ রমণী নীরব; অনাথনাথ চৈতন্যহীন জড়মূর্ত্তিবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন।

"হাঁ দিদি! আমাদের বাড়ীতে যে কালী পূজা হইয়া থাকে, তুমি তাঁহারই গীত গাইতেছ? না?"

বালিকা তাহার মুখচুম্বন করিয়া বলিল, "হাঁ ভাই! এ তাঁহারই গীত।"

"কাল যে এ ঝড় হইল, এত মানুষ মরিল, এ কি সব তিনিই করিলেন?"

"হাঁ ভাই! এ সকল তাঁহারই লীলা।

শিশু একটি ক্ষীণ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তুমি আর একটি গীত গাও! তোমার গান আমার বড় ভাল লাগে।"

বালিকা আবার সাদরে তাহার মুখচুম্বন করিয়া আর একটি গান আরম্ভ করিল।

আবার সেই শব-সমাচ্ছন্ন বেলাভূমি, সেই সন্ধ্যারাগরঞ্জিত সমুদ্রগর্ভ ও সুনীল আকাশ ছাইয়া সেই করুণ মধুর কণ্ঠ ফুটিল, উঠিল, মিশাইল। সেই সুধাময়ী বীণা নীরব হইলে কেবল সিন্ধু-নিনাদমাত্র শুনা যাইতেছিল আর সকলই নীরব। অনাথনাথ বুঝিলেন, দ্বিতীয় শিশু কণ্ঠ তাঁহারই পুত্র অমিয়ের। তবে অমিয়ও রক্ষা পাইয়াছে? তিনি জানু পাতিয়া ভূতলে প্রণত হইয়া গলদশ্রু-নয়নে বলিলেন,— "তোর কি অপূর্ব্ব লীলা! তোর যেই ধ্বংস ক্রীড়ায় মহামহীরুহ ও শৈলশৃঙ্গ পর্য্যন্ত উৎপাটিত হইয়াছে, সেই ঝড়ে তুই এই ক্ষুদ্র শিশুকে রক্ষা করিয়াছিস্! দয়াময়ী মা!" অনাথনাথ কিছুক্ষণ এইরূপে জননীর চরণে আপনার হৃদয়ের তরল ভক্তিধারা বর্ষণ করিয়া উঠিলেন, এবং তিনি এ সময়ে তাহাদের সম্মুখে যাইবেন কি না, তাহা ভাবিতে লাগিলেন।— শিশুর ক্ষীণকণ্ঠে বুঝিলেন, সে নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া

পড়িয়াছে। অকস্মাৎ তাঁহাকে দেখিলে তাহার হৃদয়ে যে আনন্দোচ্ছ্বাস উঠিবে, দুর্ব্বল হৃদয় তাহা সহিতে পারিবে ত? তিনি এইরূপ ভাবিতেছেন, এমন সময়ে শিশু আবার ক্ষীণকণ্ঠে কহিল,—

"দিদি! সত্যসত্যই আমি কালীমার মুখ দেখিয়া বড় ভয় পাইতাম। কিন্তু মা বলিলেন, তিনিও মা। হাঁ দিদি! তিনি কি সত্যই মা?"

বা। হাঁ অমিয়! তিনি মা।

শি। তিনি মা হইয়া কেমন করিয়া এমন ঝড় করিলেন, এত মানুষ মারিলেন?

বা। তোমার মা কি তোমার উপর কখন রাগ করেন নাই, তোমাকে কখনও মারেন নাই? তিনি যেমন ঝড় তুলিয়াছিলেন, এখন আবার কেমন সুন্দর শান্তভাব ধারণ করিয়াছেন! তিনি যেমন এত মানুষ মারিয়াছেন, তেমন তোমায় রক্ষা করিয়াছেন।

শি। আমাকে ত রক্ষা করিয়াছ তুমি। তুমি কি তবে সেই মা? তুই যে দিদি দুর্গা-মার মত! তুই তেমনই সুন্দর, তোর মুখে তেমনি আদর! তুই আমাকে কত আদর করিস্।

বালিকা আবার প্রেমভরে তাহার মুখ চুম্বন করিয়া বলিল, "না ভাই! তিনি তোমাকে রক্ষা না করিলে, আমি পারিতাম না। দেখ নাই, কত ভগ্নীর বুকে কত ভাই মরিয়া রহিয়াছে?

শি। না, দিদি, তুই আমার তেমন দিদি নহিস্।

বালিকা গলদশ্রু-নয়নে শিশুকে বুকে আঁটিয়া ধরিল, এবং শিশু পুষ্পনির্ম্মিত দুই ক্ষুদ্র ভুজে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া পুষ্পনিভ ক্ষুদ্র মুখখানি তাহার স্বর্গসম বুকে লুকাইল। বালিকা গদ গদ কণ্ঠে বলিল, "তুই ভাই! দেব-শিশু! তাই দেবী তোরে রক্ষা করিয়াছেন।"

আবার কিছুক্ষণ উভয়ে প্রেমাবেশে অবশ হইয়া নীরব রহিল। বালকবালিকার হৃদয়ে যে প্রেম-স্রোত প্রবাহিত হয়, তাহাই বুঝি স্বর্গের মন্দাকিনীধারা। উভয়ে নীরব, কেবল সান্ধ্য-অনিল সন্ সন্ রবে জলকল্লোল বহিতে লাগিল। কিছু ক্ষণ পরে শিশু আবার বলিল, "দিদি! সমুদ্র সর্ব্বদা কি বলিতেছে?"

বা। অমিয়! আমার পিতা বৈরাগী ছিলেন। তিনি বলিতেন, যিনি এ সংসার সৃষ্টি করিয়াছেন, পারাবার নিরন্তর তাঁহারই প্রেম-গীত গাইতেছে। সমুদ্র কহিতেছে,—'আমার যেমন অনন্ত জল, প্রেমময় হরির তেমনি অনন্ত প্রেম। আমার বুকে যেমন কত ঢেউ খেলিতেছে, তাঁহার প্রেমেও সেরূপ কত ঢেউ উঠিতেছে, ফুটিতেছে মিশিতেছে। তাহাতে এ সংসার জন্মিতেছে চলিতেছে, মরিতেছে।' এ সমুদ্রের কত শক্তি! কাল দেখিয়াছ, কেমন ভয়ঙ্কর হইয়াছিল। কত নৌকা, জাহাজ, দেশ, বাড়ী, ঘর উড়াইয়া ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। সেই হরিরও তেমনি শক্তি। সমুদ্র মানুষকে বলিতেছে—"দেখ তুমি কত ক্ষুদ্র; তোমার শক্তি তোমার সংসার—কত অসার! অতএব সেই প্রেমময়, লীলাময় হরিকে ডাক, তাঁহার ভজনা কর।"

শি। সেই হরি কে? আমাদের বাড়ীতে রাসের সময় যাঁহার পূজা হয়?

বা। হাঁ ভাই।

শি। সেই প্রহ্লাদ-চরিত্র যাত্রায় যিনি প্রহ্লাদকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি?

বা। হাঁ, তিনি।

শি। বড় সুন্দর! কেমন সুন্দর চূড়া! কেমন সুন্দর বাঁশী! তুমি তোমার ভাই গোপালকে কেমন সুন্দর কৃষ্ণ

সাজাইয়াছিলে। আমাকে কি তেমনই করিয়া সাজাইয়া দিবে? আমি তেমনই কৃষ্ণ হইতে পারিব কি? আমার বড় সাধ, তেমনই কৃষ্ণ সাজি।

বালিকা ছল ছল নয়নে বলিল,—"তুমি তাহার অপেক্ষা সুন্দর সাজিতে পারিবে। সে ত তোমার মত সুন্দর, তোমার মত দেব শিশু ছিল না। সে যে গরীব দুঃখীর ছেলে। আমি তোমাকে সুন্দর কৃষ্ণ সাজাইব। ভাই ভগ্নী দু'জনে সুন্দর সংকীর্ত্তন করিব। তুমি সাজিবে কেন? তুমি যে নিজেই আমার—ঠিক কৃষ্ণটি।" এই বলিয়া বালিকা আবার তাহার মুখচুম্বন করিল।

শিশুর মুখ গম্ভীর হইল। সে অনেকক্ষণ নীরব হইয়া কি ভাবিল। পরে আবার বালিকার বুকে মুখ লুকাইয়া অতি ক্ষীণ-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি! হরি কি প্রহ্লাদের মত আমার বাবাকে ও মাকে রক্ষা করিয়াছেন? আমি কৃষ্ণ সাজিলে কি রক্ষা করিতে পারিতাম না?" শিশু কাঁদিতে লাগিল। তাহার অশ্রুজলে বালিকার বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল। বালিকার বহুক্ষণরুদ্ধ অশ্রু-ধারা শিশুর অঙ্গ সিক্ত করিতে লাগিল। বালিকা বলিল, "হরি বড় দয়াময়। তিনি বাবা ও মাকে অবশ্য রক্ষা করিয়াছেন। আমি যদি এত বৎসর এই বালিকার প্রাণ দালিয়া বৃথা না ডাকিয়া থাকি, তবে অবশ্য তিনি এই অনাথিনীর প্রার্থনা শুনিয়াছেন। আমি সমস্ত রাত্রি তাঁহাকে ডাকিয়াছি, এবং বাবা ও মাকে রক্ষা করিতে বলিয়াছি। অমিয়! আমরা শীঘ্রই তাঁহাদের দেখিব। বাবা আমাদের খুঁজিতে খুঁজিতে এখানে আসিবেন।"

"মা!"—অনাথনাথ আর থাকিতে পারিলেন না। তিনি বস্ত্রাচ্ছাদনের বহির্ভাগে থাকিয়া—রঙ্গমঞ্চের অভিনয়ের মত এই পবিত্র দৃশ্য যেন প্রত্যক্ষ দেখিতেছিলেন তিনি আর থাকিতে পারিলেন না। বস্ত্রাচ্ছাদনের সম্মুখে গিয়া উচ্ছসিতকণ্ঠে

বলিলেন,—"মা ভগবতি। তুই আমার অমিয়কে রক্ষা করিয়াছিস্ এবং তোর বরে সেই দয়াময় হরি আমাকেও রক্ষা করিয়াছেন।"

বালক বালিকা উভয়ে প্রেমানন্দে এক কণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—"বাবা!" যে এরূপ মহাপ্রলয়ের গ্রাসে পতিত হইয়া রক্ষা পায় নাই, সে এই প্রেম, এই আনন্দ বুঝিবে না। অনাথনাথ পুত্রকে বক্ষে লইয়া সাশ্রুনয়নে তাহার মুখচুম্বন করিলেন। বালিকা সাষ্টাঙ্গে ভূতলপ্রণত হইয়া শ্রীভগবানকে প্রণাম করিয়া তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ের সুশীতল কৃতজ্ঞতাবারি তাঁহার চরণকমলে ঢালিয়া দিল। তাহার পবিত্র চক্ষের জলে সৈকতবালুকা সিক্ত হইতেছিল। বালকও পিতার বুকে কমলকোরকনিভ ক্ষুদ্র মুখখানি রাখিয়া কাঁদিতেছিল। কিছু ক্ষণ উভয়ে নীরব। শিশু যেন কথা জিজ্ঞাসা করিবে, কিন্তু যেন কি এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেছিল না। তাহার পিতৃদর্শনজনিত আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে যেন সেই আশঙ্কার গাঢ়তর মেঘ তাহার ক্ষুদ্র হৃদয় ছাইয়া ফেলিতেছিল। শেষে বহু চেষ্টার পর তাহার ক্ষীণকণ্ঠকে আরও ক্ষীণতর করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা মা—কোথায়?" প্রশ্ন মুখ হইতে নির্গত হইবামাত্র তাহার ক্ষুদ্র-হৃদয়ের ধৈর্য্যের বন্ধন ভাসাইয়া তাহার সমস্ত দিবসের রুদ্ধ শোকস্রোত অমিতবেগে ছুটিল। বালক মুখ ফুটিয়া আকুলহৃদয়ে কাঁদিতে লাগিল। অনাথনাথ আত্মশোক সংবরণ করিয়া বলিলেন,—"বাবা! যিনি আমাদের তিন জনকে রক্ষা করিয়াছেন, তিনি তোমার পুণ্যপ্রতিমা মাকেও অবশ্য রক্ষা করিয়াছেন। তিনিও শীঘ্র আসিয়া আমাদের সঙ্গে মিলিত হইবেন।" বালক আবার কিছু ক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল "উঃ! বুকে কত ব্যথা! বাবা আমি দিদির কোলে যাইব

হাঁ বাবা তিনি কে? আমার দিদি? আমাকে ত আমার দিদি রক্ষা করিয়াছে।”

অনাথনাথ শিশুকে আবার বালিকার কোলে দিয়া বলিলেন, “বাবা! সত্য সত্যই তোমার দিদি সেই ভগবতী। আমি এমন বালিকা দেখি নাই।”

শিশুর মুখে তাহার সেই শোকের মধ্যে, মেঘের বিরামে জ্যোৎস্নার মত একটুকু আনন্দ দেখা দিল। সে প্রেমভরে তাহার সজল-বিস্তৃতনয়নে বালিকার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বালিকা বার বার সেইরূপ সজল-নেত্রে তাহার মুখচুম্বন করিল। শিশু তাহার পর বহুক্ষণ সান্ধ্যছায়াসমাচ্ছন্ন সমুদ্রের দিকে চাহিয়া রহিল। সূর্য্যদেব সমুদ্রগর্ভে রক্তজবা বিকীর্ণ করিয়া ধীরে ধীরে অস্ত যাইতেছিলেন। সে অবর্ণনীয় অননুভবনীয় শোভা বালক অতৃপ্তনয়নে দেখিতে লাগিল। শিশু জিজ্ঞাসা করিল, “বাবা! সূর্য্য কোথায় যাইতেছে? ও কি সমুদ্রে ডুবিয়া যাইতেছে?

অ। না বাবা! সমুদ্রের অন্য পারেও অনেক দেশ আছে, অনেক লোক আছে। সূর্য্য এখন সে সকল দেশে আলো দিতে যাইতেছে।

শি। বাবা! মানুষও কি সেইরূপ এক দেশ হইতে আর এক দেশ আলো করিতে যায়? আমার মাও কি সেইরূপ আর এক দেশ আলো করিতে গিয়াছে? হাঁ বাবা! আমি সে দেশ দেখিয়াছি! বড় সুন্দর দেশ। আমি দিদির কোলে শুইয়া শুইয়া সে দেশ অনেকবার দেখিয়াছি। সেখানে কেমন জ্যোৎস্না, কত ফুল, কেমন সুগন্ধ!—কেমন সুন্দর ফুলের উপর আমাদের বাড়ীর লক্ষ্মীঠাকুরাণীর মত মা বসিয়া হাসিতেছেন। আমাকে “অমিয়! অমিয়!” বলিয়া ডাকিতেছেন। সেই যাত্রার প্রহ্লাদের মত কত সুন্দর সুন্দর

ছেলে, কত সুন্দর সুন্দর মেয়ে, কেমন ফুলের পোষাক পরিয়া মার চারিদিকে গায়িতেছে, নাচিতেছে! আর মার মাথার উপর বাবা! আমাদের বাড়ীর রাসের সেই কৃষ্ণ বসিয়া কি সুন্দর বাঁশী বাজাইতেছেন! মা তাঁহার পায়ের উপর মাথা রাখিয়া ঐ দেখ কেমন আমার দিকে চাহিয়া আছেন। মা! মা!

শিশু এই আনন্দের উচ্ছ্বাসে নয়ন মুদ্রিত করিয়া অৰ্দ্ধমূর্চ্ছিত অবস্থায় রহিল। অনাথনাথের ও বালিকার মুখ গম্ভীর—বড় গম্ভীর হইল। অনাথনাথ শিশুর গায়ে হাত দিয়া দেখিলেন, খুব জ্বর। ডাকিলেন,—"বাবা! বাবা!" শিশু "বাবা!" বলিয়া অতি ক্ষীণ মৃদু-কণ্ঠে উত্তর দিল, এবং বলিল,—"উঃ! বুকে বড় ব্যথা।" অনাথনাথ বুঝিলেন যে ঝটিকা-প্লাবন সময়ে শিশু বুকে দারুণ আঘাত পাইয়াছে। বালক একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আবার নয়ন মেলিয়া বলিল,—"দিদি! আমার মা আমাকে প্রহ্লাদ সাজাইয়া একটি গান গায়িতেন ও আমাকে গায়িতে শিখাইতেন। তুই সেই গানটি জানিস্? তুই একবার সেই গানটি গায়িবি? আমি উঠিতে পারিতেছি না, তেমন করিয়া নাচিতে পারিব না। আমিও তোর সঙ্গে গাইব।" বালিকা তাহার সেই অমৃতময় কণ্ঠে সান্ধ্য সৈকতবেলা অমৃতাকীর্ণ করিয়া সেই গানটি গায়িতে লাগিল, এবং অমিয় ও তাহার অমিয়পূরিত কণ্ঠে সেই সঙ্গে গায়িতে লাগিল;—

"তোর নাম রেখেছি হরিবোলা।
মনের সাধে ও আমার মন খেল না হরিনামের খেলা।"

অনাথনাথ এ গীত অনেকবার শুনিয়াছেন। মাতা-পুত্রের এ গীতাভিনয় অনেকবার দেখিয়াছেন। কিন্তু গীতটি এমন মধুর, এমন পবিত্র, এমন প্রাণদ্রবকারী তাঁহার আর কখনও বোধ হয় নাই। তিনি আত্মহারা হইয়া এই গীত শুনিতে লাগিলেন।

গীত ধীরে ধীরে সমাপ্ত হইল। বালিকা নীরব হইলেও শিশু ক্ষীণ—ক্ষীণতর কণ্ঠে ক্ষুদ্র হাতে ক্ষুদ্র তালি দিয়া ধীরে ধীরে গায়িতে লাগিল। তাহার নয়ন মুদ্রিত, মুখ শান্ত,—প্রস্ফুটিত কুসুমনিভ শোভা পাইতেছিল। ক্ষীণ—ক্ষীণতর কণ্ঠে গীত শেষ হইল। তালি বন্ধ হইল। হাত শ্লথ হইয়া পড়িল। শিশু নীরব হইল; সে তাহার মাতার কোলে, সেই প্রেমময়ের পদতলে, চলিয়া গেল। বালিকা ডাকিল,—"দাদা! দাদা!" উত্তর পাইল না। অনাথনাথ ডাকিলেন,—"বাবা! বাবা!" উত্তর পাইলেন না! শিশু তাহার মাতার কোলে, সেই প্রেমময়ের পদতলে, চলিয়া গেল। অনাথনাথ ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সন্ধ্যার ছায়া ক্রমে গাঢ়—গাঢ়তর হইয়া এই পবিত্র দৃশ্য ঢাকিয়া ফেলিল।

নবম অধ্যায়।

মহাশক্তি।

অমাবস্যার ঘোরা কৃষ্ণা মহানিশি প্রভাত হইতেছে। জননী প্রকৃত নৃমুণ্ডমালিনী সাজিয়া এ মহানিশিতে এ অঞ্চলে পূজা গ্রহণ করিয়াছেন। এমন প্রকৃত পূজা সৃষ্টিসংহারকারিণীর বুঝি আর কখনও হয় নাই। শ্মশানবাসিনীর পূজার রাত্রিতে এমন প্রকৃত মহাশ্মশান বুঝি আর কখন সজ্জিত হয় নাই। সমস্ত বঙ্গদেশ সারারাত্রি উৎসবক্ষেত্র—আর এ অঞ্চল মহাশ্মশান! আনন্দ-আলোকের পার্শ্বে এরূপে নিরানন্দের ছায়া ধরিয়া, হায় মা! তুই

উভয়ের কি মহত্ত্বই প্রতিপাদন করিস্! আনন্দ না থাকিলে নিরানন্দ, নিরানন্দ না থাকিলে আনন্দ, আমরা বুঝিতে পারিতাম না;—মানব-জীবন বৈচিত্র্যশূন্য হইয়া অসহনীয় হইয়া উঠিত। আনন্দের পার্শ্বে নিরানন্দ,—এ গঙ্গা-যমুনাসম্মিলনে তোর সংসার প্রয়াগক্ষেত্র!

রাত্রি প্রভাত হইতেছে। বঙ্গদেশ ব্যাপিয়া প্রভাত-আরতি বাজিতেছে। অনাথনাথ সমস্ত রাত্রি শোকে এবং শারীরিক ও মানসিক অবসাদে অচৈতন্য ছিলেন। অকস্মাৎ তাঁহার কর্ণে স্বপ্নে বহুদিন শ্রুত, বহুদিনবিস্মৃত, মধুর বংশীরবের মত "বাবা!" সম্বোধন প্রবেশ করিল। সম্বোধনে যেন তাঁহার মৃতবৎ দেহে সঞ্জীবনী সুধা বর্ষণ করিল। ক্রমে তিনি চৈতন্যলাভ করিতে লাগিলেন। আবার শুনিলেন,—"বাবা!" এবং অনুভব করিলেন, তাঁহার চরণে যেন সুকোমল সুশীতল কুসুম বর্ষিত হইয়াছে। নয়ন উন্মীলিত করিয়া দেখিলেন, দুই হাতে ভানুমতী তাঁহার চরণদ্বয় ধরিয়া তাঁহাকে জাগাইতেছে। কি শান্ত, কি সুন্দর, কি পবিত্র মুখখানি! কি শান্ত, কি সুন্দর, কি পবিত্র আয়ত নয়ন! সেই মুখে সেই নয়নের কি কোমলতা, কি স্নেহ, কি শোক। অনাথনাথ স্থিরনয়নে সেই মুখখানির দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার মনে হইল,—এ বালিকা কে? এ কি মানবী? বালিকা আবার "বাবা" বলিয়া ডাকিলে, অনাথনাথ বলিলেন,—"কি মা!" বালিকা বলিল—"বাবা! আমি চলিলাম। আমি ২।১ দিন পরে আবার আসিব। যদি পাই, তোমার জন্যে একখানি নৌকা লইয়া আসিব। তুমি চম্বল গ্রামে কোথাও আশ্রয় লইয়া এই দুই দিন কিঞ্চিৎ বিশ্রাম কর।"

অ। সে কি মা! তুই কোথায় যাইবি?

ভা। আমি আদিনাথ যাইব।

অ। কেন?

ভা। অমিয়কে বাঁচাইতে।

অনাথনাথ উচ্চ কণ্ঠে কাঁদিয়া বলিলেন,—"হায়! মা! অমিয় কি আর বাঁচিবে?"

ভা। বাঁচিবে।

অ। না মা! মানুষ মরিলে কি আবার বাঁচিয়া উঠে?

ভা। উঠে। লক্ষীন্দর আবার বাঁচিয়াছিল। সত্যবান্ আবার বাঁচিয়াছিল। অমিয় আবার বাঁচিবে না কেন? পত্নী যদি পতিকে বাঁচাইতে পারে, ভগ্নী ভাইকে বাঁচাইতে পারিবে না কেন?

অ। হায় মা! সে সব উপাখ্যান। রমণীদিগকে সতীধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য কবিগণ এ সকল উপাখ্যানের রচনা করিয়াছেন।

ভা। না বাবা: সে সকল গল্প নহে। সকলই সত্য কথা। বেহুলা ভেলায় ভাসিয়া দেবপুরে গিয়া স্বামীকে বাঁচাইয়াছিল, আমি এ সমুদ্র সাঁতারিয়া ঐ দেবলোক আদিনাথে গিয়া অমিয়কে বাঁচাইব।

বালিকা বিদ্যুৎবেগে অনাথনাথের চরণে প্রণাম করিয়া, তাঁহার চরণধূলি ললাটে মাখিয়া, অনাথনাথ চক্ষুর নিমেষ ফেলিবার পূর্ব্বে, সমুদ্রে ঝাঁপ দিল। তিনি তাহাকে বারণ করিবার অবসর পাইলেন না। তিনি দেখিলেন, বেদেরমণীরা যেরূপ কাপড়ের দোলা করিয়া শিশুদিগকে পৃষ্ঠে বাঁধিয়া পথ চলে, ভানুমতী সেইরূপে মৃতশিশুকে তাহার পৃষ্ঠে বাঁধিয়া, একখানি কাষ্ঠমাত্র ভর করিয়া, দু' হাতে বিশাল তরঙ্গ কাটিয়া, অবলীলাক্রমে বেগে সন্তরণ করিয়া যাইতেছে।* এ শক্তি ত মানবীর নহে!

* "Mohabat Ali of Tafalier Char in Kutubdia (I can not refrain from putting his name in record) was wash-

এ কি তবে সত্যই সত্যই সেই "কমলে কামিনী" মহাশক্তি! তিনি আবার মূৰ্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

দুই ক্রোশব্যাপী সমুদ্রশাখা সন্তরণ করিয়া বালিকা অপরাহ্নে আদিনাথ গিরিশ্রেণীর সর্ব্বোচ্চশেখরসানুস্থিত দেবমন্দিরে উপস্থিত হইল। বালিকার বৈরাগী পিতা গৌরদাস ভারতপূজিত স্বনামখ্যাত ৺শঙ্করপুরীর শিষ্য ছিলেন। তিনি এ অঞ্চলে পুরী গোস্বামী বা পুরী বাজাজি বলিয়া পরিচিত ও পূজিত ছিলেন। গৌরদাস দেহ-ত্যাগের সময়ে বালিকাকে বলিয়াছিলেন যে, ছয় বৎসর পরে তাঁহার গুরুদেব আদিনাথ দর্শন করিতে আসিবেন। সে কথাটাতে কি এক শক্তি নিহিত ছিল, তাহা বালিকার প্রাণে যেন জাগিয়া রহিয়াছিল। সে দিন গণিতেছিল। সেই ছয় বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। তাহার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, এ সময়ে আদিনাথের মন্দিরে গেলে তাঁহার সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে। সে বেদে-বেদেনীকে এই সকল কথা বলিয়াছিল। বেদে নিজেও বড় সন্ন্যাসিভক্ত ছিল। আর বেদেনী—সেও ৺পুরী গোস্বামীর প্রতিভার ও প্রতিষ্ঠার যেরূপ গল্প শুনিয়াছিল, তাহার মনে নিশ্চয় বিশ্বাস হইয়াছিল যে, তিনি তাহার মত রূপ-গুণ-বুদ্ধি-কৌশলসম্পন্ন রমণীরত্নকে দেখিলেই বড়-বড় টাকা দিবেন। অতএব উভয়ে আনন্দের সহিত বালিকার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া বাজি করিতে 'সোণাদিয়া' হইয়া আদিনাথ যাইবার পথে ঝটিকাগ্রস্ত হইয়াছিল।

বালিকা সেইরূপ উত্তরীয়বৎ বসনে পৃষ্ঠে বদ্ধ মৃত শিশু সহ অবলীলাক্রমে পর্বত আরোহণ করিয়া আদিনাথের মন্দিরে

---

ed from his home across the Kutubdia Channel t Chhanua." He spent the whole of the next day i swimming back to the Island with the help of plank."

উপস্থিত হইল, এবং একজন ভৃত্যের কাছে শুনিতে পাইল যে, সত্য সত্যই একজন মহাপুরুষ সন্ন্যাসী সে সময়ে মন্দিরে অবস্থিতি করিতেছেন। আনন্দে, আবেগে, অজ্ঞাত আশায় নিরাশায়, তাহার ক্ষুদ্র হৃদয় কম্পিত হইল। সন্ন্যাসী একটী বিশাল পার্ব্বত্য-পাদপচ্ছায়ায় স্থির নয়নে অনন্ত সমুদ্রের দিকে চাহিয়া ধ্যানস্থ বসিয়াছিলেন। কি মূর্ত্তি!

বীরবপু, ক্ষীণ কটি, প্রশস্ত উরস,
তেজঃপুঞ্জ স্বর্ণকান্তি ভস্মে আচ্ছাদিত।
জটার মুকুট উচ্চ শোভিতেছে শিরে,
আদিনাথ-অদ্রিশিরে শোভিতেছে যেন
উচ্চচূড়া মন্দিরের। বসি যোগাসনে,
মহাযোগী, দীর্ঘ দেহ স্থির সমুন্নত।
যোগস্থ আয়ত নেত্র আকর্ণবিস্তৃত,
চাহি অর্দ্ধ-নিমীলিত মহাসিন্ধু পানে।
স্থির, শান্ত, অপলক। রুদ্রাক্ষের মালা
অচল দক্ষিণ করে। শোভিছে বরদ
বাম কর বাম অঙ্কে, যেন মহাযোগী
করিছেন বরদান জীবে, চরাচরে।
শেখর নীরব স্থির, স্থির চরাচর।
কেবল সমুদ্রানিল বহিতেছে ধীরে
কাঁপাইয়া বৃক্ষপত্র, উত্তরীয়-বাস
বাম-অংস-বিলম্বিত, ধীরে ধীরে ধীরে।
অপরাহ্ণ-রবিকরে ভাসে চারি দিকে
কি দৃশ্য কল্পনাতীত সিন্ধু-বসুধার!
চারি দিকে জলরাশি, অনন্ত অতল;
পশ্চিমে দক্ষিণে মহানীল নীলাম্বুর।

উত্তরে ধূসর সিন্ধু শোভা সুবিস্তৃত
সুপবিত্র পাদমূলে চন্দ্রশেখরের ;
নীলাকাশে সুশোভিত মেঘমালা মত,
গিরিশ্রেণী তরঙ্গিত শোভে চিত্রাঙ্কিত।
পূর্ব্বে শাখা সিন্ধু ; শ্বেতভুজ সুবিশাল
প্রসারি পয়োধি যেন রয়েছে প্রণত
আলিঙ্গি আদিনাথের পবিত্র চরণ।
শোভিতেছে পূর্ব্বতীরে সমুদ্রশাখায়
চট্টলের গিরিশ্রেণী অনন্ত শৃঙ্খলে
বসুধার বক্ষে শ্যাম মরকত-মালা।
ভাসিতেছে আদিনাথ গর্ভে জলধির
কি সুন্দর!—সিন্ধুগর্ভে যেন নারায়ণ।

বালিকার বোধ হইল, তাহার সম্মুখে সেই যোগস্থ নারায়ণ। চারি দিকের এই মহাদৃশ্য সেই ঝটিকার পরে অপরাহ্ণ-রবিকরে কি গাম্ভীর্য্যপূর্ণ শান্তমূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছে! স্থান, কাল, তাহার হৃদয়ের অবস্থা, সম্মুখস্থ মহাযোগী,—তাহার ক্ষুদ্র হৃদয় ভক্তিতে পরিপূরিত হইল। সমাধিশেষে যোগিবর নয়ন উন্মীলন করিলে, বালিকা তাহার পৃষ্ঠস্থিত শিশুশব তাঁহার চরণতলে রাখিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল। সন্ন্যাসী কোমল সস্নেহকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মা! তুমি কে?"

ভা। আমি গৌরদাসের শিষ্যা-কন্যা।

স। তুমি এখানে কেন আসিয়াছ?

ভা। পুরী বাবাজি এ সময়ে এখানে আসিতে গুরুদেবের কাছে প্রতিশ্রুত ছিলেন।

স। শঙ্কর পুরীর মৃত্যু হইয়াছে বহু বৎসর।

ভা। তাঁহার মত মহাযোগীর মৃত্যু নাই। তিনি কলেবর পরিবর্ত্তন করিয়া থাকিবেন।

স। তুমি মা! কি তাহা বিশ্বাস কর?

ভা। করি।

সন্ন্যাসী ঈষৎ হাসিলেন।

স। কেন কর?

ভা। গুরুবাক্য কর্ণে শুনিয়াছি—আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন। দেহ মৃত্যুর অধীন। আত্মা অমর। চক্ষে দেখিয়াছি, শত শত মৃত জীব পড়িয়া রহিয়াছে। তাহাদের দেহ যেরূপ ছিল, সেই রূপই আছে। অতএব দেহ হইতে স্বতন্ত্র কিছু একটা ছিল, তাহা চলিয়া গিয়াছে। সে যদি এ দেহ গ্রহণ করিতে পারিয়াছিল, অন্য দেহ গ্রহণ করিতে পারিবে না কেন?

সন্ন্যাসী বালিকার তেজস্বিনী বুদ্ধিতে প্রীত হইয়া আবার একটু সস্নেহ হাসি হাসিলেন। যেন তুষারাবৃত হিমালয়শৃঙ্গে দ্বিতীয়ার চন্দ্রালোক একটু দেখা দিয়া আবার লুকাইল।

স। তুমি আমার কাছে কি চাও?

ভা। এই শিশুর প্রাণভিক্ষা।

স। মা! মানুষ মরিলে কি আবার বাঁচিতে পারে?

ভা। আমি কিরূপে মরিয়া বাঁচিয়াছিলাম? পুরী বাবাজির বাঁচাইবার শক্তি আছে।

স। অবস্থাবিশেষে জলমগ্ন জীবকে পুনর্জ্জীবিত করা যাইতে পারে। তাহাতেই বোধ হয় শঙ্কর পুরী তোমাকে পুনর্জ্জীবিত করিতে পারিয়াছিলেন। ইহার সে অবস্থা নহে।

ভা। নহে কেন?

স। ইহার মৃত্যু জলে ডুবিয়া হয় নাই। বিশেষতঃ, এই শিশু যোগভ্রষ্ট। ইহার কিঞ্চিৎ কর্ম্মফল ভোগ করিবার ছিল

সে তাহা ভোগ করিয়া জীবন্মুক্ত হইয়া চলিয়া গিয়াছে। বৎসে! ওই সমুদ্রের স্রোতে একখানি ভগ্ন যান ভাসিয়া যাইতেছে দেখিতেছ? উহা যতক্ষণ স্রোতের আকর্ষণে থাকিবে, ততক্ষণ ভাসিবে। মানুষের আত্মাও যতক্ষণ এই পার্থিব কামনা-স্রোতের আকর্ষণে থাকে, ততক্ষণ এই পৃথিবীতে তাহার পুনর্জন্ম হয়। এই স্রোতের অতীত হইলে আর হয় না। তোমার এ জগতে কর্ম্ম আছে। তোমার দ্বারা কোনও মহৎ কর্ম্ম সাধিত হইবে বলিয়া তোমাকে পুরী গোস্বামী পুনর্জ্জীবিত করিয়াছিলেন। এই শিশু পুনর্জ্জীবিত হইলে তাহার পক্ষে অধোগতি হইবে, এবং সেই কর্ম্মেও বিঘ্ন হইবে।

ভা! আমি অনাথা ভিখারিণী, বেদের মেয়ে। আমার দ্বারা বাবা! কি মহৎ কর্ম্ম সাধিত হইতে পারে?

স। সনাতনধর্ম্মরক্ষা। যিনি ধর্ম্মরক্ষার্থ যুগে যুগে রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তুমি তাঁহারই ক্ষুদ্রাংশ। মা! এই চট্টগ্রাম বড় পুণ্যভূমি। এই আদিনাথ, আর ঐ সুদূরে মেঘের গায়ে চন্দ্রনাথ দর্শন কর। জগতের কোথাও এক স্থানে এত তীর্থ নাই। কিন্তু এই পবিত্র তীর্থ সকলের কি দুরবস্থাই হইয়াছে। যে আসনে পূজ্যপাদ ৺ গোমতীবন ও রত্নবনের মত মহাযোগী বসিয়াছিলেন, আজ তাহাতে কি মোহন্তরাই বসিয়াছে! ইহারা ত মোহন্ত নহে মোহান্ধ! ৺ গোমতীবন ও রত্নবনের বাৎসরিক ব্যক্তিগত ব্যয় ছিল ৪০৲ টাকা। তীর্থের প্রায় সমস্ত আয় দেব ও অতিথি সন্ন্যাসীর সেবায় ব্যয়িত হইত। তাঁহারা স্বয়ম্ভুনাথের মন্দির-সমীপবর্ত্তী 'আস্তানে' কৌপীনমাত্র-পরিহিত হইয়া ভস্মাচ্ছাদিতকলেবরে সমাধিস্থ অবস্থায় অহর্নিশি অতিবাহিত করিতেন। যাত্রিগণ তাঁহাদের চরণে প্রণত হইয়া দেব-সেবার্থ যথা ইচ্ছা 'প্রণামী' প্রদান করিয়া এবং পদধূলি গ্রহণ করিয়া

চরিতার্থ হইত। কিন্তু বর্ত্তমান মোহন্তগণের ক্রিয়াকলাপ সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ। যাত্রিগণ ও মোহন্তগণকে প্রণাম করিয়া 'প্রণামী' দেওয়া দূরে থাকুক, তাহাদের কোনরূপ সংস্রবে পর্য্যন্ত আসিতে চাহে না। কাজেই তীর্থধাম 'রেলওয়ে' পরিণত হইয়াছিল। মোহন্তরা টিকিট কাটিয়া, তীর্থধামের সমক্ষে ঘেরা দিয়া, প্রহরী রাখিয়া, বলপূর্ব্বক প্রণামীর স্থলে এত কাল 'কর' বা 'টেক্স' আদায় করিতেছিল। মহামান্য হাইকোর্ট সেই ঘোরতর উৎপীড়ন হইতে আপাততঃ যাত্রিগণকে উদ্ধার করিয়াছেন। এই অর্থরাশি এবং তীর্থের প্রায় সমস্ত আয় মোহন্তদের আত্মসেবায় নিঃশেষিত হইতেছে। দেব এবং অতিথি সন্ন্যাসীর সেবা নামমাত্রে পরিণত হইয়াছে। মন্দির ও সোপানাবলি পর্য্যন্ত সংস্কারাভাবে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। জলাশয় সকল শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। এ ভাবে আর কিছু দিন চলিলে এ দেশের তীর্থধাম সকল লুপ্ত হইবে। কেবল এখানে বলিয়া নহে মা! ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই এই শোচনীয় অবস্থা।

ভা। বাবা! রাজা কেন এই ভণ্ড মোহন্তদিগকে তাড়াইয়া দিয়া তীর্থগুলি রক্ষা করেন না?

স। ইংরাজ রাজ্য রামরাজ্য। আসমুদ্র হিমাচল, আগান্ধার চট্টগ্রাম, এরূপ প্রগাঢ় শান্তি, যুধিষ্ঠিরের সেই ধর্ম্ম-রাজ্যের পর, ভারত আর কখনও ভোগ করিয়াছে কি না সন্দেহ। কিন্তু ইংরাজ বিদেশী, ইংরাজ ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী। এক দিকে আমাদের সনাতন ধর্ম্মের উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাব, আমাদের দর্শনের সূক্ষ্ম জটিলতা, তাঁহারা গ্রহণ করিতে পারেন না। তাঁহারা ইহাকে 'পৌত্তলিকতা' বলেন। বাক্য মনের অগোচর পরমব্রহ্মের বিভিন্ন শক্তির বিভিন্ন 'প্রতিমা' যে পুতুল নহে, তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। অতএব আমাদের সার্ব্বভৌম ধর্ম্মকে তাঁহারা

'পৌত্তলিকতা' বলিয়া তাহার প্রশ্রয় দেওয়া অকর্ত্তব্য মনে করেন। অন্য দিকে প্রজার ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ না করাই তাঁহাদের রাজ্যের একটি মূলনীতি। বহু ধর্ম্ম সম্প্রদায়ে বিভক্ত ভারতবর্ষে ইহা যে উত্তম নীতি, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু রাজা না করিলে ধর্ম্ম কে রক্ষা করিবে? পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, রাজশক্তি ভিন্ন ধর্ম্ম রক্ষিত হয় না; এক এক জন অবতার আসিয়া যুগে যুগে ধর্ম্মস্থাপন করেন। যত দিন রাজশক্তি তাহার পশ্চাতে থাকে, তত দিন তাহা রক্ষিত ও বর্দ্ধিত হয়। রাজশক্তি অপসারিত হইলে অধর্ম্মের অভ্যুত্থান আরম্ভ হয়। এইরূপে কৃষ্ণোক্ত ধর্ম্মের পশ্চাতে যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মরাজ্যচ্ছায়া, এবং বুদ্ধোক্ত ধর্ম্মের পশ্চাতে অশোকের রাজ্যচ্ছায়া ইতিহাসে পরিলক্ষিত হয়। রাজশক্তির অবলম্বন অভাবে আর্য্যধর্ম্মের এই দুর্দ্দশা হইয়াছে। ইংরাজ রাজা বলেন, তাঁহাদের নীতির রাজ্য। তীর্থ সম্বন্ধেও রাজনীতি আছে। প্রজাগণ সেই নীতির অনুসরণ করিয়া আপন আপন তীর্থ রক্ষা করুক।

ভা। বাবা! প্রজারা তাহা করে না কেন?

স। মা! কে করিবে? হিন্দু ধর্ম্ম জীবনহীন; হিন্দু সমাজ মৃত। তবে চট্টগ্রামবাসীদের সাহস আছে, উৎসাহ আছে, উদ্যম আছে। মহাঝড়েও অর্ণবযানের পালদণ্ডের শীর্ষদেশে উঠিতে চট্টগ্রামবাসী ভয় করে না। পুরী গোস্বামী মনে করিয়াছিলেন, এখানে যদি হিন্দু ধর্ম্মে ও সমাজে জীবন সঞ্চার করিতে একটি শিষ্যসম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে নৈসর্গিকশোভাসম্পন্ন এই পুণ্যস্থানের তীর্থগুলি রক্ষা করিতে পারিবেন। বিশেষতঃ এখানের তীর্থগুলির যেরূপ শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে, এমন আর কোথাও হয় নাই।

এই কারণে তিনি মুক্তহস্তে শস্য ছড়াইয়াছিলেন। পাত্রাপাত্র কিছুরই বিচার না করিয়া শিষ্য করিয়াছিলেন। মনে করিয়াছিলেন, যে বীজ উর্ব্বর ক্ষেত্রে পড়িবে, তাহা হইতে সুফল উৎপন্ন হইবে। কিন্তু হায়! প্রায় সকল বীজই উষর ক্ষেত্রে পতিত হইয়াছিল। তাঁহার অভিসন্ধির মহত্ত্ব, তাঁহার দীক্ষার গভীরত্ব, এবং তান্ত্রিক ধর্ম্মের তাৎপর্য্য, উদারতা, সমপ্রাণতা, ইহারা কিছুই বুঝে নাই। শুনিলাম কোনও এক জন অবস্থাপন্ন শিষ্য অম্লানমুখে বলিয়াছেন যে, তিনি তীর্থরক্ষাব্রতে যোগদান করিতে পারেন না, কারণ কোন মোহন্ত ও তিনি উভয়েই পুরী গোস্বামীর শিষ্য। হা পুরী গোস্বামী! তুমি কি এই ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছিলে? তুমি কি শিক্ষা দিয়াছিলে যে, কোনও শিষ্য ঘোরতর পাপকার্য্যে লিপ্ত হইলেও তোমার শিষ্যগণ, তাহাকে সেই কার্য্য হইতে বিরত করিবার চেষ্টা না করিয়া বরং তাহার প্রশ্রয় দিবে? বারংবার এ অঞ্চলে আসিয়া তোমার বুঝি স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল, তাহাদের এই অধোগতি দেখিয়া বুঝি তুমি ভগ্নহৃদয় হইয়াছিলে, তাহাতেই বুঝি তোমার অকালে দেহত্যাগ ঘটিল!

সন্ন্যাসীর নয়নে জল আসিল। বালিকার নয়নেও জলধারা বহিল। বালিকা গদদশ্রুনয়নে জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবা! ইংরাজ রাজা দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে রাজ্যশাসন করিতেছেন। দস্যু তস্করের দণ্ড দিতেছেন। যাহারা দেববিত্ত চুরি করিতেছে, তাহারাও কি চোর নহে? তাহাদেরও অন্য চোরের মত দণ্ড দেওয়া কি রাজার উচিত নহে?"

স। উচিত। কিন্তু এ পথেও দুটি অন্তরায়। ইংরাজ রাজপুরুষেরা স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া যদি ইহাদের গায়ে হস্তক্ষেপ করেন, তাঁহারা ভয় করেন যে,—"রাজা হিন্দুধর্ম্মে হস্তক্ষেপ

করিলেন"—বলিয়া সমস্ত দেশ চীৎকার করিয়া উঠিবে। তাঁহাদের এই আশঙ্কা অমূলক। সমস্ত দেশ বরং তাঁহাদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে। চীৎকার করিবে কেবল মুষ্টিমেয় লোক। ইহাদের অধিকাংশই মোহন্তদের উচ্ছিষ্টভোজী। কেবল কয়েক জন মাত্র আশঙ্কা করেন যে, ইংরাজ রাজাকে তীর্থে হস্তক্ষেপ করিতে দিলে তীর্থবিত্ত যাহা এখন মোহন্তরা ভোগবিলাসে ও পাপকার্য্যে ব্যয়িত করিতেছে, তাহা রাজকোষে যাইবে। ইহারা ইংরাজ রাজপুরুষদের সাধু উদ্দেশ্যে প্রায় সকল বিষয়েই অল্পাধিক বিশ্বাসহীন। কিন্তু তাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তীর্থগুলির রক্ষা না করিলে দুরাচার মোহন্তদের প্রতিকূলে অভিযোগ উপস্থিত করিবে কে? এ দারিদ্র দেশে যাহারা ধনী, তাহারা সকলেই উপাধিব্যাধিগ্রস্ত। ইহাদের এখন ধর্ম্ম—উপাধি, অর্থ—উপাধি, কাম—উপাধি, মোক্ষ—উপাধি! অন্য দিকে দেবতার কৃপায় মোহন্তদের প্রভূত অর্থবল। ইহাদের সঙ্গে বিবাদ করিয়া কে সর্ব্বস্বান্ত হইবে? মোহন্তরা বিলাত পর্য্যন্ত না লড়িয়া ছাড়িবে না। ২০ বৎসরেও এই বিবাদ বিচারালয়ে শেষ হইবে না। ইতিমধ্যে বিবাদী মোহন্ত সমস্ত দেববিত্তের ধ্বংস করিয়া মরিয়া যাইতে পারে। তাহা হইলে এই বিবাদে তীর্থের কোন উপকার হইবে না। কেবল অভিযোগকারীর সর্ব্বনাশ। যদি এই হিমালয়স্বরূপ অন্তরায় না মানিয়া কেহ সর্ব্বস্ব পণ করিয়া অভিযোগ করিতে অগ্রসর হয়, তখন দ্বিতীয় অন্তরায় উপস্থিত হয়। রাজপুরুষেরা পূর্ব্বে সমাজের নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া কার্য্য করিতেন। এখন আর তাহা করেন না। সুতরাং ক্রমে নেতৃগণ এই কারণে নেতৃত্ব হারাইতেছেন, দেশ নেতৃহীন হইতেছে, সাম্রাজ্যের একটি প্রধান স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। নেতার স্থানে এখন চাটুকারের

আবির্ভাব হইয়াছে, এই চাটুকারেরা সামান্য স্বার্থের জন্যে না কহিতে পারে, এমন মিথ্যা কথা নাই; না করিতে পারে, এমন পাপ নাই; না জানে, এমন প্রবঞ্চনা নাই। এই নীচাশয়দের চক্রান্তে অভিযোগ নিষ্ফল হয়।

ভা। তবে কি হিন্দুধর্ম্মের হিন্দু তীর্থের, কোনও মতে রক্ষা হইবে না?

স। হইবে। তবে হিন্দু পুরুষপুঙ্গবদের দ্বারা হইবে না। হইবে—হিন্দু রমণীর দ্বারা। সতী সাধ্বী ধর্ম্মপ্রাণা হিন্দু রমণী আছে বলিয়া দেশে এখনও ধর্ম্ম আছে, তীর্থ আছে। কোনও পুণ্যবতী সোপানশ্রেণীর নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া এখনও যাত্রিগণ চন্দ্রশেখর আরোহণ করিয়া চন্দ্রনাথ দর্শন করিতে পারিতেছে। তোমার মত হিন্দু রমণীরাই এ সকল তীর্থ রক্ষা করিবে!

ভা। হায় বাবা! আমি ভিখারিণী বেদের মেয়ে। আমার দ্বারা কেমন করিয়া এত বড় একটা মহৎকার্য্য হইবে?

স। মা! তোমাকে পুনর্জ্জীবিত করিবার সময়ে পুরী গোস্বামী তোমার কর্ণে শক্তিসম্পন্ন মন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। তোমার অসাধ্য কর্ম্ম নাই। যথাসময়ে তিনি তোমার হৃদয়ে ইহার উপায় উদ্ভাসিত করিয়া দিবেন।

সন্ন্যাসী দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিলেন। বালিকা পাদপদ্মে প্রণত হইলে, তিনি তাহার শিরে সেই বরদ পদ্মপাণি স্থাপন করিয়া বলিলেন,—"আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি তোমার মনোরথ পূর্ণ হউক।"

দশম অধ্যায়।

—*—

ঝড়ের ও সমুদ্রপ্লাবনের ভীষণ সংবাদ প্রথমতঃ জনরবের ক্ষীণকণ্ঠে, পরে এ অঞ্চলস্থ কর্ম্মচারীদের পত্রে ঘোরারাবে চট্টগ্রাম নগরে উপস্থিত হয়, এবং দেশ ব্যাপিয়া হাহাকারধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে। উত্তরে কুমিরা হইতে দক্ষিণে কক্স্‌বাজার, অনুমান ৩৫ ক্রোশ, এবং পশ্চিমে সমুদ্রতট হইতে পূর্ব্বে দক্ষিণ লুসাই পর্ব্বতশ্রেণী পর্য্যন্ত, অনুমান ৪০ ক্রোশ পরিসর স্থানে, বৃক্ষ ও গৃহাদি ধরাশায়ী হইয়াছে। অনুমান দশ লক্ষ লোক একপ্রকার গৃহহীন হইয়াছে, এবং সহস্র সহস্র লোক গৃহপিষ্ট হইয়া ও বৃক্ষচাপা পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। শত্রুসৈন্যের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া, কামানের অজস্র বজ্রবর্ষণে নগর যেরূপ বিধ্বস্ত হয়, চট্টগ্রাম নগর সেইরূপ শোচনীয় অবস্থাপন্ন হইয়াছে। নগরে পর্ণগৃহমাত্র নাই; শৈলশেখরস্থ অট্টালিকা সকল ভগ্নাঙ্গ ও শ্রীহীন; বৃক্ষাদি পড়িয়া রাজপথ সকল বন্ধ হইয়া গিয়াছে। মহামহীরুহ সকল পর্য্যন্ত সমূলে উৎপাটিত ও স্থানান্তরিত হইয়াছে। কর্ণফুলিস্থ অর্ণবযান সকল বিধ্বস্ত বা জলমগ্ন হইয়াছে। জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ফিলিমোর নগর পরিষ্কার করিয়াছিলেন, এবং বিপন্নদের সাহায্যের জন্যে যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছিলেন ও সদাশয়তা দেখাইয়াছিলেন, চট্টগ্রামবাসী তাহা শীঘ্র ভুলিবেন না।

অনাথনাথের বাটীতে এ ভীষণ সংবাদ পঁহুছিলে, তাঁহার লোকজন খাদ্যদ্রব্যাদি ও শিবির লইয়া তাঁহার অনুসন্ধানে জলপথে ছুটিল। তাঁহার জমিদারী সুবর্ণদ্বীপ-রূপ মহাশ্মশানে শিবিরস্থাপন করিয়া তিনি কয়েক দিন যাবৎ ধ্বংসাবশিষ্ট প্রজাদের প্রাণপণে সাহায্য করিতেছেন। তাঁহার পত্নীর ও বেদেদের বহু অনুসন্ধান

করিয়াছেন, কোনও সংবাদ পান নাই। পত্নীপুত্রসর্ব্বস্ব অনাথনাথের হৃদয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে কিন্তু সেই ভগ্ন হৃদয় লইয়া, আত্মশোক ভুলিয়া, প্রজাদের ভগ্নহৃদয়ে শক্তি ও শান্তির সঞ্চার করিতেছেন। শোকার্ত্তের অশ্রু মুছাইতেছেন, ক্ষুধার্ত্তের ও তৃষ্ণাতুরের অন্নজলের ব্যবস্থা করিতেছেন। প্রত্যহ গবর্মেণ্টের পক্ষ ও তাঁহার পক্ষ হইতে খাদ্য ও জল আসিতেছে; কারণ, সমুদ্রপ্লাবনে সমস্ত সরোবর ও দীর্ঘিকা লবণাক্ত ও মৃত গলিত শবে দূষিত হইয়াছে। স্থানে স্থানে কূপ খনন করা হইতেছে। সর্ব্বাপেক্ষা দুরূহ কার্য্য শবের সৎকার। শত শত সহস্র সহস্র নর-পশু-পক্ষি শবে দ্বীপাবলী ও সমুদ্রতটস্থ গ্রামসমূহ সমাচ্ছন্ন। শৃগাল, কুক্কুর, গৃধিনী, কিছুই জীবিত নাই। মৃতদেহ সকল এরূপ লবণাক্ত হইয়াছে যে, তাহা অতি ধীরে ধীরে পচিতেছে এবং অসহনীয় দুর্গন্ধ বিকীর্ণ করিতেছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গর্ত্ত করিয়া এই শবরাশি পুতিয়া ফেলিতে হইতেছে। তাঁহাকে ও চির-স্মরণীয় একজন ইংরাজ রাজপুরুষকে এই ভীষণ কার্য্য স্বহস্তে সম্পাদন করিতে হইতেছে। কারণ, যে সকল লোক ঝটিকাপ্লাবনে রক্ষা পাইয়াছে, তাহারা এরূপ হতসাহস, কর্ত্তব্যজ্ঞানহীন ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহাদের দ্বারা কোনও কার্য্যই হইতেছে না। এই পুণ্যব্রতে ভানুমতীই অনাথনাথের একমাত্র সহায় ও শান্তি। সমস্ত দিবস বালিকাকে লইয়া সর্ব্বস্বান্ত দুর্ব্বল প্রজাদের সেবা শুশ্রূষা করেন, এবং সবল প্রজাদের দ্বারা কূপ-খনন ও জমিদারি-রক্ষার্থ সমুদ্রতীরস্থ ভগ্ন বাঁধের ও প্রজাদের গৃহের সংস্কার করেন, এবং রাত্রিতে নির্জ্জন শিবিরে বালিকার মুখ দেখিয়া, তাহাকে বুকে লইয়া, পত্নী পুত্রের শোক নিবারণ করেন। ডিক্‌সন সাহেব (Cixou) পর্য্যন্ত বালিকার শক্তি, বুদ্ধি ও হৃদয়তা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। তি নিও তাহাকে অত্যন্ত

স্নেহ করেন, এবং বলেন, ভারতবর্ষে এমন রমণীরত্ন আছে, তিনি চক্ষে না দেখিলে বিশ্বাস করিতেন না।

অপরাহ্ণ। শিবিরচ্ছায়ায় সিন্ধুসম্মুখে অনাথনাথ একখানি চেয়ারে দিবসের পরিশ্রমে অবসন্নদেহে বসিয়া আছেন। পদতলে ভানুমতী, যেন দেবপদতলে চম্পকফুলরাশি।। সম্মুখে অনন্ত সমুদ্র অপরাহ্ণ-রবি-করে তরঙ্গিত তরল সুবর্ণরাশির মত শোভা পাইতেছে। অনতিদূরে বাষ্পযান ও অর্ণবযান সকল পাল প্রসারিত করিয়া নানাবিধ অর্ণবচর পক্ষীর মত ভাসিয়া বেড়াইতেছে।

অ। মা! এত দিনে আমি বৃটিশরাজ্যের ও বৃটিশ রাজপুরুষদের একটি মহত্ত্বের দৃষ্টান্ত দেখিলাম। যাহা দেখিলাম, তাহাতে বৃটিশ রাজ্যকে ও বৃটিশ রাজাকে পূজা করিতে ইচ্ছা করে। এ অঞ্চল সমুদ্রতরঙ্গমগ্ন হইবার সংবাদ চট্টগ্রাম নগরে প্রচারিত হইবামাত্র, আমাদের করুণহৃদয় কমিশনার কলিয়ার সাহেব (F. R. S. Collier) একখানি "ষ্টিমলঞ্চ" লইয়া ছুটিয়া আসেন। এমন শান্ত, স্থির, শিবতুল্য ব্যক্তি,—এমন নির্ব্বাক, আড়ম্বর-শূন্য, দৃঢ়, কর্ম্মজ্ঞ লোক, ইংরাজ রাজপুরুষদের মধ্যে বিরল। তাঁহারই কৃপায় এই ধ্বংসাবশিষ্ট হতভাগ্যগণ অন্নজল পাইতেছে। তাহার পর ওই দেবপ্রতিম ডিক্‌সন সাহেব একটি কর্ম্মাবতারের মত উপস্থিত হইয়া কি অদ্ভুত কর্ম্ম করিতেছেন, তুমি তাহার কিয়দংশ স্বচক্ষে দেখিয়াছ। তাঁহার নয়নে অশ্রু, হৃদয়ে করুণা, শরীরে অসাধারণ শক্তি ও সহিষ্ণুতা। মৃতদেহের শোচনীয় দৃশ্য দেখিয়া, জীবিতদের হাহাকার শুনিয়া, তাঁহাকে কত বার কাঁদিতে দেখিয়াছি। তাঁহার আহার নিদ্রা নাই বলিলেও হয়। তিনি অনবরত গ্রামে গ্রামে দ্বীপে দ্বীপে ঘুরিয়া কিসে হতভাগ্যদের দুঃখের উপশম হইবে, এবং এ সকল স্থান আবার বাসোপযোগী হইবে, দিবারাত্রি তাহারই জন্য পরিশ্রম

করিতেছেন। ইঁহার ঘৃণা নাই, দুর্গন্ধজ্ঞান নাই, ক্ষুধা নাই, পিপাসা নাই, মুখে চিরশান্তি, চিরপ্রসন্নতা। ঐ দেখ, পাদুকা-শূন্যপদে বর্দ্দমে দাঁড়াইয়া, আস্তিন গুটাইয়া, তিনি কখন বা স্বহস্তে মৃত্তিকা খনন করিতেছেন, কখন বা গলিত শবদেহ নিজে টানিয়া গর্ত্তে ফেলিতেছেন। তাঁহার এই অক্ষয়কীর্ত্তি এ দেশে প্রবাদের মত প্রচলিত থাকিবে, এবং আসহমানকাল এ অঞ্চলের লোকে তাঁহাকে দেবতার মত পূজা করিবে।

ভা। বাবা! ইনি কি মানুষ?

অ। মানুষ। তবে আমাদের মত মানুষ নহেন। ইঁহার কার্য্য দেখিয়া আমি এত দিনে বুঝিয়াছি, ইংরাজ কেন রাজা, আমরা কেন তাঁহার প্রজা। এত দিনে বুঝিয়াছি, ইংরাজ কি শক্তিবলে এরূপ বিস্তীর্ণ রাজ্য স্থাপন করিয়াছেন যে, তাঁহার রাজ্যে সূর্য্য কখনও অস্তমিত হয় না। ইহার এক অংশে সন্ধ্যা, অন্য অংশে প্রভাত; এক অংশে নিশীথসময়, অন্যাংশে মধ্যাহ্ন। এমন কর্ম্মবীর আর এ জগতে নাই। ইহার পর এলেন সাহেব (C. G. H. Allen) আসিয়াছিলেন। তিনি বন্দোবস্তির ভার প্রাপ্ত হইয়া দশ বৎসর এ অঞ্চলে আছেন, এবং আবালবৃদ্ধ সকলের কাছে পরিচিত। তিনি যেমন তীক্ষ্ণবুদ্ধি, কর্ম্মপটু, তেমনি সহৃদয়। এ দেশের নওয়াবাদ বন্দোবস্তি কার্য্যের মত বিরক্তিকর ও অপ্রিয় কার্য্য বুঝি আর নাই। কিন্তু কেহ তাঁহাকে কখনও বিরক্ত হইতে দেখে নাই, কখনও মুখে রুক্ষভাব শুনে নাই। কেবল মাত্র প্রিয় ব্যবহারে তিনি সকলের নিকট প্রিয়। এ অঞ্চলের অনেক তালুকদার ও প্রজাকে তিনি চেনেন। এক এক জন তালুকদারের শূন্য ভিটা ও বহু পরিবার সহ ধ্বংসের কথা শুনিয়া অশ্রুপাত করিয়াছেন। শুনিয়াছি, তাঁহারই প্রস্তাবে ও কলিয়ার সাহেবের পৃষ্ঠপোষকতায় গবর্মেণ্ট দুর্ভিক্ষের দান-

ভাণ্ডার হইতে ৫০,০০০ টাকা প্রজাদের সাহায্যার্থ দিয়াছেন। সমুদ্রতীরস্থ বাঁধ বাঁধিবার জন্য এবং কৃষকদের হাল গরু কিনিবার জন্য ১,৫০,০০০ টাকা ঋণ দিতেছেন, এবং এ অঞ্চলের দুই বৎসরের খাসমহলের রাজস্ব—লক্ষাধিক টাকা রেহাই দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। যে প্রণালীতে এ অঞ্চলের প্রজাদের সাহায্য করা হইতেছে, শুনিয়াছি, তাহার উদ্ভাবকও এলেন সাহেব। ইহার পর আমাদের প্রিয়ভাষী কালেক্টর সাহেব আসিয়া প্রজাদিগকে স্বহস্তে ঋণ দিয়াছেন ও তাহাদের বিপদে সহানুভূতি দেখাইয়া তাহাদের আশ্বস্ত করিয়াছেন।

এমন সময়ে আর এক জন সাহেব আসিলেন, এবং অনাথনাথের সঙ্গে অভিবাদন বিনিময়ের পর তাঁহার পার্শ্বস্থিত একখানি চেয়ারে বসিয়া বলিলেন,—"একটি লোক কতকগুলি পুরাতন কাপড় ও পয়সা স্থানে স্থানে বন্যাবিধ্বস্ত লোকদিগকে বিলাইতেছে। সে বলিল, সে ব্রাহ্ম।"

অ। সম্ভব। ব্রাহ্মসমাজ একদিন দেশরক্ষা করিয়াছে। পূজ্যপাদ ৺রামমোহন রায়ের অভ্যুত্থান না হইলে, এতদিন অর্দ্ধেক হিন্দু খৃষ্টান কি মুসলমান হইত। এখনও ব্রাহ্মসমাজে বহু পূজনীয় ব্যক্তি আছেন।

সাহেব। আচ্ছা বাবু! ব্রাহ্ম ধর্ম্মে ও হিন্দু ধর্ম্মে বিভেদ কি?

অ। কিছুই না। হিন্দু ধর্ম্মের উচ্চতম শাখাই ব্রাহ্মধর্ম্ম। তবে ব্রাহ্মরা এক লাফে সে শাখায় উঠিতে চাহেন। অষ্টমবর্ষীয় শিশুও একবার নয়ন মুদ্রিত করিয়া একমেবাদ্বিতীয়ং বলিলেই ব্রাহ্ম হইল। হিন্দুরা বলে, গোড়া বাহিয়া বৃক্ষের আগায় উঠিতে হইবে।

সাহেব। হিন্দুরা কি পৌত্তলিক নহে?

অ। না। পৌত্তলিক শব্দ হিন্দুদের অভিধানে কি ভাষায়

পর্য্যন্ত নাই। হিন্দুরা পুতুল পূজা করে না। পরম ব্রহ্ম মানব-ইন্দ্রিয়ের, বাক্য মনের অতীত। তাঁহাকে কেবল তাঁহার শক্তির দ্বারা ধারণা করিতে পারি। হিন্দুরা এক একটি শক্তির প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া তাহা সম্মুখে রাখিয়া সেই সেই শক্তির পূজা করে। অদ্ভুত জ্ঞান ও কবিত্বপূর্ণ প্রতিমাতত্ত্ব বুঝাইবার এ স্থান নহে। আপনিও সহজে বুঝিবেন না। তবে এইমাত্র বুঝিয়া রাখুন, খৃষ্টানদের ক্রশ যেমন খৃষ্টের আত্মবলিদানের নিদর্শন, এ সকল প্রতিমাও এক একটি শক্তির ও সত্যের নিদর্শন মাত্র।

সা। কিন্তু এই প্রতিমার প্রয়োজন কি?

অ। ক্রশের প্রয়োজন কি? যে কোনও বিদ্যা লিখিতে হইলেই তাহার অক্ষর চাই, গ্রন্থ চাই, শ্রেণী চাই, প্রণালী চাই। সকল বিদ্যা অপেক্ষা যে দুজ্ঞের্য় তত্ত্ববিদ্যা, তাহা শিক্ষা করিতে কি কিছুই চাহি না? হিন্দুদের প্রতিমাগুলি সেই পরম বিদ্যা শিক্ষার অক্ষর, শাস্ত্র তাহার গ্রন্থ, সম্প্রদায় সকল শ্রেণী, এবং পূজা বা সাধনা-পদ্ধতি তাহার প্রণালী। এখানে অন্যান্য ধর্ম্মের সঙ্গে হিন্দুধর্ম্মের পার্থক্য ও বিশেষত্ব। অন্য ধর্ম্ম শিশু, বৃদ্ধ, মূর্খ, জ্ঞানী অভেদে এক। হিন্দুধর্ম্মে অধিকারিভেদে স্বতন্ত্র সোপান আছে। যাহার যেরূপ শিক্ষা, ও জ্ঞানলাভ হইয়াছে, যেরূপ মানসিক শক্তি আছে, সে সেইরূপ সোপান অবলম্বন করে।

সা। কিন্তু অধিকাংশ লোক নিম্নতম সোপানে থাকিয়া যায়। ঊর্দ্ধে উঠিতে পারে না। তাহারা এ সকল পুতুলকেই ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করে।

অ। তাহা নহে। আপনি সামান্য এক জন মূর্খ কৃষককেও জিজ্ঞাসা করুন, সেও বলিবে, এতগুলি ঈশ্বর নাই। ঈশ্বর এক। প্রতিমারা বিভিন্ন দেবতার বা ঐশিকশক্তির প্রতিমামাত্র। লক্ষ্মী ধনদার, সরস্বতী জ্ঞানদার, দুর্গা দুর্গতিহারিণীর, কালী ধ্বংস-

কারিণীর প্রতিমা। তাহারা মারীভয় হইলে কালী পূজা করে, লক্ষ্মী কি সরস্বতী পূজা করে না। আর, অধিকাংশ লোক ত নিম্নতম সোপানে থাকিবার কথা। অন্য বিষয়—দর্শনে, বিজ্ঞানে, শিল্পেও ত তাহারা নিম্নতম সোপানে। হিন্দু ধর্ম্মের সোপানগুলিও এরূপ ভাবে গঠিত যে, ইহার সকল সোপানে, এমন কি, নিম্নতম সোপানে থাকিয়াও মানুষ সচ্চরিত্র হইতে পারে, নিষ্পাপ হইতে পারে, মানুষ হইতে পারে। ধর্ম্মের ইহাই ত উদ্দেশ্য। আপনাদের নিম্নশ্রেণীর সঙ্গে মুসলমানদের নিম্ন শ্রেণীর সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন, হিন্দু নিম্নশ্রেণী কত শান্ত, শিষ্ট ও সাধু, মনুষ্যত্বে কত উৎকৃষ্ট। তাহার কারণ, অন্যান্য ধর্ম্মে হিন্দু ধর্ম্মের মত অক্ষর নাই, অধিকারিভেদে শাস্ত্র নাই, শ্রেণী নাই, শিক্ষাপ্রণালী নাই।

সা। যদি হিন্দুদের উচ্চতম ধর্ম্মশৃঙ্গই ব্রাহ্ম ধর্ম্ম হয়, তবে হিন্দুদের সঙ্গে ব্রাহ্মদের মতভেদ কি লইয়া?

অ। কতকগুলি ছাই ভস্ম লইয়া, বিধবাবিবাহ, অসবর্ণ-বিবাহ, যুবতীবিবাহ।

সা। এগুলি কি মন্দ?

অ। মন্দ! জনসংখ্যায় পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোক বেশী। প্রত্যেক পুরুষ বিবাহ করিলেও বহুসংখ্যক নারী অবিবাহিতা থাকিবার কথা। তাই ভারতে বহুবিবাহপদ্ধতি আছে। ইহার উপর যদি বিধবারা আবার দুই বার; বহুবার বিবাহ করে, তবে অবিবাহিতা রমণীর সংখ্যা আরও বেশী হইবে। দ্বিতীয়তঃ, বিধবারা একবার স্বামী পাইয়াছিল। তাহাদের স্বামী না দেওয়া, কিংবা অন্য রমণীগণকে একেবারে স্বামীর মুখ পর্য্যন্ত দেখিতে না দেওয়া, অধিকতর নিষ্ঠুরতা। তৃতীয়তঃ, এই ভারতে এখনই অন্নজলের জন্যে হাহাকার। আপনারা বলেন, জনসংখ্যা

বর্দ্ধিত হইয়া এরূপ হইয়াছে। তবে ভারতের লক্ষ লক্ষ বিধবাকে বিবাহ করিতে দিলে কি জনসংখ্যা আরও বাড়িবে না? আপনাদের দেশে জনসংখ্যা নিবারণের জন্যে কৃত্রিম উপায় সকল অবলম্বিত হয়। আর ভারতের শাস্ত্রকার বলেন, হিন্দুবিবাহ শরীরে শরীরে সম্ভোগার্থ নহে। উহা আত্মায় আত্মায়, ধর্ম্মসাধনার্থ। আত্মার মৃত্যু নাই। দেহের মৃত্যুতে উহা ছিন্ন হয় না। অতএব বিধবারা মৃত পতির স্মৃতি হৃদয়ে ধারণ করিয়া ব্রহ্মচর্য্য বা বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া, জীবন পুণ্যময় করিয়া যাপন করিলে পরলোকে আবার পতির সঙ্গে অনন্তকালের জন্যে সম্মিলিত হইবে। সাহেব! দুইটার মধ্যে কোনটি মহৎ উপায়?

সা। কিন্তু অসবর্ণবিবাহে দোষ কি? নূতন রক্তের সংমিশ্রণে তাহাতে জাতির উন্নতি সাধিত হয়।

অ। হয়। নূতন সমজাতীয় রক্তের সংমিশ্রণে হয়, কিন্তু ভিন্নজাতীয় রক্তের সংমিশ্রণে হয় কি? ঘোড়ার ও গাধার রক্তের সংমিশ্রণে যে খচ্চর হয়, উহা না হয় গাধা, না হয় ঘোড়া। গাধায় ঘোড়ায় যেরূপ পার্থক্য আছে, মানুষে মানুষে, ব্রাহ্মণে ক্ষত্রিয়ে, ক্ষত্রিয়ে বৈশ্যে, এবং বৈশ্যে শূদ্রে ততোধিক প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে। যাহারা জ্ঞানপ্রয়াসী, তাহারা ব্রাহ্মণ যাহারা যুদ্ধপ্রয়াসী, তাহারা ক্ষত্রিয়, যাহারা বাণিজ্যপ্রয়াসী, তাহারা বৈশ্য, এবং যাহাদের এ তিন কার্য্যের কোনটিরই প্রকৃতি ও শক্তি নাই, তাহারা শূদ্র। ভারতে প্রথমে এইরূপ চারি বর্ণের উৎপত্তি হয়। পুরুষানুক্রমে বিশেষ গুণ ও কর্ম্মের অনুশীলনের দ্বারা প্রত্যেক বর্ণের প্রকৃতি ও সংস্কার এত বিভিন্ন হইয়া আসিয়াছে যে, তাহাদের এক মানবজাতি বলা যাইতে পারে না। এক জন ব্রাহ্মণ আর এই ডোমকে দেখুন। ইহারা কি এক জাতি? জন জ্ঞানপ্রয়াসী ব্রাহ্মণ যদি এই ডোমের কন্যা বিবাহ করে,

তাহার সন্তানে কি সচরাচর জ্ঞান বর্দ্ধিত হইবে? ভারতীয় বিবাহের দুইটি উচ্চ অভিসন্ধি। প্রথমতঃ সমজাতীয় রক্তের সংমিশ্রণ, দ্বিতীয়তঃ সমজাতীয় দুইটি আত্মার সংমিশ্রণ। এই উভয় সংমিশ্রণের দ্বারাই জাতীয় গুণ ও কর্ম্মের ক্রমিক উন্নতি সাধিত হইতে পারে। কেবল সবর্ণে বিবাহ হইলে হইবে না। জ্যোতিষের সাহায্যে যথাসম্ভব দুইটি সমধর্ম্ম বিশিষ্ট আত্মার সম্মিলন চাই। আর্য্যবিবাহের সমস্ত প্রক্রিয়াই দুইটি আত্মার বৈদ্যুতিক (Mesmeric) সংমিশ্রণ। উহা বুঝাইবার এ স্থান কি সময় নহে। আর্য্যদের দশকর্ম্মের ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পদ্ধতি একটু চিন্তা করিয়া বুঝিতে গেলে উহাদের বৈজ্ঞানিকতায়, দার্শনিকতায়, এবং আধ্যাত্মিকতায় অভিভূত হইতে হয়। যাক্ সে কথা। আপনাদের দেশেও অসবর্ণবিবাহ প্রচলিত আছে। কিন্তু এক জন রাজপুত্র কি আপনি, একজন মুচি মুদ্দাফরাসের কন্যা বিবাহ করিবেন কি? ব্রাহ্মসমাজেরও ত বিধবা-বিবাহ ও অসবর্ণবিবাহ মূলনীতি। কিন্তু কয়টি এইরূপ বিবাহ হইয়াছে। সে দিন ব্রাহ্মসমাজের এক জন ভক্তিভাজন নেতা বলিতেছিলেন যে, ব্রাহ্মবিধবা কেহ বিবাহ করিতে চাহে না। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্ম ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মের কন্যা চাহে, বৈদ্য ব্রাহ্ম বৈদ্য ব্রাহ্মের কন্যা চাহে। মোট কথা, মানুষের আকৃতি এক নহে, প্রকৃতি এক নহে। যেখানে ভগবান এইরূপ বৈষম্য ঘটাইয়াছেন, মানুষ কেমন করিয়া সাম্য আনিবে জলে জল মিশিবে, অনলে অনল মিশিবে। জগতে সর্ব্বত্র সম প্রকৃতিই মিশে। অতএব সমপ্রকৃতিই জাতীয়তার ঈশ্বরাভিপ্রেত ভিত্তি। তাহা মানুষ কেমন করিয়া উড়াইবে? এ জন্য সকল দেশেই একরূপ না একরূপ জাতিবিভাগ আছে। আপনাদের দেশে উহা ধন ও পদমর্য্যাদাগত। আর্য্যদের উহা প্রকৃতিগত। বলুন দেখি, কোন্‌টি অধিক স্বাভাবিক? আর আপনি যে নূতন

রক্তের কথা বলিয়াছেন, সেই কথা হিন্দু শাস্ত্রকারেরা ভুলেন নাই। তাঁহারা বর-কন্যার কয়েক পুরুষের মধ্যে বিবাহ নিষেধ করিয়া, সমজাতীয় রক্তের নূতনত্বের বিধান করিয়াছেন।

সা। আচ্ছা যুবতীবিবাহ অপেক্ষা কি বাল্যবিবাহ ভাল?

অ। ভাল। তিনটি কারণে ভাল। প্রথমতঃ কি যুবক, কি যুবতী, অবিবাহিত থাকিলে উভয়ের পদস্খলিত হইবার কথা। চরিত্রের বাঁধ, সংযমের বাঁধ,, এক বার ভাঙ্গিলে উহা রক্ষা করা বড় কঠিন। দ্বিতীয়তঃ, বিবাহ না হইলে কন্যা কিরূপ অবস্থাপন্ন পাত্রের হাতে পড়িবে, তাহা জানা অসাধ্য। ধনীর গৃহের উপযোগী করিয়া দুহিতাকে শিক্ষা দিলে, সে যদি দরিদ্রের ঘরে পড়ে, তাহার দুঃখের সীমা থাকে না। সেরূপ দরিদ্রোপযোগী শিক্ষা দিলে সে যদি ধনীর ঘরে পড়ে, অন্ধকারের কীট আলোতে গেলে যেরূপ অবস্থা হয়, তাহারও সেরূপ হয়। বিবাহ হইয়া গেলে যেরূপ ঘরে পড়িল, তাহার উপযোগী করিয়া পিতা মাতা, শ্বশুর শাশুড়ী তাহার চরিত্র গঠিত করিতে পারেন। যুবতী-বিবাহে এ সুবিধা থাকে না। বিবাহের পূর্ব্বে বর কন্যা উভয়ের চরিত্র গঠিত হইয়া গিয়াছে। গঠিত চরিত্র ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন করা, প্রস্তরমূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া নূতন করার মত অসাধ্য। যুবক যুবতী পরস্পরকে গুণ দেখাইয়া আকর্ষিত করে। পরস্পরের দোষ কখনও প্রকাশ করে না। যৌবনের মোহে নির্ব্বাচনশক্তিও আচ্ছন্ন করে। এই জন্যেই এই দেশে বর-কন্যা নির্ব্বাচনের ভার পিতা মাতার উপর। কোনও কার্য্যের ভার অদূরদর্শীর অপেক্ষা দূরদর্শীর উপর অর্পণ করা কি সঙ্গত নহে? যৌবনের মোহ অন্তর্হিত হইলে পরস্পরের প্রকৃতি অনাবৃত হইয়া পড়ে। তখন উভয়ের প্রকৃতি যদি বিভিন্ন হয়, বিপরীত হয়, উহা পরিবর্ত্তন করিবার আর সময় থাকে

না। কাজে কাজেই বিবাহবন্ধনের ছেদন অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। অন্যথা, উভয়ের জীবন ঘোরতর অসুখের হইয়া উঠে। তৃতীয়তঃ, একস্থানে একটি বৃক্ষ ও লতার চারা রোপণ করিলে উহারা পরস্পরের উপযোগী হইয়া, কেমন সুন্দররূপে বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু একটি বর্দ্ধিত লতা রোপণ করিলে সেরূপ হয় কি? বিবাহের পর হিন্দুদের বরকন্যা বুঝে, তাঁহারা এ জীবনের জন্যে সম্মিলিত হইয়াছে; আর বিচ্ছিন্ন হইতে পারিবে না। তখন চেষ্টা করিয়া হইলেও, একে অন্যের ভালবাসার পাত্র হইতে চাহে, এবং পরস্পরের সন্নৈকট্য এই চেষ্টার অনুকূল হয়। এরূপে উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় প্রেমের সৃষ্টি হয়। বিশেষতঃ, উভয়ের ভালবাসা অন্য কাহারও প্রতি সঞ্চারিত হইবার অবসর থাকে না। এইটি একটি গুরুতর কথা। যৌবনসঞ্চারেই ইন্দ্রিয় সতেজ হইতে আরম্ভ হয়। যদি এ সময়ে কাহারো উপর চক্ষু পড়ে, এবং তাহার সঙ্গে বিবাহ না হয়, এই প্রেমের ছায়া পতি পত্নীর মধ্যে একটি আবরণের মত থাকিয়া ঘোরতর অসুখের কারণ হয়। এ সকল কারণেই হিন্দুর বিবাহ এত সুখশান্তিপ্রদ, পতি-পত্নীর বিচ্ছেদ অপেক্ষাকৃত এত অল্প।

সা। বালকবালিকার বিবাহের ফলে কি সন্তান নিস্তেজ ও ক্ষীণজীবী হয় না?

অ। হইতে পারে। কই ভারতের ইতিহাসে তাহার প্রমাণ নাই। আবহমানকাল হইতে বাল্যবিবাহ ভারতে চলিতেছে। তথাপি এতকাল রাজস্থান, পঞ্জাব, এবং উত্তরপশ্চিম ভারত, এমন কি, এ বঙ্গদেশ কি অপূর্ব্ব বীরভূমি ছিল! তদ্ভিন্ন বিবাহ হইলেও যৌবন-সঞ্চার পর্য্যন্ত দম্পতীকে স্বতন্ত্র রাখাই হিন্দুশাস্ত্রের ব্যবস্থা। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ইহা এখনও প্রচলিত। বঙ্গদেশে শাস্ত্রাজ্ঞা যে সকল সময়ে প্রতিপালিত হয় না, সেই দোষ শাস্ত্রের নহে।

সা। কিন্তু স্ত্রীলোকের অবরোধপ্রথা কি ভাল?

অ। পরাধীন দেশে ভাল বৈ কি? আপনারা স্বাধীন, পরাধীনের দুঃখ বুঝিবেন না। পরাধীন পুরুষ শত লাঞ্ছনা নীরবে সহিতে পারে, কিন্তু পত্নীর লাঞ্ছনা পশু পক্ষীও সহিতে পারে না। ভারত যে দিন হইতে পরাধীন হইয়াছে, সে দিন হইতে হিন্দুদের মধ্যে এই অবরোধপ্রথা প্রচলিত হইয়াছে। মহারাষ্ট্রপ্রদেশ তাহার সাক্ষী।

সা। কিন্তু ইহারই কারণ আমরা আপনাদের সঙ্গে মিশিতে পারি না।

অ। হিন্দু মুসলমান উভয়ের মধ্যে এই অবরোধ-প্রথা আছে। আছে। কিন্তু তাহা বলিয়া কি হিন্দু মুসলমান মেশামিশি করিতেছে না? বিশেষতঃ, এই দেশের লোক দরিদ্র। তাহারা তাহাদের স্ত্রীদিগকে ইংরাজি শিখাইবে, গাউন পরাইবে, উহা তাহাদের সাধ্যাতীত। আপনারা কি আপনাদের মহিলারা কখনও বাঙ্গালা কি দেশীয় ভাষা শিখিবেন না। সামান্য শাড়ী-পরা স্ত্রীলোক দেখিলে, নাক সিট্‌কাইবেন। এরূপ অবস্থায় অবরোধপ্রথা উঠাইয়া দিলে উভয় জাতির সম্মিলনের কি সাহায্য হইবে? ভারতীয় সম্প্রদায়বিশেষ ত উহা উঠাইয়া দিয়াছেন; সম্যক্‌রূপে আপনাদের সভ্যতা অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু কই, তাঁহাদের সঙ্গে আপনাদের কি খুব মেশামিশি আছে? বরং আপনারা কি তাহাদের জাতিভ্রষ্ট (out caste) বলিয়া অবজ্ঞা করেন না।

*   *   *   *

*   *   *   *

*   *   *   *

*   *   *   *

সা। আর শিক্ষাপ্রণালী?

অ। এই অবাধবাণিজ্য ও মোকদ্দমার দাবানলে ইন্ধন যোগাইতেছে ও বাতাস দিতেছে। আগে লেখাপড়াও, শিল্প ও বাণিজ্যের মত, জাতিগত ছিল। রাজ-শাসনে জাতিগত থাকিত। এখন তাঁতির ছেলে, কুমারের ছেলে, কামারের ছেলে, জেলের ছেলে, এমন কি, মেথরের ছেলে পর্য্যন্ত লেখাপড়া শিখিতেছে। উদ্দেশ্য চাকরি। ইহার ফলে ধ্বংসোন্মুখ শিল্প ও বাণিজ্য আরও ধ্বংস হইতেছে; যাহাদের লেখা-পড়া পুরুষানুক্রমিক একমাত্র উপজীবিকা ছিল তাহাদের অন্ন মারা যাইতেছে, এবং আপনারা উমেদারের যন্ত্রণায় অস্থির হইতেছেন। আর শিক্ষা-প্রণালীই বা কি। স্বয়ং নৃমুণ্ডমালিনী কালী! করে এক দিকে ভীষণ পরীক্ষা-খড়্গ ও শিশুর সদ্যশ্ছিন্ন শির। অন্য দিকে "সেনেটের" সদস্যদের ও শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষদের জন্য অভয়, ও স্বদেশীয় ও বিদেশীয় অপূর্ব্ব পাঠ্যপুস্তক-লেখকদের জন্য বরদ কর। শবরূপী বঙ্গদেশের বক্ষে শিক্ষাপ্রণালী তাণ্ডবনৃত্য করিতেছেন। যে দেশে পরীক্ষার নাম গন্ধ ছাড়া মহাপণ্ডিতসকলের অভ্যুত্থান হইয়াছে, সে দেশে প্রায় ভূমিষ্ঠ হইলেই শিশুর পরীক্ষা আরম্ভ হয়। বৎসর বৎসর পরীক্ষা ত আছেই, তাহার উপর ত্রৈমাসিক, ষাণ্মাসিক, আবার "টেষ্ট" (Test)। পরীক্ষাও আবার এক প্রকার অগ্নি-পরীক্ষা। আবার এক সঙ্গে এত পুস্তক পড়িতে হয় যে, শিশুর সাধ্য নাই যে, একত্র বহিগুলি লইয়া যায়। তাহাতে নাই, এমন বিষয়ই নাই। ১০।১২ বৎসরের শিশুকে ক্ষেত্রতত্ত্ব, উদ্ভিজ্জতত্ত্ব, রসায়নতত্ত্ব, না শিখিতে হয়, এমন তত্ত্ব নাই! কেবল নাই অনাবশ্যক ধর্ম্মতত্ত্ব। তাহাদের খেলা নাই, পুস্তকের চাপে খেলার কথা দূরে থাকুক, অবসর পর্য্যন্ত নাই। আমোদ নাই, উৎসব নাই। তাহাদের স্বাস্থ্যরক্ষা করা হয় স্বাস্থ্য-তত্ত্বের বহি পড়িয়া। তার পর প্রত্যেক শ্রেণীতে প্রত্যেক বিষয়ের নূতন

পুস্তক কিনিতে হইবে। তাহা না হইলে শিক্ষাবিভাগের নিজের ও আত্মীয়ের অপূর্ব্ব পাঠ্যপুস্তক সকল বিক্রয় হইবে কিরূপে ইহাই এখন শিক্ষা-প্রণালীর প্রধান উদ্দেশ্য। এই তত্ত্ব সকল আবার গলাধঃকরণ করিতে হইবে বিদেশীয় একটি জটিল ভাষায়। একখণ্ড মাটির চারিদিকে জল থাকিলেই দ্বীপ বলে,—এ কথা শিশুকে বলিলেই সে বুঝিতে পারে। কিন্তু তাহা হইবে না। তাহাকে এক ঘণ্টাকাল ব্যাপিয়া মুখস্থ করিতে হইবে—Island is a piece of land Surrounded by water. ইহার একটি অক্ষরও সে বুঝে না। দ্বীপ কি, তাহা বুঝা দূরের কথা পক্ষান্তরে, ঈশ্বর অনেক দিন হইল স্কুল ও কলেজ হইতে বিদায় প্রাপ্ত হইয়াছেন। ছিলেন তিনি গুরুমহাশয়ের পাঠশালায়। সেখানে শিশু। নানাপ্রকার স্তব কণ্ঠস্থ করিত, নানারূপ ধর্ম্মোপাখ্যান শিখিত। অক্ষর লিখিতে শিখিলেই দেব-দেবীর নাম লিখিতে শিখিত, এবং গৃহে গৃহে সেই দেব-দেবীর পূজা দেখিত। এইরূপে দেবভক্তির অঙ্কুর শিশুর কোমল হৃদয়ে অঙ্কিত হইত। দেব-দেবীর নামের পর আপনার পিতা-মাতার, আত্মীয়স্বজনের নাম লিখিতে শিখিত। তাহাদের পিতা-মাতার কাছে পরমপূজনীয় ও সেবক-সেবকাধম পাঠে পত্র লিখিতে শিখিত। পূর্ব্বপুরুষের নাম শিখিত, তাহাদের কাহিনী শুনিত। এইরূপে গুরুজনের প্রতি ভক্তির অঙ্কুর শিশুর কোমল হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইত। এখন পাঠশালাতেও ধর্ম্মশিক্ষা নিষিদ্ধ, এবং পিতার কাছে ইংরাজি স্কুলের ছেলে বাঙ্গলায় পত্র লিখিতে হইলেও লেখে, "মাই ডিয়ার ফাদার।" আর সুশিক্ষার বাকি কি? ইহাতে না আছে ধর্ম্মশিক্ষা, না আছে কর্ম্মশিক্ষা। দু' পাত ছাই ভস্ম পড়িয়া আপনার ব্যবসার প্রতি অবজ্ঞা জন্মে। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, কামার, কুমার, তাঁতি, সকলেই চাহে—চাকরী, ডাক্তারী, উকিলি, মোক্তারি অধিকাংশ টয়িগিরি। এক একটি

পাপিষ্ঠ অর্থপিপাসু উকিল, মোক্তার, টল্লি যেখানে আছে, মোকর্দ্দমার চোটে তাহার আশে পাশে দূর্ব্বা গাছটি পর্য্যন্ত গজায় না। কালে কালে এই শিক্ষার ফলেও দেশ উৎসন্ন যাইতেছে! অন্নজলের হাহাকার উঠিতেছে। দেহ খর্ব্ব হইতেছে, আপনারা এই বীরভূমিতে সামান্য সৈন্যের যোগ্য লোক পাইতেছেন না। আত্মা জড়তা প্রাপ্ত হইতেছে,—দেশে প্রকৃত পণ্ডিত জন্মিতেছে না।

সাহেব নীরব, স্তম্ভিতভাবে স্থিরনয়নে সমুদ্রের সান্ধ্যশোভায় চাহিয়া রহিয়াছেন। ভানুমতী চরণতল হইতে বলিল, "বাবা! ইহার প্রতিকারের কি কোন উপায় নাই?"

অ। এই ত্রিদোষের প্রতিকার আছে। রাজা সহজে প্রতিকার করিতে পারেন। অবাধবাণিজ্য উঠাইয়া দিয়া কিংবা স্থানে স্থানে রাজভাণ্ডার হইতে কল-কারখানা স্থাপন করিয়া শিল্পীর অন্ন যোগাইতে পারেন। পূর্ব্ববৎ, গ্রামবাসীর দ্বারা পঞ্চায়েত নির্ব্বাচন করাইয়া ফৌজদারি, দেওয়ানি মোকদ্দমার ভার তাহার হস্তে দিতে পারেন। শিক্ষাপ্রণালী পূর্ব্ববৎ সরল, সহজ, স্বাভাবিক করিয়া সম্প্রদায়বিশেষে স্বেচ্ছায় যেরূপ সংস্কৃত ও আরব্য-ভাষা শিক্ষা দিবার বিধান করিয়াছেন. সেরূপ ছাত্রদিগের ধর্ম্মশিক্ষারও বিধান করিতে পারেন। আর পারি আমরা। পারে একটি প্রকৃত ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়। পারে ধর্ম্ম ও জাতিবিদ্বেষহীন একটি মাতৃসেবক প্রকৃত সন্ন্যাসিসম্প্রদায়। ইহারা গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া ধর্ম্মের সঞ্জীবনীসুধায় গ্রামবাসীর হৃদয় আর্দ্র করিয়া, আবার সেই ধর্ম্মমণ্ডলী বা পঞ্চায়েত এবং সেইরূপ পাঠশালার সৃষ্টি করুন, এবং স্বদেশীয় শিল্প ব্যবহার করা এবং এই পঞ্চায়েতের দ্বারা সর্ব্বপ্রকার বিবাদ মিটাইয়া লওয়া, গ্রামবাসীদের প্রকৃত ধর্ম্ম বলিয়া শিক্ষা দিউন। আপনার ভাল মন্দ বুঝাইয়া দিলে বুঝে না, এরূপ মানুষ নাই। এইরূপে গ্রামে গ্রামে বুঝাইয়া

দিলে আমাদের দেশের লোকেও, শীঘ্র হউক, বিলম্বে হউক, বুঝিবে।

সাহেব একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া উঠিলেন এবং অনাথনাথের করমর্দ্দন করিয়া বিদায় লইয়া বলিলেন, "অনাথবাবু! বলা বাহুল্য, আপনার সঙ্গে আমি সকল বিষয়ে একমত হইতে পারি নাই। তবে ইহা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, অনেক বিষয় আমি বুঝিলাম, এবং চিন্তা করিয়া দেখিবার অনেক বিষয় পাইলাম। ইহার জন্যে আপনি আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।"

একাদশ অধ্যায়।

—•—

মহামুনি।

দেখিতে দেখিতে শীত কাটিয়া গেল। বহু সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া এবং অবিশ্রাম পরিশ্রম করিয়া অনাথনাথ হতাবশিষ্ট প্রজাদিগের জীবনরক্ষা করিয়াছেন; পার্ব্বত্য-অঞ্চল হইতে গৃহনির্ম্মাণের উপকরণ আনাইয়া তাহাদের গৃহ নির্ম্মিত করিয়া দিয়াছেন; প্লাবনবিধ্বস্ত বাঁধ—এ অঞ্চলে তাহাকে "কাঠি" বলে—বাঁধিয়াছেন; ভবিষ্যৎ প্লাবনে পানীয় জল রক্ষা করিবার জন্যে স্থানে স্থানে প্লাবনতরঙ্গ হইতে উচ্চতর পাড়বিশিষ্ট দীর্ঘিকা খনন করিয়াছেন! এবং তাহাদের আশ্রয়ের জন্যে স্থানে স্থানে ইষ্টকনির্ম্মিত দ্বিতল কাছারী-বাড়ীর নির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়াছেন। অনাথনাথ প্রজাদের মা বাপ। চিরদিন তাঁহার এরূপ সুনাম। তাহাতে ঝটিকার পর প্রজাদের যে এরূপ সাহায্য করিয়াছেন, জনরব তাহা বিদ্যুদ্বেগে সংখ্যাতীত কণ্ঠে প্রচারিত করিয়াছে। এ সুখ্যাতিতে

স্থানান্তর হইতে প্রজা সমাগত হইতেছে। জমিদারি আবার প্রজাপূর্ণ হইতেছে, এবং সকলে জমিদারের কৃতিত্বে ও দেবত্বে উৎসাহিত হইয়া আবার কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিয়াছে। এখন আর জমিদারীতে তাঁহার বিশেষ কোনও কার্য্য নাই। ভানুমতীকে সঙ্গে লইয়া বাড়ী যাইবেন, সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু ভানুমতী যাইতে অস্বীকার করিল। সে বলিল, তাহার অস্থি এখানে, তাহার গোপাল এখানে, তাহার সেই লক্ষ্মীস্বরূপা মাতা—অনাথনাথের পত্নী—এখানে, সে এখানে থাকিবে। সে বেদের মেয়ে, এ সকল গরীব দুঃখীর পুত্রকন্যাকে বুকে লইয়া, তাহাদের মাতাকে মাতা বলিয়া, সে সেই শোক হৃদয়ে বহন করিবে। দরদর ধারায় তাহার অশ্রু বহিতে লাগিল। অনাথনাথেরও পুত্রপত্নীর শোক আবার এত দিন পরে উথলিয়া উঠিল। তিনি সংযত, স্থির প্রকৃতির লোক। প্রজার দুঃখনিবারণব্রতে সেই শোক চাপিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রাণাধিক পত্নীপুত্রকে এখানে রাখিয়া গৃহে ফিরিবেন, এই স্মৃতিতে বহুদিন পরে তাঁহারও চক্ষে জল আসিল। আত্মসংযমবলে অশ্রুসংবরণ করিয়া বলিলেন,—"মা! তুই ভিন্ন আমার আর কে আছে? তুই আমার এ জীবনের একমাত্র শান্তি! তোকে ফেলিয়া আমি সেই শ্মশানে শূন্য হৃদয়ে কি আকর্ষণে ফিরিব? আমিও তবে আর বাড়ী ফিরিব না।" ভানুমতী কিছুক্ষণ নীরবে শান্ত সমুদ্রের দিকে চাহিয়া কি ভাবিল। শেষে তাঁহার সঙ্গে যাইতে সম্মত হইল।

অদ্য প্রাতে অনাথনাথ গৃহে যাত্রা করিবেন। ঘাটে সজ্জিত বজরা নানা বর্ণের পাতাকা উড়াইয়া সমুদ্রের শান্ত লহরীতে মৃদু মৃদু দুলিতেছে। সমুদ্রসৈকতে লোকারণ্য। প্রজাগণ—নরনারী, বালক বালিকা,—তাঁহাকে বিদায় দিতে আসি আর্ত্তনাদ করিয়া কাঁদিতেছে। কেহ কেহ চরণতলে গড়াগ

দিতেছে। বৃদ্ধা রমণীরা সাশ্রুনয়নে পুত্রবৎ তাঁহার গায়ে হাত বুলাইয়া কত আশীর্ব্বাদ করিতেছে। সকলেরই কণ্ঠে ভানুমতীর প্রতি 'মা' বা 'দিদি' সম্বোধন। তাহাকে রমণীরা বুকে লইয়া গলা জড়াইয়া কাঁদিতেছে। সকলে বলিতেছে—"তুই মা! কোনও দেবকন্যা। শাপক্রমে বেদের মেয়ে হইয়াছিস্।" অনাথনাথ ও ভানুমতী গলদশ্রুনয়নে তাহাদের নানা রূপে সান্ত্বনা দিয়া বজরায় উঠিলেন। প্রজাগণ সমুদ্রকল্লোল প্লাবিত করিয়া, তাঁহার জয়জয়কার করিতে লাগিল। চৈত্রমাস; পূর্ণ বসন্ত। বজরার শ্বেত পাল দক্ষিণানিলে প্রসারিত হইল; তরণী পক্ষপ্রসারিতা রাজহংসীর ন্যায় সমুদ্রের নীলগর্ভ বিদারিত করিয়া ছুটিল।

পুণ্যতোয়া শৈলজায়া কর্ণফুলী নদীর তীরে পাহাড়তলী গ্রামের পার্শ্বস্থিত একটি শৈলশেখরে অনাথনাথের অট্টালিকা-খচিত ভদ্রাসন। নদীতীর হইতে গিরিশ্রেণীর স্তরে স্তরে বৃক্ষরাজিসজ্জিত শ্যামবপু উত্থিত হইয়াছে। তাহার সর্ব্বোচ্চ শেখরে বৃক্ষপল্লবান্তরালে অর্দ্ধলুক্কায়িত, অর্দ্ধপ্রকাশিত, মনোহর অট্টালিকা। বিস্তীর্ণা কর্ণফুলীর

—"পড়ি জল নীলে ধবল সৌধ ছবি,
অনুকারিছে নভ অঙ্গন ও।"

এক দিকে নদী। অন্য দিকে গিরিপাদমূলে নাগেশ্বর-উপবনে সমাচ্ছন্ন একটি সমুন্নত প্রান্তরে বৌদ্ধদিগের মহামুনির মহাক্ষেত্র। নাগেশ্বরের উপবন হইতে ভগবান বুদ্ধদেবের চূড়া গগনে উত্থিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভার বিকাশ করিতেছে। অনাথনাথের অট্টালিকা হইতে এই শোভা অতুলনীয়। চৈত্র-সংক্রান্তির দুই দিন পূর্ব্ব হইতে এখানে প্রস্ফুটিত নাগেশ্বরবনে পর্ব্বত ও সমতল-বাসী বৌদ্ধদিগের একটি মেলা বসিয়া থাকে। অনাথনাথ বাটী

ফিরিবার কিছু দিন পরে এই মেলার আরম্ভ হইয়াছে। এই মহামেলার কথা আমি চট্টগ্রামবাসী কিছু না বলিয়া "বঙ্গবাসী"র এক জন বিদেশীয় প্রবন্ধলেখকের ভাষায় বলিব;—

"মহামুনি চট্টগ্রামবাসী বৌদ্ধদিগের একটি সুপ্রসিদ্ধ মেলা। প্রতি বৎসর বিষুবসংক্রান্তিতে চট্টগ্রাম পাহাড়তলীতে এই মেলা মিলিয়া থাকে। এ দেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়ে পরিবেষ্টিত; ঐ পাহাড়ে বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী মগদের বসতি, এবং সমতল উপত্যকায় নানা স্থানে বৌদ্ধ-ভদ্রলোকদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লী আছে। ঐ সকল বৌদ্ধদের আগ্রহ, উৎসাহ ও ধর্ম্মপিপাসায় মেলা-স্থান এক অপূর্ব্ব ভাবে পূর্ণ হইয়া উঠে। বাস্তবিক যিনি সংসারে স্বর্গ দেখিতে চাহেন, যিনি ঘোর অশান্তিতে দগ্ধ হইয়া শীতল হইতে চাহেন, যিনি দুঃখের বোঝা বহিয়া বহিয়া কাতরপ্রাণে সুখের অন্বেষণ করেন, তিনি একবার এই মহামুনির মহাভাব প্রত্যক্ষ করুন। সকল জ্বালা সকল অশান্তি, মুহূর্ত্তমধ্যে কি এক কুহকে কোথায় লুকাইয়া পড়িবে! * *

"মরি! মরি! কি প্রাণারাম স্থান। কি মনোহর দর্শন! এমন ত জীবনেও দেখি নাই! এ দৃশ্য যে কল্পনারও অতীত। অতি ক্ষুদ্র শৈল,—উপরিভাগ সমতল। সেই সমতল স্থান নবীন পল্লবে নবীন মুকুলে সুশোভিত নানা জাতি তরুলতায় আচ্ছন্ন। মধুর মলয় সততই মৃদুপ্রবাহে প্রবাহিত। নাগেশ্বর পুষ্প শোভা ও সুবাস দানে সততই তৎপর। বসন্ত পূর্ণমূর্ত্তিতে বিরাজিত। অতি সম্পূর্ণ, অতি সম্পন্ন! বিলাসিনী বাসন্তীর এই পূর্ণবিকশিত পরিণত মূর্ত্তি; এ মূর্ত্তি ধারণায় আইসে না। সে দৃশ্যে প্রাণ মন ডুবিয়া যায়, উত্তেজনা ফুরায়, দেহগ্রন্থি শিথিল হইয়া পড়ে। আজ সেই বসন্তের নির্জ্জন ক্রীড়া-কানন অগণিত মানব ও শত শত দোকান পসারিতে পরিপূর্ণ। সকল

দোকানেই মহা ভিড়; এমন কি, পথ চলিতে কষ্ট বোধ হয়; এই জনস্রোতের মধ্য দিয়া অতি কষ্টে যেখানে মহামুনির প্রকাণ্ড মন্দির, সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে প্রস্থে সমান। চতুষ্পার্শ্বেই সমান আয়তনের বারেণ্ডা আছে। মন্দিরাভ্যন্তরে বুদ্ধদেবের বিরাটমূর্ত্তি। ইহারই অর্চ্চনা-উপলক্ষে এই মহামেলায় অসংখ্য মগের সমাগম হইয়া থাকে। মূর্ত্তিটি লম্বে ১০।১২ হাত, এবং তদনুসারে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পূর্ণতা। বিরাট-রূপে অর্দ্ধনিমীলিতনেত্রে যোগাসনে উপবিষ্ট। কি প্রশান্ত মূর্ত্তি! কি গভীর ভাব! দেখিলাম, ৭।৮ জন বৌদ্ধ ভিক্ষু মহামুনির পদতলে বসিয়া একাগ্রপ্রাণে আরাধনায় নিমগ্ন। তাঁহাদের মস্তক মুড়ান—দাড়ি গোঁপ কামান,—পরিধানে গেরুয়া বসন।”

অনাথনাথ হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী হইলেও অন্য ধর্ম্মের প্রতি ও ধর্ম্মশিক্ষকের প্রতি ভক্তিপরায়ণ। তিনি এই মেলার সাহায্যার্থ, বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধদের সেবার্থ বহু অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন। তিনি ভানুমতীকে লইয়া অপরাহ্নে মেলাস্থলে আসিলেন। উভয়ে ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে মহামুনি বুদ্ধদেবের মহামূর্ত্তিকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া মেলা দর্শন করিতে লাগিলেন। প্রশস্ত উপ-বন ব্যাপিয়া মেলা বসিয়াছে। যত দূর দেখা যাইতেছে, নানা পার্ব্বত্যজাতীয় নরনারীতে মেলা-স্থান পরিপূরিত; তাহাদের গীতে, হাস্যে ও বংশীধ্বনিতে মুখরিত। মস্তকের উপর বসন্তের কোকিল, 'বউ কথা কও' নাগেশ্বরের ডালে বসিয়া, গগনে উড়িয়া, অমৃতকণ্ঠে সেই বংশীনিনাদের সঙ্গে যোগ দিতেছে। পার্ব্বত্য জাতিদের স্বর্ণগৌর কান্তি। পুরুষের মস্তকে সম্মুখে কৃষ্ণের চূড়ার মত ঘোর ঘনকৃষ্ণ কেশের চূড়া। সেই বিদেশীয়

প্রবন্ধ লেখকের ভাষায়,—

"সকলেরই এই বেশ। মগপুরুষের মাথায় রেশমী রুমাল, গায়ে কুর্ত্তা, পরিধানে হাঁটু পর্য্যন্ত ধুতি হাতে রূপার বালা, এবং কাণে রূপার আঙটি। তাহারা বৃদ্ধ বয়সেও গয়না পরিতে কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করে না। মগমহিলাদের খোপা প্রকৃত ফুলের ন্যায় কৃত্রিম ফুলের তোড়ায় সুশোভিত; বক্ষঃস্থল একটি রেশমী রুমালে বাঁধা, পরিধানে রেশমী শাড়ী, গলায় টাকার মালা; হাতে রূপার বালা, এবং কাণে রূপার গয়না। ইহাদের কাণের ছিদ্র এত বড় যে, এক বুরুল পুরু রৌপ্যখণ্ড ইহারা কাণে অনায়াসে ঢুকাইয়া দেয়। মগ মহিলারা প্রকৃতির প্রসাদে স্বভাবতই লাবণ্যময়ী। সকলেই বেশ হৃষ্টপুষ্ট। তাহাদের দেহমন সততই প্রফুল্ল। মগ পুরুষেরা সকলেই বলশালী ও কর্ম্মঠ; কিন্তু খর্ব্বাকৃতি। স্ত্রীপুরুষ সকলেরই নাসিকাটি চাপা। মগেরা বড় আমোদপ্রিয়। নৃত্যগীত তাহাদের নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য। শত সহস্র লোকের সম্মুখে যুবকেরা অসঙ্কোচে যুবতীদের নৃত্যে বংশীবাদন করে ও উত্তেজিত হইয়া তাহাদিগের বাহুলতার আশ্রয়ে নৃত্য করিতে থাকে; অথচ মুখে নির্ম্মল হাসি, প্রাণে অপার আনন্দ।"

তাহারা দলে দলে অন্ন ও পুষ্প লইয়া বুদ্ধদেবকে পূজিতে যাইতেছে। অনাথনাথকে দেখিয়া দলে দলে ভূতলে জানু রাখিয়া ললাটে ভূমিতল স্পৃষ্ট করিয়া প্রণাম করিল। তাহারা সকলে তাঁহাকে দেবতার মত ভক্তি করে। আলুলায়িতকুন্তলা, গৈরিকবসনপরিহিতা, প্রায়নিরাভরণা স্বর্ণপ্রতিমাস্বরূপা ভানুমতীকে তাঁহার পশ্চাতে দেখিয়া সকলে বিস্মিত-নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। কেহ কেহ তাহাকে বৌদ্ধ-সন্ন্যাসিনী মনে করিয়া প্রণাম করিল, অনাথনাথ তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া নানাবিধ কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া, তাহাদের সুখ

দুঃখে সহানুভূতি দেখাইয়া, মেলাস্থান পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি যেখানে যাইতেছেন, সেখানে একটি আনন্দ উচ্ছ্বাস উঠিতেছে। তিনি পূর্ণচন্দ্রের মত যেন আনন্দজ্যোৎস্না বিকীর্ণ করিতেছেন। ক্রমে উৎসব ক্ষেত্রের এক নির্জ্জন প্রান্তে উপস্থিত হইয়া একটি নাগেশ্বরবৃক্ষতলায় কোমল মকমলসন্নিভ শ্যাম দূর্ব্বাসনে বসিলেন। ভানুমতী তাঁহার চরণতলে বসিল।

ভা। বাবা! আপনি ত মহামুনিকে প্রণাম করিলেন; হিন্দুর কি মগের দেবতাকে প্রণাম করা উচিত?

অ। উচিত। মা! এই নাগেশ্বর পুষ্পকে কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি মগ সকলেই কি আদর করিতেছে না? যিনি দেবতা, তিনি নরজাতির নাগেশ্বর। দেবতা মগের হউন, মুসলমানের হউন, খৃষ্টানের হউন, তাঁহাকে প্রণাম করা, পূজা করা উচিত। বিশেষতঃ হিন্দুর কাছে তিনি পূজ্য। স্বয়ং ভগবান বলিয়াছেন, 'যেখানে ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তিনি দুষ্কৃতের দমন ও সাধুদের পরিত্রাণ করিয়া ধর্ম্মসংস্থাপন করিবার জন্যে, সেখানে জন্মগ্রহণ করেন।" ঠিক এই অবস্থায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মথুরায়, বুদ্ধদেব কপিলবস্তুতে, খৃষ্টদেব 'নেজারথে', এবং মহম্মদ মদিনায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অতএব শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভগবদ্বাক্য মানিতে গেলে, হিন্দুর সকলকে অবতার বলিয়া মানিতে হয়। তিনি যে কেবল এ ক্ষুদ্র ভারতে জন্মগ্রহণ করিবেন, এমন কথা বলেন নাই। এই জন্যে হিন্দুরা সকল ধর্ম্মে বিদ্বেষহীন।

ভা। বাবা! এই মহামুনি বুদ্ধদেব কে?

তখন অনাথনাথ বুদ্ধদেবের সেই বিচিত্র জীবনের আখ্যায়িকা তাহাকে সংক্ষেপে শুনাইলেন। সিদ্ধার্থের জন্ম, কৈশোর, জীবের জন্ম-জরা-ব্যাধি-মৃত-দুঃখ-নির্ব্বাণের উপায়-উদ্ভাবনের

জন্মে, রাজপুত্রের সন্ন্যাস, ঘোরতর তপস্যা, অপূর্ব্ব নির্ব্বাণ-ধর্ম্ম-প্রচার, তিরোধান, ভক্তিগদ্গদকণ্ঠে শুনাইলেন। বালিকা স্তম্ভিত-হৃদয়ে বুদ্ধলীলা শ্রবণ করিল। অনাথনাথ বসন্তের সান্ধ্য নীলাকাশের দিকে চাহিয়া সাশ্রুনয়নে সেই তিরোধানকাহিনী বর্ণনা করিলেন। বালিকা স্তম্ভিতহৃদয়ে যেন সেই মহাদৃশ্য বহুক্ষণ নীরবে বসন্তের সান্ধ্য আকাশপটে অঙ্কিত দেখিল। বহুক্ষণ পরে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল,—"বাবা! আমার পূজনীয় বৈরাগী পিতা আমাকে কিঞ্চিৎ লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। তিনি আমাকে বাঙ্গালা রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবতের ব্রজলীলা, চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যমঙ্গল ও চৈতন্যচরিতামৃত পড়াইয়াছিলেন। আমি ইহার বেশী কিছুই জানি না।"

অ। ইহার বেশী রমণীদিগের শিখিবার আর কিছু নাই। কিন্তু হায়! এখনকার শিক্ষাপ্রণালী কেবল আমাদের বালকদের মুণ্ডপাত করিয়া ক্ষান্ত হইতেছে না, বালিকাদেরও বলিদান দিতেছে। এখন বালকদের মত বালিকারাও পড়ে ছাইভস্ম; শিখে,— না ধর্ম্ম, না কর্ম্ম। যে দেশে ঘরে ঘরে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী ছিল, এখন সেই দেশে ঘরে ঘরে সূর্য্যমুখী, ভ্রমর ও কুন্দনন্দিনী। রমণীরা বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসের সূক্ষ্ম উচ্চ শিক্ষা বুঝিতে পারে না, শিখিতে পারে না। শিখে ঘোরতর আত্মাভিমান, স্বার্থপরতা ও পতিপ্রতিযোগিতা যাক্ সে কথা।

ভা। আমি দেখিতেছি, চৈতন্যদেবের ও বুদ্ধদেবের লীলা প্রায় একরূপ।

অ। খৃষ্টদেবের লীলাও তাই। তাঁহার জীবনের প্রথম ত্রিশ বৎসর কি করিয়াছিলেন, কেহই জানে না। তার পর ২॥০ আড়াই বৎসর তিনি একজন হিন্দুবৈরাগী তুমি আমার গৃহে তাঁহার চিত্রে দেখিয়াছ, তিনিও একজন কৌপীন-উত্তরীয়-

পরিহিত বৈরাগী মাত্র। কেবল ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও মহম্মদ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা যেরূপ স্থানে, যেরূপ সময়ে, যেরূপ সমাজে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে, দুষ্কৃতের দমন, সাধুদের পরিত্রাণ, ও ধর্ম্মের সংস্থাপন হইত না। উভয়ের কুরুক্ষেত্রের প্রয়োজন হইয়াছিল। দুষ্কৃতের দমনের জন্যে স্বয়ং অসি ধরিতে হইয়াছিল। খৃষ্ট ধরেন নাই বলিয়া দুষ্কৃতেরা তাঁহাকে "ক্রুশে" নৃশংসরূপে হত্যা করিল। সেই হত্যাতেই তিনি অবতারত্ব লাভ করিলেন। বুদ্ধদেব ও চৈতন্যদেব যে সময়ে অবতীর্ণ হন, তখন ভারত জ্ঞানের চরমসীমায় উন্নত। তাঁহাদের জ্ঞানের ও ভক্তির অসি ভিন্ন অন্য অসির প্রয়োজন ছিল না।

ভা। ইঁহারা কি পরস্পর বিরুদ্ধমতাবলম্বী নহেন?

অ। না; শ্রীভগবান এক,—কেবল সাধনার পথ প্রকৃতি-ভেদে স্বতন্ত্র। এই মহামুনির মেলা ত এক, কিন্তু ওই দেখ, কত পথে ইহাতে লোক আসিতেছে। যে পথ যাহার পক্ষে সহজ, সে সেই পথে আসিতেছে। মানুষের প্রকৃতি বিভিন্ন, শিক্ষা বিভিন্ন। অতএব প্রকৃতি ও শিক্ষা অনুসারে ধর্ম্মের পথও স্বতন্ত্র হইবে। তুমি মা! তোমার বৈরাগী পিতার কাছে ষড়্‌রসের কথা কি শুনিয়াছ?

ভা। শান্ত, বাৎসল্য, দাস্য, সখ্য, কান্ত, মধুর।

অ। তান্ত্রিক হিন্দু ও খৃষ্টান শান্তরসাশ্রিত। তাহারা ঈশ্বরকে পিতামাতার মত প্রেম করে। হিন্দু দেব দেবীরা পিতা মাতা। খৃষ্টের ঈশ্বরও পিতা। এই রসের সঙ্গে দাস্যরসও সংমিশ্রিত। কারণ, পিতা মাতার দাস কোন্ পুত্র নহে? মুসলমান ধর্ম্মে সখ্যরস। মহম্মদ ঈশ্বরের সখা। কিন্তু সখ্য এবং অপর তিনটি রস বৈষ্ণবধর্ম্মের নিজস্ব। নন্দযশোদা শ্রীকৃষ্ণকে যেরূপ

প্রেম করিতেন, ঈশ্বরকে সেইরূপ প্রেম করা, বাৎসল্যরস। শ্রীদাম সুদাম যেরূপ করিত, সেরূপ করা, সখ্যরস। ব্রজ-গোপীরা যেরূপভাবে তাঁহাকে পতিভাবে দেখিত, জগৎ-পতিকে সেইভাবে প্রেম করা—পতিপত্নীর মত প্রেম করা—কান্ত রস। আর শ্রীমতী যেরূপ পতির অপেক্ষাও শ্রীকৃষ্ণকে প্রিয়তর ভাবে প্রেম করিতেন, ঈশ্বরকে সেরূপ প্রেম করা মধুর রস। ইহা পতিপত্নীপ্রেমের অপেক্ষাও গাঢ়তর। ইহাতে মানুষ সম্পূর্ণরূপে শ্রীভগবানে আত্মহারা হয় ও তাঁহাকে অভিন্ন দেখে। তাই রাসের শেষে গোপীরা মনে করিয়াছিল, তাহারাই শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার লীলার অভিনয় করিয়াছিল। এই অবস্থা হিন্দু যোগীর 'সোঽহং' এবং বুদ্ধের 'নির্ব্বাণ'। এরূপে যাহার যেরূপ প্রকৃতি, মানুষ তদনুরূপ রস বা ধর্ম্ম অবলম্বন করে। এক এক ধর্ম্ম একটি সাধনার পথমাত্র—গন্তব্য স্থান শ্রীভগবান। মূল পথ তিন—জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি,। তিন পথেরই প্রদর্শক শ্রীকৃষ্ণ। যোগীর জ্ঞানপথ, বুদ্ধের কর্ম্মপথ, অপর ধর্ম্ম ভক্তিপথের বিভিন্ন শাখা।

তখন মহামুনির মন্দিরে সান্ধ্য আরতি বাজিয়া উঠিল। বাসন্তী জ্যোৎস্নায় নাগেশ্বরের উপবন ও সমীপবর্ত্তী পর্ব্বত ও প্রান্তর হাসিতে লাগিল। মেলাস্থল আনন্দকোলাহলে পূরিত হইল। বিদেশীয় দর্শক সেই দৃশ্য এইরূপে চিত্রিত করিয়াছেন;—

"দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। চারিদিকের শ্যামল গিরিরাজি দূর সুনীল প্রাচীরের ন্যায় দেখা যাইতে লাগিল। মাথার উপর গাছে গাছে পাখীগুলি একবার কিচিমিচি করিয়া উঠিয়া আবার পরক্ষণেই নীরব হইল। কিন্তু নিম্নে সেই আনন্দকোলাহলের এক বিন্দুও হ্রাস হইল না। বরং সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া বৌদ্ধ মগদের আনন্দলহরী আরও

উছলিয়া উঠিল। শত শত দোকান পসারিতে অগণিত দীপশিখা জ্বলিয়া উঠিল। ক্ষুদ্র শৈলশেখর যেন ৺ শ্রীকৃষ্ণের মুক্তাবনের মত শোভা পাইতে লাগিল। মগ-মহিলাগণ বিচিত্র বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া দলে দলে চারিদিকে নাচিয়া বেড়াইতে লাগিল। একি! একি! আমি স্বর্গে! এরা কি দেব-বালা! না গন্ধর্ব্বকুমারী অথবা অপ্সরী! এদের চতুষ্পার্শ্বে যেন কি এক মোহের মদিরা ছড়াইয়া পড়িতেছে। লাবণ্য ঢলিয়া পড়িতেছে। পূর্ব্বে ভাবিতাম, পাহাড়ীদের আবার রূপ কি? বেশভূষাই বা কোথায়? আজ আমার সেই ভ্রম সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হইল। আজ আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি,—যদি রূপ থাকে, তবে এদের মধ্যেই আছে, যদি বেশভূষার বাহার থাকে, তবে এই মগ-মহিলাদের বেশভূষাতেই আছে!"

"যুবতীগণ যুবকের দলে, কিশোরীগণ কিশোরের দলে, এবং বালকগুলি বালকের দলে এক হইয়া সেই মহামুনির প্রকাণ্ড মন্দিরের প্রশস্ত বারাণ্ডায় নাচিয়া নাচিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বুদ্ধনাম কীর্ত্তন করিতে লাগিল, আর একবার আনন্দে উন্মত্ত হইয়া কেমন এক রকম অস্বাভাবিক চীৎকারে মন্দির-প্রাঙ্গণ বারংবার কাঁপাইতে লাগিল।

"যখন এবংবিধ নৃত্যগীতে, মন্দিরে, প্রাঙ্গণে রাস্তা ঘাটে আনন্দের ঢেউ ছুটিতে লাগিল, কার সাধ্য সে তরঙ্গে স্থির থাকিতে পারে? তুমি আতুর হও, উঠিয়া নাচিবে,—বোবা হও, আনন্দে আনন্দধ্বনি করিবে,—বধির হও, যেন সব শুনিতে থাকিবে,—অন্ধ হও প্রত্যক্ষ দেখিতে থাকিবে। এ মেলার এমনই মহান্ ভাব।"

"রাত্রি কিছু অধিক হইল, মগ স্ত্রীপুরুষ দলে দলে যে যেখানে পাইল, গাছের তলে বিনা শয্যায় শয়ন করিতে লাগিল।

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তোমরা মাটিতে শুইলে কেন?' হাসিমুখে উত্তর হইল,—'প্রভুর বাড়ী,—এ যে আমাদের ফুলশয্যা; এমন শয্যা আর কোথায় পাব?'

দ্বাদশ অধ্যায়।

ব্রজলীলা।

সুন্দর বৈশাখ মাস সুন্দর সুনীলাকাশ,
কি সুন্দর বহিছে মলয়,—
শান্ত সুশীতল!

কি সুন্দর শৈলশোভা তরঙ্গিত মনোলোভা
উপত্যকা তরুশোভাময়,—
সুন্দর শ্যামল!

সুন্দর বৈশাখ মাসে, সুন্দর জ্যোৎস্না হাসে
নীলাকাশে শ্যামল ধরায়,—
কি হাসি সুন্দর!

যুবতী পার্ব্বতী সতী হাসিতেছে পুণ্যবতী,
সরলার হাসি নিরমল,—
প্রাণ স্নিগ্ধকর।

সে যুথিকা হাসি মাখি শোভিতেছে কর্ণফুলী
পার্ব্বতীর পদপ্রান্তে,
মালা মালতীর।

পার্ব্বতীর প্রেমধারা পুণ্যবতী স্রোতস্বতী
কি তরল সুধা নিরমল,—
কি শান্ত গভীর !

অনাথনাথ ও ভানুমতী অট্টালিকার ছাদে বসিয়া প্রকৃতির এই বৈশাখী ফুল্লচন্দ্রিকামণ্ডিতা শোভা দেখিতেছিলেন। প্রকৃতির এই লীলাভূমির শীর্ষস্থানে বসিয়া যে এই শোভা দেখে নাই, কবির সাধ্য নাই, চিত্রকরের সাধ্য নাই, তাহাকে উহা বুঝাইবে। গিরিপাদমূলে, নদীর উভয় কূলে, গ্রামগুলি এক একটি বৃক্ষসমাচ্ছন্ন উপবনের মত শোভা পাইতেছে। বৃক্ষ-অন্তরালে গ্রামের প্রদীপাবলী জ্যোৎস্নায় ক্ষীণালোক হইয়া প্রস্ফুটিত মালতীপুষ্পের মত শোভা পাইতেছে। পল্লবে গুল্মে ও তৃণে সমাবৃতা পার্ব্বত্য ও সমতলভূমি জ্যোৎস্নালোকে কি মনোহর শ্যামশোভা ধারণ করিয়াছে। এই শ্যামক্ষেত্রে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত কর্ণফুলীর কি নয়নানন্দকর বঙ্কিমগতি ! শ্যামার ও শ্বেতভুজার এই আলিঙ্গনে পরস্পরের সৌন্দর্য্য কত বর্দ্ধিত হইয়াছে ! গিরিশেখরে অনাথনাথের মনোহর পুরীর অট্টালিকা ও উদ্যান চন্দ্রকরে খণ্ড-ত্রিদিবের মত বোধ হইতেছিল। বৃক্ষে বৃক্ষে, গুল্মে গুল্মে, পূর্ণবসন্তের প্রস্ফুটিত ফুলরাশির সেই কৌমুদী-প্রোদ্ভাসিত শোভা কল্পনাদুর্লভ। অট্টালিকার ছাদের টবে নানাজাতীয় ক্রোটন, ফুল ও লতার মনোহর উদ্যান ও নিকুঞ্জ স্থানে স্থানে নানা অবয়বের ছায়া নিক্ষেপ করিয়া জ্যোৎস্নায় একটি স্বপ্নদৃষ্ট শোভার বিকাশ করিতেছে। নিম্নে নাগেশ্বরের উপবন হইতে মহামুনির মন্দিরের চূড়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া, মানবকে নির্ব্বাণের পথ দেখাইতেছে, যেন বলিয়া দিতেছে যে, পুণ্যকর্ম্মের দ্বারা মানব-

হৃদয় তাহার মত জ্যোৎস্নাবিধৌত শ্বেতনির্ম্মলকান্তি ধারণ করিলে তবে নির্ব্বাণের দিকে উত্থিত হইতে পারে।

অনাথনাথ একখানি ‘লাউঞ্জ চেয়ারে’ এবং ভানুমতী তাঁহার পদতলে আরক্তমকমলমণ্ডিত ‘ফুটষ্টুলে’ বসিয়া স্থিরচিত্তে এই শৈলকিরীটিনী, সরিৎমালিনী, জ্যোৎস্নাহাসিনী প্রকৃতির শোভা দেখিতেছিলেন। যদিও বিগত ঝটিকায় এই শোভা অনেক বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে, তথাপি উহা অতুলনীয়া। উভয়ের মুখ প্রশান্ত; অধরে প্রীতির হাসি। প্রকৃতির প্রশান্ত প্রীতিময়ী জ্যোৎস্না যেন তাঁহাদের হৃদয়েও প্রবেশ করিয়া সেই ঝটিকার বিষাদচ্ছায়া কিঞ্চিৎ অপসারিত করিয়াছে।

কিছুক্ষণ স্থির নয়নে এই শোভা দেখিয়া, এবং উভয়ে উহার আলোচনা করিয়া অনাথনাথ বলিলেন,—“মা! আমি স্থির করিয়াছি’ তোকে আমার কন্যারূপে গ্রহণ করিব।”

ভা। বাবা! তুমি ত সেই ঝড়ের দিন হইতেই আমাকে কন্যারূপে গ্রহণ করিয়াছ।

অ। শাস্ত্রানুসারে গ্রহণ করিব।

ভা। সে কি বাবা। বেদের মেয়েকে কি ব্রাহ্মণে শাস্ত্রমতে গ্রহণ করিতে পারে?

অ। পারে। পণ্ডিতেরা ব্যবস্থা দিয়াছেন, তোমাকে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া গ্রহণ করিতে পারিব। তুমি বেদের মেয়ে নও, বৈরাগীর মেয়ে। সকলে বলিতেছে, তুমি কোনও শাপ-ভ্রষ্টা দেবকন্যা। এত রূপ, এত গুণ, এরূপ চরিত্র, বেদের মেয়ের হইতে পারে না। আমাদের পুণ্যশ্লোক শাস্ত্রকারেরা শ্রীভগবানের একটি মধুর নাম রাখিয়াছেন—পতিতপাবন। তিনি ঘোরতর পাপীকেও পবিত্র করিয়া মুক্ত করেন। তখন, অবস্থাক্রমে যাহারা সামাজিক ভাষায় জাতিভ্রষ্ট, তাহাদিগকে

পতিত করিয়া রাখা আমাদের ধর্ম্ম হইতে পারে না। এই নির্ম্মম বিদ্বেষমূলক অধর্ম্মে আজ ভারতের কত হিন্দু মুসলমান হইয়া হিন্দুসমাজকে কেবল যে দুর্ব্বল করিয়াছে, এমন নহে; উহারা মহাশত্রু হইয়া সোণার ভারতকে জাতীয় বিদ্বেষে উচ্ছিন্ন করিতেছে। হিন্দু সমাজের এই জড়ত্বহেতু অনেক পূজনীয় ব্যক্তিকে, শিক্ষার্থ বিলাত গিয়াছিলেন বলিয়া, আমরা হারাইতেছি। বীরভূমি পঞ্চনদ প্রদেশে এইরূপ সমাজচ্যুতকে শুদ্ধ করিয়া সমাজে লইবার জন্য "শুদ্ধিসভা" স্থাপিত হইয়াছে। মাড়ওয়ারীরাও এইরূপ করিয়াছেন। কলিকাতায়ও দুই এক জন শ্রদ্ধার্হ ব্যক্তি এইরূপে সমাজে গৃহীত হইয়াছেন।

ভা। সে কি বাবা! হিন্দু খৃষ্টান হউক, মুসলমান হউক, দেশদেশান্তরে যাউক, সে আবার হিন্দু হইতে পারিবে?

অ। কেন পারিবে না? হিন্দু শব্দ আমাদের কোনও শাস্ত্রে কি অভিধানে নাই। শুনিয়াছি, যবনদের সিন্ধুনদ পর্য্যন্ত ভারত-জয় হইতেই এই শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। তাহারা 'স' উচ্চারণ করিতে পারিত না। ইংরাজেরাও পারেন না। তাহারা সিন্ধু নদকে হিন্দু নদ বলিত। তৎপ্রদেশ-বাসীদিগকে হিন্দু বলিত। সেই হইতে এ দেশের নাম হিন্দুস্থান ও আমাদের ধর্ম্মের নাম হিন্দুধর্ম্ম? যাহা হউক, এই হিন্দুধর্ম্মের মূলনীতি কি? এই ভারতের আসমুদ্রগিরি, আচট্টল গান্ধারে যে অসংখ্য লোক বাস করিতেছে, ইহাদের বিশ্বাস এক নহে, আচার এক নহে, আহার এক নহে, পরিচ্ছদ এক নহে, আকৃতি এক নহে, ভাষা এক নহে। অথচ সকলেই হিন্দু। ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস পর্য্যন্ত হিন্দুধর্ম্মের মূল নহে। নিরীশ্বর সাংখ্য ও চার্ব্বাকও হিন্দু। দেবদেবীর পূজা হিন্দুধর্ম্মের মূল নহে। আমাদের যোগী

সন্ন্যাসীরা কোনও দেবদেবীর পূজা করেন না, অথচ তাঁহারা হিন্দুসমাজের শীর্ষস্থানীয় বঙ্গদেশে যে সকল দেবদেবীর মূর্ত্তির পূজা আছে, ভারতের অন্যত্র তাহা প্রায় নাই বলিলেও চলে। বেদান্তের ঈশ্বর নিগুর্ণ নিরাকার,— বৈদান্তিকেরাও হিন্দু। পুরাণ ও তন্ত্রের ঈশ্বর সগুণ ও সাকার। পৌরাণিকেরা ও তান্ত্রিকেরাও হিন্দু। আচার হিন্দুধর্ম্মের অঙ্গ নহে,—ভারতের নানা দেশে নানা আচার। পরিচ্ছদও তদ্রূপ। আহার হিন্দুধর্ম্মের মূল নহে। ঘোরতর মদ্যমাংসাশীও হিন্দু এবং মদ্যমাংসবিদ্বেষী নিরামিষাহারীও হিন্দু। তবে হিন্দুধর্ম্মের মূল কি? এই বিস্তীর্ণ ভারতব্যাপী হিন্দুদের মধ্যে কি সাধারণ কিছু নাই? যদি কিছু থাকে, তবে নিশ্চয় উহাই হিন্দুধর্ম্মের মূল ভিত্তি। আমরা দেখিতে পাই, ইহাদের তিনটি সাধারণ সম্পত্তি আছে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এবং ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া পদ্ধতিসহ দশকর্ম্মপদ্ধতি ও বর্ণভেদ। কি বঙ্গে, কি তৈলঙ্গে, কি মহারাষ্ট্রে, বৈষ্ণব, শাক্ত, সৌর ও গাণপত্য, সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে সর্ব্বত্র শ্রীকৃষ্ণ 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং' বলিয়া পূজিত। সর্ব্বত্র কি সন্ন্যাসী, কি গৃহী. সকলের দ্বারা শ্রীগীতা অধীত ও পূজিত; সর্ব্বত্র উক্ত পদ্ধতি এবং বর্ণধর্ম্মানুসারে অল্পাধিক পরিমাণে সমাজ পরিচালিত। তবেই বোধ হইতেছে, প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের আধ্যাত্মিক তত্ত্বের মূল শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার শ্রীগীতা, এবং সামাজিক তত্ত্বের মূল উক্ত পদ্ধতি ও বর্ণানুসারে কর্ম্মের দ্বারা সমাজসংরক্ষণ। ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন, গুণ ও কর্ম্মানুসারে তিনি চারি বর্ণ বিভক্ত করিয়াছিলেন। শাস্ত্রকারেরা বুঝিয়াছিলেন যে, বর্ণ জন্মগত করিলে গুণ ও কর্ম্মের পুরুষানুক্রমে আরও উন্নতি সাধিত হইবে। ফলে তাহাই হয়। একটি দ্বাদশবর্ষীয় তাঁতীর ছেলে যেরূপ কাপড় বুনিবে, একজন মহাপণ্ডিত দশ বৎসর শিক্ষা করি-

য়াও তাহা পারিবেন না। কিন্তু শাস্ত্রকারেরা বুঝেন নাই যে, তাহার পরিণাম এই হইবে যে, ব্রাহ্মণের পুত্র মহামূর্খ ও ঘোরতর পাপী হইলেও ব্রাহ্মণ হইবে। বর্ণ এইরূপে জন্মগত হইয়া গুণ ও কর্ম্মের ভিত্তি ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তাই বৌদ্ধধর্ম্মের সাম্যবাদে হিন্দুসমাজ এরূপ বিধ্বস্ত হইয়াছে যে, আবার সেই বর্ণাশ্রমমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠিত করা মানুষের সাধ্যাতীত। কিন্তু তাহা হইলেও কোনও রূপ সামাজিকপদ্ধতি যথাসাধ্য রক্ষা করিতে চেষ্টা না করিলে, সমাজ বন্ধনহীন হইয়া আরও ধ্বংসমুখে অগ্রসর হইবে। সমাজের কিছু একটা বন্ধন চাই। উক্ত পদ্ধতি ও বর্ণাশ্রমের তুল্য এমন সুন্দর জ্ঞানগর্ভ বন্ধন আর কি হইতে পারে? অতএব হিন্দু কেহ খৃষ্টান হইয়া, মুসলমান হইয়া, কি দেশান্তরে গিয়া যদি (প্রচলিত কথায়) জাতিভ্রষ্ট হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হয়, হিন্দুধর্ম্মের মূল এই ত্রিনীতি বা মূলনীতি অবলম্বন করিলে সে হিন্দু বলিয়া গৃহীত হইবে।

জা। তাহার কি কোনও প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক নহে?

অ। আমি এ কথা এক দিন নরনারায়ণ ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন, দুই প্রকার পাপের জন্যে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা। আধ্যাত্মিক পাপ ও সামাজিক পাপ। বিদ্যাশিক্ষার্থ কি কোন সৎকর্ম্মার্থ বিলাত কি দেশান্তরে যাওয়া আধ্যাত্মিক পাপ নহে। তবে সামাজিক রীতিনীতির লঙ্ঘনের জন্যে সামাজিক পাপ হইতে পারে। কিন্তু এক জন বিলাতপ্রত্যাগত ব্যক্তি প্রায়শ্চিত করিলেও যখন তাহাকে পদে পদে সেই রীতিনীতির লঙ্ঘন করিয়া চলিতে হইবে, তখন প্রায়শ্চিত্ত করা ধর্ম্মকে বিদ্রূপ করা বই নহে আর দেশে থাকিয়াই কোন হিন্দু ইংরাজ

মুসলমানকে স্পর্শ করিতেছে না? যাহা দশ বৎসর পূর্ব্বে অখাদ্য বলিয়া পরিগণিত ছিল, আজ তাহা খাইতেছে না কে? যাহারা যদৃচ্ছাক্রমে খাইতেছে, কই তাহারা ত প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে না? আর যাঁহারা বিলাত কি অন্য দেশে যাইতেছে, তাহারা অবস্থার বাধ্য হইয়া খাইতেছে, তবে তাহারা প্রায়শ্চিত্ত করিবে কেন?

ভা। কিন্তু, বাবা! আমাকে সেরূপে গ্রহণ করিয়া কি করিবে?

অ। তোমাকে আমার উত্তরাধিকারিণী করিব, এবং বিবাহ দিয়া আমার শ্মশানসদৃশ এই পুরীতে অধিষ্ঠিত করিব।

ভানুমতীর মুখ গম্ভীর হইল। সে মাথা হেঁট করিয়া ছাদের দিকে চাহিয়া রহিল। লজ্জাবনত মুখে বলিল,—"তাহা হইলেই বা কি হইবে?"

অ। তুমি সুখী হইবে; আমি সুখী হইব।

ভা। সুখ কি বাবা? একটি কবিতায় পড়িয়াছি,—

সুখ যাহা বল কথার কথা,
দেখেছে কি কেহ পেয়েছে কখন?
আকাশকুসুম, মুকুতার লতা,
জীবনেতে মৃগতৃষ্ণিকার ভ্রম!
ওই আকাশের নীলিমার মত
দুঃখ(ই) জীবনের স্থিতি ও বিস্তার;
সুখ যাহা বল বিদ্যুৎ মতন,
বাড়ায় দ্বিগুণ নীলিমা তাহার!

আহা! অভাগিনী অনাথিনী বালিকা সুখ কি তাহা কখনও জানে নাই,—প্রশ্ন শুনিয়া অনাথনাথের এ কথা মনে পড়িল। তাঁহার চক্ষু সজল হইল। তিনি একবার তাহার মুখের দিকে দেখিলেন—কিন্তু কই, তাহাতে ত সেরূপ কোনও ভাব নাই।

সে স্থির গম্ভীর চিন্তাকুল মুখে জ্যোৎস্নাপ্রোদ্ভাসিত নির্ম্মল আকাশের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। তখন তাঁহারও মুখ গম্ভীর ও চিন্তান্বিতের ভাব ধারণ করিল। তিনি একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন,—"বড় কঠিন প্রশ্ন। তবে ইহা বুঝিয়াছি, সুখ পদে নহে, সম্পদে নহে; গৌরবে নহে, বিভবে নহে; ধনে নহে, জনে নহে। পদে পদের আকাঙ্ক্ষা, সম্পদে সম্পদের আকাঙ্ক্ষা বাড়ে মাত্র। ক্ষণিক তৃপ্তির পর অতৃপ্তি বাড়ে মাত্র। সেকেন্দার সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়া আর জয় করিবার কিছু নাই বলিয়া কাঁদিয়াছিলেন! আজ ইয়ুরোপীয় জাতিদের অবস্থাও তাই। ইহারা রাজ্য রাজ্য করিয়া আকুল! কই, রাজ্যে, ঐশ্বর্য্যে, গৌরবে, বিভবে, কেহ তৃপ্ত হইয়াছে, সুখী হইয়াছে,—একথা ত কাহারও মুখে শুনি নাই।"

ভা। আমার বৈরাগী পিতা বলিতেন, কেবল ধর্ম্মেই সুখ।

অ। তোমার মুখে যেরূপ শুনিয়াছি, তাহাতে বোধ হয়, তিনি বড় বিচক্ষণ লোক ও এক জন পরম সাধু ছিলেন। ধর্ম্মই সুখের একমাত্র পথ। ইহার দ্বিতীয় পথ নাই। থাকিবার কথাও নহে। আমরা দেখিতে পাই, কতকগুলি প্রবৃত্তির উপর পক্ষীর পক্ষিত্ব, পশুর পশুত্ব নির্ভর করিতেছে। এ সকল প্রবৃত্তির চরিতার্থতাই তাহাদের সুখ। যে নীতিবলে তাহাদের এ সকল প্রবৃত্তির চরিতার্থতা হয়, সে সকল নীতি তাহাদের পক্ষিত্ব ও পশুত্ব ধারণ করে। তাহাই তাহাদের পক্ষিধর্ম্ম ও পশুধর্ম্ম। তদ্রূপ যে সকল শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক প্রবৃত্তির উপর মানবের মানবত্ব নির্ভর করে, তাহাদের চরিতার্থতাই মানব-সুখ। এবং যে নীতিমালায় ইহাদের চরিতার্থতা ধারণ করে, অর্থাৎ যাহাদের উপর ইহাদের চরিতার্থতা নির্ভর করে, সেই নীতিমালাই মানব-ধর্ম্ম, অতএব ধর্ম্মই একমাত্র সুখের পথ।

ভা। গুরুদেব বলিতেন, ব্রজলীলার মত ধর্ম্মশিক্ষার এমন সহজ ও মধুর উপায় আর নাই। তিনি অনেক ব্রাহ্ম ও ইংরাজি-ওয়ালা বাবুর সঙ্গে এ বিষয়ে তর্ক করিতেন। আমি কাছে বসিয়া শুনিতাম। বাবুরা কৃষ্ণের বড়ই নিন্দা করিতেন।

অ। আমিও করিতাম। একদিন একটি ঘটনায় ইংরাজী শিক্ষার ও সভ্যতার আবরণ আমার চক্ষু হইতে খসিয়া পড়ে। রথের সময়ে 'নবযৌবনের' মেলার দিন শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ-দেবের দর্শন-মন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্বে একটি সিংহে অঙ্গ হেলাইয়া বসিয়া আছি। জলস্রোতের মত ভারতের নানাদেশীয় যাত্রীর স্রোত জগন্নাথদেব দর্শন করিয়া আনন্দে নাচিতে নাচিতে কাঁদিতে কাঁদিতে আত্মহারা হইয়া সেই দ্বার দিয়া বহির্গত হইতেছে। সেই ভক্তির উচ্ছ্বাসে আমার কঠিন হৃদয়ও আর্দ্র হইয়াছে, চক্ষে অশ্রুজল দেখা দিয়াছে। এমন সময়ে তোমারই মত একটি ষোড়শী কিশোরী উন্মাদিনীর মত ছুটিয়া আসিয়া আমার গলায় পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"আমি বড় হতভাগিনী। আমি অনেক দূর হইতে আসিয়াছি। আমার ভাগ্যে জগন্নাথদর্শন ঘটিল না। তুমি আমাকে জগন্নাথদর্শন করাও।" তাহার বসন বিশৃঙ্খল হইয়াছে। তাহার অশ্রুজলে আমার বক্ষ ভাসিতেছে, তাহার ভক্তির উচ্ছ্বাসে আমিও কাঁদিতে লাগিলাম। বলিলাম,—তুমি আমার গলা ছাড়িয়া দাও। আমি তোমাকে সঙ্গে লইয়া জগন্নাথ দেখাইতেছি।" কিন্তু তাহার বাহ্যজ্ঞান নাই। তাহার কেবল একমাত্র প্রলাপের মত কথা,—"আমি বড় অভাগিনী, আমার ভাগ্যে জগন্নাথ-দর্শন ঘটিল না।" এক জন কনেষ্টবল আমার আজ্ঞামতে আমার গ্রীবার পশ্চাৎ হইতে তাহার মুষ্টি খুলিয়া দিলে, আমি তাহাকে শববৎ জড়াইয়া লইয়া যাত্রীদের স্রোত বন্ধ করিয়া শ্রীমন্দিরে

লইয়া গেলাম। সে অতৃপ্ত স্থির নির্নিমেষনয়নে জগন্নাথ দর্শন করিল। দর দর ধারায় অশ্রু তাহার কপোল বহিয়া পড়িতেছে। সে বেদী প্রদক্ষিণ করিল। আবার অতৃপ্তনয়নে জগন্নাথ দর্শন করিল। তখন তাহার বাহ্যজ্ঞানের উদয় হইল। সে অবগুণ্ঠন টানিয়া কাঁদিতে লাগিল, এবং পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে বলিল যে, বহু আত্মীয় সহ সে মন্দিরের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলে স্বজন-গণের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। আমি তাহাকে মন্দিরের বাহিরে লইয়া আমার কাছে বসাইয়া রাখিলাম। তখন সে লজ্জাশীলা অবগুণ্ঠনবতী। পরে অন্বেষণ করিয়া তাহার আত্মীয় স্বজনের হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিয়া আমি শ্রীমন্দিরের সেই দক্ষিণ দ্বারে বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম,—এ কি ঘটনা! শ্রীভগবানের মূর্ত্তিদর্শনের জন্য ভক্তিতে অধীরা হইয়া যদি একটি কিশোরী এরূপভাবে এক জন অজ্ঞাত পুরুষের গলায় পড়িতে পারে, তবে ব্রজকিশোরীরা অদ্ভুতকর্ম্মা ও দৈব-শক্তিসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়া—যে শ্রীকৃষ্ণ কিশোর বয়সে শারী-রিক বলে এত অসুরের বিনাশ করিয়াছিলেন, এবং জ্ঞানবলে ইন্দ্রযজ্ঞ ভঙ্গ করিয়া নবধর্ম্মের প্রচার করিয়াছিলেন,—সেই 'সজল-জলদ-স্নিগ্ধ-কান্তি' ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়া রাসের শেষে ভক্তিতে, ভক্তির চরম প্রেমে অধীরা হইয়া তাঁহার শ্রীঅঙ্গ আলিঙ্গন করিবে, তাঁহার শ্রীমুখ চুম্বন করিবে, তাহাতে নিন্দার বিষয় কি? বুদ্ধদেব কি পত্নীপুত্র ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান নাই? চৈতন্যদেব কি শ্রীকৃষ্ণের জন্যে মাতা পত্নী ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান নাই? তবে সরলা ব্রজগোপীরা স্বয়ং যে শ্রীভগ-বানকে পতি-পুত্র হইতে অধিক প্রেম করিত, তাঁহাকে দর্শন করি-বার জন্যে পতিপুত্র ত্যাগ করিয়া যাইত, তাহাতে আর নিন্দার বিষয় কি? এখনও কি গ্রামে এক জন সাধু সন্ন্যাসী আসিয়াছে

শুনিলে গ্রামবাসিনীরা পতিপুত্র ত্যাগ করিয়া তাহাকে দেখিতে ছুটে না? বিশেষতঃ, শ্রীকৃষ্ণ তখন কিশোর মাত্র; কিশোরত্বের সীমা পঞ্চদশ বর্ষ।

আর একদিন আমি কার্য্যস্থান হইতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখি যে, একটি কিশোর সন্ন্যাসি-শিশুকে লইয়া পরিবারস্থ মহিলারা এত আত্মহারা হইয়াছে যে, আমার জলখাবার প্রস্তুত করিতে হইবে—আমার পতিপ্রাণা পত্নী পর্য্যন্ত ইহা ভুলিয়া গিয়াছেন। তাহারা শিশুটিকে লইয়া একরূপ পাগল হইয়াছে। তখন আমার মনে হইল যে, একটি মূর্খ কিশোরসন্ন্যাসীকে লইয়া যখন ইহারা এরূপ করিতেছে, তখন স্বয়ং ভগবান নবীনকিশোর শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত হইলে ইহারা কি করিবে? কালে যমুনাতীরাভিনীত এই সরল ও সহজ, যমুনার সলিলের মত নির্ম্মল, শীতল ও মধুর ধর্ম্মও আবিল ও পঙ্কিল হইল। বৌদ্ধ, খৃষ্টীয়, মহম্মদীয় ও গৌরীয় ধর্ম্মের অবস্থাও তাহাই হইয়াছে। হইবারই কথা; শ্রীভগবানের প্রতিভা মানুষ কোথায় পাইবে? এইরূপ আবিল ও পঙ্কিল হইয়াছিল বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের অবতার প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি জাহ্নবীতীরে ও সিন্ধুতীরে সেই ব্রজলীলার অভিনয় করিয়া বঙ্গদেশ ও ভারতের নানা স্থান কৃষ্ণ নামে ও কৃষ্ণপ্রেমাশ্রুতে পবিত্র করিয়া গিয়াছেন। আহা! কি করুণ মধুর লীলা! জগতে এমন প্রাণশীতলকারী আর কি আছে? তিনি কখন শ্রীকৃষ্ণের দাসভাবে বিভোর হইয়া ব্রজলীলার শান্তিরস, কখন নন্দযশোদার ভাবে বিভোর হইয়া বাৎসল্যরস, কখন শ্রীদাম সুদামের ভাবে বিভোর হইয়া সখ্যরস, কখন বা গোপ-কিশোরীদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পতিপ্রেমে বিভোর হইয়া কান্তরস, শ্রীরাধার প্রেমে বিভোর হইয়া মধুররস—সর্ব্বশেষে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের ভাবে বিভোর হইয়া শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে এই

ষড়্রসম্ভোগের অভিনয় দেখাইয়া, শ্রীভগবানের প্রতি ভক্তের প্রেম এবং ভক্তের প্রতি শ্রীভগবানের প্রেমই যে ব্রজলীলা, তাহা জলের মত বুঝাইয়া দিয়াছেন। আমরা শ্রীচৈতন্য দেবের লীলা না বুঝিলে ব্রজলীলা বুঝিতে পারি না। জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ বড় কঠিন। যদি সরল ও সহজ পথ চাও, তবে "সর্ব্ব ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই শরণ লও।" ব্রজের গোপীরাই সর্ব্বধর্ম্ম, এমন কি, পতিপুত্র পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া একমাত্র তাঁহার শরণ লইয়াছিল। যে রাসলীলা নিন্দনীয় মনে করিতাম, এরূপে তাহার মাধুর্য্য ও গাম্ভীর্য্য ক্রমে আমার শিলাসম কঠিন বক্ষ দ্রব করিতে লাগিল। আমি বুঝিলাম, ধর্ম্মপথই একমাত্র সুখের পথ। বুঝিলাম, শ্রীভগবানকে প্রেম না করিলে মানুষ ধর্ম্মপথের প্রকৃত পথিক হইতে পারে না। বুঝিলাম সে প্রেম শিক্ষা দিবার জন্যে ব্রজলীলার মত সহজ, সরল ও মধুর আদর্শ আর হইতে পারে না। শ্রীভগবানকে প্রভুর মত, পিতার মত পুত্রের মত, সখার মত, পতির মত, পত্নীর মত, ভালবাসিতে সকল নরনারীই পারে। এ সকল প্রেমের মধ্যে পতিপত্নীর প্রেম সর্ব্বাপেক্ষা গাঢ়তম। কিন্তু পতিপত্নীপ্রেমের অপেক্ষাও গাঢ়তর যে প্রেম, তাহাই চরম প্রেম—তাহাই রাস। মা! তুমি একবার সেই গানটী গাও না।

ভানুমতী তখন বংশীবিনিন্দিত সুমধুর কণ্ঠে হর্ম্ম্যশীর্ষ মুখরিত করিয়া মধুর কীর্ত্তন গাহিতে লাগিল,—

১

ওরে ব্রজবাসী আয় রে আয়।
রাসে তোরা কে নাচিবি আয়।
ওরে চন্দ্র নাচে তারা নাচে,
ধরা নেচে নেচে যায়।

২

কার্ত্তিক পূর্ণিমা নিশি
গ্রহে গ্রহেতে ভাসি,
বাজিছে কৃষ্ণের বাঁশী, প্রাণ-উদাসী
বুদ্ধ হেসে, গৌর নেচে, গৃহ ছেড়ে ছুটে যায়।

৩

সদ্যঃপ্রসূত কুমার
ছাড়ি, বুদ্ধ অবতার,
ছাড়ি বিষ্ণুপ্রিয়া পত্নী, শচী মা, নিমাই,
পত্নীপুত্র ছেড়ে তোরা ব্রজবধূ আয় রে আয়।
পত্নী পুত্র না ছাড়িলে কৃষ্ণধনে নাহি পায়।

৪

প্রেমে কিশোর বিহ্বল,
দুই নেত্র ছল ছল,
মাঝে কৃষ্ণ,—কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত গোপীদল
নাচে করে কর, দেখে কৃষ্ণ সবারি গলায়,—
নীল শশী বেড়ি যেন তারা নাচিছে ধরায়।

৫

প্রেমে হাসে জ্যোছনা,
প্রেমে হাসে যমুনা,
প্রেমে হাসে বৃন্দাবন,—নাহি উপমা।
নীলমণিধারাপ্রেমে যমুনা উছলি যায়।

৬

আহা আছেন ঈশ্বর
বিরাজিত নিরন্তর
সর্ব্বভূত-হৃদয়েতে, কৃষ্ণ রাসেশ্বর।

রাসচক্রে সর্ব্বভূত প্রেমে নাচিয়া বেড়ায়,
ঘুরিছে প্রকৃতি নেচে ধরি পুরুষ-গলায়।

৭

প্রেমের ব্রজ এ ধরা,
প্রেমের গোপী আমরা,
কাল-কালিন্দীর তীরে প্রেমেতে ভরা;
জন্মে জন্মে কর্ম্মফলে ভ্রমি ভব রাসলীলায়,—
(নাথ!) নবীনের নাহি দুঃখ যদি হৃদে তোমায় পায়!

অনাথনাথ দেখিলেন, ভানুমতী বৈশাখী জ্যোৎস্নায় পুলকিত আকাশের দিকে চাহিয়া গাইতেছে, এবং তাহার কপোল-যুগল বহিয়া গঙ্গাধারার মত ভক্তি বিগলিত অশ্রুধারা ঝরিতেছে। অনাথনাথ ভাবিলেন আমি কি তবে ভ্রান্ত?"

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

বিজয়া।

অনাথনাথ বড়ই পত্নী-পুত্র-পরায়ণ ছিলেন। নিমিষের জন্যেও তাহাদিগকে চক্ষুর অন্তর করিয়া থাকিতে পারিতেন না। কার্ত্তিক ঝটিকাসঙ্কুল মাস; তথাপি স্ত্রী পুত্র সঙ্গে করিয়া আপনার জমিদারী পরিদর্শনে গিয়াছিলেন। তাই সকলে মনে করিয়াছিল যে, পত্নী পুত্র হারাইয়া তিনি উন্মত্ত হইবেন; কিন্তু ভানুমতীকে সঙ্গে করিয়া তিনি যখন গৃহে ফিরিলেন, তখন সকলে দেখিল, তাঁহার গম্ভীর, শান্ত ও মধুর প্রকৃতি আরও গম্ভীর শান্ত ও মধুর হইয়াছে। এই নিদারুণ

শোকের সময়ে তিনি কি যেন এক শান্তিছায়া পাইয়াছেন; কি যেন এক সঙ্কল্প মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন। তাঁহার মুখে শোকের চিহ্ন কেহ দেখিল না; শোকের কথা কেহ শুনিল না। অতি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া তিনি এক অধ্যায় গীতা পাঠ করেন। ইহা তাঁহার চির অভ্যাস। তাহার পর ভানুমতীকে লইয়া পুরোদ্যানে ভ্রমণ করিয়া গ্রাম পরিদর্শন করেন। সকলের সুখ-দুঃখের সংবাদ লইয়া, নিজ বাটীর ঔষধালয় হইতে রোগীর ঔষধের ব্যবস্থা করাইয়া, বিপন্নের বিপদ উদ্ধারের উপায় করিয়া দিয়া, এবং যাহার যেরূপ অভাব, যথাসাধ্য তাহার অপনোদন করিবার চেষ্টা করিয়া, তিনি গৃহে ফিরেন। ভানুমতী ইহাতে তাঁহার এক জন প্রধান সহায়। অনাথনাথ গৃহে ফিরিয়া গেলেও সে অনেকক্ষণ গ্রামে গ্রামে বেড়াইত, এবং গ্রামবাসিগণের সুখ-দুঃখের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিত। সে যেন তাহাদের পরিবারস্থ এক জন হইয়া পড়িয়াছিল। শিশুরা তাহাকে দেখিলেই আনন্দে ছুটিয়া আসিত, রমণীরা জোর করিয়া তাহাকে আপন আপন বাড়ী লইয়া যাইত, পুরুষেরা তাহার উপর অজস্র আদর বর্ষণ করিত। সকলের মুখে সেই এক কথা, "মা! তুই কোন দেবকন্যা?" সেও জাতিনির্ব্বিশেষে গ্রামস্থ বৃদ্ধ বৃদ্ধাকে বাবা ও মা, ও যুবক যুবতীকে দাদা ও দিদি বলিয়া ডাকিত এবং শিশুদিগকে পুত্র কন্যার মত আদর করিত। তাহাকে দেখিবামাত্র গ্রামে আনন্দ-কোলাহল উত্থিত হয়।

অনাথনাথ গৃহে ফিরিয়া ইতিমধ্যে আপনার বিষয়কার্য্য করিতেন। তিনি এখন যেরূপ মনোযোগের সহিত ও পরিশ্রমের সহিত জমিদারীর কার্য্য দেখিতেন পূর্ব্বে এরূপ দেখেন নাই; কর্ম্মচারীরা বুঝিল যে, তিনি সমস্ত সুশৃঙ্খল করিয়া সেরেস্তার

কাগজপত্র গোছাইয়া লইতেছেন; কি যেন তাঁহার একটা অভিসন্ধি আছে। তাহার পর অপরাহ্নে ভানুমতীর মুখে রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি নানা গ্রন্থ শুনিতেন, এবং তাহার সঙ্গে নানা বিষয়ের আলোচনা করিতেন। কখন বা দ্বারস্থ পণ্ডিত কোনও শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করিয়া উভয়কে শুনাইতেন। সন্ধ্যার সময়ে আবার উদ্যানে, নদীতীরে, কিংবা পর্ব্বতে পর্ব্বতে ভানুমতীকে লইয়া বেড়াইতেন, এবং কখন বা কোনবৃক্ষতলায় কি গিরিশেখরে উপলখণ্ডে কি উদ্যানবাটীতে বসিয়া, ভানুমতীর মুখে বেহালা, হারমোনিয়ম, এস্রার, সারঙ্গীর সঙ্গে কীর্ত্তন শুনিতেন। ভানুমতী বৈরাগীর মেয়ে; সে পূর্ব্বে বেহালা, সারঙ্গী বাজাইতে জানিত। ইতিমধ্যে সে অবলীলাক্রমে অন্য দুই যন্ত্রও বাজাইতে শিখিয়াছিল। এই সঙ্কীর্ত্তনের সময়ে কখন সে নিজে বাজাইয়া গাইত; অনাথনাথ তাহার সঙ্গে গাইতেন। অধিকাংশ সময়ে তিনি বাজাইতেন, এবং আত্মহারা হইয়া তাহার গান শুনিতেন। এইরূপে সন্ধ্যা অতিবাহিত হইত।

আজ বৈশাখী পূর্ণিমা, বড় পুণ্য দিন; ইহা শ্রীবুদ্ধদেবের জন্ম ও তিরোধানের দিন। অনাথনাথ দিবস ও নিশার্দ্ধ আনন্দে মহামুনির মন্দিরে ও উপবনে কাটাইয়াছেন। রাত্রি যখন শেষ হইয়া আসিতেছে, এমন সময়ে সুষুপ্ত অবস্থায় তাঁহার বোধ হইল, যেন কে অতি মধুর ভক্তিবিহ্বল কণ্ঠে মধুর কীর্ত্তন গাইতেছে—তিনি যেন শুনিতে পাইলেন,—

"শ্যাম পরশমণি, কি দিব তুলনা।
সে অঙ্গপরশে আমার এ অঙ্গ সোনা।
হস্তের ভূষণ আমার চরণসেবন;
কর্ণের ভূষণ আমার সে নাম শ্রবণ।

নয়নের ভূষণ আমার রূপদরশন ;
বদনের ভূষণ আমার সে নাম কীর্ত্তন।

তাঁহার বোধ হইল, কণ্ঠ ভানুমতীর। সে যেন উদ্যানে, গৃহে, ছাদে, আকাশে বিচরণ করিয়া গাইতেছে ; ফুল্লজ্যোৎস্নাকীর্ণ জগৎ যেন শ্যামনামে মুখরিত ও ভক্তিরসে সিক্ত হইয়াছে ; চারি দিকে অজস্র পুষ্পবৃষ্টি হইতেছে। তিনি মুগ্ধহৃদয়ে আত্মহারা হইয়া শুনিতে লাগিলেন, এবং সেই পুণ্যদৃশ্য দেখিতে লাগিলেন। কিছু ক্ষণ পরে সঙ্গীত থামিল ; তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল ; বুঝিলেন, তাঁহার নয়নে অশ্রু। এ কি ? তিনি উঠিয়া উদ্‌ঘাটিত গবাক্ষের নিকটে গিয়া উদ্যানের দিকে দেখিলেন। নির্ম্মল ধবল জ্যোৎস্নালোকে পত্র-পুষ্পশোভিত উদ্যান হাসিতেছে। কই, সেখানে ত ভানুমতী নাই! তখন অনাথনাথ ভাবিলেন, তিনি রাত্রিতে এ সঙ্গীত ভানুমতীকে গলদশ্রুনয়নে, বাষ্পাকুলিত কণ্ঠে সারঙ্গীর সঙ্গে গাইতে শুনিয়াছিলেন, স্বপ্নে আবার সেই গীত শুনিয়াছেন। কিন্তু এ স্বপ্নে তাঁহার হৃদয় যেন ভক্তিতে আর্দ্র, দ্রব হইয়াছে, প্রাণে যেন কি অমৃত প্রবেশ করিয়াছে, ধমনীতে যেন কি অমৃত সঞ্চারিত, সঞ্চালিত হইয়াছে। ভক্তিতে আত্মহারা অবশ ভাবে রজনীর অবশিষ্ট কাল না নিদ্রিত, না জাগ্রৎ অবস্থায় অতিবাহিত করিলেন। প্রত্যূষে উঠিয়া উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু কই, অন্য দিন যেরূপ ভানুমতী তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকে, আজ ত নাই। তিনি মনে করিলেন, সে নদীতীরে গিয়াছে ; তিনি পুরগিরি অবতরণ করিয়া কর্ণফুলীর তীরে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু কই, ভানুমতী এখানেও নাই। তিনি তখন মনে করিলেন, বালিকা কাল অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া আনন্দ করিয়াছিল, তাই এত সকালে জাগিতে পারে নাই। তিনি কিছুক্ষণ নদীতীরে বেড়াইলেন। বৈশাখের প্রভাত স্বভাবতঃ

সুন্দর। তাহাতে এই গিরিতল-বিচারিণী গিরিজায়ার তীরে উহা আরও কত সুন্দর! অবস্থার পর্ব্বতজাল ভেদ করিয়া ভক্তিস্রোতের মত কর্ণফুলী বহিয়া যাইতেছে। ভক্তিতে জ্ঞানের আলোক সঞ্চারিত হইলে উহা যেরূপ আরও প্রসন্নভাব ধারণ করে, বসন্তের বালসূর্য্যকিরণে কর্ণফুলী সেইরূপ প্রসন্নসলিলা হইয়াছে। দৃশ্যটি ঠিক যেন অনাথনাথের হৃদয়ের একটি প্রতিকৃতি। গত সন্ধ্যায় সেই সঙ্গীত শুনিয়া, গত নিশিতে সেই স্বপ্ন দেখিয়া অবধি তাঁহার হৃদয়েও এরূপ একটি শান্তসলিল ভক্তিস্রোত সেই 'শ্যাম' পরশমণির দিকে ছুটিয়াছে। ক্রমে বেলা হইল; কই ভানুমতী আসিল না। তখন তাঁহার মনে আর একটি সন্দেহ হইল। তিনি বড় মধুর ঈষৎ হাসি হাসিলেন। কাল উৎসবের শেষে শয়ন করিতে যাইবার সময় অনাথনাথ একখানি পুরু কাগজ ভানুমতীর হাতে দিয়া বলিয়াছিলেন,—

"মা ইহা আমার দানপত্র। আজ হইতে আমার এই বিপুল সম্পত্তি তোমার। এই পুণ্যতিথিতে আমার পূর্ব্বপুরুষের এই পবিত্র পুরীতে তোমাকে লক্ষ্মীরূপে প্রতিষ্ঠিত করিলাম।" ভানুমতীর মুখ গম্ভীর হইল। তাহার সমস্ত শরীর যেন কম্পিত হইল। সে প্রসারিত দানপত্র গ্রহণ করিল, এবং অঞ্চলে কণ্ঠ বেষ্টিত করিয়া তাঁহার চরণযুগলে প্রণত হইল, এবং পদযুগল অশ্রুসিক্ত করিল। অনাথনাথ তাহাকে উচ্ছ্বাসের সহিত বুকে তুলিয়া তাহার মুখচুম্বন করিলেন। দেখিলেন, শিশিরসিক্ত শতদলের ন্যায় সেই মুখ শান্ত, স্থির, পবিত্র। সে আর কিছু বলিল না। অনাথনাথ আবার তাহার মুখচুম্বন করিয়া সানন্দাশ্রুনয়নে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। তিনি মনে করিলেন, ভানুমতীর বুঝি সেই কারণে হৃদয়ে বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে, এবং সমস্ত রাত্রি জাগিয়াছে, তাই উঠিতে বিলম্ব হইয়াছে।

তিনি পুরীতে প্রত্যাগত হইয়া বসিয়াছেন, এমন সময়ে তাঁহার কার্য্যাধ্যক্ষ কর্ম্মচারী আসিয়া বলিলেন, "যে কর্ম্মচারীটি মরিয়া গিয়াছে, এবং যাহার পরিবার প্রতিপালনের আপনি সে দিন মাত্র সংস্থান করিয়া দিয়াছেন, তাহার কাগজপত্র বুঝিয়া লইবার জন্যে তাহার একটি বাক্স খুলিলে তাহাতে আপনার নামাঙ্কিত এই পুরাতন পত্র অনেক কাগজের নীচে পাইলাম। পত্রখানি বন্ধ রহিয়াছে। তাহাতে বোধ হইতেছে, আপনি দেখেন নাই।" কার্য্যাধ্যক্ষ এই বলিয়া একখানি 'তুলট' কাগজে লেখা অতি পুরাতন পত্র অনাথনাথের হস্তে সমর্পণ করিলেন। অনাথনাথ পত্রখানি খুলিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন।

"শ্রীহরিঃ শরণং।

মহামহিমার্ণব

শ্রীযুক্ত বাবু অনাথনাথ রায়, জমীদার মহাশয়

মহিমার্ণবেষু—

শ্রীকৃষ্ণের নিকট আপনার মঙ্গল ভিক্ষা পূর্ব্বক নিবেদন। ১২৮৮ সনের কার্ত্তিক মাসের মহা ঝড়ে রাজখালী গ্রামের নিকটে সমুদ্রতীরে আপনার বজরা জলমগ্ন হয়। ঝটিকার সময় আমি ও আমার বৈরাগিণী যে একটি ভূপতিত বৃক্ষে আশ্রয় লইয়াছিলাম, তাহার কাছ দিয়া একটা কি ভাসিয়া যাইতে আমার পায়ে লাগে। স্পর্শ করিয়া দেখিলে একটি শিশু বলিয়া বোধ হইল। আমি উহাকে উঠাইয়া লইয়া আমার বক্ষের মধ্যে রাখিয়া রাত্রি অতিবাহিত করি। প্রভাতে দেখিলাম, আপনার দুই বৎসর বয়স্কা কন্যা। আপনার বজরায় ভিক্ষা করিতে গিয়া আমি তাহাকে দেখিয়াছিলাম। তখন তাহার জীবনের কোন লক্ষণ ছিল না। সে বিষয়ে ৺পুরী গোস্বামী এই পথে আদিনাথ যাইতেছিলেন। তিনি শিশুটিকে তাঁহার

দৈবশক্তি দ্বারা পুনর্জ্জীবিত করেন। আমার বৈরাগিণী কাঁদিতে লাগিল। সে কোনও মতে মেয়েটিকে আপনাকে প্রত্যর্পণ করিতে দিবে না। সেই রাত্রিতেই তাহাকে লইয়া পলায়ন করে, এবং বহু অন্বেষণে আমি অনেক দিন পরে ত্রিপুরার অন্তর্গত একটি গ্রামে তাহাকে প্রাপ্ত হই। দেখিলাম, দুটিতে বড় আনন্দে আছে, মেয়েটি বৈরাগিণীর জীবনসর্ব্বস্ব হইয়া এবং মেয়েটি তাহাকে 'মা' বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছে। তখন আমার সাধ্য নাই যে, তাহাকে বৈরাগিণীর কাছ হইতে সরাইয়া লইয়া আপনাকে প্রত্যর্পণ করি। ৺পুরী গোস্বামীও নিষেধ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, মেয়েটি শ্রীভগবতীর অংশসম্ভূতা। কোনও মহৎ কার্য্য সাধনের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছে। প্রত্যর্পণ করিলে তাহার বিঘ্ন হইবে। বিশেষতঃ সে যখন আমাকে তাহার কচি মুখে ঈষৎ হাস্য করিয়া 'বাবা' বলিয়া ডাকিল, তখন আমার হৃদয়ে একটা বিপ্লব উপস্থিত হইল। সমুদয়ই শ্রীকৃষ্ণের লীলা,—আমি মায়াপাশে আবদ্ধ হইলাম। এই দশ বৎসর আমি তাহাকে সঙ্গীত ও শাস্ত্র শিক্ষা দিয়াছি। মা আমার স্বয়ং সেই ব্রজকিশোরী কৃষ্ণপ্রেমানুরাগিণী শ্রীরাধা। এমন রূপ, এমন গুণ, এমন ভক্তি, মানুষের হইতে পারে না।

আমি বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত। আপনি এই পত্র যখন পাইবেন, আমি তখন ধরাধামে থাকিব না। বৈরাগিণী আমার পূর্ব্বেই বৈকুণ্ঠে গিয়াছে। ঢাকা জেলার অন্তর্গত রাজনগর গ্রামে শ্রীহরিচরণ দত্তের দোকানে আপনার হারাণ লক্ষ্মীকে পাইবেন। আপনি তাহাকে গ্রহণ করিবেন, এবং এই মহাপাতকী তস্করের অপরাধ ক্ষমা করিবেন। ইতি ১২ই মাঘ, ১২৯৮ সন।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের দাসানুদাস
শ্রীগৌরদাস বৈরাগী।"

পত্রপাঠ শেষ করিয়া "ভানুমতী আমার অমিয়া!" "মা অমিয়া! মা অমিয়া!" বলিয়া আনন্দে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে উন্মত্তের মত অন্তঃপুরে ভানুমতীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন। অন্তঃপুরের দ্বিতল গৃহে তাঁহার শয়নকক্ষের পার্শ্বের একটি কক্ষ অতি সুন্দর রূপে সজ্জিত করিয়া ভানুমতীকে থাকিতে দিয়াছিলেন। কক্ষ ত নহে,—একটি ক্ষুদ্র ত্রিদিব। কিন্তু কক্ষে ভানুমতী নাই। সমস্ত বাড়ী, সমস্ত পুরী, সমস্ত উদ্যান ও উপবন, সমস্ত নদীতীর অন্বেষণ করিলেন, ভানুমতীকে পাইলেন না। পুরীতে মহা আনন্দের কলরব পড়িয়া গেল। কর্ম্মচারী, দাস দাসী, আত্মীয়, কুটুম্ব সকলে চারি দিকে অন্বেষণে ছুটিল। সকলেরই মুখেই—"ভানুমতী বাবুর হারাণ মেয়ে অমিয়া!" সমস্ত পুরী যেন আনন্দে এককণ্ঠে বলিতে লাগিল, "ভানুমতী বাবুর হারাণ মেয়ে অমিয়া।" সমস্ত উদ্যান ও উপবন আনন্দে পত্রের মর্ম্মরে বলিতে লাগিল, "ভানুমতী বাবুর হারাণ মেয়ে অমিয়া!" শৈলসমীরণ আনন্দে সন্ সন্ রবে, পার্ব্বত্য পক্ষিগণ কল কলরবে বলিতে লাগিল, "ভানুমতী বাবুর হারাণ মেয়ে অমিয়া।" কর্ণফুলী আনন্দে তর তর স্রোতে বহিয়া যাইতে যাইতে বলিতেছিল, "ভানুমতী বাবুর হারাণ মেয়ে অমিয়া।" উপত্যকাস্থ গ্রামসমূহে আনন্দকোলাহল উঠিল, "ভানুমতী বাবুর হারাণ মেয়ে অমিয়া!" কিন্তু ভানুমতী কোথায়? এ আনন্দ-উচ্ছ্বাসের সময় ভানুমতী কোথায়? যাহাকে বুকে লইয়া আনন্দে নৃত্য করিতে যেন জগৎ আকুল হইয়াছে, সে ভানুমতী কোথায়? অনাথনাথ স্বয়ং বারবার পুরী, উদ্যান, নদীতীর, সর্ব্বশেষে গ্রামে গ্রামে তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলেন, ভানুমতীকে পাইলেন না। তিনি ভগ্নহৃদয়ে গদগদশ্রুনয়নে গৃহে ফিরিয়া আবার তাহার কক্ষে প্রবেশ করিলেন। শূন্য

গৃহের প্রত্যেক সজ্জা ও উপকরণ যেন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "ভানুমতী কোথায়?" তিনি বাতায়নপথে পুরোদ্যান, নীলমণিমালানিভ গিরিগর্ভস্থ কর্ণফুলী ও বৃক্ষসমাচ্ছন্ন উপবন সদৃশ গিরিপদতলস্থ গ্রামসমূহ দেখিতে লাগিলেন,—সকলই যেন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছিল,—"ভানুমতী কোথায়?" তাঁহার হৃৎকম্প হইল। তিনি ভানুমতীর শয্যার উপর বক্ষ রাখিয়া নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিয়া শয্যা সিক্ত করিলেন। হৃদয়ের বিপ্লব একটু উপশমিত হইলে তিনি শূন্যহৃদয়ে কক্ষমধ্যে দেখিতে লাগিলেন। অকস্মাৎ তাহার লিখিবার মেজের উপর তিনি যেন একখানি পত্র দেখিতে পাইলেন। তিনি উঠিয়া গিয়া দেখিলেন, পত্র ভানুমতীর সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখিত, এবং শিরোনামায় তাঁহার নাম। বিদ্যুৎবেগে পত্রের আবরণ ছিন্ন করিয়া তিনি পড়িতে লাগিলেন,—

"বাবা! আজ তোমাকে আমার অতীত কাহিনী কহিব। সে সময় উপস্থিত হইয়াছে। শৈশবে কি ছিলাম, কোথায় ছিলাম, মনে নাই। এইমাত্র স্মরণ আছে, বৈরাগী পিতা ও বৈরাগিণী মাতার বড় স্নেহভাগিনী ছিলাম। তখন আমার নাম ছিল স্বর্ণ। তাঁহাদের সঙ্গে নানা স্থানে বেড়াইয়া গান গাইয়া শৈশব বড় সুখে কাটাইয়াছি। অষ্টম বর্ষ বয়সে আমার স্নেহপ্রতিমা করুণাময়ী বৈরাগিণী মাতা আমাকে বক্ষে লইয়া কৃষ্ণনাম গাইতে গাইতে বৈকুণ্ঠে চলিয়া যান। তাহাতে আমার ক্ষুদ্র হৃদয় একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে। বহুকাল মাতার জন্যে, কি ভিক্ষার সময়, কি গান গাইবার সময়, কি গৃহে বিশ্রাম করিবার সময়—কাঁদিতাম, পিতার সমুদয় সান্ত্বনা এই শোকস্রোতে ভাসিয়া যাইত। এই শোকের শান্তি না হইতেই দুই বৎসরের মধ্যে পিতাও পুণ্যবতী জননীর অনুসরণ করেন। রাজনগর গ্রামে একটি

দোকানে তাঁহার জীবলীলার অবসান হয়। আমাকে সেই দোকানদারের কাছে রাখিয়া যান; বলিয়াছিলেন,—মা। তুই আমাদের মেয়ে নহিস্। আমরা মহাপাতকী, তোর মত দেবকন্যা কোথায় পাইব? তুই ঝড়ের সময় সমুদ্রের বন্যায় আমাদের কাছে ভাসিয়া আসিয়াছিস; আমরা মহাপাপী, মায়াতে মুগ্ধ হইয়া তোর পিতাকে প্রত্যর্পণ করিতে পারি নাই। তিনি কুবেরসদৃশ ভাগ্যবান্। বৈরাগিণী চলিয়া গিয়াছে। মনে করিয়াছিলাম, এবার চট্টগ্রাম অঞ্চলে গেলে তোকে তোর পিতার হাতে অর্পণ করিব। কিন্তু শ্রীভগবানের বুঝি তাহা ইচ্ছা নহে। আমি তাঁহার কাছে পত্র লিখিলাম। তুমি এই দোকানে থাকিবে। তিনি আসিয়া তোমাকে লইয়া যাইবেন।' আমি এই প্রহেলিকা কিছুই বুঝিতে পারি নাই। পিতার পরলোকগমনে সংসার শূন্য হইল। আমি আশ্রয়হীনা হইলাম। এবার হৃদয় একবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। আমি শোকে এরূপ অভিভূতা হইয়াছিলাম যে, তিনি কি বলিয়াছিলেন, ভাল করিয়া শুনিতে পারি নাই। একটি ক্ষুদ্র কুসুমের উপর পার্ব্বত্য শিলাখণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়িলে ফুলটি যেরূপ নিষ্পিষ্ট হয়, পিতার মৃত্যু সমাগত জানিয়া, আমার হৃদয়ও সেইরূপ হইয়াছিল। দিনের পর দিন চলিয়া যাইতে লাগিল। দোকানদার পিতার কিছু সঞ্চিত অর্থ পাইয়াছিল। সে কয়েক দিন আমাকে খুব যত্ন করিল। ক্রমে সে যত্ন শিথিল হইল। এমন সময়ে এক দল বেদে সেখানে উপস্থিত হইল। দোকানি আমাকে গোপনে তাহাদের কাছে বিক্রয় করিয়া প্রকাশ্যে বলিল, 'তুমি বৈরাগীর মেয়ে। কোন গৃহস্থ তোমাকে স্থান দিতে চাহে না। তুমি আর বেশী দিন আমার এখানে থাকিলে আমার জাতি যাইবে। অতএব তুমি বেদেদের সঙ্গে চলিয়া যাও।' জগৎ অন্ধকার

দেখিলাম। আর কোথাও যাইবার স্থান দেখিলাম না। আমি এইরূপে বেদেদের ক্রীতকন্যা হইলাম। বেদিনী মাতা কিছু উগ্রপ্রকৃতি হইলেও, বেদে পিতা বড় ভালমানুষ। তখন আমার নাম হইল—আশা। সর্ব্বশেষ তাহাদের শিশু পুত্র গোপাল—(এখানে পত্রে এক ফোঁটা চক্ষের জল পড়িয়াছে) বাছা! আমার কোথায় গেল! তাহার আদরে আমি সকল দুঃখ ভুলিয়াছিলাম। এইরূপে ছয় বৎসর অতিবাহিত হইয়া যায়। তাহার পরে সুবর্ণদ্বীপে তোমাদের দর্শনলাভ করি। দর্শনমাত্রই কে যেন আমার হৃদয়ে বলিয়া দিল, 'অভাগিনী! এই তোর পিতা, তোর মাতা, তোর ভ্রাতা। হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, ছুটিয়া গিয়া তোমাদের চরণতলে পড়িতে, ভাইটিকে বুকে লইতে, প্রাণ আকুল হইল। কত দেশে কত লোকের কাছে বাজী করিয়াছি; কত লোক কতরূপ স্নেহমমতা দেখাইয়াছে; কিন্তু মনের এমন ত ভাব কখনও হয় নাই; কাহাকেও ত পিতা মাতা বলিয়া মনে হয় নাই। তোমাদেরও আমার প্রতি সেই অপার স্নেহ ও করুণা। তাহার পর সেই প্রলয়কারী ঝড়। মাকে হারাইলাম, ভাইকে হারাইলাম। আমার গোপালকে হারাইলাম। সেই দরিদ্র আশ্রয়দাতা দুটিকে হারাইলাম। (এখানে অশ্রুতে লেখা ভাসিয়া গিয়াছে।)

কিন্তু বাবা! শ্রীভগবানের কি লীলা! যে ঝড়ে পৃথিবী দলিত নিষ্পিষ্ট করিয়া গেল, আমার মত ক্ষুদ্র, তুচ্ছ বনফুল-টিকে উড়াইয়া আনিয়া তোমার দেবচরণে অর্পণ করিল! যে ঝড়ে জগৎ বিধ্বস্ত করিল, আশ্রয়হীনা আমার জন্ত কি এই স্বর্গের সৃষ্টি করিল! আমি এই কয়েক মাস তোমার হৃদয়ে কি স্বর্গ দেখিলাম, তোমার মুখে কি স্বর্গের সংবাদ শুনিলাম, তোমার, স্নেহে কি স্বর্গ ভোগ করিলাম। সর্ব্বশেষে আমি

পথের ভিখারিণী, রাজনন্দিনী ;—একটি বিপুল রাজ্যের উত্তরাধিকারিণী।"

কিন্তু বাবা! বৈরাগিণী কি রাজনন্দিনী হইতে পারে? তোমার ওই উদ্যানের লতাটি যে ভাবে তরুটিকে অবলম্বন করিয়া উঠিয়াছে, বলপূর্ব্বক তাহার সেই ভাবের, সেই গতির কি পরিবর্ত্তন করিতে পার? সে জীবনলতা বৈরাগ্য-বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া এত দূর উঠিয়াছে, তাহাকে স্থানান্তরিত করিয়া সংসার-বৃক্ষের ছায়ায় রোপণ করিলে কি সুখী হইতে পারে? বাবা এই কয়েক মাস ত তোমার বিপুল সংসারের শীতল ছায়ায় কাটাইলাম। কিন্তু কই? তোমার ইন্দ্রপুরীসদৃশ রাজপুরী, তোমার এই বিস্তীর্ণ রাজ্য, এই গৌরব, এই সম্পদ, এ সকল ত কিছুই আমার চক্ষে পড়িল না। তোমার ওই দেবমূর্ত্তি, তোমার ওই দেব-হৃদয়ে, তোমার দেব-দুর্ল্লভ জ্ঞান। তোমার পাদপদ্মে মাথা রাখিয়া তোমার পূজা করিতে পারিলেই ভানুমতী সুখী। তাহার অধিক সুখ সে চাহে না,—তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ে ধারণা করিতে পারে না। বৈরাগী পিতা তাহার হৃদয়ে যে বীজ বপন করিয়াছিলেন, তুমি এই কয়েক মাস তাহাতে জল-সেক করিয়া অঙ্কুরিত করিয়াছ। তুমি কি উহার ফুল ফল হইতে দিবে না? বৈরাগী পিতা আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ে একটি ক্ষুদ্র মূর্ত্তি স্থাপিত করিয়াছিলেন,—কৃষ্ণ। তোমার মুখে সমাজতত্ত্ব, ধর্ম্মতত্ত্ব, জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তিতত্ত্ব শুনিতে শুনিতে সে হৃদয় বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। সেই স্থাপিত ক্ষুদ্র মূর্ত্তিটি বড়ই মহিমাময় হইয়াছে। এখন কেবল সেই রূপ দেখিতে পারিলে, সেই নাম গাইতে পারিলেই আমার সুখ; এ হৃদয়ে অন্য সুখ স্থান পায় না।

"হস্তের ভূষণ আমার চরণসেবন,
কর্ণের ভূষণ আমার সে নামশ্রবণ।

নয়নের ভূষণ আমার রূপদরশন,
বদনের ভূষণ আমার শ্যামগুণগান।"

এত দিন দেবদেবী কি, আমি বুঝিতাম না। রাধাকৃষ্ণ কিরূপ ছিলেন, বুঝিতাম না। যে দিন তোমাকে ও মাকে দেখিলাম, সে দিন বুঝিলাম, দেব দেবী কি, রাধাকৃষ্ণ কি! বৈরাগী পিতা আমাকে একটী ক্ষুদ্র বালগোপাল দিয়াছিলেন। আমি উঁহাকে বুকে বুকে রাখিতাম, এখনও রাখি। পিতা হাসিয়া আমাকে তাই যশোদারাণী বলিয়া ডাকিতেন। বেদের পুত্র গোপালকে পাইয়া মনে করিতাম, বালকৃষ্ণ বুঝি এইরূপ ছিলেন। কিন্তু তাহাতেও যেন তৃপ্তি পাইতাম না। যে দিন অমিয়কে বুকে পাইলাম, সে দিন বোধ হইল, আমি প্রকৃতই বালগোপালকে পাইলাম। আমি পরিতৃপ্ত হইলাম। কিন্তু তাহাকে পাইতে পাইতে হারাইলাম। আমি রাজ্য লইয়া কি করিব? এখন যে পাথরের বাল-গোপালটি আমার বুকে আছে, আমি উঁহাকে আমার সেই হারাণ গোপাল ও অমিয় বলিয়া জানি। তাহারাই কালে সেই যশোদার দুলালকে আমার বুকে আনিয়া দিবে। তুমি যে ছয় রসের ব্যাখ্যা করিয়াছ, আমি তাহার মধ্যে বাৎসল্য রসটি বুঝিয়াছি। উঁহাতে প্রাণ ভরিয়া গিয়াছে।

আজ তুমিও আমার চক্ষে সেই বালগোপাল। আমি তোমার যশোদা মা। তুমি যখন আমাকে বুকে লও, আমি সেই যশোদার ভাবে বিভোর হই। তবে তুমি এত স্নেহে যখন এই রাজ্য দান করিয়াছ, তখন আমি তাহা প্রত্যাখ্যান করিতে পারি না। গ্রহণ করিলাম। 'গুরুদেব ৺পুরী গোস্বামী আমাকে বাঁচাইয়াছিলেন। আমার অমিয়কে লইয়া তাঁহার কাছে আদিনাথে গিয়াছিলাম। তিনি কলেবর পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি বলিলেন, আমাকে বাঁচাইয়াছিলেন, আমার

দ্বারা কোন মহৎ কার্য্য হইবে বলিয়া। অমিয়কে বাঁচাইলেন না; বলিলেন, তাঁহার দ্বারা সে কার্য্যের বিঘ্ন হইবে। সেই মহৎ কার্য্য কি, আমি যেন এত দিনে বুঝিতেছি। এই বিপুল রাজ্যের আয়ের দ্বারা একটি ভাণ্ডার গঠিত হইবে। তাহার নাম হইবে 'অনাথ-ভাণ্ডার।' উহা পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়া নিম্নলিখিত বিষয়ে নিয়োজিত হইবে।

১। যে সকল তীর্থধাম মোহন্তদের পাপাচরণে বিনষ্ট হইতেছে, তাহাদের হস্ত হইতে সেই সকল তীর্থের উদ্ধার ও রক্ষা করিতে হইবে।

২। কয়েক জন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও সন্ন্যাসীকে বৃত্তি পূর্ব্ববৎ টোল স্থাপন করিতে হইবে, এবং পতিত ব্রাহ্মণদিগকে সপ্তশতী ব্রাহ্মণদিগের মত স্বতন্ত্র করিয়া দিয়া, একটি প্রকৃত ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিতে হইবে। এবং ইহাদের দ্বারা যাহাতে গ্রামে গ্রামে পূর্ব্ববৎ পঞ্চায়ত সৃষ্ট হইয়া গ্রামের শান্তি-বিধান হয়, এবং স্বদেশীয় শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৩। যাহাতে অন্য শিক্ষার সঙ্গে প্রত্যেক ধর্ম্মাবলম্বীর ধর্ম্মশিক্ষা হইতে পারে, বালকবালিকাগণের জন্যে সেইরূপ কয়েকটি আদর্শ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

৪। এই পুরীতে সেইরূপ দুটি প্রধান টোল ও বিদ্যালয়ই তোমার ও জননীর নামে স্থাপিত হইবে, এবং 'অনাথনাথ' ও 'রাজরাজেশ্বরী' নামে তোমাদের হরগৌরী মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়া সমারোহে পূজিত হইবে, এবং ভোগের দ্বারা দরিদ্রের ও অতিথি সন্ন্যাসী ও আতুর নিরন্নের সেবা হইবে।

৫। আদিনাথের পশ্চিমে সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে আমার গুরুদেবের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাঁহার আদেশমতে সেই

পবিত্র স্থানে মহামহীরুহ অশ্বথের ছায়ায় আমার অমিয়কে গুরুদেবের চরণকমলতলে রাখিয়া আসিয়াছি। সেখানে 'অমিয়গোপাল নামে একটি বালগোপালমূর্ত্তি একটি সুন্দর মন্দিরে স্থাপিত হইবে, এবং 'অমিয়াশ্রম' নামে আদিনাথ-শৈলশ্রেণীর উপর একটি সুন্দর আশ্রম স্থাপিত হইবে। উহা ঠিক ভারতের পূর্ব্বকালীন আশ্রমের মত হইবে, যেন সাধু বৈরাগী সন্ন্যাসীরা সেই মনোহর শৈলাশ্রমে তপস্যা করিতে পারেন। সেখানে একটি টোল ও বিদ্যালয় স্থাপিত হইবে, এবং পূজার ভোগের দ্বারা দরিদ্র ও তপস্বীদের সেবা হইবে। সমুদ্রপ্লাবনের সময় দ্বীপবাসীরা সেই আশ্রমে আশ্রয় পাইবে, এবং সেই 'অমিয়ভাণ্ডার' হইতে সর্ব্বপ্রকার সাহায্য পাইবে। সেই আশ্রমের মন্দিরে তোমার ও জননীর প্রতিকৃতি থাকিবে।

বাবা! তোমার আমার জন্যে কিছুই রাখিলাম না। আমরা পিতাপুত্রীর,—মাতাপুত্রের,—আশ্রয়ের স্থান শ্রীভগবানের চরণাম্বুজ। আমি সেই আশ্রয়ে চলিলাম। তুমও আসিও। বদরিকাশ্রমে শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণতলে উভয়ে আবার মিলিত হইব। তপস্যা সিদ্ধ হইলে পিতাপুত্রী 'অমিয়াশ্রমে' আসিয়া তাহার দেহমৃত্তিকার সঙ্গে আমাদের দেহমৃত্তিকা মিশাইব।

তোমার স্নেহের কন্যা

"ভানুমতী।"

অনাথনাথ পত্রখানি একবার, দুইবার, বহুবার পড়িলেন। পড়িতে পড়িতে অশ্রুতে পত্রখানি সিক্ত হইল। শেষবার পাঠ সমাপন করিয়া বলিলেন, "মা! তাহাই হইবে। তুই প্রকৃত মায়ের কাজ করিলি; তোর এই পতিত পুত্রকে উদ্ধার করিলি।" তিনি জেলার কালেক্টরকে পত্র লিখিলেন, "আমার সমস্ত বিষয় গবর্ণমেণ্টের হস্তে অর্পণ করিলাম। দেশের প্রধান ব্যক্তিদের

দ্বারা একটি সমিতি গঠিত হইবে, এবং তাহাদের অধিকাংশের মতে এক জন সাধু কার্য্যাধ্যক্ষ নিয়োজিত হইয়া আমার কন্যা অমিয়া (প্রকাশ ভানুমতীর) পুত্রের লিখিত অনুষ্ঠানে আমার সম্পত্তির বার্ষিক আয় ব্যয়িত হইবে। 'অমিয়াশ্রমে' ভানুমতীর প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তাহার বক্ষে 'অমিয়গোপাল' মূর্ত্তি সন্নিবেশিত করিতে হইবে, এবং মা আমার যশোদা-রূপে পূজিতা হইবেন।"

কক্ষে আলমারির উপর ভানুমতীর দুইখানি গৈরিক বসন ছিল। ভানুমতী রাজনন্দিনী হইয়াও বৈরাগীর বসন ত্যাগ করে নাই। একখানি পরিধেয় ও আর একখানি উত্তরীয় করিয়া সেই বিপুল রাজ্যের অধিকারী অনাথনাথ পথের ভিখারী হইলেন।

সমাপ্ত।

উৎসর্গ।

—•—

যাঁহার উদ্দেশে প্রবাস হইতে পত্রগুলি লিখিত হইয়াছিল,—তাঁহার নামে এই প্রবাসের পত্র উৎসর্গ করা হইল।

বিজ্ঞাপন।

—•—

প্রবাসের পত্রের অধিকাংশ আমার "সাহিত্যে" প্রকাশিত হইয়াছিল। এক্ষণে পুনর্মুদিত হইল। পুণা, দণ্ডকারণ্য ও ভারতরমণীর চিত্র, এই তিন খানি পত্র নূতন প্রকাশিত হইল।

কবিবর নবীন বাবু, আমার অনুরোধে, পত্রগুলি মুদিত করিবার অনুমতি দিয়াছেন। সাধারণের জন্য পত্রগুলি লিখিত হয় নাই। নবীন বাবু ভ্রমণ-উপলক্ষে যেখানে যাইতেন, সেখান হইতে সহধর্ম্মিণীকে পত্র লিখিতেন। পত্রগুলিও তাড়াতাড়ি লেখা, হয় ত রেলওয়ে ষ্টেশনে ট্রেণের অপেক্ষায় বিশ্রামগৃহে বসিয়া আছেন, এবং পত্র লিখিতেছেন। তবু পত্রগুলি মনোরম হইয়াছে। সাহিত্যের অনেক পাঠক প্রবাসের পত্রের প্রশংসা করিয়াছেন। এক্ষণে প্রবাসের পত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল, আশা আছে, সাদরে পরিগৃহীত হইবে।

২রা আশ্বিন
১২৯৯

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি।
প্রকাশক।

প্রবাসের পত্র।

দার্জ্জিলিঙ্গ।

ঈশ্বরের কৃপায়, আমার এই বিপদ্‌সঙ্কুল জীবনের একটি সুখস্বপ্ন অংশতঃ সফল হইল,—আমি দার্জিলিঙ্গ দেখিলাম। সেই মহিমার মূর্ত্তি হিমাচল দেখিলাম। বাল-সূর্য্য-কিরণে প্রদীপ্ত, তপ্ত-কাঞ্চনাভ কাঞ্চনশৃঙ্গ দেখিলাম, জগতে বুঝি এমন মহান্ দৃশ্য আর নাই! হিমাদ্রি পার্শ্ব ও সানুস্থিত, শৈবিমালায় পুষ্পিত, শীতল-পাদপ-শ্রেণীতে উপবনীকৃত, দার্জ্জিলিঙ্গের মনোহারী চিত্রখানি নয়ন ভরিয়া দেখিলাম। ততোধিক সুখের কথা, আমার শৈশবসুহৃদ্ অভিন্নহৃদয়, সহৃদয়তায় কামিনী-কোমল, উমেশকে দেখিলাম। আর দেখিলাম তাহার উমাকে! স্বামী উমেশ, ভার্য্যা কেদার-কামিনী! "অখণ্ডপুণ্যানাং ফলমিব" না হইলে, বোধ হয়, পতি এমন পত্নী, ও পত্নী এমন পতি লাভ করিতে পারেন না।

শৈশব হইতে প্রকৃতির মহাপ্রদর্শনভূমি পার্ব্বতী-মাতার (চট্টগ্রাম) অঙ্কে যে বিরাজ করিয়াছে, দার্জ্জিলিঙ্গে তাহার পক্ষে দেখিবার অভিনব দৃশ্য তত কিছুই নাই। গিরিপার্শ্ববাহী 'রেল-ওয়েটি' যেরূপ ঘুরিয়া ফিরিয়া,—স্তরে স্তরে, পর্ব্বতের পাদমূল হইতে উর্দ্ধে মেঘমালা ভেদিয়া উঠিয়াছে, নগরাজ যেন বক্ষে

স্তরে স্তরে উপবীত ধারণ করিয়াছেন,—উহাই কেবল দেখিবার যোগ্য। স্থানে স্থানে যখন মেঘজাল ভেদ করিয়া উর্দ্ধে উঠিলাম, তখন স্থানে স্থানে নীচে কিছুই দেখা যাইতেছিল না। জগৎ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল! কেবল হিমাদ্রি, আকাশের সীমা দেখাইয়া, হৃদয়ে যুগপৎ আনন্দ ও আতঙ্ক জন্মাইতেছিল। আর দেখিবার যোগ্য প্রভাত-অরুণালোকে স্বুবর্ণমণ্ডিত কাঞ্চনশৃঙ্গ বা কাঞ্চন-জঙ্ঘা।

উমেশের উমা সম্বন্ধে আর দু'চার কথা না লিখিলে, তুমি বিরক্ত হইবে। হিমালয়ের অঙ্কে, উমা-উমেশ-শোভা, এই শরৎকালে সন্দর্শন, আমি আমার জীবনের একটি প্রকৃত দুর্গোৎসব বলিয়া চির দিন মনে রাখিব। দার্জিলিঙ্গ আজ আমার চক্ষে একটি পুণ্যতীর্থ। ঠাকুরাণীটিকে দেখিতে প্রথম আমাদের মধু বাবুর ফুলেশ্বরীর মত বোধ হয়। কিঞ্চিৎ মনোনিবেশ করিয়া দেখিলে, এ ফুলেশ্বরী সম্বন্ধে বলিতে হয়,—

"ওরে প্রিয় ফুল তুলনা যে নাই,
কি তুলনা দিব?
মিছে কি বলিব?
অতুলন তোরে বলিছে সবাই।"

এ ফুলেশ্বরীর গাম্ভীর্য্যমাখা ঈষৎ হাসিটুকু,—জ্যোৎস্নার কোলে ঈষৎ বিজুলী সঞ্চার,—মধুমাখা স্নেহটুকু, বৈশাখী জ্যোৎস্নার অমৃতভরা ভাবটুকু, বুঝি সেই ফুলেশ্বরীতে নাই। তাঁহার অঙ্কে দুইটি পুত্র কুসুম বিরাজিত। ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা কর, তাহারা দীর্ঘজীবী হইয়া মাতার উজ্জ্বল মুখ আরো উজ্জ্বল করুক! আমারও দুই বন্ধুর অদৃষ্ট সমান। আর একটি পুত্র, অঙ্ক শূন্য করিয়া, মাতার ঐ দেবীমূর্ত্তিতে বিষাদের ছায়া মাখাইয়া

দিয়া চলিয়া গিয়াছে। পতি-পত্নীর ভালবাসায় আজ দার্জিলিঙ্গ আমার চক্ষে যথার্থই কৈলাস,—দুইটি দিন স্বর্গসুখে অতিবাহিত করিতেছি।

বৈদ্যনাথ।

পথে কয়েক ঘণ্টা কাল বৈদ্যনাথে ছিলাম। শ্রীক্ষেত্র যে দেখিয়াছে, তাহার কাছে বৈদ্যনাথে দেখিবার কিছুই নাই। শ্রীক্ষেত্রের মন্দিরের অনুকরণে একটি প্রাঙ্গণ। মধ্যস্থলে একটি মন্দিরে বৈদ্যনাথ। বলিতে হইবে না যে, তিনি লিঙ্গরূপী। প্রাঙ্গণের চারি দিকে, মন্দিরে নানা দেব দেবী। অধিকাংশই বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি, যেখানে বুদ্ধ-মূর্ত্তি কোনও মতে লুকাইবার যো নাই, সেখানে তাঁহার নাম "কাল-ভৈরব" হইয়াছে। বৈদ্যনাথ, দেওঘর বা দেবঘর, অতি সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া শুনিয়াছিলাম, কিন্তু আমার তত ভাল লাগিল না।

বৈদ্যনাথে, "অমৃতবাজার পত্রিকা"র সম্পাদক শিশির বাবু ও তাঁহার সহোদর মতি বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। ইহাঁরা যশোহরের বন্ধু—বেশ আদর করিলেন। প্রাতে তাঁহারা আহার করাইলেন। সেই ঘোরতর ব্রাহ্ম দুই ভাই এখন ঘোরতর বৈরাগী; এখন প্রত্যহ তাঁহারা পূজা আহ্নিক করেন। কলিকাতা ছাড়িয়া, শিশির বাবু বৈদ্যনাথে আশ্রমবাসী হইয়া, সস্ত্রীক নির্জ্জনে থাকেন। দেখিলাম,—আমার জীবনের সেই স্বপ্ন, শিশির বাবু কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন। তাঁহার স্ত্রী রাঁধেন, তিনি পার্শ্বে বসিয়া "অমৃতবাজারের" সম্পাদকীয় কার্য্য নির্ব্বাহ

করেন। বৈরাগ্য এত দূর যে, ঘরে বসিবার আসন খানি পর্য্যন্ত নাই। খবরের কাগজ বিছাইয়া বসিয়া, অতি তৃপ্তির সহিত, তিন জনে আহার করিলাম। তাঁহারা এক জন বৈরাগী সঙ্গে রাখিয়াছেন। তিন জনে মিলিয়া, বৈষ্ণব কবিদিগের সেই কবিতা গাইলেন। কর্ণে অমৃতবর্ষণ হইল, হৃদয় গলিয়া গেল, চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। ভাবে ভাবে মিলিয়া এ কীর্ত্তন, আমি ত জীবনে ভুলিব না। বৈষ্ণব কবিদিগের কবিতায় কি যে প্রেমামৃত আছে, তাহা যত পান করা যায়, কিছুতেই পিপাসা মেটে না। তাঁহারা গাইলেন,—

"দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে তোমারে নয়নে দেখি,
বেড়াইয়া ভুজলতা হৃদয়ে হৃদয়ে রাখি।"

প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। সেই অবস্থায় দেওঘর ছাড়িলাম।

প্রয়াগ।

"স্থানীয় ন্যাশন্যাল কংগ্রেস" সভার দুইটি অধিবেশন দেখিতে গিয়াছিলাম। কোট্‌-হ্যাট্‌-ধারী বাঙ্গালী দাঁড়কাকগুলির মধ্যস্থলে,—মরি! মরি!—কি একটি মূর্ত্তি দেখিলাম। মাথায় উষ্ণীষ, গলায় উড়ানি, গায়ে চাপকান, পরিধানে ধুতি। ইহাঁর নাম—মদনমোহন মালবী। এই ত জাতীয় বেশ। কিন্তু যখন লোকটি কথা কহিতে লাগিলেন, আমার ভ্রম হইল, পশ্চাৎ হইতে বুঝি খ্যাতনামা ডব্‌লিউ, সি, বনার্জি,—হায় রে বাঙ্গালী নামের দুর্গতি—ইংরাজি বলিতেছেন। লোকটির প্রতি আমার বড় শ্রদ্ধা হইয়াছিল। কাল হরিমোহনকে সঙ্গে করিয়া, তাঁহাকে দেখিতে যাই। তিনি হরি-

মোহনদের সহপাঠী ছিলেন। প্রায় দুই ঘণ্টা কাল দুই জনে আলাপ করিলাম, যেন দুই জনের প্রাণে প্রাণে মিশিয়া গেল। ইনি সংস্কৃত শাস্ত্রাদিতে পারদর্শী। তাহা ছাড়া অন্য অন্য ভাষাও জানেন; বাঙ্গালা পর্য্যন্ত বুঝেন। আমার নাম পূর্ব্বে জানিতেন। তিনি স্বধর্ম্মাবলম্বী, সাহিত্যানুরাগী, স্বদেশের ও স্বজাতির মঙ্গলের জন্য সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া সন্ন্যাসী হইতে প্রস্তুত। আমি যখন গীতার উল্লেখ করিলাম, তিনি আনন্দে অধীর হইয়া বলিলেন, তিনি প্রত্যহ প্রাতে এক অধ্যায় গীতা পাঠ করেন। আমাদের উভয়ের হৃদয়ের গতি এক। সেই মহাভারতীয় মহানীতির কেন্দ্রস্থলে যেমন মদনমোহন, পশ্চিমভারতের বর্ত্তমান নীতি-যন্ত্রের কেন্দ্রস্থলে—তেমনই এই মদনমোহন। ইংলণ্ডের "ওকবৃক্ষ"—অতিশয় সারবান বৃক্ষ, কিন্তু ভারতের চন্দনবৃক্ষের সৌরভ তাহাতে নাই। আমি তাঁহাকে বলিয়া আসিয়াছি যে, আমি তাঁহাতে ইংলণ্ডের "ওকের" সারবত্তার সঙ্গে, ভারতের চন্দনের সুগন্ধ দেখিবার প্রত্যাশা করি।

কানপুর।

আজ আমি কানপুরে। সৌজন্যতার প্রতিমূর্ত্তি, শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, কানপুরের খ্যাতনামা ডাক্তার, আমাকে ষ্টেশন হইতে সাদরে তাঁহার বাড়ীতে লইয়া আসেন। তিনি দাসত্ব-শৃঙ্খল চরণে ঠেলিয়া, এখানে স্বাধীনভাবে ব্যবসা করিতেছেন, কানপুরে তাঁহার বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠা। তাঁহার গৃহের নিম্নতল ডাক্তারখানা' উপরের প্রকোষ্ঠ সকল আবাসগৃহ। ডাক্তারখানা শুনিয়া তুমি হয় ত কেষ্টার-অয়েল, চিরতা ও কুইনাইন মনে

করিয়া নাক সিট্‌কাইতেছ। এ তাহা নহে, মহেন্দ্র বাবুর ডাক্তারখানা একটি ক্ষুদ্র ইন্দ্রালয়। এমন সুন্দর সুসজ্জিত বাঙ্গালীর ডাক্তারখানা কোথাও দেখি নাই। ডাক্তারখানর মধ্যে তাঁহার বসিবার কক্ষটির গবাক্ষ সকল সুরঞ্জিত চিত্র দৃশ্যাবলির দ্বারা সুসজ্জিত। কক্ষের প্রাচীরে চীনদেশীয় নরনারীর বিচিত্র চিত্র শোভিতেছে। কক্ষস্থিত দ্রব্যাদি ঝক্ ঝক্ করিতেছে। তাঁহার সঙ্গে অল্প ক্ষণ আলাপের পর এতদূর সমপ্রাণতা হইয়াছে, এবং তিনি এত আদর করিতেছেন যে, আমার কানপুর ছাড়িতে ইচ্ছা করিতেছে না।

অদ্য প্রাতে কানপুর পরিদর্শনে বাহির হই। প্রথমতঃ গঙ্গার পয়ঃপ্রণালী দর্শন করিয়া নয়ন তৃপ্ত করি। হরিদ্বারে গঙ্গার গর্ভে বাঁধ দিয়া একটি জল-স্রোত সোপানে সোপানে উর্দ্ধ হইতে এই কানপুরে আসিয়া আবার গঙ্গায় পড়িয়াছে। জগৎপ্রাণ হইতে যেন একটি মানব-জীবন-স্রোত উৎপন্ন হইয়া, আবার জগৎ-প্রাণ-গর্ভে বিলীন হইয়া যাইতেছে। এক সোপান হইতে সোপানান্তরে জলরাশি গর্জ্জন করিয়া শ্বেত-কুসুম-নিভ ফেণমালায় বিকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে, সে দৃশ্য অতি সুন্দর। তবে তুমি যখন উড়িষ্যার 'কেনাল' দেখিয়াছ, তখন তোমার ইহা তত নূতন ও চমৎকার বলিয়া বোধ হইবার কথা নহে। এই 'কেনেলের' স্রোতোবেগে পরিচালিত হইয়া, স্থানে স্থানে যে সকল ময়দার কল চলিতেছে, তাহা কিন্তু তুমি দেখ নাই।

কৃষ্ণের একটি মধুমাখা নাম 'কানাই' বা 'কান', তাহা তুমি জান। বোধ হয়, 'কান' হইতেই এ স্থানটির নাম কানপুর হইয়াছে। এরূপ পবিত্রস্থান আজ একটি শোকসিন্ধু। সিপাহী-বিদ্রোহের সময়ে যেরূপ নৃশংস দৃশ্য সকল এখানে অভিনীত হইয়াছিল, এমন আর কোথাও হয় নাই। বিদ্রোহ আরম্ভ

হইলে, স্থানীয় ইংরাজকর্ম্মচারী ও সৈন্যগণ যে স্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া, একবিংশতি দিবস অতুল সাহসে বিদ্রোহীদিগের প্রতি-কূলে আত্মরক্ষা করেন, সে স্থানটি আজ একটি মনোহর পুষ্পো-দ্যান। তাহার মধ্যস্থলে, উচ্চ সৌধ-চূড়ায় শোভিত, কারুকার্য্য-শোভিত—একটি গির্জ্জা। তাহার প্রাচীরে শ্বেত ও কৃষ্ণ মর্ম্মর প্রস্তরে, আত্মরক্ষায় যাঁহারা প্রাণ বিসর্জ্জন করেন, তাঁহাদের আত্মীয় ও সহযোদ্ধারা, তাঁহাদের স্মরণলিপি লিখিয়া রাখিয়াছেন। মাতা পিতা পুত্রের জন্যে কাঁদিতেছেন, ভগিনী ভ্রাতার জন্যে কাঁদিতেছেন, অনাথিনী বিধবা পতির জন্যে কাঁদিতেছেন। এ সকল শোকলিপি পড়িবার সময়ে, অশ্রুসংবরণ বড় কঠিন হইয়া পড়ে। একজন সৈনিক, দুর্গাবদ্ধ, প্রপীড়িত ও পিপাসাতুর রমণী ও শিশুদের জন্যে, পার্শ্বস্থিত কূপ হইতে জল আনিতে গিয়া, আহত হইয়া মৃত্যু-মুখে পতিত হন। তাঁহার শোকলিপির নিম্নে একটি কৃত্রিম কূপ গির্জ্জার মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার পবিত্র জলে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করা হইয়া থাকে। আমার ইচ্ছা হইল, এই আত্মবিসর্জ্জনের পবিত্র সলিলে দীক্ষিত হইয়া জীবন সার্থক করি। বেদীর উর্দ্ধে গবাক্ষ শ্রেণীতে নানাবর্ণের কাচে খৃষ্ট-জীবনের নানাবিধ দৃশ্য চিত্রিত রহিয়াছে। অথচ আমরাই পৌত্তলিক! কেন্দ্রস্থলে মহর্ষি খৃষ্টের ক্রুশে মৃত্যুর সেই শোকাবহ দৃশ্য চিত্রিত রহিয়াছে। এমন পবিত্র শোকচিত্র বুঝি আর নাই। চিত্রতলে একটি শ্বেতপ্রস্তরের ক্রুশ, তিনটি রক্তবর্ণ রত্নে খচিত হইয়া শোভা পাইতেছে। গির্জ্জার বাহিরে একটি সুন্দর সমাধি। যে সকল ইংরাজেরা কানপুরের শেষ যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের অস্থিরাশি এখানে প্রোথিত রহিয়াছে। যে কূপ হইতে উক্ত সৈনিক জল আনিতে গিয়া বিদ্রোহীদের হস্তে প্রাণত্যাগ করেন, সে কূপটি এখনও সেইরূপ অবস্থায় আছে।

তাহার দুই স্থানে এখনও তোপের গোলার চিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে।

২১ দিবস যুদ্ধের পর, ইংরাজগণ অনাহারে ও যুদ্ধের উপকরণ অভাবে আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইলে, বিদ্রোহনায়ক নানার হস্তে আত্মসমর্পণ করেন। নানা তাঁহাদিগকে লক্ষ্ণৌ যাইবার অনুমতি দিলে, তাঁহারা নৌকারোহণ করিবামাত্র, বিদ্রোহিগণ তীর হইতে গোলাগুলি বর্ষণ করিয়া, সমস্ত তরণী দগ্ধ ও জলমগ্ন করিয়া দেয়। যে ঘাটে তাঁহারা নৌকায় উঠেন, তদবধি উহা "বধঘাট" বলিয়া খ্যাত হইয়াছে। এই ঘাটে শিব-শূন্য একটি মন্দির এখনও বিরাজিত রহিয়াছে। মানুষ যখন হিংসা-প্রণোদিত হইয়া পশুত্ব প্রাপ্ত হয়, তখন, এরূপ পবিত্র স্থান,—মাতা ভাগীরথীর বক্ষ পর্য্যন্ত কলুষিত করিতে শঙ্কিত হয় না। মানুষ-পশুর মত এমন হিংস্র পশু জগতে নাই। এই বধঘাটে দাঁড়াইয়া আমার বোধ হইল, যেন আমি সেই হৃদয়বিদারক দৃশ্য নয়নে দেখিতেছিলাম। সেই শত শত নর-নারীর ও কুসুমার শিশুর রোদননিনাদে যেন পুণ্যতোয়া জাহ্নবীর বক্ষ প্লাবিত করিয়া, আমার কর্ণে প্রবেশ করিতেছিল। পার্শ্বে রজকেরা সারি বাঁধিয়া কাপড় ধুইতেছিল। আমি ভাবিতেছিলাম, ভারতমাতার বক্ষ হইতে কি কেহ এ কলঙ্ক এইরূপে ধুইয়া ফেলিতে পারে না?

সেখান হইতে সৈন্যনিবাসমালা অতিক্রম করিয়া, 'সবেদা কুঠি' দেখিতে যাই। এটি নানার কানপুরস্থ আবাস-গৃহ ছিল। গৃহটি এখন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। ইহার পার্শ্বে, বিদ্রোহীদের সঙ্গে ইংরেজদের কানপুরের শেষ যুদ্ধ হয়। তিন দিক হইতে তিন জন খ্যাতনামা সৈন্যাধ্যক্ষ আক্রমণ করিলে, ত্রিবেণীর তরঙ্গ-তাড়িত তৃণরাশির ন্যায়, সেনাধ্যক্ষবিহীন বিদ্রোহীরা গঙ্গার

সেতু বাহিয়া পলাইতে আরম্ভ করে। তখন প্রতিহিংসা-মত্ত ইংরাজেরা তোপের দ্বারা সহস্র সহস্র নর-নারীকে জলমগ্ন করিয়া নিহত করেন। কেবল এক পক্ষেই নৃশংসতার অভিনয় হয় নাই।

তাহার পর, মহেন্দ্র বাবু স্বয়ং আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া, কানপুরের শীর্ষঘাট দেখান। ইহাতে এক দিকে পুরুষ ও অন্যদিকে স্ত্রীলোকের স্নান করিবার স্থান নির্দ্ধারিত রহিয়াছে। অসংখ্য নর-নারী—আজ একাদশী—গঙ্গায় অবগাহন করিতেছিল। তুমি কাশীর ঘাট দেখিয়াছ। কানপুরের শীর্ষঘাট তাহার কাছে অতি ক্ষুদ্র হইলেও, দেখিতে অতি সুন্দর। সম্মুখের মিউনিসিপাল উদ্যানের উপর দিয়া ঘাটের খিলান-শ্রেণী দেখিতে অতি সুন্দর।

তাহার পর যাহা দেখিলাম, তাহা এ জীবনে ভুলিব না। একটি গৃহে আবদ্ধ করিয়া, অসংখ্য নর-নারী ও শিশুগণকে নানাসাহেবের অনুচরেরা বধ করিয়া, হত ও আহত অবস্থায়, তাহাদিগকে পার্শ্বস্থিত একটি কূপে নিক্ষেপ করে। গৃহটি এখন নাই। এরূপ পাপচিহ্ন না থাকাই ভাল। তাহার স্থানে একখানি মার্ব্বেল-ফলক মাত্র আছে; তাহার বক্ষে 'বধ-গৃহ' এই কথাটি মাত্র লেখা আছে। আর যে কূপে হত ও আহতদের নিক্ষেপ করিয়াছিল, তাহার উপর কি বিষাদময়ী মূর্ত্তিই স্থাপিত হইয়াছে! একটি অনিন্দ্যসুন্দরী, শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিতা. যুগলপক্ষবিশিষ্টা স্বর্গীয় দেবী, বক্ষের উপর হস্ত রাখিয়া, করে দুইটি তালের অস্ফুট শাখা ধরিয়া, অধোবদনে কূপের দিকে চাহিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন! মূর্ত্তিটি জীবন্ত শোক! দেখিলে হৃদয়ে কি শোক, কি পবিত্রতা সঞ্চারিত হয়, তাহার ভাষা বুঝি নাই। চারি দিকে উচ্চ প্রস্তরের "রেলিংয়ের" মধ্যে মূর্ত্তিটি রক্ষিত হইয়াছে। মহেন্দ্র

বাবুর কৃপা ভিন্ন আমি উহার ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিতাম না। সমস্ত স্থানটি ব্যাপিয়া, এখন একটি বিস্তৃত, পুষ্পবৃক্ষ-শোভিত উদ্যান। এমন হৃদয়স্পর্শী স্থান বুঝি আর জগতে নাই।

লক্ষ্ণৌ।

১

কাল সকালের ট্রেণে লক্ষ্ণৌ গিয়া, একজন ইংরাজের হোটেলে ছিলাম। তাঁহাকে আড়কাটি করিয়া, কাল সমস্ত দিন, নগর দর্শন করিয়াছিলাম। আজ আবার মহেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া তোমাকে পত্র লিখিলাম।

ভগবান্ বিশ্বরূপ, তাঁহার বিশ্বও বহুরূপী। কাল, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তাহার রূপান্তর করিতেছে। রামচন্দ্রের রাজ্যের নাম কোশল ও রাজধানীর নাম অযোধ্যা ছিল। কালে, রাজ্য ও রাজধানী, উভয়ই মোগল-সাম্রাজ্যের ছায়ায় বিলীন হইয়া যায়। ক্রমে, সেই মোগলসাম্রাজ্যে কালের ছায়া পতিত হইলে, রামরাজ্যে যিনি দিল্লীর সম্রাটের প্রতিনিধি ছিলেন, তিনি তাঁহার মস্তকোপরি স্বাধীনতার ছত্র উড়াইলেন। তাঁহার রাজ্যের নাম হইল অযোধ্যা, রাজধানী লক্ষ্ণৌ। তাঁহার রাজপ্রাসাদশিরে, স্বর্ণছত্র উড়াইয়া, তাহার নাম রাখিলেন "ছত্র-মঞ্জিল।" কালে আবার বৃটিশসিংহ কবলে করিয়া, সেই ছত্রধারীকে 'মেটিয়া-বুরুজে' বন্দী করিয়া রাখিলেন,—তিনি সেই কারাগার হইতে 'লক্ষ্ণৌ টপ্পায়' কাঁদিলেন। ভারত কাঁদিল, সেই হৃদয়দ্রবকারী শোক-সঙ্গীতে চিরদিন কাঁদিবে। বন্দী ওয়াজিদ আলি সাহার মৃত্যু হইয়াছে; তাঁহার সকল যন্ত্রণার শেষ হইয়াছে। লক্ষ্ণৌ

সহর, আজ অযোধ্যার নবাবদিগের সমাধিমাত্র। কালে সেই রাজ্যের নাম হইয়াছে "আউড্" রাজধানীর নাম "লখ্নাও"। ভারতব্যাপী বৃটিশ-ছত্রের ছায়াতে "ছত্র-মঞ্জিলের" ছত্র বিমলিন হইয়া লুকাইয়া গিয়াছে।

সিপাহি-বিদ্রোহের সময়ে লক্ষ্ণৌও একটি কেন্দ্রস্থান হইয়াছিল। চারি দিক্ হইতে সহস্র সহস্র বিদ্রোহী লক্ষ্ণৌতে সমবেত হইয়া, যে স্থানে ইংরাজ-প্রতিনিধি বা 'রেসিডেন্ট' বাস করিতেন, তাহা আক্রমণ করে। এই আবাসস্থানের নাম "রেসিডেন্সি।" স্বল্প সৈন্য এবং এ অঞ্চলের ইংরাজ নরনারী সমবেত হইয়া, ছয়মাস কাল এ স্থান রক্ষা করেন। তাহার পর, বহির্ভাগ হইতে ইংরাজ-সৈন্য আসিয়া, বিদ্রোহীদিগকে পরাজয় করিয়া, তাঁহাদিগকে উদ্ধার করে। এই ছয় মাসের দারুণ অবরোধের ইতিহাস, স্থানটির অঙ্গে অঙ্গে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। তোপের গোলাঘাতে সমস্ত গৃহাদির ছাদ ধসিয়া গিয়াছে। যে সকল দেওয়াল এখনও দাঁড়াইয়া আছে, তাহাও তোপের ও বন্দুকের গোলা গুলিতে বাহির দিক্ বোলতার বাসার মত হইয়াছে। ভিতরের দিক্ নর-শোণিতে রঞ্জিত রহিয়াছে। স্ত্রীলোকদিগকে মাটীর ভিতরে 'তয়খানাতে' রাখা হইয়াছিল। তাহার ভিতর পর্য্যন্ত একটি গোলা গিয়া, একটি রমণীর মস্তক উড়াইয়া লইয়া যায়। সেই গোলার দাগ, রমণীর শোণিতচিহ্ন, এখনও দেয়ালে আছে। ইংরাজ জাতির মধ্যে 'হেন্‌রি লরেন্সের' মত দেবতুল্য ব্যক্তি ভারতে কখন আইসেন নাই। তাঁহার হৃদয় ভারতের দুঃখে নিরন্তর দুঃখী ছিল। তাঁহার মত-অনুসারে রাজ্য পরিচালিত হইলে, বিদ্রোহ ঘটিত না। তিনি লক্ষ্ণৌ হইতে পলায়ন করিলে, আজ ভারতে ইংরাজ থাকিত কি না, সন্দেহ। কর্ত্তব্যের অনুরোধে তিনি 'রেসিডেন্সি' ছাড়েন না। যেখানে তিনি

আহত হন, যেখানে তাঁহার মৃত্যু হয়, উভয় স্থান এখনও চিহ্নিত রহিয়াছে। তাঁহার সমাধির উপর এই কয়েকটি কথা লেখা আছে—"এখানে সার হেন্‌রি লরেন্স নিদ্রা যাইতেছেন, যিনি আপন কর্ত্তব্য সাধন করিতে যত্ন করিয়াছিলেন।" কি হৃদয়গ্রাহী কথা! গৃহ সকল সেইরূপ ভগ্ন অবস্থায় রক্ষিত হইয়াছে। স্থানটি একটি উৎকৃষ্ট উদ্যানে পরিণত করা হইয়াছে। তাহার বৃক্ষচ্ছায়ায় কত বীর ও বীরাঙ্গনা নিদ্রা যাইতেছেন।

পত্রখানি এই পর্য্যন্ত লেখা হইবার পর, মহেন্দ্র বাবু বাড়ী ফিরিয়া আইসেন, এবং আমাকে সঙ্গে করিয়া বাহির হন; সুতরাং আর লেখা হইল না; পর দিবস বিঠুর যাই, সায়াহ্নে অর্দ্ধমৃত অবস্থায় আবার কানপুরে ফিরিয়া আসি। কাল কানপুর হইতে রওনা হইয়া, এইমাত্র ১৯এ মে তারিখে ১টার সময়ে, হরিদ্বার পঁহুছিয়াছি। কাল রাত্রি হইতে আহার হয় নাই। এ দিকে আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ এখানেও কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসীর মেলা হইয়া থাকে। পথে ঘাটে ভারতবর্ষের নানাস্থানীয় কুসুমরাশি ফুটিয়া যেমন মন মোহিত করিতেছে, অন্যদিকে, বাড়ী ঘর সকল এত অপরিষ্কার করিয়াছে যে, এক মুহূর্ত্ত তিষ্ঠিতে ইচ্ছা করিতেছে না। অতি কষ্টে, একটি বাড়ীর ত্রিতলে, একটি অষ্টকোণ পায়রার খোপ-বিশেষ কক্ষ পাইয়াছি। নিম্নে সুনীলা ক্ষীণ-কলেবরা মাতর্গঙ্গা, কুলু কুলু রবে বহিয়া যাইতেছেন, সংখ্যাতীত নরনারী তাহাতে অবগাহন করিতেছে। অপর পারে হিমাচল, নাট্যশালার যবনিকার মত শোভা পাইতেছেন। শরীর অবসন্ন, হৃদয়ও তোমাদের পত্র না পাইয়া ডুবিয়া রহিয়াছে; অতএব এইখানেই শেষ করিলাম। লাহোরে পঁহুছিয়া, লক্ষ্ণৌ, বিঠুর ও হরিদ্বারের বর্ণনা করিয়া, দীর্ঘ পত্র লিখিব।

লক্ষ্ণৌ।

—০—

২

আজ আবার লক্ষ্ণৌর কথা লিখিব। কিন্তু কি লিখিব? লক্ষ্ণৌ মুসলমানদের শোকসিন্ধু। রেসিডেন্সির কথা পূর্ব্বে লিখিয়াছি। তাহার পার্শ্বেই কিঞ্চিৎ দূরে 'কেশরবাগ'। একটি প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণ কল্পনা কর। তাহার চারি পার্শ্বে সারি সারি দ্বিতল ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহশ্রেণী। স্থানে স্থানে গোল ও অন্যবিধ বারাণ্ডা বাহির হইয়াছে। প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে একটি অতি পরিপাটী একতল গৃহ। বিস্তৃত খিলানাবলীর উপর সুরঞ্জিত ছাদ, সারি সারি শোভা পাইতেছে। ইহার নাম 'বারদ্বারী'। ইহার চারি দিকে পুষ্পোদ্যান। এক দিকে ভগ্ন স্নানের 'হামাম,' অন্য দিকে একটি জলপ্রণালী, তাহার উপর এক পোল। চারি দিকের অট্টালিকাতে শেখ নবাব ওয়াজিদ আলি সাহার ৩৫০ কি ৪০০ পত্নী থাকিতেন। তাহাদিগকে লইয়া, নবাব এই 'কেশর-বাগে' রাস, দোল ইত্যাদি জীবন্ত লীলা করিতেন। ইহাতে স্ত্রীলোক ও নপুংসকগণ ভিন্ন আর কেহ প্রবেশ করিতে পারিত না। এক এক কক্ষে এক একটি অতুলনীয়া রূপসী। পৃথিবীর যত স্থান রমণীর পুষ্পোদ্যান বলিয়া খ্যাত, সর্ব্বত্র হইতে এ ফুল রাশি, নবাব-বাহাদুরের ইন্দ্রিয়চরিতার্থ করিবার জন্য সঞ্চিত হইত। যখন 'কেশর-বাগের' পুষ্পোদ্যানে রমণীগণ প্রভাতে ও সায়াহ্নে বিচরণ করিতেন, মনে কর দেখি, তখন ফুলের সঙ্গে জীবন্ত ফুল মিশিয়া কি অপূর্ব্ব শোভাই হইত। কিন্তু ইহাদের

অনেকের সঙ্গে পতি-প্রবরের জীবনে এক দিনও সাক্ষাৎ হইত কি না, সন্দেহ। আমি ২।৪টি প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম। এক একটি কক্ষ, সম্মুখে একটুকু বারাণ্ডা। আমার কাছে স্থানটি বড় আরামের কি আয়েসের যোগ্য বোধ হইল না। এরূপ নরাধম ইন্দ্রিয়পরায়ণের রাজ্য থাকিবে কেন? ছলে কৌশলে বৃটিশ সিংহ বাহাদুর, গরিব নির্দ্দোষ ওয়াজিদ আলির রাজ্য কাড়িয়া লন। সিপাহিবিদ্রোহের ইহাও একটি প্রধান কারণ। যাহার উপর এরূপ অত্যাচার হইয়াছে, সিপাহিরা মনে করিয়াছিল, সে অবশ্য তাহাদের সঙ্গে যোগ দিবে। বিদ্রোহের পর, ইংরাজ বাহাদুর, অযোধ্যার তালুকদারগণকে কেশরবাগ দিয়াছেন। তাঁহারা কেহ কেহ, স্থানে স্থানে গৃহটি সংস্কার করিতেছেন, এবং সামান্য পথিকগণকে ভাড়া দিতেছেন। হায় পার্থিব গৌরবের পরিণাম! অযোধ্যার দুর্দ্দান্ত নবাব-পত্নীদিগের বিলাস স্থলে আজ কি না পান্থনিবাস! এক দিক্ ভাঙ্গিয়া প্রকাণ্ড 'কেনিং কলেজ' স্থাপিত করা হইয়াছে। এক দিকে একটি অতি উচ্চ 'গেট' রহিয়াছে। ইহার নাম 'লক্ষ্মী-দরওয়াজা'। প্রস্তুত করিতে লাখ টাকা লাগিয়াছিল। তাই নাম 'লক্ষ্মী'। অনেক দরিদ্রের 'লক্ষ্মী'র মূল্য যে লাখ টাকারও অধিক। টাকায় ত তাহার মূল্য হইতে পারে না।

তাহার পর 'বড় ইমামবারা' দেখিতে যাই। এক পার্শ্বে রুম দেশের অনুকরণে একটি প্রকাণ্ড গেট বা তোরণ। তাহার পর, ইমামবারার মূল তোরণ। তাহা পার হইয়া গেলে, এক প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণ। চারি দিকে সারি সারি কক্ষসমন্বিত প্রাচীর। এক পার্শ্বে একটি অতি প্রকাণ্ড, অতি সুন্দর মস্‌জিদ, মধ্যাহ্ন রবিকরে ধক্ ধক্ জ্বলিতেছে। প্রাঙ্গণের সম্মুখে ইমামবারা। মধ্যে একটি বিস্তীর্ণ কক্ষ। পৃথিবীতে নাকি এত বড় কক্ষ আর

নাই। তাহাতে ইমামবারা-নির্ম্মাতা জনৈক ভূতপূর্ব্ব নবাব সমাধিস্থ রহিয়াছেন। কক্ষের উপরে রক্তবর্ণ প্রস্তরের বারাণ্ডা চারিদিকে শোভা পাইতেছে। তাহাতে বসিয়া নবাব-পুর-বাসিনীগণ; নীচে যে কোরাণ পাঠ হইত, তাহা শুনিতেন। বারাণ্ডায় প্রবেশ করিবার দ্বার সকল এরূপ ভাবে নির্ম্মিত হইয়াছে যে, একটি গোলক-ধাঁধাঁ বলিলেও হয়। পথপ্রদর্শক এক জন সঙ্গে না থাকিলে পথ খুঁজিয়া পাওয়া ভার। নবাব-রমণীগণ, এখানে নাকি নবাব-পতির সঙ্গে লুকোচুরি খেলিতেন। কথাটা ঠিক্! দিল্লী হইতে চুরি করিয়া, তাঁহারা এ রাজ্য স্থাপিত করিয়াছিলেন। আর তাহা লুকাইয়া গিয়াছে। জগতের রাজত্ব ও সম্পদ্ মাত্রই এরূপ লুকাচুরি। এক জন চুরি করিয়া রাজ্য ও সম্পত্তির সৃষ্টি করে—যুদ্ধই বল, বাণিজ্যই বল, আর ওকালতিই বল,—তাহা দুই দিন পরে লুকাইয়া যায়। ইহার সুখ বা গৌরব যে স্থাপন করে, সে প্রকৃতই দয়ার পাত্র। মনুষ্যত্বই প্রকৃত সুখ। মানুষের সকলই যায়, মনুষ্যত্ব যায় না। অযোধ্যার রাজ্য নাই। বাল্মীকির কবিত্ব অমর! তাঁহার পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া, শত শত নরনারী প্রতিদিন মনুষ্যত্ব লাভ করিতেছে। কি কথায় কি কথা আনিয়া ফেলিলাম! মধ্য কক্ষের দুই পার্শ্বে অষ্ট-কোণ-সমন্বিত আর দুইটি কক্ষ আছে। তিনটি কক্ষই বহুমূল্য ঝাড় ইত্যাদিতে সজ্জিত। ইহার কিঞ্চিৎ দূরেই ছোট ইমামবারা। এটিও ঠিক্ বড় ইমামবারার মত। তবে আকৃতিতে ছোট হইলেও, দেখিতে এবং কারুকার্য্যে এটি অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট। বড় ইমামবারার প্রাঙ্গণ মরুভূমির মত। একটি বৃক্ষচ্ছায়া, একটি ফুলের চারাও নাই। কিন্তু ইহার প্রাঙ্গণে একটি সুন্দর উদ্যান রচিত হওয়াতে, স্থানটি অতীব সুন্দর ও শান্তিপ্রদ বোধ হয়।

কেশরবাগের পার্শ্বেই 'ছত্র-মঞ্জিল'। একটি নহে, পাঁচটি গৃহ লইয়া ভূতপূর্ব্ব নবাবদিগের এই বাসস্থান নির্ম্মিত। প্রধান ভবনটির শীর্ষদেশে একটি স্বর্ণছত্র বিরাজিত। তাই ইহার নাম ছত্রমঞ্জিল। ধাতুনির্ম্মিত ছত্রটি এখনও শোভিত রহিয়াছে, নিম্নস্থ গোমতীর সলিলে প্রতিবিম্বিত হইতেছে! কিন্তু সেই ছত্রধর এখন কোথায়? তাঁহার রাজ্যের যে একটি ক্ষুদ্র ছায়া মেটিয়া-বুরুজে ছিল, তাহা পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে। ছত্র-প্রাসাদের নিম্নতলের এক কক্ষ এখন সাধারণ পুস্তকালয়। উর্দ্ধতলের কক্ষ সকল শ্বেতপুরুষদের ক্লব-ভবন। অন্য একটি গৃহ এখন মিউ-জিয়ম—এ অঞ্চলের লোক বলে, 'আজায়েব ঘর'। আবার বলি, হায় পার্থিব সম্পদের ও গৌরবের পরিণাম!

তার পর, 'শাহা-নিজা' দেখিতে যাই। এটিও একটি প্রকাণ্ড সমাধিভবন। সিপাহীবিদ্রোহের সময়ে এখানে ঘোরতর যুদ্ধ হয় বলিয়া, এ স্থানটি এখন বিশেষ বিখ্যাত! এতভিন্ন, (বলা বাহুল্য) লক্ষ্ণৌতে ইংরাজদিগের পার্ক বা পঞ্চবটী উদ্যান আছে। লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের বাড়ী আছে। পুরাতন রাজপ্রাসাদ সকল দেখিয়া আসিয়া, উহা দেখিতে ঠিক্ যেন একটি কপোতের বাসা বোধ হয়। ২।৪টি ইংরাজকে, যেখানে বিদ্রোহের সময়ে হত্যা করা হইয়াছিল, তাহার উপর অবশ্য একটি স্মৃতিস্তম্ভ আছে। আর, যে শত শত নিরপরাধদিগকে ইংরাজেরা হত্যা করিয়া-ছিলেন, এখন আর তাহার চিহ্নমাত্র নাই!

রুড়কি।

আজ প্রাতে হরিদ্বার হইতে ১২টার সময়ে রুড়কি পঁহুছি। ডাকবাঙ্গলাতে যৎকিঞ্চিৎ আহার করিয়া নগরদর্শনে যাই। এইমাত্র

ষ্টেশনে আসিয়া, গাড়ীর ঘণ্টা খানিক বিলম্ব দেখিয়া, অপেক্ষা-কক্ষে বসিয়া তোমাকে পত্র লিখিতে বসিলাম। চিরদিনই তোমাকে পত্রলেখা আমার পক্ষে এক আনন্দ। তথাপি এ দূর দেশ হইতে পত্র লিখিতে যে সুখ বোধ হয়, এমন সুখ বুঝি জগতে অল্পই আছে।

পূর্ব্বদৃষ্ট স্থান সকলের কথা এখন হাতে রাখিয়া, রুড়কিতে যাহা দেখিলাম, আজ তাহাই লিখিব। সলিলস্বরূপা গঙ্গা-দেবীর শক্তি আমাদের পুণ্যশ্লোক পূর্ব্ব পুরুষেরা বুঝিয়াছিলেন। তাই সলিলশক্তির পূজা প্রচলিত করিয়াছেন। তাই বলিয়া-ছেন,— তাঁহার শক্তিপ্রভাবে ঐরাবত ভাসিয়া গিয়াছিল। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ, তাঁহারা সে শক্তি কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলেন না। মাতার প্রকৃত পূজা আমরা শিখিলাম না। গীতার কর্ম্মবাদ ঘুচিয়া, দেশে বেদান্তদর্শনের মায়াবাদ আসিল। সংসার কিছুই নহে, মায়ামাত্র। জীবন কিছুই নহে নলিনীদলগত জলমাত্র। পড়িয়া গেলেই ভাল। এ শিক্ষাও মহৎ বটে; কিন্তু জ্ঞানের এক অঙ্গমাত্র। আমরা এই এক অঙ্গকে, এই আধ্যাত্মিক জ্ঞানকাণ্ডকে সর্ব্বস্ব ভাবিয়া, প্রকৃত কর্ম্মকাণ্ড ভুলিয়া গেলাম। আমরা তাই ডুবিলাম। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বুঝিল, যে শক্তি ঐরাবতকে উড়াইতে পারে, তাহার দ্বারা কলের চাকা ঘুরাণ যাইতে পারে। অতোধিক দেখিলেন, দেশে জলাভাবে কৃষি হয় না, দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, অথচ জীবনস্বরূপা ভাগীরথীর জলরাশি বহিয়া সমুদ্রে পড়িতেছে। যেখানে গঙ্গা প্রথম তাঁহার জন্মস্থান বা পিত্রালয় হিমাচল হইতে পদতলস্থ সমতল ভূমিতে পড়িয়াছেন, সেখানে গঙ্গার পার্শ্বে হরিদ্বারে গঙ্গা অপেক্ষা গভীর-তর করিয়া খাল বা কেনেল কাটিয়া,—এ অঞ্চলে "নহর" বলে, কথাটা বোধ হয় নহর— গঙ্গার স্রোত ফিরাইয়া, জলশূন্য স্থানের

মধ্যে বহুতর স্রোত বহাইয়া, শেষে কানপুরে নিয়া, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান আবার গঙ্গার পূর্ব্ব স্রোতে ফেলিলেন। ইহাতে অন্তরবর্ত্তী স্থানসমূহে স্বর্ণ ফলিতেছে। রুড়কিতে কেনেল আসিয়া সোলানী নদীর পার্শ্বে উপস্থিত। নদীর সঙ্গে মিশাইয়া দিলে খালের জলও নদীপথে বহিয়া যাইবে। বিজ্ঞান, অদ্ভুত কৌশলে, নদীর বক্ষে প্রায় ৩ মাইল ব্যাপী এক মহাসেতু নির্ম্মাণ করিয়া, সেতুর উপর দিয়া গঙ্গার লহর বা কেনেল বহাইয়া লইয়াছে। নীচে সোলানী নদী পূর্ব্ব-পশ্চিমে বহিয়া যাইতেছে। সেতুর উপর দিয়া লহর উত্তর দক্ষিণে বহিয়া যাইতেছে। বর্ষাকালে স্থানটির যে কি শোভা হয়, বলা যায় না। ঐরাবতও ভাসিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু কেনেলের দুই পার্শ্বে দুই বিরাট সিংহমূর্ত্তি ব্রিটিশদিগের জাতীয় চিহ্ন—ভ্রূকুটী করিয়া স্রোতের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। ভগীরথ গঙ্গা আনিয়াছিলেন, তাহা উপাখ্যান। ব্রিটিশ সিংহ যে এ অঞ্চলে গঙ্গা আনিয়াছেন, তাহা স্বচক্ষে দেখিলাম। ঐরাবত ভাসিয়া গিয়াছিল, মাতা এখন ব্রিটিশ সিংহের সঙ্কেত অনুসরণ করিয়া প্রবাহিতা হইতেছেন। কেনেলের জলের বেগে, স্থানে স্থানে কল ঘুরিয়া ময়দা পিষিতেছে। এ সকলকে জলের কল বলে। তাই বলিতেছিলাম, পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা যথার্থ শাক্ত। তাহারাই শক্তির প্রকৃত পূজা করিতেছে। আমাদের পূজা কেবল পুতুলপূজাই বটে। আমরা সত্যই অন্তঃসারশূন্য পৌত্তলিক।

জল সিদ্ধ করিলে বাষ্প উঠে, জলপাত্রের মুখে আচ্ছাদন থাকিলে, তাহা ঢক ঢক করিয়া নড়িতে থাকে, একবার উঠে, একবার পড়ে—ইহা আবহমান কাল হইতে আমরা দেখিয়া আসিতেছি। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বুঝিল, এ ক্ষুদ্র শক্তিকেও বড় করিয়া মানবের বৃহৎ কার্য্য সাধিত হইতে পারে। জলপাত্রের

আচ্ছাদন ঢক ঢক, করিয়া নড়িতেছে দেখিয়া, জনৈক পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক, বাষ্পের শক্তির প্রথম আবিষ্কার করেন। আজ তাহার উত্তরাধিকারিগণ, সেই, বাষ্পের দ্বারা, বৃহৎ বৃহৎ কলের আচ্ছাদন নাড়িয়া, তদ্দ্বারা চক্রের পর চক্র ঘুরাইয়া, স্থলে শকট, জলে অর্ণবযান চালাইতেছেন। রুড়কিতে ইহা দ্বারা কর্ম্মকার ও সূত্রধরের কার্য্য করিতেছে। কলে লোহা গলিতেছে, গড়িতেছে, ছেঁচিতেছে, কাটিতেছে, এবং জগতের যাবদীয় লোহার বস্তু নির্ম্মাণ করিতেছে। আবার কলে কাঠ কাটিতেছে, রেঁদা করিতেছে, এবং এইরূপে কাষ্ঠের নানাবিধ উপকরণ প্রস্তুত করিতেছে। কল-ঘর দেখিয়া, রুড়কির ইঞ্জিনিয়ারিং কালেজ দেখিতে যাই। মধ্যস্থলে একটি গোল কক্ষ, উপরে গুম্বজ, অতি-পরিপাটী, তাহার দুই পার্শ্বে দুই গলির দুই সীমায়, আবার দুইটি ঈষৎ গোলাকার কক্ষ। অতি সুরঞ্জিত, ইঞ্জিনিয়ারিং চিত্রাদিতে সজ্জিত। বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ারদিগের মূর্ত্তি প্রকোষ্ঠ-কেন্দ্রে, এবং চিত্র দেয়ালে, শোভিতেছে। গলির দুই পার্শ্বে, ক্লাসে ক্লাসে ছাত্রেরা বসিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতেছে। গৃহটি অতি সুন্দর। আর না। গাড়ী আসিতেছে। ভরসা করি, কাল লাহোর গিয়া তোমাদের পত্র পাইব। মন আকুল বলিয়া কোথাও তিষ্ঠিতে পারিতেছি না।

বিঠুর।

আজ বিঠুরের কথা লিখিব। বিঠুরে প্রথমে নানা সাহেবের বাড়ী দেখিতে যাই। ইংরাজেরা মহারাষ্ট্র জয় করিয়া, মহারাষ্ট্র-পতি বাজিরাওকে বিঠুরে বন্দী করিয়া রাখেন। নানা ধুন্দুপন্থ

বা নানা সাহেব, তাঁহারই পোষ্যপুত্র ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর, ইংরাজ বাহাদুর তাঁহার বৃত্তির লাঘব করেন, এবং তাঁহার সহিত নানাবিধ অসদ্ব্যবহার করেন। আজিমুল্লা নামক একজন নীচবংশীয় মুসলমান যুবককে, ইংরাজ, নানার পুত্রের শিক্ষক নিযুক্ত করেন। এই ব্যক্তি শীঘ্র নানার বিশ্বাসভাজন হয়। তাঁহার পক্ষে উকিল হইয়া বৃত্তি বাড়াইবার জন্যে, বিলাতে দরবার করিতে যায়। বহুতর অর্থব্যয় করিয়া, বিফল হইয়া, দেশে আসিয়া নানাকে বলে যে, ইংলণ্ড একটি ক্ষুদ্র স্থান মাত্র। সে শীঘ্র নানাকে ভারতবর্ষের সম্রাট করিয়া দিবে। এই পাপিষ্ঠই বিদ্রোহের প্রধান কারণ। তাহার দ্বারাই কানপুরে সেই সকল শোচনীয় হত্যাকাণ্ড হয়। নানা অতি ধর্ম্মাত্মা লোক ছিলেন, তিনি ইহার কিছুই জানিতেন না। বিদ্রোহের সময়ে, ইংরাজেরা নানার বাড়ী তোপে উড়াইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার হাতার প্রাচীর এবং তোরণটি মাত্র এখন অবশিষ্ট আছে। দেখিলে, হৃদয়ে যুগপৎ শোক ও দয়ার উদয় হয়। মহারাষ্ট্রপতির সঙ্গে বহুতর মহারাষ্ট্র এ অঞ্চলে আসিয়াছিল। আজ তাহারা অন্নাভাবে হাহাকার করিতেছে।

তাহার পর, ধ্রুব-ঘাট দেখিতে যাই। প্রবাদ, এখানে ধ্রুব তপস্যা করিয়াছিলেন। পার্শ্বে একটি প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ বিধৌত করিয়া, গঙ্গা প্রবাহিতা হইতেছেন। এখান হইতে ঘাটের সারি লাগিয়াছে। কার্ত্তিকপৌর্ণমাসীর মেলা উপলক্ষে, অদ্য গঙ্গাসলিল-বিধৌত কামিনীকুসুমরাশির অতুলনীয় শোভা। ব্রহ্মাবর্ত্তের ঘাটে যাই। এখানে একটি লোহার শলাকা প্রস্তর-গ্রথিত রহিয়াছে। ইহাকে ব্রহ্মাবর্ত্তের খুঁটা বলে। আর্য্যগণ প্রথম যখন ভারতে উপনিবেশ সংস্থাপন করেন, বোধ হয়, এই পর্য্যন্তই ব্রহ্মাবর্ত্তের সীমা ছিল। তাহার পরে আর্য্যাবর্ত্ত। শেষ

যে ঘাটে লক্ষ্মণ কাঁদিতে কাঁদিতে মাতা জানকীকে বনবাসে রাখিয়া চলিয়া যান, যেখানে মহর্ষি বাল্মীকি তাঁহাকে পাইয়া আশ্রমে লইয়া যান, সেই ঘাট দেখি। স্থানটি দেখিবামাত্র—যদিও দেখিবার কিছুই নাই, একটি সামান্য ঘাটমাত্র—স্মৃতির উচ্ছ্বাসে আমার চক্ষু অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া উঠে। তাহার পর, জগতের কবিগুরু মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রম। কবিতার জন্মস্থান, মহাকাব্যের জন্মস্থান, ভারতের অতুলনীয় রামায়ণের জন্মস্থান, রামসীতার যে চরিত্রবলে তাঁহারা চিরদিন দেবদেবীস্বরূপ পূজিত, সেই চরিত্রের জন্মস্থান দেখিয়া, যে ভক্তি ও শান্তির উদ্রেক হইল, তাহা ভাষায় প্রকাশ করিবার শক্তি আমার নাই। স্থানটি এখন কথঞ্চিৎ অরণ্য, পিলোয়া বৃক্ষে ও তেঁতুল ইত্যাদিতে সমাচ্ছন্ন। গঙ্গার তরঙ্গাভিঘাতে বালুকাস্তর স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র পর্ব্বতাকার ধারণ করিয়াছে। প্রবাদ, এইরূপ একটি ক্ষুদ্র বালুকাস্তূপে, মহর্ষির আশ্রম কুটীর ছিল। এরূপ পবিত্র স্থানে কোথায় একটি দেবতুল্য মহর্ষিমূর্ত্তি দেখিব, না নিকৃষ্ট লিঙ্গ-উপাসকেরা এক শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া, তাহার উপর এক সামান্য মন্দির স্থাপন করিয়াছেন। পার্শ্বে যেখানে সীতাদেবীর কুটীর ছিল, সেখানে একটি অতি কদর্য্য মূর্ত্তি আছে। কিঞ্চিৎ দূরে একটি ক্ষুদ্র ইষ্টকগৃহে তাঁহার এবং রামচন্দ্রাদির মূর্ত্তি রক্ষিত হইয়াছে। সীতাদেবীর শ্বেতপ্রস্তরের মূর্ত্তিটি অতি সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী। পবিত্র আশ্রমমূল প্রক্ষালিত করিয়া, এখানে শৈলসুতা প্রবাহিতা হইতেছেন। বাল্মীকি যদি ইংরাজদের কেহ হইতেন, তবে আজ আমরা এখানে বাল্মীকির মূর্ত্তিসমন্বিত একটি প্রকৃত আশ্রম দেখিতাম, এবং পদে পদে কালিদাসের আশ্রমের বর্ণনা মনে পড়িত। বাল্মীকির দুর্ভাগ্য, তিনি আমাদের বাল্মীকি। তথাপি দ্বারভাঙ্গার মহারাজার তাঁহার প্রতি

কিঞ্চিৎ কৃপা কটাক্ষ পড়িয়াছে। তিনি তালার উপর তালা তুলিয়া, একটি কবুতরের বাসার মত অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইতেছেন। পার্শ্বে একটু পুষ্পোদ্যানও দেখিলাম। গৃহটি দেখিয়া আমার বোধ হইল যে, মহারাজের উদ্দেশ্য যে, উহার চূড়া দূর হইতে দেখা যাইবে, এবং তদ্দ্বারা বাল্মীকির না হউক, তাঁহার নাম ঘোষিত হইবে। বাল্মীকি এক অমর অদ্বিতীয় মহাকাব্য লিখিয়াও, কোথাও আপনার নাম সন্নিবেশিত করেন নাই। আর মহারাজ যে তাঁহার আশ্রমে সামান্য একটি গৃহ নির্ম্মাণ করিতেছেন, তাহাতেও সর্ব্বাগ্রে নামের জন্যে লালায়িত। হায় রে আমাদের দুর্গতি!

এ অবধি যত স্থান দেখিয়াছি, কোনও স্থান তোমাকে দেখাইতে ইচ্ছা হয় নাই। কেবল মহর্ষির পবিত্র আশ্রমে দাঁড়াইয়া, জাহ্নবীর দিকে চাহিয়া মনে হইল, তুমি সঙ্গে থাকিলে কত সুখ হইত; অথচ, এ পুণ্য তীর্থটি কোনও বিদেশীয় যাত্রিক দর্শন করে না। এ দিকে ভারতবর্ষে এমন ঘর নাই, যেখানে রামায়ণ নাই, যেখানে রামসীতার পূজা নাই। কয় জনে বুঝে, এ পূজা বাল্মীকির অদ্ভুত প্রতিভার? মহর্ষির কৃপা ভিন্ন আজ রামসীতাকে কে চিনিত?

লাহোর।

তোমার পত্রের জন্য ব্যাকুল হইয়া আমি হরিদ্বার কি রুড়কিতে তিষ্ঠি নাই। ঊর্দ্ধশ্বাসে আসিয়া আজ প্রাতে লাহোরে পৌঁছিয়াছি। লাহোরে প্রথম মিউজিয়ম দেখি। বিশেষ কিছু বলি-

যার নাই। সম্মুখে বিখ্যাত ঝমঝম তোপ। হিন্দু ও শিখদিগের সময়ের এইটি সাম্রাজ্যের প্রধান লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত। ইংরেজদের সঙ্গে চিলেনওয়ালার যুদ্ধেও শিখেরা এই প্রকাণ্ড তোপ ব্যবহার করিয়াছিল। তোপটি পিতলের, দেখিতে অতি সুন্দর। তাহার পর সার জন লরেন্সের প্রস্তরের মূর্ত্তি। ইঁহাকে ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ ভারতবর্ষের ত্রাণকর্ত্তা বলেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে, ইনি পাঞ্জাবের লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর ছিলেন। তাঁহার নির্ভীকতা ও বুদ্ধিপ্রভাবে, পঞ্জাব বিদ্রোহে যোগ দেয় নাই। তাহাতেই কণ্টকের দ্বারা কণ্টক উদ্ধৃত হয়, শিখদের দ্বারা সিপাহিরা পরাভূত হয়। তাঁহার এক হস্তে কলম, অন্য হস্তে তরবার, বীরভাবে দণ্ডায়মান।

তাহার পর, "সালেমার বাগ" দেখিতে যাই। সম্রাট সাহাজাহান এক দিন স্বপ্নে স্বর্গ দেখেন। এ তোমার আমার স্বপ্ন নহে, সম্রাটের স্বপ্ন, তাহা বিফল হইতে পারে না। সেই স্বপ্ন-দৃষ্ট স্বর্গ সৃষ্টি করিবার জন্য আদেশ প্রচারিত হইল। মুসলমানদের স্বর্গ সপ্তস্তরবিশিষ্ট। তদনুসারে সপ্ত স্তরে সজ্জিত "সালেমার" উদ্যান প্রস্তুত হইল। ইংরাজ বাহাদুর ঘোরতর পার্থিব সুখপরায়ণ। অতএব স্বর্গের উপরের সিঁড়ী চারি স্তর ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া, নিম্নের তিনটি স্তরমাত্র রক্ষা করিয়াছেন। মরি! মরি! কি কল্পনা! কি দৃশ্য! স্তরে স্তরে এই তিন স্তর মাটির ভিতর নামিয়াছে! প্রথম স্তরে 'গেট' পার হইলে, তাজমহলের সম্মুখে যেরূপ জল-প্রণালী আছে, সেইরূপ। তাহার দুই পার্শ্বে রাস্তা, রাস্তার দুই দিকে সুফল বৃক্ষের উপবন। তাহার পর একটি সুন্দর বসিবার ঘর, সম্মুখে একটি কৃত্রিম সরোবর। মধ্যস্থলে একটি বসিবার স্থান, অতি সুন্দর। সরোবরের দুই পার্শ্বে উপবন। তৃতীয় স্তরে আবার জলপ্রণালী ও উপবন। প্রণালীতে

ও সরোবরে, সর্ব্বত্র, সংখ্যাতীত ফোয়ারা খেলিতেছে। স্থানটি কি সুশীতল ও শান্তিপ্রদ!

পর দিবস "সাহাদঁরা" দেখিতে যাই। এটি সম্রাট জাহাঙ্গীরের সমাধিগৃহ। শুনিলাম, নুরজাহান ইহা পতিভক্তির নিদর্শনস্বরূপ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। গৃহটি দেখিতে যেন একটি অতি প্রকাণ্ড বৈঠকখানা বাড়ী। কোথাও মুসলমানের সমাধির গুম্বেজ নাই। চারি কোণে বহুতল কক্ষবিশিষ্ট, চারিটি উচ্চ স্তম্ভ। তুমি তাজমহলে এরূপ দেখিয়াছ। তাহার উপর হইতে দূরস্থ লাহোরের ও নিম্নস্থ রাবীনদীর শোভা দেখিতে অতি মনোহর। ফিরিয়া আসিবার সময়, কয়েকটি মসজিদ ও রণজিৎ সিংহের— যাঁহাকে ইংরাজেরা পঞ্জাবের সিংহ বলেন,—সমাধি দেখিলাম। এটি গৌরবের সমাধি বলিলেও হয়। এই সিংহের ঘরে, হা বিধাতঃ। কি কেবল শৃগাল জন্মিল? তাঁহার শেষটি আজ রুষিয়াতে ভিক্ষা করিয়া জীবনযাপন করিতেছেন।

তাহার পর লাহোরের দুর্গ দেখিলাম। যে সকল গৃহে রণজিৎ থাকিতেন, তাঁহার সেই প্রিয় শিখ-মহল এখনও বর্ত্তমান। তুমি হাজারি-আয়না দেখিয়াছ। মনে কর, কতকগুলি কক্ষের ভিতরের প্রাচীর ও ছাদ, সেইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আয়নার দ্বারা খচিত। একটি গৃহে শিখদিগের নানাবিধ অস্ত্র সজ্জিত রহিয়াছে। তাহাদের বর্ম্ম বা বক্ষস্ত্রাণ ও পৃষ্ঠত্রাণ দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। এ গুলি ধাতুময় এবং ওজনে এক একটি ২০।৩০ সেরের কম হইবে না। এই ভার অলঙ্কারের স্বরূপ ব্যবহার করিয়া, যাহারা সেই বিস্ময়কর যুদ্ধ সকল করিয়াছিল, জানি না, তাহারা কি অসাধারণশক্তিসম্পন্ন লোকই ছিল। তাহারা কত প্রকারের অস্ত্র, বন্দুক ও তোপই প্রস্তুত করিয়াছিল! আমার চক্ষে জল আসিল, আর মনে হইল,—যুবরাজ! আজি সে জাতি কোথায়?"

লিখিতে ভুলিয়াছি যে, জাহাঙ্গীরের সমাধি দেখিয়া আসিবার সময়ে, তাঁহার প্রিয়তমা মেহের-উন্-নেসা' (অর্থ, স্ত্রীজাতির চন্দ্র) বা নুরজাহান (অর্থ, পৃথিবীর আলোক) সুন্দরীর সমাধি দেখিয়া আসি। তুমি জান, নুরজাহান তখন ভারতবর্ষের অদ্বিতীয়া সুন্দরী ও অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্না রমণী বলিয়া, তাঁহার স্বামী সের আফগানকে বধ করিয়া, জাহাঙ্গীর তাহাকে বিবাহ করেন। একটী গল্প শুনিলাম। এক জন কবি তাঁহাকে দেখিবার জন্য, বহুদূর হইতে আসিয়া, রাজপথের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে। যখন তাঁহার গাড়ী চলিয়া যায়, সে বলিয়া উঠিল,—

খোল আবরণ, বহু দূর হ'তে
এসেছি দেখিতে মুখ।

নুরজাহান উত্তর করিলেন, তাও কবিতায়,—

খুলিলে; ভূতলে উদিবে চন্দ্রমা,
তারাগণ পাবে দুখ।

এ হেন রমণীরত্নের সমাধিটি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। দেখিয়া মনে যে কি কষ্ট হইল, বলিতে পারি না। উপরের কবর পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। নিম্নের কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, রাবীর বন্যাস্রোত প্রবেশ করিয়া, সেখান হইতেও কবরের চিহ্ন পর্য্যন্ত ধুইয়া লইয়া গিয়াছে। বঙ্কিমবাবু যথার্থই নুরজাহানের মুখে বলিয়াছেন, 'এ রূপের ছাঁচ কবরের মাটীতে থাকিবে।' সেই রূপের, সেই প্রতিভার চিহ্ন বহুদিন লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু, অবস্থার ঘূর্ণচক্রে পড়িয়া. এই ভুবনমোহিনী যে পাপে লিপ্ত হইয়াছিলেন, রাবীরও সাধ্য নাই যে, তাহা ইতিহাস হইতে মুছিয়া ফেলে।

অমৃতসার।

তোমাকে অমৃতসরের কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। লাহোর হইতে দিল্লী আসিবার সময়ে, পথে অমৃতসর দর্শন করি। প্রতুল, তাঁহার একজন মুন্সীকে আমার সঙ্গে দিয়াছিলেন। আমার গাড়ীস্থিত জনৈক পঞ্জাবী যুবক,—পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বি-এ,—উক্ত মুন্সীর কাছে আমার কথা শুনিয়া বড় আগ্রহের সহিত আমার সঙ্গে আলাপ আরম্ভ করে। তাহার নাম হরিচন্দ। তাহার পিতা ডেপুটী কালেক্টর, ভ্রাতা অমৃতসরের তলশিল-দার, সে নিজেও এবার ডিপুটী-কালেক্টরী পরীক্ষা দিয়াছে। প্রতুলের বাসায় ঠিক যেন আমি কলিকাতায় ছিলাম। বাঙ্গালা কথা, বাঙ্গালী আহার, বাঙ্গালী ব্যবহার। আমি প্রতুলকে বলিতাম যে, ইহার জন্য আমার পাঞ্জাব আসিয়া কি ফল? কিন্তু প্রতুল-ভায়ার সময় নাই যে, আমাকে কোনও পঞ্জাবীর বাড়ী লইয়া গিয়া, পঞ্জাবের আচার ব্যবহার দেখান। অতএব এ যুবকের সহিত আমিও আগ্রহের সহিত আলাপ করিলাম। ফল এই হইল, অমৃতসরে গাড়ী পঁহুছিবার পূর্ব্বেই, সে আমাকে পাইয়া বসিল। সে আমাকে সঙ্গে করিয়া, সমস্ত অমৃতসর দর্শন করায়, এবং তাহার বাড়ীতে আহার করায়;—সে আহারে বেশ নূতনত্ব আছে। গোলাকার এক চৌকির উপর বসিলাম, এবং গোলাকার আর এক চৌকিতে রুটী, ডাল, তরকারী এবং মাংস প্রভৃতি আহারীয় সামগ্রী প্রদত্ত হইল। আমি বড় আনন্দে খাইলাম। লোকটি এত ভালবাসা জানাইল যে, গাড়ী ছাড়িবার সময়েও আমার হাত তাহার হাতে গাঁথা ছিল। অথচ, এ দিকের বাঙ্গালীরা বলেন যে, এ দেশস্থ লোকেরা তাঁহাদিগকে ঘৃণা করে; তাই তাঁহারা তাহাদের সঙ্গে মিশেন না।

অমৃতসরে প্রথমে বিখ্যাত স্বর্ণ-মন্দির দেখিতে যাই। ইহাকে শিখেরা "দরবার সাহেব" বলে। 'তুমি বেহারের "পাত্তপুরীর" দৃশ্যটি স্মরণ কর। ' একটি বৃহৎ সরোবর। ইহারই নাম অমৃতসর। তাহার চারি তীরে, সারি সারি দ্বিতল ত্রিতল অট্টালিকা। শুনিলাম, একটিতে রোগী ভিন্ন আর কেহ প্রবেশ করিতে পারে না; এখানে, রোগী ধন্না দিলেই রোগ আরোগ্য হয়।

অমৃতসরোবরের মধ্যস্থলে সলিল-গর্ভে স্বর্ণ-মন্দির, চতুর্থ শিখগুরু রামদাস কর্তৃক ৩০০ শত বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হয়। মন্দিরটি অনতিবৃহৎ হইলেও, সৌন্দর্য্যে অতুলনীয়। উহার স্বর্ণে সমাচ্ছন্ন দেহ ও উচ্চ গুম্বেজ, মধ্যাহ্নরবিকরে প্রদীপ্ত অগ্নিবৎ ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছিল। নয়ন ঝলসিয়া যাইতেছিল। অন্তর্ভাগও স্বর্ণ কারুকার্য্যে এবং স্থানে স্থানে মূল্যবান্ পান্না, মরকত, হীরক ইত্যাদি দ্বারা খচিত। স্তম্ভসারি দ্বারা শোভিত মধ্যকক্ষে, গুরুগোবিন্দের রচিত গ্রন্থদ্বয় বহুমূল্য আবরণে আচ্ছাদিত রহিয়াছে, এবং বহুমূল্য চামরে উভয় পার্শ্ব হইতে ব্যজনিত হইতেছে। এক দিকে বসিয়া দুই জন গায়ক গাহিতেছে। যাত্রী নর-নারী কক্ষের চারি দিক প্রদক্ষিণ করিতেছে। দ্বিতল গৃহে, গুরুগোবিন্দের যোদ্ধৃবেশে অশ্বারূঢ় একটি চিত্র রক্ষিত হইয়াছে। সেখানে রণজিৎ সিংহেরও একটি চিত্র আছে। মন্দিরের প্রবেশদ্বারের উপরিভাগে, গুরু নানকের একটি মূর্ত্তি স্বর্ণে খোদিত রহিয়াছে। এক দিকে মর্ম্মর সেতুর দ্বারা মন্দিরটি সরোবরের তীরের সঙ্গে সংযুক্ত রহিয়াছে। শুনিলাম, জাহাঙ্গীর ও তাঁহার অদ্বিতীয়া রূপসী পত্নী নুরজাহানের সমাধি ও সালেমার উদ্যান হইতে বহুমূল্য মর্ম্মর ও রত্ন ইত্যাদি আনীত হইয়া, এই মন্দির নির্ম্মিত ও সজ্জিত

হইয়াছিল। নুরজাহানের সমাধির বর্ত্তমান, দুরবস্থার ইহাই প্রধান কারণ। শুনিয়া আমি দীর্ঘনিশ্বাস সংবরণ করিতে পারিলাম না। এই ধার্ম্মিক ও বীর-পুরুষেরা, কিরূপে যে এতাদৃশ হৃদয়হীন কার্য্য করিয়াছিলেন, আমি বুঝিতে পারিলাম না।

শিখদিগের ধর্ম্মের স্রষ্টা নানক। ইনিই ইহাদের প্রথম গুরু। গুরু গোবিন্দ দ্বিতীয় গুরু। ইনি ঘোরতর যোদ্ধা ছিলেন। নানক-প্রচারিত ধর্ম্মে ও গীতোক্ত ধর্ম্মে, আমি বড় প্রভেদ দেখিলাম না। শিখেরা জাতিভেদ মানে না, আহারসম্বন্ধে কোনও রূপ ধরা-বাঁধা নাই। তাহারা কোনও ধর্ম্মের বিদ্বেষী নহে, একমাত্র নারায়ণের উপাসনা করে, এবং গ্রন্থ দু'খানির পূজা করে। আমার ধারণা হইয়াছে যে, গুরু নানক, বিলুপ্ত গীতোক্ত ধর্ম্মই প্রচার করেন। নানক শিখদিগের কৃষ্ণ, রণজিৎ সিংহ অর্জ্জুন, এবং "যুদ্ধস্ব বিগত জ্বর"ই ইহাদের মূল মন্ত্র। এই মন্ত্র সাধিয়া, ধর্ম্মবলে কর্ম্মকে বলবান্ করিয়া, অমিতপরাক্রমে ইহারা পঞ্জাবে মোগলসাম্রাজ্যের বক্ষের উপর, শিখরাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং এই মন্ত্রবলেই, শিখেরা ভারতীয় ইতিহাসে, অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

মন্দিরদর্শনের পর, আমি 'গোবিন্দগড়' দুর্গ দেখিতে যাই। এ দুর্গ রণজিৎ সিংহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কলিকাতার দুর্গের মত, ইহা দেখিতে একটি প্রসারিত-দল পদ্মের মত। তাহার পর নগর দর্শন করি। অমৃত-সর নগরও রণজিৎ কর্ত্তৃক স্থাপিত, দেখিতে অতি সুন্দর। একটি দোকানে গিয়া, কিরূপে শাল প্রস্তুত হয়, তাহা দেখিলাম। স্বতন্ত্র স্থানে আলোয়ান প্রস্তুত হয়। সেই আলোয়ানের উপর, এই সকল দোকানে কারুকার্য্য করা হয়। এক এক বর্ণের সূতা, এক এক জন

কারীকরের হাতে। এক জন কারীকর, একখানি শালের ফুলের সর্ব্বত্রে কাল স্থতার কার্য্য করিতেছে, আর এক জন তাহাতে লাল স্থতার কার্য্য করিতেছে। স্থচের দ্বারা কি স্থক্ষ্মভাবে এবং কি পরিশ্রমের সহিতই কার্য্য করিতে হয়। একখানি 'দোরোখা শাল' দেখিলাম। ইহার দুই পিঠেই রোখ। আমি এরূপ শাল দেখিনাই। মূল্য ২০০৲ টাকা বলিল। এরূপ এক যোড়া শাল লইতে আমার বড়ই ইচ্ছা হইল! কারীকরদের বেতন ৭৲। ৮৲ টাকা হইতে ২০৲ পর্য্যন্ত।

তাহার পর, অমৃতসরের উদ্যান এবং প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সের জন্য যে গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা দেখিয়া, অমৃতসর দর্শন শেষ করিলাম। আমি এখানে ৬। ৭ ঘণ্টামাত্র ছিলাম।

ইন্দ্রপ্রস্থ।

দিল্লীর কথা তোমাকে আমি আর নূতন করিয়া কি লিখিব? "বিশপ হিবার" হইতে "নীহারিকা"-রচয়িত্রী পর্য্যন্ত, যিনি দিল্লী আগ্রা দেখিয়াছেন, তিনিই তাহার বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তুমিও তাহা অনেক বার পড়িয়াছ। অতএব দিল্লীর কথা আমি আর নূতন করিয়া কি লিখিব? দিল্লী, হিন্দু-সাম্রাজ্যের মহাশ্মশান, মুসলমান সাম্রাজ্যের মহা সমাধি, মহাকালের মহা রঙ্গভূমি। শ্মশানের ছাই উড়িয়া গিয়াছে, যমুনার পবিত্রজলে প্রক্ষালিত হইয়া গিয়াছে। সমাধির প্রস্তুররাশিতে দিল্লী আজ সমাচ্ছন্ন। বর্ত্তমান দিল্লী হইতে পুরাতন দিল্লী পর্য্যন্ত পঞ্চ ক্রোশ স্থান ব্যাপিয়া, কেবল সমাধির পর সমাধি, তাহার পর সমাধি। যে

দিকে চাহিবে, দেখিতে পাইবে—"ঘোরারাবী, মহারৌদ্রী, শ্মশানালয়বাসিনী," ধ্বংসরূপিণী,—মহাকালী, দিগম্বরীবেশে নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছেন। ধ্বংসগত সাম্রাজ্য সকলের ভস্মের নীরবতার মধ্য হইতে যেন জননীর ঘোর অট্টহাস্য ভাসিয়া উঠিতেছে। দিল্লীতে পা দিয়াই আমার সেই বাইরণের মহাকাব্য স্মরণ হইল ;—

"দাঁড়াও। চরণ তব সাম্রাজ্য ধূলায়।
"দুইটি সাম্রাজ্য নীচে রয়েছে প্রোথিত !"

দিল্লী যত দেখিতে লাগিলাম, তত অন্য একজন কবির আক্ষেপ মনে পড়িল,—

"বীরত্বের গর্ব্ব আর প্রভুত্ব বিভব,
"সম্পদ সংসার সব যাহা করে দান,
অলঙ্ঘ্য মৃত্যুর হায়। মুখাপেক্ষী সব,
'গৌরবের পথ মাত্র মৃত্যুর সোপান।"

সর্ব্ব প্রথম হিন্দুর শ্মশানের কথা বলিব, কারণ হিন্দু সাম্রাজ্য সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। হিন্দু সাম্রাজ্য, ভগবান্ কৃষ্ণের কীর্ত্তি,—যুধিষ্ঠিরের সাম্রাজ্য,—উপন্যাসের কথা নহে, কাব্যকারের সৃষ্টি নহে। ইন্দ্রপ্রস্থের রাশি রাশি ভগ্নাবশেষ, স্তূপাকারে, বর্ত্তমান দিল্লীর এক ক্রোশ দক্ষিণে এখনও বর্ত্তমান আছে। লোকেরা ইহাকে এখনও ইন্দ্রপাট বলে। যুধিষ্ঠিরের রাজপুরীর দুর্গ এখনও বর্ত্তমান আছে। বলা বাহুল্য, কালে উহা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। প্রথম যবন সম্রাটেরা ইহার সংস্কার করেন। দুর্গের এক কোণে ভগ্ন রাজপুরীর প্রস্তররাশিতে নির্ম্মিত, এক উচ্চ মসজিদ এবং তাহার পার্শ্বে আর একটি অতি সুন্দর, গোল, ত্রিতলকক্ষসমন্বিত, স্বল্পায়তন গৃহমাত্র বর্ত্তমান আছে। হিন্দু রাজপুরীর প্রস্তরে নির্ম্মিত মুসলমান রাজপুরীও আবার কালে ধ্বংস হইয়া

গিয়াছে। দ্বিতীয় গৃহের ত্রিতল কক্ষে বসিয়া, যমুনার শীতল সমীরণ সেবন করিতে করিতে, প্রথম মোগল সম্রাট হুমায়ুন অধ্যয়ন করিতেন। ইহার তৃতীয় সোপান হইতে পড়িয়া, তাঁহার অপমৃত্যু হয়। মোগল রাজ্য, তাঁহার পুত্র, প্রাতঃস্মরণীয় আকবর আগ্রায় তুলিয়া লইয়া যান। ইন্দ্রপ্রস্থের দ্বিতীয়বার কপাল ভাঙ্গিল। ইদানীং ইহাতে একটি গ্রাম বসিয়াছে। বহুবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইষ্টকগৃহও নির্ম্মিত হইয়াছে। যেখানে সেই বিচিত্র রাজপুরী, সেই অতুলনীয়, ময়দানবের নির্ম্মিত সভাগৃহ ছিল, আজ সেখানে দরিদ্রের কুটীরসমূহ বিরাজ করিতেছে। ভগবানের সেই অমানুষিক লীলার কেন্দ্রস্থান ইন্দ্রপ্রস্থের এই দশা। মসজিদের ছাদের প্রস্তরে বক্ষ রাখিয়া, পুরাতন দুর্গের প্রাচীর দেখিয়া দেখিয়া শোকের ও ভক্তির উচ্ছ্বাসে আমি কাঁদিলাম। হয় ত, এ স্থানে এখনও সেই নরোত্তমের পদধূলি পড়িয়া আছে,—প্রহ্লাদের মত তাহা অঙ্গে মাখিয়া, এই অকিঞ্চিৎকর মানবজীবন সার্থক করি! সকলই গিয়াছে, কেবল এখনও দুর্গের পদমূল ভক্তিভরে প্রক্ষালন করিয়া, যমুনা দেবী শোকে নীরবে বহিয়া যাইতেছেন। আজ এই পর্য্যন্ত।

পুরাতন দিল্লী।

ইন্দ্রপ্রস্থের কথা লিখিয়াছি। যে অমানুষিক প্রতিভাবলে ভারতে মহাভারত স্থাপিত হইয়াছিল, প্রভাসতীরে অকালে তাহার তিরোধান হইলে, সেই ধর্ম্মরাজ্যের ভিত্তি এরূপ দৃঢ়ভাবে ধর্ম্মে স্থাপিত হইয়াছিল যে, তাহা কিছু কালের জন্যে কিঞ্চিৎ চঞ্চল হইলেও, বহু শতাব্দী ব্যাপিয়া স্থায়ী হইয়া, ভারতে সুখ ও শান্তির

বিধান করিয়াছিল। কালে গীতার ধর্ম্ম লুপ্ত হইল। অনন্তজ্ঞান-সম্পন্ন শাস্ত্রকারদের জ্ঞানান্ধ উত্তরাধিকারিগণ, ভারতের শক্তি জাতিভেদ-শৃঙ্খলে দৃঢ়রূপে বাঁধিলেন। ধর্ম্ম কেবল যাগযজ্ঞে এবং নরহত্যা ও জীবহত্যায় পরিণত হইল। আবার সেই অবস্থা,—

"যখন যখন ঘটে ভারত! ধর্ম্মের গ্লানি,
অধর্ম্মের অভ্যুত্থান, আপনাকে সৃজি আমি।
সাধুদের পরিত্রাণ, বিনাশ দুষ্কৃতদের
করিতে সাধন,
স্থাপন করিতে ধর্ম্ম, করি আমি যুগে যুগে
জনম-গ্রহণ।"

আবার ভগবান্ জন্মগ্রহণ করিলেন। ভগবান্ বুদ্ধদেব এক ফুৎকারে জাতিবন্ধন উড়াইয়া দিয়া, সাম্যগীতে ভারত প্লাবিয়া, গীতার কর্ম্মবাদ ঘোষণা করিলেন। ভারত নবজীবন পাইয়া নাচিয়া উঠিল। আবার অশোকের ধর্ম্মরাজ্য স্থাপিত হইল। অসংখ্য শৈলস্তম্ভ, বৌদ্ধ ধর্ম্মনীতি বক্ষে ধারণ করিয়া, ভারত ব্যাপিয়া, ধর্ম্মরাজ্য ঘোষণা করিল। কিন্তু জগতের পরিবর্ত্তননীতি অলঙ্ঘ্য। উন্নতি না হইলে অবনতি হইবে। জগৎ স্থির থাকিতে পারে না। আবার জ্ঞানান্ধ বৌদ্ধ যাজকের হস্তে পড়িয়া, বৌদ্ধ-ধর্ম্ম অন্তঃসারশূন্য হইল। ভগবান্ আবার জন্মগ্রহণ করিলেন। শঙ্করাচার্য্য, অদ্বৈত শৈববাদে ভারত মাতাইয়া তুলিলেন। ভারতে তৃতীয় বার ধর্ম্মসাম্রাজ্য স্থাপিত হইতে চলিল। চৌহান পৃথ্বীরাজ ইহার শক্তি। ইন্দ্রপ্রস্থের চারি ক্রোশ উত্তরে, যমুনা-তীরে তাঁহার রাজধানী স্থাপিত হইল। তাহারই নাম দিল্লী। পৃথ্বীরাজের দুর্গের প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ এখনও বর্ত্তমান আছে। তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভ বা কুতুব মিনার, এখনও বর্ত্তমান আছে। নূতন দিল্লীর বহির্ভাগে, এখনও তাঁহার নীতিস্তম্ভ দুইটি বিরাজ

করিতেছে। পুরাতত্ত্ববিৎ ইংরাজ বলেন, কুতুব মিনার কুতুবুদ্দিনের নির্ম্মিত। মোল্লাগণ ইহার সানুদেশে দাঁড়াইয়া, "আজাহার" দিবে বলিয়া, নির্ম্মিত হইয়াছিল। হিন্দুরা বলেন, পৃথ্বীরাজের কন্যা যমুনা দর্শন করিবেন বলিয়া, এই স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই দুইটি প্রবাদের কোনটিই ঠিক বলিয়া বোধ হয় না। এই পর্ব্বতবৎ উচ্চ স্তম্ভে উঠিলে, কথা কহিবার শক্তি থাকে না! অতএব মোল্লা সাহেবগণ এত সোপান বহিয়া উঠিয়া যে আজাহার দিতে পারিতেন, এমন বোধ হয় না। বিশেষতঃ পার্শ্বস্থিত বিপুল কারুকার্য্যখচিত, বিচিত্র, অতুলনীয় হিন্দু দেবালয় ভগ্ন করিয়া, যে মসজিদ নির্ম্মিত হইতেছিল, তাহা শেষ হয় নাই। মসজিদের পূর্ব্বে আজাহারের স্থান নির্ম্মিত হওয়া সম্ভবপর নহে। অন্য দিকে, অনতিপরিস্ফুটিতা, কুসুমকোমলা, পৃথ্বীরাজ-দুহিতা যমুনাদর্শনের জন্য যে এত সোপান বাহিয়া উঠিবেন, তাহাও সহজে বিশ্বাস করা যায় না। আমার বোধ হয়, চিতোরে যেরূপ কীর্ত্তিস্তম্ভ আছে, ইহাও সেইরূপ কোনও বিরাট যুদ্ধের শেষে, পৃথ্বীরাজ কর্ত্তৃক বিজয়ের নিদর্শনস্বরূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। কালে ইহা জীর্ণ হইলে, কুতুবুদ্দিন ইহা সংস্কৃত এবং আরবী অক্ষরে শোভিত করেন। আমার অনুমানের প্রধান কারণ এই যে, চিতোরের স্তম্ভ ও এই স্তম্ভটী ঠিক একরূপ।

বলিয়াছি, পৃথ্বীরাজের সাম্রাজ্য স্থাপিত হইতেছিল, কিন্তু হইল না। মহম্মদীয় ধর্ম্মের বৈজয়ন্তী উড়াইয়া, মুসলমান দিগ্বিজয়ীরা ঘন ঘন ভারতের দ্বারে হানা দিতে লাগিলেন; অন্যূন ৷শ বার পৃথ্বীরাজের বাহুবলে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন। কিন্তু হায়! হায়! এমন সময়ে ভারতের চিরকলঙ্ক, চিরসর্ব্বনাশের কারণ অন্তর-বিরোধানল জ্বলিয়া উঠিল। পৃথ্বীশ্রীকাতর, কুলাঙ্গার, কান্যকুব্জপতি জয়চন্দ্র, মহম্মদ ঘোরীর সঙ্গে যোগ দিল। বীর-

কুলোত্তম পৃথ্বীরাজ রণক্ষেত্রে পতিত হইলেন। ভারতের কপাল বুঝি চিরদিনের জন্য ভাঙ্গিল; ভারতের শেষ সূর্য্য চিরদিনের জন্য অস্তমিত হইল।

—*—

বর্ত্তমান দিল্লী।

পূর্ব্বে তোমাকে যুধিষ্ঠিরের ইন্দ্রপ্রস্থ এবং পৃথ্বীরাজের দিল্লীর কথা লিখিয়াছি। যুধিষ্ঠিরের ইন্দ্রপ্রস্থের প্রাচীর, বৌদ্ধ সাম্রাজ্যের একটিমাত্র লৌহ স্তম্ভ, এবং পৃথ্বীরাজের "পিথোরা"-দুর্গের ভগ্নাবশেষমাত্র বর্ত্তমান আছে। ভারতের বক্ষের উপর দিয়া, এমনই সর্ব্বধ্বংসী বিপ্লব চলিয়া গিয়াছে যে, পূর্ব্বকৃত দেবালয়ের প্রাঙ্গণে যে লৌহস্তম্ভটি আছে, লোকে তাহাকে "ভীমের গদা" বলিত। প্রবাদ, কোনও রাজা তাহার মূল দেখিবার চেষ্টা করেন। তাহাতে স্তম্ভ হইতে রক্ত উঠে এবং স্তম্ভ "ঢিলা" হইয়া যায়। "ঢিল্লী" হইতে "দিল্লী" নাম হইয়াছে। কিন্তু স্তম্ভের অঙ্গে যে লিপি খোদিত আছে, তাহা এখন পুরাতত্ত্ববিৎগণ পড়িয়াছেন। তাহাতে লেখা আছে, রাজা "ধুব" কর্ত্তৃক, ১,৫০০ বৎসর পূর্ব্বে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ ইনি বৌদ্ধ রাজা ছিলেন। দিল্লীর উপর দিয়া এমন বিপ্লব গিয়াছে যে, এ ঘটনাটি পর্য্যন্ত দিল্লীর পরবর্ত্তী অধিবাসিগণ কেহ জানিত না।

পৃথ্বীরাজের সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয়। কুতুবুদ্দিন প্রভৃতি প্রথম পাঠান সম্রাটেরা, পৃথ্বীরাজের দিল্লীতে রাজধানী রাখেন। এই ঐতিহাসিক মহাশ্মশানে, ঈশ্বরের নৈতিক রাজ্যের প্রমাণ, সর্ব্বত্রে বিরাজমান রহিয়াছে। আলাউদ্দিনের পদ্মিনী-উপাখ্যান এবং চিতোরধ্বংস শ্রবণ কর। আর এখানে দেখ,

সেই আলাউদ্দিন যে প্রকাণ্ড হিন্দু দেবালয় ভাঙ্গিয়া মসজিদ নির্ম্মাণ করিতেছিল, তাহা অসম্পূর্ণ রহিয়াছে, তাহার রাজবাটী ধরাশায়ী হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। আফগান রাজ্যের জনৈক অধিনায়কের সমাধি, এখন ইংরাজদিগের "ডাকবাঙ্গলাতে" পরিণত হইয়াছে। তাহার কবরের প্রস্তরখানি বারাণ্ডায় পড়িয়া রহিয়াছে। হরি! হরি! মানুষ কেমন করিয়া এমন হৃদয়হীনতার কার্য্য করিতে পারে?

'টোগলক' সম্রাটেরা, ইহার কিঞ্চিৎ দূরে, যমুনাতীরে, নূতন দুর্গ ও নগর নির্ম্মাণ করিতেছিলেন। তাহার ভগ্নাবশেষ পড়িয়া রহিয়াছে। "পথোরা"-গড়ে, একদিকে এক ব্রাহ্মণ ঠাকুর অর্থ উপার্জ্জনের জন্য মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া, "যোগমায়া" নাম দিয়া, এক যোগী পূজা করিতেছেন; পূজার মন্ত্রটিও জানেন না। অন্য দিকে দুটি পুরাতন গোলাকার কক্ষে, ডাকবাঙ্গলা স্থাপিত হইয়াছে। কালের বিচিত্র গতিতে এই মহা বীরভূমির কি পরিবর্ত্তনই ঘটাইয়াছে। ডাকবাঙ্গলাতে বিশ্রাম করিয়া, বর্ত্তমান বা নূতন দিল্লীতে ফিরিয়া আসি। পথে "সপ্দর জঙ্গের" বিরাট সমাধিমন্দির। তাহার চারিদিকে, বিচিত্র-কারুকার্য্যখচিত আরও অনেকগুলি বহু পুরাতন সমাধিমন্দির বিষণ্ণভাবে দাঁড়াইয়া আছে। এ সকল পার হইয়া আসিয়া নূতন দিল্লী। আফগান সাম্রাজ্যও, কালে মোগল সাম্রাজ্যের ছায়াতে বিলুপ্ত হইল। তুমি পড়িয়াছ যে, মোগল সম্রাটেরা যদুবংশের সন্তান। প্রথম মোগল সম্রাট বাবর এবং হুমায়ুন, অতি বিচক্ষণ লোক ছিলেন। বীরত্ব এবং বিদ্যা একাধারে সম্মিলিত করিয়াছিলেন। যদুবংশের সন্তান বলিয়া হউক, কিংবা মহাভারতের পুণ্য ঐতিহাসিক ভূমি বলিয়াই হউক, তাঁহারা বিলুপ্ত ইন্দ্রপ্রস্থে রাজধানী স্থাপন করিলেন হুমায়ুন, শের আফগান কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া মারবারের মরুভূমি

পলায়নকালে অমরকোটে সম্রাটচূড়ামণি আকবর জন্মগ্রহণ করেন। এই সময়ে, হুমায়ুন যে মসজিদ নির্ম্মাণ করিতেছিলেন, সের সা তাহা শেষ করেন। তাহার নাম "কিল্লাকোনা" মসজিদ। তাহার পার্শ্বে একটি উচ্চ ত্রিতল ক্ষুদ্র গৃহ নির্ম্মাণ করেন। তাহার নাম "সের মঞ্জিল।" হুমায়ুন সের শাকে পরাভূত করিয়া রাজ্য পুনরুদ্ধার করিবার পর, ইহাতে তাঁহার পুস্তকালয় স্থাপন করেন। একদা তিনি সর্ব্বোচ্চ কক্ষে বসিয়া নিবিষ্টমনে পড়িতেছেন, এমন সময়ে পার্শ্বস্থিত মসজিদ-শীর্ষ হইতে, 'মোয়াজিন' নমাজের সময় বিজ্ঞাপন করিল। হুমায়ুন ব্যস্ত হইয়া যেমন অবতরণ করিতেছিলেন, অমনই পদস্খলিত হইয়া, তৃতীয় সোপান হইতে গড়াইতে গড়াইতে একেবারে নীচে পড়িয়া যান। তাহাতে তাঁহার অপমৃত্যু ঘটে।

তাঁহার কুলতিলক পুত্র আকবর, আগ্রাতে দুর্গ ও রাজধানী নির্ম্মাণ করেন, এবং তাঁহার পুত্র জাহাঙ্গীরও তথায় রাজত্ব করেন। সাহাজাহান পুনরায় রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত করিয়া, নূতন দিল্লীর দুর্গ ও গৃহাদি নির্ম্মাণ করেন। ইহাঁর সময়েই আগ্রা এবং দিল্লীর দুর্গের বিখ্যাত অট্টালিকা সকল ও "তাজমহল" নির্ম্মিত হয়। স্থাপত্যকার্য্য, ইহাঁর সময়ে যেন ভারতবর্ষে চরম উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিল। এখন দিল্লীর দুর্গের মধ্যে চল। প্রথমে "দেওয়ান আম্" বা সাধারণ দর্শনগৃহ। রক্ত প্রস্তর স্তম্ভ সারির উপর একটি সুন্দর গৃহ। তিন দিক খোলা, এক দিকে প্রাচীর, তাহার পশ্চাতে কয়েকটি কক্ষ। মধ্য কক্ষটির দ্বিতলে, সম্রাটের সিংহাসন থাকিত। এই কক্ষটি শ্বেত মর্ম্মর-প্রস্তরের কারুকার্য্যে খচিত। এখানেই ময়ূরসিংহাসন থাকিত। তাহার নিম্নে একটি শ্বেত মর্ম্মরবেদী আছে। তাহার উপর উজির বসিতেন। আবেদনপত্রাদি তিনি পাঠ করিয়া এক স্বর্ণপাত্রে

রাখিতেন। এবং তাহা রজতশৃঙ্খলে উত্থিত হইয়া সম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত হইত। তাহার পশ্চাতে, যমুনাতীরে, শ্বেতপ্রস্তরের শ্রেণীবদ্ধ অট্টালিকা শোভা পাইতেছে। কেন্দ্রস্থলে বিখ্যাত "দেওয়ান খাস।" ইহারও তিন দিক খোলা। যমুনার দিকে প্রস্তরের ছিদ্রবিশিষ্ট গবাক্ষ। ইহার স্তম্ভ সকল এবং উপরের ছাদ, স্বর্ণে এবং নানাবিধ বর্ণে রঞ্জিত রহিয়াছে। চারি কোণের স্তম্ভের উপর, প্রাচীরে লেখা আছে,—

"যদ্যপি স্বরগ থাকে এই ধরাতলে,
এখানে- এখানে—তাহা এখানে কেবল।"

তাহার বামপার্শ্বে সেইরূপ কক্ষ সারি, সম্রাটের অন্তঃপুর। কক্ষগুলি অতিক্ষুদ্র, কিন্তু অতি মনোহর। যমুনার দিকে একটি গোল প্রাচীরহীন কক্ষ, গৃহের বহির্ভাগে শোভা পাইতেছে স্তম্ভের বিরামস্থানে আয়না বসান রহিয়াছে। কিন্তু এই অন্তঃ-পুরের কক্ষে, কি অন্য কোথাও কপাট নাই। বহুমূল্য পুরু পর্দা, প্রত্যেক দ্বারে ঝুলান থাকিত। দেওয়ানখাসের অন্য পার্শ্বে স্নানের গৃহ। ইহার কক্ষগুলি অতি মনোহর। প্রাচীর এবং ছাদ কাচে সুসজ্জিত! যে দিকে চাহিবে, তোমার শত শত প্রতিবিম্ব দেখিবে। জানি না নুরজাহান প্রভৃতি কত সুন্দরীর প্রতিবিম্বই এ সকল কাচকক্ষে প্রতিভাত হইয়াছে। একদিকে একটি কক্ষে জল গরম হইয়া প্রণালীপথে মর্ম্মরনির্ম্মিত ক্ষুদ্র কুণ্ডে আসিত। ইহাতে সুন্দরীরা অবগাহন করিতেন। চারিদিকে তাহাদের তৈলমর্দ্দনের এবং আরামের কক্ষ রহিয়াছে। যখন শত শত সুন্দরীরা সম্রাটকে বেষ্টন করিয়া স্নান করিতেন, কেহ জলে অর্দ্ধ বা পূর্ণ নিমজ্জিতা, কেহ কক্ষে মদালসে উপবিষ্টা বা অর্দ্ধ-শায়িতা, কেহ জলক্রীড়া করিতেছেন, কেহ বেড়াইতেছেন, কেহ হাসিতেছেন, কেহ গাহিতেছেন, কেহ রসালাপ করিছেন, মরি!

মরি! কি রূপের ফোয়ারাই চারিদিকে খেলিতে থাকিত। সম্মুখে আর একটি কক্ষ। তাহার মধ্যস্থলে পদ্মের মত একটি কুণ্ড। তাহাতে গোলাপজল রক্ষিত হইয়া, গৃহ সুবাসিত করিয়া রাখিত! এরূপ আরও ৩। ৪টি কক্ষ আছে। কে বলিবে, তাহা কি কার্য্যে ব্যবহৃত হইত। স্নানকক্ষের সম্মুখেই "মতিমসজিদ"। শ্বেতপ্রস্তরে নির্ম্মিত। ইহাতে রঙ্গের কার্য্য নাই, কেবল শ্বেত মর্ম্মরের উপর কারুকার্য্য। প্রকৃতই ইহা মসজিদের মধ্যে একটি মতি। গৃহটি কি সুন্দর! এখানে সম্রাটকে বেষ্টন করিয়া, অন্তঃপুরবাসিনীরা নমাজ পড়িতেন।

পুরাতন দিল্লী হইতে নূতন দিল্লীতে আসিতে, পথে একটি প্রকাণ্ড সমাধিস্থান দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে নিজামদ্দিন নামক জনৈক বিখ্যাত ফকিরের একটি শ্বেতমর্ম্মরনির্ম্মিত সমাধি আছে। গৃহটি অতি সুন্দর। তাহার কিঞ্চিৎদূরে, একই প্রাঙ্গণে, কবি খসরুর সমাধি। ইহাতে তুমি বুঝিবে, মুসলমান সম্রাটেরা কবিদিগের যথেষ্ট সম্মান করিতেন। তাহারই পার্শ্বে মরি। মরি! কি হৃদয়গ্রাহী দৃশ্য! যখন মোগলকুলের কংস আরঙ্গজিব, আপন পিতা সাহাজানকে বন্দী করিলেন, তাঁহার কন্যা জেহানারা চিরকৌমার্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়া, পিতার সেবার জন্য, তাঁহার সঙ্গে কারাবাসিনী হন। তাঁহার একটি ক্ষুদ্র মর্ম্মর কবর, মধ্যস্থান শ্যামল দূর্ব্বাদলে শোভিত। কবরের শীর্ষদেশে, একটি শ্বেত মর্ম্মরফলকে, তাঁহার নিজের রচিত একটি কবিতা লিখিত রহিয়াছে;—

"বহুমূল্য আবরণে কর'ও না সুসজ্জিত
কবর আমার।
তৃণ শ্রেষ্ঠ আবরণ দীন-আত্মা জেহানারা
সম্রাট-কন্যার।"

পিতৃপরায়ণা জেহানারা, রমণীদিগের জন্য, পিতৃভক্তির এবং পবিত্রতার কি আদর্শই রাখিয়া গিয়াছেন! আমি আকবরের সমাধিকে ভিন্ন, আর কোনও সমাধিকে প্রণাম করি নাই। জাহানারার সমাধিকে আমি ভক্তিভরে প্রণাম করিলাম। স্থানটি দেখিয়া আমার কলুষিত হৃদয়ও যেন পবিত্র হইল। স্থানটি একটি মহাতীর্থ।

সমদার্শিনী নীতিতে মহামতি আকবর যে সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, নরাধম আরঙ্গজিবের দুর্নীতিতে এবং ধর্মোৎপীড়নে, শিবজীর অসিঘাতে, তাহা ভাঙ্গিয়া পড়িল। দুর্গের বাহিরে প্রকাণ্ড "জুমা মসজিদের" গগণস্পর্শী স্তম্ভ-শিরে দাঁড়াইয়া দিল্লী দর্শন করিলে বোধ হয়, যেন মুসলমান সাম্রাজ্যের ইতিহাস, চক্ষের সম্মুখে প্রসারিত রহিয়াছে। হৃদয় কি ঐতিহাসিক স্মৃতিতেই আন্দোলিত হইতে থাকে। মানবের সম্পদ ও গৌরব কি জলবিম্ব বলিয়াই ধারণা হয়! ইচ্ছা করে না যে, সেই স্তম্ভশিরে অধিরোহণ করিয়া আবার সংসারে প্রবেশ করি। পাপমতি আরঙ্গজিবের সঙ্গে মোগল সাম্রাজ্য ডুবিল। শিবজী তাহার ভিত্তি পর্য্যন্ত চঞ্চল করিয়া গিয়াছিলেন। ভারতের অদৃষ্ট ক্ষেত্র পাণিপথ যুদ্ধক্ষেত্রে, তাহা নাদের সাহার অসিপ্রহারে টলিয়া পড়িল। নৃশংস 'নাদের' দিল্লী লুণ্ঠন করিয়া, নগর কেন্দ্রস্থলস্থিত এক মসজিদের উপর হইতে, দিল্লীবাসীদের বধাজ্ঞা প্রচার করিল। নরশোণিতে দিল্লী ভাসাইয়া, যমুনাকে রক্তবর্ণা করিল। দিল্লী বিলুপ্তপ্রায় হইল। মোগল সাম্রাজ্য শোণিতস্রোতে ভাসিয়া কালসাগরে চিরদিনের জন্য বিলীন হইল।

"আহা! কি কুদিবসে গ্রাসিল রাহু, মোচন হইল না আরও।
"ভাঙ্গিল চূর্ণিল, উলটি পালটি, লুটি নিল যাহা ছিল সারও।"

সেই বধভূমি এখন একটি ফোয়ারার দ্বারা চিহ্নিত আছে। আজ আর না। আজ দিল্লী-দর্শন-কাহিনী শেষ করিব। নরপশু নাদের

সাহা দিল্লী লুণ্ঠন করিয়া এবং নরহত্যা-স্রোতে দিল্লী ভাসাইয়া, স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। মোগলরাজলক্ষ্মী আর মাথা তুলিতে পারিলেন না। তাঁহার ছায়া ক্রমে বৃটিশ-বৈজয়ন্তী-ছায়াতলে বিলীন হইল। যে ইংরাজ মোগলের ছায়াতে ভারতে বাণিজ্য করিতে আইসে, সে মোগলের সিংহাসনে বসিল। আকবরের উত্তরাধিকারীকে তাহার বৃত্তিভোগী হইয়া, সামান্য ব্যক্তির মত দিল্লী নগরে বসতি করিতে হইল। ময়ূরসিংহাসন নাদের সাহা লইয়া গিয়াছিল, দেওয়ান-আম, দেওয়ান-খাস বৃটিশ সৈন্য-নিবাস হইল। ভারত বীরশূন্য, পদতলে দলিত, দেখিয়া বৃটিশ সিংহের রাজ্যলিপ্সা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। ঘোরতর অধর্ম্ম ও বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া, তাহারা ক্রমে ক্রমে উত্তর ভারতের পঞ্জাব পর্য্যন্ত উদরসাৎ করিল। রণজিৎ সিংহের ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হইল। ভারতের মানচিত্র লাল হইয়া গেল। কিন্তু রাজার উপর একজন মহারাজা, শক্তিমানের উপর একজন মহাশক্তিমান আছেন। তাঁহার রাজনীতি, তাঁহার শক্তি অলক্ষ্য। ঝান্সির বীর-রাণী লক্ষ্মী বাই, সিংহিনীর মত গর্জ্জন করিয়া বলিলেন,—"মেরা ঝান্সী নেহি দেঙ্গে!" সিপাহি-বিদ্রোহানল জ্বলিয়া উঠিল, ইংরাজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইল, বৃটিশ সিংহাসন টল টল করিতে লাগিল। দিল্লী ভারতের যুগযুগান্তরীন রাজধানী। বিদ্রোহিগণ চারিদিক হইতে দিল্লীতে সমবেত হইল। বৃত্তিভোগী বৃদ্ধ মোগল সম্রাটের উত্তরাধিকারীকে, বলে যষ্টির মত দাঁড় করাইয়া, মোগল সাম্রাজ্য বিঘোষিত করিল। শিখ সৈন্য সহায় করিয়া ইংরাজ দিল্লী আক্রমণ করিলেন। দিল্লীর চারিদিকে দৃঢ় উচ্চ প্রাচীর। তাহার বিশাল নগর-দ্বার সকল রুদ্ধ। পার্শ্বস্থিত অত্যুচ্চ শৈল-শেখর হইতে ইংরাজ "কাশ্মীর-দ্বারের" উপর গোলা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু দ্বার এত দৃঢ় যে, প্রায় চারি মাস কাল

গোলা বর্ষণ করিয়াও তাহা বিনষ্ট করিতে পারিলেন না। অবশেষে মৃত্যু সংকল্প করিয়া, কতক সৈন্য বিদ্রোহীদিগের অগ্নিবৃষ্টি পার হইয়া আসিয়া, প্রাচীরের তলে স্তূপাকার বারুদ রাখিয়া, অগ্নিসংযোগ দ্বারা প্রাচীরের এক স্থলে সুরঙ্গ করিয়া, অমিতপ্রতাপে সেই সুরঙ্গ দিয়া দিল্লী প্রবেশ করিল। বারুদের নির্ঘাতে এবং নির্ঘোষে ভূমিকম্প হইল, দিল্লী কাঁপিল, বিদ্রোহীরা টলিল, পলায়ন করিতে লাগিল। দিল্লী আবার নরশোণিতে প্লাবিত হইতে লাগিল। বিদ্রোহী-দিগের নায়ক কেহই ছিল না, প্রকৃত যুদ্ধবিদ্যা কেহই জানিত না। যদি নগরে অবরুদ্ধ হইয়া না থাকিয়া, তাহারা বাহিরে গিয়া যুদ্ধ করিত, ৪০,০০০ বিদ্রোহী এক ফুৎকারে ক্ষুদ্র ইংরাজ-সৈন্য উড়াইয়া দিতে পারিত। সেনাপতি এবং নীতিশূন্য বিদ্রোহীগণ, কর্ণধারশূন্য অর্ণবযানের ন্যায়, এই ঝটিকায় উড়িয়া গেল। বিজয়ী নিকলসন, নগর প্রাচীরের উপর দাঁড়াইয়া পলায়নপর বিদ্রোহী-দিগের ধ্বংসসাধন করিতেছিলেন, পার্শ্বস্থিত একটি কক্ষে লুক্কায়িত জনৈক বিদ্রোহীর গুলিতে তিনি পতিত হইলেন। কাশ্মীরদ্বারের অবস্থা ঠিক সেইরূপ ভাবেই রক্ষিত হইয়াছে। ইহার প্রত্যেক তোপের গোলার দাগে, প্রত্যেক ভগ্নাংশে, সিপাহিবিদ্রোহের ইতিহাস অঙ্কিত রহিয়াছে। নিকলসন বিজয়ের সময়ে যেখানে পড়িয়াছিলেন, সেই স্থানটিতে একটি স্মৃতিলিপি আছে। শৈল-মালার যে শৃঙ্গ হইতে দিল্লীতে গোলা বর্ষণ করা হয়, তথায় এখন মনোহর "বিজয়স্তম্ভ" বিরাজ করিতেছে। যুদ্ধে যাঁহারা পড়িয়া ছিলেন, তাঁহাদের নাম তাঁহার চারি পার্শ্বে মুদ্রিত রহিয়াছে অনতিদূরে, যে "হিন্দু রাওর" অট্টালিকাতে ইংরাজগণ সমবেত হইয়াছিলেন, এবং যে গৃহে মহিলাগণ রক্ষিত হইয়াছিলেন, তা এখনও বিদ্যমান আছে। তাহাদের মধ্যস্থলে ধর্ম্মাশোকের ২,০০

বৎসর পূর্ব্বের নির্ম্মিত, একটি নীতিস্তম্ভ উপরি-উক্ত বীরত্বের নিদর্শনের সঙ্গে ধর্ম্মের প্রতিযোগিতা করিতেছে, এবং নীরবে পার্থিব গৌরব ও সাম্রাজ্যের নশ্বরতা বিজ্ঞাপিত করিতেছে।

দিল্লীবিজয়ের পর, বৃত্তিভোগী সম্রাটের পুত্রগণ প্রাণভয়ে হুমায়ুনের সমাধিতে পলায়ন করিয়াছিলেন। এই বৃহৎ ও শিল্প-নৈপুণ্যপূর্ণ সমাধি, ইন্দ্রপ্রস্থের নিকটে অবস্থিত। হুমায়ুনের পত্নী হাজি বেগম ইহা নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন, এবং তাঁহার পুত্র সম্রাট আকবর শেষ করেন। সমাধিটি একটি ক্ষুদ্র দুর্গ বলিলেও হয়। ইংরাজ সেনাপতি হড্‌সন্ ইহা আক্রমণ করেন, এবং আত্মসমর্পণ করিবার জন্য, সম্রাটকুমারদিগের কাছে সংবাদ প্রেরণ করেন। তাঁহাদের প্রাণের কোনও বিঘ্ন হইবে না বলিয়া আশ্বস্ত করা হইলে, তাঁহারা আত্মসমর্পণ করেন। তখন, নৃশংস হড্‌সন্, এই শিশুদিগকে দিল্লীদ্বারের কাছে, বন্দীভাবে লইয়া গিয়া স্বহস্তে তাঁহাদিগকে গুলি করিয়া বধ করেন। কেবল তাহাই নহে, মৃত কুকুরের ন্যায়, তাঁহাদের দেহ দিল্লীর প্রকাশ্য স্থানে ফেলিয়া রাখেন। নীচ প্রবৃত্তি উত্তেজিত হইলে, মানুষ হিংস্র পশু হইতেও অধম হইয়া পড়ে। অবশ্য হড্‌সনের এই কসাই-কার্য্যের স্থানদ্বয়ে কোন স্মৃতিলিপি নাই। কিন্তু যত কাল অতীত হইয়া যাইতেছে, যত লোকের মস্তিষ্ক সিপাহিবিদ্রোহ-সম্বন্ধে নৃশংসতাশূন্য হইতেছে, ততই হড্‌সনের নরপশুতা এরূপ জ্বলন্ত অক্ষরে ইতিহাসের অঙ্গে ভাসিয়া উঠিতেছে যে, তাহার উত্তরাধিকারী ও বন্ধুগণ, এ কলঙ্ক অপনয়ন করিবার জন্য এখন যত চেষ্টাই করুন না কেন, হতভাগ্য সম্রাটকুমার-দিগের রক্ত তাহার হস্ত হইতে সর্ব্বপাপহারী অগ্নি কি পারাবারও অপনয়ন করিতে পারিবেন না। এইরূপে হড্‌সন্ আততায়ীর হস্তে, জগদ্বিখ্যাত মোগল-সাম্রাজ্যের শেষ ছায়াটি

পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইল। সুকুমার শিশুর রক্তে, ইংরাজ-রাজা দিল্লীতে পুনরভিষিক্ত হইল। মানবের ইতিহাস কি শিক্ষার স্থল! বিশ্বেশ্বরের বিশ্বরাজ্যের নীতিসমূহ কি দূরদর্শী, কি দুর্লঙ্ঘ্য! তাই বলিয়াছি, দিল্লী হিন্দুদিগের মহাশ্মশান; মুসলমানদিগের পাঁচটি সাম্রাজ্য দিল্লীর ধূলাতে বিলীন হইয়া গিয়াছে। একে একে পাঁচটি সাম্রাজ্যের ইতিহাস, পাপের পতন, দুর্ব্বলের ধ্বংস, সবলের উত্থান, কর্ম্মহীনের লয়, কর্ম্মীর বিজয়, নররাজ্যের নশ্বরতা, সৃষ্টিরাজ্যের অবিনশ্বরতা, অধর্ম্মের ক্ষয়, ধর্ম্মের জয়, দিল্লীর অঙ্গে অঙ্গে অঙ্কিত রহিয়াছে। পাঁচটি সাম্রাজ্যের ভস্ম অঙ্গে মাখিয়া, দিল্লী আজি কি উদাসীন মূর্ত্তিই ধারণ করিয়াছে। এত সাম্রাজ্যের উত্থান পতন, এত বিপ্লব, পৃথিবীর আর কোনও নগর দর্শন করে নাই, ভারত ভিন্ন পৃথিবীর আর কোনও দেশ দর্শন করে নাই, হিন্দুজাতি ভিন্ন অন্য কোনও জাতি এত বিপ্লবতরঙ্গাভিঘাতে জীবিত থাকিতে পারে নাই। রোম নাই, গ্রীস নাই, তাহাদের অপেক্ষা প্রাচীন ভারত আছে। সেই রোমজাতি, সেই গ্রীকজাতি নাই, কিন্তু তদপেক্ষা পুরাতন হিন্দুজাতি কঙ্কালাবশিষ্ট হইয়াও এখন আছে। ভারত পড়ে, মরে না। হিন্দুজাতি বলহীন হয়, জীবহীন হয় না। কর্ম্মহীন হয়, ধর্ম্মহীন হয় না। ধর্ম্মের সঙ্গে কর্ম্মের যোগ হইলে, আবার মাথা তুলিয়া উঠিবে। বাহুবল নশ্বর, ধর্ম্মবল অমর।

আগ্রা।

পূর্ব্ব-পত্রে দিল্লীর কথা শেষ করিয়াছি। দিল্লীতে এক দিন হোটেলে, এবং দুই দিন বন্ধু পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কালেজের প্রফেসরের বাসায় ছিলাম; আহার যোগাইতেন, দিল্লীর স্বনাম-

খ্যাত ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র সেন। ইহারা দুটি দিন কি যত্নই করেন! দার্জিলিঙ্গে যে সর্দ্দি হইয়াছিল, তাহা দিল্লী পর্য্যন্ত ভুগিতেছিলাম। হেম বাবু খাওয়াইলেন, চিকিৎসা করিলেন, আসিবার সময়ে ঔষধ সঙ্গে দিলেন। আমি বলিলাম, আমি ঠিক যেন কবি হেম বাবুর 'বাঙ্গালীর মেয়ের' অবস্থা প্রাপ্ত হইলাম,—

"খেয়ে যায়, নিয়ে যায়, আর যায় চেয়ে,
"হায়! হায়! ওই যায় বাঙ্গালীর মেয়ে।"

দিল্লী হইতে আগ্রায় আসি। আগ্রায় প্রথম সেকেন্দরা দেখিতে যাই। সেকেন্দরা সম্রাট আকবরের সমাধি, আগ্রা হইতে পাঁচ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত। বাবর ও আকবরের হিন্দুধর্ম্মের প্রতি যে প্রবণতা ছিল, তজ্জন্য গোঁড়া মুসলমানেরা যে তাঁহাদিগকে কাফের বলিত,—সেকেন্দরা দেখিলে তাহা বিলক্ষণ বলিতে পারা যায়। সেকেন্দরাটি ঠিক যেন একটি হিন্দুর দেবালয়। মুসলমান সমাধির সেই গোলাকার গুম্বেজের চিহ্নমাত্র নাই। হিন্দু-দেবালয়ের চূড়া স্তরে স্তরে সজ্জিত রহিয়াছে। সকল সমাধিতেই মূল কবর মাটিতে; তাহা মাটির স্তূপমাত্র। এই স্তূপের উপরের গৃহে, ঠিক একটি কবরাকৃতি, প্রস্তর কিংবা ইষ্টকের দ্বারা নির্ম্মিত হয়। এই কবরকক্ষটি সেকেন্দরাতে বড় অন্ধকার। সম্রাট আকবরের পোষাক যেমন আড়ম্বরশূন্য ছিল, তাঁহার কবরও সেইরূপ। তাহা কেবল একটি নির্ম্মল শ্বেতপ্রস্তরের বেদীমাত্র। গবর্ণর জেনেরল লর্ড নর্থব্রুক, এক সহস্র টাকা মূল্যের একখানি ছাদ না কি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। তাহাও শুনিলাম, মোল্লাগণ চুরী করিয়াছেন। অট্টালিকার ত্রিতলে একটি শ্বেতমর্ম্মরনির্ম্মিত অতি সুন্দর কক্ষ আছে। ইহাতেও শ্বেতমর্ম্মরের একটি কবরাকৃতি আছে। পূর্ব্বে ইহা স্বর্ণে ও অন্য বর্ণে, রঞ্জিত ও চিত্রিত ছিল। তাহা কালে মলিন হইয়া

গলে, পুনঃসংস্কার করা বহু ব্যয়সাধ্য বলিয়া, ইংরাজরাজ তাহার
পর চুন-কাম করিয়া দিয়াছেন। সমাধিটি এখন দেখিতে ঠিক
যেন শ্বেতবসনাবৃতা শোকাতুরা হিন্দুবিধবা। চারি দিকে প্রকাণ্ড
প্রাঙ্গণ উদ্যানে সজ্জিত ছিল। এখনও দুই চারিটি গাছ
ফুল আছে। একটি সুন্দর গোলগৃহ সেই প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে
এখন ইংরাজদিগের আরামগৃহের কার্য্য করিতেছে। আমি
দিন দেখিতে যাই, সে দিন বহুতর সৈন্য ও তাহাদের ক
চারীরা বিহার করিতে আসিয়াছিলেন। সেকেন্দরা বহুকক্ষ
বিশিষ্ট। দুই একটি কক্ষে আরও দুই একটি কবর আছে। আ
বর মনে করিয়াছিলেন, তাঁহার উদার রাজনীতিবলে হিন্দুমুস
মানকে মিলিত করিয়া যে সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছেন, এ
অক্ষয় হইবে। কক্ষে কক্ষে তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের ক
হইবে। তিনি জানিতেন না যে, তিন পুরুষ না যাইতে, আ
জিব সেই নীতির বিপর্য্যয় ঘটাইয়া, সেই সাম্রাজ্যের ধ্বং
পথ পরিষ্কার করিয়া যাইবেন। আজ সেকেন্দরার সমুদয়
শূন্য পড়িয়া আছে। প্রাঙ্গণের বহির্ভাগে আর একটি প্র
বিশিষ্ট ক্ষুদ্র দ্বিতল অট্টালিকা আছে। শুনিলাম, আক
মৃত্যুর পর, তাঁহার পত্নী, যোধপুররাজকন্যা, যোধা বাই ই
বাস করিতেন। মুসলমানী হইবার পরও, রাজপুত মহি
হিন্দুরমণীর পাতিব্রত্য রক্ষা করিতেন।

অপরাহ্ণে প্রথমতঃ যমুনা পার হইয়া "রাম বাগ" বা "অ
বাগ" দেখিতে যাই। এটি যমুনার উপর একটি বৃহৎ উ
যমুনার গর্ভ হইতে ইহার প্রাচীর সবলভাবে উঠিয়াছে।

তাহার পর এতমাদদ্দৌলা দেখিতে যাই। এটি নুরজা
মাতার এবং পিতার সমাধিগৃহ। সেই ভুবনমোহিনীর
জননী পাশাপাশি নিদ্রা যাইতেছেন। সমাধিটি অপেক্ষাকৃ

হইলেও, শ্বেতমর্ম্মর প্রস্তরের এরূপ সুচারু অট্টালিকা, যেন আর দেখি নাই। ঠিক যেন একটি ছবি। চারিদিকে সুন্দর ফলপুষ্পের উদ্যান এখনও রক্ষিত হইয়াছে।

তাহার পর যমুনা পার হইয়া আসিয়া, জগদ্বিখ্যাত তাজমহল এ জীবনে দ্বিতীয় বার দেখিতে যাই। তাজ তুমি দেখিয়াছ, অতএব তাহার কথা আর কি লিখিব? যিনি তাজ দেখিয়াছেন. তিনি যিনিই হউন, মোহিত হইয়াছেন। এক জন লিখিয়াছেন,—

"তাজ প্রকৃতই একটি কবিতা। উহা কেবল স্থাপত্যের একটি বিশুদ্ধ আদর্শ নহে; উহা এরূপ সৃষ্টি যে তাহাতে কল্পনার পরিতৃপ্ত হয়, কারণ সৌন্দর্য্যই উহার বিশেষ লক্ষণ। তুমি কি কখনও আকাশে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছ? এই দেখ, এইটি আকাশ হইতে মর্ত্ত্যে আনীত হইয়াছে, এবং অনন্তকালের বিস্ময়ের জন্য এখানে স্থাপিত হইয়াছে। তথাপি উহা এমনই লঘু-ভার, এমনই বায়ুবৎ বোধ হয়, দূর হইতে দেখিলে, উহার গগনস্পর্শী চূড়াবলীসহ এমনই শিশির এবং সূর্য্যালোকে নির্ম্মিত অট্টালিকা, সূর্য্যকিরণে ফুটনোন্মুখ একটি রজতবিম্ব বলিয়া বোধ হয় উহাকে স্পর্শ করিবার এবং উহার চূড়াতে চড়িবার পরও, উহা প্রকৃত কি না তোমার সন্দেহ হয়।" শ্লীমেন বলেন;— তাজদর্শনের পর, আমি আমার স্ত্রীকে অট্টালিকাসম্বন্ধে তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করি। তিনি উত্তর করিলেন, আমি কি মনে করি, তাহা তোমাকে বলিতে পারি না, কারণ এরূপ একটি অট্টালিকা সমালোচনা করিবার শক্তি আমার নাই। তবে আমার হৃদয়ের ভাব তোমাকে বলিতে পারি। 'এরূপ একটি সমাধি পাইবার জন্য আমি কাল মরিতে পারি।" তাজ দর্শন করিয়া যে পথে তোমাকে লইয়া বেড়াইয়াছিলাম কেবল সেই পথেই বেড়াইলাম। যে স্থানে তোমাকে লইয়া বসিয়াছিলাম, কেবল সেই স্থানেই

বসিলাম। উদ্যানের অন্য পথে যাইতে কি অন্য অংশ দেখিতে আমার প্রবৃত্তি হইল না। সেই পূর্ব্ব-দর্শন-স্মৃতিতে এবং আর একখানি মুখের স্মৃতিতে আমি বিহ্বল হইয়া উঠিয়াছিলাম।

তাহার পর আগ্রার দুর্গ দেখিতে গেলাম। এই দুর্গ আকবর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মুসলমানেরা বলেন, তিনি এই নগরের নাম এ জন্যে আকব্বরাবাদ রাখিয়াছিলেন। তাহা হইতে আগ্রা। হিন্দুরা বলেন, 'অগ্রবণ' ইহার পূর্ব্ব নাম ছিল, তাহা হইতেই আগ্রা। দিল্লীর মত আগ্রাতে ঠিক সেইরূপ দেওয়ান-আম, দেওয়ান-খাস, শিশমহল, মতিমসজিদ, দুর্গের বাহিরে জুম্মা মসজিদ পর্য্যন্ত আছে। তবে আগ্রার অট্টালিকাগুলি অপেক্ষাকৃত বড়। কিন্তু দিল্লীর অট্টালিকা আমার চক্ষে অপেক্ষাকৃত সুন্দর বোধ হইয়াছিল। গৃহ সকল ঠিক দিল্লীর মত যমুনার তীরে অবস্থিত, ঠিক সেইরূপ—

"পড়ি জল নীলে ধবল সৌধ ছবি
"অনুকারিছে নভ অঙ্গন ও।"

দেওয়ান-খাসের ও স্নানাগারের মধ্যবর্ত্তী প্রাঙ্গণে এক পার্শ্বে একটি কৃষ্ণ এবং অন্য পার্শ্বে আর একটি শ্বেতমর্ম্মর আসন রক্ষিত হইয়াছে। আমাদের পাণ্ডা বলিলেন, প্রথমটিতে স্বয়ং আকবর এবং দ্বিতীয়টিতে তাঁহার হিন্দুমন্ত্রী খ্যাতনামা বীরবল বসিয়া সান্ধ্য গগণতলে যমুনার লহরী দেখিতে দেখিতে মন্ত্রণা ও গল্প করিতেন। যাট সূর্য্যমল দিল্লী জয় করিয়া প্রথম আসনে বসিলে, আসন মনোদুঃখে বিদীর্ণ হইয়া যায় এবং রক্ত উদ্গিরণ করে। পাণ্ডা সেই বিদীর্ণ রেখা ও একটি লাল দাগ রক্ত বলিয়া দেখাইলেন। অন্যদিকে অন্তঃপুরকক্ষের সংলগ্ন, রক্তপ্রস্তরে নির্ম্মিত, আর একটি প্রকাণ্ড অন্তঃপুর মহল আছে। এটি রাজপুতকন্যা যোধা বাইয়ের মহল বলিয়া খ্যাত। তিনি মুসলমান মহিষীগণ হইতে স্বতন্ত্র

থাকিতেন এবং এই মুসলমান অন্তঃপুরেও হিন্দু আচার ব্যবহার রক্ষা করিতেন।

দেওয়ান-খাসে দাঁড়াইয়া যমুনার দিকে চাহিয়া মনে হইল,—

"তব জল কল্লোল সহ কত সেনা
"নাদিল কোনও দিন সমরে ও।
"তব জল বুদ্‌বুদ সহ কত রাজা
"পরকাশিল, লয় পাইল ও।
"আজি সব নীরব রে যমুনে! সব
"গত তব বিভব কালে ও।"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, সুললিত 'যমুনা-লহরী' বিষাদমগ্ন-হৃদয়ে গাহিতে গাহিতে আগ্রা দর্শন শেষ করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলাম।

জয়পুর।

আগ্রা হইতে আমরা জয়পুর যাই। দিল্লীর ডাক্তর হেম বাবুর জ্যেষ্ঠ সহোদর সংসারচন্দ্র সেন জয়পুরের মহারাজার প্রাইভেট্ সেক্রেটারী। তাঁহার মন্ত্রীও এক জন বাঙ্গালী—কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ইঁহারা উভয়ে জয়পুর স্কুলের শিক্ষক হইতে এরূপ উচ্চ পদ অধিকার করিয়াছেন। আমরা সংসার বাবুর অতিথি হই। যেখানে বাঙ্গালী, সেখানে দুর্গাকালী, সেখানে পাঠাবলি, আর সেখানেই দলাদলি।

জয়পুরে পঁহুছিয়াই আমরা প্রথমতঃ রাজবাটি দর্শন করিতে যাই। একটি প্রকাণ্ড নগরের অষ্টম ভাগ ব্যাপিয়া এই রাজবাটী। অতএব ইহার বর্ণনা কি করিব? ইহা একটি মনোহর হর্ম্মাবলীর উদ্যান বলিলেও হয়। এক পার্শ্বে প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণের চারিদিকে

সমুদয় বিচারালয় ও কার্য্যগৃহ সজ্জিত রহিয়াছে। রাজাদিগের রাজ্যে উচ্চতম কর্ম্মচারীরাও ফরাসে তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিয়া, যাবতীয় রাজকার্য্য ও বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। এখানে আইনকানুনের তত ঘটা নাই, নর-রক্ত-শোষক জলোকা উকিল মোক্তারের হট্টগোল নাই। বিচারকার্য্য একরূপ মোটামুটি সরল ও সহজভাবে নিষ্পন্ন করা হয়। বৃটিশ রাজ্যের ন্যায়, ধর্ম্মাবতার-দের সুবিচার ও সূক্ষ্ম বিচারের জালে পড়িয়া, প্রজাদের প্রাণান্ত হয় না। প্রেমিক বৈষ্ণব কবি বলিয়াছেন,—

"পরাণ ছাড়িলে পিরীত না ছাড়ে।"

বৃটিশরাজ্যেও তাই,—

"পরাণ ছাড়িলে উকিলে না ছাড়ে।"

হিন্দুরাজ্যে বিচারকার্য্য কিরূপ সহজে নিষ্পন্ন হইত, এ সকল স্থান দেখিলে কতক বুঝিতে পারা যায়। তবে ক্রমে ক্রমে সকলই "লাল" হইয়া যাইতেছে।

অন্য প্রাঙ্গণে "দেওয়ান-আম," তৃতীয় প্রাঙ্গণে "দেওয়ান-খাস," শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তরের দুগ্ধ ফেণ-নিভ অমল ধবল শোভায় শোভা পাইতেছে। ইহাদের স্তম্ভের অবসরে, নানা বর্ণের পুরু পর্দ্দা ঝুলান রহিয়াছে এবং গৃহ বহুমূল্য উপকরণে ও স্ফটিক ঝাড়ে সজ্জিত রহিয়াছে। এই দুই গৃহ দেখিলে, দিল্লীর ও আগ্রার দেওয়ান-গৃহ সকল কিরূপ সজ্জিত থাকিত, বুঝিতে পারা যায়। রাজবাটীর কেন্দ্রস্থলে মহারাজার আবাস-ভবন 'চন্দ্রমহল।' একটি প্রকাণ্ড ত্রিতল অট্টালিকা, বহুমূল্য ইংরাজী উপকরণে সজ্জিত। তাহার পশ্চাতে প্রশস্ত পুষ্পোদ্যান, জলপ্রণালীতে বিভক্ত এবং ফোয়ারাতে শোভিত। উদ্যানের অপর প্রান্তে 'গোবিন্দজীর' মন্দির। বৃন্দাবন হইতে আনীত হইয়া গোবিন্দজী এই রাজপুরী মধ্যে স্থাপিত হন। মূর্ত্তিটি কৃষ্ণপ্রস্তর নির্ম্মিত, বড় সুন্দর বলিয়

শুনিলাম। কিন্তু আমি তেমন অসামান্য সৌন্দর্য্য কিছু দেখিলাম না। পূজক ব্রাহ্মণ বাঙ্গালী। এক দল রাজপুতনী বসিয়া কৃষ্ণলীলা কীর্ত্তন করিতেছে, মধ্যস্থলে একজন অর্দ্ধনগ্ন পুরুষ দাঁড়াইয়া ভক্তিভরে নৃত্য করিতেছে। দৃশ্যটি হৃদয়স্পর্শী, অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া দেখিলাম ও শুনিলাম। তাহার পর, মৃত মহারাজ রাম সিংহের বৈঠকখানা দেখিলাম। উহা এখন বিলিয়ার্ড খেলার গৃহ হইয়াছে। উহার উপকরণে এখন 'চন্দ্র-মহল সজ্জিত হইয়াছে! তাহার পর 'বাদলমহল।' ইহা একটি বৃহৎ নীল সলিলপূর্ণ সরসীতীরে শোভিত। সম্মুখে উদ্যান, পশ্চাতে সরোবর। অট্টালিকা সুন্দর, সুশীতল। বর্ষাকালে মহারাজ এখানে একদিন দরবার করেন। রাজবাটীর আর এক প্রান্তে 'হাওয়াই মহল' বহু তলায় একটি অতি উচ্চ রথের মত শোভা পাইতেছে। বোধ হয়, এই অট্টালিকাতে গ্রীষ্মকালে বেশ বাতাস খেলে বলিয়া, ইহার নাম 'হাওয়াই মহল। 'মহল হইতে মহলান্তরে এবং রাজবাটির সর্ব্বত্রে বিচরণ করিবার জন্যে, আবৃত ইষ্টকনির্ম্মিত পথ সকল শ্বেত লতার মত চারিদিকে নির্ম্মিত হইয়াছে। পুরবাসী অসূর্য্যম্পশ্যা রূপসীরা এই সকল পথে সর্ব্বত্রে যাতায়াত করেন। মহারাজ যে রাত্রি যে মহিষীর সঙ্গে অতিবাহিত করিবেন, আদেশ করিলে, তিনি সজ্জিতা হইয়া, এই সকল পথে, 'চন্দ্রমহলের' অপর পার্শ্বস্থিত অন্তঃপুর মহল হইতে প্রোষিতভর্ত্তৃকা হইয়া অভিসারে উপস্থিতা হন। তুমি যদি একজন রাজমহিষী হইতে, তবে কি করিতে বল দেখি? অথচ ইঁহারাই অম্লানবদনে স্বামীর চিতারোহণ করিতেছেন। শুধু তাহা নহে। বর্ত্তমান মহারাজ এক জন বৃন্দাবনের ভিখারী-মাত্র ছিলেন। সে কথা পরে বলিব। তিনি জয়পুরের সিংহাসন পাইবার পর, যোধপুরের রাজকন্যাকে, ইঁহাদের রাজনীতি

অনুসারে বিবাহ করেন। কিন্তু, তিনি তাঁহার পূর্ব্ব স্ত্রীকে শুনিলাম, সমধিক ভাল বাসেন। একদা রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কিছু যদি বাঞ্ছনীয় থাকে, আমাকে বল তুমি আমায় কখনও কিছু চাহ নাই।" পতিব্রতা সতী উত্তর করিলেন;—"আমার কিছুই বাঞ্ছনীয় নাই। লোকে আশীর্ব্বাদ করে, 'তোর স্বামী মহারাজ হউক।' বিধাতা-আমার স্বামীকে মহারাজ করিয়াছেন, অতএব আমার আর বাঞ্ছনীয় কি হইতে পারে?" মহারাণী হইয়াও ইহাঁর চরিত্রের কিছুমাত্র রূপান্তর হয় নাই। ইনি রাজার মহিষীভার গ্রহণ না করিয়া, দাসীভাবে পূর্ব্ব তাঁহার সেবা করেন। এক পাত্রে আহার করেন, ছায়ার ন্যায় তাঁহার সঙ্গে থাকেন। সতিনী মহাতেজস্বিনী রাজপুত-কন্যা, গল্প এরূপ যে, মহারাজ এক দিন তাঁহার কি একটি কথা রক্ষা করেন নাই। বীরবালা লম্ফ দিয়া প্রাচীর হইতে অসি বাহির নিষ্কাষিত করেন, ভয়ে মহারাজ চণ্ডিকার পদানত হন। এ সপত্নীর ছায়াতে থাকিয়াও, পূর্ব্ব পত্নী যে সতীত্বের ও নারীর আদর্শ দেখাইতেছেন, তাহাতে সমস্ত জয়পুর মোহিত।

অপরাহ্ণে আমরা জয়পুরের শিল্প বিদ্যালয় দেখিতে যাই। মৃত মহারাজ রাম সিংহের এটি একটি মহৎ কীর্ত্তি, তিনিই স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। এখানে চিত্রের, কাষ্ঠের, পিত্তল এবং মাটির পাত্র ও পুতুল ইত্যাদি নির্ম্মাণের কার্য্য শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। শিল্পবিদ্যার বেশ উৎকর্ষ দেখিলাম। একটি ব্যাং কিনিতে আমার বড়ই ইচ্ছা ছিল। তাহারা কিনিতে দিল না, বোধ হয়, ভেক লইব বলিয়া ভয় হইয়াছিল!

তাহার পর, মহারাজের 'রামবাগ' দেখিতে যাই। এমন এবং মনোহর উদ্যান, বুঝি, আর কোথাও নাই। তাহার পার্শ্বে মিউজিয়ম বা 'আজবের ঘর' নির্ম্মিত হইতেছে

গৃহটীর নির্ম্মাণে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে ; ঘর ত নহে, একখানি ছবি। একটি প্রশস্ত দুই তল উচ্চ 'হল', তাহার তিন পার্শ্বে কক্ষের সারি, তার পার্শ্বে একটি প্রাঙ্গণ এবং চতুঃপার্শ্বে আবার কক্ষের সারি। কক্ষ সকল স্বর্ণমিশ্রিত নানা বর্ণে সুকৌশলে চিত্রিত। হলের উপরিস্থ গবাক্ষে, কাচে, নানা বর্ণে কৃষ্ণের ব্রজলীলা চিত্রিত রহিয়াছে। অট্টালিকার প্রাচীরের গায়ে স্থানে স্থানে মহাভারত ও রামায়ণের নানা দৃশ্য চিত্রিত হইয়াছে। উদ্যানে ফোয়ারা ছুটিতেছে, চক্রাকারে ঘুরিতেছে ; ব্যাণ্ড বাজিতেছে ; তালে তালে রাজপুত সর্দ্দারগণের অশ্ব ছুটিতেছে। এখনও তাহাদের পার্শ্বে তরবারি ঝুলিতেছে, অস্তমিত বীরত্বের ও রাজপুত ইতিহাসের সাক্ষী দিতেছে। গ্যাসের আলোকে, অট্টালিকা ও উদ্যান অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছিল। মুহূর্ত্ত সেই শোভা নয়ন ভরিয়া দেখিলাম।

পর দিবস প্রাতে, হস্তিপৃষ্ঠে, ঐতিহাসিক 'আম্বের' দেখিতে গেলাম। জয়পুরের নগরতোরণ পার হইয়াই আম্বেরে প্রবেশ করি। প্রবাদ, আম্বেরে মহামারী হওয়াতে, রাজা জয়সিংহ কর্ত্তৃক তাহার পার্শ্বে জয়পুর নগর স্থাপিত হয়। রাস্তার উভয় পার্শ্বে পুরাতন আম্বেরের ভগ্নাবশেষ পড়িয়া রহিয়াছে। প্রথম একটি প্রশস্ত ঝিল ও তাহার মধ্যস্থলে একটি সুন্দর অট্টালিকা জীর্ণাবস্থায় শোকের মূর্ত্তির মত দণ্ডায়মান দেখিলাম। পশ্চাতে পর্ব্বতশ্রেণী। তাহার পর, আম্বের-দুর্গের তোরণে প্রবেশ করিয়া, দুর্গে আরোহণ করিতে আরম্ভ করিলাম। আম্বের দুর্গ গিরি-শেখরে। তাহার পাদমূলে আর একটি ঝিল, তাহার মধ্যস্থলে একটি ক্ষুদ্র ফলপুষ্পের উদ্যান কি শোভাই বিকাশ করিতেছে। এই ঝিলের পার্শ্ব বহিয়া, আমরা খ্যাতনামা আম্বের-দুর্গে প্রবেশ করি। প্রথম একটি প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। তাহার চারি পার্শ্বে অশ্বশালা

ও সৈনিকনিবাস। এক দিকে, দ্বিতলে একটি সুন্দর মন্দিরে, 'যশোরেশ্বরী কালী', বিরাজ করিতেছেন। প্রতাপাদিত্যকে বন্দী করিয়া আনিবার সময়ে, মানসিংহ, জননীকেও বন্দিনী করিয়া আনিয়া তাঁহার রাজপুরী মধ্যে স্থাপিত করিয়াছেন। আমরা যখন দর্শন করি, তখন পূজা শেষ হইয়াছে। প্রত্যহ একটি অজ-মুণ্ড মাতাকে বলিদান দেওয়া হয়। মাতার সঙ্গে বঙ্গদেশের এই নৃশংস জীবহিংসাপাপও এখানে প্রবেশ করিয়াছে। তবে ইহারা বীরপুরুষ। ইহাদের বলিদান পদ্ধতি বঙ্গদেশের মত তেমন নিষ্ঠুর ব্যাপার নহে। মানুষ যত কাপুরুষ হয়, ততই নিষ্ঠুর হয়। নিতান্তই বলিদান দিতে হইবে, তাই যেন অনিচ্ছায়, প্রাঙ্গণের এক কোণে এই কার্য্য সমাপন করা হয়। খানিকটা বালির উপর ছাগলটিকে দাঁড় করাইয়া রাখিয়া, অকস্মাৎ খড়্গাঘাতে তাহার মুণ্ডছেদন করা হয়। রক্তটা বালির উপর মাত্র পড়ে, এবং প্রাঙ্গণ-ভূমি স্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই স্থানান্তরিত হয়। আমাদের দেশের সেই বাদ্য, সেই নৃত্য, সেই মহিষ পাঁঠার উপর বীরত্ব, সেই ফাঁস, সেই হাঁড়িকাঠ, সেই টানাটানি, সেই পশুত্ব, সেই হৃদয়-বিদারক নিষ্ঠুরতা এখানে নাই। হরি! হরি! ধর্ম্মের নামে জগতে কত অধর্ম্মই সাধিত হয়। মানুষ যখন অম্লানবদনে নরবলি, এমন কি পুত্র কন্যা বলি পর্য্যন্ত দিতে পারে, তখন এই নির্ব্বাক্ নিরপরাধ পশুহত্যা তাহাদের হৃদয় স্পর্শ করিবে কেন?

মন্দিরের পর, দেওয়ান-আম, দেওয়ান-খাস, অন্তঃপুর-মহল ইত্যাদি ঠিক দিল্লীর অনুকরণেই সজ্জিত রহিয়াছে। সকলই শ্বেতপ্রস্তরে নির্ম্মিত, শিশমহলটি যেন দিল্লী আগ্রা অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট। একটি কক্ষে কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন ইত্যাদি তীর্থস্থানের দৃশ্য প্রাচীরে চিত্রিত রহিয়াছে। চিত্রকর যে বর্ত্তমান শিল্প

বিজ্ঞানে নিতান্ত অপটু ছিল, এমন বোধ হইল না। ইহারই পার্শ্বে আবার প্রকাণ্ড অন্তঃপুর-মহল। তাহাতে যাবতীয় অন্তঃপুর-বাসিনীগণ বাস করিতেন। আজ তাহা ব্যাঘ্রের বাসস্থান হইয়াছে। কালের ও মানব-অদৃষ্টের কি বিচিত্র গতি! শুনিলাম, ব্যাঘ্রে সম্প্রতি মানুষ মারিয়াছে। তাই বাঙ্গালী বীরমন্ত্রী, অন্তঃপুর-মহলের প্রবেশ দ্বার রুদ্ধ করিয়া, অন্তঃপুর-মহলে ব্যাঘ্রদিগের নির্ব্বিবাদ অধিকার করিয়া দিয়াছেন। বীরকুলর্ষভ মানসিংহ এই আম্বের-দুর্গ ও নগর নির্ম্মাণ করেন। যে মানসিংহ কাবুল হইতে বঙ্গদেশের যশোর পর্য্যন্ত বিজয় করেন, যাঁহার অসির অগ্রভাগে আকবরের মোগল সাম্রাজ্য স্থাপিত ছিল, যে আম্বেরের নামে সমস্ত ভারত আসিন্ধু হিমাচল কম্পিত হইত, এবং যাঁহাকে মোগল সম্রাট আকবর পর্য্যন্ত ঈর্ষ্যা ও রাগরক্ত নয়নে দর্শন করিতেন, আজ সেই আম্বেরের, সেই মানসিংহের আম্বেরের এই অবস্থা। তাঁহার অন্তঃপুর ব্যাঘ্রপুরে পরিণত হইয়াছে। মানসিংহ, তোপের মুখে বীরকুলতিলক প্রতাপসিংহকে অপমানের উত্তর দিয়াছিলেন, তোপের মুখে চিতোর ধ্বংস করিয়াছিলেন। আজ চিতোরের যে দশা, তাঁহার প্রাণপ্রতিম আম্বেরেরও সেই দশা! কাল, মনুষ্যগর্ব্বের ও পাপের কি ভীষণ পরীক্ষক ও দণ্ডবিধাতা। আম্বেরের দুর্গস্থিত রাজবাটির শীর্ষকক্ষ হইতে, পর্ব্বতমালায় বেষ্টিত, ভগ্নগৃহপূর্ণ হতগৌরব আম্বের, এবং পার্শ্বস্থিত জয়পুর দেখিতে দেখিতে, হৃদয় কি বিষাদে, কি গাম্ভীর্য্যেই পরিপূর্ণ হইয়াছিল। এখনও শৃঙ্গে শৃঙ্গে দুর্গ বিরাজিত। ঠিক যেন প্রাণশূন্য শব, ঠিক যেন বীরপুরুষের দেহ-কঙ্কাল শৃঙ্গে শৃঙ্গে দেখা যাইতেছে। তাহার ভিতর ছিন্ন-বস্ত্রে, ভগ্ন অস্ত্রে সজ্জিত, কতকগুলি শৃগালকুকুরাধম সৈন্য আছে। দেখিলে লোকের ঘৃণা হইবে। সেই জন্য, এ সকল দুর্গে প্রবেশ নিষিদ্ধ।

আমি এই শৃঙ্গস্থিত দুর্গমালা, গহ্বরস্থিত মৃত নগরের সমাধি এবং জীবিত নগরের চাক্‌চিক্য দেখিয়া ভাবিলাম,—

ভারতে যেমতি পুরাকালে হায়!
শোভিত আসন্ন আলোকমালায়
যেমতি গাইত গীত গায়িকায়,
পূরিয়া যামিনী সঙ্গীত সুধায়।
সেই নৃত্যগীত রয়েছে সকল,
কিন্তু কোথা গেল সেই বীর্য্যবল?”

ভাবিতে ভাবিতে চিন্তাবসন্ন হৃদয়ে জয়পুরে ফিরিলাম। জয়পুর বাঙ্গালীর বড় গৌরবের স্থান। নগরটি অতি সুচারুরূপে নির্ম্মিত ও সজ্জিত। প্রশস্ত রাজপথ সকল জয়পুরকে ঠিক যেন একটি শতরঞ্চ খেলার ঘরের মত বিভক্ত ও সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিমে সরল রেখায় রাজপথ সকল সারি সারি ছুটিয়াছে। দুই দিকে একরূপ দ্বিতল গৃহশ্রেণী। কি নগর কি রাজবাটী, হুগলীর বিদ্যাধর নামক জনৈক জ্যোতিষী ব্রাহ্মণের কল্পনাপ্রসূত। আজও বাঙ্গালী জয়পুরের মন্ত্রী এবং রাজসহায়; তাই বলিতেছিলাম, জয়পুর বাঙ্গালীর বড় গৌরবের স্থান। মহারাজ জয়সিংহ এক জন প্রতিভাসম্পন্ন জ্যোতিষবিৎ ছিলেন। আপন প্রতিভাবলে, নানাবিধ জ্যোতিষ-যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া, ইনি জ্যোতিষ অনুশীলনের জন্যে, স্থানে স্থানে মান-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। দিল্লীর বহির্ভাগে এরূপ একটি অদ্ভুত মন্দির ছিল। এই অধঃপতনের দিনে লোকে ইহার নাম ‘যন্ত্র-মন্ত্র’—দিয়াছে। জয়পুর রাজবাটীর এক কোণেও এইরূপ একটি প্রশস্ত মান-মন্দির আছে। জয়সিংহের সিংহাসনে এমনি শৃগাল সকল বসিয়া তাঁহার অনির্ব্বচনীয় অবমননা করিয়া আসিতেছেন যে, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের এই অদ্বিতীয় অতুলনীয় গৌরবনিদর্শন সকল

সর্ব্বত্র ধ্বংস হইয়া যাইতেছে। এই হস্তি-মূর্খ দের কাছে এতাদৃশ প্রতিভার সম্মান হইবে কেন? যে অর্থ ইহারা প্রতিবৎসর ইংরাজের পদসেবায় ব্যয়িত করেন, যে অর্থ বর্ত্তমান 'রামবাগে' মিউজিয়মে ব্যয়িত হইতেছে, তাহার ভগ্নাংশমাত্রে এ সকল সংস্কৃত ও রক্ষিত হইতে পারে। এ কথাটা মহারাজকে বলিতে আমি সংসার বাবুকে বলিয়াছি। তিনি বলিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। যে উদ্যান নির্ম্মিত হইতেছে, তাহা যদি আম্বেরের দুর্গের পদমূলে উপত্যকায় নির্ম্মিত হইত, মিউজিয়মটি যদি প্রথমোক্ত ঝিলের কেন্দ্রস্থলে নির্ম্মিত হইত, তবে পুরাতন আম্বের পুনর্জীবিত হইত, এবং শিল্পের সঙ্গে প্রাকৃতিক শোভা মিলিয়া কি অপূর্ব্ব দৃশ্যেরই সৃষ্টি করিতে পারিত! কিন্তু সে সহৃদয়তা, সে সৌন্দর্য্য-জ্ঞান, দেশীয় রাজাদের থাকিবে কেন? তাহা হইলে তাঁহারা ভারতীয় রাজা হইতেন না।

জয়পুরের বর্ত্তমান মহারাজ কায়েম সিংহ সম্বন্ধে গোটা দুই-গল্প বলিব। ইনি জয়পুর রাজ্যের এক জন সামান্য সর্দ্দার ছিলেন। জ্যেষ্ঠ সহোদরের সঙ্গে তাঁহার বিরোধ হয়, এবং তিনি রাজবিচার অগ্রাহ্য করিয়া যুদ্ধ করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠের সাহায্যার্থ এবং তাঁহার দমনার্থ রাজসৈন্য প্রেরিত হইলে, ইনি পরাভূত হইয়া পলায়ন করিয়া বৃন্দাবনে যান, এবং সেখানে ভিক্ষুকের মত সস্ত্রীক থাকেন। এ দিকে অপুত্রক রাজা রাম সিংহ মৃত্যুশয্যায় শায়িত হন, এবং কায়েম সিংহের বীরত্বে এবং তেজস্বিতায় প্রীত হইয়া, তাঁহাকে উত্তরাধিকারিত্বে মনোনীত করেন। কায়েম সিংহ, 'মাধো সিংহ,' নাম গ্রহণ করিয়া, জয়পুরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। অদৃষ্টের আবর্ত্তনে বৃন্দাবনের ভিক্ষুক জয়পুরের মহারাজ হইল। তিনি নির্ব্বাসন সময়ে অসাধারণ কষ্টভোগ করিয়াছিলেন। তিনি তাহার অনেক অদ্ভুত গল্প করেন। এখন যাহারা রাজবাটীর এবং তাঁহার নিজের ভৃত্য ও রাজকর্ম্মচারী, তিনি তাহাদিগকে

দেখাইয়া বলেন, "এই ব্যক্তি ঘুস না পাইলে আমাকে গলায় ধাক্কা দিয়া রাজবাটীতে প্রবেশ করিতে দিত না, এই কর্ম্মচারী ঘুস না পাইলে আমার কারাবাসী সহচরদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে দিত না। রাজকর্ম্মচারীদের সকলের দোষগুণ আমি জানি এবং রাজনীতি সকল কি কৌশলে ব্যর্থ করিতে পারা যায়, আমি তাহাও জানি," অথচ তিনি সিংহাসনে বসিয়া একটি কর্ম্মচারীকেও কর্ম্মচ্যুত করেন নাই।

একদিন সংসার বাবুকে দেখাইয়া, তাঁহার পরিচারকবর্গের সমক্ষে, সংসার বাবুর ছোট ভাই পূর্ণ বাবুকে বলেন—"তোমার যে এই দাদাটি দেখিতেছ, ইনি বড় সহজ পাত্র নহেন। ইনি স্কুলে আমার শিক্ষক ছিলেন। আমাকে মারিবার জন্ম বলিতেন, "'কায়েম সিংহ! হাত লাও।' আরে! মার খানেকে ওয়াস্তে কোই ক্যা হাত লাতায়? আমি প্রাণান্তে হাত বাড়াইতাম না, এবং উনি মারিতে আসিলে, আমি টেবিলের চারিদিকে ঘুরিতাম। উনি তাড়াইয়া তাড়াইয়া আমাকে মারিতেন। আমি এক এক বার মনে করিতাম, ধরিয়া হাড় গুঁড়া করিয়া দি। এখন করযোড় করিয়া আমার সমক্ষে দাঁড়াইয়া আছেন। আর এখন যদি আমি বলি, 'হাত লাও।'—বাপ! কি মারটাই আমাকে মারিয়াছে।" সকলে হাসিতে লাগিল। সংসার বাবুও হাসিয়া বলিলেন—"মহারাজ! আমি যদি জানিতাম, তুমি জয়পুরের মহারাজ হইবে, আমি তোমাকে আরও বেশী করিয়া মারিয়া শিক্ষা দিতাম।" দেখিলে, যেমন শিষ্য, তেমনি গুরু কিনা? এখন তিনি সংসার বাবুকে ছায়ার মত সঙ্গে রাখেন, এবং এক জন সামান্য লোকের ন্যায় যখন তখন কান্তি বাবুর বাড়ী যান। এই দুই গল্পে তুমি লোকটি কি প্রকার চতুর, তেজস্বী ও সহৃদয়, তাহা বুঝিতে পারিবে।

আর কত লিখিব। জয়পুরে দু'দিন রাজভোগ খাইয়াছি, রাজার গাড়ীতে ও হাতীতে রাজার মত সম্মানে রাজ্য পরিদর্শন করিয়াছি। মহারাজ যদিও তখন জয়পুরে ছিলেন না, তথাপি রোজ সংসার বাবুর বাড়ীতে রাজার পাকশালা হইতে আহারীয় আসিত। রান্নাতে ঝালটুকু যেন বেশি। ভারতীয় রাজারা দিন দিন ইংরাজ পলিটিকেল দ্বারা যেরূপ অপমানিত হন, ঝাল খাইয়াই সেই ঝাল নিবারণ করেন। এক দিন মহারাজ গবর্ণরজেনেরেলের ইভিনিং পার্টিতে গিয়াছেন। আমাদের দেশের এক জন বিলাসী, ইংরাজপছন্দ, সাহেবী ধরণের মহারাজকে, সেখানে সুরাপান করিতে ও কেক খাইতে দেখিয়া, সংসার বাবুকে বলিলেন, "ইহার বাড়ীতে কি খাওয়া মেলে না? এখানে ঝুটা খাইয়া বেড়াইতেছে কেন?"

পুষ্কর।

কাল প্রাতে আজমীর পঁহুছিয়া পুষ্কর দেখিতে যাই। পুষ্কর যেমন মনে করিয়াছিলাম, তেমন কিছুই নহে। গোবর্দ্ধনের মত একটি নৈসর্গিক সরোবর মনে কর। গোবর্দ্ধন হইতে কিঞ্চিৎ বড় হইলেও, দেখিতে তেমন মনোহর নহে। সেইরূপ একটি ঝিল। তাহার দুই পার্শ্বে সারি সারি অট্টালিকা। অন্য দুই দিকে অট্টালিকাশ্রেণী কিছু বিরল। কিঞ্চিৎ দূরে, চারি দিকে রাজগিরের পাহাড়ের মত পাহাড় তরঙ্গিত ভাবে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। জলের

বর্ণ নীল, কিন্তু এত ময়লা যে, ব্রহ্মা তাঁহার যজ্ঞের উপযোগী মনে করিয়া থাকিলেও, আমি তাহা কোনও মতে স্পর্শ করিতে মনে প্রবৃত্তি জন্মাইতে পারিলাম না। তারাচরণ পাঁচ ডুব দিয়াছেন, যদি কিছু পুণ্য হইয়া থাকে, অবশ্য আমি তাহার অংশ পাইব। কারণ তারাচরণ আমাকে যেরূপ ভালবাসে, স্বর্গের ভাগ দিতেও কখন কাতর হইবে না। পুষ্করের মধ্যস্থলে, একখানি উপলখণ্ডের উপর, জনৈক মকর মহাশয় নিদ্রা যাইতেছিলেন, কি তপস্যা করিতেছিলেন, বলিতে পারি না। যজ্ঞ-জলে তাঁহারও যেন অতৃপ্তি হইয়াছে, কারণ আমরা যতক্ষণ ছিলাম, ততক্ষণ তিনি নিশ্চল ছিলেন; একটি বারও জলে নামিলেন না।

পুষ্কর দর্শন করিয়া, একখানি ক্ষুদ্র খাটুলি চড়িয়া, সাবিত্রী দেবীর দর্শনলাভ করিতে পার্শ্ববর্ত্তী পর্ব্বতে আরোহণ করি। খাটুলি সামান্য দড়ির বন্ধন, স্থানে স্থানে ঠক ঠক করিয়া পাথরে লাগিতেছিল, আর আমি ভাবিতেছিলাম, ভারতভ্রমণ বুঝি এই খানেই শেষ হইল। প্রায় এক ঘণ্টাকাল আরোহণ করিবার পর, আমরা মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। একটি ক্ষুদ্র মন্দির। দুটি শ্বেত প্রস্তরের মূর্ত্তি—সাবিত্রী ও সরস্বতী। দুটি মূর্ত্তিই যেন জৈন বলিয়া বোধ হইল। পর্ব্বতশেখর হইতে দৃশ্যটি মনোহর, কিন্তু কঠোর। শ্রেণীর পর শ্রেণী বাঁধিয়া বন্ধুর পর্ব্বতমালা শোভা পাইতেছে। মধ্যে মধ্যে মাড়োয়ারের বন্ধুর উপত্যকা, কোথাও বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামে ও শস্যক্ষেত্রে বিচিত্রিত। পাদমূলে পুষ্কর ও বাপীতীরস্থিত নগর, শ্বেত পুষ্পে পুষ্পিত, একটি মনোহর উদ্যানের মত শোভা পাইতেছে। কিন্তু, চন্দ্রশেখরের দৃশ্যের কাছে ইহা কিছুই নহে।

অবতরণসময়ে ব্রহ্মার মন্দির দর্শন করি। লোকটি নিতান্ত অরসিক ছিলেন না, তাঁহারও শুক্লপক্ষের ও কৃষ্ণপক্ষের দুই

বনিতা। সাবিত্রী দেবীর যজ্ঞে আসিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব দেখিয়া, তিনি নবযৌবনসম্পন্না 'বালস্ত্রী' গায়ত্রী দেবীকে বিবাহ করেন। সাবিত্রী দেবীও আমাদের বঙ্গলক্ষ্মী, তিনি চটিয়া লাল। পাহাড়ে চড়িয়া নব দম্পতীকে অভিশাপ দিলেন যে, তাঁহার চরণধৌত জল তাঁহাদের মস্তক পাতিয়া লইতে হইবে। বড় বেজায় কথা! স্বয়ং ব্রহ্মার যদি এই দশা হয়, তবে আমরা গরিব কোথায় যাই? মন্দিরে ব্রহ্মার শ্বেত প্রস্তরের চতুর্মুখ মূর্ত্তি এবং পার্শ্বে সেই ছোট ঠাকুরাণী। বুড়া এত চোটের পরও নব যৌবনের মায়া ছাড়িতে পারে নাই!

মোট কথা, পুষ্কর সত্যযুগে বোধ হয় একটি অতি মনোজ্ঞ ও অতি পবিত্র স্থান ছিল। শৈলমালাবেষ্টিত একখণ্ড গভীর নির্ম্মল সলিল দর্পণ, তাহার চারি পার্শ্বে বৃক্ষলতাশোভিত, নানাবিধ পক্ষীর কলগানে মুখরিত, এবং যজ্ঞধূমে সমাচ্ছন্ন, আশ্রমাবলী হইতে বেদধ্বনি সমুত্থিত হইতেছে; দৃশ্যটি না জানি কি পবিত্র, কি হৃদয়গ্রাহী ছিল। যদি ইউরোপীয় কোন জাতির তীর্থ স্থান হইত, তবে পুষ্কর আজ ঠিক সেইরূপ দেখিতে পাইতাম। সেই দৃশ্যটির সৃষ্টি করা বড় বেশী ব্যয়সাধ্যও নহে। ইহার চারিদিকে এখনও কত হিন্দু রাজা আছেন। কিন্তু তাঁহারা এরূপ মহাপাতক করিবেন কেন?

ফিরিয়া আসিয়া, সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে, আজমীরস্থ বিখ্যাত ফকিরের দরগা দেখিতে যাই। ইনিই কুক্ষণে আমাদের ভারতবর্ষে মহম্মদীয় ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্যে প্রথম প্রবেশ করেন পার্শ্বে জৈনদিগের একটী অতি বৃহৎ, অতি প্রশস্ত, এবং মনোহর কারুকার্য্যে খচিত দেবালয় ছিল। মহম্মদ ঘোরি আজ্ঞা প্রচার করেন যে, এই মন্দিরে তিনি জুম্মার নমাজ পড়িবেন। জুম্মা ২॥ দিন বাকি। ২॥ দিবসের মধ্যে হিন্দুর দেবালয় ভগ্ন করি

কথঞ্চিৎ মসজিদের আকৃতি করা হয়। ইহার নাম সেই জন্য ২॥ দিনের ঝোপরা। সেই দেবালয়ের প্রাচীর, স্তম্ভ, ছাদ, কারু-কার্য্যে এখনও শোভা পাইতেছে। বোধ হয়, এই দেবালয়ের প্রস্তরের দ্বারা পার্শ্বস্থিত দরগা নির্ম্মিত হয়। কবরের চারিদিকে রূপার রেলিং। প্রশস্ত প্রাঙ্গণের এক সীমাতে বাদসাহ আকবর ও সাহাজান নির্ম্মিত মসজিদ, দেওয়ান-খাস ইত্যাদি গৃহ বর্ত্তমান আছে। প্রবাদ, সমস্ত একটি শিবালয় ছিল। কাপুরুষের দেবতাও কাপুরুষ হইয়া থাকে। কালা পাহাড়ের ভয়ে শিব পাতালে প্রবেশ করেন। মুসলমানেরা বলেন, ফকির এই পথে তিরোহিত হইয়াছিলেন। এই দরগাতে দুটি প্রকাণ্ড তামার ডেক, দুটি ইষ্টকনির্ম্মিত চুল্লির উপর বিরাজ করিতেছে। দেখিতে যেন এক একটি ক্ষুদ্র পুষ্করিণী। ১৫০০৲ এবং ৯০০৲ টাকা ব্যয় করিলে, ইহার এক একটিতে খিচুড়ী পাক হয়, এবং লোকেরা কম্বল জড়াইয়া ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া তাহা লুটিয়া খায়।

একটি শোক-ইতিহাস ইহার সঙ্গে জড়িত আছে। আলা-উদ্দিন চিতোর জয় করিয়া, এক যোড়া রজত-খচিত চন্দনের কপাট, একটি পিত্তলনির্ম্মিত প্রদীপের বৃক্ষ বা ঝাড়, এবং দুইটি নাকাড়া এখানে আনিয়া, তাহার বিজয়পতাকা চিহ্ন-স্বরূপ প্রকাশ্য স্থানে রাখে। তাহা এখনও আছে। অপমানে, অভি-মানে, চিতোরাধিপতি প্রতিজ্ঞা করেন যে, যে পর্য্যন্ত তাহা উদ্ধার করিতে না পারিবেন, সে পর্য্যন্ত মেবারেশ্বর আজমীরে প্রবেশ করিবেন না। তিনি বহু যুদ্ধেও এই প্রতিজ্ঞাপালন করিতে পারেন নাই। রাজপুতনার সেই সূর্য্য অস্ত গিয়াছে, তথাপি, উদয়পুরের রাণা একবার ইংরাজ কর্ত্তৃক বাধ্য হইয়া এখানে আসিয়াও নগরের বাহিরে ছিলেন, মধ্যে প্রবেশ করেন নাই।

রাজপুতনানার অধঃপতন, হিন্দুধর্ম্মের এই দুর্গতি, তারাগ
নীরবে শৈলসানু হইতে চাহিয়া দেখিতেছেন। এ দুর্গ পৃথ্বীরা
প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ইহার তোরণে এখন বৃটিশ বৈজয়ন্ত
উড়িতেছে।

অন্য প্রাতে আনা-সাগর দেখিতে যাই। আনা নামক রাজ
নদী স্রোত বন্ধ করিয়া, এই সাগর সৃষ্টি করেন। ইহার তি
দিকে শৈলমালা, এক দিকে উক্ত বাঁধ এবং তদুপরি ভগ্ন হি
রাজভবনের উপর মোগলদিগের রাজপ্রাসাদাবলী বিরাজিত রহি
য়াছে। ইহার শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত দেওয়ান-আমে, জাহাঙ্গীর প্রথ
ইংরাজ রাজদূত সার টমাস রোয়ের সঙ্গে কুক্ষণে সাক্ষাৎ করেন
এইরূপে এইখানে দুইটি সাম্রাজ্যের অধঃপতনের সূত্রপাত হ
ভারতের দুইটী মহা দুর্দিন এখানে আমাদের অদৃষ্টগগনে সঞ্চ
রিত হয়। সেই সকল শ্বেতপ্রস্তর-নির্ম্মিত অট্টালিকাতে এখ
কমিশনর বিহার করিতেছেন, এবং তাহাতে তাঁহার আফিস
মিউনিসিপাল অফিস বিরাজ করিতেছে। জগতের কি বিচি
গতি! বাদসাহরমণীদের ক্রয়-বিক্রয় করিবার জন্যে যে "মি
বাজার" ছিল, এখন তাহা উদ্যানের কুলির নিবাস!

একটী বড় সুন্দর গল্প শুনিলাম। এই উদ্যানের ও সাগরে
উপরিস্থ এক অত্যুচ্চ শিখরে রাজপুতানার এজেণ্টের উপনিবাস
একদা তিনি এখানে পদার্পণ করিলে, সৌধচূড়ায় তাঁহার বৈ
য়ন্তী উড়িল। কিন্তু ততোধিক উচ্চ শৈলে, হনুমানজীর আস্তানা
তাঁহার বৈজয়ন্তী উড়িতেছে। রাজপুরুষ তাহা সহিতে পারিবে
না। তিনি আস্তানার সন্ন্যাসীকে ডাকিয়া বলিলেন যে, রা
প্রতিনিধির বৈজয়ন্তী অপেক্ষা হনুমানের বৈজয়ন্তী ঊর্দ্ধে থাকি
পারিবে না। সন্ন্যাসী হনুমানের চেলা, তাহার কিঞ্চিৎ বী

জয়স্তী ত উৰ্দ্ধে উড়িবেই, তাহাতে আবার আশ্চর্য্যের বয় কি?

চিতোর।

এ পত্রে চিতোরের কথা লিখিব। কারণ, চিতোরের কথা তুমি নিতে বোধ হয় নিতান্ত উৎসুক হইয়া রহিয়াছ। কিন্তু কি লখিব? চিতোরের নাম করিতেই আমার হৃদয় কি শোকের ও ভক্তির উচ্ছ্বাসে পূর্ণ হয়, তাহা বলিতে পারি না।

নিশীথসময়ে চিতোর ষ্টেসনে উপস্থিত হই। আমাদিগকে ডাকবাঙ্গালা দেখাইয়া দিবার জন্য, ষ্টেসনে একটি লোক চাহিলাম। শুনিলাম যে, এই অল্প পথটুকু যাইতেই পথে এত 'ভেঁড়িয়া' (নেকড়ে বাঘ) যে, গলায় কামড়াইয়া ত ধরেই, তাহা ছাড়া, "ছোড়তা বি নেহি।" কেহ প্রাণান্তে যাইতে স্বীকার করিল না। ইহাতেই তুমি বুঝিতে পারিবে, কি বীরভূমি, কি অরণ্য ও কাপুরুষের বাসভূমি হইয়াছে। কাযে কাযেই সে রাত্রি, ষ্টেসনের মেজেতে পড়িয়া কাটাইলাম। প্রাতে চিতোরস্থ 'হাকিমে'র নিকট হইতে হস্তী এবং পাশ লইয়া আমরা দুর্গ দর্শন করিতে যাই। দুর্গপদমূলে এখনও একটী গ্রাম আছে। এই গ্রামটী পার হইয়া আমরা চিতোরশৈলে আরোহণ করিতে আরম্ভ করি। আরাবলী গিরিশ্রেণী হইতে একটী পর্ব্বত স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে। তাহাই চিতোর দুর্গ। অতি প্রশস্ত পথ, ঘুরিয়া শৈলশেখরে উঠিয়াছে। পর্ব্বতটী রাজগিরের পর্ব্বতের মত প্রস্তরময়। ক্রমে পদ্মদ্বার, হনুমানদ্বার, গণেশদ্বার, দুটী ঝুলনদ্বার,

সূর্য্যদ্বার, সর্ব্বশেষে পুরদ্বার অতিক্রম করিয়া, প্রায় এক ঘণ্টাকাল আরোহণের পর, সানুদেশে উপস্থিত হই। সানুদেশ উত্তর দক্ষিণে মাইল তিন দীর্ঘ, এবং এক মাইল সমতলভূমি। ইহার উভয় পার্শ্ব হইতে মধ্যস্থল ঈষৎ নিম্ন। তাহাতে নানা স্থানে জলাশয় নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই প্রশস্ত সানুদেশ বেষ্টিয়া দুর্গ-প্রাচীর এবং প্রাচীরের মধ্যে লক্ষ বীরপুরুষের পুণ্যধাম চিতোর নগর অবস্থিত ছিল। এখন তাহার ভগ্নাবশেষে পরিপূর্ণ। চিতোর এখন একটি মহাশ্মশান। এখনও স্থানে স্থানে তৈল-কুণ্ড, ঘৃতকুণ্ড ইত্যাদি বর্ত্তমান রহিয়াছে। যুদ্ধের সময় তাহা পূর্ণ রাখা হইত। হায়! হায়! আজ সেই বীরনগর, সেই বীরপুরুষ সকল কোথায় গেল?

আমরা প্রথমে মাতা পদ্মিনী দেবীর আবাসস্থান দেখিতে যাই। শুনিলাম, তাহার চিহ্নমাত্রও ছিল না। ভূতপূর্ব্ব মহারাজ সজ্জন সিংহ এক জন প্রকৃত সজ্জন ছিলেন। তিনি চিতোরের ঐতিহাসিক স্থানগুলির পুনর্নির্ম্মাণ করিতেছিলেন। তাঁহার সুযোগ্য উত্তরাধিকারী তাহা বন্ধ করিয়াছেন। সজ্জন সিংহ পদ্মিনীর আবাসস্থানের ভিত্তি খুঁজিয়া কয়েকটি দেওয়াল তুলিয়াছেন এবং কয়েকটি ক্ষুদ্র কক্ষ নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছেন। অট্টালিকাশিরে স্ফটিকের নক্ষত্র, সতীত্বের ধ্বজার মত, সূর্য্যালোকে ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছিল। পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র সরোবরের মধ্যে একটী ক্ষুদ্র দ্বিতল গৃহ। পদ্মিনী দেবী তাহাতে ক্রীড়া করিতেন। যে সৌন্দর্য্যের প্রতিবিম্বমাত্র দিল্লী উন্মত্ত করিয়াছিল, সেই ঘোরতর শোকনাটক ঘটাইয়াছিল, যাহার জন্যে এত বীরগণ যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের উপবীত পরিমাণে ৭৪৷৷০ মণ হইয়াছিল; সেই সৌন্দর্য্যের এইমাত্র স্মৃতিচিহ্ন চিতোরে বিদ্যমান রহিয়াছে।

'পদ্মিনীর মহল' দর্শন করিয়া আমরা 'কালী মাইর' মন্দির দেখি। একটি শ্বেতপ্রস্তরের মূর্ত্তি, তাহার পার্শ্বে একটি কৃষ্ণ প্রস্তরের মূর্ত্তি। প্রথমটী জৈন বলিয়া বোধ হইল। মন্দিরটীও যেন জৈনমন্দিরের প্রস্তরের দ্বারা নির্ম্মিত বোধ হইল। মূর্ত্তি দুইটীর ইতিহাস কেহ কিছুই জানে না। এই কুলাঙ্গারদের অপেক্ষা চিতোরের ইতিহাস আমরা অধিক জানি। এই মন্দিরেই সেই চিতোরেশ্বরী কালী ছিলেন। তিনিই স্বপ্ন দেখাইয়াছিলেন—"মঁয় ভুখা হোঁ!" হায় মা! এখন কি তোমার ক্ষুধা নিবারণ হইয়াছে? আজ যে চিতোরের কয়েকটী কঙ্কালমাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে!

তাহার পর, মীরা বাইয়ের নির্ম্মিত মন্দির ও তাহাতে স্থাপিত রাধাকৃষ্ণের মনোহর মূর্ত্তি দর্শন করিয়া, আমরা কুম্ভরাণার কীর্ত্তিস্তম্ভে আরোহণ করি। এই স্তম্ভটী আমার কাছে সর্ব্বপ্রশংসিত, কুতুব মিনার বা পৃথ্বীরাজের স্তম্ভ অপেক্ষা অধিক মনোহর বোধ হইল। স্তম্ভটী উপর্য্যুপরি নয়টী প্রকোষ্ঠ দ্বারায় নির্ম্মিত। কুতুব মিনারে ক্রমাগত কেবল সোপান বাহিয়া উঠিতে হয়। এই স্তম্ভের এক প্রকোষ্ঠ হইতে অন্য প্রকোষ্ঠে উঠিয়া, প্রকোষ্ঠ প্রদক্ষিণ করিয়া, তাহার পর আবার সোপান আরোহণ করিতে হয়। প্রত্যেক প্রকোষ্ঠের মধ্যস্থলে এক একটী দেব দেবীর মূর্ত্তি বিরাজমান রহিয়াছে। দিল্লীশ্বরকে উপর্য্যুপরি পরাজয় করিয়া, মহাবীর কুম্ভরাণা এই কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

তাহার পর যে স্থান দর্শন করিলাম, তাহা ভুলিবার নহে। স্থানটীর নাম গোমুখী। গিরিপার্শ্বে দেব দেবীর মূর্ত্তিতে পরিপূর্ণ একটী অতি সুন্দর কক্ষ। তাহার পশ্চাৎ পার্শ্ব দিয়া, চন্দ্রশেখরের মন্দাকিনীর মত, দুইটী নির্ঝরধারা প্রবাহিত হইয়া সম্মুখস্থ

প্রস্তরনির্ম্মিত সরোবরে পড়িতেছে। নির্গমপথ বন্ধ করিলে সরোবরটীর মুখে মুখে জল হয়। সমস্ত স্থানটী বৃক্ষচ্ছায়ায় সমাচ্ছন্ন। শীতল, নির্জ্জন এবং শান্তিপ্রদ এমন স্থান আমি যেন দেখি নাই। রাজপুরী হইতে একটী গুপ্ত পথ, পর্ব্বতের অভ্যন্তর দিয়া এখানে আসিয়াছে। রাজমহিষীরা এই পথ দিয়া আসিয়া অবগাহন করিতেন এবং দেব দেবীর পূজা করিতেন। মূর্খ স্থান-দর্শক আমাদিগকে বলিল, এই সুড়ঙ্গের মধ্যে "জোহর" হইত; যুদ্ধাবশেষে ইহাতেই বীরনারীরা পুড়িয়া মরিতেন। আমি তাহা বিশ্বাস করিলাম না। অনেক জিজ্ঞাসার পর বলিল, রাজপুরীর মধ্যে এই সুড়ঙ্গের অন্য মুখ আছে। আমরা ঊর্দ্ধশ্বাসে সেখানে গেলাম। ইহা টড সাহেবের বর্ণনার সঙ্গে মিলিল। এই সেই পর্ব্বতাভ্যন্তরীণ কক্ষের পথ, যাহতে সহস্র সহস্র বীরনারীরা প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া, জগতের বিস্ময়কর সতীত্বের এবং সাহসের জলন্ত ও জীবন্ত প্রমাণ রাখিয়া গিয়াছেন। তাহার ভিতর প্রবেশ করিবার সাধ্য নাই। শুনিলাম, বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আমি এই পবিত্র স্থানকে ভক্তিভরে প্রণাম করিলাম এবং ললাটে ইহার ধূলা মাখিলাম। এইটী আমাদের একটী প্রকৃত মহাতীর্থ।

হায়! হায়! কি কুলাঙ্গারেরা, কি হৃদয়হীন নরাধমেরা, কি শৃগালেরাই সিংহদিগের আসনে বসিয়াছে। যদি এই চিতোর ইংরাজদিগের কোনও রূপ ঐতিহাসিক ক্ষেত্র হইত, আজ সেই পদ্মিনীর পবিত্র আবাসগৃহ, সেই রাজপুরী, আমরা একটী বৃহৎ উদ্যানে বিরাজিত দেখিতাম। সেই পবিত্র জোহর-কক্ষ, আজ শত আকাশ-গবাক্ষে আলোকিত হইত, কক্ষটী ঐতিহাসিক চিত্রে সজ্জিত হইত। আমরা চিত্রে দেখিতাম, সময়ে সময়ে কিরূপে বীরনারীরা সহস্রে সহস্রে অগ্নি প্রবেশ করিতেছেন,

দেখিতাম, একস্থানে চিতোরেশ্বরী কাণপুরস্থ সেই স্বর্গীয়া দেবীর ায় দাঁড়াইয়া, অধোবদনে রোদন করিতেছেন। চিতোরের ঙ্গে অঙ্গে তাহার ঐতিহাসিক গৌরব সকল স্বর্ণ-অক্ষরে লিখিত াকিত। তুমি জান, প্রতাপসিংহ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, ত দিন দিল্লী জয় করিয়া তিনি চিতোর অধিকার করিতে না ারিবেন, তত দিন তিনি তৃণে ভিন্ন শয়ন করিবেন না, পত্রে ন্ন আহার করিবেন না। শুনিলাম, তাঁহার অযোগ্য উত্তরাধি-ারিগণ এখনও স্বর্ণশয্যার নীচে তৃণ রাখিয়া শয়ন করেন, স্বর্ণ-াত্রের নীচে পত্র রাখিয়া আহার করেন। সেই বীরপ্রতিজ্ঞা খনও তাঁহারা ভুলেন নাই। তথাপি, চিতোরের পদ্মিনীর, িতোরের প্রতাপসিংহের, প্রাণপ্রতিম চিতোরের আজ এই বস্থা! এটি যে চিতোর, তাহা পথিককে বলিয়া দিবার জন্য কটী অঙ্গুলি নির্দ্দেশমাত্র কোথাও নাই। আছে—ইতিহাসে াছে! তারাচরণ বলিলেন, "রক্তধমনী-বিশিষ্ট প্রস্তররাশিতেও ন সেই বীরপুরুষদের শোণিতধারা বর্ত্তমান আছে।" আছে লিয়াই আমি দরিদ্র দুর্ব্বল বাঙ্গালী এই মহাতীর্থ দর্শন করিতে রজীবন লালায়িত ছিলাম। আজ দেখিয়া জীবন সার্থক মনে রিলাম। চিতোর অমর, চিতোর উনবিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্র। তোর ভারতের ভবিষ্যৎ আশা। সে বীরত্ব, সে সতীত্ব ভিন্ন রতের অন্য আশা নাই।

প্রায় ১টার সময়ে অবরোহণ করিয়া আসি। উদয়পুরের নেক মহারাষ্ট্রীয় কর্ম্মচারীর পাচক মহাশয়, আমাদের জন্যে ত্নপূর্ণ আহার প্রস্তুত করিতেছিলেন। একদিকে প্রকাণ্ড কাণ্ড চাউল; অন্যদিকে তদুপযোগী কলাইয়ের ডাল। কোন-ই সিদ্ধ হয় নাই।

যোধপুর।

ভগবানের কৃপায়, বড় সুখে বড় সম্মানে, যোধপুর দর্শন করিয়া আসিলাম। কাল যে কার্ড লিখিয়াছি, তাহাতে জানিয়াছ, যোধপুরের এসিষ্টাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পণ্ডিত জীবানন্দের সহিত লাহোর যাইবার সময়ে রেলে সাক্ষাৎ হয়। আর একটি লোক অম্বালার কমিশরিয়েটের ছিলেন। অর্দ্ধ ঘণ্টার আলাপের পর, তাঁহারা এত প্রীত হন যে, উভয়ে আমাকে অম্বালা ও যোধপুরে যাইতে নিতান্ত অনুরোধ করেন। অম্বালায় যাইতে পারিলাম না। যোধপুরে পণ্ডিত জীবানন্দের কাছে টেলিগ্রাফ করি। ষ্টেসনে পৌঁছিয়া দেখি, রাজার বাঙ্গালী কর্ম্মচারী বাবু হরিশচন্দ্র মিত্র, মান্দ্রাজ 'এথিনিয়ম' পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক, আমার অপেক্ষা করিতেছেন। পণ্ডিতের বাড়ী পঁহুছিয়া দেখি, আমার অভ্যর্থনার জন্যে একটি কক্ষ সুন্দররূপে সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি এবং রাজার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হরদয়াল সিংহ—ইনি কাউ-ন্সেলেরও মেম্বর—এক বাড়ীতে থাকেন। ইহারা দু'জন যে কি আদর করিলেন, বলিতে পারি না। দুই বেলা পরিপাটী আহার। বসিতে হয় আসনে, কিন্তু থাল থাকে একখানি অতি সুন্দর চৌকির উপর। থাল রূপার, তাহার উপর সমুদয় রূপার বাটী সাজান রহিয়াছে। চামচ দিয়া তরকারী লইয়া খাইতে হয়। রান্না পঞ্জাবী ধরণের। কারণ, ইহারা পঞ্জাবী।

সন্ধ্যার সময়ে, হরদয়াল সিংহ আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া রাজার ভ্রাতা ও মন্ত্রী কর্ণেল সার প্রতাপ সিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করান। আমরা জানিতাম যে, কেবল নরাধম সিবিলিয়ানগুলোই বুঝি খোসামুদির প্রিয়। কিন্তু দেখিলাম, এ রাজাদের কাছে তাহারা কোথায় লাগে! হরদয়াল সিংহ আমাকে ইহার ইঙ্গিত

করিয়াছিলেন। আমি যদিও এ কার্য্যে অনভ্যস্ত, তথাপি সেই স্বরে বীণা বাঁধিয়া আলাপ করিলাম। তিনি এত সন্তুষ্ট হন যে, অপরাহ্নে ফিরিয়া গিয়া তাঁহার অশ্বারোহী সৈন্যের ব্যায়াম দেখিতে বলেন। আমি নূতন রাজবাড়ী দেখিতে যাই। সম্মুখের একটি বাড়ীতে—এটীই শ্রেষ্ঠ অট্টালিকা—শুনিলাম, রাজার উপপত্নী থাকেন এবং রাজা দিন রাত্রি এখানেই পড়িয়া থাকেন। তাহার পশ্চাতে অন্তঃপুরমহল। তাঁহার মহিষী কয়েক জন তাহাতে আবদ্ধ আছেন। রাজকার্য্যের সম্যক্ ভার প্রতাপসিংহের হস্তে, তিনিই প্রকৃত রাজা। নূতন বাড়ী, আমাদের চক্ষে কিছুই লাগিল না। তবে নূতন যে একটী কার্য্যালয়বাড়ী হইতেছে, তাহা অতি জাঁকাল রকমের। ফিরিয়া আসিয়া, প্রতাপসিংহের কাছে বসিয়া অশ্বক্রীড়া দেখি। মাড়ওয়ার রাজ্যের সর্দ্দারদিগের শিশুদিগকে পর্য্যন্ত তিনি অশ্বারোহণে শিক্ষা দিতেছেন। খোকার অপেক্ষা ছোট্ট ছোট শিশুরাও নক্ষত্রবেগে ঘোড়া ছুটাইতেছে। প্রতাপসিংহকে দেখিলে, রাজপুতকুলতিলক হিন্দুগৌরবসূর্য্য প্রতাপসিংহকে মনে পড়ে। লোকটী দেখিতে ক্ষুদ্র, কিন্তু তেজ যেন ফুটীয়া পড়িতেছে। শুনিলাম, ইনি জীবন্ত ব্যাঘ্রের দন্ত উৎপাটন করেন। তাঁহার ডান হাতে এক ব্যাণ্ডেজ এবং ডান পায়ে অন্য ব্যাণ্ডেজ বাঁধা রহিয়াছে। তদ্রূপ, তাঁহার পারিষদবর্গেরও হস্তে, পদে, চক্ষে, ব্যাণ্ডেজ শোভা পাইতেছে। সকলেই ঘোড়া হইতে পড়িয়া আহত হইয়াছে। ইহাতেই বুঝিবে যে, ইহারা কিরূপ অশ্বারোহণে ব্রতী। সন্ধ্যার পর, জ্যোৎস্নালোকে আবাসে ফিরিয়া আসি।

পরদিবস প্রাতে যোধপুরের দুর্গ দেখিতে যাই। একটী প্রায় চন্দ্রনাথের মত উচ্চ শৈলের সর্ব্বাঙ্গ এবং এক পার্শ্বের উপত্যকা আবৃত করিয়া দুর্গপ্রাচীর চলিয়া গিয়াছে। উপত্যকায়, যোধপুরের গৃহাবলী অসংখ্য হংসমালার মত শোভা পাইতেছে।

শৈলশৃঙ্গ ব্যাপিয়া দুর্গের অট্টালিকা। এই দুর্গ ও নগর, তুমি জান, যোধাসিংহ স্থাপন করিয়াছিলেন। তাই ইহার নাম যোধপুর। শৈলশেখর যেরূপ স্তরে স্তরে ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে, সেই রূপ স্তরে স্তরে অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে; তলার উপর তলা উঠিয়া, গগনস্পর্শী বিরাট মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, মনে যুগপৎ ভয় ও বিস্ময়ের সঞ্চার করিতেছে। ইহার কক্ষগুলি অনতিবিস্তৃত, কারণ তাহারা পুরাতন, কিন্তু সুচিত্রিত ও সুসজ্জিত। তবে ইংরাজি সাজ সজ্জার তত বাড়াবাড়ি নাই। একটী কক্ষে রজত দোলা রজত-শৃঙ্খলে দুলিতেছে। তাহার পশ্চাতে এক বিরাট আরসি। যখন যোধপুরাধিপতি এই দোলায় দুলিতে থাকেন, ভুবনমোহিনী মহিষীগণ কেহ বা অঙ্কে বসিয়া আছেন, কেহ বা চন্দ্রকে ঘেরিয়া তারামালার মত চারিদিকে দোলা আলো করিয়া বসিয়া আছেন, কেহ বা অলঙ্কার-ঝনৎকারে কক্ষ পূর্ণ করিয়া তালে তালে দোলাইতেছেন, দুলিতেছে রূপসী, দোলাইতেছে রূপসী, তখন কি প্রতিবিম্বই না জানি আরসীতে প্রতিভাত হয়! ইচ্ছা হয়, আরসী হইয়া একবার সে রূপতরঙ্গের প্রতিবিম্বমাত্রও অনুভব করিয়া জীবন সার্থক করি। চটিতেছ না ত? কিন্তু, কি নরকুলাঙ্গারই যোধার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। এহেন রাজপুরীতে তাঁহার তৃপ্তি হইল না। তিনি কতকগুলা অশ্বশালার মত গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া, তাহাতে উপপত্নী লইয়া বিরাজ করিতেছেন, রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্কও নাই।

দুর্গদ্বারে কি পবিত্র দৃশ্য! রাজপত্নীগণ সহমরণে যাইবার সময় হস্তে যে চন্দন মাখিয়া স্বামীর শবের সঙ্গে দুর্গের বাহিরে শ্মশানে যাইতেন, দুর্গের বাহির হইবার সময়ে, তাহার দুই পার্শ্বের প্রাচীরে পবিত্র করপদ্মের চিহ্ন রাখিয়া যাইতেন। আমাদের সঙ্গে 'পাওনিয়ারের' সংবাদদাতা একটী সাহেব ছিলেন।

তিনি গণিলেন, এরূপ ৩২টী কর-চিহ্ন আছে। কিন্তু আহা! কি অযত্নে পড়িয়া আছে। আমাদের হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল। আমি সাহেবটীকে বলিলাম—"তোমার 'পাওনিয়ার' পত্রিকা আমাদিগকে অজস্রধারায় গালি দিতে পারে, কিন্তু এই যে পুরাতন ঐতিহাসিক কীর্ত্তি ধ্বংস হইয়া যাইতেছে; এই যে পবিত্র আত্ম-বিসর্জ্জনের নিদর্শন সকলের একটী টেবলেট্ মাত্রও নাই, ইহার প্রতি কি তোমাদের কথনও চক্ষু পড়ে না? কোন্ কোন্ সাধ্বী এরূপে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহাদের নামের একটী তালিকা ও ঘটনার কাল, এস্থানে কি রাখা কর্ত্তব্য নহে? এ স্থানটী একটী পবিত্র তীর্থের মত কি রক্ষিত হওয়া উচিত নহে? এই দুর্গে কত ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহার অঙ্গে কি সে সকল লিখিত থাকা উচিত নহে?" সাহেব লজ্জিত হইয়া বলিলেন, এই প্রথম ব্যক্তির সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল, যে এরূপে তাঁহার চক্ষু খুলিয়া দিল। তিনি ১৩ বৎসর ভারতে কাটাইয়াছেন, কই, কেহ ত এরূপ কথা বলেন নাই। তিনি এখন ভারত ছাড়িয়া যাইতেছেন, তথাপি ইহা ভুলিবেন না। তিনি এত প্রীত হইলেন যে, বরদার সহকারী মন্ত্রীর কাছে, আমার সাহায্যের জন্যে, এক পত্র দিলেন, এবং বম্বে গেলে, তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে অনেক করিয়া বলিলেন। রাজার জনৈক উচ্চ কর্ম্মচারী, এরূপ কথা শুনিয়া আমাকে নিমন্ত্রণ করিলেন, এবং এ বিষয়ে তিনি মনোযোগী হইবেন, বলিলেন। তাহার পর, সেই তিন সহস্র ফুট উচ্চ শৈলশেখরের উপরে অশ্বপদাঘাতে প্রস্তরে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ তুলিয়া, আমরা রাজার প্রকাণ্ড একখানি যুড়িতে গৃহে ফিরিয়া আসিলাম।

আসিবার সময়ে পণ্ডিত জীবানন্দ, শ্বেত-প্রস্তরের দুই সেট চার পেয়ালা ও রেকাবি দিলেন। তাঁহার এবং হয়দয়াল সিংহের

ফটোগ্রাফ দিলেন। উক্ত সাহেব এবং হরিশ বাবু রাজার যুড়িতে আমাদিগকে ট্রেণে উঠাইয়া দিলেন। ষ্টেশনে আবার প্রতাপ সিংহের সঙ্গে দেখা। তাঁহার এক জন শরীররক্ষককে দিল্লীর সৈন্ত-ব্যায়ামে যোগ দিবার জন্তে পাঠাইতে আসিয়াছেন। তিনি আমাকে বলিলেন যে, তুমি যোধপুরে অতি অল্প সময় থাকিয়া চলিয়া যাইতেছ, আবার আসিও। আমি বলিলাম, আপনার অনুগ্রহ থাকিলে আসিতে পারি। যাহা লিখিলাম, তাহাতে বুঝিবে, কি সুখে ও সম্মানে ভারতের পশ্চিম প্রান্তে যোধপুর দর্শন করিয়া গেলাম।

তারাচরণ বলিতেছেন, আমি লিখিতে ভুলিয়াছি যে, যোধপুর দুর্গে এক সুবর্ণরঞ্জিত কক্ষ এবং সুবর্ণ ও রজতে নির্ম্মিত সিংহাসন দেখিয়াছি।

বরদা।

আমরা জয়পুর হইতে আজমীর, পুষ্কর, চিতোর, এবং যোধপুর—ইহাদের বিষয় পূর্ব্বে লিখিয়াছি—দর্শন করিয়া, বরদায় যাই। বরদার সহকারী দেওয়ান বা মন্ত্রী, আমাদিগকে তাঁহার অতিথির মত গ্রহণ করেন। তারাচরণ সঙ্গে বলিয়া, আমি আপা সাহেব রোডের ধর্ম্মশালায় অবস্থান করি। সহকারী মন্ত্রী মনিভাই যশোভাই, আমাকে অনেক অনুযোগ করেন যে, পূর্ব্বে তাঁহাকে কোনও সংবাদ দিই নাই। তাহা হইলে তিনি আমাদের জন্তে যথোচিত বাসস্থান নিয়োজিত করিয়া রাখিতেন। রাজার গাড়ী, রাজার সিপাই ও কারকুন, আমাদের জন্তে নিয়োজিত হয়। আমরা অতি সম্মানের সহিত বরদা দর্শন করি।

বরদায় দেখিবার জিনিস দুই। রাজবাড়ী এবং গুর্জ্জরী। গুর্জ্জর ও গুজরাটের কামিনীকুসুমের সৌন্দর্য্যের গীত সময়ান্তরে লিখিব। বরদার মহারাজকে "গাইকোয়ার বলে। অর্থ, গাভী-রক্ষক। গো ব্রাহ্মণ এক। অতএব রাজার উপাধি গাভীরক্ষক বলিয়া এক জন ব্যাখ্যা করিলেন। আমার বোধ হয়, মহারাষ্ট্র ভূপতির গাভীরক্ষক ছিলেন বলিয়া, গাইকোয়ার নাম হইয়াছে। তেমনি তাঁহার মন্ত্রী বা পেশকার ছিলেন বলিয়া সেতারা এবং পুণার রাজার নাম পেশোয়া ছিল। শিবজীর উত্তরাধিকারীরা হীনবল হইলে, পেশোয়া এবং গাইকোয়ার স্বাধীন নরপতি হন। আমার এ অনুমান কত দূর সত্য, জানি না। বর্ত্তমান রাজার নাম জিয়াজী গাইকোয়ার। ভূতপূর্ব্ব গাইকোয়ার অনেক 'পলিটিকেলে'র বিষচক্ষে পড়েন, এবং তাঁহার চক্রান্তে রাজ্যচ্যুত হইলে, তাঁহার দূরসম্পর্কীয় একটি দরিদ্র বালককে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এই বৃহৎ রাজ্যের অধিকারী করেন। ইনিই বর্ত্তমান গাইকোয়ার। বরদা হইতে কিঞ্চিৎ দূরে 'মাখনপুরা' রাজবাটী নামক এক বৃহৎ রাজপুরী আছে। খাণ্ডেরাও গাই-কোয়ার এখানে পাশাপাশি দুইটি অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন। বর্ত্তমান গাইকোয়ার তাহার পার্শ্বে তিন লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া আর একটী অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া এখানে বাস করিতেছেন। নগরের মধ্যে আর এক রাজবাড়ীতে অন্যান্য রাজমহিলারা বাস করেন। মাখনপুরার তিনটী অট্টালিকা এক শৃঙ্খলে গাঁথা, এবং আবরিত এক গৃহপথ দিয়া নূতন অট্টালিকা হইতে পুরাতন অট্টা-লিকাতে যাইতে পারা যায়। পুরাতন দুটী বৈঠকখানমাত্র, এবং নূতনটী অন্তঃপুর। বহুমূল্য ইংরাজি উপকরণের দ্বারা সকল অট্টালিকা সজ্জিতা, বিশেষতঃ; অন্তঃপুরমহলের সজ্জা কল্পনাতীত। যে সকল রাজবাড়ী দেখিয়া আসিয়াছি, ইহার তুলনায় কিছুই

নহে। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে, মহারাজ সস্ত্রীক শৈলবিহারে গিয়াছিলেন। সমুদায় গৃহ জনশূন্য। সহকারী মন্ত্রীর আদেশে, আমরা মহারাজার শয়নকক্ষ পর্য্যন্ত নয়ন ভরিয়া দেখিলাম। দেখিবে কি, যে দিকে নয়ন ফিরাইবে, চক্ষু ঝলসিয়া যাইবে। বোধ হইল, মহারাজা ইউরোপীয়ের মত থাকেন। স্নানাগার পর্য্যন্ত উৎকৃষ্ট মর্ম্মরের ইউরোপীয় উপকরণে সজ্জিত। নরচক্ষে যাহা দেখে নাই, তাহাও আমরা দেখিলাম। একটী কক্ষের প্রাচীরে এক বৃহৎ তৈলচিত্রে কি ভুবনমোহিনী মূর্ত্তিই দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ইনি মহারাজার মৃতা রাণী লক্ষ্মীবাই। এই চিত্রখানির প্রতি আমরা বহুক্ষণ নিমেষশূন্য চিত্রবৎ চাহিয়া ছিলাম। চিত্রখানি মানুষের বলিয়া ত বোধ হইল না। কি মুখ, কি চোক্, কি শরীরের দীর্ঘগঠন, কি চম্পক কোরক-নিভ বর্ণ, কি অতুলনীয়া অঙ্গভঙ্গী, কিছুই যেন মানুষের বলিয়া বোধ হইল না। আমাদের বোধ হইল, যেন একটী রূপের স্বপ্ন দেখিতেছি! মহারাষ্ট্রীয় বেশে চিত্রময়ী ভূষিতা। সম্মুখের কুঞ্চিত কোঁচাগ্র, সম্মুখ হইতে বঙ্কিমভাবে পদ মধ্য দিয়া অসাবধানে পশ্চাৎ দিকে পড়িয়া কি শোভারই বিকাশ করিতেছে! জয়পুরের আয় ৬০ লক্ষ, যোধপুরের ৪০ লক্ষ, এবং বরদার ১॥ ক্রোর! যদি বিধাতা আমাকে বলিতেন, তুমি এ সুন্দরীকে চাহ, কি বরদার সিংহাসন চাহ, আমি অম্লানবদনে এই পার্থিব রাজ্য না চাহিয়া, এই অপার্থিব রূপরাজ্য ভিক্ষা চাহিতাম। ভৃত্যেরা বলিল, চিত্রে কিছুমাত্র অত্যুক্তি নাই। তাহারা তাঁহাকে স্বচক্ষে দেখিয়াছে। আবার যেমন রূপ, তেমনই মন, তেমনই হৃদয়। ভৃত্যগণ এখনো তাঁহার জন্যে হাহাকার করিতেছে। তিনি একটীমাত্র পুত্র রাখিয়া গিয়াছেন। শিশুটীরও তৈলচিত্র অন্য কক্ষে দেখিলাম। যদিও মার সম্পূর্ণ রূপ পা

নাই, তথাপি মরি! মরি! কি রূপ! শিশু ত নহে, যেন একটী স্বর্গীয় কুসুমকোরক। কক্ষান্তরে মহারাজার বর্ত্তমান মহিষীর একখানি অসম্পূর্ণ তৈলচিত্র দেখিলাম। তিনিও কিছু কুৎসিতা নহেন। তথাপি এই মোহিনীর ছায়াতে তাঁহাকে কি কুৎসিতই দেখাইল। ভৃত্যেরাও আমাদের মতের প্রতিপোষণ করিল। এই রমণীরত্নের দৃষ্টিতলে, এবং তাঁহার শিশুপুত্রের মুখখানি দেখিয়া, মহারাজ যে কি প্রকারে দ্বিতীয় রমণীকে তাঁহার হৃদয়াভিষিক্ত করিয়াছেন, আমি ত বুঝিতে পারি না। কর্ম্মচারীরা বলিলেন, রাজকার্য্যে অধিক পরিশ্রম নিবন্ধন গাইকোয়ারের শিরোরোগ হইয়াছে! তাই তিনি বারংবার ইউরোপে ও শৈলে শৈলে এমন করিয়া বেড়াইতেছেন। মধ্যে সংবাদপত্রে দেখিয়াছিলাম যে, তিনি উন্মত্ত হইয়াছেন। আমার মতে, কার্য্যাধিক্য ইহার কারণ নয়, এই স্ত্রীবিয়োগই ইহার কারণ।

কিন্তু এ হেন ইন্দ্রপুরীতেও মহারাজার সাধ মিটীল না। আর একটী কি অপূর্ব্ব রাজবাটীই প্রস্তুত হইতেছে! ইহাতে ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে। সম্পূর্ণ হইতে আরও ২৫ লক্ষ লাগিবে। যে ইহার কল্পনা করিয়াছিল, সে এক জন অদ্ভুত কবি। ময়দানব তাহার শিষ্য হইবার যোগ্য নহে। আমি ইহার কি বর্ণনা করিব? প্রথম একটী প্রকাণ্ড ত্রিতল উচ্চ হল। তাহার পর প্রাঙ্গণ বেষ্টিয়া গাইকোয়ারের বহির্ম্মহল, তাহার পর অন্তঃপুরমহল। এই উভয় মহল, হলের সমান উচ্চ, ত্রিতল। মহলে মহলে প্রাঙ্গণ বেষ্টিয়া অসংখ্য কক্ষ। এক একটী কক্ষ, এক একটী গৃহ বলিলেও চলে,—এত প্রশস্ত। চিতোরের 'কীর্ত্তি-স্তম্ভে'র মত একটী স্তম্ভ, ত্রিতল ভেদ করিয়া গগনমার্গে উঠিয়া কি অপূর্ব্ব শোভাই ধারণ করিয়াছে! স্তম্ভটী দশ কি দ্বাদশ তল। তবে, চিতোরের তলায় তলায় মধ্য কক্ষে এক একটী

দেবদেবীর মূর্ত্তি আছে। এখানে অশ্বারোহী রমণীদিগের বসিবার জন্যে তাহা শূন্য রাখা হইয়াছে। বোধ করি, উপযোগী উপকরণে সজ্জিত হইবে। এই বৃহৎ অট্টালিকার সমস্ত কক্ষগুলি—এমন কি প্রবেশপথ পর্য্যন্ত—সুবর্ণমিশ্রিত বর্ণে বিচিত্র কৌশলে চিত্রিত হইতেছে। বিলাত হইতে শিল্পকর আসিয়া, ইহার চতুর্দ্দিকে উদ্যান সৃষ্ট করিবে, এবং উপযোগী সজ্জা ও উপকরণ প্রস্তুত করিবে। কাণ্ডখানা কি বুঝিতে পারিলে কি? এই রাজবাটীর নাম "লক্ষ্মীমহল"। কিন্তু যে লক্ষ্মীর জন্যে এই অতুলনীয় পার্থিব স্বর্গ সৃষ্ট হইতেছিল, তিনি আজ কোথায়? প্রজারাও, তাঁহার স্মরণার্থ, নগরমধ্যে একটী 'ঘটীকাস্তম্ভ' প্রস্তুত করিয়াছে। আজ সেই লক্ষ্মী বৈকুণ্ঠে।

বোম্বাই।

বরদায় এক দিন মাত্র থাকিয়া আমরা বোম্বাই যাই। বোম্বাই নাম সম্বন্ধে দুটী প্রবাদ আছে। ৩৫০ বৎসর পূর্ব্বে যখন পর্ত্তুগিসেরা এ স্থানটী অধিকার করে, তখন ইহার 'বুয়ন বাহিয়া'—উৎকৃষ্ট বন্দর—নাম রাখে। তাহা হইতে বোম্বাই হয়। দ্বিতীয় প্রবাদ—'মম্বাই' বলিয়া এক দেবী ছিলেন। তাঁহার নাম হইতে ইংরাজেরা বোম্বাই বা বম্বে করিয়াছেন। এখনও বোম্বাই সহরের একটী অংশের নাম মম্বাই দেবী আছে। আর একটী অংশের নাম কামদেবী। বোম্বাইর অংশবিশেষ প্রকৃতই কামদেবীর স্থান। সে কথা পরে লিখিব।

বোম্বাই আমার কাছে শ্যামা ভারতমাতার জিহ্বা বলিয়া বোধ হইয়াছিল। জননীর পশ্চিম তীর ব্যাপিয়া, উত্তর দক্ষিণ

ঘাট গিরিমালা দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরবৎ শোভা পাইতেছে। এই গিরি-শ্রেণীই আমাদের কবিকল্পনার সম্বল 'মলয়াচল'। এই শৈল সমাচ্ছন্ন তীর হইতে জিহ্বার মত একটী ভূমিখণ্ড সমুদ্রবক্ষে ভাসমান। শ্যামার জিহ্বা রক্তবর্ণা। শ্যামা ভারতমাতার জিহ্বা শ্যামপত্র-সমাচ্ছন্ন সৌধ ও শৈলমালায় উদ্যানবৎ শোভিত। শ্যামার জিহ্বার চারিদিকে রক্ত-ফোঁটা চিত্রিত হইয়া থাকে। এ শ্যামা জিহ্বার চারিদিকে ফোঁটার মত ক্ষুদ্র শৈল-দ্বীপরাশি নীল সমুদ্রগর্ভে শোভা পাইতেছে। এখন বুঝিলে, বোম্বাই কি মনোহর উপদ্বীপ? ইহার তিন দিকে সমুদ্র পরিখার মত বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। এ সমুদ্রে তরঙ্গ নাই, লহরী নাই, গর্জ্জন নাই। শান্ত, স্থির, নীরব। যেন একখানি অনন্ত নীল আরসি পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার মধ্যে মধ্যে এক একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ যেন এক একটী সুন্দর ফুলের মত শোভা পাইতেছে। বোম্বাইর উভয় পার্শ্বে নানা স্থানে সমুদ্র-শাখা ভূমিমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। এ সকল শাখার উপর দিয়া রেলওয়ের দীর্ঘ সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে। গাড়ী এই সলিলরাশির উপর দিয়া, উভয় পার্শ্বে সুপরি, তাল, নারিকেল, খর্জ্জুর বৃক্ষশোভিত গিরিমালার মধ্য দিয়া চলিয়া যাইতে, কি চঞ্চল চিত্ত-বিনোদন প্রাকৃতিক শোভাই প্রাণ মন মোহিত করিয়া দেয়।

আমরা প্রথমেই জিহ্বার অগ্রভাগস্থ পর্ব্বতস্থিত ইংরাজি বসতিস্থান দেখিতে যাই। এই পর্ব্বতটীর নাম "মেলেবার হিল," তাহার প্রান্ত সীমাগ্রে শৈবালসমাবৃত হংসের ন্যায়, বোম্বাইয়ের গবর্ণরের রাজপ্রাসাদ সমুদ্রে ভাসিতেছে। এই পর্ব্বতটী ইংরাজ-দিগের গৃহাবলীতে সমাচ্ছন্ন। উভয় পার্শ্বের সমুদ্র সকল গৃহ হইতে দেখা যায়; পর্ব্বতটীর সর্ব্বত্রে পথমালা এরূপ বিচিত্র কৌশলে নির্ম্মিত হইয়াছে যে, সকল দিকে গাড়ী চলিয়া যায়।

রক্তবর্ণ রাজপথসমূহ গিরি-অঙ্গে যেন প্রবালহারাবলীর মত শোভা পাইতেছে। উভয় পার্শ্বে মনোহর সৌধ ও উদ্যানমালা, এবং তাহার বিরাম-স্থান-পথে সমুদ্রের নীল কান্তি দর্শন করিয়া শকট-ভ্রমণ কি মনোহর।

ফিরিবার সময়ে এই পর্ব্বতস্থিত পার্সিদিগের "নীরব মন্দির" বা সমাধিস্থান দর্শন করি। মূল সমাধিস্থানটী একটী গোলাকার প্রাচীর মাত্র। তাহার অন্তর্ব্বর্ত্তী স্থানটী চক্রাকারে তিন মণ্ডলে বিভক্ত করা হইয়াছে। কেন্দ্রস্থলে একটী কূপ; তাহাকে বেষ্টিয়া যে মণ্ডল, তাহাতে শিশুদিগের, তাহার বাহিরের মণ্ডলে রমণী-দিগের, তাহার বাহিরের মণ্ডলে পুরুষদিগের শব রক্ষিত হয়। প্রাচীরের এক স্থানে একটী গবাক্ষ আছে। মৃত ব্যক্তির আত্মী-য়েরা এই গবাক্ষ পর্য্যন্ত শব লইয়া গেলে, সমাধিস্থ দুই জন ভৃত্য এখান হইতে শব ভিতরে লইয়া যায়। তাহারা ভিন্ন অন্য কেহ ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না। তাহার পর শবটীর বসন মোচন করিয়া, উপযুক্ত মণ্ডলে রাখিয়া দেয়। অল্পকাল মধ্যেই শকুনে তাহা নিঃশেষ করিলে, ভৃত্যেরা অস্থি সকল মধ্য কূপের গর্ভে ফেলিয়া দেয়। কালে উহা চূর্ণে পরিণত হইয়া, কূপতলস্থ জলপ্রণালী দিয়া পর্ব্বতের উপত্যকায় গিয়া, ভূমির সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া ভূমির উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করে। মানুষকে এরূপ শকুনের আহার্য্য করা আপাততঃ শুনিতে বড়ই নিষ্ঠুরতা বলিয়া বোধ হয়। তবে চক্ষের উপর পোড়াইয়া ফেলা, কিংবা ভূমিগর্ভে অসংখ্য কীটের আহার করিয়া দেওয়াই কি নিষ্ঠুরতা নহে? যখন আর্য্যজাতিরা কেবল বৈদিক অগ্নির উপাসক মাত্র ছিলেন, তখন দুই ভাগ হইয়া উত্তর কুরু হইতে এক শাখা ভারতে প্রবেশ করেন, অন্য শাখা পারস্য দেশে গমন করেন, ইহারাই পার্সি। ভারতীয় আর্য্যদিগের ধর্ম্মের অনন্ত রূপান্তর ও উন্নতি হইয়াছে।

পার্সিরা এখনও অগ্নি-উপাসক। উত্তর কুরু শীতপ্রধান দেশ, অতএব অগ্নি তথায় মনুষ্যের প্রধান অবলম্বন, প্রধান দেবতা। শব দাহ করিতে অগ্নির ও ইন্ধনের অপব্যয় বৃক্ষ-বিরল শীতপ্রধান দেশে সম্ভব নহে। সেই জন্যে উত্তর কুরুতে শব এরূপে পশু পক্ষীর আহারের জন্যে ফেলিয়া রাখা হইত, ইউরোপে এখনও ভূগর্ভে প্রোথিত করা হইয়া থাকে। পার্সিরা সেই পূর্ব্ব নিয়ম রক্ষিত করিয়া আছেন। ভারতে কাষ্ঠের অভাব নাই, কাযেই এই নিষ্ঠুর নিয়ম পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এরূপে দেশ, কাল ও অবস্থাই মানুষের জাতীয় আচার ব্যবহারের রূপান্তরের মূলীভূত কারণ।

তদ্ভিন্ন আর একটী গভীর তত্ত্ব পার্সী ও হিন্দুদিগের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার ভিতরে নিহিত আছে। উভয় জাতির ধর্ম্মনীতির মূল— সর্ব্বভূতহিত। শবটী পোড়াইয়া ফেলিলে কি কবর দিলে, আপা-ততঃ কাহারও হিতসাধন করা হয় না। কালে তাহা ভূমি, জল, ইত্যাদি পঞ্চভূতে বিলীন হইয়া, শস্যাদি উৎপন্ন করিয়া, জীবহিত সাধন করে সত্য, তবে সে বহুকালসাপেক্ষ এবং তত্ত্বটী জটিল। পার্সীদিগের শব তৎক্ষণাৎ পশু পক্ষীর আহার হইয়া প্রত্যক্ষ জীবহিত সাধন করে, এবং অস্থিও কালে ভূমির উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করে। আমি ত মরিয়া গিয়াছি, সুখ দুঃখের অতীত হইয়াছি; অতএব, আমার লোষ্ট্রবৎ জীবশূন্য দেহটী আহার করিয়া যদি কয়টি প্রাণীর তৃপ্তি হয়, ক্ষতি কি? দেহটি ধ্বংস করা ও ভূগর্ভে পচিতে দেওয়া অপেক্ষা, এরূপ জীবহিতে নিয়োজিত হওয়া কি ভাল নহে?

পর দিবস নগর দর্শন করিতে করিতে আমরা খ্যাতনামা 'হস্তিগুম্ফা' দেখিতে যাই। বোম্বাই নগরটি দেখিতে অতি সুন্দর। কলিকাতার মত এমত বৃহৎ অট্টালিকা নাই, তবে অট্টালিকাগুলি বহুতলবিশিষ্ট এবং বড় কবিত্বপূর্ণ। প্রত্যেক

গৃহ নানারূপ বারাণ্ডা ও নানারূপ কোণবিশিষ্ট। আকৃতিবৈচিত্র্য বড় মনোহর। বোম্বাই নগরের দুইটী বিশেষ লক্ষ্য। অধিকাংশ অট্টালিকার সর্ব্বোচ্চ তলার ছাদ খোলার, এবং ফুল অতি বিরল। সমুদ্রের লবণাক্ত বাতাসে ফুল বাঁচে না, বোধ হয়। সমুদ্রানিল সলিলসিক্ত বলিয়া বোম্বাই অঞ্চলে গ্রীষ্মের প্রখরতা নাই, এবং লবণাক্ত বলিয়া শীতেরও প্রবলতা নাই। এই পৌষ মাসের মধ্যভাগেও আমরা কিছুমাত্র শীত অনুভব করিলাম না। এ জন্যেই কবিরা মলয়াচলকে চিরবসন্তের আলয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, এবং এই জন্যেই মলয়ানিলের এত গুণগান। তবে এ বসন্ত পুষ্পহীন বোধ হইল, এবং এ মলয়াচলে চন্দনবৃক্ষ ও ভুজঙ্গ নাই বলিয়া তারাচরণের দৃঢ় বিশ্বাস,—মলয়াচল ব্রহ্মদেশে। জানি না, সেই চিরবসন্তের দেশে থাকিয়া তোমার ভায়া কি দারুণ বিরহ-যন্ত্রণাই ভোগ করিতেছেন।

আমরা একখানি 'জালিবোট' ভাড়া করিয়া, সমুদ্রগর্ভস্থ এলিফেণ্টা বা হস্তিগুম্ফা-দ্বীপ দেখিতে গেলাম। এই সমুদ্রবিহার আমি এ জীবনে ভুলিব না। স্থানে স্থানে খণ্ড-পর্ব্বত সমুদ্রগর্ভে যেন এক একটী দোল কিংবা এক একখানি রথের মত ভাসিতেছে। তাহার মধ্য দিয়া আমাদের তরণী ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছে। কোনো খণ্ড-শৈলে ইংরাজরাজ বোম্বাই রক্ষণার্থ অস্ত্রাগার, কোথাও বা বারুদাগার নির্ম্মাণ করিয়াছেন। শ্বেত অট্টালিকাটী দূর হইতে দেখিলে বোধ হয়, যেন একটী রাজহংস গিরিশিরে বসিয়া সমুদ্র শোভা দেখিতেছে। স্থানে স্থানে যুদ্ধযান এবং বৃহৎ বৃহৎ বাষ্পীয় যান সকল সগর্ব্বে ভাসিতেছে। আমাদের ক্ষুদ্র তরণী হংসিনীর মত তাহার পার্শ্বে ক্রীড়া করিতে করিতে চলিয়াছে। বহু দূর গিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলাম—অহো! কি দৃশ্য!

"দূরে চক্রনিভ তন্বী, তমাল তালের লীলা,
কলঙ্ক রেখার মত শোভে লবণাম্বু বেলা।"

তমাল দেখি নাই। কিন্তু তালজাতীয়-বৃক্ষশীর্ষ-বনরাজি-মণ্ডিতা, সৌধমালায় বিচিত্রিতা বোম্বাই নগরী কি শোভার ভাণ্ডারই লবণাম্বুতীরে খুলিয়া রাখিয়াছে, এবং কি মনোহর নীলদর্পণে কি মনোহর মুগমণ্ডলের প্রতিবিম্ব দেখিতেছে। যে ব্যক্তি একবার সমুদ্রগর্ভ হইতে এই 'মলয়াধারের তীর সুবঙ্কিম' এবং এই মধ্যাহ্ন রবিকরে "মলয়াচলের-উজ্জ্বল-নীলিমা" নয়ন ভরিয়া দেখিয়াছে, সে কখনও উহা ভুলিতে পারিবে না।

এলিফেণ্টা দ্বীপের পর্ব্বতটী বৃক্ষাবলীতে বড় সুন্দররূপে শোভা পাইতেছিল। এই পর্ব্বতের কটীদেশে 'হস্তিগুম্ফা,' তাহা হইতে ইহার নাম 'এলিফেণ্টা' হইয়াছে। এই গুম্ফা-দ্বারে পুরাকালে একটি প্রস্তরের হস্তী ছিল। সমুদ্র-তীর হইতে গুম্ফা পর্য্যন্ত সোপানশ্রেণী উঠিয়াছে। জনৈক শ্বেতাঙ্গ পুরুষ ও তাঁহার শ্বেতাঙ্গিনী প্রিয়া এখন গুম্ফার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। তাঁহাদের পাশ লইয়া গুম্ফা দর্শন করিতে হয়। দুইটিই বেশ ভদ্রলোক। যদিও বহুতর শ্বেতাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গিনীরা তখন গুম্ফাদ্বারে বিরাজ করিতেছিলেন, কেহ পান করিতেছেন, কেহ ভক্ষণ করিতেছেন, কেহ সমুদ্র শোভার প্রতি চাহিয়া চাহিয়া বৃক্ষ-দোলায় দুলিতেছেন, তথাপি তাঁহারা আমাদের প্রতি খুব ভদ্রতা দেখাইলেন। পর্ব্বতের প্রস্তর বক্ষ কাটিয়া, 'আজগিরের' শোনভাণ্ডার কক্ষের মত, কিন্তু তদপেক্ষা বড়, একটী কক্ষ নির্ম্মিত হইয়াছে। কক্ষ, প্রাচীর বড় সুচারুরূপে নির্ম্মিত নহে। 'বরাবরের' গুম্ফা সকল এতদপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট, তাহাদের প্রাচীরে মুখ দেখা যায়, এমনি মসৃণ। তবে কক্ষটীর প্রাচীরের গায়ে বহুতর হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবী মূর্ত্তি স্থাপিত রহিয়াছে। মূর্ত্তিগুলি তত শিল্পনৈপুণ্য-

পূর্ণ না হউক, নিতান্ত মন্দ নহে। তাহার পার্শ্বে অসম্পূর্ণ আরো ২।৩ টী ক্ষুদ্র গুম্ফা আছে। আমার বোধ হইল, এই গুম্ফা বৌদ্ধদের কর্ত্তৃক তপস্যার জন্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল, পরে বৌদ্ধ-বিপ্লবের পর হিন্দুরা অধিকার করিয়াছেন। তাহার প্রমাণ, দুই স্থানে দুইটী শিবলিঙ্গ বসান হইয়াছে, দেখিলে বেশ উপলব্ধি হয় যে, সেখানে অন্য কোনও মূর্ত্তি ছিল, তাহা উঠাইয়া শিবলিঙ্গ স্থাপিত করা হইয়াছে। গর্ত্তটী লিঙ্গ অপেক্ষা বড়। এই পর্ব্বত হইতে চতুর্দ্দিকস্থ সমুদ্রগর্ভে ভাসমান পার্ব্বত্য দ্বীপপুঞ্জ ও সমুদ্রশোভা দেখিলে চোক ফিরাইতে ইচ্ছা করে না। মুহূর্ত্ত এই শোভা দেখিয়া আমরা ফিরিলাম। প্রতিকূল বাতাস নিবন্ধন অর্দ্ধ পথ আসিলেই সন্ধ্যা হইল, জ্যোৎস্না উঠিল; পটপরিবর্ত্তন হইয়া জ্যোৎস্নাপ্রোদ্ভাসিত, পর্ব্বত-দ্বীপ-খচিত, সমুদ্রের কি মনোমুগ্ধকর শোভা হইল। মনের আনন্দে সকলে মিলিয়া গাহিতে গাহিতে বোম্বাই ফিরিয়া আসিলাম। গীত যেন আপনি হৃদয় উচ্ছ্বসিত করিয়া বহিতেছে, তরণী যেন সেই গীতের তালে তালে মনের আনন্দে নাচিতেছে। পূর্ব্ব দিন মলয়-পর্ব্বত-শিরে দাঁড়াইয়া, এই সমুদ্রের দিকে চাহিয়া, আমিও বাইরণের মত স্বপ্ন দেখিয়েছিলাম—

মলয় বোম্বাই বক্ষে ;
বোম্বাই সমুদ্র তীরে ;
তথা দাঁড়াইয়া একা দেখিনু স্বপনে;—
ভারতের সুখসূর্য্য আসিবে যে ফিরে।

বাইরণের স্বপ্ন ফলিয়াছে ;—গ্রীসের সুখের দিন ফিরিয়াছে। আমার স্বপ্ন ফলিবে কি ?

পূনা।

কাল প্রাতে বম্বে ছাড়িয়া অপরাহ্ণ ৫টার সময়ে পূনা পঁহুছি। বম্বে ২টা দিন কি কষ্টে কাটাইয়াছি বলিতে পারি না। তারা-চরণের হিন্দুয়ানীর কল্যাণে যে এক মহারাষ্ট্রীয় হিন্দু হোটেলে উঠিয়াছিলাম, তাহার বিচিত্র নাম পূর্ব্বে লিখিয়াছি। ইনি মহারাষ্ট্রীয় এবং মহারাষ্ট্রীয়দিগের দস্যুপ্রবৃত্তির একটি জীবন্ত মূর্ত্তি। সে মূর্ত্তিখানি দেখিয়াই আমার চমক লাগিয়াছিল। আমি তখনই বুঝিয়াছিলাম যে, আমরা এক ব্যাধের ফাঁদে পড়িয়াছি। তিনি আমাদের অর্থ শোষণ করিবার জন্যে জাল পাতিতেছিলেন। আর একটি ভুক্ত-ভোগী বাঙ্গালী, তাঁহার হোটেলে ছিলেন, ইঁহার কৃপায় আমরা রক্ষা পাই। যাহা হউক, অর্থ না হউক, দুই দিন যাবৎ আমাদের শোণিত শোষিয়া, ইনি ৭।০ লইয়া আমাদিগকে ছাড়েন। লইলেন ৭।০ আনা, খাইতে দিয়াছিলেন ছটাক দুই চাউল, আর খনিকটা মূলার শাক। তাঁহার বিচিত্র হোটেলে যদি আধ ঘণ্টা কালও থাক, তবে সমস্ত দিবসের ভাড়া দিতে হয়। কাযে কাযে আমাদিগকে কাল অনাহারে ছাড়িতে হয়, এবং সমস্ত দিন অনাহারে থাকিতে হয়। যাহা হউক, সেই "নারায়ণ-ভোজন-বস্তি-গৃহ" বা গ্রহ হইতে উদ্ধার পাইয়া, আমি নারায়ণকে ধন্যবাদ দিয়াছিলাম। হোটেল কর্ত্তার নাম নারায়ণ। তিনি আমাদিগকে ভোজন না করিয়া যে গ্রাসমুক্ত করিয়াছেন, তাহা দুইটি রমণীর এয়োত্তির জোর বলিতে হইবে।

'কল্যাণ' ষ্টেশন হইতে আমরা ঘাট পর্ব্বত বা মলয়াচল আরোহণ করিতে আরম্ভ করি। গরজাট ষ্টেশন হইতে দুই খানি এঞ্জিন ট্রেণের অগ্রে ও পশ্চাতে সংযোজিত হয়। কখন বা পশ্চাতের এঞ্জিনে টানিয়া আমাদিগকে দেখিতে দেখিতে

পর্ব্বতসানুদেশে, অর্থাৎ সমুদ্র-উপকূল হইতে ২০০০ ফিট উর্দ্ধে তুলিয়া ফেলে। এই গগণবিহার বিজ্ঞানের একটি চরম গৌরব। কখন বা উচ্চ সেতুর উপর দিয়া, কখন বা গিরিপার্শ্ব, বহিয়া, ট্রেণ নক্ষত্র বেগে ছুটিতেছে। যদি এক পা এ-দিক ও-দিক হয়, তবে সহস্র সহস্র ফিট গভীর গিরিগহ্বরে পতিত হইবে। আর কখন বা গিরিগর্ভ ভেদ করিয়া, সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়া, অন্ধকারে ছুটিয়া যাইতেছে। এরূপে ২৫টি সুড়ঙ্গ পার হইয়া আসি। গাড়ীতে আলো দেওয়া আছে, সুড়ঙ্গে প্রবেশ করিলে ঠিক যেন রাত্রি। এক একটি সুড়ঙ্গ এত দীর্ঘ যে, ট্রেণ ২।৩ মিনিট তাহার ভিতরে থাকিয়া যায়। রেলপথের দুইদিকের দৃশ্যই বা কত মনোহর। অনন্ত গিরি-শ্রেণী স্তবকের পর স্তবকে সজ্জিত রহিয়াছে। সুদূরে, কোনও শৃঙ্গে, পুরাতন মহারাষ্ট্র দুর্গের ভগ্নাবশেষ শোভা পাইতেছে। স্থানে স্থানে নির্ঝর স্রোত নীল-মণি-হারের মত দেখাইতেছে।

সেই যে ২০০০ ফিট উপরে উঠিয়াছি, আর আমরা নামি নাই। উপরে উঠিলে রেল প্রায় সমসূত্রে পূনা পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। অতএব বুঝিতে পারিতেছ যে, পূনা নগর সমুদ্রতীর হইতে ২০০০ ফিট উর্দ্ধে অবস্থিত। এই আকাশের উপর মহারাষ্ট্রের কি বিশাল রাজ্যই অবস্থিত ছিল।

এলাহাবাদের জনৈক ডাক্তার, পূনার জন্যে একখানি পরিচয়-পত্র দিয়াছিলেন। আসিয়া দেখিলাম, যাঁহার নামে পত্র, তিনি এক জন ছাত্র। ইহাঁরা কয়েক জন বাঙ্গালী ছাত্র এখানের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়িতেছেন। তাঁহাদের ছাত্র-আবাসে বসিয়া তোমার কাছে পত্র লিখিতেছি। তাঁহারা আমাদের বড় যত্ন করিতেছেন। একটি ছাত্র ভিন্ন এখানে আর বাঙ্গালী নাই।

অন্ত প্রান্তে প্রথমে পার্ব্বতীর পর্ব্বত আরোহণ করি। যাইবার পথে পর্ব্বতের পাদমূলে একটি ঝিল, তাহার মধ্যস্থানে একটি দ্বীপ। ঝিল এখন শুষ্ক, দ্বীপ এখন জঙ্গল। পর্ব্বতে উঠিয়া প্রথমেই পার্ব্বতীর মন্দিরে যাই। মধ্যস্থলে রজতনির্ম্মিত শিব। "রজতগিরিনিভং" ধ্যানবাক্যের প্রতিমূর্ত্তি। এক পার্শ্বে স্বর্ণ-পার্ব্বতী "তপ্তকাঞ্চনাভা," অন্য দিকে সোণার গণেশ। উভয়কে অঙ্কে লইয়া, মহাদেব বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার মহারাষ্ট্র বেশ, মাথায় একটি প্রকাণ্ড পাগড়ি। আমার বোধ হইল—সিদ্ধি, শক্তি এবং নিষ্কামতা, যেন একাধারে এই ত্রিমূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছে। এই ত্রিমূর্ত্তির বা ত্রিশক্তির সাধনা দ্বারা শিবজী মহারাষ্ট্র রাজ্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন, মোগল রাজ্যের অধঃপতন ঘটাইয়াছিলেন। এই মহাসাধনা ভুলিয়া, তাঁহার কাপুরুষ উত্তরাধিকারী বাজিরাও, সেই সাম্রাজ্য হারাইলেন, ভারতকে ইংরাজ-কবলে কবলিত করিলেন। ত্রিমূর্ত্তিকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া, পার্শ্বস্থিত সৌধশিরে আরোহণ করিলাম। এই মন্দিরের পার্শ্বে, শেষ মহারাষ্ট্রাধিপতি পেশোয়া বাজিরাওর অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান রহিয়াছে। অদূরে শৈলশেখরে শিবজীর খ্যাতনামা দুর্গত্রয়—সিংহগড়, রাজগড় এবং রায়গড়—আকাশের গায়ে চিত্রপট দেখাইতেছে; চারিদিকে গিরিশ্রেণী আকাশে তরঙ্গ খেলিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া আছে। ইহাদের প্রত্যেকের অঙ্গে অঙ্গে মহারাষ্ট্রদিগের গৌরবের ও অধঃপতনের ইতিহাস লিখিত রহিয়াছে, একটি পর্ব্বতের কক্ষদেশে "চতুঃসিংহ" মন্দির একটি শ্বেত কুসুমের মত শোভা পাইতেছে। ইহাতেও হরপার্ব্বতীর মূর্ত্তি আছে। দশমী দিবসে মহারাষ্ট্রীয়গণ তাঁহাদের পূজা করিয়া, দেশলুণ্ঠনে এবং যুদ্ধে যাত্রা করিতেন। আমার কর্ণে যেন সেই বীরকণ্ঠ, সেই "বম বম বম হর হর" রব স্বপ্নশ্রুত শব্দের ন্যায় প্রবেশ করিতে লাগিল—

"হর হর হর বলে ; কি কাণ্ড করিকে বলে ;
সেই সিংহনাদ আজি হয়েছে স্বপন।
মহারাষ্ট্র ইতিহাস অদ্ভুত যেমন।"

শিব-শক্তির মন্দিরের পদমূলে, সেই কির্কির যুদ্ধক্ষেত্র। এই ক্ষেত্রে পেশোয়ার রাজমুকুট খসিয়া পড়ে। কাপুরুষ বাজিরাও, প্রাণভয়ে পার্ব্বতীর মন্দিরের একটি কক্ষে বসিয়া, এই যুদ্ধক্ষেত্রে তাহার অদৃষ্টের পরীক্ষা দেখিতেছিল। ইংরাজদিগের জয় হইলে, সেই কক্ষ হইতে পলায়ন করে, এবং ধৃত হইয়া বিঠুরে বন্দী হয়। নানা সাহেব তাহারই পোষাপুত্র। সেই হরপার্ব্বতীর, সেই শিবশক্তির মন্দির এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু মহারাষ্ট্রদিগের শিব (মঙ্গল) ও শক্তি (বীরতা) চিরদিনের জন্যে অস্তমিত হইয়াছে। আজ সেই যুদ্ধক্ষেত্রে, হর-পার্ব্বতীর মন্দিরের ছায়াতলে, বম্বের গবর্ণরের বাড়ী এবং সৈন্য-গৃহাবলী শোভা পাইতেছে। ইহাদের এত দূর অধঃপতন ঘটিয়াছে যে, মন্দিরের পূজক শিবের ধ্যানটি পর্য্যন্ত বলিতে পারিল না, এবং পুরোহিত মহাশয় বলিলেন, মৃত ভাষা সংস্কৃত তিনি কি জন্য শিখিবেন। তিনি ইংরাজিতে আমাদের কাছ হইতে কিছু উশুল করিবার জন্যে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এমন অর্থগৃধ্নু নরপিশাচ আমি যেন আর দেখি নাই। সে তাহাদের জাতীয় ইতিহাসের কিছুই জানে না। আমি তাহাকে সেই জন্যে ৵০ আনা পয়সা মাত্র দিয়া আপনার ইতিহাসখানি পড়িতে বলিলাম।

ছাদ হইতে অবতরণ করিয়া, পার্শ্বস্থিত এক মন্দিরে কৃষ্ণপ্রস্তর-নির্ম্মিত কার্ত্তিকের ও অন্য মন্দিরে নারায়ণের চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দর্শন করি। দেবতারা সকলেই এখন ইংরাজ রাজ্যের বৃত্তি-ভোগী। বিষ্ণুর মন্দিরে অতি সুন্দর সঙ্গীত হইতেছিল। পূজক ব্রাহ্মণও একটি অতি সুন্দর ধ্যান বলিলেন। আমি লিখিয়া লইয়াছি।

পার্ব্বতীর পর্ব্বত হইতে অবরোহণ করিয়া, পূনার 'শিল্পপ্রদর্শনী' দেখিতে যাই। প্রদর্শনী কাল বন্ধ হইয়াছে। কর্ম্মচারিগণ প্রথম বলিলেন, আমাদিগকে না দেখিতে দিবেন, না কোনও জিনিস কিনিতে দিবেন। দুই এক কথা বলিলে বলিলেন, কি করিবেন, নিয়ম লঙ্ঘন করিতে পারিবেন না। নিতান্ত পক্ষে সম্পাদকের মত চাহি। তাহার পর দু'চার কথা তীব্র বিদ্রূপ শুনিয়াই নিয়মও লঙ্ঘন করিলেন, দেখিতেও দিলেন, কিনিতে দিতেও স্বীকৃত হইলেন। তাহার পর সহর দেখি। দেখিলাম, পেশোয়াদের পুরাতন রাজবাটীর একটিতে বৃটিশদিগের পুলিস ষ্টেশন বিরাজ করিতেছে। তাহার পর দুর্গ দেখিতে গেলাম। দ্বারদেশে আমাদের জনৈক পুলিস প্রভু বিরাজিত। বলা বাহুল্য যে আর দেখা হইল না। ভিতরে, দেখিবারও কিছু নাই। তাহার পর, বাজার দেখিয়া গৃহে আসিলাম। শিবজী, আপন গুরুকে দান করিয়া পুণ্য করিয়াছিলেন বলিয়া এ স্থানটির নাম—শুনিলাম—পূনা হইয়াছে। আজ সেই পূনা নগর, মহারাষ্ট্রীয়দের একটি ঐতিহাসিক মহাশ্মশান। পূনা 'সার্ব্বজনিক' সভাগৃহে, পেশোয়াদিগের জনৈক খ্যাতনামা মন্ত্রীর একখানি চিত্র দেখিলাম। এখন সেই বীর রাজা নাই, সেই গভীর রাজনৈতিক মন্ত্রীও নাই। মহারাষ্ট্রের ভাগ্যে, ভারতের ভাগ্যে, আবার সে মণিকাঞ্চনের সংযোগ হইবে কি না, কে বলিবে?

দণ্ডকারণ্য।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, বোম্বায়ের "নারায়ণ-ভোজনবক্তি গৃহ" হইতে দুই দিনে উদ্ধার হইয়া পূনায় যাই। পূনার কথা লিখি-

যাছি। পূনা হইতে 'নাসিক' যাই। পূনার মত, নাসিকও মধ্য-ভারতের অধিত্যকায় ২০০০ ফিট উচ্চে অবস্থিত। কল্যাণ ষ্টেশন হইতে ক্রমশঃ ১৩টি গিরিসুড়ঙ্গ ভেদ করিয়া গাড়ী এই অধিত্যকায় আরোহণ করে। কিন্তু একবার উঠিলে অনন্ত সমতল ভূমি। তুমি এত উচ্চ স্থানে উঠিয়াছ বলিয়া বোধ হইবে না। শুধু তাহা নহে, অধিত্যকাটি স্বর্ণপ্রসূ। চারিদিকে সুন্দর শস্য-ক্ষেত্র এবং নিবিড় আম্রবন দেখিলে, ঠিক যেন বঙ্গ দেশ বলিয়া বোধ হয়। ইহার জল বাতাস এত উৎকৃষ্ট যে, একবার নাসিককে ভারতের রাজধানী করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছিল। লক্ষ্মণ এখানে সূর্পণখার নাসিকা কাটিয়াছিলেন বলিয়া, স্থানটির নাম "নাসিক" হইয়াছে বোধ হয়। ষ্টেশন হইতে পাঁচ মাইল ব্যবধানে নাসিক নগর। টোঙ্গায় যাইতে হয়। এখানকার টোঙ্গাগুলি এক নূতন জিনিস। দেখিতে যেন কেনভাসের ছাদওয়ালা টম-টুম। লাঙ্গলে যেরূপে গরু জুড়িয়া থাকে, ইহাতে সেইরূপ দুটি ঘোড়া যুড়িয়া দেয়। কিন্তু নক্ষত্রবেগে চলিয়া যায়।

আমরা অপরাহ্নে নাসিকে গিয়া, পাণ্ডা অমৃতরাম অনন্তরাম সিঙ্গবিয়ার বাড়ীতে অতিথি হই, এবং তাহার ভ্রাতৃ-বধূ আম্বা দেবী আমাদের অন্নপূর্ণার কার্য্য করেন। পর দিবস প্রাতে, প্রথমে গোদাবরী দর্শন করি। গোদাবরীর গর্ভ প্রস্তরময়। তাহা কাটিয়া, দীর্ঘাকৃতি কুণ্ডরাশি সৃষ্টি করা হইয়াছে। কুণ্ডের দুই পার্শ্বে জলের রন্ধ্র রাখা হইয়াছে। তাহার দ্বারা কুণ্ড হইতে কুণ্ডান্তরে গোদাবরী স্রোত বহিয়া যাইতেছে। উপর দিয়া লোক এ পার হইতে ও পারে যাতায়াত করিতেছে। তারাচরণ গঙ্গাষ্টক আবৃত্তি করিতে করিতে, "তুঙ্গতরঙ্গাস্ফালিত" জলে স্নান করিলেন। তাঁহার জন্যে ত এক ডুব দিলেনই। তাঁহার পিতা, মাতা, সর্ব্বশেষ আজন্ম পতিবিরহিণী পত্নীর জন্যেও এক ডুব

দিলেন। আমার মাতা নাই, পিতা নাই। তাঁহারা উভয়ে বৈকুণ্ঠে; বহুদিন এই অযোগ্য পুত্রের পাপ পুণ্যের অতীত হইয়াছেন। আছেন পত্নী, কিন্তু তাঁহার স্বামী অবগাহন করিলে, সেই স্বামীর পুণ্যের ভাগী তিনি হইতে পারিবেন কি না, আমার সে বিষয়ে অনেক সন্দেহ আছে। সংসারসমুদ্রে ডুবিয়া ত তাঁহার জন্যে কোন পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারি নাই। গোদাবরীতে ডুবিয়া কি পারিব? তদ্ভিন্ন, এ স্থানের জলের এরূপ বর্ণ যে, তাহা কেবল নিমজ্জিতা সুন্দরীদের "তুঙ্গ স্তন" মাত্র আস্ফালিত করিয়া আসিতেছে বলিয়া ত আমার বোধ হইল না। চক্ষের উপর দেখিলাম, কতরূপ ময়লাই এ স্থানে প্রক্ষালিত হইতেছে। এখানে স্নান করিতে আমার কিছুতেই প্রবৃত্তি হইল না।

গোদাবরীর অপর পারেই 'দণ্ডকারণ্য।' এখন তাহা একটি ক্ষুদ্র গৃহারণ্য। গোদাবরী পার হইয়া আমরা প্রথম একটি বৃহৎপ্রাঙ্গণসম্বলিত মন্দিরে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার মূর্ত্তি দর্শন করি। প্রবাদ আছে যে, এখানে রামচন্দ্র কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বনবাস করিয়াছিলেন। এই সেই রামায়ণের আরণ্যশোভাপূর্ণ পঞ্চবটী। প্রাঙ্গণে অনেকগুলি উদরসর্ব্বস্ব সন্ন্যাসী বসিয়া রহিয়াছে। এক জন আমাদের সঙ্গে কিঞ্চিৎ রসিকতা করিলেন। তাহার পর আর একটি মন্দিরে যাই। এখানে কৃষ্ণমূর্ত্তি স্থাপিত আছে। পাণ্ডা বলিলেন, এ মন্দিরে যাহা মানস করিব, তাহা পাইব। আমি বলিলাম, আমার কিছুই বাঞ্ছনীয় নাই। নারায়ণ আমাকে যাহা দিয়াছেন, আমি তাহাতেই সুখী। তারাচরণ বলিলেন, কিছু আমাকে প্রার্থনা করিতে হইবে। তখন আমি প্রার্থনা করিলাম—প্রভো। আমার নির্ব্বল তোমার কার্য্যের উপযোগী হউক। মনে মনে আর একটি প্রার্থনা করিলাম—তাহা বলিব না। তাহার কিঞ্চিৎ দূরে, ভূগর্ভে, একটি কক্ষে সীতা দেবী

একটি মূর্ত্তি স্থাপিতা আছে। আমি ইহার ভিতর কষ্টে প্রবেশ করিয়াছিলাম. যেন নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আইসে। তারাচরণের সাহস হইল না। মূর্খ পাণ্ডা বলিল, রামচন্দ্র রাবণের ভয়ে সীতাকে এইখানে লুকাইয়া রাখিতেন। তাহার রামায়ণের জ্ঞানও এই পর্য্যন্ত। সীতা এখানে অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল অবরুদ্ধা থাকিলে, রাবণ সবংশে মরিত না, বাল্মীকিকেও এত শ্রম করিতে হইত না। তিনি এখানেই মরিতেন।

তাহার পর, প্রায় এক ক্রোশ দূরে তপোবন দেখিতে যাই। প্রবাদ. এখানে তপস্যা করিয়া লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিত-বধের শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। এ স্থানটির মত এমন শান্তিপ্রদ স্থান আমি অল্প দেখিয়াছি। আমার বোধ হয়, এইটিই প্রকৃত বাল্মীকি-কল্পনার লীলাভূমি 'পঞ্চবটী'। এখনও পাঁচটি বট গাছ একস্থান আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। এখনও তাহার চারিদিকে নানাবিধ বনবৃক্ষ রহিয়াছে. এবং দেখিলে এককালে যে এই অধিত্যকাটি সম্যক অরণ্য ছিল, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। অনতিদূরে আরাবলীর শেখরমালা এক পার্শ্বে আকাশের গায়ে চিত্রের মত দেখা যাইতেছে। অন্য দিকে রামায়ণের বর্ণনার সার্থকতা করিয়া, এখনও গোদাবরী নদী গদ্‌গদ্‌ রবে শিলা হইতে শিলান্তরে প্রবাহিতা হইতেছেন। স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র জলপ্রপাত পুষ্পবৃষ্টি করিতেছে। এক পার্শ্বে নিবিড় অরণ্যময় তীরে নানাবিধ বনফুল ফুটিয়া রহিয়াছে; অন্য পার্শ্বে তৃণশূন্য বন্ধুর পর্ব্বতশ্রেণী দৈত্য-ব্যূহের মত ভীমবেশে দাঁড়াইয়া আছে। এক স্থানে জল কিঞ্চিৎ গভীর। পাণ্ডা বলিলেন, লক্ষ্মণ এখানে সূর্পণখার নাক কাণ কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন। আর এক বিদ্যাবাগীশ তিনি এক ক্ষুদ্র গর্ত্ত সম্মুখে করিয়া বসিয়াছিলেন। তাঁহার মতে, রামচন্দ্র রাবণের ভয়ে আসল সীতাকে এই কাঁকড়ার গর্ত্ত দিয়া পাতালে

পাঠাইয়াছিলেন।" রামায়ণের এই অদ্ভুত অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়া একটি পয়সা চাহিলেন। এখানে একটী জলপ্রপাতে আমি বড় প্রীতিভরে স্নান করিলাম। "জননী শৈলসুতা, নীলমণিহারনিভ সুশীতল বারিধারা আমার মানব দেহে ঢালিয়া দিয়া মন প্রাণ, পবিত্র করিলেন।

নর্ম্মদা।

এক দিন মাত্র নাগিকে থাকিয়া, ছাব্বিশ ঘণ্টা রেলে কাটাইয়া, আমরা অবসন্ন প্রাণে জব্বলপুর পঁহুছি। সেই রাত্রিতেই তারাচরণ চলিয়া আইসেন। পর দিন প্রাতে আমি নর্ম্মদা দর্শন করিতে যাই। জব্বলপুর হইতে এ স্থান এগার মাইল ব্যবধান; পথ অতি সুন্দর এবং ছায়াসমাচ্ছন্ন। প্রথমেই নর্ম্মদার জলপ্রপাত দেখিতে যাই। স্থানীয় লোকেরা ইহাকে 'ধূমধারা' বলে। উচ্চ হইতে নিম্নে, প্রস্তরগর্ভে বেগে জলধারা পড়িয়া যে জল-কণা উৎকীর্ণ করে, তাহা দূর হইতে ঠিক ধূমের মত বোধ হয়। সেই জন্যে এই জলপ্রপাতের নাম ধূমধারা হইয়াছে। উভয় পার্শ্বে শ্বেত শৈলশ্রেণী। তাহাদের পাদমূল প্রক্ষালন করিয়া, প্রস্তরগর্ভা নর্ম্মদা প্রবাহিতা। দেখিলেই মেঘদূতের সেই কবিত্ব-পূর্ণ চরণটি মনে পড়ে।

"রেবাং দ্রক্ষ্যস্যুপলবিষমে বিন্ধ্যপাদে বিশীর্ণাম্।"

অর্থ,—

"বিষম উপল মাঝে—
বিন্ধ্যপদে শীর্ণা রেবা করিও দর্শন।"

নর্ম্মদার অন্য নাম রেবা, তাহা তুমি জান। অনুমান পঞ্চাশ হস্ত উর্দ্ধ হইতে, বহু ধারায় গর্জ্জন করিয়া, নর্ম্মদা ভীষণ বেগে পতিত হইয়া এই অপূর্ব্ব জলপ্রপাত সৃষ্টি করিয়াছেন। নর্ম্মদা যেন অবিরাম সংখ্যাতীত শ্বেতকুন্দকুসুম রাশি বর্ষণ করিয়া বিন্ধ্যপাদ পূজা করিতেছেন। জল তুষারবৎ শীতল। তথাপি এই প্রাকৃতিক কবিত্বস্রোতে অবগাহন না করিয়া আমি থাকিতে পারিলাম না। প্রপাতের নীচে নামিবার সাধ্য নাই। উপরিভাগে বসিয়াও স্নান করিবার সময় আমি স্থির থাকিতে পারিলাম না। স্রোতের বেগ এত প্রখর, কিন্তু চারি অঙ্গুলের অধিক জলের গভীরতা নাই।

ফিরিবার সময়ে, গৌরী-শঙ্কর দর্শন করি। জলপ্রপাত হইতে এই মন্দির পর্য্যন্ত, গিরিমূল অসংখ্য আমলকী, বেল ও নানাবিধ বনজাত ফলবৃক্ষে সমাচ্ছন্ন। দেখিলে, ঋষিদিগের পুরাতন আশ্রমের চিত্র মনে পড়ে। আমি কোনও কোনও ফল খাইয়া দেখিলাম। মন্দিরটি একটি শৃঙ্গে অবস্থিত। মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম—কেশবচন্দ্রের নববিধান। মধ্যস্থলে বৃষারূঢ় হরপার্ব্বতী। তাহার উভয় পার্শ্বে স্থানে স্থানে গণপতির সঙ্গে বুদ্ধদেব নীরবে শোভা পাইতেছেন। মন্দিরের প্রাঙ্গণের চারিদিকে, প্রাচীরের মত শ্রেণীবদ্ধ কক্ষমালা। প্রত্যেক কক্ষে এক একটি মূর্ত্তি বিরাজিত। অল্প বেশী সকলেরই ভগ্নাবস্থা। পাণ্ডা ঠাকুর বলিলেন, চৌষট্টি যোগিনী। কিন্তু আমি তাহাতে যোগিনীর গন্ধও দেখিলাম না। আমি দেখিলাম, অধিকাংশই মাহেশ্বরী প্রভৃতি রক্তবীজবধের মহাবিদ্যা ভগ্নাবস্থাপন্না হইয়া পড়িয়া আছেন। মন্দিরটি এক সময়ে গৌরবাপন্ন ছিল, সন্দেহ নাই। এ পর্ব্বতের সানুদেশ হইতে নর্ম্মদার উভয়তীরস্থ শৈলমালা ও উপত্যকার শোভা মনোমুগ্ধকর।

পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া আমি ভারতখ্যাত 'মার্ব্বলরক' বা মর্ম্মর পর্ব্বত দেখিতে যাই। এখানে নর্ম্মদার উভয়তীরস্থ পর্ব্বতই মর্ম্মর, কিন্তু উপরিভাগ তৃণ-গুল্ম-সমাচ্ছন্ন এবং বৃষ্টির দ্বারা বিবর্ণ হইয়াছে। সেরূপ অমল শ্বেতবর্ণ দেখিতে পাওয়া যায় না। জলপ্রপাত হইতে কিঞ্চিৎ দূরে জলপতন-বেগে গর্ভস্থ প্রস্তর কাটিয়া একটি দীর্ঘাকার বিচিত্র সরোবর প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। যেখানে স্বয়ং প্রকৃতিই শিল্পী, সেখানে তাহার বিচিত্রতা এবং শোভার কথা কি বলিব? গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক এখানে দুটি বাঙ্গলা এবং দুখানি প্লেজার বোট বা আমোদতরণী রক্ষিত হইয়াছে। তীরস্থিত গৃহ দুইখানি যেন দুখানি ছবি। ডিষ্ট্রীক্ট বাঙ্গলাটি এত সুন্দর, এবং স্থানটি এত হৃদয়মুগ্ধকর যে, আমার ইচ্ছা হইল, এখানে তোমাকে লইয়া যদি কিছুদিন থাকিতে পারি! আমি একখানি জালিবোটে নর্ম্মদার গর্ভে বেড়াইতে লাগিলাম। আমি ইহার কি বর্ণনা করিব? অমল ধবল হইতে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, এবং উভয় বর্ণের সংমিশ্রিত নানাবর্ণের, মর্ম্মরশৈলশ্রেণী উভয় পার্শ্বে সরল ভাবে মধ্যাহ্ন রবিকরে কি মহিমাপূর্ণ শোভা ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার পদতলে ঘুরিয়া ফিরিয়া নীল তরল অমৃত-খণ্ডের মত নর্ম্মদার গর্ভস্থ সরসী শোভা পাইতেছে। তাহার উভয় পার্শ্বে নানাবর্ণের মর্ম্মর প্রাচীরের ছায়া সেই নীলদর্পণে প্রতিভাত হইয়া, নানাবর্ণের মেঘমালায় খচিত এক খণ্ড আকাশের মত শোভা পাইতেছে। স্থানে স্থানে মর্ম্মর গর্ভে কি সুন্দর সুন্দর কক্ষই নির্ম্মিত হইয়া রহিয়াছে। কক্ষপ্রাচীর শ্বেত মর্ম্মরের; কক্ষতল নর্ম্মদা সলিলে নীল-মণিময়। স্থানে স্থানে মর্ম্মরখণ্ড নর্ম্মদার স্রোত অবরোধ করিতে চাহিতেছে, যেন গিরি হস্ত প্রসারণ করিয়া রহিয়াছে। আবার স্থানে স্থানে এক এক খণ্ড বিচ্ছিন্ন মর্ম্মর নদীগর্ভে ভাসমান। ঠিক যেন প্রকৃতি বিচিত্র বেদী নির্ম্মাণ

করিয়া রাখিয়াছেন। এই সলিলখণ্ডে বেড়াইতে বেড়াইতে আমি সৌন্দর্য্যে আত্মহারা হইয়াছিলাম। আমার বোধ হইল, আমি যেন একটি অপ্সরাপুরীর স্বপ্ন দেখিতেছি। সেখানে সকলই যেন সুন্দর, কোমল, তরল। সেখানে সকলই প্রেম, সহৃদয়তা এবং মহাপ্রাণতা। আমার মনে হইল, এই সলিলখণ্ড বিন্ধ্যাচলের হৃদয়। বিন্ধ্যসুতা নর্ম্মদা দুহিতা-প্রেমাশ্রুতে ইহা পূর্ণ করিয়া, কল্ কল্ রবে কাঁদিতে কাঁদিতে পতিগৃহে চলিয়াছেন। অদূরে জলপ্রপাতের শব্দ এখান হইতে শুনিতে কি মধুর, কি করুণ! অথবা যেন কোন সতী সাধ্বী আকুল হৃদয়ে পতিহৃদয়ে হৃদয় ঢালিতে চলিয়াছেন। সতী যে পথে যাইতেছেন, তাহার উভয় পার্শ্বস্থ সংসার-প্রস্তর-রাশিও যেন নির্ম্মল, পবিত্র ও সুশীতল করিয়া যাইতেছেন। বোম্বাই নগরের পার্শ্বস্থ আরব সমুদ্রে নৌকাবিহার, সে এক দৃশ্য—তাহা মহিমাপূর্ণ, অনন্ত প্রেমের আভাসপূর্ণ। নর্ম্মদার নৌকাবিহার, সে অন্য দৃশ্য—তাহা মাধুর্য্যময়, ক্ষুদ্র বালিকার পিতৃপ্রেমের ক্ষুদ্র অথচ গভীর উচ্ছ্বাস। একটী বীর পুরুষের বিরাট হৃদয়, অন্যটী বালিকা নবোঢ়া বধূর ক্ষুদ্র বুক!

প্রাণ ভরিয়া নর্ম্মদার এই মোহিনী শোভা সন্দর্শন করিয়া, আসিবার সময়ে, পথে দুর্গাবতীর রাজধানী 'গড়া' এবং শৈলশেখরস্থিত তাঁহার আবাসস্থান 'মদনমহল' দেখিয়া আসি। দুর্গাবতীর নাম তুমি 'পলাশিতে'ও পড়িয়াছ।

"তথাপি সমরে যেন রাণী দুর্গাবতী।"

ইনি পরম রূপসী গোণ্ডজাতীয়া বীরাঙ্গনা ছিলেন। স্বয়ং মোগল সম্রাটের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। স্বয়ং অশ্বারোহিণী হইয়া সম্মুখ সমরে অদ্ভুত বীরত্ব দেখাইয়া ভারতবর্ষ তাঁহার কীর্ত্তিতে পূর্ণিত করিয়াছিলেন। এই দানবদলনীর দুর্গটীর একটী মাত্র অট্টালিকা এখনও বর্ত্তমান আছে। উচ্চ শৈলশৃঙ্গের উপরে একখানি

প্রকাণ্ড গোলাকৃতি পাথর। তাহার পার্শ্ব হইতে সরল ভাবে প্রাচীর তুলিয়া একটী ক্ষুদ্র দ্বিতল গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। পাথরের এক পার্শ্বেও একটী কক্ষ আছে। ইহা শুদ্ধ ধরিলে গৃহটী ত্রিতল। এই গৃহের দ্বিতীয়তল হইতে 'গড়া' নগরের দৃশ্য চিত্রিতবৎ সুন্দর দেখায়। পর্ব্বতটীর চতুষ্পার্শ্বে স্থানে স্থানে প্রাকৃতিক গড় বা ঝিল স্ফটিকখণ্ডের মত শোভা পাইতেছে। এই সকল গড় হইতে স্থানটীর নাম গড়া হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র গৃহটী পর্য্যন্ত এতদিন কালজয়ী হইয়া রহিয়াছে; কিন্তু সেই নিরুপমা সুন্দরী, সেই দিল্লীশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বিনী 'বীরনারী আজ কোথায়। বিংশতি কোটী নরাধমে আজ ভারতমাতার বক্ষ গুরুভারে পীড়িত না করিয়া, যদি এরূপ একটী বীরনারী, একটী দুর্গাবতী থাকিত, জননীর কি দুর্গোৎসবই হইত। হায়! হায়! দুর্গাবতীর কি চিরদিনের জন্যে বিজয়া হইল! আবার কি তাহার বোধন হইবে না?

জব্বলপুরে ফিরিয়া শিল্পবিদ্যালয় দেখিতে যাই। যে সকল 'ঠগেরা' ইংরাজ সাম্রাজ্যের আরম্ভে, গামছা মোড়া দিয়া সহস্র সহস্র পথিকের প্রাণহত্যা করিয়া ডাকাতি করিত, বৃটিশ শাসনের প্রভাবে, আজ তাহারা ও তাঁহাদের সন্তানেরা এই জব্বলপুরে আবদ্ধ থাকিয়া, অপূর্ব্ব শিল্প কার্য্য সকল করিতেছে। এই বিদ্যালয় হইতে আমাদের তাঁবু শতরঞ্চি ইত্যাদি যাইয়া থাকে। যে হস্ত ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বে প্রাণসংহারক গামছা মুড়িত, আজ তাহা তাঁত বুনিতেছে। ইহা অপেক্ষা ইংরাজ রাজ্যের অধিক গৌরবের কথা কি হইতে পারে? ইহার যতই দোষ থাকুক না কেন, আজ ভারতবর্ষে যে সার্দ্ধ শতবৎসরব্যাপী অভিন্ন শান্তি আসমুদ্রগিরি বিরাজ করিতেছে, ভারতমাতা ইহা কখনও উপভোগ করেন নাই। ইংরাজ-সাম্রাজ্যের এই শান্তি অক্ষয় হউক!

সেই রাত্রিতেই এলাহাবাদ রওনা হই। পরদিন প্রাতে এখানে পঁছছিয়া, ঈশ্বরকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিলাম। আমার ভাব ভ্রমণবৃত্তান্ত শেষ হইল। কাল প্রাতে কলিকাতা যাইতেছি। যদি সময় পাই, তোমার স্বজাতীয়াদের সম্বন্ধে একখানি পত্র কলিকাতা হইতে লিখিব। স্থানবর্ণনায় সে সকল কথা কিছু লিখিবার অবসর পাই নাই।

ভারত-রমণীর চিত্র।

তুলনায় সমালোচনা।

তোমাকে আমার উত্তর-ভারত-ভ্রমণ সম্বন্ধে আর একখানি পত্র লিখিব বলিয়াছিলাম। তুমি তোমার স্বজাতীয়াদের সম্বন্ধে ২।১ কথা অবশ্য শুনিতে চাহিবে। এলাহাবাদ পর্য্যন্ত কুম্ভোদরী-দের তুমি দেখিয়াছ, তাঁহাদের বেশ-ভূষার কথা অবগত আছ। দিল্লী পর্য্যন্তও প্রায় সেইরূপ। তবে সে অঞ্চলের রূপসীরা কাপড় একেবারে নাভির নীচে নগ্নতার শেষ সীমায় পরেন না। কিঞ্চিৎ উপরে কিঞ্চিৎ কসিয়া পরেন। উদরটি তত তানপুরার অধোভাগের মত দেখায় না। তাহার পর পঞ্জাব। পঞ্জাবিনীরা বেশ সুন্দরী। প্রকৃত আর্য্য আকৃতি ইহাদেরই আছে। রং যেন ফুটিয়া পড়িতেছে। নাসিকা প্রকৃতই গৃধিনীগঞ্জিত। তবে মুখের রেখাবলী আমাদের চক্ষে কিছু অধিক তীক্ষ্ণ বোধ হয়। তাহাদের

পোষাক—পায়জামা, পিরাণ এবং চাদর। পায়জামা হাঁটু হইতে পা পর্য্যন্ত পায়ের সঙ্গে আঁটা। হাঁটুর উপর ঢিলা। পিরাণটি প্রায় হাঁটু পর্য্যন্ত পড়ে। শুনিলাম, সুন্দরীরা শয়ন করিবার সময় পায়জামা একেবারে খুলিয়া ফেলিয়া কেবল পিরাণটি মাত্র অঙ্গে ধারণ করেন। পিরাণটি ইংলণ্ডীয় ললনাদের নাইট্ সার্টের কার্য্য করে।

বঙ্গ সুন্দরীদের মত ইহাদের পর্দ্দা আছে, তবে অপেক্ষাকৃত ইহারা স্বাধীন এবং সে স্বাধীনতায় কিঞ্চিৎ বীরত্ব আছে। একটি গল্প বলিব। হরিদ্বার হইতে গাড়ী আসিয়া লুক্সর ষ্টেশনে পঁহুছিল। এখানে অন্য গাড়ীতে যাইতে হয়, এবং তাহা আসিতে প্রায় দুই ঘণ্টা বিলম্ব হয়। আমি গাড়ীর পার্শ্বে প্ল্যাট্ফরমে বেড়াইতেছি। এক জন মধ্যবয়স্কা পঞ্জাববাসিনী আমাকে আহ্বান করিলেন। মুখ ফিরাইয়া দেখিলাম, তাঁহার পার্শ্বে জ্বলন্ত অগ্নিশিখানিভ একটি পূর্ণকিশোরী কন্যা। মুখখানি কি অর্দ্ধপ্রস্ফুটনোন্মুখ কমলকোরকের শোভার ন্যায় নয়ন মোহিত করিতেছে। অর্দ্ধবয়সী আমার সঙ্গে অসঙ্কুচিত ভাবে আলাপ করিলেন। * * * এই নবীন পরিচিতার সঙ্গে বহুক্ষণ বেশ কৌতুকে কাটাইলাম। তাহার পর অন্য গাড়ী আসিয়া পঁহুছিল। আমার গাড়ীতে জিনিষ তুলিয়া আমি দ্বারের কাছে প্ল্যাট্ফরমে দাঁড়াইয়া আছি; পিঠে কি কোমল হাত লাগিল। ফিরিয়া দেখিলাম, মাতা ও কন্যা। যুবতী বলিলেন,—সাহেব! আমাকে আমার গাড়ীতে তুলিয়া দেও"। আমি আজ্ঞা প্রতিপালন করিলাম। তখন হুকুম হইল,—"আমার বৃদ্ধ পিতাকেও তুলিয়া দিয়া আইস।" আমি বলিলাম, "আমি তাঁহার বৃদ্ধ পিতাকে কি প্রকারে চিনিব?" এমন সময়ে বৃদ্ধ আসিয়া স্ত্রীলোকের গাড়ীতে একটা মোট দিয়া ছুটিল। কোনও গাড়ীতে স্থান নাই। বৃদ্ধ,

লোকের গোলে পড়িয়া গেল। যুবতী চীৎকার করিয়া হুকুম দিতে লাগিলেন, "তুমি আমার বাপকে উঠাইয়া দেও।" আমি দেখিলাম, আমার মন্দ হাকিম জোটে নাই। গাড়ীতে স্থান নাই। ষ্টেশনমাষ্টারের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া একখানি গাড়ী জুড়িয়া লইলাম। তখন বহুতর অন্ত লোকের সঙ্গে বৃদ্ধ উঠিল। সুন্দরী আবার আমাকে তলপ দিলেন। বলিলাম, "তোমার বাপ উঠিয়াছে।" প্রশ্ন—"তুমি স্বচক্ষে দেখিয়াছ ?" উত্তর—"দেখিয়াছি।" তখন তিনি আমাকে ছাড়িলেন। শুনিলাম, তিনি একজন মহাজনের বনিতা। প্রত্যেক ষ্টেশনে আমি বেড়াইবার সময় আমার সঙ্গে আলাপ করিতেন। তিনি জলন্দরে নামিয়া গেলেন, আমি লাহোরে চলিয়া গেলাম।

আমি কাশ্মীর যাইবার অবসর পাই নাই। শীতে যাইবারও সুবিধা নাই। অতএব কাশ্মীরকুসুমরাশি আমি বড় একটা দেখি নাই। তবে যাহা দেখিলাম এবং শুনিলাম তাহাতে তাঁহাদের উপর আমার শ্রদ্ধা কিঞ্চিৎ কমিয়াছে। তাঁহাদের আকৃতিতে কিঞ্চিৎ পুরুষে পুরুষে ভাব, যদিও রং অতুলনীয়, এবং শুনিলাম, তাঁহারা নিতান্ত অপরিষ্কার। সকলে বলিলেন, ইহাদের অপেক্ষা শিমলা-অঞ্চলবাসিনী হিমালয়কন্যারাই সুন্দরী। ইহাদিগকে পাহাড়িয়া বলে। তাহার একটিমাত্র আমি দেখিতে পাইয়াছিলাম। প্রতুলের বাড়ীর পার্শ্বে একটি পাহাড়িয়া গৃহস্থ বাস করেন। তাঁহার একটি কন্যা সর্ব্বদা প্রাচীরের সে পাশে দাঁড়াইয়া, প্রতুলের দাসীর সঙ্গে কথা কহিত এবং প্রায়ই সে ও তাহার মাতা, নানা কায কর্ম্ম করিয়া বেড়াইত। মরি! মরি! কি রূপ! আমি এমন রূপ যেন কখনও দেখি নাই। শুনিলাম, তাহার নাম পার্ব্বতী এবং সে রূপেও ঠিক আমাদের পার্ব্বতী। তাহাকে দেখিয়া আমি বুঝিলাম, আমাদের

শাস্ত্রকার যেন আমাদের উমাকে হিমালয়ের কন্যা বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। তাহাকে অসুর এবং সিংহের পিঠে চড়াইয়া দিলে, সে একটি জীবন্ত পার্ব্বতী হইবে। রূপে, লাবণ্যে, বর্ণে, শরীরের দৈর্ঘ্যে, সে যেন দক্ষ শিল্পকরের নির্ম্মিত একটি অপূর্ব্ব প্রতিমা। দূর হইতে যতদূর বুঝা যাইতেছিল, তাহার এই প্রথম যৌবন; এবং যে ভাবে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইত, তাহাতে আমার বোধ হইত,—সে একটি ফুল অপেক্ষা ভারি হইবে না। মরি! মরি! কি মুখ, কি চোক, কি নাসিকা, কি বর্ণ, কি ক্ষুদ্র অবয়ব, সর্ব্বশেষ কি মধুমাখা ঈষৎ হাসি। তাহাকে আমি যতবার দেখিতাম, আমার বোধ হইত, যেন একটি রূপের স্বপ্ন দেখিতেছি। তাহার পোষাক পঞ্জাবী রমণীদিগের মত। তবে কখন কখন হিন্দুস্থানীদের মত সাড়ীও পরিতে দেখিতাম।

তাহার পর রাজপুতানা যাই। কি জয়পুরের, কি যোধপুরের, কি আজমীরের, কোন স্থানের রাজপুতনা আমি সুন্দরী দেখি নাই। কেবল চিতোরের রমণীরা একরূপ ইহার ব্যতিক্রম। মাড়ওয়ারের রমণীরা সর্ব্বাপেক্ষা রূপহীনা। রাজপুতনীদের পরিধান ঘাঘরা, কাঁচুলী ও ওড়না। ঘাঘরাটিও আবার এক প্রকাণ্ড ব্যাপার, এবং উলঙ্গ না হইয়া যতদূর সাধ্য, তত দূর নাভির নীচে ঘাঘরার সম্মুখটি নামাইয়া পরিয়া থাকে। অতএব কৃশাঙ্গিনীরা ছাড়া, অন্য মহিলারা বেহার-অঞ্চল-বাসিনীদের ন্যায় মহোদরী। কাঁচুলীও এরূপ ভাবে পরেন যে, ভারতচন্দ্রের কদম্বের ও দাড়িম্বের নিম্নের এক তৃতীয়াংশ তাহার বাহিরে থাকে, এবং তাহাতে বন্ধনের দাগ থাকে।

তাহার পর গুজরাটে চল। বরদার গুর্জ্জরীদের রূপ বর্ণনীয় নহে। যে দিক চাহিয়া দেখ, ষ্টেশনের মেথরাণী পর্য্যন্ত নয়ন মোহিত করিয়া দিবে। গুর্জ্জরীর "উরজরঞ্জন" ত আছেই. তাহা

ছাড়া, ইহাদের মধ্যে 'তন্বী শ্যামা' প্রায় দেখিতে পাইবে না। গাইকোয়ারের মৃতা মহিষী লক্ষ্মীবাই হইতে পথের ভিখারিণী পর্য্যন্ত সকলই সুন্দরী। ইহারা বেহারের স্ত্রীলোকদের মত সাড়ী পরে, তবে শ্রাদ্ধটী তত নীচে গড়ায় না। কেবল ভারতচন্দ্রের কামদেবের প্রবেশার্থ "নাভিকূপ" মাত্র অনাবৃত থাকে। মুসলমান সাম্রাজ্যের তরঙ্গ রাজপুতানার দক্ষিণে বড় আইসে নাই। মার-ওয়ার ছাড়িয়া আসিলে অবগুণ্ঠন আসিয়া পড়ে; তখন আর রমণী, অবগুণ্ঠন মধ্যে বদনচন্দ্র ঢাকিয়া, দর্শকের কৌতূহল বৃদ্ধি করে না। স্ত্রীস্বাধীনতাও ক্রমশঃ এখান হইতে মাথা তুলিয়া উঠি-তেছে, দেখা যায়! আর এক-পা অগ্রসর হইলেই দেখিতে পাইবে একেবারে চাঁদের হাট। মহারাষ্ট্রমহিলারা এখন "কাম-রঙ্গ পরিহরি রণরঙ্গে নাই বা মাতুন, তবে সেই পশ্চাৎ-কোঁচা-আঁটা বসন পরিধান, সেই অবগুণ্ঠনশূন্য প্রফুল্ল পদ্মমুখ, সেই অসঙ্কোচ গমন দেখিলে, ইহারা এক কালে যে রণরঙ্গে মাতি-তেন, তাহা বিলক্ষণ বুঝা যায়। মস্তকমুণ্ডিত, পর্ব্বতবৎ-পাগড়ী-সজ্জিত, মহারাষ্ট্রীয় পুরুষদিগকে দেখিতে বড় ভাল দেখায় না, কিন্তু তাঁহাদের অঙ্গনারা পরম রূপসী। তাঁহাদের কেবল কপোলদেশটার অস্থিটা যেন কিঞ্চিৎ বেশী পরিদৃশ্যমান। তাঁহাদের বসনপরিধানের নিয়মটীই কেবল স্বতন্ত্র; এরূপ নহে; তাঁহাদের কবরীবন্ধনেও কিঞ্চিৎ নূতনত্ব আছে। কবরী এক-বেণীবদ্ধ করিয়া তাহা চক্রাকারে পশ্চাৎ দিকে রাখা হয়। মাথার পশ্চাতে যেন একটী চাঁচর চক্র,—প্রেমফাঁসির গ্রন্থি। প্রাণে প্রাণে যে ফিরিয়া আসিয়াছি,' সে কেবল তোমার কপালের জোরে। মহারাষ্ট্রীয় সুন্দরীরা সর্ব্বত্র অবলীলাক্রমে বিরাজ করেন; কি উদ্যানে, কি বাস্তস্থানে, তাঁহারা সম্মুখ কোঁচার অগ্রভাগ বাম-হস্তে লীলা করিয়া ধরিয়া, পাদুকাশূন্য চরণে বিচরণ করিয়া

বেড়ান। সঙ্গে কিন্তু একটী পুরুষ মানুষ থাকেন। এ দৃশ্য ঘোমটা মধ্য হইতে উঁকি-বিক্ষেপিনী বঙ্গমহিলাদের ও তাঁহাদের আড়ে-ঠারে-দৃষ্টি-সঞ্চালনকারী রসিক পুরুষদিগের দেখিবার যোগ্য, শিখিবার যোগ্য। এই পুণ্যবতীদের দর্শনেও মনে কি এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ এবং পবিত্রতা সঞ্চারিত হয়। রাজস্থান ছাড়িয়া গেলে আমার বোধ হইল, যেন সম্পূর্ণ একটী সৌন্দর্য্যপূর্ণ নূতন জগতে প্রবেশ করিলাম। কবি বলিয়াছেন, যে পর্য্যন্ত রমণীর হাসিতে আলোকিত না হইয়াছিল, জগৎ অরণ্য ছিল। কথাটা বড় গভীর। আমাদের বঙ্গসমাজ রমণীর হাসিশূন্য, আমাদের জীবন তাই এত উৎসাহহীন, এত আনন্দশূন্য। যবন রাজ্য আমাদের আর যে সকল অনিষ্ট করিয়াছে, তাহা অতি সামান্য। নিপীড়িত হিন্দুধর্ম্ম মাথা তুলিয়াছে, ব্যক্তি গত নিপীড়ন সমাজহৃদয় স্পর্শ করে নাই। কিন্তু আমাদের সমাজে এই স্ত্রী-অবরোধস্বরূপ যে অর্দ্ধাঙ্গ বা পক্ষঘাত রোগ সঞ্চার করিয়াছে, তাহার উপসর্গে সমাজ এই ৭০০ বৎসর পরেও মাথা তুলিতে পারিল না।

কেবল মহারাষ্ট্রীয়দের মধ্যে বলিয়া নহে, পার্শীদের মধ্যেও এই পাপ প্রবেশ করে নাই। তাহাদের রমণীরাও রূপে চারিদিক আলোকিত করিয়া সর্ব্বত্র বেড়াইয়া বেড়াইতেছে। হিন্দু-সুন্দরীরা চম্পকবরণী। পার্শী রূপসীদের বর্ণ সদ্যঃপ্রস্ফুটিত শিশিরসিক্ত পদ্ম ফুলের মত। ইহুদীরা ভিন্ন ইহাদের তুলনার স্থান আর নাই। ইহাদের সাড়ীই বোম্বাই সাড়ী। সাড়ীর উপর একটী মলমলের আজানুলম্বিত পিরাণ; তাহার উপর জ্যাকেট্। ইঁহারা মাথার চুল ঢাকিয়া একখানা সাদা রুমাল বাঁধিয়া তাহার উপর খোঁপা মাত্র ঢাকিয়া মাথায় কাপড় দিয়া থাকেন। পিরাণের দৈর্ঘ্য এবং কাল চুলে সাদা কাপড়ের বন্ধনটী যেমন আমাদের চক্ষে ভাল লাগে না।

আমরা অপরাহ্নে নাসিকে পৌঁছি। যে পাণ্ডার বাটীতে গিয়া উঠি, তিনি মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ। তাঁহারা পাঁচ সহোদর। পাঁচটী স্ত্রীই সুন্দরী। আমি মাথা ধুইয়া উপরে যাইতেছি, নীচে ক্ষুদ্র অগ্নিশিখার ন্যায় একটী বালিকা বসিয়া আছে। আমি তাহাকে ডাকিলে সে এক লম্ফ দিয়া আমার বুকে উঠিয়া পা দুখানি দিয়া আমার কোমর জড়াইয়া ধরিয়া আমার মুখের উপর মুখ রাখিয়া কি বলিতে লাগিল। বুঝিলাম একটি কথা দকষীণা (দক্ষিণা)। তাহার নাম ভগ্‌গু্যা। বয়স ৬।৭ বৎসর; বিবাহ হইয়াছে তিন বৎসর। বালিকা দিনে শ্বশুরবাড়ীতে, রাত্রিতে পিতার বাড়ীতে থাকে। আর একখানি ঈষৎশ্যাম বদন পার্শ্বের কক্ষ হইতে উঁকি মারিতেছিল। ভগ্‌গু্যাকে তাহাকে ডাকিতে বলিলাম। সে হিহি করিয়া হাসিয়া, বীণার পঞ্চমে ডাকিল—"রুক্কু! ইক্কি আ।" রুক্কু আসিল। তাহার বয়স ৮ কি ৯ বৎসর হইবে। বড় সুন্দরী! তাহাকে আমার কাছে ডাকিয়া আনিলে সে কিঞ্চিৎ সলজ্জভাবে দাঁড়াইয়া, অমনি হাত বাড়াইয়া বলিল—"দকষীণা"। অমনি তাহার শাশুড়ী আসিতেছে বলিয়া ছুটিয়া গেল। আমি উপরে গেলে আবার যাইয়া বলিল "দক্‌ষীণা"। যাইবার সময় দিব বলিলে বলিল, তাহার শশুড়ী দেখিবে, সে আসিতে পারিবে না। তাহার পর দুটীতে সিঁড়ির উপর বসিয়া কত গান গাহিতে লাগিল। আমি কাছে গেলে ভগ্‌গুটী গলায় জড়াইয়া ধরে, রুক্কু পালায়। সে এ বাড়ীর পুত্রবধূ। অতএব দেখিলে, ইহাদের মধ্যে বাল্য-বিবাহ যেরূপ ভাবে প্রচলিত; শুনিলে সমাজসংস্কারগণ মূর্চ্ছা যাইবেন। কিন্তু যে পর্য্যন্ত স্ত্রী-সংস্কার না হইবে, সে পর্য্যন্ত তাঁহাদের সঙ্গে স্বামীর সাক্ষাৎ হয় না। ইঁচড়ে পাকান ব্যাপার আমাদের বঙ্গদেশের লোকে যেমন মোক্ষ মনে করেন, ইহারা সেরূপ মনে করে না। এই জন্যই বঙ্গদেশের রমণীরা অকাল-

কুষ্মাণ্ড হইয়া পড়ে। যৌবনের প্রারম্ভে বৃদ্ধা, ফুল ফুটিতে না ফুটিতেই ঝরিয়া পড়ে।

পতিপত্নীর জীবনের সুখ অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়; তাহা ছাড়া সন্তানেরা ক্ষীণপ্রাণ, ও রোগগ্রস্ত হইয়া, পিতা মাতার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে। ভগবান কতদিনে সমাজকে এ পাপের করাল গ্রাস হইতে রক্ষা করিবেন, তাহা তিনিই জানেন!

সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আহার করিতে বসিলাম। সম্মুখে পাতা দেখিয়া আমি হাঁসিতেছি দেখিয়া, সুন্দরী তাহা উঠাইয়া লইয়া আমাকে একখানি থালা দিলেন। আমরা খাইতে বসিলাম। সুন্দরী পরিবেশন করিয়া সম্মুখে বসিয়া আমার সঙ্গে আলাপ আরম্ভ করিলেন। এ আলাপ—

"সীতা নাড়ে হাত, বানরে নাড়ে মাথা।"

তিনি হিন্দি বুঝেন না, আমি মহারাষ্ট্রীয় বুঝি না। প্রেমিক খুড়া গাইয়াছেন—

"নয়নে নয়নে যদি হৃদয়ে হৃদয়ে,
বালির বাঁধে রোধে কি হে অসীম সলিলে?"

দুটি মানব হৃদয় যদি কথা কহিতে চাহে, ভাষা তাহার প্রতিবন্ধকতা করিতে পারে না। আমরা নয়নে নয়নে, হৃদয়ে হৃদয়ে কথা কহিতে লাগিলাম। ঠাকুরাণীটির নাম অম্বা। সন্তানের কথা জিজ্ঞাসা করিলে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "নারায়ণ না দিলে কি করিব?" আমি বলিলাম, নারায়ণের দিবার এখনও বিস্তর সময় পড়িয়া আছে। তিনি আমার নাম ধাম, সর্ব্ব শেষ লক্ষ্মীর কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। আমি লক্ষ্মী-ছাড়া হইয়া আসিয়াছি কেন, তাহারও কৈফিয়ৎ চাহিলেন। পুত্রটির কথাও অনেক জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি পা ছড়াইয়া সম্মুখে বসিয়া একরূপে ঈষৎ হাসিয়া হাসিয়া, প্রীতিবিস্ফারিত-

নয়নে চাহিয়া চাহিয়া, বীণার কোমল স্বর-মালা সংমিলিত করিয়া, আলাপ করিতেছিলেন, আর সময়ে সময়ে আমাকে "চাউল দে। ওয়ারণ দে" (ভাত দি, ডাল দি) বলিতেছেন। যদিও খাইবার কিছুই ছিল না, তথাপি সে ডাল ভাত কি আনন্দেই আহার করিলাম!

শুইলাম। পুনা হইতে দীর্ঘকাল রেলবিহারে শরীর অবসন্ন হইয়াছিল। শুইবামাত্র নিদ্রা আসিল। রাত্রি ১০।১১টা হইবে। নীচে রমণীকণ্ঠেরও হাসির মিশ্রিত তরঙ্গ উঠিয়াছে। আমি উঠিয়া একটা প্রয়োজনে নীচে গেলাম। মরি—কি দৃশ্য! ইহাঁরা স্বামীকে "ধনী" বলেন। কথাটা সার্থক। এরূপ রূপরত্ন যাহাদের, তাহারা ধনী বই কি? সংসারের সাররত্ন রমণীরত্ন। যাঁহাদের "ধনী" বাড়ী আছেন, তাঁহারা আপন আপন কক্ষে গিয়া ধনভোগ করিতেছেন। তিন সুন্দরীর "ধনী" বাড়ী নাই। ইহারা এক প্রদীপের আলোকে বসিয়া, হাঁটু হইতে পায়ে এ রাত্রিতে তৈল মাখিতেছেন, হাসিতেছেন, গল্প করিতেছেন। রূপ, আনন্দ, বীণার ঝঙ্কার ছড়াইয়া পড়িতেছে। আমি মুহূর্ত্ত মাত্র দাঁড়াইয়া এই আনন্দবাজার দেখিলাম, চলিয়া গেলাম। তাঁহারা কোনও সঙ্কোচই মনে করিলেন না। তারাচরণেরও নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে। কিঞ্চিৎ পরে অম্বাদেবী, তাঁহার পশ্চাতে প্রদীপ হস্তে অন্য এক সুন্দরী, আমাদের কক্ষদ্বারে আসিয়া হাসিতে লাগিলেন। না বুঝি হাসি, না বুঝি ভাষা। মহা বিপদে পড়িলাম। তারাচরণের মুখ শুকাইয়া গেল। অম্বা দেবী আমাকে ইঙ্গিত করিয়া, আমার বিছানা গুড়াইতে বলিলেন। আমি গুড়াইতেছি, তিনি বিদ্যুৎবৎ ছুটিয়া যাইতে শ্রীচরণ একখানিতে তড়িদাহত হইলাম। তিনি একটী চোরকুঠারি খুলিলেন, এবং সেখান হইতে একটী বিছানার তাড়া টানিতে টানিতে হাসিতে লাগিলেন। লোপা-

নের শীর্ষ-দেশস্থা দীপহস্তা সুন্দরীও হাসিতেছেন। উভয়ের সে উচ্চ হাসি, সেই উচ্চ রসিকতাপূর্ণ কথা, দুর্ভাগ্যক্রমে কিছুই বুঝিতেছি না। তারাচরণ ভয়ে কাঁপুক, আমি ভাবিলাম, মেয়ে মানুষের কাছে অপ্রস্তুত হইব কেন, দাঁড়াইয়া সে হাসিতে যোগ দিলাম। তারাচরণ চীৎকার করিতে লাগিল,—"আরে ও বাবু বৈস!" আমি বলিলাম, 'ভয় নাই; হরনেত্রানল নহে, আমরা কামদেবের মত ভস্ম হইব না।" রমণীদের রঙ্গরসও কিছুই বুঝিতেছি না, কিন্তু তারাচরণ যেন ঠিক দুই ফাঁসিকাষ্ঠের মধ্যে অবস্থিত। দুই দিকে দুই সুন্দরী। পলাইবারও পথ নাই। তাহার অবস্থা দেখিয়া আমার হাসিতে হাসিতে পার্শ্ব ফাটিয়া যাইতেছিল। বোধ হয় রমণীরাও তাহা দেখিয়া হাসিতেছিলেন। আমাদের একতরফা সমাজের কল্যাণ ভদ্ররমণীর কাছে পড়িলে বাঙ্গালীকে কি বিভ্রাটেই পড়িতে হয়। দেবীরা একটি বালিশ লইয়া, বাকি বিছানা ছড়াইয়া ফেলিয়া চলিয়া গেলেন। আমি বলিলাম,—"কেমন তারা। ইহাদের 'ধনীদের' আজ বাড়ী না থাকাটা ভাল হয় নাই।" এতক্ষণে তাহার মুখে হাসি আসিল, বিপদ্ কাটিয়া গেল। সুন্দরীরা নীচে গেলে বোধ হয়, এক জন পুরুষ আসিয়া, অতিথি বাড়ীতে আছে, তথাপি এইরূপ হৈ-রৈ করিতেছেন বলিয়া ভৎসনা করিল। তাহার পর গৃহ নীরব হইল। পর দিন অম্বাদেবী আর বড় কাছে ঘেঁসিলেন না। একবার বিষণ্ণ ভাবে দূর হইতে দেখা দিয়া, যেন নয়নের ভাবে বলিলেন, "পোড়ার মুখ! তুমি আমাকে গাল খাওয়াইয়াছ।" এ বেলা প্রদীপধারিণী আমাদের অন্নপূর্ণা হইলেন। তিনি অম্বাদেবী অপেক্ষা প্রাচীনা। আহার করিতেছি, আহা কি দৃশ্য! নীচে একটী বকুলবৃক্ষের তলায় একখানি শ্রীমদ্ভাগবত রাখিয়া, একটী গৃহলক্ষ্মী তাহা প্রদক্ষিণ করিতেছেন, এবং প্রত্যেকবার ঘুরিয়া

আসিয়া, গ্রন্থকে ভক্তিভরে প্রণাম করিতেছেন। তাঁহার মধ্যম যৌবনের উত্তাল তরঙ্গায়িত রূপ, তাঁহার সেই ভক্তি ও প্রীতিপূর্ণ, মুখশ্রী, সেই চক্রাকার ভ্রমণ, সেই গ্রীবাভঙ্গী, সেই কক্ষ-আন্দোলন, সেই পদসঞ্চালন, আমি এ জীবনে ভুলিব না। তিনি সর্ব্ব-জ্যেষ্ঠ সহোদরের সহধর্ম্মিণী, গৃহের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্মী। শুনিলাম, প্রতিদিন এ পরিবারের মঙ্গল কামনা করিয়া, এরূপে সহস্রবার প্রদক্ষিণ করেন। বুঝিলে কি একবার কাণ্ডখানা কি? বঙ্গদেশে এ পবিত্র দৃশ্য একদিন দেখিতে পাওয়া যাইত। এখন সে স্বর্গ বঙ্গদেশ হইতে লুপ্ত হইয়াছে। বঙ্গসুন্দরীদের স্বামী এখন গুরু নহে, দেবতা নহে, একটি সামান্য শাসনের বস্তু। স্বামীর পরিবার পরম শত্রু। তাহার ধর্ম্ম এখন স্বামীশাসন, * * * কিংবা স্বামীর চরিত্র সমালোচন করিতে করিতে ২।৪ বার অঙ্গুলীভঙ্গী, ২।৪টি শাপের মন্ত্রের মত মন্ত্রপাঠ! এরূপ ভাবে যদি কাহাকেও একখানি ধর্ম্মগ্রন্থ ২।৪ বার প্রদক্ষিণ করিতে বল, তখনই ডাক্তার ডাকিতে হইবে; মাথায় বরফ ঢালিতে হইবে। আমরা সভ্য হইতেছি, উন্নত হইতেছি, এবং অন্ধকার হইতে আলোকে আসিতেছি। এই সাধ্বীর এই প্রদক্ষিণব্রত দেখিয়া, হৃদয় আমার কি পবিত্র, কি মহিমাপূর্ণ হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না। আমাদের এ সকল সীতা সাবিত্রী কোথায় গেল?

আহার করিয়া আমরা রওনা হইলাম। কাপড় পরিতেছি, প্রদীপধারিণী বড় কোমল স্নেহময় কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমরা কি সত্য সত্য আজই যাইবে?" আমি বলিলাম,—"তোমাদের স্নেহের জন্য ধন্যবাদ, আজিই যাইব।" তাহাদের শাশুড়ীর হস্তে বধূদের জন্য কিঞ্চিৎ দক্ষিণা দিয়া, আমরা বাড়ী হইতে কিঞ্চিৎ দূরে একটি দোকানে একটি ঘটী কিনিলাম।

যখন গাড়ীতে উঠিতেছি,—অপরদিকের দোকানে দাঁড়াইয়া কে?—সেই প্রদীপধারিণী!

তাহার পর নর্ম্মদা। এখান হইতে অবরোধপ্রথার আরম্ভ হইয়াছে। যে পাণ্ডার বাড়ীতে আহার করিলাম,—ঘরখানি কুটীর, কিন্তু কি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন!—পাণ্ডা বলিলেন, আমি সস্ত্রীক থাকিলে ব্রাহ্মণীরা বাহির হইতেন।

নর্ম্মদা হইতে প্রয়াগ, প্রয়াগ হইতে উষায় হাবড়া পঁহুছিয়া, সেতু বাহিয়া যখন গঙ্গা পার হইতেছি, তখন দেখিলাম, দুই ধারে উষাস্বরূপিণী বঙ্গদিগম্বরীগণ অবগাহন করিতেছেন। তখন মনে হইল,—

"কে চায় খাইতে মধু বিনা বঙ্গকুসুমে?
কোথা হেন শতদল,
বুকে করি পরিমল,
থাকে পতিমুখ চেয়ে মধুমাখা সরমে?
বঙ্গকুল বধূ বিনা মধু কোথা কুসুমে?"

সম্পূর্ণ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও দেবীমাহাত্ম্যচণ্ডী সম্বন্ধে

পূর্ব্বভাষ।

গীতা ও দেবী-মাহাত্ম্য চণ্ডীর মূল এখন চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইয়াছে। আমরাও বহু পূর্ব্বে এই দুই খানি পুস্তকের মূল সংস্কৃত অংশ অনুবাদসহ উপহার দিয়াছিলাম। সুতরাং এখন আর মূলের পুনঃ প্রচার আবশ্যক বোধ করি না। বিশেষতঃ কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের অনুবাদ কতদূর মূলানুযায়ী তৎপ্রদর্শনের কিছুমাত্র প্রয়োজন অনুভূত হয় না। এ অবস্থায় আমরা মূল সংস্কৃত শ্লোকগুলি সঙ্গে সঙ্গে না দিয়া শুদ্ধ নবীনচন্দ্রের রচনা অর্থাৎ তাঁহার অনূদিত কবিতাগুলি এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিলাম। যদি কাহারও কৌতূহল জন্মে নির্দ্দিষ্ট অঙ্ক-সংখ্যানুসারে অনায়াসে মূলের সহিত মিলাইয়া দেখিতে পারিবেন।

প্রকাশকস্য।

সর্ব্বোপনিষদোগাবোদোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থোবৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥

গীতামাহাত্ম্যম্।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

—*—

আমি মূর্খ, ভগবদ্গীতার মর্ম্ম কি বুঝিব? গীতা জগতের অদ্বিতীয় ধর্ম্মগ্রন্থ; গীতার ভাষায় বলিতে গেলে—

"আকূল পূরিত, স্থির, অচঞ্চল
সমুদ্রে সলিল প্রবেশে যেমন;"

তেমনি জগতের যাবদীয় ধর্ম্মগ্রন্থরাশি এই গীতা সাগরে বিলীন হইয়া যায়। কাব্যাংশেও গীতা অতুলনীয়। ইহার অভিনেতা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং ভারতের অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর অর্জ্জুন। স্থান—ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র। সময়—মহাভারত-যুদ্ধের প্রারম্ভ। দর্শক—ভারতের সশস্ত্র যুদ্ধার্থী নৃপতিমণ্ডল। বিষয়—কর্ত্তব্য-পরাঙ্মুখ অর্জ্জুনকে কর্ত্তব্য কর্ম্মে রত করা। ইহা গীতার গৌণ উদ্দেশ্য। অনন্ত জ্ঞানসিন্ধু মন্থন করিয়া মানবজাতির জন্য পরম ধর্ম্মামৃত বা চরম মনুষ্যত্ব উদ্ভাবন করাই গীতার মুখ্য উদ্দেশ্য। কাব্যে এবং ধর্ম্মগ্রন্থে রূপগত পার্থক্য থাকিলেও প্রকৃত মনুষ্যত্ব শিক্ষা দেওয়াই উভয়ের একমাত্র উদ্দেশ্য। গীতোপদিষ্ট সেই চরম মনুষ্যত্বের নাম—নিষ্কাম ধর্ম্ম।

এই নিষ্কামত্ব বা কামনার নির্ব্বাণই বৌদ্ধ ধর্ম্মের—নির্ব্বাণ।

কি প্রণালীতে এই মহৎ ধর্ম্ম প্রতিপাদিত হইয়াছে, কি সূত্রে গীতোক্ত তত্ত্বরত্নরাশি গ্রথিত হইয়াছে, এবং তাহার মধ্যে কোন্ কোনটী সর্ব্বপ্রধান, তাহা একবার সংক্ষেপে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

১ম অধ্যায়—সৈন্যদর্শন।

ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে কৌরব পাণ্ডবেরা যুদ্ধার্থে সমবেত হইয়াছেন। ভারতবর্ষের সমগ্র নৃপতিমণ্ডল দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যুদ্ধের প্রতীক্ষা করিতেছেন। এ ত সময়ে অর্জ্জুনের ইচ্ছানুসারে শ্রীকৃষ্ণ উভয় সেনার মধ্যে রথ লইয়া গেলে অর্জ্জুন দেখিলেন যে, তাঁহার সমুদায় আত্মীয়স্বজন যুদ্ধার্থে উপস্থিত। তিনি বলিলেন—

"হই বা নিহত যদি ইহাদের করে আমি, হে মধুসূদন !
তুচ্ছ মহী, ইহাদেরে না ইচ্ছি ত্রৈলোক্যতরে বধিতে কখন।" ৩৫

তখন তিনি শোকে একান্ত কাতর হইয়া ধনুর্ব্বাণ ত্যাগ করিয়া উদ্বিগ্ন মনে রথে বসিয়া রহিলেন।

২য় অধ্যায়—সাঙ্খ্যযোগ।

ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিলেন যে, এরূপ সঙ্কটসময়ে তাঁহার এরূপ মোহ ও ক্লীবত্ব আর্য্যের অযোগ্য। কিন্তু অর্জ্জুন বলিলেন, তিনি গুরুগণ বধ না করিয়া বরং ভিক্ষা করিয়া খাইবেন। তাঁহার এই ইন্দ্রিয়-শোষক শোক ধরার রাজ্য, কিংবা সুর-রাজ্যও বিমোচন করিতে পারিবে না। অতএব—

"পরন্তপ ধনঞ্জয় কহিলেন পদ্মনাভে—
করিব না যুদ্ধ আমি, রহিলেন মৌনভাবে।" ৯

তখন ভগবান্ সহাস্যবদনে তাঁহাকে অদ্ভুত গীতোক্ত ধর্ম্ম বুঝাইতে আরম্ভ করিলেন। এইখানে গীতা আরম্ভ হইল।

তিনি বলিলেন, অর্জ্জুন জ্ঞানী হইয়াও, যে বিষয়ে শোক করা উচিত নহে, তাহাতে শোক করিতেছেন। এ কথাটী তিনি তিন প্রকারে বুঝাইলেন। তিনি প্রথমতঃ বুঝাইলেন যে, আত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, বিকার নাই, কেবল দেহ মাত্র অন্ত হয়। অতএব আত্মাকে কেহ বধ করিতে পারে না, আত্মাও কাঁহাকে বধ করেন না। মানুষের দেহে যেরূপ কৌমার, যৌবন, ও বার্দ্ধক্য সংঘটিত হইয়া থাকে, মৃত্যুও সেইরূপ অবস্থান্তর মাত্র।

"যথা জীর্ণ বাস করি পরিহার,
করে নর নব বসন গ্রহণ ;
তথা পরিহরি দেহী জীর্ণ দেহ,
করে অন্য নব শরীর ধারণ।" ২২

দ্বিতীয়তঃ, যদি মনে কর, আত্মা নিত্য জন্মিতেছে, নিত্য মরিতেছে, তথাপিও শোক অনুচিত। কারণ—

"জন্মিলে নিশ্চিত মৃত্যু মরিলে জন্ম নিশ্চিত,
অপরিহার্য্যের তরে শোক তব অনুচিত।" ২৭

তদ্ভিন্ন—

"আদিতে অব্যক্ত থাকে, মধ্যভাগে হয় ব্যক্ত ভূতগণ যত ;
নিধনে অব্যক্ত পুনঃ হয়ঃ তার তরে কিবা বেদনা ভারত ?" ২৮

বুঝাইলেন, আত্মা নিত্য। তাহার জন্ম মৃত্যু নাই। আর দেহ আদিতে অব্যক্ত থাকে বলিয়া ত কেহ শোক করে না। তবে নিধনে অব্যক্ত হয় বলিয়া শোক করিবে কেন ?

তৃতীয়তঃ, অন্য কারণে না হইলেও নিতান্ত—

"স্বধর্ম্মেরো পানে চাহি ভীতি কর পরিহার,
ধর্ম্মযুদ্ধ হ'তে শ্রেয় ক্ষত্রিয়ের নাহি আর।" ৩১

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ধর্ম্মযুদ্ধ। ইহার উদ্দেশ্য পরস্বহরণকারী দুরাচারের দমন।

ভগবান্ বলিলেন—

"আর যদি তুমি নাহি কর এই ধর্ম্মরণ,
হারা'য়ে স্বধর্ম্ম, কীর্ত্তি, পাপে হবে নিমগন।" ৩৩

ইহার নাম সাঙ্খ্যযোগ বা জ্ঞানযোগ। তিনি বলিলেন, ভোগ ঐশ্বর্য্য ইত্যাদি ফল কামনা করিয়া যে কর্ম্মাদি করা যায়, তাহাতে চিত্ত বিষ্ণুতে সমাহিত বা স্থিরীকৃত হয় না।

"সকাম সকল বেদ, অর্জ্জুন! হও নিষ্কাম,—
যোগী, নিত্য ব্রহ্মে স্থিত, দ্বন্দ্বহীন, আত্মবান্।" ৪৫

কারণ, কর্ম্ম হইতে জ্ঞানযোগ শ্রেষ্ঠ—

"বহু কূপে হয় যাহা, পারে এক পারাবারে সাধিতে সকল।
একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞান পারে তথা প্রদানিতে সর্ব্ব বেদফল।" ৪৬

তবে কি কর্ম্ম করিব না? করিব।

"কর্ম্মে তব অধিকার, নহে ফলে কদাচিত।
ত্যে'য়াগিবে কর্ম্মফল, কর্ম্মত্যাগ অনুচিত।" ৪৭

অতএব—

"সুখ দুঃখ সমজ্ঞানে, লাভালাভ, জয়াজয়,
কর যুদ্ধ তুমি, পাপ হইবে না ধনঞ্জয়!" ৩৮

এরূপ যোগ অবলম্বন করিলে তোমার জ্ঞান ব্রহ্মেতে স্থিত হইবে, অর্থাৎ তুমি স্থিতপ্রজ্ঞা লাভ করিবে।

তখন অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন "স্থিতপ্রজ্ঞ" ব্যক্তির লক্ষণ কি? ভগবান্ বুঝাইলেন—

(১) "মনের কামনা সর্ব্ব করি পার্থ! পরিহার,
আত্মাতেই তুষ্ট আত্মা, স্থিতপ্রজ্ঞ নাম তার। ৫৫

(২) "কূর্ম্মের অঙ্গের মত, করিবারে সঙ্কুচিত,
যে পারে ইন্দ্রিয়গণ, তার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত। ৫৮

(৩) "সংযত-ইন্দ্রিয় হও মৎপর ও যোগস্থিত।" ৬১

অর্থাৎ (১) নিষ্কাম, (২) জিতেন্দ্রিয় এবং (৩) ঈশ্বরপরায়ণ যোগীই স্থিতপ্রজ্ঞ।

"আকুল পূরিত, স্থির, অচঞ্চল,
সমুদ্রে সলিল প্রবেশে যেমন ;
তেমতি কামনা প্রবেশে যাহাতে,
সেই পায় শান্তি, নহে কামীজন।" ৭০

৩য় অধ্যায়—কর্ম্মযোগ।

অর্জ্জুন তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, যদি কর্ম্মযোগ হইতে জ্ঞান-যোগ শ্রেষ্ঠ, তবে আমাকে কেন এ ঘোর কর্ম্মে নিয়োজিত করিতেছেন ?

ভগবান্ কহিলেন, কর্ম্ম না করিয়া লোক নৈষ্কর্ম্ম্য লাভ করিতে পারে না। বিশেষতঃ—

"অকর্ম্মা থাকিতে কেহ নাহি পারে কদা চিত।
স্বভাব গুণেতে সবে হয় কর্ম্মে নিয়োজিত॥" ৫

অতএব প্রকৃতির দ্বারা বাধ্য হইয়া কর্ম্ম করিতে হইবে।

"কিন্তু আত্মাতেই রত, আত্মাতেই তৃপ্তি যার,
আত্মাতে সন্তুষ্ট সদা, তার কার্য্য নাহি আর।" ১৭

যতদিন সে অবস্থা না হইবে তত দিনে নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করিতে হইবে। তদ্ভিন্ন লোকশিক্ষার জন্যে নিতান্ত তোমার কর্ম্ম করা উচিত। কারণ—

"যাহা আচরিবে শ্রেষ্ঠ করে তা ইতর জন।" ২১

স্বয়ং ঈশ্বর কর্ম্ম করিতেছেন—

"আমার কর্ত্তব্য পার্থ ! ত্রিলোকে নাহি কিঞ্চিৎ—

অপ্রাপ্ত, প্রাপ্তব্য নাহি, তবু আমি কর্ম্মান্বিত।" ২২

কেন ?

"আমি কর্ম্ম না করিলে হবে সব উৎসাদিত।" ২৪

অতএব সকলেরই কর্ম্ম করা উচিত। তবে অজ্ঞানীরা যে কর্ম্ম সকামভাবে করে, জ্ঞানীরা তাহা নিষ্কামভাবে করিবে।

ভগবান্ কহিলেন—

"আমাতে সকল কর্ম্ম আধ্যাত্মিক জ্ঞানবলে করি সমর্পণ,

নিষ্কাম, মমতা-হীন হয়ে, নির্ব্বিকারচিত্তে কর তুমি রণ।" ৩০

তুমি যে দুষ্ট শত্রুকে ক্ষমা করিয়া কর্ম্মত্যাগ করিতেছ, অর্থাৎ যুদ্ধ করিতেছ না, তাহা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নহে। ক্ষমা ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম তাহা ভাল হইলেও—

"সগুণ সু-অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম হ'তে শ্রেয় স্বধর্ম্ম বিগুণ।

স্বধর্ম্মে নিধন শ্রেয়, পরধর্ম্ম ভয়াবহ তথাপি, অর্জ্জুন !" ৩৫

তখন অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, চিত্ত-বিকার জন্মাইয়া পুরুষকে কে অনিচ্ছায় বলপূর্ব্বক পাপে নিযুক্ত করে ? উত্তর—কাম এবং ক্রোধ। অতএব ইন্দ্রিয় সংযত করিয়া ইহাদিগকে ধ্বংস করিবে।

৪র্থ অধ্যায়—জ্ঞানকর্ম্ম-বিভাগযোগ।

পূর্ব্ব দুই অধ্যায়ে জ্ঞানযোগ এবং কর্ম্মযোগ বুঝাইয়া ভগবান্ এই অধ্যায়ে উভয়ের পার্থক্য বুঝাইতেছেন। বুঝিলাম, ফল-কামনা ত্যাগ করিয়া, অর্থাৎ ঈশ্বরে কর্ম্মফল সমর্পণ করিয়া কর্ম্ম করাই কর্ম্মযোগ। কিন্তু কোন্‌টী সুকর্ম্ম, কোন্‌টী দুষ্কর্ম্ম, এবং কর্ম্ম-হীনতাই বা কি, তাহা কি প্রকারে জানিব ? যখন লোকের

এরূপ দুরবস্থা হয়, যে সুকর্ম্মে দুষ্কর্ম্মে প্রভেদ বুঝিতে পারে না, অর্থাৎ সংসার হইতে ধর্ম্মজ্ঞান তিরোহিত হয়—

"যখন যখন ঘটে, ভারত! ধর্ম্মের গ্লানি,
অধর্ম্মের অভ্যুত্থান, আপনাকে সৃজি আমি। ৭
"সাধুদের পরিত্রাণ, বিনাশ দুষ্কৃতদের করিতে সাধন,
স্থাপন করিতে ধর্ম্ম, করি আমি যুগে যুগে জনম গ্রহণ।" ৮

তখন ভগবান্ শরীর গ্রহণ করিয়া মানব-জাতিকে প্রকৃত ধর্ম্ম অথবা প্রকৃত কর্ত্তব্যজ্ঞান শিক্ষা দেন। আর যদি বল যে, তাহা লাভ করা বহু জ্ঞান এবং তপস্যার ফল, তথাপি—

"যে যথা আমাকে চাহে, তাকে তথা ভজি আমি।"

কারণ—

"পার্থ! সর্ব্বরূপ নর মম পথ অনুগামী।" ১১

লোকে দ্রব্যাদি দ্বারা নানারূপ যাগ যজ্ঞ করে এবং যোগ সাধন করে। কিন্তু—

"দ্রব্যময় যজ্ঞ হ'তে জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেয়ান্বিত;
সর্ব্বরূপ কর্ম্ম, পার্থ! জ্ঞানে হয় সমাপিত।" ৩৩

সে জ্ঞান কিরূপ—

"যে জ্ঞান লভিলে পুনঃ না হয় মোহ, পাণ্ডব!
আত্মার আত্মাতে যাহে দেখিবে সংসার সব॥" ৩৫

কিরূপ হইলে তাহা পাওয়া যায়?

"তৎপর, সংযতেন্দ্রিয়, শ্রদ্ধাবান্ লভে জ্ঞান।
লভি জ্ঞান, পায় শীঘ্র পরম শান্তি নিদান।" ৩৯

৫ম অধ্যায়—কর্ম্ম-সন্ন্যাসযোগ।

ঈশ্বর-জ্ঞান লাভার্থ কর্ম্ম-ত্যাগের নাম সন্ন্যাস। ঈশ্বরে ফল সমর্পণ করিয়া, অর্থাৎ ফল-কামনা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করার নাম

কর্ম্মযোগ। অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, এ দুটীর কোন্‌টী শ্রেয়? ভগবান্ কহিলেন, উভয়ই শ্রেয়স্কর, তথাপি সন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগ শ্রেষ্ঠ। কিন্তু সাঙ্খ্যযোগ ও কর্ম্ম-যোগ পৃথক্ নহে—

"সাঙ্খ্যে পায় যেই স্থান, যোগেও সেখানে যায়;
অভিন্ন সাঙ্খ্য ও যোগ, যে দেখে সে দেখে তায়।" ৫

কর্ম্মযোগ-বিহীন সন্ন্যাস কেবল দুঃখের কারণ। কেননা কর্ম্মযোগী সর্ব্বভূতে পরমাত্মাকে দেখে, এবং সে মনে করে, ইন্দ্রিয়াদির ভোগ্যবিষয়ের জন্যে ইন্দ্রিয়েরা কর্ম্ম করিতেছে। অতএব সে কর্ম্ম করিয়াও সন্ন্যাসীর মত কোন কর্ম্মে লিপ্ত হয় না।—

"ব্রহ্মে সমর্পিয়া কর্ম্ম, নিষ্কাম যে কর্ম্মরত;
না হয় সে পাপে লিপ্ত পদ্মপত্রে জল মত।" ১০

সে কেবল আত্ম-শুদ্ধির নিমিত্ত কর্ম্ম করে মাত্র। সে জানে—

"নরের কর্ত্তৃত্ব, কর্ম্ম, কর্ম্মফল, কদাচিত
না সৃজেন বিভু; জীব স্বভাবেতে প্রবর্ত্তিত। ১৪
"না লন সুকৃতি, পাপ, কারো বিভু কদাচন।"

তবে লোকে সেরূপ মনে করে কেন?—

"অজ্ঞানে আচ্ছন্ন জ্ঞান, তাহে মুগ্ধ জীবগণ" ১৫

সে প্রকৃতরূপে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া শান্তি লাভ করে।

"যজ্ঞ-তপ-ফল-ভোক্তা, অর্জ্জুন! সর্ব্ব লোকের আমি মহেশ্বর,
সুহৃদ্ সর্ব্বভূতের,—আমাকে জানিয়া শান্তি লভে সেই নর।" ২৯

এত অল্প কথায় পরমেশ্বরের এমন একটি মহৎ ও পূ চিত্র অন্য কোনও ধর্ম্মগ্রন্থে আছে কি না জানি না।

ষষ্ঠ অধ্যায়—অভ্যাসযোগ।

এই অধ্যায়েও সন্ন্যাস এবং কর্ম্মযোগ বা যোগের কথা। ভগবান্ কহিলেন—

"করে যে কর্ত্তব্য কর্ম্ম কর্ম্ম-ফলে হীনস্পৃহ,
সে সন্ন্যাসী, সেই যোগী ; নহে নিরগ্নি নিষ্ক্রিয়।" ১

যে ব্যক্তি যোগাকাঙ্ক্ষী, কর্ম্ম তাহার অবলম্বন। আর যে ব্যক্তির যোগসিদ্ধি হইয়াছে তাহার অবলম্বন শান্তি। তাহার আর কর্ম্ম নাই। যোগারূঢ় বা যোগসিদ্ধের অবস্থা কিরূপ ?—

"জ্ঞানে বিজ্ঞানেতে তৃপ্ত, অবিকার,-জিতেন্দ্রিয়,
সেই যোগী, যার লোষ্ট্র, শিলা, স্বর্ণ সমপ্রিয়।" ৮

* * * *

"নিবাত স্থানেতে স্থিত নিষ্কম্প প্রদীপ মত,
অর্জ্জুন ! সংযতচিত্ত যোগী আত্ম-যোগরত" ১৯

* * * *

"আত্মাকে সমস্ত ভূতে, আত্মাতে সমস্ত ভূত
সর্ব্বত্র সমান-দর্শী যোগী করে অনুভূত।" ২৯

* * * *

"সর্ব্বত্র সমান দেখে আত্মবৎ যেই জন,
সুখে দুঃখে, মম মতে সে জন যোগী পরম।" ৩২

তখন অর্জ্জুন কহিলেন,—

"হে কৃষ্ণ ! চঞ্চল মন দৃঢ়, মত্ত শক্তিধর ;
তাহার নিগ্রহ করা বায়ু মত সুদুষ্কর।" ৩৪

উত্তর—

"দুর্জ্জয় চঞ্চল মন, হে মহাবাহো ! নিশ্চিত।
অভ্যাসে, বৈরাগ্য, কিন্তু হয় তাহা নিগৃহীত।" ৩৫

অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন যাহারা মনের চঞ্চলতা নিবন্ধন যোগে অকৃতকার্য্য হয়, তাহারা কি "ছিন্ন মেঘের মত" উভয় লোক ভ্রষ্ট হয় ? ভগবান্ কহিলেন—

"ইহলোকে পরলোকে না হয় সে বিনাশিত।
দুর্গতি কল্যাণকারী নাহি পায় কদাচিত।" ৪০

সে ব্যক্তি পরজন্মে

"লভি তথা বুদ্ধিযোগ, পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত ধন,
সিদ্ধি তরে বহু যত্ন করে সে, কুরুনন্দন!" ৪৩

সে এরূপ যত্ন করিয়া,

"বহু জন্মে হ'য়ে সিদ্ধ, পায় সে পরমগতি।" ৪৫

৭ম অধ্যায়—বিজ্ঞানযোগ।

সকল যোগের লক্ষ্য সেই পরমগতি বা পরমব্রহ্মের প্রকৃতি কিরূপ? ভগবান্ কহিলেন, ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, বুদ্ধি, মন ও অহঙ্কার—এই আমার অষ্ট প্রকার প্রকৃতি। ইহাদিগকে অপরা প্রকৃতি কহে। জীবভূত অন্য যে পরা প্রকৃতি আছে, তাহা হইতে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হয়।

"আমা হ'তে শ্রেষ্ঠ আর নাহি কিছু হে ভারত!
আমাতে গ্রথিত বিশ্ব সূত্রে মণিগণ মত।" ৭

রাজসিক, তামসিক ও সাত্ত্বিক ভাবে জগৎ বিমুগ্ধ। কেবল চাতুর্ব্বিধ পুণ্যবান্ ভগবানের ভজনা করে—পীড়িত, তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু, অর্থাকাঙ্ক্ষী, এবং জ্ঞানী। ইহাদের মধ্যে

"লভি বহু জন্ম অন্তে এই জ্ঞান—'কৃষ্ণ সব,'
যে জ্ঞানী আমাকে পায়, সে মহাত্মা সুদুর্লভ।"১৯

আর যাহারা দেবতার পূজা করে?

"লভে ক্ষণ-স্থায়ী ফল সেই অল্পজ্ঞানিগণ;
দেবযাজী পায় দেব, আমাকে মদ্ভক্ত জন।" ২৩

আর,

"অধিভূত, অধিদেব, অধিযজ্ঞ সহ জানে যাহারা
আমাকে সে যোগিগণ, প্রয়াণকালেও পার্থ! জানিবারে পায়।" ৩০

৮ম অধ্যায়—ব্রহ্মযোগ।

অধিভূতাদি কাহাকে বলে তাহা বুঝাইয়া ভগবান্ বলিলেন—

"সহস্র যুগ পর্য্যন্ত ব্রহ্মার দিন বিদিত,
রাত্রিযুগ সহস্রান্ত,—জানে দিবারাত্রিবিৎ। ১৭
"অব্যক্ত হইতে সব জনমে আসিলে দিন।
সেরূপ আসিলে রাত্রি অব্যক্ততে হয় লীন। ১৮
"ভূতগণ এইরূপে জন্মি জন্মি হয় লয়।
রাত্রিতে অবশ থাকে, দিবসেতে হয় লয়।" ১৯

সংক্ষেপে এমন বিজ্ঞানসঙ্গত সৃষ্টি-প্রকরণ কি আর কোনও ধর্ম্মগ্রন্থে আছে? সৃষ্টিপ্রকরণ বুঝিলাম। তবে ভূতগণের এই ব্যক্ত ও অব্যক্ত অবস্থা ভিন্ন কি আর কিছু নাই?

"ব্যক্তাব্যক্ত ভিন্ন আছে সনাতন ভাব আর,
সর্ব্বভূত হ'লে নাশ না হয় বিনাশ যার।" ২০
"অব্যক্ত অক্ষর সেই—তাহাই গতি প্রধান।" ২১

তাহাকে কিরূপে পাওয়া যায়?

"সে শ্রেষ্ঠ পুরুষ হয় অনন্য ভক্তিতে লাভ,
সর্ব্বত্র অন্তঃস্থ যার, সবে যার আবির্ভাব।" ২২

ভগবান্ কহিলেন—

"জানিলে এ পথ যোগী নহে মুগ্ধ কদাচিত।
অতএব সর্ব্বকালে হও তুমি যোগান্বিত।" ২৭

তুমি যোগান্বিত হইয়া যুদ্ধ কর।

৯ম অধ্যায়—রাজগুহ্যযোগ।

ভগবান্ এ অধ্যায়ে ঐশ্বরিক রাজগুহ্য ভাব, অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ নিগূঢ় তত্ত্ব সকল ব্যাখ্যা করিতেছেন।

"অব্যক্ত মূর্ত্তিতে মম জগত সর্ব্বব্যাপিত।
আমাতে সমস্ত ভূত, আমি নহি তাহে স্থিত।" ৪

সে আবার কিরূপ?

"যথা আকাশেতে নিত্য সর্ব্বগামী মহা বায়ু করে অবস্থান,
সেই রূপে সর্ব্বভূত আমাতেই অবস্থিত, জানিও প্রমাণ।" ৬

কি সুন্দর ও বিশদ উপমা। সেই সর্ব্বভূতের স্রষ্টা কে?

"কল্পক্ষয়ে সর্ব্বভূতে আমার প্রকৃতি পায়।
কল্পারম্ভে তাহাদের সৃষ্টি আমি পুনরায়।" ৭

কি প্রকারে?

"প্রকৃত অধ্যক্ষে মম সৃজে এই চরাচর।
এই হেতু জগতের বিপর্য্যয় বীরবর॥" ১০

কিন্তু ভগবানই জগতের সর্ব্বেসর্ব্বা, এবং লোকেরা একত্বে বা পৃথকত্বে তাঁহারই পূজা করিয়া থাকে। আর,—

"যারা শ্রদ্ধান্বিত হয়ে পূজে অন্য দেবতায়,
তারাও অবিধিমতে, কৌন্তেয়! পূজে আমায়।" ২৩

ভক্তের অতি সামান্য উপহারও তিনি গ্রহণ করেন।

"ভক্তিতে যে জন দেয় পত্র, পুষ্প, ফল, জল,—
লই আমি পবিত্রাত্মা ভক্তদত্ত সে সকল।" ২৬

আর পাপী দুরাচারও যদি তাঁহাকে ভজনা করে,—

"ধর্ম্মাত্মা হইয়া শীঘ্র পায় সে শান্তি পরম।
কৌন্তেয়! জানিও নষ্ট নাহি হয় ভক্ত মম।" ৩১

অতএব—

"মদ্ভক্ত, মদ্গত-চিত্ত, হও মম উপাসক, কর নমস্কার!
যুক্তাত্মা মৎ-পরায়ণ এরূপ হইলে, পাবে একত্ব আমার।" ৩৪

১০ম অধ্যায়—বিভূতিযোগ।

অর্জ্জুন তখন জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কহ সে অশেষ দিব্য আপন বিভূতি চয়,
করিতেছে অবস্থিতি ব্যাপি যাহে লোকত্রয়। ১৬
"হে যোগি! কি ভাবে চিন্তি পাব আমি তব জ্ঞান?
চিন্তিব তোমায় আমি কি কি ভাবে, ভগবান?" ১৭

ভগবান্ কহিলেন, তাঁহার বিভূতি বা গুণ অনন্ত। জগতের যে জাতীয় দ্রব্যে যাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট তাহাই তাঁহার বিভূতি। যথা—

"আদিত্যেতে আমি বিষ্ণু, জ্যোতিষ্মানে প্রভাকর,
মরুতে মরীচি আমি, তারাগণে শশধর।" ২১

* * * *

"বেগগামী মধ্যে বায়ু, শস্ত্রীগণে দাশরথী,
মৎস্যেতে মকর আমি, নদীগণে ভাগীরথী।" ৩১

* * * *

"বৃষ্ণিগণে বাসুদেব, পাণ্ডবে শ্বেতবাহন,
কবিগণে শুক্রাচার্য্য, মুনিগণে দ্বৈপায়ন।" ৩৭

মোটামুটি,

"যে সত্ত্ব ঐশ্বর্য্যান্বিত, শ্রীমৎ বা প্রভাযুত,
জানিবে সে সব মম তেজ-অংশ সমুদ্ভূত।" ৪১

সর্ব্বশেষ বলিলেন—

"কিংবা এত, পার্থ! তব কিবা প্রয়োজন জানি?
একাংশে সমগ্র বিশ্ব ব্যাপিয়া রয়েছি আমি।" ৪২

১১শ অধ্যায়—বিশ্বরূপ দর্শন।

অর্জ্জুন সেই বিশ্বব্যাপী ঐশীরূপ দেখিতে ইচ্ছা করিলে, ভগবান্ তাঁহাকে "দিব্য চক্ষু" দিয়া বলিলেন—

"দেখ পার্থ! দেখ শত সহস্র রূপ আমার—
নানাবিধ, নানাবর্ণ, আমার দিব্য আকার। ৫
"দেখ সূর্য্য, বসু, রুদ্র, মরুত, অশ্বিনীসুত,
অনেক অদৃষ্টপূর্ব্ব, ভারত! দেখ অদ্ভুত। ৬
"এক স্থানে সমুদায় দেখ বিশ্ব চরাচর—
দেখ যাহা ইচ্ছা আর, মম দেহে, বীরবর!' ৭

শ্রীকৃষ্ণ পরমযোগী। যাঁহারা যোগশাস্ত্র বিশ্বাস করেন, যাঁহারা বিশ্বাস করেন, আত্মা "মহিমাসিদ্ধির" দ্বারা বিশ্ব ব্যাপিতে পারে, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের এই বিশ্বরূপে কিছুই বিস্ময়ের বিষয় দেখিবেন না। যাঁহারা যোগশাস্ত্র বিশ্বাস না করেন, তাঁহারা এরূপ বুঝিলেই হইবে, যে ভগবান অর্জ্জুনকে উপরোক্তমতে পরমেশ্বরের বিশ্বরূপ দেখাইলেন, অর্থাৎ বুঝাইয়া দিলেন, আমরা বিশ্বের দ্বারাই একমাত্র বিশ্বেশ্বরকে জানিতে পারি। ইহার দ্বিতীয় উপায় নাই। অতএব বিশ্বই তাঁহার রূপ,—তিনি বিশ্বরূপ।

শ্রীকৃষ্ণ-প্রদত্ত "দিব্যচক্ষু" বা জ্ঞানের দ্বারা অর্জ্জুন সেই বিশ্বরূপ দেখিলেন। দেখিয়া ভীত স্তম্ভিত হইয়া তাঁহার ধ্যান করিলেন। কি ঈশ্বর-মাহাত্ম্যে, কি কবিত্বে, এই ধ্যান অপূর্ব্ব। বিস্মিত পুলকিত, রোমাঞ্চিত অর্জ্জুন প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন—

"বহু বাহূদর বদন নয়ন,
দেখিতেছি তব অনন্ত স্বরূপ;
নাহি অন্ত মধ্য, নাহি তব আদি,
দেখিতেছি, বিশ্বেশ্বর! বিশ্বরূপ!" ১৬

আবার—

"দ্যুলোক, ভূর্লোক, অন্তরীক্ষ, তুমি
ব্যাপিয়াছ একা দিক্ সমুদয় ;
দেখিয়া অদ্ভুত উগ্ররূপ তব
হ'তেছে মহাত্মা! ভীত লোকত্রয়।" ২০

বিশ্বের দ্বারা বিশ্বকর্ত্তাকে দেখিতে গেলে তাঁহার ধ্বংস কার্য্যই নশ্বর মানবের সর্ব্বাগ্রে নয়নগোচর হয়।

তাই—

"করাল দশন বদনে তোমার
দেখি কালানল-সন্নিভ প্রকাশ।
নাহি জানি দিক, নাহি পায় শান্তি,
সুপ্রসন্ন হও, হে জগন্নিবাস!" ২৫

আবার,

"যথা নদীদের বহু অম্বুবেগ
সিন্ধু-অভিমুখী, প্রবেশে সাগরে,
তথা এই নরলোক বীরগণ
পশিছে অনন্ত বদননিকরে।" ২৮

এই সর্ব্ব-সংহারক মূর্ত্তি দেখিয়া অর্জ্জুনের বীর-হৃদয়ও সন্ত্রস্ত হইল।

তিনি বারংবার কাতর হইয়া বলিলেন—

"প্রসীদ দেবেশ! জগন্নিবাস।"

তিনি বার বার ভক্তিভাবে প্রণাম করিলেন—

"তোমাকে সহস্র করি নমস্কার
পুনঃ নমস্কার করি বহুবার। ৩৯
"সম্মুখে, পশ্চাতে, করি নমস্কার,
সর্ব্বদিকে, সর্ব্ব প্রণাম আবার।" ৪০

ভগবান্ প্রথমে বুঝাইয়াছেন যে, এই কালগ্রাস বা মৃত্যু প্রাণীমাত্রেরই অপরিহার্য্য অদৃষ্ট-লিপি। তখন অর্জ্জুনকে ডাকিয়া বলিলেন—

"অতএব উঠ, লভ তুমি যশ।
কর রাজ্যভোগ জিনি শত্রুদল।
পূর্ব্বেই করেছি হত আমি সব,
সব্যসাচি! তুমি নিমিত্ত কেবল।"৩৩

১২শ অধ্যায়—ভক্তিযোগ।

অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবানকে যাহারা এরূপ সাকার-ভাবে উপাসনা করে আর যাহারা অব্যক্ত নিরাকারভাবে উপাসনা করে, এই দুই প্রকার উপাসকের মধ্যে কাহারা উত্তম। ভগবান বলিলেন, নিরাকার উপাসকই শ্রেষ্ঠ। যাহারা এরূপ ভাবে অব্যক্তের উপাসনা করে—

"সংযমি ইন্দ্রিয়গণ, সমজ্ঞান সমুদায়,
সর্ব্বভূত হিতে রত,—তারাই আমাকে পায়।"

কিন্তু নিরাকার উপাসনা বড় কঠিন।—

"অব্যক্ত আসক্তদের ক্লেশ সমধিক তর,
দুঃখেতে অব্যক্তগতি পায় দেহধারী নর।" ৫

সেই জন্য—

"আমাতে স্থাপিত স্থির চিত্ত যদি নাহি হয়,
পাইতে অভ্যাস যোগে ইচ্ছা কর, ধনঞ্জয়।৯
"অভ্যাসে অশক্ত যদি, হও মৎ-কর্ম্মপর;
করি কর্ম্ম মম তরে পাবে সিদ্ধি, বীরবর।১০
"তাতেও অশক্ত যদি, কর মম যোগাশ্রয়,
যতাত্মা হইয়া ত্যাগ কর কর্ম্ম-ফলাশয়।"১১

তাহার পর ভগবান্ কহিলেন, যে সর্ব্বভূতে সমদর্শী, যাহার সুখ দুঃখাদিতে সমজ্ঞান, যে জিতেন্দ্রিয়, যে—

"শুচি, দক্ষ, উদাসীন, বিগত-ব্যথ, নিস্পৃহ,
সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী, মদ্ভক্ত, সে মম প্রিয়।" ১৬

১৩শ অধ্যায়।—ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগযোগ।

অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ, এবং জ্ঞান ও জ্ঞেয় কি? ভগবান্ কহিলেন, শরীর ক্ষেত্র, আমি ক্ষেত্রজ্ঞ, এবং ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। তাহার পর তিনি বুঝাইলেন, ভূতগণের সাধারণ প্রবৃত্তি যাহা তাহা ক্ষেত্রের বিকৃতি, এবং পূর্ব্বোক্ত উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকলের জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। আর—

"তত্ত্ব জ্ঞানার্থ দর্শন, অধ্যাত্মজ্ঞান নিত্যতা,—
ইহাকেই কহে জ্ঞান, অজ্ঞান যাহা অন্যথা।" ১২

জ্ঞেয় স্বয়ং ভগবান্—

"অবিভক্ত ভূতগণে বিভক্ত রূপেতে স্থিত;
সৃষ্টি স্থিতি গ্রাসকারী সেই জ্ঞেয় অভিহিত।" ১৭

এই জ্ঞেয় পুরুষ এবং প্রকৃতি উভয় অনাদি, এবং গুণ ও বিকার মাত্রই প্রকৃতি-সম্ভূত।

"কার্য্য আর কারণের প্রকৃতিকে হেতু কহে,
সুখ দুঃখ ভোগ হেতু প্রকৃতি পুরুষ নহে। ২১

"হইয়া প্রকৃতি স্থিত, পুরুষ প্রকৃতি-জাত ভুঞ্জে গুণগণ,
এই গুণ-সঙ্গ, পার্থ। অসৎ সৎ যোনিতে জনম কারণ!" ২২

কিন্তু পুরুষ তাহাতে লিপ্ত হন না।

"নির্লিপ্ত সূক্ষ্মতা হেতু সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বগত, আকাশ যেমন;
সর্ব্বদেহে অবস্থিত নির্ব্বিকার পরমাত্মা নির্লিপ্ত তেমন।" ৩৩

১৪শ অধ্যায়—গুণত্রয় বিভাগযোগ।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে গুণের কথা আসিয়া পড়িয়াছে। ভগবান্ এই অধ্যায়ে গুণের প্রকৃতি বিশেষ করিয়া বুঝাইতেছেন। গুণরাশি তিন ভাগে বিভক্ত—সত্ব, রজঃ এবং তম।

"নির্ম্মলত্ব হেতু সত্ব,—প্রকাশক, অনাময়,—
সুখ সঙ্গে, জ্ঞান সঙ্গে, করে বদ্ধ, ধনঞ্জয়।
"তৃষ্ণা-সঙ্গে-সমুদ্ভূত রাগাত্মক রজঃগুণ,
দেহীকে কর্ম্মের সঙ্গে করে বদ্ধ, হে অর্জ্জুন।৭
"সর্ব্বদেহী-মোহকারী জান অজ্ঞানজ তমঃ,
প্রমাদ ও নিদ্রালস্যে করে বদ্ধ, অরিন্দম।"৮

তাহার পর এই তিন গুণে মানুষকে কি প্রকার কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে, ইহারা বর্দ্ধিত হইলে কিরূপ হয়, সে অবস্থায় মৃত্যু হইলে কি গতি হয়, এবং তাহার ফলাফল কিরূপ ভগবান তাহা বিস্তারিতরূপে বুঝাইলেন।—

"সুকৃত কর্ম্মের, পার্থ। সাত্বিক ফল নির্ম্মল;
রজসের ফল দুঃখ, তমের অজ্ঞান ফল।" ১৬

কিন্তু এই ত্রিগুণ অতিক্রম না করিলে মুক্তি নাই।

"দেহ সমুদ্ভূত এই গুণত্রয় অতিক্রমি আত্মা দেহধারী,
জন্ম-মৃত্যু-জরা-দুঃখ-মুক্ত হ'য়ে, অমৃতের হয় অধিকারী।" ২০

এই তত্ব নিরাকরণ করিবার জন্যেই ভগবান্ বুদ্ধদেব সংসার-ত্যাগী হইয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার অপূর্ব্ব জীবনের মূল মন্ত্র। অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন ত্রিগুণাতীত বা ত্রিগুণ অতিক্রমকারীর লক্ষণ কি? ভগবান বুঝাইলেন, যে জিতেন্দ্রিয়, সমজ্ঞানী, এবং নিষ্কাম—

"উদাসীন মত থাকে, নহে গুণে বিচলিত ;
গুণ কার্য্যে রত জানি, রহে যে অচঞ্চলিত। ২৩

সে ব্যক্তিই গুণাতীত। আর—

"অনন্য ভক্তিযোগেতে যে জন সেবে আমায়,
হ'য়ে সর্ব্ব গুণাতীত সে ব্রহ্মত্ব ভাব পায়।" ২৬

১৫শ, অধ্যায়।—পুরুষোত্তম যোগ।

সেই ত্রিগুণাত্মক সংসার কিরূপ, তাহা একটী "ঊর্দ্ধ মূল-অব্যয়-অশ্বত্থ" বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করিয়া অতি সুন্দর রূপ বুঝান হইয়াছে।

"অধে-ঊর্দ্ধে তার শাখা প্রসারিত,
গুণেতে বর্দ্ধিত, বিষয়ে পত্রিত ;
অধ অনুগামী বাসনার মূল,—
নরলোকে কর্ম্ম-বন্ধন নিশ্চিত।" ২

বৈরাগ্য দৃঢ়াস্ত্রে ইহাকে ছেদন করিয়া পরমধাম অন্বেষণ করিতে হইবে। সে কিরূপ ?—

"চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি তথা নাহি করে দীপ্তি দান,
যথা গেলে নাহি জন্ম, সে মম পরম ধাম।" ৬

মৃত্যু ও জন্মসময়ে এই গুণভোগী ইন্দ্রিয়গণ কোথায় যায় ?
"দেহ প্রাপ্তিকালে, আর দেহ পরিত্যাগ কালে করেন ঈশ্বর
গ্রহণ ইন্দ্রিয়গণ, পুষ্প হ'তে যথা গন্ধ লয় সমীরণ।" ৮

ত্রিগুণান্বিত ও ইন্দ্রিয় সমন্বিত ভূতগণ ক্ষর এবং ভূতস্থ পুরুষ অক্ষর। তবে পরমেশ্বর কি ?

"ক্ষরের অতীত আমি, অক্ষর হ'তে উত্তম
এই হেতু লোকে বেদে আখ্যাত পুরুষোত্তম।" ১৮

১৬শ অধ্যায়—দৈবাসুর সম্পদ্-বিভাগ যোগ।

ভগবান্ এই অধ্যায়ে বুঝাইতেছেন যে, ত্রিগুণান্বিত এবং ইন্দ্রিয় সমন্বিত লোক দুই প্রকার প্রকৃতি বিশিষ্ট হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। যাহারা দৈব সম্পদেতে অভিজাত অর্থাৎ দৈবগুণ বিশিষ্ট হইয়া জন্মগ্রহণ করে, তাহারা এই গীতোক্ত উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল লাভ করে, আর যাহারা নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি পরায়ণ তাহারা আসুরী সম্পদে অভিজাত।

"অসত্য, অপ্রতিষ্ঠিত, অনীশ্বর এ জগত,—আসুরীরা কহে,
কাম-হেতু-পরস্পর -সমুদ্ভূত ভিন্ন ইহা আর কিছু নহে।" ৮

আমাদের শিবলিঙ্গ পূজা কি তবে ইঁহাদের দ্বারাই প্রচলিত? এই অসুর জন্মাদের প্রবৃত্তি যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে তাহা আমাদের আধুনিক সমাজের একটী জীবন চিত্র। বর্ণনাটী আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কিছু গায়ে লাগিবার কথা।

"আমরণ চিন্তাগ্রস্থ হইয়া অপরিমাণ,
কাম-উপভোগ ধ্রুব করে পরমার্থ জ্ঞান। ১১

"শত আশা-পাশে বদ্ধ, কাম ক্রোধ পরায়ণ,
কামার্থ সঞ্চিতে অর্থ অন্যায় করে যতন।" ১২

এইরূপে বুঝাইয়া ভগবান কহিলেন—

"দ্বেষ্টা, ক্রূর, মন্দকারী, সংসারে সে নরাধম,—
অসুর যোনিতে আমি অজস্র করি ক্ষেপণ।" ১৯

পরলোক বা পুনর্জন্ম বিশ্বাস না করিলেও দেখিতে পাই সচরাচর পুরুষানুক্রমে যোগীর সন্তান যোগী, পাপীর সন্তান পাপী এবং পুণ্যাত্মার সন্তান পুণ্যাত্মা, হইয়া থাকে। আর্য্যশাস্ত্রানুসারে পতি পত্নীর গর্ভে সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করেন। এজন্যে পত্নীর নাম জায়া।

"মোক্ষার্থ দৈবী-সম্পদ, আসুরী বন্ধন তরে।
কেন কর শোক তুমি দৈবী জন্ম লাভ করে।" ৫

১৭শ অধ্যায়—শ্রদ্ধাত্রয় বিভাগ যোগ।

মানুষের দুই প্রকার প্রকৃতি বুঝাইয়া এখন ভগবান্ বুঝাইতেছেন, মানুষের শ্রদ্ধা তিন ভাগে বিভক্ত।—সাত্ত্বিক, রাজসিক, এবং তামসিক। এ তিন শ্রদ্ধানুসারে লোকের পূজা, আহার, যজ্ঞ এবং তপ সকলই তিন প্রকার। তন্মধ্যে—

"সুখ্যাতি-মান-পূজার্থ দম্ভে অনুষ্ঠিত তপ—
চঞ্চল, অধ্রুব,—তাহা রাজসিক, পরন্তপ!" ১৮

তেমনি দানও তিন প্রকার—

"দাতব্য মাত্র জানিয়া অনুপকারীকে দান
যথা দেশে কালে পাত্রে—সাত্ত্বিক তাহার নাম।" ২০

আর—

"প্রতি-উপকার তরে, কিংবা ফল কামনায়,
ক্লিষ্টভাবে দেয় যাহা,—রাজস কহে তাহায়।" ২১

অবশেষ—

"অদেশে অকালে, যাহা অপাত্রেতে হয় দান
অশ্রদ্ধা অবজ্ঞা সহ,—তামস তাহার নাম।" ২২

১৮শ অধ্যায়—মোক্ষ যোগ।

ভগবান্ কহিলেন, উপরোক্ত যজ্ঞ, দান, তপ, কর্ম্মাদির দ্বারা মনীষিরা পবিত্রিত হইয়া থাকেন, অতএব তাহা কদাচিত ত্যাগ করিবে না।

তবে—

"ত্যজিয়া আসক্তি, ফল, কর্ত্তব্য এ কর্ম্ম সব।
নিশ্চিত উত্তম মত এই মম, হে পাণ্ডব।" ৬

কেন ?—

"কর্ম্মের ত্রিবিধ ফল,—অনিষ্ট ইষ্ট, মিশ্রিত,—
ঘটে অত্যাগীর পরে, ত্যাগীর নহে কচিৎ।" ১২

কর্ম্মের হেতু পাঁচটী—দেহ, কর্ত্তা, ইন্দ্রিয়গণ, চেষ্টা এবং দৈব। কর্ম্মের প্রবর্ত্তক তিন—জ্ঞান, জ্ঞেয়, ও পরিজ্ঞাতা। কর্ম্মের আশ্রয়ও তিন—করণ, কর্ম্ম, ও কর্ত্তা। জ্ঞান, কর্ম্ম, কর্ত্তা, বুদ্ধি, ধৃতি, এবং সুখ গুণভেদে ত্রিবিধ—সাত্বিক, রাজসিক, ও তামসিক।

"নাহি পৃথিবীতে, স্বর্গে, দেবগণে, কদাচন
প্রকৃতিজ এই তিন গুণ-মুক্ত যেই জন।" ৪০

"ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রদের, পরন্তপ!
স্বভাব-সম্ভূত গুণে প্রবিভক্ত কর্ম্ম সব।" ৪১

এই স্বাভাবিক কর্ম্ম করিলে কদাচ পাপ হয় না। এমন কি—

"সদোষ হ'লেও নাহি কদাচ সহজ কর্ম্ম, করিবে বর্জ্জিত;
ধূমাবৃত অগ্নি মত, সর্ব্ব কর্ম্ম রত থাকে দোষে আবরিত।" ৪৮

ভগবান্ কহিলেন—

"করিব না যুদ্ধ—ইহা ভাবিছ যে অহঙ্কার করিয়া সহায়,
মিথ্যা সে সঙ্কল্প তব, প্রকৃতিই নিয়োজিত করিবে তোমায়।" ৫

* * * * *

"সর্ব্বভূত-হৃদয়েতে বিরাজিত, হে অর্জ্জুন! আছেন ঈশ্বর;
যন্ত্রারূঢ় সর্ব্বভূত মায়া-বলে ভ্রাম্যমান করি নিরন্তর।" ৬১

অতএব—

"তেয়াগিয়া সর্ব্ব ধর্ম্ম, লও তুমি এক মাত্র শরণ আমার।
করিও না শোক, পার্থ! সর্ব্ব পাপ হ'তে আমি করিব উদ্ধার।" ৬৬

গীতা শেষ হইল। "লও তুমি একমাত্র শরণ আমার" এইটি গীতার মূল-মন্ত্র, চরম-শিক্ষা। বুঝিলাম, ভগবান্ ভিন্ন আর কিছুই

নাই। তাঁহার প্রকৃতির বা শক্তির ব্যক্ত ভাবই পরিদৃশ্যমান জগৎ। তাঁহার প্রকৃতি হইতে জগৎ সৃষ্ট, তাঁহার প্রকৃতির দ্বারা জগৎ রক্ষিত ও পালিত এবং তাঁহার প্রকৃতিতেই জগৎ বিলীন হইয়া যায়। তিনি সর্ব্বভূতস্থ আত্মা। অতএব আত্মা অমর; মৃত্যু দেহের অবস্থান্তর মাত্র। এই প্রকৃতি অনুযায়ী কর্ম্মের নাম স্বধর্ম্ম। অভ্যাসের দ্বারা ইন্দ্রিয় সংযত করিয়া এবং ফলকামনা পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ কর্ম্মফল ভগবানে সমর্পণ করিয়া, নিষ্কাম ভাবে স্বধর্ম্ম পালন করিলেই চরম মনুষ্যত্ব বা পরম সুখ লাভ হয়। ভগবান্ সর্ব্বভূতস্থ; অতএব সর্ব্বভূতকে আত্মসম জ্ঞান করিয়া, সর্ব্বভূত হিতার্থ কর্ম্ম করিলেই কর্ম্মফল ভগবানে সমর্পিত হয়।

এই অপূর্ব্ব ধর্ম্মগীতা শেষ করিয়া ভগবান্ অর্জ্জুনকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

"একাগ্র চিত্তে কি পার্থ! করিলে ইহা শ্রবণ?
অজ্ঞানজ মোহ তব হইল কি বিমোচন?" ৭২

ভারতমাতার কি এমন দিন হইবে যে আর্য্যসন্তানেরা এই ভগবদ্গীতা পাঠে স্বধর্ম্ম শিক্ষা করিয়া অর্জ্জুনের মত ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে বলিবে—

"নষ্ট মোহ, স্মৃতিলাভ, হয়েছে প্রসাদে তব,
গত ভ্রান্তি মম; আজ্ঞা পালিব তব, কেশব।" ৭৩

যিনি মনোনিবেশ পূর্ব্বক এই গীতা পাঠ করিবেন, তাঁহাকে সঞ্জয়ের মত বলিতে হইবে—

"কৃষ্ণার্জ্জুন এ সংবাদ অদ্ভুত ও পুণ্যাধার,
স্মরিয়া স্মরিয়া হৃষ্ট হইতেছি বারংবার।" ৭৬
"হরির অদ্ভুতরূপ স্মরিয়া স্মরিয়া আর
হ'তেছে বিস্ময় মহা, হৃষ্ট চিত্ত বারংবার।" ৭৭

সঞ্জয় যে ভবিষ্যদ্বাণী অন্ধরাজকে বলিয়া গীতা-আবৃত্তি শেষ করিয়াছিলেন, অদ্য "ভারত-হিতৈষিগণকে" তাহা উপহার দিয়া এই সমালোচনা শেষ করিব—

"যত্র যোগেশ্বর কৃষ্ণ, যত্র পার্থ ধনুর্দ্ধর,
তত্র শ্রী, বিজয়োন্নতি, নীতি ধ্রুব, নৃপবর।" ৭৮

ভারতের হৃদয়ে কৃষ্ণ, বাহুতে পার্থ অধিষ্ঠিত না হইলে, ভারতের শ্রী, বিজয়োন্নতি, ও ধ্রুব নীতির আশা নাই।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

প্রথম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন।

ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে সমবেত যুদ্ধাশয়
মম পুত্র, পাণ্ডবেরা কি করিল, হে সঞ্জয়! ১

সঞ্জয় কহিলেন।

ব্যূহিত পাণ্ডব সেনা নিরখিয়া দুর্য্যোধন,
আচার্য্য সমীপে রাজা করিলেন নিবেদন। ২
দেখ পাণ্ডুপুত্রদের, আচার্য্য! সেনা অপার,
ব্যূহিত দ্রুপদ পুত্রে ধীমান্ শিষ্য তোমার। ৩
ভীমার্জ্জুন সমযোদ্ধা, দেখ, শূর, ধনুর্দ্ধর,
মহারথী যুযুধান, বিরাট পঞ্চালেশ্বর। ৪
ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, কাশীরাজ বীর্য্যাধার,
পুরুজিত, কুন্তিভোজ, নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য আর। ৫
যুধামন্যু পরাক্রান্ত উত্তমৌজা বীর্য্যবান্,
সুভদ্রা-দ্রৌপদী-পুত্র মহারথী খ্যাতনাম। ৬
বিশিষ্ট আমার পক্ষে যে সেনা-নায়কগণ।
কহিতেছি, দ্বিজোত্তম! তাহাদের বিবরণ। ৭

আপনি, ও ভীষ্ম কর্ণ, কৃপ রণজয়ী চির,
বিকর্ণ ও অশ্বত্থামা, সোমদত্ত সুত বীর। ৮
অন্যান্য অনেক শূর সজ্জিত আমার তরে ত্যজিতে জীবন,
সবে যুদ্ধবিশারদ, ধরে সবে নানা শস্ত্র, নানা প্রহরণ। ৯
অপর্য্যাপ্ত মম সৈন্য করেন ভীষ্ম রক্ষণ;
পর্য্যাপ্ত পাণ্ডব সেনা রক্ষিছে ভীম তেমন। ১০
সর্ব্বত্রে ব্যূহের মুখে যথাভাগে অবস্থিত
হইয়া, করুন্ সবে ভীষ্মদেবে সংরক্ষিত। ১১
জন্মা'তে তাঁহার হর্ষ, কুরু বৃদ্ধ পিতামহ
প্রতাপী, ধ্বনিলা শঙ্খ উচ্চে সিংহনাদ সহ। ১২
তখন পণব, ভেরী, আনক, গোমুখ, শঙ্খ,
সহসা বাজিল, শব্দে হইল তুমুল্ আতঙ্ক। ১৩
তখন শ্বেতাশ্ব-যুক্ত মহতি রথেতে স্থিত
মাধব, পাণ্ডব, শঙ্খ করিলেন বিধ্বনিত। ১৪
হৃষীকেশ—"পাঞ্চজন্য," "দেবদত্ত"—ধনঞ্জয়,
ভীমকর্ম্মা ভীম—"পৌণ্ড্র," ধ্বনিলেন শঙ্খত্রয়। ১৫
বাজাইলা শঙ্খ রাজা কুন্তিপুত্র যুধিষ্ঠির,—"অনন্ত বিজয়,"
নকুল ও সহদেব—"সুঘোষ," "মণিপুষ্পক," মহাশঙ্খদ্বয়। ১৬
ধনুর্দ্ধর কাশীরাজ, শিখণ্ডি রণ পণ্ডিত,
ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাটেশ্, সাত্যকি অপরাজিত। ১৭
দ্রুপদ, দ্রৌপদীপুত্র, সুভদ্রার মহাবাহু পুত্র বীরমতি,
পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খ, তখন ধ্বনিলা সবে,
হে পৃথিবী-পতি। ১৮
ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদের, বিদারিয়া অন্তঃস্থল,
আকাশ পৃথিবী ব্যাপী উঠিল সে কোলাহল। ১৯
কপিধ্বজ, যুদ্ধে স্থিত দেখি ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ,

নিক্ষেপ করিতে অস্ত্র তুলি. নিজ শরাসন।
কহিলেন, মহীপতে। হৃষীকেশে এই মত। ২০

অর্জ্জুন কহিলেন।

উভয় সেনার মধ্যে হে অচ্যুত! রাখ রথ। ২১
যাবত নিরখি আমি, যুদ্ধকামী বীরগণে
কাহারা আমার সনে যুঝিবেক এই রণে; ২২
দুষ্ট ধার্ত্তরাষ্ট্রদের সাধিবারে প্রিয়ব্রত,
কাহারা আসন্ন রণে হইয়াছে সমাগত। ২৩

সঞ্জয় কহিলেন।

এ রূপে কহিলে পার্থ, হৃষীকেশ, হে ভারত!
উভয় সেনার মধ্যে স্থাপিয়া উত্তম রথ, ২৪
কহিলেন,—দেখ পার্থ! সমবেত কুরুগণ
ভীষ্ম দ্রোণ প্রমুখীন মহীপতি সর্ব্বজন। ২৫
পাণ্ডব দেখিলা চাহি, পিতৃ. পিতামহ, গুরু, মাতুল তথায়,
ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র, সখা, শ্বশুর, সুহৃদ্‌গণ, উভয় সেনায়। ২৬
দেখিয়া কৌন্তেয় তথা সর্ব্ব বন্ধু অবস্থিত,
কহিলেন এইরূপে কৃপাবিষ্ট বিষাদিত—২৭

অর্জ্জুন কহিলেন।

দেখিয়া স্বজন, কৃষ্ণ! সমবেত, রণোৎসুক,
অবসন্ন গাত্র মম, বিশুষ্ক হতেছে মুখ।২৮
কাঁপিতেছে অঙ্গ মম, হইতেছে রোমাঞ্চিত,
পড়িছে গাণ্ডীব খসি, হতেছে দেহ দাহিত। ২৯
নাহি শক্তি থাকি স্থির, হইতেছে ভ্রান্ত মন,
হে কেশব! দুর্নিমিত্ত করিতেছি দরশন। ৩০
বধিয়া স্বজন রণে নাহি দেখি শ্রেয়মুখ;

না চাহি বিজয়, কৃষ্ণ। নাহি চাহি রাজ্য, সুখ। ৩১
কি কাজ রাজ্যে, গোবিন্দ! কি কাজ ভোগে, জীবনে?
যাদের কারণ,
চাহি রাজ্য, ভোগ, সুখ, তারা উপস্থিত যুদ্ধে
ত্যজিতে জীবন। ৩২
রয়েছে আচার্য্য তথা, পিতা, পুত্র, পিতামহ,
মাতুল, শ্বশুর, পৌত্র, শ্যালক, সম্বন্ধিসহ। ৩৩
হই বা নিহত যদি ইহাদের করে আমি,
হে মধুসূদন!
তুচ্ছ মহী, ইহাদেরে না ইচ্ছি ত্রৈলোক্য তরে
বধিতে কখন। ৩৪
বধি ধার্ত্তরাষ্ট্রগণে কিবা প্রীতি জনার্দ্দন
হইবে উদয়?
এই আততায়িগণে বধিলেও পাপাশ্রয়
ঘটিবে নিশ্চয়। ৩৫
করিব না হত্যা কভু ধার্ত্তরাষ্ট্রে সবান্ধব;
কিরূপে স্বজন বধি হইব সুখী, মাধব? ৩৬
যদিও না দেখে এরা, লোভেতে হয়েছে মোহ
কুলক্ষয় কি যে দোষ, কি পাতক মিত্রদ্রোহ। ৩৭
আমরা জানিয়া, নাহি নিবৃত্ত হইব কেন,
দেখিতেছি জনার্দ্দন। কুলক্ষয় পাপ হেন? ৩৮
কুলক্ষয়ে হয় নষ্ট কুল ধর্ম্ম সনাতন,
ধর্ম্ম নষ্টে হয় কুল অধর্ম্মেতে নিগমন। ৩৯
অধর্ম্মেতে করে দুষ্ট কুলনারী অতঃপর,
দুষ্টা নারী হতে, কৃষ্ণ! জনমে বর্ণসঙ্কর। ৪০
করে কুলঘাতীদের কুল সহ পিতৃলোক

সঙ্কর নরকগামী, লুপ্ত করে পিণ্ডোদক। ৪১
করে কুলঘাতীদের, এ বর্ণ-সঙ্কর পাপ,
সনাতন কুলধর্ম্ম জাতিধর্ম্ম অপলাপ। ৪২
মনুষ্যের, জনার্দ্দন! কুলধর্ম্ম হ'লে নাশ,
শুনিয়াছি ঘটে তাহে নিয়ত নরক বাস। ৪৩
অহো! কি যে মহাপাপ করিতে হয়েছি রত,
রাজ্য-সুখ লোভে, হায়! স্বজন করিয়া হত! ৪৪
প্রতিহিংসা পরাঙ্মুখ, অশস্ত্র, আমাকে রণে
সশস্ত্র কৌরবে ব'ধে, মঙ্গল ভাবিব মনে। ৪৫

সঞ্জয় কহিলেন—

কহি পার্থ রণস্থলে বসিলেন রথাসনে,
তেয়াগিয়া ধনুর্ব্বাণ, শোকেতে উদ্বিগ্ন মনে। ৪৬

ইতি অর্জ্জুন বিষাদ যোগনাম
প্রথম অধ্যায়। ১।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

—*—

সঞ্জয় কহিলেন।

কৃপাবিষ্ট, অশ্রুপূর্ণ আকুলিত দুনয়ন,
বিষাদিত, ধনঞ্জয়ে কহিলা মধুসূদন—১

ভগবান্ কহিলেন।

বিষম সঙ্কটে তব কেন হ'লো, বীরবর!
আর্য্যের অযোগ্য মোহ, অস্বর্গ্য অকীর্ত্তিকর? ২

পেও না ক্লীবত্ব, তব নহে যোগ্য কদাচন,
হৃদয় দৌর্ব্বল্য ক্ষুদ্র ত্যজি উঠ, অরিন্দম। ৩

অর্জ্জুন কহিলেন।

পূজনীয় ভীষ্ম দ্রোণ সহ রণে, জনার্দ্দন!
কেমনে করিব প্রতিযুদ্ধ, হে অরিসূদন! ৪
না বধিয়া গুরু, ওহে মহাত্মন্! ভিক্ষায় ভোজন মঙ্গল আমার;
ভুঞ্জিতে হইবে, গুরু বধি হত, কাম, অর্থ, লিপ্ত শোণিতে সবার। ৫
না জানি আমরা কি যে গরীয়ান—জয় পরাজয়, দেবকী-কুমার!
যাঁদেরে বধিয়া না চাহি বাঁচিতে, সেই কৌরবেরা সম্মুখে আমার। ৬
কাতরতা দোষে আচ্ছন্ন স্বভাব, জিজ্ঞাসিতে তোমায় ধর্ম্ম-মূঢ় মন,
নিশ্চয় যা শ্রেয় কহ, শিষ্য আমি, শিখাও আমায়, লইনু শরণ। ৭
ইন্দ্রিয়-শোষক—শোক বিমোচন করিবে কি আছে না দেখি এমন,
ধরায় সমৃদ্ধ রাজ্য নিষ্কণ্টক, সুররাজ্য, নাহি পারিবে কখন। ৮

সঞ্জয় কহিলেন।

পরন্তপ ধনঞ্জয় কহিলেন পদ্মনাভে—
"করিব না যুদ্ধ আমি," রহিলেন মৌনভাবে। ৯
তখন সহাস্যে কৃষ্ণ কহিলেন, কুরুপতি!
উভয় সেনার মধ্যে অর্জ্জুনে বিষণ্ণমতি। ১০

ভগবান্ কহিলেন।

কথা কহ জ্ঞানীমত, তবে কেন অশোকেতে হও শোকান্বিত?
মৃত কি জীবিত তরে, নাহিক অনুশোচনা করেন পণ্ডিত। ১১
জন্মি নাই তুমি, আমি, কিংবা নরপতিগণ,
কিংবা জন্মিব না পরে,—অর্জ্জুন! নহে এমন। ১২
দেহীর এ দেহে যথা, কৌমার, যৌবন, জরা, হয় সংঘটন,
দেহান্তরপ্রাপ্তি তথা; তাহাতে বিমুগ্ধ নাহি হয় ধীরজন। ১৩

ইন্দ্রিয়-সংযোগ শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ যত ;
অনিত্য, আইসে যায় ; সহ তাহা হে ভারত ! ১৪
যে জন ব্যথিত নহে তাহাতে, পুরুষবর।
দুঃখে সুখে সমজ্ঞান, অমর সে ধীর নর। ১৫
না থাকে অসৎ, সৎ নাহি হয় তিরোধান ;
তত্ত্বদর্শী উভয়ের দেখেছে এ পরিণাম। ১৬
জেন তুমি অবিনাশী যেই আত্মা সর্ব্বময়,
নাশিতে অব্যয় আত্মা, কেহই সমর্থ নয়। ১৭
অমর অচ্ছেদ্য নিত্য শরীরীর দেহ যত
ধ্বংসশীল—অতএব যুদ্ধ কর, হে ভারত ! ১৮
যে ইহাকে ভাবে হন্তা, যে ইহাকে ভাবে হত,—
উভয় অজ্ঞানী, আত্মা না হন্তা, হত, ভারত ! ১৯
নাহি জন্মে, নাহি মরে, পুনঃ পুনঃ সমুৎপন্ন
কভু নাহি হয় ;
অজন্ম, অক্ষয়, নিত্য, পরিণামহীন, হত
দেহ সহ নয় ॥ ২০
অবিনাশী, নিত্য, অজ, অব্যয় বলিয়া আত্মা
জানে যেই জন,
কেন সে পুরুষ, পার্থ ! করিবে বা করাইবে
কাহারো নিধন ? ২১
যথা জীর্ণবাস করি পরিহার,
করে নর নব বসন গ্রহণ ;
তথা পরিহরি দেহী জীর্ণ দেহ,
করে অন্য নব শরীর ধারণ ॥ ২২
না পারে ছেদিতে অস্ত্র, দহিবার হুতাশন,
সলিলে করিতে আর্দ্র, শুকাইতে প্রভঞ্জন। ২৩

অচ্ছেদ্য, অদাহ্য আত্মা, নাহি ক্লেদ, বিশোষণ,
নিত্য সর্ব্বময়, স্থাণু, অচল ও সনাতন। ২৪
অব্যক্ত, অচিন্তনীয়, পরমাত্মা নির্ব্বিকার,—
জানিয়া, তাহার তরে করিওনা শোক আর। ২৫
মনে কর যদি আত্মা নিত্য জাত, নিত্য মৃত;
তথাপিও, মহাবাহো! শোক তব অনুচিত।২৬
জন্মিলে নিশ্চিত মৃত্যু, মরিলে জন্ম নিশ্চিত
অপরিহার্য্যের তরে শোক তব অনুচিত। ২৭
আদিতে অব্যক্ত থাকে,
মধ্যভাগে হয় ব্যক্ত ভূতগণ যত,
নিধনে অব্যক্ত পুনঃ হয়;
তার তরে কিবা বেদনা, ভারত?২৮
আশ্চর্য্য স্বরূপ দেখে আত্মা কেহ,
আশ্চর্য্য স্বরূপ কহে অন্তজন,
আশ্চর্য্য স্বরূপ শুনে অন্ত কেহ,
শুনিয়াও কেহ না জানে কখন। ২৯
দেহী নিত্য, অবিনাশী, সর্ব্ব দেহে অবস্থিত;।
তাহা হতে সর্ব্বভূত;—শোক তব অনুচিত।৩০
স্বধর্ম্মেরো পানে চাহি ভীতি কর পরিহার,
ধর্ম্মযুদ্ধ হ'তে শ্রেয় ক্ষত্রিয়ের নাহি আর।৩১
যথা ইচ্ছা উপস্থিত উদ্‌ঘাটিত-স্বর্গদ্বার;
সুখী সে ক্ষত্রিয় হয় হেন যুদ্ধলাভ যার।৩২
আর যদি তুমি নাহি কর এই ধর্ম্ম রণ,
হারায়ে স্বধর্ম্ম, কীর্ত্তি, পাপে হবে নিমগন।৩৩
অক্ষয় অকীর্ত্তি তব ঘোষিবেক সর্ব্বদিক,
সক্ষম জনের পার্থ! অকীর্ত্তি মরণাধিক। ৩৪

ভয়ে রণ-পরাঙ্মুখ, তোমায়
ভাবিবে মনে মহারথী সব ;
মান্য যাহাদের কাছে, তাহাদের
কাছে তুমি হইবে লাঘব। ৩৫
কহিবে অকথ্য কথা অহিত-আকাঙ্ক্ষী সবে ;
নিন্দিবে সামর্থ্য, আছে দুঃখতর কিবা ভবে ? ৩৬
হত হও পাবে স্বর্গ ; পৃথিবী, হইলে জয় ;
উঠ তবে, হে কৌন্তেয় ! যুদ্ধার্থে কৃতনিশ্চয়। ৩৭
সুখ দুঃখ সমজ্ঞানে, লাভালাভ, জয়াজয়,
কর যুদ্ধ তুমি ; পাপ হইবে না ধনঞ্জয় ! ৩৮
অভিহিত সাংখ্য যোগে এই বুদ্ধি শুন আর
বুদ্ধিযোগযুক্ত জন কর্ম্মবন্ধ হয় পার। ৩৯
প্রারম্ভ নিষ্ফল নহে, বিঘ্ন কিছু নাহি হয়,
স্বল্প মাত্র এই ধর্ম্মে, ত্রাণ করে মহাভয়। ৪০
বিষ্ণুজ্ঞানাত্মক বুদ্ধি একই, কুরুনন্দন।
অনন্ত বহুধাবুদ্ধি ধরে অবিশ্বাসিগণ। ৪১
না জানে অস্তিতি অন্ত, সদাবেদবাদরত,
কামী, স্বর্গপরায়ণ, বিবেকবিহীন যত। ৪২
জন্মকর্ম্মফলপ্রদ কহে কথা মনোরম,
বহুল ক্রিয়াতে পূর্ণ, ভোগৈশ্বর্য্যপরায়ণ। ৪৩
ভোগৈশ্বর্য্য প্রসক্তের তাহে চিত্ত অপহৃত,
বিষ্ণুজ্ঞানাত্মক বুদ্ধি নাহি হয় সমাহিত। ৪৪
সকাম সকল বেদ, অর্জ্জুন হও নিষ্কাম,
যোগী, নিত্য ব্রহ্মে স্থিত, দ্বন্দ্বহীন, আত্মবান্। ৪৫
বহু কূপে হয় যাহা, পারে এক পারাবারে
সাধিতে সকল।

একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞান পারে তথা প্রদানিতে
সর্ব্ব বেদফল। ৪৬

কর্ম্মে তব অধিকার, নহে ফলে কদাচিত।
তেয়াগিবে কর্ম্মফল, কর্ম্ম ত্যাগ অনুচিত। ৪৭

যোগস্থ, নিঃশঙ্কভাবে কর কর্ম্ম, ধনঞ্জয়,
সিদ্ধাসিদ্ধে সমভাব,—সে সমত্ব যোগ কয়। ৪৮

বুদ্ধি যোগ হ'তে কর্ম্ম বহু দূরে ধনঞ্জয়।
কর বুদ্ধি যোগাশ্রয়, ফলাকাঙ্ক্ষা নীচাশয়। ৪৯

করে বুদ্ধিযুক্ত জন কি সুকৃত কি দুষ্কৃত
বর্জ্জন উভয়;
অতএব যোগতরে কর যুক্ত, কর্ম্মমধ্যে
যোগ শুভময়। ৫০

বুদ্ধিযুক্ত মনীষীরা তেয়াগিয়া কর্ম্মফল,
লভে জন্মবন্ধমুক্তি, নির্ব্বিঘ্ন সে পদতল। ৫১

মোহের গহন তুমি বুদ্ধি যোগে অতিক্রম
করিবে যখন,
হইবে উদয় তব শ্রোতব্য, শ্রুত, বিষয়ে
বৈরাগ্য তখন। ৫২

শ্রুতি দ্বারা বিক্ষেপিত না হইয়া বুদ্ধি তব
থাকিবে নিশ্চল,—
অচল সমাধিগত,—তখন তোমার যোগ
হইবে সফল। ৫৩

অর্জ্জুন কহিলেন।

সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞঃ কারে কহে জনার্দ্দন?
কি ভাষা স্থিরবুদ্ধির, গমন, উপবেশন?

ভগবান্ কহিলেন।

মনের কামনা সর্ব্ব করি, পার্থ! পরিহার,
আত্মাতেই তুষ্ট আত্মা, স্থিতপ্রজ্ঞ নাম তার।৫৫
দুঃখে অনুদ্বিগ্নমন, সুখেতে নিঃস্পৃহ যেই,
নাহি রাগ, ভয়, ক্রোধ,—স্থিতপ্রজ্ঞ মুনি সেই।৫৬
যে সর্ব্বত্র বীতস্নেহ; শুভাশুভে কদাচিত
না করে আনন্দ, দ্বেষ;—তার আত্মা প্রতিষ্ঠিত।৫৭
কূর্ম্মের অঙ্গের মত, করিবার সঙ্কুচিত
যে পারে ইন্দ্রিয়গণ—প্রজ্ঞা তার প্রতিষ্ঠিত।৫৮
বিষয় নিবৃত্ত মাত্র হয় নিরাহারিগণ,
বিষয়-বাসনা ত্যাগ করে ব্রহ্মদর্শী জন।৫৯
পুরুষ হ'লেও পার্থ! জ্ঞানী মোক্ষপরায়ণ,
প্রমত্ত ইন্দ্রিয়গণ বলে হরি লয় মন।৬০
সংযত-ইন্দ্রিয় হও, মৎপর ও যোগস্থিত;
ইন্দ্রিয় বশেতে যার, তার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত। ৬১
চিন্তিলে বিষয় নর, উপজে আসক্তি বোধ;
কামনা আসক্তি হ'তে, কামনা হইতে ক্রোধ; ৬২
ক্রোধ হ'তে জন্মে মোহ, মোহে হয় স্মৃতিভ্রম,
স্মৃতিভ্রংশে বুদ্ধিনাশ, বুদ্ধিনাশে বিনাশন। ৬৩
আত্মবশ ইন্দ্রিয়েতে—রাগদ্বেষ-বিরহিত—
ভুঞ্জিয়া বিষয়, শান্তি লভে বশীভূত চিত। ৬৪
আত্মপ্রসাদেতে হয় সর্ব্ব দুঃখ বিনাশিত;
প্রসন্নচেতার হয় আশু বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত।
নাহি বুদ্ধি, আত্মচিন্তা, ইন্দ্রিয় অজিত যার,
কোথা শান্তি বিনা চিন্তা, শান্তি বিনা সুখ আর? ৬৬
মন যার স্বেচ্ছাচারী ইন্দ্রিয়েতে হয় রত,
লুপ্ত হয় প্রজ্ঞা, ঝড়ে সমুদ্রে তরণী মত। ৬৭

অতএব মহাবাহো! সর্ব্বরূপে নিগৃহীত
হয়েছে ইন্দ্রিয় যার, তার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত। ৬৮
সকলের নিশা যাহা, সংযমী তাহে জাগ্রত,
যাহাতে জাগ্রত সব, মুনি দেখে নিশা মত। ৬৯

আকুল পূরিত, স্থির, অচঞ্চল
সমুদ্রে সলিল প্রবেশে যেমন;
তেমতি কামনা প্রবেশে যাহাতে,
সেই পায় শান্তি, নহে কামী জন। ৭০

ত্যজিয়া কামনা সর্ব্ব যেই হয় স্পৃহাহীন,
নির্ম্মল নিরহঙ্কার—পায় শান্তি চিরদিন। ৭১
পার্থ! ব্রহ্মে স্থিতি এই, নহে যাহে মুগ্ধজ্ঞান,
তাহাতে মরিলে হয় ব্রহ্মপদে নিরবাণ। ৭২

ইতি সাংখ্যযোগ নাম
দ্বিতীয় অধ্যায়।২।

তৃতীয় অধ্যায়।

—*—

অর্জ্জুন কহিলেন।

কর্ম্ম হ'তে বুদ্ধি-যোগ শ্রেষ্ঠ যদি, জনার্দ্দন!
আমাকে এ ঘোর কর্ম্মে কর কেন নিয়োজন? ১
বিমিশ্র বাক্যেতে মম হইতেছে বুদ্ধিভ্রম,
নিশ্চিত করিয়া কহ যাহে শ্রেয় হয় মম। ২

ভগবান্ কহিলেন।

লোকের দ্বিবিধ নিষ্ঠা বলেছি পূর্ব্বে, অনঘ!
জ্ঞানযোগ সাঙ্খ্যদের, যোগীদের কর্ম্মযোগ। ৩
নাহি আরম্ভিয়া কর্ম্ম না পায় নৈষ্কর্ম্ম্য নর,
বিহনে সন্ন্যাস-যোগ সিদ্ধি নাহি, বীরবর! ৪
অকর্ম্মা থাকিতে কেহ নাহি পারে কদাচিত,
স্বভাব গুণেতে সবে হয় কর্ম্মে নিয়োজিত। ৫
সম্বরিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয় ইন্দ্রিয় বিষয় ধ্যান
করে মনে যে বিমূঢ়, মিথ্যাচার তার নাম। ৬
ইন্দ্রিয় সম্বরি মনে, করে পার্থ! অনুষ্ঠান
কর্ম্মেন্দ্রিয়ে কর্ম্মযোগ, সে জন শ্রেষ্ঠ নিষ্কাম। ৭
কর্ম্ম, অকর্ম্মের শ্রেষ্ঠ; কর কর্ম্ম নিয়মিত,
না হয় দেহযাত্রাও অকর্ম্মেতে নির্ব্বাহিত। ৮
যজ্ঞার্থ করিবে কর্ম্ম, অন্য কর্ম্ম মানুষের বন্ধন কারণ,
অতএব হে কৌন্তেয়! অনাসক্ত হ'য়ে
কর্ম্ম কর আচরণ। ৯

যজ্ঞ সহ সৃজি প্রজা বলেছিলা প্রজাপতি—
"হউক ইহাতে তব ইষ্টসিদ্ধি, ক্রমোন্নতি। ১০
"ইহাতে দেবের বৃদ্ধি, দেবগণে বৃদ্ধি দেব;
"বৃদ্ধি করি পরস্পরে পরম কল্যাণ লভ। ১১
"যজ্ঞেতে বর্দ্ধিত দেব তোমাদের ইষ্টভোগ
করিবে অর্পণ।
"চোর সে, তাঁদের দ্রব্য না দিয়া তাঁদের, ভোগ
করে যেই জন।" ১২
যজ্ঞশিষ্টভোগী হয় সর্ব্ব পাপে বিমোচন,
যে রাঁধে আপনা তরে, সে করে পাপ ভক্ষণ। ১৩

অন্ন হতে ভূতগ্রাম, পর্জ্জন্য হইতে অন্ন,
পর্জ্জন্যের যজ্ঞ হ'তে, কর্ম্ম হ'তে যজ্ঞোৎপন্ন। ১৪
ব্রহ্ম হ'তে কর্ম্ম, ব্রহ্ম অক্ষরেতে উপজিত;
তাই সর্ব্বগত ব্রহ্ম নিত্য যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত। ১৫
হেন প্রবর্ত্তিত চক্র যে না করে অনুসার,
সে পাপী ইন্দ্রিয়পর বৃথায় জীবন তার। ১৬
কিন্তু আত্মাতেই রত, আত্মাতেই তৃপ্তি যার,
আত্মাতেই সন্তুষ্ট সদা, তার কার্য্য নাহি আর। ১৭
কৃত কি অকৃত কার্য্য নাহি তার কদাচন;
সর্ব্বভূতে নাহি চায় আশ্রয় কারো কখন। ১৮
অনাসক্ত কর্ম্ম তুমি কর সদা আচরণ,
অনাসক্ত কর্ম্মাচারী পুরুষ লভে পরম। ১৯
কর্ম্মেতে লভিলা সিদ্ধি জনকাদি মহোদয়,
নিতান্ত লোকের তরে কর কর্ম্ম, ধনঞ্জয়। ২০
যাহা আচরিবে শ্রেষ্ঠ, করে তা ইতর জন;
শ্রেষ্ঠ যাহা মানে, লোক করে তা অনুসরণ। ২১
আমার কর্ত্তব্য, পার্থ! ত্রিলোকে নাহি কিঞ্চিত,—
অপ্রাপ্ত, প্রাপ্তব্য নাহি; তবু আমি কর্ম্মান্বিত। ২২
নিরলস কভু যদি কর্ম্ম নাহি করি আমি,
পার্থ! সর্ব্বরূপে নর হবে মম অনুগামী। ২
আমি কর্ম্ম না করিলে, হবে সব উৎসাদিত;
সঙ্করত্বে, মলিনত্বে, হবে প্রজা কলঙ্কিত। ২৪
সকাম অজ্ঞানী কর্ম্ম করে যথা, হে ভারত!
করিবে সমাজহিতে নিষ্কাম জ্ঞানী তেমত। ২৫
কর্ম্মাসক্ত অজ্ঞানীর না জন্মা'য়ে বুদ্ধিভ্রম,
নিয়োজিবে সর্ব্ব কর্ম্মে, করি কর্ম্ম জ্ঞানিগণ। ২৬

হয় প্রাকৃতিক গুণে সর্ব্ব কর্ম্ম সম্পাদন
"আমি কর্ত্তা"—ভাবে মনে অহঙ্কারী মূঢ়জন। ২৭
মহাবাহো! গুণ-কর্ম্ম-বিভাগের তত্ত্বজ্ঞানী,
হয় না আসক্ত গুণে, ইন্দ্রিয়কে ভোগী জানি। ২৮
প্রকৃতির গুণ মূঢ় গুণকর্ম্মে হয় রত;
হেন মন্দবুদ্ধিগণে চালাবে না জ্ঞানী যত। ২৯
আমাতে সকল কর্ম্ম আধ্যাত্মিক জ্ঞানবলে করি সমর্প
নিষ্কাম, মমতা-হীন, হয়ে নির্ব্বিকারচিত্ত কর তুমি রণ
যারা মম এই মত করে নিত্য অনুষ্ঠান,—
শ্রদ্ধাবন্ত, অনসূয়—পায় কর্ম্ম হ'তে ত্রাণ। ৩১
অসূয়াতে মম মত, না করে পালন যারা,
জেনো তুমি, নষ্টমতি সর্ব্বজ্ঞানমূঢ় তারা। ৩২
জ্ঞানীরাও করে স্ব স্ব প্রকৃতির অনুসার,
প্রাণীরা প্রকৃতিগামী, নিগ্রহ কি করে আর? ৩৩
ইন্দ্রিয়ার্থে ইন্দ্রিয়ের আছে দ্বেষ, অনুরাগ;
এ পথের প্রতিকূল উভয়, করিবে ত্যাগ। ৩৪
সগুণ সু-অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম হ'তে শ্রেয় স্বধর্ম্ম বিগুণ।
স্বধর্ম্মে নিধন শ্রেয়, পরধর্ম্ম ভয়াবহ তথাপি, অর্জ্জুন!

অর্জ্জুন কহিলেন।

কে করে পুরুষে বল এই পাপে প্রবর্ত্তিত
অনিচ্ছায়, বাসুদেব! বলে করি নিয়োজিত? ৩৬

ভগবান্ কহিলেন।

এই কাম, এই ক্রোধ, রজোগুণে সমুদ্ভূত,—
মহাভোগী, মহাপাপী,—জানিবে শত্রুর মত। ৩৭
ধূমেতে আবৃত বহ্নি মুকুর মলেতে যথা,
জরায়ুতে গর্ভ, জ্ঞান ইহাতে আবৃত তথা। ৩৮

আবৃত সতত জ্ঞান, জ্ঞানীদের শত্রু প্রায়,
কৌন্তেয়! দুষ্পূরণীয়, অগ্নিতুল্য, কামনায়। ৩৯
ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও মন, ইহারই অধিষ্ঠান;
ইহাতে মোহিত করে দেহীকে, আবরি জ্ঞান। ৪০
তাই ইন্দ্রিয়াদি আগে করি পার্থ! নিয়মিত,
বিজ্ঞান-জ্ঞান-নাশক কর এ পাপ ধ্বংসিত। ৪১
ইন্দ্রিয়াদি শ্রেষ্ঠ উক্ত, তাহা হ'তে শ্রেষ্ঠ মন,
মন হ'তে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, তা হ'তে পরমাত্মন। ৪২
এরূপ জানিয়া, আত্মা আত্মাতে নিশ্চল করি,
মহাবাহো! দুরাসদ নাশ কামরূপ অরি। ৪৩

ইতি কর্ম্ম যোগ নাম
তৃতীয় অধ্যায়। ৩।

চতুর্থ অধ্যায়।

ভগবান্ কহিলেন।

এ অব্যয় যোগ আমি বলেছিনু বিবস্বানে।
বিবস্বান্ মনুকে কহে, মনু ইক্ষ্বাকুর স্থানে। ১
এরূপে পরম্পরায় জানিলা রাজর্ষিগণ
কালে এই মহাযোগ নষ্ট হলো অরিন্দম। ২
কহিনু তোমায় আজি সেই যোগ পুরাতন,—
উত্তম রহস্য এই, তুমি ভক্ত সখা মম। ৩

অর্জ্জুন কহিলেন।

বিবস্বান্ জন্মিলা পূর্ব্বে, পরে জন্ম হলো তব।
তুমি বলেছিলে আগে, জানিব কিসে, কেশব ! ৪

ভগবান্ কহিলেন।

তোমার আমার জন্ম হয়েছে বহু অতীত।
আমি তাহা জানি সব, নহে তা তব বিদিত।৫
যদিও অজন্মা আমি, অব্যয়াত্মা, সর্ব্বেশ্বর ;
আপন মায়ায় জন্মি আপন প্রকৃতি-পর। ৬
যখন যখন ঘটে, ভারত ! ধর্ম্মের গ্লানি,
অধর্ম্মের অভ্যুত্থান, আপনাকে সৃজি আমি। ৭
সাধুদের পরিত্রাণ, বিনাশ দুষ্কৃতদের
করিতে সাধন,
স্থাপন করিতে ধর্ম্ম, করি আমি যুগে যুগে
জনম গ্রহণ। ৮
এই দিব্য জন্ম, কর্ম্ম, যে জন জানে আমার,
আমাকে সে পায়, পার্থ ! পুনর্জন্ম নাহি তার। ৯
রাগ-ভয়-ক্রোধশূন্য, মন্ময় মম-আশ্রিত,
বহুজ্ঞানতপে পূত হয় মমভাবে স্থিত ॥ ১০
যে যথা আমাকে চাহে, তাকে তথা ভজি আমি,
পার্থ ! সর্ব্বরূপে নর মম পথ অনুগামী।১১
পূজে দেবগণে পার্থ ! ফলসিদ্ধাকাঙ্ক্ষী নর,
পরলোকে কর্ম্মফল হয় সিদ্ধি শীঘ্রতর। ১২
গুণ কর্ম্ম অনুসারে সৃষ্ট চতুর্ব্বর্ণ চয়,
যদিও তাদের কর্ত্তা, অকর্ত্তা আমি অব্যয়। ১৩
কর্ম্মে নাহি হই লিপ্ত, নাহি চাহি কর্ম্মফল ;—
যে আমাকে জানে হেন, মুক্ত সে কর্ম্মশৃঙ্খল। ১৪

পূর্ব্বে মুমুক্ষুরা কর্ম্ম করিলা জানি এমত।
অতএব কর কর্ম্ম তুমি প্রাচীনের মত। ১৫
কিবা কর্ম্ম কি অকর্ম্ম, পণ্ডিত (ও) তাহে মোহিত।
কহিতেছি কর্ম্ম যাহে অশুভ হবে মোচিত। ১৬
কর্ম্মও জ্ঞাতব্য, আর জ্ঞাতব্য কর্ম্মবিরতি,
জ্ঞাতব্য কুকর্ম্ম কিবা,—দুজ্ঞের্য় কর্ম্মের গতি। ১৭
কর্ম্মে যে অকর্ম্ম দেখে, অকর্ম্মে যে কর্ম্মভোগী,
মনুষ্যে সে বুদ্ধিমান, সর্ব্বকর্ম্মকারী যোগী। ১৮
যার সর্ব্বকর্ম্মারম্ভ কাম-সংকল্প-বর্জ্জিত,—
জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ কর্ম্ম,—জ্ঞানী কহে সে পণ্ডিত। ১৯
ত্যজি কর্ম্মফলাসক্তি নিত্যতৃপ্ত, নিরাশ্রিত,—
কর্ম্মে রত হইলেও নাহি করে সে কিঞ্চিৎ। ২০
নিরাশী, সংযত-চিত্ত, সর্ব্বপরিগ্রহ-হীন,
শরীরার্থ করি কর্ম্ম নাহি হয় পাপে লীন। ২১
যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট, বিমৎসর, দ্বন্দ্বাতীত,
সিদ্ধাসিদ্ধি সমজ্ঞানী, কর্ম্মে নহে নিবদ্ধিত। ২২
জ্ঞানে স্থিরতরচিত্ত, নিষ্কাম বন্ধন-হীন,
যজ্ঞার্থ আচরি কর্ম্ম, সমগ্র করে বিলীন। ২৩
ব্রহ্ম হবি ব্রহ্মাগ্নিতে, ব্রহ্মহোতা, ব্রহ্মার্পণ;—
ব্রহ্মকর্ম্ম করি ধ্যান ব্রহ্মেতে করে গমন। ২৪
করে কোন কোন যোগী দেব-যজ্ঞ অনুষ্ঠান।
কেহ কেহ যজ্ঞাহুতি করে ব্রহ্মাগ্নিতে দান। ২৫
শ্রুতি ইন্দ্রিয়াদি অন্যে সমর্পে সংযমানলে,
শব্দাদি বিষয় অন্যে ইন্দ্রিয়-অনলে বলে। ২৬
অপরে ইন্দ্রিয় কর্ম্ম প্রাণকর্ম্ম সমুদায়,
সমর্পে জ্ঞান-প্রদীপ্ত সংযমযোগশিখায়। ২৭

দ্রব্যযজ্ঞ, তপযজ্ঞ, যোগযজ্ঞ সেই মত
'করে অন্যে, জ্ঞান-যজ্ঞ করে যতী দৃঢ়ব্রত। ২৮
অপরে অপানে প্রাণ, অর্পিয়া প্রাণে অপান,
প্রাণ অপানের গতি রোধি, করে প্রাণায়াম।
অন্য স্বল্পাহারী করে প্রাণে—প্রাণেন্দ্রিয় দান। ২৯
যজ্ঞ দ্বারা পাপক্ষয় করি যজ্ঞবিদ্‌গণ,
করি যজ্ঞামৃত ভোগ, লভে ব্রহ্ম সনাতন। ৩০
ইহলোক (ও) নাহি পায় অযাজ্ঞিক, কুরুসত্তম ! ৩১
এইরূপ নানা যজ্ঞ প্রকাশিত ব্রহ্মমুখে ;
কর্ম্মজ জানিয়া সব, মোক্ষ লাভ কর সুখে। ৩২
দ্রব্যময় যজ্ঞ হ'তে জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেয়ান্বিত ;
সর্ব্বকর্ম্ম, পার্থ। জ্ঞানে হয় সমাপিত।
প্রণিপাত প্রতিপ্রশ্নে, সেবায়, তোমাকে জ্ঞান
তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণ করিবেন শিক্ষা দান। ৩৪
যে জ্ঞান লভিলে পুনঃ না হবে মোহ, পাণ্ডব !
আমার আত্মাতে যাহে দেখিবে সংসার সব। ৩৫
সর্ব্বপাপী হ'তে যদি কর তুমি পাপাচার,
জ্ঞান-তরণীতে হবে সর্ব্বপাপার্ণব পার। ৩৬
যথা কাষ্ঠ করে ভস্ম প্রজ্বলিত হুতাশন,
সর্ব্ব কর্ম্ম ভস্মসাৎ জ্ঞানাগ্নি করে তেমন। ৩৭
জগতে কিছুই নাই পবিত্র জ্ঞানের মত।
যোগসিদ্ধ যথাকালে হয় তাহা অবগত। ৩৮
তৎপর, সংযতেন্দ্রিয় শ্রদ্ধাবান্, লভে জ্ঞান।
লভি জ্ঞান, পায় শীঘ্র পরম শান্তি-নিদান। ৩৯
শ্রদ্ধাহীন, সন্দেহাত্মা, অজ্ঞ হয় বিনাশিত।
ইহলোক, পরলোক, নাহি সুখ কদাচিত। ৪০

যোগে সমর্পিত কর্ম্ম, জ্ঞানেতে ছিন্ন সংশয়,
আত্মবন্তে, নাহি করে কর্ম্মে বদ্ধ ধনঞ্জয়। ৪১
অতএব হৃদয়ের এ সংশয় অজ্ঞানতঃ
কাটি জ্ঞান-খড়্গো, উঠ, যোগস্থ হও ভারত!

ইতি জ্ঞান কর্ম্ম বিভাগ যোগ নাম
চতুর্থ অধ্যায়। ৪।

পঞ্চম অধ্যায়।

—*—

অর্জ্জুন কহিলেন।

কর্ম্মত্যাগ, কর্ম্মযোগ কহিলে, কৃষ্ণ। উভয়,
এ উভয়ে যেটা শ্রেয় আমাকে কহ নিশ্চয়। ১

ভগবান্ কহিলেন।

সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ উভয়ই শ্রেয়স্কর।
তথাপি সন্ন্যাস হ'তে কর্ম্মযোগ শ্রেষ্ঠতর। ২
জেনো সে নিত্যসন্ন্যাসী নাহি দ্বেষাকাঙ্ক্ষা যার,
নির্দ্বন্দ্ব সে হয় সুখে সকল বন্ধন পার। ৩
পণ্ডিতে না, মূর্খে কহে পৃথক্ সাংখ্য ও যোগ।
এক অনুষ্ঠিলে হয় উভয়ের ফলভোগ। ৪
সাংখ্যে পায় যেই স্থান, যোগেও সেখানে যায়।
অভিন্ন সাংখ্য ও যোগ, যে দেখে, সে দেখে তায়। ৫
দুঃখের কারণ, পার্থ! সন্ন্যাস-যোগ-বিহীন।
[illegible] মনি হয় অচিরে ব্রহ্মে বিলীন। ৬

যোগযুক্ত বিশুদ্ধাত্মা, বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়, আপন আত্মায়
দেখে সর্ব্বভূত—আত্মা,—সে কর্ম্ম করিয়া নাহি লিপ্ত হয় তায়। ৭
"কিছু নাহি করি আমি"—ভাবে যোগী তত্ত্ববিৎ,"দর্শন, শ্রবণ
আহার, গমন, নিদ্রা, ঘ্রাণ, শ্বাস, পরশন, কথন, গ্রহণ,
"নিমেষ, উন্মেষ, ত্যাগ,"—তাঁহার ধারণা হয়,
ইন্দ্রিয়ার্থে ইন্দ্রিয়েরা রত মাত্র সমুদয়। ৮-৯
ব্রহ্মে সমর্পিয়া কর্ম্ম, নিষ্কাম যে কর্ম্ম-রত,
না হয় সে পাপে লিপ্ত পদ্মপত্রে জল মত। ১০
কেবল ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, দেহ, মন দ্বারা করে
সঙ্গত্যাগী যোগী কর্ম্ম,—শুধু আত্মশুদ্ধি তরে। ১১
যোগী, কর্ম্ম-ফলত্যাগী, পায় শান্তি শ্রদ্ধান্বিত;
যোগহীন ফলাসক্ত কামে হয় বিবর্দ্ধিত। ১২
বশী সর্ব্ব কর্ম্ম সুখে করে মন সমর্পিত।
নব-দ্বার দেহে দেহী না করে কর্ম্ম কিঞ্চিৎ। ১৩
নরের কর্ত্তৃত্ব, কর্ম্ম কর্ম্মফল, কদাচিত
না সৃজেন বিভু. স্বভাবেতে প্রবর্ত্তিত। ১৪
না লন সুকৃতি, পাপ, কভু বিভু কদাচন।
অজ্ঞানে আচ্ছন্ন জ্ঞান, তাহে মুগ্ধ জীবগণ। ১৫
আত্মার অজ্ঞান এই জ্ঞানে যাঁরা করে হত,
তাহাদের ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশে আদিত্য মত। ১৬
তদ্বুদ্ধি, তদাত্মা, আর তন্নিষ্ঠা, তৎ-পরায়ণ,
জ্ঞানে ধৌত-পাপ,—করে পুনর্জন্ম অতিক্রম। ১৭
কি গো, হস্তী, কি ব্রাহ্মণ বিনীত ও জ্ঞানবান,
কুকুর, চণ্ডাল, সব—জ্ঞানীরা দেখে সমান। ১৮
সাম্যে স্থিত মন যাঁর ইহ লোকে স্বর্গজিত,
—নির্দ্দোষ সমত্ব ব্রহ্মে—হয় তাহে ব্রহ্মে স্থিত। ১৯

প্রিয় প্রাপ্তে নহে হৃষ্ট, অপ্রিয়ে নহে দুঃখিত,
স্থিরবুদ্ধি, অসংমূঢ়, ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মে স্থিত। ২০
বাহ্য স্পর্শে অনাসক্ত, আত্মাতে যে সুখী হয়,
সে ব্রহ্ম-যোগ-যুক্তাত্মা, লভে সে সুখ অক্ষয়। ২১
পরশ-জনিত ভোগ দুঃখের কারণ যত,—
আদি-অন্ত-শীল, পার্থ! জ্ঞানী তাহে নহে রত। ২২
শরীর মোচন পূর্ব্বে যে হয় সহিষ্ণু-পর
কাম-ক্রোধোদ্ভব-বেগ,—সেই যোগী, সুখ নর। ২৩
যাহার অন্তরে সুখ, অন্তরে জ্যোতি, আরাম ;
সেই যোগী ব্রহ্মস্থিত, ব্রহ্মেতে লভে নির্ব্বাণ। ২৪
লভে ব্রহ্মে নিরবাণ পাপহীন ঋষি যত,
দ্বিধাহীন, জিতেন্দ্রিয়, সর্ব্বভূত[illegible]তে রত। ২৫
কামক্রোধ-বিরহিত, সন্ন্যাসী, স[illegible]-চিত,
নির্ব্বাণ উভয় লোকে লভে ব্রহ্মে অ[illegible]ন্বিত। ২[illegible]
ত্যজিয়া ইন্দ্রিয়-কার্য্য, উভয় ভ্রূমধ্যে চক্ষু
করিয়া স্থাপন,
করি সমভাবাপন্ন নাসান্তরচারী প্রাণ
অপান তেমন। ২৭
জিতেন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি, মুনি মোক্ষ-পরায়ণ,—
নাহি ইচ্ছা ভয় ক্রোধ,—সেই মুক্ত সর্ব্বক্ষণ। ২৮
যজ্ঞ-তপ-ফল-ভোক্তা, অর্জ্জুন! সর্ব্বলোকের
আমি মহেশ্বর,
সুহৃদ সর্ব্ব ভূতের, আমাকে জানিয়া শান্তি
লভে সেই নর। ২৯

ইতি কর্ম্ম সন্ন্যাস যোগ নাম
পঞ্চম অধ্যায়। ৫।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

—*—

ভগবান্ কহিলেন।

করে যে কর্ত্তব্য কর্ম্ম কর্ম্ম-ফলে হীনস্পৃহ,
সে সন্ন্যাসী, সেই যোগী ; নহে নিরগ্নি, অক্রিয়।
যাহাকে সন্ন্যাস বলে তাহাই যোগ নিশ্চিত।
সঙ্কল্প অত্যাগী, যোগী নাহি হয় কদাচিত। ২
যোগারোহী যেই মুনি, কর্ম্মই কারণ তার।
যোগারূঢ় যেই জন, শান্তিই কারণ সার। ৩
ইন্দ্রিয় কি কর্ম্ম তার নহে যবে অনুষ্ঠান—
সকল সঙ্কল্প-ত্যাগী—যোগারূঢ় তার নাম। ৪
উদ্ধারিবে আপনাকে, অবসন্ন নাহি করি,
আপনি আপন বন্ধু, আপনি আপন অরি। ৫
সেই আপনার বন্ধু, যেই জন আত্মজিত।
আত্ম অরি-জয়ী তথা আপন শত্রু নিশ্চিত। ৬
প্রশান্ত বিজিত—আত্মা রহে পরব্রহ্মধ্যানে,—
শীতে উষ্ণে, সুখ দুঃখে, কিবা মান অপমানে। ৭
জ্ঞানে বিজ্ঞানেতে তৃপ্ত, অবিকার, জিতেন্দ্রিয়,
সেই যোগী, যার লোষ্ট্র, শিলা, স্বর্ণ, সমপ্রিয়। ৮
মধ্যস্থে, দ্বেষ্য, বন্ধুতে, শত্রুমিত্রে,
উদাসীনে—পক্ষ- বিরহিত,
সাধুতে, পাপীতে আর, সর্ব্বত্রে
সমান জ্ঞান, বিশিষ্ট নিশ্চিত। ৯

সতত নির্জ্জনে যোগী করে আত্মা-সমাহিত,—
একাকী, সংযত, তৃষ্ণা-পরিগ্রহ বিরহিত। ১০
শুদ্ধস্থানে আপনার স্থিরাসন প্রতিষ্ঠিয়া,
—নাতি উচ্চ, নাতি নীচ, চেলাজিন কুশাসন,—
করিয়া একাগ্রমন, সংযত ইন্দ্রিয়ক্রিয়া,
আত্মশুদ্ধি তরে যোগ করিবেক আচরণ। ১১-১২
সমান করি অচল স্থির কায়, গ্রীবা, শির,
দেখিয়া নাসিকা অগ্র, নাহি দেখি অন্যতর,
প্রশান্তাত্মা, ভয়হীন, ব্রহ্মচারি-ব্রতে স্থির,
জিতাত্মা, মচ্চিত্ত, যোগী আসীন রবে মৎপর।১৩-১৪
করি আত্মা সমাহিত এরূপে জিতচিত্ত যোগী,
পরম নির্ব্বাণ শান্তি, মৎস্থিতি, হয় ভোগী ॥ ১৫
নহে অত্যাহার যোগ, নহে যোগ অনাহার,
নহে অতি নিদ্রা, নহে অনিদ্রা, অর্জ্জুন! আর ॥ ১৬
নিয়মিত চেষ্টা, কর্ম্ম, আহার, বিহার, যার,
তথা নিদ্রা, জাগরণ,—দুঃখহারী যোগ তার ॥ ১৭
যখন সংযতচিত্ত আত্মাতেই স্থিত—
সর্ব্ব-কাম-স্পৃহাহীন; সেই যোগী অভিহিত ॥ ১৮
নিবাত স্থানেতে স্থিত নিষ্কম্প প্রদীপ মত,
অর্জ্জুন! সংযত-চিত্ত যোগী, আত্মযোগ রত ॥ ১৯
যোগেতে নিরুদ্ধ চিত্ত যাহাতে হয় রমিত,
আত্মাতে দেখি আত্মায় হয় যাতে সন্তোষিত,—২০
বুদ্ধি-গ্রাহ্য অতি সুখ যাহাতে ইন্দ্রিয়াতীত,
যাতে আত্মতত্ত্ব হতে নাহি হয় বিচলিত,—২১
যাহা পেলে অন্য লাভ অধিক না হয় জ্ঞান,
মহৎ দুঃখেও যাতে না হয় বিকল প্রাণ,—২২

জানিবে তাহাই যোগ, দুঃখ-সংযোগরহিত,
অনির্ব্বেদ চিত্তে তুমি করিবে তাহা সাধিত। ২৩
কামনা সঙ্কল্প জাত অশেষ করি বর্জ্জিত.
ইন্দ্রিয় মনের দ্বারা করি পূর্ণ-নিয়মিত। ২৪
ধৈর্য্যশীল, বুদ্ধিবলে নিবৃত্ত হইবে ক্রমে,
আত্মাতে স্থাপিয়া মন, চিন্তা করিবে না মনে॥ ২৫॥
অস্থির চঞ্চল মন, করে যাতে বিচরণ,
তা'হতে নিবৃত্তি করি, রাখিবে বশে আপন॥ ২৬॥
এরূপে প্রশান্তমনা যোগীর সুখ উত্তম
হয় লাভ, রজোহীন, নিষ্পাপ, ব্রহ্মজীবন॥ ২৭॥
এইরূপে আত্মযুক্ত পাপহীন যোগিজন,
অনায়াসে মহাসুখ লভে ব্রহ্ম-পরশন॥ ২৮॥
আত্মাকে সমস্ত ভূতে, আত্মাতে সমস্ত ভূত,
সর্ব্বত্র সমান-দশী যোগী করে অনুভূত॥ ২৯
যে আমাকে দেখে সর্ব্বে, সর্ব্বত্র আমাতে আর,
হয় না অদৃশ্য মম, না হই অদৃশ্য তার॥ ৩০॥
সর্ব্বময় জানিয়া যে অভিন্ন ভজে আমায়,
সর্ব্বথা থাকিয়াও সে আমাতেই স্থিতি পায়।
সর্ব্বত্র সমান দেখে আত্মবৎ যেই জন,
সুখে দুঃখ—মম মতে সে জন যোগী পরম। ৩২

অর্জ্জুন কহিলেন।

যেই সাম্যযোগ তুমি কহিলে, মধুসূদন!
নাহি দেখি স্থিতি তার চঞ্চলতা নিবন্ধন। ৩৩
হে কৃষ্ণ। চঞ্চল মন, দৃঢ়, মত্ত, শক্তিধর;
তাহার নিগ্রহ করা বায়ু মত সুদুষ্কর। ৩৪

ভগবান্ কহিলেন।

দুর্জ্জয় চঞ্চল মন, হে মহাবাহো ! নিশ্চিত।
অভ্যাসে, বৈরাগ্যে, কিন্তু হয় তাহা নিগৃহীত। ৩৫
অসংযত পক্ষে যোগ দুষ্প্রাপ্য, মত আমার ;
উপায়েতে পায় কিন্তু যত্নে আত্মা বশে যার। ৩৬

অর্জ্জুন কহিলেন।

শ্রদ্ধাবান অযতাত্মা, যোগেতে চঞ্চল-মতি,
না পাইয়া যোগ-সিদ্ধি লভে কৃষ্ণ ! কিবা গতি ? ৩৭
হবে কি উপায়-ভ্রষ্ট, নষ্ট, ছিন্ন মেঘ মত,
ব্রহ্মপথ মূঢ় জন, হইয়া অসিদ্ধব্রত। ৩৮
তুমিই ছেদিতে, কৃষ্ণ ! পার মম এ সংশয়,
তুমি ভিন্ন ছেদিবার আর কারো সাধ্য নয়। ৩৯

ভগবান্ কহিলেন।

ইহলোকে পরলোকে নাহি হয় সে বিনাশিত,
দুর্গতি কল্যাণকারী নাহি পায় কদাচিত। ৪০
যোগভ্রষ্ট, পুণ্য-লোকে বহু বর্ষ করি বাস,
পবিত্র ধনীর গৃহে লভে জন্ম মহেষ্বাস ! ৪১
ধীমান্ যোগীর কুলে অথবা লভে জনম,—
নরলোকে জন্ম আর দুর্লভ নাহি এমন। ৪২
লভি তথা বুদ্ধিযোগ, পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত ধন,
সিদ্ধিতরে বহু যত্ন করে সে, কুরুনন্দন ! ৪৩
পূর্ব্বাভ্যাসে করে কর্ম্ম অনিচ্ছায় নিয়োজিত,
যোগ-জিজ্ঞাসুই হয় বেদব্রহ্মে প্রবর্তিত। ৪৪
যত্নে যোগাচারী যোগী,—পাপমুক্ত, শুদ্ধমতি,—
বহু জন্মে হ'য়ে সিদ্ধ, পায় সে পরমা গতি। ৪৫

তপস্বীর শ্রেষ্ঠ যোগী, জ্ঞানিদেরও শ্রেষ্ঠ হয়,
কর্ম্মীদেরও শ্রেষ্ঠ যোগী, হও যোগী, ধনঞ্জয় ! ৪৬
মম মতে যোগি-মধ্যে মদ্গত যাহার মন,—
শ্রদ্ধায় আমাকে ভজে,—সেই যোগী শ্রেষ্ঠতম। ৪৭

ইতি অভ্যাসযোগ নাম
ষষ্ঠ অধ্যায়। ৬।

সপ্তম অধ্যায়

—*—

ভগবান্ কহিলেন।

অনুষ্ঠিলে যোগ, পার্থ ! লইয়া মম আশ্রয় মদাসক্ত মন,
অসংশয় যেই রূপে আমাকে জানিতে পারে, করহ শ্রবণ। ১
সবিজ্ঞান এই জ্ঞান কহিব সম্পূর্ণ, যার
জ্ঞানোদয়ে ইহলোকে জ্ঞাতব্য থাকে না আর। ২
সহস্র মনুষ্য মধ্যে যতনে কচিৎ কেহ সিদ্ধির কারণ,
যত্নশীল সিদ্ধ মধ্যে, যথার্থ আমাকে কেহ জানে কদাচন।
ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু আকাশ, বুদ্ধি ও মন,
অহঙ্কার,—এই ভিন্ন অষ্টধা প্রকৃতি মম।
ইহারা অপরা ; অন্য প্রকৃতি পরা আমার,
জীবভূত, মহাবাহো ! ধারণ করে সংসার। ৫
ইহাতেই সর্ব্বভূত লভে জন্ম বারংবার,
আমি সর্ব্ব জগতের প্রভব-প্রলয়াধার। ৬
আমা হ'তে শ্রেষ্ঠ আর নাহি কিছু, হে ভারত !
আমাতে গ্রথিত বিশ্বসূত্রে মণিগণ মত। ৭

সলিলেতে রস আমি, প্রভা শশি-বিভাকরে,
বেদেতে প্রণব, শব্দ আকাশে, পৌরুষ নরে। ৮
অনলেতে তেজ আমি, পৃথিবীতে পুণ্য ঘ্রাণ,
তপস্যা তপস্বিগণে, আমি সর্ব্বভূতে প্রাণ। ৯
সকল ভূতের, পার্থ! আমি বীজ সনাতন,
জ্ঞানীদের জ্ঞান আমি, তেজস্বীর তেজ মম। ১০
বলীদের বল আমি,—কামরাগ-বিবর্জ্জিত,
ভারত। জীবের আমি কামনা ধর্ম্ম-বিহিত। ১১
রাজসিক, তামসিক, সাত্বিক যে সব ভাব,—
আমি নাহি তাতে, সব আমা হতে আবির্ভাব। ১২
এ ত্রিগুণ ভাবে মুগ্ধ সর্ব্ববিশ্ব চরাচর;
অব্যয়, এ হ'তে ভিন্ন না জানে আমাকে নর। ১৩
এই দৈবী, গুণময়ী মম মায়া সুদুস্তর;
যাহারা আমাকে ভজে, তরে তারা নি[illegible]। ১৪
আমাকে দুষ্কৃত মূঢ় নাহি পায় দুরাচার,
মায়াতে বিলুপ্ত জ্ঞান, আসুরিক ভাবাধার। ১৫
চতুর্ব্বিধ পুণ্যবান আমাকে ভজনা করে—
পীড়িত, তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু, অর্থাকাঙ্ক্ষী, জ্ঞানী নরে। ১৬
ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যোগী একভক্ত মম,
হেন জ্ঞানী প্রিয় আমি, সেও মম প্রিয় জন। ১৭
ইহারা সকলে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু মম
মতে জ্ঞানী স্বরূপ আত্মার।
হইয়া মদেকচিত্ত লভে অত্যুত্তম গতি,
আশ্রয় আমার। ১৮
লভি বহু জন্ম অন্তে এই জ্ঞান—"কৃষ্ণ সব,"
যে জ্ঞানী আমাকে পায়, সে মহাত্মা সুদুর্লভ। ১৯

কামে হৃতজ্ঞান যারা পূজে অন্য দেবগণ,
আপন প্রকৃতি মতে নিয়ম করি পালন। ২০
যে ভক্ত যে মূর্ত্তি মম শ্রদ্ধায় করে অর্চ্চিত,
অচল তাহার শ্রদ্ধা তাহাতে করি স্থাপিত, ২১
করে আরাধনা তার হয়ে দৃঢ় শ্রদ্ধান্বিত,
পায় পরে আমা হ'তে বাঞ্ছিত বিহিত হিত। ২২
লভে ক্ষণস্থায়ী ফল সেই অল্পজ্ঞানিগণ।
দেবযাজী পায় দেব, আমাকে মদ্ভক্তজন। ২৩
অব্যক্ত আমাকে ব্যক্ত ভাবে বুদ্ধিহীনগণ;
না জানে পরম ভাব অব্যয় ও অনুত্তম। ২৪
প্রকাশ সর্ব্বত্রে নহি যোগমায়া সমাবৃত;
অজন্ম অব্যয় আমি, মূর্খ লোকে অবিদিত। ২৫
জানি আমি বর্ত্তমান, পার্থ! ভবিষ্যত, ভূত;
আমাকে না জানে কেহ, জানি আমি সর্ব্বভূত। ২৬
হে ভারত! দ্বন্দ্ব মোহে ইচ্ছা-দ্বেষ-সমুত্থিত
সৃষ্টিতে, হে পরন্তপ! সর্ব্বভূত সম্মোহিত। ২৭
যেই পুণ্যকর্ম্মীদের হইয়াছে পাপ গত,
দ্বন্দ্ব-মোহ-মুক্ত, ভজে আমাকেই দৃঢ়ব্রত। ২৮
জরা-মরণ মোক্ষার্থ যতনে যে মমাশ্রিত,
হয় সে অধ্যাত্ম-ব্রহ্ম, অখিল কর্ম্ম বিদিত। ২৯
অধিভূত, অধিদৈব, অধিযজ্ঞ সহ জানে,
যাহারা আমায়,
আমাকে সে যোগিগণ, প্রয়াণকালেও পার্থ!
জানিবারে পায়। ৩০

ইতি বিজ্ঞানযোগ নাম
সপ্তম অধ্যায়। ৭।

অষ্টম অধ্যায়।

—*—

অর্জ্জুন কহিলেন।

কি সে ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম কি, কর্ম্ম কি, পুরুষোত্তম ?
অধিভূত, অধিদৈব, কারে বলে, জনার্দ্দন ? ১
অধিযজ্ঞ কিবা রূপ ? কে দেহে, মধুসূদন ?
কিরূপে মরণকালে জানে তা সংযমিগণ ? ২

ভগবান্ কহিলেন।

অক্ষর পরম ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম—স্বভাব তাঁর।
ভূত জন্ম বৃদ্ধি-প্রদ বিসর্জ্জন—কর্ম্মসার ; ৩
অধিভূত,—ক্ষর-ভাব ; পুরুষ,—অধিদৈবত,
অধিযজ্ঞ আমি দেহে, হে দেহিশ্রেষ্ঠ ভারত ! ৪
অন্তকালে আমাকেই স্মরি দেহমুক্ত হয়,
যে জন, আমার ভাব প্রাপ্ত হয় অসংশয়। ৫
যে যে ভাব স্মরি মনে ত্যজে অন্তে কলেবর,
সে সে ভাব পায়, পার্থ ! সে ভাব-ভাবিত নর। ৬
অতএব সর্ব্বকালে আমাকে স্মরিয়া, যুদ্ধ কর, ধনঞ্জয় !
আমাতে মানস বুদ্ধি হইলে অর্পিত পাবে আমাকে নিশ্চয়। ৭
অভ্যাস-যোগেতে যুক্ত হইয়া অনন্যমন,
চিন্তি, পার্থ ! হয় লাভ পুরুষ দিব্য পরম। ৮
কবি ও অনাদি, নিয়ন্তা বিশ্বের,
সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্ম, করে যে স্মরণ,—
সকলের ধাতা, অচিন্ত্য স্বরূপ,
তমঃ হ'তে শ্রেষ্ঠ আদিত্য বরণ। ৯

করি মৃত্যুকালে চিত্ত অবিচল
ভক্তিযুক্ত, যোগবলে যেই জন
ভ্রূমধ্যে করিয়া প্রাণ সমাবেশ
চিন্তে, পায় দিব্য পুরুষ পরম। ১০
কহে বেদবিৎ অক্ষর যাঁহার,
পশে যাতে বীতরাগ ব্যক্তিগণ ;
করে ব্রহ্মচর্য্য ইচ্ছিয়া যাহার,
কহিব সংক্ষেপে সে পদ কেমন। ১১
করি রুদ্ধ সর্ব্বদ্বার, হৃদয়ে নিরুদ্ধ মন,
মস্তকে নিবেশি প্রাণ, করিয়া যোগ ধারণ। ১২
উচ্চারি ওঁকার ব্রহ্ম, আমাকে করি স্মরণ
যে যায় ত্যজিয়া দেহ, সে পায় গতি পরম। ১৩
সতত অনন্যচিত্ত আমাকে যে নিত্য স্মরে,
সুলভে আমাকে পায় নিত্যযুক্ত যোগিবরে। ১৪
আমাকে পাইলে সিদ্ধ পরম মহাত্মাগণ,
অনিত্য দুঃখালয়ে পুনঃ না লভে জনম। ১৫
আব্রহ্ম-ভুবন লোকে, সকলই পুনঃ পুনঃ হয় আবর্ত্তিত।
আমাকে পাইতে কিন্তু, পার্থ! পুনর্জন্ম নাহি হয় কদাচিত। ১৬
সহস্র যুগ পর্য্যন্ত ব্রহ্মার দিন বিদিত,
রাত্রি যুগ সহস্রান্ত,—জানে দিবারাত্রিবিৎ। ১৭
অব্যক্ত হইতে সব জনমে আসিলে দিন,
সেরূপ আসিলে রাত্রি অব্যক্তেতে হয় লীন। ১৮
ভূতগণ এইরূপে জন্মি জন্মি হয় লয়,
রাত্রিতে অবশ থাকে, দিবসেতে জন্ম হয়। ১৯
ব্যক্তাব্যক্ত ভিন্ন আছে সনাতন ভাব আর,
সর্ব্বভূত হ'লে নাশ, না হয় বিনাশ যার। ২০

অব্যক্ত অক্ষর সেই—তাহাই গতি-প্রধান,
যাহা পেলে নাহি জন্ম—আমার পরম ধাম । ২১
সে শ্রেষ্ঠ পুরুষ হয় অনন্যভক্তিতে লাভ,
সর্ব্বত্র অন্তঃস্থ যার, সবে যার আবির্ভাব । ২২
যেই কালে যোগীদের হয় জন্ম, নাহি হয়
মরণান্তে, সেই কাল কহিতেছি ধনঞ্জয় ! ২৩
অগ্নি সম শুক্ল দিন, ষণ্মাস উত্তরায়ণ,—
সেকালে মরিলে, ব্রহ্ম পায় ব্রহ্মজ্ঞানিগণ । ২৪
ধূম্র কৃষ্ণবর্ণ রাত্রি, ষণ্মাস দক্ষিণায়ন,—
পাইয়া চন্দ্রের জ্যোতি করে যোগী নিবর্ত্তন । ২৫
জগতের নিত্যরূপে শুক্ল কৃষ্ণ গতিদ্বয়,
এক হতে অনাবৃত্তি, অন্যে পুনর্জন্ম হয় । ২৬
জানিলে এ পথ যোগী নহে মুগ্ধ কদাচিৎ,
অতএব সর্ব্বকালে হও তুমি যোগান্বিত । ২৭
কিবা বেদে, যজ্ঞে কিবা তপস্যায়,
দানে, পুণ্যফল যাহা আদেশিত ।
ইহা জানি, লভে সেই সব ফল,
শ্রেষ্ঠ আদ্য স্থানে, যোগী যোগান্বিত । ২৮

ইতি অক্ষয় ব্রহ্মযোগ নাম
অষ্টম অধ্যায় । ৮ ।

নবম অধ্যায়।

—*—

ভগবান্ কহিলেন।

অসূয়াবিহীন তুমি, কহিব তোমাকে এই কথা গুহ্যতম,—
বিজ্ঞান সহিত জ্ঞান,—যাহাকে জানিলে হবে, অশুভ মোচন। ১

শ্রেষ্ঠ বিদ্যা, গুহ্যশ্রেষ্ঠ, পবিত্র ইহা উত্তম,
প্রত্যক্ষ, ধর্ম্মানুগত, সুখ-সাধ্য, সনাতন। ২

এই ধর্ম্মে শ্রদ্ধাহীন পুরুষেরা কোন মতে
না পেয়ে আমাকে, ভ্রমে মৃত্যুসংসারের পথে। ৩

অব্যক্ত মূর্ত্তিতে মম জগত সর্ব্বব্যাপিত ;
আমাতে সমস্ত ভূত, আমি নাহি তাতে স্থিত। ৪

দেখ ঐশ্বরিক যোগ—অর্জ্জুন! আমাতে নহে
স্থিত ভূতগণ।
ধারক, পালক আমি—মম আত্মা ভূতস্থিত নহে
কদাচন। ৫

যথা আকাশেতে নিত্য সর্ব্বগামী মহাবায়ু করে অবস্থান,
সেইরূপে সর্ব্বভূত আমাতেই অবস্থিত,
জানিও প্রমাণ। ৬

কল্পক্ষয়ে সর্ব্বভূত আমার প্রকৃতি পায়।
কল্পারম্ভে তাহাদের সৃজি আমি পুনরায়। ৭

অবিলম্বি স্বপ্রকৃতি সৃজি আমি বারংবার।
প্রকৃতি-বশে অবশ অখিল ভূতসংসার। ৮

সেই সব কর্ম্মে বদ্ধ নহি আমি, হে ভারত!
অনাসক্ত সেই কর্ম্মে থাকি উদাসীন মত। ৯

প্রকৃতি অধ্যক্ষে মম সৃজে এই চরাচর।
এই হেতু জগতের বিপর্য্যয়, বীরবর। ১০
আমাকে ভাবিয়া দেহী অবজ্ঞে বিমূঢ়গণ।
না জানে পরম ভূত—মহেশ্বর ভাব মম। ১১
বৃথা আশা, বৃথা কর্ম্ম, বৃথা জ্ঞান,
তাহাদের চিত্ত বিচলিত,
মোহিনী রাক্ষসী আর আসুরিক
প্রকৃতির হইয়া আশ্রিত। ১২
মহাত্মারা কিন্তু, পার্থ! দিব্য দৈব
প্রকৃতিকে করিয়া আশ্রয়,
আমাকে অনন্যমনে ভজে,
জানি ভূতদের আদি অব্যয়। ১৩
সতত কীর্ত্তন করি যত্ন করি দৃঢ়ব্রতী
সভক্তি প্রণাম করি, পূজা করে নিত্য যতি। ১৪
জ্ঞানযজ্ঞে অপরে বা আমাকে বিশ্বতমুখ করিয়া যাজনা,
একত্বে বা পৃথকত্বে, বহু প্রকারেতে মম করে উপাসনা। ১৫
আমি ক্রতু, আমি যজ্ঞ, স্বধা ও ঔষধ আমি,
আমি মন্ত্র, আমি আজ্য, আমি অগ্নি, হুত আমি। ১৬
পিতা আমি জগতের, মাতা, ধাতা, পিতামহ।
পবিত্র ওঙ্কার-জ্ঞেয় ঋক, সাম, যজু সহ। ১৭
গতি, ভর্ত্তা, প্রভু, সাক্ষী, রক্ষী, বন্ধু, ভোগস্থান,
উৎপত্তি, প্রলয়, স্থিতি, অব্যয় বীজ নিধান। ১৮
আমি দিই তাপ, বর্ষা আকর্ষি বর্ষি, পাণ্ডব!
অমৃত ও মৃত আমি, সৎ অসৎ আমি সব। ১৯
ত্রৈবেদিক সোম-পায়ী পূতপাপ
যজ্ঞেতে আমাকে পূজি স্বর্গ চায়।

পেয়ে পুণ্যে তারা স্বর ইন্দ্রলোক,
ভুঞ্জে দিব্য দেহ ভোগ অমরায়। ২০
ভুগি [illegible] বিশাল সেই স্বর্গলোক
আ[illegible], মর্ত্ত্যে পুনঃ [illegible] পুণ্যক্ষয়,
এইরূপে হয় ত্রিধর্ম্ম আ[illegible]
সকামীর গতাগত, ধনঞ্জয়। ২১
উপাসনা করে যারা করি এক মনে ধ্যান,
সেই নিত্যযুক্তদের যোগ-সিদ্ধি করি দান।২
যারা শ্রদ্ধান্বিত হয়ে পূজে অন্য দেবতায়,
[illegible] অবিধিমতে, কৌন্তেয়! পূজে আমায়। ২৩
[illegible] যজ্ঞের আমি [illegible] প্রভু নিশ্চিত,
আমাকে না [illegible] জানে [illegible] হয় পুন আবর্ত্তিত।২৪
দেবব্রতী পায় [illegible], পিতৃব্রতী পিতৃগণ,
ভূতযাজী ভূতগণ, আমাকে মদযাজী জন।
[illegible] যে জন দেয় পত্র, পুষ্প, ফল, জল,—
[illegible] আমি, পবিত্রাত্মা ভক্তদত্ত সে সকল ॥ ২৬
তোমার সকল কর্ম্ম, আহুতি, দান, ভোজন,—
কৌন্তেয়! তপস্যা তব,—আমাতে কর অর্পণ।
মুক্ত হ'য়ে শুভাশুভ কর্ম্মফলবন্ধনের এইরূপ দায়,
সন্ন্যাস যোগেতে হ'য়ে যুক্ত-আত্মা, জন্মমুক্ত পাইবে আমায়। ২৮
সর্ব্বভূতে সম আমি, নাহি দ্বেষ্য, প্রিয় মম।
আমি তাতে, সে আমাতে, ভক্তিতে ভজে যে জন। ২৯
আমাকে অনন্যভাবে ভজে যদি দুরাচার,
সেও সাধু, সত্যপথে, পার্থ। অনুষ্ঠান তার। ৩০
ধর্ম্মাত্মা হইয়া শান্ত পায় সে শান্তি পরম;
কৌন্তেয়। জানিও, নাহি নষ্ট হয় ভক্ত মম। ৩১

আমাকে আশ্রয় করি পাপজন্মা দুরমতি,
নারী, বৈশ্য, তথা শূদ্র প্রাপ্ত হয় শ্রেষ্ঠ গতি। ৩২
তখন, ব্রাহ্মণভক্ত পুণ্যবান্ রাজর্ষির
কথা কি আবার ?
অনিত্য, অসুখপূর্ণ, পেয়ে ইহলোকে, কর
ভজনা আমার। ৩৩
মদ্ভক্ত, মদ্গত-চিত্ত, হও মম উপাসক,
কর নমস্কার।
যুক্তাত্মা মৎপরায়ণ এরূপে হইলে, পাবে
একত্ব আমার। ৩৪

ইতি রাজাবস্থা রাজগুহ্য যোগনাম
নবম অধ্যায়। ৯।

দশম অধ্যায়

ভগবান্ কহিলেন

কহিব পরম কথা, মহাবাহো! পুনরায়
—প্রীত হইতেছ তুমি—তব হিত-কামনায়। ১
না জানে প্রভাব মম মহর্ষি কি সুরগণ।
সর্ব্বরূপে তাহাদের আমি আদি সনাতন
যে জানে অনাদি আমি সর্ব্বলোক মহেশ্বর,
হয় সর্ব্বপাপমুক্ত সেই মোহ-হীন নর। ৩
বুদ্ধি, জ্ঞান, অসংমোহ, ক্ষমা, সত্য, দম, শম,
সুখ দুঃখ, ভাবাভাব, ভয়াভয়, অহিংসম। ৪

অহিংসা, সমতা, তুষ্টি, তপ, দান যশোযশ,—
আমা হতে ভূতগণ হয় ভিন্ন ভাববশ। ৫
পূর্ব্বে সপ্ত ঋষি, পরে চারি মনু, হে পাণ্ডব!
আমার মানসজাত,—যাহা হতে প্রজা সব। ৬
মম এ বিভূতিযোগে হয় যার জ্ঞানোদয়,
নিশ্চয় সে যোগযুক্ত, তাহাতে নাহি সংশয়। ৭
আমি সর্ব্বস্রষ্টা, সর্ব্ব আমা হ'তে প্রবর্ত্তিত,—
ইহা জানি আমাকেই ভজে জ্ঞানী ভাবান্বিত। ৮
মচ্চিত্ত, মদ্গতপ্রাণ, দিয়া জ্ঞান পরস্পরে;
কহি নিত্য মম কথা, তোষণ রমণ করে। ৯
সপ্রেম ভজনাকারী সেই নিত্যযুক্ত গণে,
সেই বুদ্ধিযোগ, যাতে পায় আমি- সনাতনে। ১০
নাশি অনুকম্পা করি আত্ম ভাবে হ'য়ে স্থিত,
তাদের অজ্ঞান তম, জ্ঞানদীপে প্রজ্বলিত। ১১

অর্জ্জুন কহিলেন।

পরম পবিত্র তুমি, পরব্রহ্ম, পরধাম;
নিত্য ব্রহ্ম, দিব্য, অজ, আদিদেব ভগবান—
কহেন ঋষিরা সর্ব্বে, দেবর্ষি নারদ মুনি,
অসিত, দেবল, ব্যাস,—স্বয়ং কহিলে তুমি। ১২—১৩
মনে হয় সব সত্য কহিলে যা, হে কেশব!
ভগবন্! তব ব্যক্তি না জানে দেব দানব। ১৪
আপনাকে আপনিই জান, হে পুরুষোত্তম!
দেবদেব! জগৎপতে! ভূতেশ! ভূতভাবন! ১৫
কহ সে অশেষ দিব্য আপন বিভূতিচয়,
করিতেছ অবস্থিতি ব্যাপী যাহে লোকত্রয়। ১৬

হে যোগিন্! কি ভাবে চিন্তি, পাব আমি তব জ্ঞান?
চিন্তিব তোমায় আমি কি কি ভাবে, ভগবান্? ১৭
বিভূতি ও আত্মযোগ সবিস্তারে, জনার্দ্দন!
কহ পুনঃ সে অমৃত শুনি তৃপ্ত নহে মন। ১৮

ভগবান্ কহিলেন।

অনন্ত, অসংখ্য, মম দিব্য আত্মবিভূতির
কহিব প্রধান যাহা তোমাকে, হে কুরুবীর! ১৯
আমি আত্মা, গুড়াকেশ! সর্ব্বভূত-অন্তর্যামী,
আমি আদি, আমি মধ্য, ভূতদের অন্ত আমি। ২০
আদিত্যেতে আমি বিষ্ণু, জ্যোতিষ্মানে প্রভাকর,
মরুতে মরীচি আমি, তারাগণে শশধর। ২১
বেদ মধ্যে সাম বেদ, দেবতা মধ্যে বাসব,
ইন্দ্রিয়েতে মন, ভূতে চেতনা আমি, পাণ্ডব! ২২
শঙ্কর রুদ্রের মধ্যে, যক্ষ রক্ষে বিত্তেশ্বর,
সুমেরু শিখরিগণে, বসু মধ্যে বৈশ্বানর। ২৩
পুরোহিত মধ্যে, আমি বৃহস্পতি, ধনুর্দ্ধর!
কার্ত্তিক সেনানী মধ্যে, সরসী মধ্যে সাগর। ২৪
মহর্ষিতে আমি ভৃগু, বচনে আমি ওঁকার,
যজ্ঞে আমি জপ-যজ্ঞ, স্থাবরে হিমাদ্রি আর। ২৫
অশ্বত্থ সকল বৃক্ষে, নারদ দেবর্ষিগণে,
গন্ধর্ব্বেতে চিত্ররথ, কপিল সংসিদ্ধ জনে। ২৬
অশ্বগণে উচ্চৈঃশ্রবা অমৃত সাগর-জাত,
গজেন্দ্রেতে ঐরাবত, নরগণে নরনাথ। ২৭
ধেনু মধ্যে কামধেনু, অস্ত্রগণে আমি বাজ;
আমি জন্মকারী কাম, বিষধরে নাগরাজ;

নির্ব্বিষ নাগে অনন্ত, জলচরে পাশী আমি;
অর্য্যমা পিতৃগণেতে, জিতেন্দ্রিয়ে মৃত্যুস্বামী। ২৮-২৯
দৈত্যেতে আমি প্রহ্লাদ, কাল সংখ্যাকারিগণে;
পশুগণে আমি সিংহ, বৈনতেয় বিহঙ্গমে। ৩০
বেগগামী মধ্যে বায়ু, শস্ত্রিগণে দাশরথি,
মৎস্যেতে মকর আমি, নদীগণে ভাগীরথী। ৩১
সকল সৃষ্টির আমি আদি, অন্ত, মধ্য পার্থ।
বিদ্যায় অধ্যাত্ম বিদ্যা, বাদীর আমি বাদার্থ। ৩২
অক্ষরে আমি অকার, সমাসেতে দ্বন্দ্ব আমি;
আমিই অক্ষয় কাল, বিশ্বমুখ বিশ্বস্বামী। ৩৩
আমি সর্ব্বহর কাল, ভবিষ্যৎ কল্লাদির
উদ্ভব কারণ,
নারী মধ্যে কীর্ত্তি, বাণী, স্মৃতি, মেধা, ক্ষমা,
রূপ অনুপম। ৩৪
সামবেদে বৃহৎসাম, ছন্দেতে গায়ত্রী বর,
মাসে আমি মার্গশীর্ষ, ঋতুতে কুসুমাকর। ৩৫
ছলনাকারীর দ্যূত, তেজীর তেজ, অর্জ্জুন।
জয়, ব্যবসায়, আমি সাত্ত্বিকের সত্ত্বগুণ। ৩৬
বৃষ্ণিগণে বাসুদেব, পাণ্ডবে শ্বেতবাহন,
কবিগণে শুক্রাচার্য্য, মুনিগণে দ্বৈপায়ন। ৩৭
দমনকারীর দণ্ড, জিগীষুর নীতিবল,
গুহ্য বিষয়েতে মৌন, জ্ঞানীদের জ্ঞানোজ্জ্বল। ৩৮
সর্ব্বভূত বীজ যাহা, তাও আমি, বীর্য্যবান।
নাহি চরাচর ভূত আমা বিনা বর্ত্তমান। ৩৯
মম দিব্য বিভূতির নাহি অন্ত, মহারথ।
বিস্তর বিভূতি মম,—কহিলাম সংক্ষেপত। ৪০

যে সত্ব ঐশ্বর্য্যান্বিত, শ্রীমৎ বা প্রভাযুত,
জানিবে সে সব মম তেজ-অংশ-সমুদ্ভূত। ৪১
কিংবা এত, পার্থ! তব কিবা প্রয়োজন জানি?
একাংশে সমগ্র বিশ্ব ব্যাপিয়া রয়েছি আমি। ৪২

ইতি বিভূতি-যোগনাম
দশম অধ্যায়। ১০।

একাদশ অধ্যায়।

—*—

অর্জ্জুন কহিলেন।

কৃপা করি আধ্যাত্মিক বিষয় গুহ্য পরম
কহিলে যা, তাহে মোহ হইল বিগত মম। ১
শুনিলাম বিস্তারিত ভূতদের সৃষ্টি লয়,
তব কাছে, কমলাক্ষ! মাহাত্ম্য তব অব্যয়। ২
এরূপে যে আত্মরূপ কহিলে, পরমেশ্বর!
ইচ্ছা সেই ঐশী রূপ দেখি তব, নরবর! ৩
দেখিতে সক্ষম আমি যদি, প্রভো! মনে হয়,
আমাকে, হে যোগেশ্বর! দেখাও আত্মা অব্যয়। ৪

ভগবান্ কহিলেন।

দেখ, পার্থ! দেখ শত সহস্র রূপ আমার,—
নানাবিধ, নানাবর্ণ, আমার দিব্য আকার। ৫
দেখ সূর্য্য, বসু, রুদ্র, মরুত, অশ্বিনীসুত,
অনেক অদৃষ্ট-পূর্ব্ব, ভারত! দেখ অদ্ভুত। ৬

একস্থানে সমুদায় দেখ বিশ্ব চরাচর—
দেখ যাহা ইচ্ছা আর, মম দেহে, বীরবর! ৭
আমাকে দেখিতে নাহি পাবে তব এ নয়ন,
দিব দিব্য চক্ষু, দেখ ঐশ্বরিক যোগ মম। ৮

সঞ্জয় কহিলেন।

মহা যোগেশ্বর হরি এত কহি, হে রাজন!
দেখাইলা ধনঞ্জয়ে ঈশ্বর-রূপ পরম।
অনেক-বদন-নেত্র অদ্ভুত-দর্শন কত;
বহু-দিব্য-আভরণ দিব্য অস্ত্র-সমুদ্যত। ১০
দিব্য-মাল্য-বস্ত্র-ধর, দিব্য-গন্ধে সুচর্চ্চিত,
সর্ব্বাশ্চর্য্য-ময়-দেব, অনন্ত বিশ্ব-ব্যাপিত। ১১
আকাশে সহস্র সূর্য্য হয় যদি সমুত্থিত,
সেই প্রভা মহাত্মার প্রভা সম কথঞ্চিত। ১২
একত্রে সমগ্র বিশ্ব বিভক্ত অনেক রূপ,
দেখিলেন দেবদেব-দেহে পার্থ অপরূপ! ১৩
তখন বিস্মিত পার্থ,—পুলকিত রোমাবলি,—
প্রণমিয়া দেবরূপ কহিলেন কৃতাঞ্জলি—১৪

অর্জ্জুন কহিলেন।

দেখি দেবগণ তব দেব-দেহে,—
তেমতি সকল স্থাবর জঙ্গম;
পদ্মাসন-স্থিত ব্রহ্মা প্রজাপতি,
ঋষিগণ, আর দিব্য নাগগণ। ১৫
বহু বাহূদর, বদন, নয়ন,
দেখিতেছি তব অনন্ত স্বরূপ;
নাহি অন্ত মধ্য, নাহি তব আদি,
দেখিতেছি, বিশ্বেশ্বর! বিশ্বরূপ! ১৬

কিরীট-শোভিত, গদাচক্রধারী,
তেজোরাশি, সর্ব্বরূপে দীপ্তিমান ;
দেখি সর্ব্বরূপে ছনিরীক্ষ্য তুমি,
দীপ্তানল অর্ক-জ্যোতিঃ অবিরাম। ১৭

তুমিই জ্ঞাতব্য, পরম, অক্ষর,
তুমিই বিশ্বের পরম নিধান ;
তুমিই অব্যয়, নিত্য ধর্ম্মাশ্রয় ;
মম মতে নিত্য, পুরুষপ্রধান। ১৮

আদি-মধ্য-অন্ত-বিহীন, অনন্ত-
বীর্য্য বাহু নেত্র সূর্য্য শশধর ;
দেখিতেছি, মুখ দীপ্তহুতাশন
করিতেছে তেজে তপ্ত চরাচর। ১৯

দ্যুলোক, ভূর্লোক, অন্তরীক্ষ, তুমি
ব্যাপিয়াছ একা দিক সমুদয় ;
দেখিয়া অদ্ভুত উগ্ররূপ তব,
হতেছে, মহাত্মা! ভীত লোকত্রয়। ২০

এই সুরগণ পশিছে তোমাতে,
কেহ ভীত স্তব করে যোড়কর ;
কহি স্বস্তি বাক্য, ঋষি সিদ্ধগণ
করে স্তব, স্তুতি করি বহুতর। ২১

রুদ্রাদিত্য, ইন্দ্র, সাধ্য দেবতারা,
অশ্বিনীকুমার, বায়ু, পিতৃগণ,
গন্ধর্ব্ব ও যক্ষ, অসুর-সকল
করিতেছে সবে বিস্ময়ে দর্শন। ২২

মহৎ স্বরূপ, বহু মুখ নেত্র,
বহু বাহু উরু পদ অগণিত ;

হৃদর বহু করাল দশন,
ত্রিলোক ও আমি দেখিয়া ব্যথিত। ২৩
নভঃস্পর্শী, দীপ্ত অনেক-বরণ,।
বিস্তৃতাস্য, দীপ্ত বিশাল নয়ন,
দখি আন্তরাত্মা হতেছে ব্যথিত,
নাহি পাই ধৈর্য্য, শান্তি, নারায়ণ! ২৪
করাল দশন বদনে তোমার,
দেখি কালানলসন্নিভ প্রকাশ,
নাহি জানি দিক, নাহি পাই শান্তি,
সুপ্রসন্ন হও, হে জগন্নিবাস। ২৫
ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র দেখিতেছি সব,
ভীষ্ম, দ্রোণ, এই সূতের নন্দন,
সকল অবনিপালের সহিত,
সহ স্বপক্ষীয় মুখ্য যোদ্ধৃগণ। ২৬
পশিতেছে বেগে বদনে তোমার,
করাল দশন-মালায় ভীষণ,
কেহ বা বিলগ্ন দশন অন্তরে,
চূর্ণিতমস্তক, হতেছে দর্শন। ২৭
যথা নদীদের বহু অম্বুবেগ
সিন্ধু-অভিমুখী, প্রবেশে সাগরে;
তথা এই নরলোক বীরগণ
পশিছে জ্বলন্ত বদন নিকরে। ২৮
যেমতি প্রদীপ্ত অনলে পতঙ্গ
পশে দ্রুতবেগে মরিবারে তরে,
পশিছে নাশার্থ তথা প্রাণিগণ,।
দ্রুতবেগে তব বদন-বিবরে। ২৯

করিছ লেহন সর্ব্ব লোকগণ,—
সমগ্র জলন্ত বদনে গ্রাসিত ;
তেজে পূর্ণ করি সমগ্র জগত
উগ্র ভাতি তব করিছে তাপিত। ৩০
উগ্ররূপ তুমি কে আমাকে কহ,
সুপ্রসন্ন হও, নমি দেববর !
আদ্য তুমি, আমি ইচ্ছি জানিবারে ;
প্রবৃত্তি তোমার না হি জানি নর। ৩১

ভগবান্ কহিলেন।

আমি বৃদ্ধ কাল লোক-সংহারক,
লোক সংহারেতে প্রবৃত্ত এখন।
বিনা তুমি আর থাকিবে না কেহ
প্রতি-সৈন্যস্থিত অস্ত্র যোদ্ধৃগণ। ৩২
অতএব উঠ ! লভ তুমি যশ।
কর রাজ্য ভোগ জিনি শত্রুদল।
পূর্ব্বেই করেছি হত আমি সব,
সব্যসাচি ! তুমি নিমিত্ত কেবল। ৩৩
দ্রোণ আর ভীষ্ম, কর্ণ, জয়দ্রথ
তেমতি অন্যান্য বীর যোদ্ধৃচয়,
আমা হ'তে হত, না হবে ব্যথিত,
যুদ্ধ কর, কর রণে শত্রু জয়। ৩৪

সঞ্জয় কহিলেন।

শুনি কেশবের এরূপ বচন,
কৃতাঞ্জলি করে কিরীটী কম্পিত
কহিলেন, কৃষ্ণে নমি পুনঃ পুনঃ,
গদগদ কণ্ঠে নমি ভয়ে ভীত। ৩৫

অর্জ্জুন কহিলেন।

উচিত, হে কৃষ্ণ! তোমার কীর্ত্তনে
হয় অনুরক্ত, হৃষ্ট যে সংসার;
পলায়ে যে দিগন্তরে রক্ষগণ,
সর্ব্ব সিদ্ধগণ করে নমস্কার। ৩৬
কেন না নমিবে, মহাত্মা! তোমায়?
ব্রহ্মারও যে আদি-কর্ত্তা গুরুতর;
অনন্ত, দেবেশ, হে জগন্নিবাস!
সদসৎ হতে যে শ্রেষ্ঠ, অক্ষর। ৩৭
তুমি আদি দেব, পুরুষ পুরাণ,
তুমি এ বিশ্বের নিধান স্বরূপ,
তুমি জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, তুমি মোক্ষধাম,
তুমি বিশ্বব্যাপ্ত, হে অনন্তরূপ। ৩৮
বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, শশাঙ্ক,
প্রপিতামহ, তুমি ব্রহ্মা আর;
তোমাকে সহস্র করি নমস্কার,
পুনঃ নমস্কার করি বহুবার। ৩৯
সম্মুখে পশ্চাতে, করি নমস্কার,
সর্ব্বদিকে, সর্ব্ব! প্রণাম তোমায়।
তুমি মহাবীর্য্য, অমিতবিক্রম,
সর্ব্বব্যাপ্ত তুমি, সর্ব্ব তুমি তায়। ৪০
সখা জ্ঞানে আমি বলিয়াছি ব'লে—
"হে কৃষ্ণ! যাদব! হে সখে আমার!"
প্রমাদে, প্রণয়ে; হইয়া মোহিত,
না জানিয়া তব মহিমা অপার; ৪১
করেছি অবজ্ঞা করি পরিহাস

আসনে, ভোজনে, বিহারে, শয্যায়,
পরোক্ষে, সমক্ষে, অচ্যুত তোমার,—
তুমি অপ্রমেয় ক্ষম সমুদায়। ৪২
লোক চরাচর সকলের পিতা,
পূজ্য তুমি, গুরু হতে গরীয়ান,
অতুলপ্রভাব। নাহি তিন লোকে
অন্য কেহ শ্রেষ্ঠ তোমার সমান। ৪৩
অতএব নমি প্রণত শরীরে
আরাধ্য ঈশ্বরে, ক্ষম দোষ যত,—
পিতায় পুত্রের, সখায় সখার,
প্রিয় প্রেয়সীর সহে যেই মত। ৪৪
হৃষ্ট আমি দেখি অদৃষ্ট স্বরূপ,
ভয়েতে ব্যথিত মানস আমার,
দেখাও আমাকে তব দেব-রূপ,
দেবেশ! প্রসন্ন হও, বিশ্বাধার! ৪৫
কিরীট-ভূষিত, গদাচক্রধারী,
ইচ্ছা মম দেখি তব সেই রূপ,
ধর চতুর্ভুজ স্বরূপ তোমার,
হে সহস্রবাহো! ওহে বিশ্বরূপ! ৪৬

ভগবান্ কহিলেন।

প্রসন্ন হইয়া দেখা'নু অর্জ্জুন!
আত্মযোগে এই শ্রেষ্ঠ রূপ মম,
তেজস্বী, অনন্ত, আদ্য, বিশ্বরূপ;
তুমি ভিন্ন অন্যে দেখেনি কখন। ৪৭
নাহি বেদে, যজ্ঞে, দানে, অধ্যয়নে,
নাহি ক্রিয়া-বলে, উগ্র তপস্যায়,

নৃলোকে এরূপ, তোমা বিনা আর কুরুশ্রেষ্ঠ !
অন্যে দেখিবারে পায়। ৪৮

না হও ব্যথিত, মূঢ়ভাবাপন্ন,
হেন ঘোর রূপ দেখিয়া আমার ;
মম পূর্ব্বরূপ কর দরশন,
ভয়হীন, প্রীতচিত্ত পুনর্ব্বার। ৪৯

সঞ্জয় কহিলেন।

বাসুদেব ইহা কহিয়া, অর্জ্জুনে
দেখাইলা স্বীয় রূপ পুনর্ব্বার।
করিলা আশ্বস্ত ভীত ধনঞ্জয়ে,
ধরি সৌম্য বপু মহাত্মা আবার। ৫০

অর্জ্জুন কহিলেন।

এই মানুষিক রূপ দেখি তব, জনার্দ্দন !
হইনু প্রকৃতিগত, এখন প্রসন্ন মন ! ৫১

ভগবান্ কহিলেন।

যেই সুদুর্দর্শনীয় নিরখিলে রূপ মম,
দেবগণও নিত্যাকাঙ্ক্ষী করিবারে দরশন। ৫২
বেদে, তপে, দানে, যজ্ঞে, নাহি পারে কদাচন
দেখিতে এরূপ মম, দেখিলে তুমি যেমন। ৫৩
অনন্য ভক্তিতে পাবে, অর্জ্জুন ! এ রূপ মম
জানিতে, দেখিতে, তত্ত্বে প্রবেশিতে, অরিন্দম ! ৫৪
মম কর্ম্মকারী, অতি মদ্ভক্ত, কামনাহীন,
সর্ব্বভূতে অহিংস যে, সে হয় আমাতে লীন। ৫৫

ইতি বিশ্বরূপ দর্শননাম
একাদশ অধ্যায়। ১১।

দ্বাদশ অধ্যায়।

—*—

অর্জ্জুন কহিলেন।

এরূপে সতত যোগে করে তব উপাসনা যেই ভক্তগণ,
অক্ষর অব্যক্তে আর পূজে যারা,—যোগবিৎ কাহারা উত্তম ? ১

ভগবান্ কহিলেন।

আমাতে নিবেশি মন, যারা নিত্যযুক্ত করে উপাসনা মম,
পরম শ্রদ্ধার সহ,—ধনঞ্জয় ! মম মতে তারা যুক্ততম। ২
পূজে যারা ক্ষরহীন, অনির্দ্দেশ্য, চিন্তাতীত,
সর্ব্বত্রগামী, অব্যক্ত, ধ্রুব, স্থির, কূটস্থিত। ৩
সংযমি ইন্দ্রিয়গণ, সমজ্ঞান সমুদায়,
সর্ব্বভূতহিতে রত,—তারাই আমাকে পায়। ৪
অব্যক্তে আসক্তদের ক্লেশ সমধিকতর,
দুঃখেতে অব্যক্তগতি পায় দেহধারী নর। ৫
মৎপর, আমাতে যারা সর্ব্ব কর্ম্ম করি দান,
অনন্যযোগেতে করে মম উপাসনা ধ্যান, ৬
আমাতে অর্পিত চিত্ত, তাহাদেরে করি পার
অচিরেতে মৃত্যু যুক্ত সংসারের পারাবার। ৭
আমাতে স্থাপিত মন, কর বুদ্ধি নিবেশিত,
আমাতে দেহান্তে বাস পাইবে তবে নিশ্চিত। ৮
আমাতে স্থাপিত স্থির চিত্ত যদি নাহি হয়,
পাইতে অভ্যাস যোগে ইচ্ছা কর, ধনঞ্জয় ! ৯
অভ্যাসে অশক্ত যদি, হও মৎ-কর্ম্মপর ;
করি কর্ম্ম মম তরে, পাবে সিদ্ধি, বীরবর। ১০

তাতেও অশক্ত যদি, কর মম যোগাশ্রয়,
যতাত্মা হইয়া ত্যাগ কর কর্ম্ম-ফলাশয়। ১১
অভ্যাস হইতে জ্ঞান, জ্ঞান হ'তে ধ্যান, শ্রেয়ঃ;
ধ্যান হ'তে ফলত্যাগ, ত্যাগে শান্তি, হে কৌন্তেয়। ১২
সর্ব্বভূতে দ্বেষহীন, মিত্র, সকরুণ-প্রাণ,
নির্ম্মম, নিরহঙ্কার, দুঃখ সুখ সমজ্ঞান, ১৩
ক্ষমী, সদা তুষ্ট, যোগী, দৃঢ়ব্রতী, জিতেন্দ্রিয়,
মদর্পিত-মন-বুদ্ধি যে ভক্ত, সে মম প্রিয়। ১৪
না দেয় উদ্বেগ লোকে, নহে যে উদ্বেজনীয়,
হর্ষ-ক্রোধ-ভয়োদ্বেগ-মুক্ত যে, সে মম প্রিয়। ১৫
শুচি, দক্ষ, উদাসীন, বিগত-ব্যথ, নিস্পৃহ,
সর্ব্বারম্ভ-পরিত্যাগী মদ্ভক্ত, সে মম প্রিয়। ১৬
নহে হর্ষ-দ্বেষ-যুক্ত; নাহি শোক-বাঞ্ছনীয়,
শুভাশুভ পরিত্যাগী ভক্তিমান, মম প্রিয়। ১৭
শত্রু মিত্রে সমজ্ঞান, তথা মান অপমান,
অনাসক্ত, শীত উষ্ণে, সুখে দুঃখে সমজ্ঞান, ১৮
তুল্য নিন্দা স্তুতি, মৌনী, অল্পে তুষ্ট, শূন্য-গৃহ,
স্থিরমতি, ভক্তিমান, সেই নর মম প্রিয়। ১৯
এইরূপ ধর্ম্মামৃত যাঁহাদের ভজনীয়,
শ্রদ্ধাযুক্ত মহাভক্ত, তারা মম অতি প্রিয়। ২০

ইতি ভক্তিযোগ নাম

দ্বাদশ অধ্যায়। ১২

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

—*—

অর্জ্জুন কহিলেন।

প্রকৃতি পুরুষ, আর ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ সব,
জানিতে বাসনা করি জ্ঞান ও জ্ঞেয়, কেশব। ১

ভগবান্ কহিলেন।

এ শরীর, হে কৌন্তেয়! হয় ক্ষেত্র অভিহিত;
ইহাকে যে জানে তাকে ক্ষেত্রজ্ঞ কহে পণ্ডিত। ২
ক্ষেত্রজ্ঞ আমাকে জান সর্ব্বক্ষেত্রে, হে ভারত!
ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞান—সেই জ্ঞান, মম মত। ৩
সে ক্ষেত্র যাহা, যে রূপ, বিকার উৎপত্তি যাহা,
ক্ষেত্র যে, প্রভাব যাহা,—সংক্ষেপেতে শুন তাহা। ৪
বহুমতে, নানা ছন্দে, গাইয়াছে ঋষিগণ,
ব্রহ্মসূত্রপদে, করি হেতুযোগে নিরূপণ। ৫
মহাভূতগণ, বুদ্ধি প্রকৃতি, ও অহঙ্কার,
দশেন্দ্রিয়, মন, পঞ্চ-ইন্দ্রিয়-গোচর আর, ৬
ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, শরীর, চেতনা, ধৃতি,—
কহিলাম সংক্ষেপেতে এই ক্ষেত্র সবিকৃতি। ৭
শ্লাঘা-দম্ভ-বিহীনতা, ক্ষমা, সরলতাসহ,
আচার্য্যের সেবা, শৌচ, স্থৈর্য্য, আত্ম-বিনিগ্রহ,। ৮
ইন্দ্রিয়ার্থে বৈরাগ্যতা, অহঙ্কারহীন মন,
জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-দুঃখ-দোষ দরশন,। ৯
আসক্তি সহানুভূতি পুত্র-দারা-গৃহে হীন,
ইষ্ট কি অনিষ্ট লাভে সমচিত্ত চিরদিন,। ১০

আমাতে অনন্য যোগে ভক্তি ব্যতিচার-হীন,
শুদ্ধদেশে রয়ে, জনসংসর্গে রতিবিহীন, ১১
তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শন, অধ্যাত্মজ্ঞান নিত্যতা,—
ইহাকেই কহে জ্ঞান, অজ্ঞান যাহা অন্যথা। ১২
কহিতেছি জ্ঞেয় যাহা—যেই জ্ঞানে মোক্ষ হয়,—
অনাদি পরম ব্রহ্ম, সৎ অসৎ কিছু নয়। ১৩
পাণি, পদ, আঁখি, শির, মুখ, শ্রুতি সর্ব্বস্থান,
আবরিয়া সর্ব্বলোক করিছেন অধিষ্ঠান। ১৪
সর্ব্বেন্দ্রিয়প্রকাশক, সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিত,
নির্গুণ, গুণের ভোক্তা, অনাসক্ত, সর্ব্বভৃত। ১৫
চরাচর ভূতদের অন্তর বহিরাধার,
সূক্ষ্ম হেতু অবিজ্ঞেয়, দূরস্থ, অন্তরে আর। ১৬
অবিভক্ত, ভূতগণে বিভক্তরূপেতে স্থিত;
সৃষ্টি-স্থিতি-গ্রাসকারী সেই জ্ঞেয় অভিহিত। ১৭
জ্যোতিষ্কগণের জ্যোতিঃ, তমের পরম তিনি,
জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞানগম্য তিনি সর্ব্ব অন্তর্যামী। ১৮
এই ক্ষেত্র, জ্ঞান, জ্ঞেয়, কহিলাম সংক্ষেপতঃ,
মম ভক্ত ইহা জানি, হয় মম ভাবগত। ১৯
উভয় অনাদি জান, প্রকৃতি, পুরুষ আর;
প্রকৃতি-সম্ভূত সব জানিবে,—গুণ, বিকার। ২০
কার্য্য আর কারণের প্রকৃতিকে হেতু কহ,
সুখ দুঃখ ভোগে হেতু পুরুষ,—
প্রকৃতি নহে। ২১
হইয়া প্রকৃতিস্থিত, পুরুষ প্রকৃতিজাত ভুঞ্জে গুণগণ;
এই গুণ-সঙ্গ, পার্থ! অসৎ সৎ যোনিতে
জনম কারণ। ২২

সাক্ষী ও অনুমোদক, ভর্ত্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর—
পরমাত্মা অভিহিত এ দেহে পুরুষবর। ২৩
এরূপে পুরুষে আর প্রকৃতিকে গুণ সহ জানে যেই জন,
সর্ব্বরূপে কর্ম্মরত হইলেও পুনঃ পুনঃ না লভে জনম ।২৪
কেহ ধ্যানে আপনাতে করে আত্মা দরশন,
কেহ দেখে সাংখ্য যোগে, কর্ম্মযোগে অন্য জন। ২৫
না জানিয়া এইরূপ, শুনিয়াই উপাসনা করে অন্য জন,—
সেই শ্রুতি-পরায়ণ—তারাও অচিরে করে মৃত্যু
অতিক্রম। ২৬

যাহা কিছু লভে জন্ম, স্থাবর জঙ্গম সব,—
ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের যোগে, জানিবে, ভরতর্ষভ। ২৭
সর্ব্ব ভূতে সমভাবে আছেন পরমেশ্বর,
ভূতনাশে অবিনাশ, যে দেখে সে দর্শী নর। ২৮
সর্ব্বত্রে সমান দেখে ঈশ্বরের অবস্থিতি,
না হিংসে আত্মার আত্মা, লভে তাতে শ্রেষ্ঠ গতি। ২৯
ক্রিয়মাণ কর্ম্ম সব সর্ব্বথা প্রকৃতিগত
যে দেখে, সে আপনাকে অকর্ত্তা দেখে সর্ব্বতঃ। ৩০
যখন পৃথক ভূত একস্থ করে দর্শন,—
তা হতে উৎপত্তি দেখে,—ব্রহ্মত্ব লভে তখন। ৩১
অনাদি নির্গুণ হেতু পরম-আত্মা অব্যয়
হইয়াও শরীরস্থ না করে, না লিপ্ত হয়। ৩২
নির্লিপ্ত সূক্ষ্মতা হেতু, সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বগত আকাশ যেমন
সর্ব্ব দেহে অবস্থিতি নির্ব্বিকার পরমাত্মা
নির্লিপ্ত তেমন।
যথা একমাত্র রবি প্রকাশে সর্ব্ব জগত,
তেমতি সমস্ত ক্ষেত্র প্রকাশে ক্ষেত্রী, ভারত। ৩৪

ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের ভেদ জ্ঞান-নয়নেতে যারা করে দরশন,
ভূতের প্রকৃতি-মুক্তি, জানে যারা, করে লাভ
তাহারা পরম। ৩৫

ইতি ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞবিভাগ যোগ নাম
ত্রয়োদশ অধ্যায়। ১৩।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

—*—

ভগবান্ কহিলেন।

জ্ঞানে যাহা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান, কহিতেছি পুনরায়;
জানি যাহা মুনিগণ সিদ্ধি পরমার্থ পায়। ১
এ জ্ঞান আশ্রয় করি যারা মম ধর্ম্মান্বিত,
সৃষ্টি কালে নাহি জন্মে, প্রলয়ে নহে ব্যথিত। ২
যোনি মম মহদ্ব্রহ্ম, করি তাতে গর্ভাধান,
তাতে জন্ম, হে ভারত! লভে সর্ব্বভূতগ্রাম। ৩
সকল যোনিতে হয় যেই মূর্ত্তি সম্ভাবিতা,
মহদ্ব্রহ্ম যোনি তার আমি বীজপ্রদ পিতা। ৪
সত্ত্ব রজঃ তমঃ গুণ প্রকৃতি-সম্ভব সব,
অব্যয় দেহীকে দেহে নিবদ্ধ করে, পাণ্ডব! ৫
নির্ম্মলত্ব হেতু সত্ত্ব—প্রকাশক, অনাময়,—
সুখসঙ্গে, জ্ঞানসঙ্গে, করে বদ্ধ, ধনঞ্জয়! ৬
তৃষ্ণা-সঙ্গ-সমুদ্ভূত রাগাত্মক রজোগুণ,
দেহীকে কর্ম্মের সঙ্গে করে বদ্ধ, হে অর্জ্জুন! ৭

সর্ব্ব-দেহি-মোহকারী জান অজ্ঞানজ তমঃ,
প্রমাদ ও নিদ্রালস্যে করে বদ্ধ, অরিন্দম। ৮
সত্ত্ব সুখে, রজঃ কর্ম্মে করে, পার্থ! সংশ্লেষিত;
আবরিয়া জ্ঞান, তমঃ প্রমাদে করে পাতিত। ৯
জন্মে সত্ত্ব, রজঃ তমে করি, পার্থ! অভিভূত;
রজঃ—সত্ত্ব তমে; তমঃ—সত্ত্ব রজে, কুন্তিসুত। ১০
এই দেহে সর্ব্বদ্বারে হয়, পার্থ! প্রকাশিত
জ্ঞান যবে, তখনই সত্ত্বগুণ বিবর্দ্ধিত। ১১
প্রবৃত্তি, লোভ, উদ্যম, কর্ম্মেতে অশান্ত-স্পৃহা,
রজোগুণে হয় বৃদ্ধি, হে ভারতশ্রেষ্ঠ! ইহা। ১২
অবিবেক, অপ্রবৃত্তি, প্রমাদ, মোহ তেমন,
তমোগুণে হয় সব বর্দ্ধিত, কুরু-নন্দন! ১৩
যখন বর্দ্ধিত সত্ত্ব,—মরে যদি দেহিগণ,
সে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীরা করে নির্ম্মল-লোকে গমন। ১৪
রজোগুণে হ'লে লয়, জন্মে কর্ম্মাসক্ত ঘরে;
মূঢ়যোনি হয় প্রাপ্ত, তমোগুণে যদি মরে। ১৫
সুকৃত কর্ম্মের, পার্থ! সাত্ত্বিক ফল নির্ম্মল;
রজসের ফল দুঃখ, তমের অজ্ঞান ফল। ১৬
সত্ত্ব হ'তে জন্মে জ্ঞান; রজঃ হ'তে লোভোদয়;
প্রমাদ, অজ্ঞান, মোহ, তমঃ হতে, ধনঞ্জয়! ১৭
সাত্ত্বিকেরা যায় ঊর্দ্ধে; রহে মধ্যে রাজসিক;
করে অধোগতি লাভ হীনবৃত্তি তামসিক। ১৮
যখন না দেখে দ্রষ্টা গুণভিন্ন কর্ত্তা আর,
জানে গুণভিন্ন ব্রহ্ম—পায় সে ভাব আমার। ১৯

দেহ-সমুদ্ভূত এই গুণত্রয়
অতিক্রমি আত্মা দেহধারী,

জন্ম মৃত্যু জরা দুঃখ-মুক্ত হ'য়ে,
অমৃতের হয় অধিকারী। ২০

অর্জ্জুন কহিলেন।

কোন্ লক্ষণেতে, প্রভো! হয় এ ত্রিগুণাতীত?
কি আচরে, কিসে হয় ত্রিগুণ অতিক্রমিত? ২১

ভগবান্ কহিলেন।

প্রকাশ, প্রবৃত্তি, মোহে প্রবৃত্ত হইয়া দ্বেষ
না করে, নিবৃত্ত হ'য়ে না করে আকাঙ্ক্ষা লেশ; ২২
উদাসীন মত থাকে, নহে গুণে বিচলিত;
গুণকার্য্যে রত জানি, রহে যে অচঞ্চলিত, ২৩
সম সুখ দুঃখ, স্থির, সম লোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চন,
তুল্য প্রিয়াপ্রিয়, তুল্য স্তুতি নিন্দা, ধীর মন, ২৪
তুল্য শত্রু মিত্র পক্ষ, তুল্য মান অপমান,
সর্ব্বারম্ভ-পরিত্যাগী, গুণাতীত তার নাম। ২৫
অনন্যভক্তি-যোগেতে যে জন সেবে আমায়,
হ'য়ে সর্ব্বগুণাতীত সে ব্রহ্মত্ব ভাব পায়। ২৬
অমৃত-অব্যয়-রূপ ব্রহ্মের আমি আধার,
শাশ্বত ধর্ম্মের, পার্থ! একান্ত সুখের আর। ২৭

ইতি গুণত্রয় বিভাগযোগ নাম
চতুর্দ্দশ অধ্যায়। ১৪।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

—•—

ভগবান্ কহিলেন।

অব্যয় অশ্বত্থ-রূপী এ সংসার ঊর্দ্ধমূল,
অধঃ শাখান্বিত;
বেদ যার পত্রাবলী, তাহাকে যে জন জানে,
সেই বেদবিৎ। ১
অধে ঊর্দ্ধে তার শাখা প্রসারিত,
গুণেতে বর্দ্ধিত, বিষয়ে পত্রিত;
অধঃ অনুগামী বাসনার মূল,—
নরলোকে কর্ম্ম-বন্ধন নিশ্চিত; ২
আদি, অন্ত, রূপ প্রতিষ্ঠা তাহার,
নাহি উপলব্ধ হয় কদাচিৎ;
সুদৃঢ় শিকড় এই অশ্বত্থকে
বৈরাগ্যদৃঢ়াস্ত্রে করিয়া ছেদন, ৩
পরে অন্বেষণ করিবে সে পদ,
যথা গেলে নাহি পুনঃ আবর্ত্তন,—
"যা হ'তে বিস্তৃত প্রবৃত্তি, পুরাণ,
লইনু সে আদি পুরুষশরণ।" ৪
মান মোহ হীন, জিত সঙ্গদোষ,
নিত্য আধ্যাত্মিক, নিষ্কাম হৃদয়,
সুখদুঃখরূপ দ্বন্দ্বজ্ঞানমুক্ত
অমূঢেরা পায় সে পদ অব্যয়। ৫

চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি তথা নাহি করে দীপ্তি দান,
যথা গেলে নাহি জন্ম, সে মম পরম ধাম। ৬
মম অংশ জীবলোকে জীবভূত সনাতন,
প্রকৃতিস্থ ষষ্ঠেন্দ্রিয়ে, মনে, করে আকর্ষণ। ৭
দেহ প্রাপ্তি কালে, আর দেহ
পরিত্যাগ কালে, করেন গ্রহণ
ঈশ্বর ইন্দ্রিয়গণ, পুষ্প হ'তে যথা গন্ধ লয় সমীরণ। ৮
চক্ষু, কর্ণ, স্পর্শ, ঘ্রাণ, রসনা, মন, ভারত!
আশ্রয় করিয়া ভোগ করেন বিষয় যত। ৯
উৎক্রামী, স্থিত, ভোক্তা কিংবা এই গুণান্বিত,—
না দেখে বিমূঢ়; দেখে জ্ঞান-চক্ষু-সমন্বিত। ১০
যত্নবান্ যোগী দেখে আত্মাতেই অবস্থিত;
অকৃতাত্মা অবিবেকী নাহি দেখে কদাচিত। ১১
যে আদিত্য-তেজ করে বিভাসিত ত্রিভুবন,
চন্দ্রেতে অগ্নিতে যাহা, জানিবে সে তেজ মম। ১২
প্রবেশিয়া পৃথিবীতে ভূতগ্রাম করি আমি বলেতে ধারণ
হ'য়ে রসাত্মক সোম করি আমি ঔষধির
পুষ্টি সম্পাদন। ১৩
হ'য়ে বৈশ্বানর আমি প্রাণীদের দেহগত,
প্রাণাপান যোগে করি পাক অন্ন চারিমত। ১৪
সকলের হৃদে সন্নিবিষ্ট আমি,
আমি স্মৃতিজ্ঞান, অভাব তাহার;
সর্ব্ব বেদ দ্বারা আমি মাত্র জ্ঞেয়,
বেদান্তকারী ও বেদবিদ্ আর। ১৫
জানিও পুরুষ দুই লোকেতে— অক্ষর, ক্ষর;
সর্ব্বভূতগণ ক্ষর, কূটস্থ মাত্র অক্ষর। ১৬

উত্তম পুরুষ অন্য পরমাত্মা অভিহিত ;
নিত্য ব্রহ্ম বিশ্বে পশি করেন তাহা পালিত। ১৭
ক্ষরের অতীত আমি, অক্ষর হ'তে উত্তম,
এই হেতু লোকে বেদে আখ্যাত পুরুষোত্তম। ১৮
যে জ্ঞানী আমাকে জানে এরূপ পুরুষোত্তম,
সর্ব্বভাবে আমাকে সে ভজে সর্ব্ববিদ্ জন। ১৯
এই গুহ্যতম শাস্ত্র কহিলাম সংক্ষেপতঃ.
যাহা জানি বুদ্ধিমান কৃতার্থ হয়, ভারত। ২০

ইতি পুরুষোত্তম যোগনাম
পঞ্চদশ অধ্যায়। ১৫।

ষোড়শ অধ্যায়।

—*—

ভগবান্ কহিলেন।

জ্ঞানযোগে অবস্থিতি, অভয়, সত্ত্বশুদ্ধতা,
দান, দম, যজ্ঞ, তপ, স্বাধ্যায় ও সরলতা, ১
অহিংসা, অক্রোধ, সত্য, ত্যাগ, শান্তি, অপৈশুন,
দয়া, অলোভতা, লজ্জা, মৃদুতা স্থিরতা গুণ, ২
তেজ, ক্ষমা, ধৃতি, শৌচ, অদ্রোহ, অনভিমান,—
পায় দৈবী-সম্পদেতে অভিজাত পুণ্যবান। ৩
দম্ভ, অভিমান, ক্রোধ, কর্কশতা, জ্ঞানাভাব,
আসুরিক সম্পদেতে অভিজাত করে লাভ। ৪

মোক্ষার্থ দৈবী-সম্পদ আসুরী বন্ধন তরে,
কেন কর শোক তুমি দৈবী জন্ম লাভ ক'রে ? ৫
ইহলোকে দেবাসুর সৃষ্ট ভূত দুই মত,
কহিলাম দৈব যাহা ; আসুর শুন, ভারত। ৬
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি নাহি জানে আসুরিকগণ,
নাহি শৌচাচার সত্য তাহাদের, অরিন্দম! ৭
অসত্য, অপ্রতিষ্ঠিত, অনীশ্বর এ জগত, আসুরিয়া কহে,
কামহেতু পরস্পর-সমুদ্ভূত ভিন্ন, ইহা আর কিছু নহে। ৮
অল্প বুদ্ধি, নষ্ট আত্মা এতাদৃশ দৃষ্টি, পার্থ করিয়া আশ্রয়,
উগ্রকর্ম্মা, জগত-অরি, জগতের ক্ষয়হেতু জন্মে, ধনঞ্জয়! ৯
দম্ভমানমদান্বিত, কামনা দুষ্পূরণীয়
করিয়া আশ্রয়।
সে অশুচি রতিগণ করে মোহে অনুষ্ঠান
অশুভনিচয়। ১০
আমরণ চিন্তাগ্রস্ত হইয়া অপরিমাণ,
কাম-উপভোগ ধ্রুব করে পরমার্থ জ্ঞান। ১১
শত আশাপাশে বদ্ধ, কামক্রোধ-পরায়ণ,
কামার্থ সঞ্চিতে অর্থ অন্যায় করে যতন। ১২
"আজ পাইলাম ইহা,—পাব এই মনোরথ,—
"এই আছে,—পুনঃ ধন ভবিষ্যতে হবে কত। ১৩
"বধিয়াছি ঐ শত্রু,—অপর করিব হত,—
"আমি প্রভু ভোগী, সিদ্ধ, বলবান, সুখী কত। ১৪
"ধনাঢ্য, স্বজনবান, কে আছে আমার মত ?
"করিব আমোদ, যজ্ঞ, দান"—কহে মূর্খ যত। ১৫
বহুধা বিভ্রান্তচিত্ত, মোহ-জালে সমাবৃত,
কামাসক্ত, কামভোগে নরকে হয় পতিত। ১৬

অনম্র, আত্ম-গর্ব্বিত, ধন-মান-মদান্বিত,
দম্ভেতে অবৈধ হয় নাম মাত্র যজ্ঞান্বিত। ১৭
অহঙ্কার-বল-দর্প-কাম-ক্রোধ সমাশ্রিত,
আত্ম-পর-দেহে দ্বেষে আমাকে অসূয়ান্বিত। ১৮
দ্বেষ্টা, ক্রূর, মন্দকারী, সংসারে যে নরাধম—
আসুরী যোনিতে আমি অজস্র করি ক্ষেপণ। ১৯
পাইয়া আসুরী যোনি জন্মে জন্মে মূঢ়মতি
না পেয়ে আমাকে, পার্থ! পায় ক্রমে অধোগতি। ২০
নরকের এই তিন আত্মবিনাশক দ্বার,—
কাম, ক্রোধ, আর লোভ, করিবে তা পরিহার। ২১
এই তিন তমোদ্বার বিমুক্ত হইয়া নর,
আচরিয়া আত্মশ্রেয়ঃ পায় গতি শ্রেষ্ঠতর। ২২
শাস্ত্রবিধি করে ত্যাগ যেই কামাচারী জন,
নাহি পায় সিদ্ধি সুখ, না পায় গতি পরম। ২৩
কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থায় শাস্ত্রই তব প্রমাণ;
শাস্ত্রবিধি মতে কর্ম্ম জানি কর অনুষ্ঠান। ২৪

ইতি দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগযোগ নাম
ষোড়শ অধ্যায়। ১৬।

সপ্তদশ অধ্যায়।

অর্জ্জুন কহিলেন।

শাস্ত্রবিধি ত্যজি যারা পূজে শ্রদ্ধান্বিত মন,
তাহাদের নিষ্ঠা, কৃষ্ণ! সত্ত্ব, রজঃ, কিবা তমঃ? ১

ভগবান্ কহিলেন।

দেহীদের স্বভাবজ সেই শ্রদ্ধা তিন মত,—
সাত্ত্বিকী, রাজসী, আর তামসী, শুন, ভারত। ২
সত্ত্ব অনুরূপী শ্রদ্ধা সকলের, হে ভারত!
শ্রদ্ধাময় নর,—যার, যাহা শ্রদ্ধা, সে সে মত। ৩
সাত্ত্বিক দেবতা পূজে যক্ষ রক্ষঃ রাজসিক,
ভূত প্রেতগণ অন্যে পূজে যারা তামসিক। ৪
অশাস্ত্রবিহিত ঘোর তপে যারা তপান্বিত,
দম্ভ-অহঙ্কার-যুক্ত, কাম রাগ বলান্বিত,
শরীরস্থ ভূতগণ, মূঢ়েরা করে ক্লেশিত—
অন্তরস্থ আমাকেও—আসুরী তারা নিশ্চিত।৬
আহারও সকলের তিনরূপ প্রিয় পুনঃ,
তথা যজ্ঞে, তপে, দানে আছে এই ভেদ, শুন। ৭
আয়ুঃ-সত্ত্ব বলারোগ্য-সুখ প্রীতি-বর্দ্ধনীয়,
রস্য, স্নিগ্ধ, হৃদগ্রাহী আহার সাত্ত্বিক-প্রিয়। ৮
অতি-উষ্ণ, কটু, অম্ল, তীক্ষ্ণ,
রুক্ষ, বিদাহক, লবণাক্ত আর,
দুঃখ-শোক-রোগপ্রদ, রাজসিক
জন-প্রিয় এ সব আহার। ৯
গত-যাম, গতরস, পূতি, বাসি দিনান্তর,
উচ্ছিষ্ট অশুদ্ধ যাহা, তামসের প্রিয় বড়। ১০
নিষ্কামীর দ্বারা যজ্ঞ বিধিমতে অনুষ্ঠিত ভাবে যে সাত্ত্বিক,
"মন সমাধান তরে কহিতেছি মাত্র যজ্ঞ,"—
সে যজ্ঞ সাত্ত্বিক। ১১
ফল দম্ভ তরে হয় অনুষ্ঠিত যেই সব,
রাজসিক যজ্ঞ তাহা জানিবে ভরতর্ষভ! ১২

বিধিহীন, অসৃষ্টান্ন দক্ষিণা-মন্ত্র-রহিত,
শ্রদ্ধাহীন যেই যজ্ঞ, তামস তাহা কথিত। ১৩
দেব-দ্বিজ-গুরু-প্রাজ্ঞ-পূজা, শৌচ, সরলতা,
শারীরিক তপ ইহা—ব্রহ্মচর্য্য, অহিংস্রতা। ১৪
অনুদ্বেগকর বাক্য, সত্য, প্রিয়, হিতকর,
স্বাধ্যায় অভ্যাস,—তপ বাঙ্ময়, হে বীরবর। ১৫
চিত্ত-প্রসন্নতা, সৌম্য, মৌন, আত্ম-নির্যাতন,
শুদ্ধভাব,—এই তপ মানস, কুরুনন্দন। ১৬
শ্রদ্ধাসহ অনাসক্ত যোগিগণ-অনুষ্ঠিত
এই তিন রূপ তপ, সাত্ত্বিক নামে কথিত। ১৭
সুখ্যাতি-মান-পূজার্থ দম্ভে অনুষ্ঠিত তপ,—
চঞ্চল অধ্রুব,—তাহা রাজসিক, পরন্তপ। ১৮
মূঢ়কৃত আত্ম-পীড়া দ্বারা তপ অনুষ্ঠিত,
কিংবা পর-বিনাশার্থ,—তামসিক অভিহিত। ১৯
জানিয়া দাতব্য মাত্র অনুপকারিকে দান
যথা দেশে, কালে পাত্রে,—
সাত্ত্বিক তাহার নাম। ২০
প্রতি-উপকার তরে, কিংবা ফল-কামনায়
ক্লিষ্টভাবে দেয় যাহা,—রাজস কহে তাহায়। ২১
অদেশে, অকালে যাহা অপাত্রেতে হয় দান
অশ্রদ্ধা অবজ্ঞা সহ,—তামস তাহার নাম। ২২
ও তৎসৎ—ব্রহ্মের এই ত্রিবিধ নাম আছে নির্দ্দেশিত,
পুরাকালে তাহা হ'তে বেদ যজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা
হয়েছে বিহিত। ২৩
সে হেতু উচ্চারি "ওম্" তপঃক্রিয়া যজ্ঞদান
হয় ব্রহ্মবাদীদের সতত যথাবিধান। ২৪

উচ্চারিয়া "তৎ" ফল-অভিসন্ধি তেয়াগিয়া,
মোক্ষার্থীরা করে নানা যজ্ঞ তপ দান ক্রিয়া। ২৫
সদ্ভাবে বা সাধুভাবে হয় "সৎ" প্রযোজিত,
প্রশস্ত কর্ম্মেতে তথা হয় তাহা নিয়োজিত। ২৬
যজ্ঞে তপে দানে নিষ্ঠা হয় "সৎ" উচ্চারিত;
তদর্থ কর্ম্মও হয় "সৎ" শব্দে অভিহিত। ২৭
অশ্রদ্ধায় হুত, দত্ত, কৃত, তপ অনুষ্ঠিত,
না ঐহিক, পারত্রিক; অসৎ তাহা বিদিত। ২৮
ইতি শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগ নাম
সপ্তদশ অধ্যায়। ১৭।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

অর্জ্জুন কহিলেন।

ত্যাগের ও সন্ন্যাসের, মহাবাহো। ইচ্ছা মম
জানিতে পৃথক তত্ত্ব, হে কৃষ্ণ কেশিসূদন। ১

ভগবান্ কহিলেন।

কাম্যকর্ম্ম-ত্যাগ কহে সন্ন্যাস সুকবিগণ;
সর্ব্বকর্ম্ম-ফল ত্যাগ, কহে ত্যাগ বিচক্ষণ। ২
কহেন মনীষী কেহ, কর্ম্ম মাত্র দোষবৎ কর পরিহার
অপরে কহেন পুনঃ, যজ্ঞ দান তপ কর্ম্ম
অত্যাজ্য তোমার। ৩
সেই ত্যাগে মম মত, ভারত। শুন নিশ্চিত।
বীরেন্দ্র! ত্রিবিধ ত্যাগ হইয়াছে প্রকীর্ত্তিত। ৪

যজ্ঞ দান তপ কর্ম্ম ত্যজিবে না কদাচিত,
যজ্ঞ দান তপে হয় মনীষীরা পবিত্রিত। ৫
ত্যজিয়া আসক্তি, ফল, কর্ত্তব্য ও কর্ম্মসব।
নিশ্চিত উত্তম মত এই মম, হে পাণ্ডব। ৬
নিয়ত কর্ম্মের ত্যাগ, অর্জ্জুন! নহে উচিত,
যেহেতু তাহার ত্যাগ তামস নামে কীর্ত্তিত। ৭
কায়-ক্লেশ ভয়ে কর্ম্ম দুঃখ ভাবি পরিহার,—
নাহি তাহে ত্যাগফল, রাজসিক নাম তাঁর। ৮
"ইহাই কর্ত্তব্য"—ভাবি যে কর্ম্ম করে নিয়ত,
ত্যজি ফলাসক্তি,—ত্যাগ সাত্ত্বিক তাহা, ভারত! ৯
না দ্বেষে অশুভ কর্ম্মে, শুভে অনুরক্ত নয়,
ত্যাগী, তত্ত্বভাবাপন্ন, মেধাবী, ছিন্ন-সংশয়। ১০
সম্পূর্ণ ত্যজিতে কর্ম্ম না পারে দেহী কখন,
যে কর্ম্ম-ফলের ত্যাগী, সেই ত্যাগী, বীরোত্তম। ১১
কর্ম্মের ত্রিবিধ ফল—অনিষ্ট, ইষ্ট, মিশ্রিত,—
ঘটে অত্যাগীর পরে, ত্যাগীর নহে কচিত। ১২
মহাবাহো! এই পঞ্চ কারণ হও বিদিত,
সর্ব্বকর্ম্ম-সিদ্ধি তরে কর্ম্মান্ত সাঙ্খ্যে কথিত। ১৩
অধিষ্ঠান—দেহ, কর্ত্তা, করণ—ইন্দ্রিয়গণ,
নানাবিধ চেষ্টা, দৈব, এই পঞ্চ, অরিন্দম! ১৪
শরীরে, বাক্যেতে, মনে যেই কর্ম্ম করে নর,—
ন্যায্য, কি অন্যায্য—হেতু এই পঞ্চ, কুরুবর। ১৫
তথায় আত্মাকে মাত্র দেখে কর্ত্তা যেই জন,
অকৃতবুদ্ধি বশতঃ—নাহি দেখে সে দুর্জ্জন। ১৬
নাহি অহঙ্কার-ভাব, নহে বুদ্ধি লিপ্ত যার,
বধি নাহি বধে লোক, নহে নিবদ্ধিত আর। ১৭

জ্ঞান, জ্ঞেয়, পরিজ্ঞাতা,—কর্ম্মপ্রবর্ত্তক ত্রয় ;
কারণ, কর্ম্ম ও কর্ত্তা,—এই তিন কর্ম্মাশ্রয়। ১৮
জ্ঞান, কর্ম্ম, কর্ত্তা, পার্থ! গুণ-ভেদে তিন মত
গুণ-সংখ্যা শাস্ত্রমতে,—শুন তাহা যথাবত। ১৯
সর্ব্বভূতে যাতে দেখে একই ভাব অব্যয়,—
বিভক্ততে অবিভক্ত,—সে জ্ঞান সাত্ত্বিক কয়। ২০
পৃথক্‌বিধ নানাভাব পৃথকত্বে যেই জ্ঞান
জ্ঞানে সর্ব্ব ভূতদের,—রাজস তাহার নাম। ২১
যাহা সর্ব্বেসর্ব্বা জানি অহেতুক অযথার্থ
এক অল্প কার্য্যাসক্ত,—তাহাই তামস, পার্থ! ২২
নিয়ত, আসক্তিহীন, অরাগ-অদ্বেষ-কৃত,
নিষ্কামীর কৃত কর্ম্ম,—সাত্ত্বিক তাহা কথিত। ২৩
অহঙ্কারে কামেচ্ছায় হয় যেই কর্ম্ম কৃত
বহুল আয়াস সহ,—রাজস সে অভিহিত। ২৪
পরিণাম, ক্ষতি, হিংসা, সামর্থ, না করি জ্ঞান,
মোহে প্রবর্ত্তিত কর্ম্ম,—তামস তাহার নাম। ২৫
নিষ্কাম, অনহঙ্কার, ধৃতিযুক্ত, উৎসাহিত,
সিদ্ধাসিদ্ধে নির্ব্বিকার,—সাত্ত্বিক কর্ত্তা কথিত। ২৬
রাগী, ফলাকাঙ্ক্ষী, লোভী, অশুচি ও হিংসাপর,
হর্ষ-শোকান্বিত,—কর্ত্তা রাজস, হে বীরবর! ২৭
অসভ্য, অসমাহিত, শঠ,
পর-অপকারী, অনম্র, অলস,
কর্ত্তব্যে বিষাদ-পর, দীর্ঘসূত্রী যেই জন,
—সে কর্ত্তা তামস। ২৮
বুদ্ধি ও ধৃতির ভেদ গুণতঃ ত্রিবিধ হয় ;
পৃথক অশেষ রূপে কহিতেছি, ধনঞ্জয়! ২৯

প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, কার্য্য ও অকার্য্য, ভয়, অভয়,
বন্ধ, মোক্ষ জানি যাহে,—সে বুদ্ধি সাত্ত্বিকী কয়। ৩০
যাহাতে ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, কার্য্য ও অকার্য্য আর,
হয় জ্ঞান অসম্পূর্ণ,—রাজসী নাম তাহার। ৩১
অধর্ম্মকে ধর্ম্ম ভাবে যেই বুদ্ধি তমাবৃত,
বুঝে সব বিপরীত,—তামসী তাহা কথিত। ৩২
মন প্রাণেন্দ্রিয়-ক্রিয়া যে ধৃতি করে ধারণ
একাগ্র যোগেতে, ধৃতি সাত্ত্বিকী তা, অরিন্দম। ৩৩
যে ধৃতি করে ধারণ ধর্ম্মকাম অর্থ পুনঃ
প্রসঙ্গতঃ ফলাকাঙ্ক্ষী,—রাজসী তাহা, অর্জ্জুন। ৩৪
যার বলে স্বপ্ন, ভয়, শোক, দুঃখ, অহঙ্কার,
নাহি ছাড়ে মূঢ়—ধৃতি তামসী নাম তাহার। ৩৫
এখন ত্রিবিধ সুখ শুন, যাতে, হে পাণ্ডব!
অভ্যাসেতে হয় রতি, অন্ত হয় দুঃখ সব। ৩৬
যাহা অগ্রে বিষবৎ পরিণামে হয়
জ্ঞান অমৃত অধিক,
আত্ম-বিষয়িনী-বুদ্ধি প্রসাদেতে উপজিত,—
সে সুখ সাত্ত্বিক। ৩৭
বিষয়ে ইন্দ্রিয় যোগে অগ্রে যাহা সুধাধিক,
পরিণামে বিষবৎ,—সেই সুখ রাজসিক। ৩৮
কিবা অগ্রে, পরিণামে যাহা আত্ম-মোহকর—
নিদ্রালস্য-প্রম-জাত,—তামস সে, বীরবর। ৩৯
নাহি পৃথিবীতে, স্বর্গে দেবগণে, কদাচন
প্রকৃতিজ এই তিন গুণ-মুক্ত যেই জন। ৪০
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রদের, বীরর্ষভ!
স্বভাব-সম্ভূত গুণে প্রবিভক্ত কর্ম্ম সব। ৪১

শম, দম, তপ, শৌচ, সরলতা, ক্ষমা-ব্রত,
আস্তিক্য, বিজ্ঞান, জ্ঞান,—ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবতঃ। ৪২
শৌর্য্য, ধৈর্য্য, তেজ, দাক্ষ্য, যুদ্ধেতে স্থির নির্ভীক,
দান, ধর্ম্মভাব,—কর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক। ৪৩
গোরক্ষা, কৃষি, বাণিজ্য,—বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবতঃ।
পরিচর্য্যাত্মক কর্ম্ম শূদ্রদের সেই মত। ৪৪
স্ব স্ব কর্ম্মে রত নর পায় সিদ্ধি, হে অর্জ্জুন!
স্বকর্ম্মনিরত সিদ্ধি পায় যথা বলি, শুন। ৪৫
প্রাণীর প্রবৃত্তিদাতা, যিনি ব্যাপ্ত চরাচর,
স্বকর্ম্মে পূজিয়া তাঁকে সিদ্ধিলাভ করে নর। ৪৬

সগুণ-সু-অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম হ'তে
শ্রেয়ঃ স্বধর্ম্ম বিগুণ;
স্বভাব-নিয়ত কর্ম্ম করিলে,
কদাচ পাপ না হয়, অর্জ্জুন! ৪৭
সদোষ হ'লেও নাহি কদাচ
সহজ কর্ম্ম করিবে বর্জ্জিত;
ধূমাবৃত অগ্নি মত, সর্ব্ব কর্ম্মারম্ভ
থাকে দোষে আবরিত। ৪৮

সর্ব্বত্রে অসক্তবুদ্ধি, জিতাত্মা, নিস্পৃহ জন,
সন্ন্যাসেতে করে লাভ নৈষ্কর্ম্মসিদ্ধি পরম। ৪৯
সিদ্ধি প্রাপ্ত যেই রূপে পায় ব্রহ্ম, হে অর্জ্জুন!
জ্ঞানের পরম নিষ্ঠা যাহা, সংক্ষেপেতে শুন। ৫০
শুদ্ধবুদ্ধি, ধৃতিবলে আত্মা যার নিয়মিত,
শব্দাদি বিষয়ত্যাগী, রাগ-দ্বেষ-বিবর্জ্জিত,

নিরজনবাসী লঘু-আহারী,
সংযত যার বাক্য, কায়, মন,

নিত্য ধ্যান-যোগ-পর, বৈরাগ্য
সম্যক যার হয়েছে গ্রহণ,
অহঙ্কার, বল, দর্প, ক্রোধ, পরিগ্রহ, কাম
ত্যজিয়া,—নির্ম্মম, শান্ত, ব্রহ্মে করে অবস্থান। ৫১—৫৩
ব্রহ্মভূত, প্রসন্নাত্মা, না করে আকাঙ্ক্ষা শোক,
সর্ব্বসমদর্শী, লভে মদ্ভক্তি—পরম লোক। ৫৪
ভক্তিতে যথার্থ জানে,—আমি সর্ব্ব চরাচর ;
জানি তত্ত্বে আমাকেই করে লাভ অনন্তর। ৫৫
করিলেও সর্ব্ব কর্ম্ম সদা মদাশ্রয়গত,
মম প্রসাদেতে পায় অব্যয় পদ শাশ্বত। ৫৬
চিত্ত দ্বারা সর্ব্ব কর্ম্ম আমাতে অর্পি মৎপর,
বুদ্ধি যোগাশ্রয়ে হও মৎচিত্ত নিরন্তর। ৫৭
মচ্চিত্ত, প্রসাদে মম হও সর্ব্ব দুঃখ পার ;
হবে নষ্ট, নাহি শুন যদি করি অহঙ্কার। ৫৮
"করিব না যুদ্ধ"—ইহা ভাবিছ যে
অহঙ্কার করিয়া সহায়,
মিথ্যা সে সঙ্কল্প তব, প্রকৃতিই
নিয়োজিত করিবে তোমায়। ৫৯
স্বভাবজ স্বীয় কর্ম্মে নিবদ্ধ হ'য়েও যাহা
করিতে মোহে অনিচ্ছু, অবশে করিবে তাহা। ৬০
সর্ব্বভূত-হৃদয়েতে বিরাজিত,
হে অর্জ্জুন! আছেন ঈশ্বর ;
যন্ত্রারূঢ় সর্ব্ব ভূত মায়াবলে
ভ্রাম্যমাণ করি নিরন্তর। ৬১
তাঁহার শরণ লও সর্ব্বভাবে, হে ভারত!
তাঁহার প্রসাদে পাবে শান্তি ও স্থান শাশ্বত। ৬২

গুহ্য হ'তে গুহ্যতর কহিনু জ্ঞান, পাণ্ডব!
বুঝিয়া অশেষ মতে কর যাহা ইচ্ছা তব। ৬৩
পুনঃ গুহ্যতম কথা শুন মম, বীরর্ষভ!
তুমি অতি প্রিয় মম, কহিতেছি হিত তব। ৬৪
মদ্ভক্ত, মদ্গত-চিত্ত, হও মম উপাসক,
কর নমস্কার।
আমাকে পাইবে সত্য,—প্রিয় তুমি, তব কাছে
প্রতিজ্ঞা আমার। ৬৫
তেয়াগিয়া সর্ব্ব ধর্ম্ম, লও তুমি
একমাত্র শরণ আমার।
করিও না শোক, পার্থ! সর্ব্বপাপ
হ'তে আমি করিব উদ্ধার। ৬৬
তপস্যা-শুশ্রূষা-ভক্তি-বিহীন নিন্দকে মম,
আমার এ কথা তুমি কহিবে না কদাচন। ৬৭
এ পরম গুহ্য তত্ত্ব, যে মম ভক্তকে কয়
পরম ভক্তিতে, পাবে আমাকে সে
অসংশয়। ৬৮
তাহা হ'তে মনুষ্যেতে নাহি মম প্রিয়কারী,
নাহি হবে প্রিয়তর এ ভবে, গাণ্ডীব-ধারি! ৬৯
আমাদের এ ধর্ম্মকথা যে করিবে অধ্যয়ন,
জ্ঞান-যজ্ঞে আমারে সে পূজিবে,—
এ মত মম। ৭০
শুনে ইহা যেই নর, অনসূয়, শ্রদ্ধাবান,
সেও মুক্ত, পায় পুণ্যকারীদের শুভধাম। ৭১
একাগ্রচিত্তে কি, পার্থ! করিলে ইহা শ্রবণ?
অজ্ঞানজ মোহ তব হইল কি বিমোচন? ৭২

অর্জ্জুন কহিলেন।

নষ্ট মোহ, স্মৃতি-লাভ, হয়েছে প্রসাদে তব,—
গত ভ্রান্তি মম; আজ্ঞা পালিব তব, কেশব। ৭৩

সঞ্জয় কহিলেন।

মহাত্মা কৃষ্ণের আর পার্থের, হে নৃপোত্তম!
শুনিলাম এ সংবাদ অদ্ভুত, লোমহর্ষণ। ৭৪
শুনিনু ব্যাস-প্রসাদে এ গুহ্য যোগ পরম,
সাক্ষাৎ যোগেশ্বর কৃষ্ণ কহিতে পার্থে স্বয়ম। ৭৫
কৃষ্ণার্জ্জুন এ সংবাদ, অদ্ভুত ও পুণ্যাধার,
স্মরিয়া, স্মরিয়া হৃষ্ট হইতেছি বারংবার। ৭
হরির অদ্ভুত রূপ স্মরিয়া স্মরিয়া আর
হতেছে বিস্ময় মহা, হৃষ্ট চিত্ত বারংবার। ৭৭
যথা যোগেশ্বর কৃষ্ণ, যথা পার্থ ধনুর্দ্ধর,
তথা শ্রী, বিজয়োন্নতি, নীতি ধ্রুব, নৃপবর! ৭৮

ইতি মহাভারতান্তর্গত-ভীষ্মপর্ব্বে যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন
সংবাদে মোক্ষযোগ নাম অষ্টাদশ অধ্যায়। ১৮।

সমাপ্ত।

মার্কণ্ডেয় চণ্ডী।

বড় অদ্ভুত গ্রন্থ—মার্কণ্ডেয় ঠাকুরের এই চণ্ডী খানি। শূকর-ভোজীদের হাতে সমস্ত ক্ষিতিমণ্ডলের রাজা সুরথ অর্দ্ধচন্দ্র লাভ করিয়া বনে যাইতেছিলেন—পথে সমাধি নামক বৈশ্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। তিনিও তাঁহার স্ত্রীপুত্রের কাছে অর্দ্ধচন্দ্র খাইয়া একই পথ অনুসরণ করিতেছেন। দুজনেই মেধস ঋষির আশ্রমে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ঠাকুর! এরূপ অর্দ্ধচন্দ্র খাইয়াও আমার রাজ্যের প্রতি এবং বৈশ্যজের এমন আদর্শ স্ত্রীপুত্রের প্রতি মমতা হইতেছে কেন?"

তখন ঋষি ঠাকুর, একটি দিগ্‌গজ দার্শনিক, উত্তর দিলেন—

"পতিত মমতাবর্ত্তে, মোহ-গর্ত্তে জীব যত
সংসার স্থিতিকারীর মহামায়া প্রভাবতঃ।" ১ মা ৪০

সুরথ জিজ্ঞসা করিলেন মহামায়াটা কে?

উত্তর—

নিত্য সে জগত মূর্ত্তি ব্যাপ্ত আছে চরাচর।" ১ মা, ৪৭

আবার—

"সেই নিত্য অভিহিতা হন আবির্ভূতা যবে
দেবকার্য্য সিদ্ধি তরে, উৎপন্না কহে তবে।" ১ মা, ৪৮

তখন এই কথা বুঝাইতে মেধস্ ঠাকুর কতকগুলি আষাঢ়ে গল্প ছাড়িলেন।

সমস্ত বিশ্ব একার্ণবে পরিণত। ভগবান্ নিদ্রার শেষশয্যায় শয়িত। তাঁহার কাণের ময়লা হইতে মধু আর কৈটভ নামক দুই অসুর জন্মিয়া তাঁহার নাভিপদ্মস্থিত ব্রহ্মপ্রজাপতিকে বধ করিতে উদ্যত হইল। তখন প্রাণের দায়ে ব্রহ্মা নিদ্রাদেবীর কাছে মহা কান্না আরম্ভ করিলেন। খোসামুদিটি কেবল হালে প্রচলিত হয় নাই। তিনি নিদ্রাদেবীকে জগৎসংসারের সর্ব্বেসর্ব্বা বলিয়া স্তব করিলেন, নিদ্রাপ্রিয় বাঙ্গালীর পক্ষে এতদপেক্ষা সুখকর আর কি হইতে পারে? দেবী নারায়ণের সর্ব্ব-শরীর হইতে নির্গতা হইলেন। "নিদ্রামুক্ত জগন্নাথ" দুরাত্মা মধু-কৈটভের সঙ্গে পঞ্চসহস্র বৎসর বাহুযুদ্ধ করিলেন। অসুর দুটা বড় Noble fellows ছিল। যখন দেখিল যে নারায়ণ কিছুতেই কাওটার কিনারা করিতে পারিতেছেন না, তখন তাহাদের মনে লোকটার প্রতি দয়া হইল। তাহারা বলিল—"আচ্ছা বর লও।" নারায়ণ বলিলেন—"আর কি ছাই বর লইব। আমার বধ্য হও।" একেবারে প্রাণ ধরিয়া টান—তখন অসুর দুটা কিঞ্চিৎ Diplomacy (কূটনীতি) খাটাইয়া বলিল—"জল নাই এমন স্থানে আমাদিগকে বধ কর।" সর্ব্বত্র জল, অতএব হরি নিজ ঊরুর উপর রাখিয়া তাহাদের মাথা চক্রে কাটিয়া ফেলিলেন। চণ্ডীর প্রথম মাহাত্ম্য শেষ হইল।

[দ্বিতীয় মাহাত্ম্য]

অসুররাজ মহিষে এবং দেবরাজ পুরন্দরে শতাব্দ ব্যাপিয়া যুদ্ধ। বলা বাহুল্য, দেবরাজ পরাজিত হইলেন। এরূপ অবস্থায় তাঁহাদের উপাসকেরা যেরূপ Political agitation বা রাজনৈতিক আন্দোলন অবলম্বন করেন

দেবতারাও তাহাই করিলেন। তাঁহারা এক Deputaion (দল). বাঁধিয়া ঈশান এবং বিষ্ণুর কাছে গিয়া এক emorial বা দরখাস্ত করিলেন। গৃহের চতুঃসীমার মধ্যে, গৃহিণীর সান্নিধ্যে, কেবল আমরা, বাঙ্গালীরা যে মহাতেজস্বী, তাহা নহে—আমাদের দেবতাদেরও তখন তেজ উথলিয়া পড়ে। সকল দেবতাদের অঙ্গ হইতে এক একটি তেজ বিনিঃসৃত হইয়া একটি অতি জাঁকাল তেজের তিলোত্তমা সৃষ্টি হইল। দেবতারা সকলে তাঁহাকে স্ব স্ব অস্ত্র অর্পণ করিলে, তিনি সিংহে চড়িয়া প্রথমে চিক্ষুরাখ্য বিড়ালাখ্য মহাহনু প্রভৃতি মহিষাসুরের Monster সেনাপতিগণের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

[তৃতীয় মাহাত্ম্য]

তাহাদিগকে বধ করিলে খোদ মহিষাসুর যুদ্ধে উপস্থিত হইলেন, সে সত্য সত্যই একটা প্রকাণ্ড মহিষ—তুণ্ডে,খুরে, লেজে তোলপাড় করিয়া ফেলিল! মহীতল খুরক্ষুণ্ণ করিল, শৃঙ্গেতে উচ্চ অচল ছুড়িয়া মারিল, লেজের বাড়িতে সমুদ্রের সম্যক্ জল ডাঙ্গায় ফেলিয়া দিল, শৃঙ্গে মেঘসকল খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। মহিষটা আবার বহুরূপীও সাজিল। মাথা কাটিলে খড়্গপাণি মহাবীর হইয়া দেখা দিল! তার পর মহাগজমূর্ত্তি ধারণ করিল। তার পর নিজ মহিষমূর্ত্তিতে যুদ্ধ করিতে লাগিল। দেবী একেবারে exhausted বা অবসন্না হইয়া পড়িলেন। হাজার হউক মেয়ে মানুষ। তখন কিঞ্চিৎ Stimulent বা সুরাসেবা করিতে করিতে বলিলেন—

"গর্জ্জ গর্জ্জ মূঢ়! মধু পান করি যতক্ষণ।
তোমাকে বধিলে শীঘ্র গর্জ্জিবেন দেবগণ।" ৩য়, ৩৬

তার পর একেবারে দুর্গোৎসব—

ইহা কহি এক লম্ফে আরোহিয়া ক্রোধাকুল
অসুরে আক্রমি, পদে কণ্ঠে হানিলেন শূল। ৩৭
তখন সে পদাক্রান্ত হ'লে অর্দ্ধ বিনিষ্কৃত
নিজ মুখ হ'তে হলো, দেবীর বীর্য্যে সংবৃত। ৩৮
যুঝিলেক মহাসুর হয়ে অর্দ্ধ বিনির্গত,
অসিতে কাটিয়া শির দেবী করিলেন হত।" ৩৯

দেবতারা তখন খুব নাচ গান করিয়া বাঙ্গালীর Inaugurate বা দুর্গোৎসব প্রচলিত করিলেন।

[চতুর্থ মাহাত্ম্য]

দেবতারা মহা সমারোহে একটি লম্বা চৌড়া Thanksgiving service বা ধন্যবাদপর্ব্ব সম্পাদন করিলে, দেবী বিপদের সময় দেখা দিবেন বলিয়া পেট ভরিয়া খোসামুদি খাইয়া গা-ঢাকা দিলেন।

[পঞ্চম মাহাত্ম্য]

দেবতাগণের আবার বিপদ। শুম্ভ নিশুম্ভ দুই ভাই অসুর, তাঁহাদিগকে একেবারে বেদখল করিয়া দিয়াছে। তাঁহারা আবার একটী Monster Meeting করিয়া Resoluion (প্রতিজ্ঞা) করিলেন যে, এবার আর ঈশান বিষ্ণুর কাছে একেবারে Directly না গিয়া সেই বিষ্ণুমায়া ঠাকুরাণীর কাছে যাইবেন। নাগেশ্বর হিমাচলে—তখনও সিমলা দার্জিলিঙ্গ ভবে ছিল—Her Excellency বা ঠাকুরাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে, তাঁহারা আর একটী দীর্ঘ Memorial বা দরখাস্ত পাঠ করিলেন। এইটী আমাদের খাঁটি দরবা'রে ধরণের—আলা গোড়া খোসামুদি ও সেলাম। "নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ"—খোসামুদিটা অমোঘ অস্ত্র, কখনও বিফল হয় না। কবিরা যে রমণীগণকে ভুজঙ্গের সঙ্গে তুলনা করিয়া থাকেন, কথাটা নিতান্ত কবি-কল্পনা

নহে। দেবী আপনার দেহ-কোষ হইতে কালিকা ঠাকুরাণীকে বিনিঃসৃত করিয়া বেদখল দেবতাদিগকে দখল দেওয়াইবার জন্য নিযুক্ত করিলেন। তিনি একটুকু Humourous Procedure বা রসিকা কার্য্যপ্রণালী করিলেন। কালোরূপে হিমাচলটা আলো করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। দেখিয়া চণ্ড মুণ্ডের মুণ্ড ঘুরিল। তাহারা যাইয়া শুম্ভকে বলিল—"প্রভো তোমরা দেবতাদের—

"এরূপে সমস্ত রত্ন করিয়াছ আহরণ, ?"
কল্যাণী স্ত্রীরত্ন কেন কর না তবে গ্রহণ" ৫৩

"স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি"—শুম্ভ তাহা জানিতেন। প্রীতিতে মেয়ে মানুষকে আনিতে সুগ্রীব দূতকে প্রেরণ করিলেন। ঠাকুরাণীটি রসিকা। তিনি বলিলেন—কথাটি ঠিক। শুম্ভ ও নিশুম্ভ এমন বীর্য্যবান্ই বটে। কিন্তু পূর্ব্বে অত্যল্পবুদ্ধিহেতু প্রতিজ্ঞা করিয়াছি—

"যে আমাকে জিনে রণে, করে দর্প চূর্ণ মম,
যে আমার প্রতিযোগী—ভর্ত্তা হবে সেই জন।" ৬৯

শুম্ভ নিশুম্ভের সঙ্গে লড়াই! সুগ্রীব বুঝিল মেয়ে মানুষটা পাগল। সে তখন কিঞ্চিৎ গরম হইয়া ধমকাইল। মিষ্টি মুখে না যান, ত চুলে ধরিয়া নিবে। কিন্তু ঠাকুরাণীট তাহাতে টলিলেন না।

[ষষ্ঠ মাহাত্ম্য]

শুম্ভ শুনিয়া চটিয়া লাল। ধূম্রলোচনকে ডাকিয়া বলিলেন—

"হে ধূম্রলোচন! তুমি বেষ্টিত স্বসৈন্য গণে
আন বলে সে দুষ্টাকে বিহ্বলা কেশাকর্ষণে। ৩

পরিত্রাণকারী তার থাকে যদি কোন জন,
হউক অমর, যক্ষ, গন্ধর্ব—করি' হনন।" ৪

তখন ধূম্রলোচন দেবীর কাছে গিয়া কহিল—"ওগো ভাল মানুসের মেয়ে।

"প্রীতিতে প্রভুর কাছে না যাও যদি, অবলা,
নিব তবে ধরি বলে কেশাকর্ষণে বিহ্বলা।"
দেবী বলিলেন, তাহা হইলে নাগর—
"বলে যদি নেও তুমি, কি আর করিব আমি।"

ধরিতে হাত বাড়াইবামাত্র ধূম্রলোচন এক হুঙ্কারে, ধূম্র হইয়া গেল। তখন দেবীর সিংহ মহাত্মা যথেষ্টরূপে উদরপূরণ করিলেন। শুনিয়া প্রস্ফুরিতাধর শুম্ভ চণ্ড-মুণ্ডকে হুকুম দিলেন—"সিংহটাকে মারিয়া স্ত্রীলোকটীকে চুলে ধরিয়া আন।" বামাঙ্গিনীদের চিরকালই চুল লইয়া দুর্গতি।

[সপ্তম মাহাত্ম্য

চণ্ড মুণ্ড আপনার ফাঁদে আপনি পড়িয়া যুদ্ধে অগ্রসর। তখন

"অম্বিকা করিলা অতি কোপ অরিগণ প্রতি,
ক্রোধে মসীবর্ণ মুখ হইল ভীষণ অতি। ৪
ললাট ফলক হ'তে ভ্রূকুটি-কুটিলাননী
করালবদনা কালী জন্মিলা অসিপাশিনী। ৫
চিতাকাষ্ঠ করে ধরি, নরমালা বিভূষণা,
ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিধানা শুষ্ক মাংস
কি ভীষণ লোল জিহ্বা কিবা মুখ বিস্তারিত,
নিমগ্ন রক্ত নয়ন দিঙ্মুখ নাদে পূরিত। ৭

ইনি মাহুত ও যোধঘণ্টাসমন্বিত আস্ত হাতীগুলো গিলিয়া ফেলিতে লাগিলেন। শুধু তাহা নহে, হাতি তবু খাদ্য—কাষ্ঠের রথগুলো পর্য্যন্ত খাইতে লাগিলেন। অতএব চণ্ড মুণ্ডের ভবলীলা শীঘ্র শেষ হইল। তিনি তাহাদের মুণ্ড লইয়া কল্যাণী চণ্ডিকাকে উপঢৌকন দিলে, চণ্ডিকা তাঁহাকে চামুণ্ডা Title বা উপাধি দিলেন। আমাদের গবর্ণমেণ্টও যদি রাজ্যশূন্য ব্যক্তিগণকে রাজা ও রাণী উপাধি না দিয়া চামুণ্ড ও চামুণ্ডা উপাধি দেন, তাহা হইলে, উপাধিটী উভয়বিধ অর্থ ও শাস্ত্রসঙ্গত হয়।

[অষ্টম মাহাত্ম্য]

শুম্ভ তখন নানাজাতীয় বিকৃতনামা দৈত্য-সৈন্য-সহ রক্তবীজকে যুদ্ধে পাঠাইলেন। এমন সময় আবার দেবী-দেহ হইতে "শতশিবা নিনাদিনী" আর এক সংস্করণ নির্গত হইল। নাম শিবদূতী। তখন দেবতাদের শরীর হইতেও ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, নারসিংহী, ঐন্দ্রী নির্গত হইয়া তাঁহার সঙ্গে যোগ দিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সংস্করণ প্রসবে রক্তবীজ দেবতাদের অপেক্ষাও পটু। তাহার এক একটী রক্তবিন্দু ভূমিতে পড়িলে এক একটি রক্তবীজ জন্মায়। বড় বিভ্রাটেরই কথা। তখন এ বন্দবস্ত হইল যে, রক্ত মাটিতে না পড়িতে কালীঠাকুরাণী গিলিয়া ফেলিবেন। চণ্ডিকা এইরূপে এই পৌরাণিক পুরুভুজকে ধ্বংস করিলেন।

[নবম মাহাত্ম্য]

খবর শুনিয়া শুম্ভ নিশুম্ভ অতুল কোপ করিলেন। দেবতারা দেবীকে In anticipation of জয়—বা জয় হইবার পূর্ব্বেই জয়া উপাধি দিলেন। ভরসা করি উপাধিব্যাধিগ্রস্তেরা এই নূতন

প্রণালীটী গবর্ণমেণ্টের গোচর করাইবেন। চণ্ডিকা শূলে নিশুম্ভের বুক বিদ্ধ করিলে—

"শূল-ভিন্ন বক্ষ হ'তে জনমি' পুরুষ আর—
মহাবল মহাবীর্য্য কহে 'তিষ্ঠ' বারংবার।" ৩৩

দেবী সেই "নিষ্ক্রান্ত ও খড়্গান্বিত শির" কাটিয়া ফেলিলে আর পাঁচ ঠাকুরাণীরা মিলিয়া মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দিলেন।

[দশম মাহাত্ম্য]

শুম্ভ তখন বলিল যুদ্ধটা কিছু Unfair (অন্যায়) হইতেছে—

"বলোন্মত্তা দুষ্টে! দুর্গে! হইও না গরবি ।
অন্য বলাশ্রয়ে তুমি যুঝিছ অভিমানিনী। ২

দেবী একটু Diplomacy বা কূটনীতি খাটাইয়া বলিলেন— "বা! অন্য বল কোথায়?"—

"এ জগতে একা আমি, কে মম দ্বিতীয় আর?
আমাতে পশিছে দেখ বিভূতিচয় আমার।" ৩

তখন ঠাকুরাণীরা সকলে গা-ঢাকা দিলেন। দেবী শূলের দ্বারা শুম্ভেরও বক্ষ বিদীর্ণ করিলে—

"মরিল সে পড়ি ভূমে—দেবী-শূলাগ্র-বিক্ষত।
কাঁপিল সকল পৃথ্বী সসিন্ধু দ্বীপ-পর্ব্বত। ২৩
হত হ'লে দুরাত্মন্ প্রসন্ন হইল ভব।
জগত লভিল স্বাস্থ্য, নির্ম্মল হইল নভ। ২৪
উল্কা সহ মেঘোৎপাত হ'ল সব প্রশমিত,
নিরাপদ নদী পথ হইলে সে নিপাতিত। ২৫
বহিল পুণ্য-বাতাস, সুপ্রভাত আখণ্ডল,
জ্বলিল শান্ত অনল, শান্ত দিক্ কোলাহল। ২৬

বাপ! কি কাণ্ডখানা! বলা বাহুল্য যে ভীরু দেবতাগুলো তখন খুব নাচ গান আরম্ভ করিল। তাঁহারা যুদ্ধ কার্য্য গৃহিণীদের দ্বারা নির্ব্বাহ করাইতেনই, নাচ বাদ্যটাও গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরার উপর বরাদ্দ ছিল। আমাদের মত সে শ্রমটুকুও তাঁহারা নিজে স্বীকার করিতেন না।

[একাদশ মাহাত্ম্য]

তার পর দেবতারা সকলে মিলিয়া আর একটি লম্বা চৌড়া Thanks giving service বা ধন্যবাদপর্ব্ব নির্ব্বাহ করিলেন। এই কাপুরুষ দেবতারা একটা মুস্কিলে পড়িলেই দেবী নানা বিকট অদ্ভুত রূপ ধরিয়া তাহাদের রক্ষা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতা হইলেন।

[দ্বাদশ মাহাত্ম্য]

শুধু তাহা নহে। দেবী তাহার পর একটা দীর্ঘ বিজ্ঞানের দ্বারা তাঁহার উপর্য্যুক্ত চরিতাবলী পাঠের যেরূপ ফল ব্যাখ্যা করিলেন তাহার কাছে হলওয়েব বটিকা কোথায় লাগে? সকল রোগ ত প্রশমিত হইবেই. তাহা ছাড়া ভূভারতে এমন কিছু নাই, যাহা উহার দ্বারা পাওয়া যাইবে না। ইহা কহিয়া তিনি চলিয়া গেলে, দেবতারা অবশিষ্ট অসুরগণকে পাতালে প্রেরণ করিয়া—তখনও Transportation ছিল—আপন আপন অধিকার দখল করিলেন।

মেধস ঋষি কহিলেন—

"এইরূপে ভগবতী পুনঃ পুনঃ সর্ব্বক্ষণ
জগত-পালন তরে লভেন, ভূপ। জনম।
বিশ্বের প্রসূতি তিনি, তাঁহাতে বিশ্ব মোহিত,
করেন পূজিতা হ'লে জ্ঞানোন্নতি প্রদানিত।

মহামারী স্বরূপেতে মহাকালী চরাচর
করেন সকল ব্যাপ্ত মহা কালে নৃপবর।
তিনি কালে মহামারী, তিনি সৃষ্টিপ্রসবিনী,
রক্ষেন সকল ভূত কালে সেই সনাতনী।
নরের উন্নতি-কালে লক্ষ্মী-বৃদ্ধি-প্রদায়িনী।
বিনাশ সময়ে তথা অলক্ষ্মী ধ্বংসকারিণী।
পুষ্প, ধূপ গন্ধাদিতে করিলে পূজা তাঁহার,
প্রদানেন বিত্ত পুত্র, ধর্ম্মমতি শুভ আর।" ৩৫—৪১

বেশ কথা! কিন্তু দুর্গাপূজায় সময়ে যে মহিষাসুরের এবং অজাসুরের গরিব বাছাদিগকে সবংশে বিনাশ করা হয়, কই তাহার ত কোনও বিধান এখানে নাই। উপরে একস্থানে পশু কথাটা আছে বটে, তেমন আর এক স্থানে চণ্ডমুণ্ডকে "মহাপশু" বলা হইয়াছে। পশুহননের কথা কোথাও নাই।

[ত্রয়োদশ মাহাত্ম্য]

এই সকল গল্প শুনিয়া সুরথ রাজা আর বৈশ্যজ—
"দেবীর মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি পুলিনে সৃজি উভয়ে,
দেবী সূক্ত জপি' তপে রহিলেন লীন হ'য়ে।
কভু মিতাহার করি, কভু নিরাহার-ব্রত
সাধি' থাকিলেন তাঁর ধ্যানে মগ্ন অবিরত।
পুষ্প-ধূপ-হোম-দানে করিলেন পূজা তাঁর
স্ব স্ব দেহজাত রক্ত দিয়া বলি-উপহার।" ১৩শ, ১০

ও হরি! তবে 'বলি' শব্দের অর্থ অজ ও মহিষ মুণ্ডচ্ছেদন নহে? আর আমরা কি "নিজ গাত্ররক্তের" পরিবর্ত্তে পাঁঠার রক্ত দিয়া থাকি? এই সমশ্রেণীকতা তবে অজপুত্রদের গৌরবের

সুরথ রাজা ইহজন্মে নিজ রাজ্য ও অন্য জন্মে অক্ষয় রাজ্য চাহিলেন, আর—

"দুঃখিত মানসে বৈশ্য মাগিলেন বরদান
আমার কি? আমি কিবা? আসক্তি নাশক জ্ঞান" ১১

রাজজাতীয় লোকগুলা কি চিরকালই ঘোরতর স্বার্থ-পরায়ণ? দেবী উভয়কে বর দিয়া চলিয়া গেলেন। সুরথ অন্য জন্মে সাবর্ণি মনু হইলেন। চণ্ডীমাহাত্ম্য এখানে শেষ হইল।

এখন কথাটা হইতেছে, মার্কণ্ডেয় ঠাকুর যে নিতান্ত গঞ্জিকা দেবীর সেবক ছিলেন, চণ্ডীখানি পড়িয়াও এমন বোধ হয় না। তিনি স্থানে স্থানে অতি উচ্চ অঙ্গের কবিত্ব ও দার্শনিকত্ব দেখাইয়াছেন। তিনি ইচ্ছা করিলে যে আমাদের তৃতীয় শ্রেণীর উপন্যাসলেখকের ন্যায়ও একটি গল্প ছাঁদিতে পারিতেন না, এখনও বোধ হয় না। তবে এরূপ আষাঢ়ে গল্প লিখিলেন কেন। ইহার ভিতর কি আর কোন অর্থ আছে? আজ কালের দিনে যাঁহারা পুরাতন শাস্ত্রের আধ্যাত্মিক অর্থ ব্যবসায় করিতেছেন, মনে করিলাম তাঁহাদের কাহারও কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইব। এমন সময়ে এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি উপস্থিত, আমি মেজাজটি পঞ্চমে চড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"তুমি কে?" সে মেজাজটা একেবারে সপ্তমে তুলিয়া উত্তর করিল—"মহামহোপাধ্যায় শ্রীলক্ষ্মীকান্ত চক্রবর্ত্তী—উপাধি তর্কভিন্দিপাল।"

প্র। মহাশয়ের নিবাস?

উ। আপাততঃ তোমার বাড়ীতে।

প্র। প্রয়োজন?

উ। ভিক্ষা।

আমার হার হইল। আমি ক্যাল ক্যাল করিয়া চাহিয়া

ব্রা। তোমার সঙ্গে শ্রী শ্রীমান কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তীর আলাপ আছে ?

উ। যৎকিঞ্চিৎ।

ব্রা। আমি তাহার নাতি।

আমি মনে করিলাম, সে ত আফিমখোর—এ গুলিখোর না হইয়া যায় না। তখন একটু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"ভিন্দিপাল ঠাকুর! চণ্ডী আপনার পড়া আছে ?"

গম্ভীর স্বরে উত্তর হইল—"শর্ম্মার পড়া না থাকে, এ ভূভারতে কোন্ মূর্খের পড়া আছে ?

আ। ভাল ভাল, অন্য মূর্খের পড়া না থাকুক, আপনার থাকিলেই হইল। আচ্ছা ঠাকুর। এসব আষাঢ়ে গল্পের অর্থ কি ?

ব্রা। বানর হইতে মানুষ জন্মিয়াছে। উহা কি আষাঢ়ে গল্প নহে ?

আ। উহা যে Theory of evolution—বিবর্ত্তনবাদ।

ব্রা। বাপু হে। ইহাও সেই বিবর্ত্তন, আবর্ত্তন, সংবর্ত্তন, পরিবর্ত্তনবাদ।

একথা কয়টি পাষণ্ড এমনি স্বরুচিবিরুদ্ধ মুখভঙ্গির সহিত ও হাত নাড়া দিয়া বলিল যে আমি তাহাতে কুতই চটিলাম। বলিলাম—"সাবধান ঠাকুর, বেয়াদপি কর ত তাড়াইয়া দিব।"

ব্রা। মূর্খে সর্ব্বত্র পণ্ডিতকে তাড়াইয়া দিয়া থাকে। তাহাতে দুঃখ নাই। কিন্তু কথাটা আগে শুন। দশ অবতারবাদের মূলে যে বিবর্ত্তনবাদ রহিয়াছে, তাহা বোধ হয় বুঝিয়াছ ?

আ। শুনিয়াছি।

ব্রা। চণ্ডীর মূলেও তাই। তুমি গীতা পড়িয়াছ ?

আ। এই গীতা যুগে কেমন করিয়া বলিব পড়ি নাই ?

ব্রা। তবে একবার গীতার সৃষ্টি প্রকরণটা মনে কর—

'কল্পক্ষয়ে সর্ব্বভূত আমার প্রকৃতি পায়।
কল্পারম্ভে তাহাদের সৃজি আমি পুনরায়। ৭
অবলম্বি' স্ব প্রকৃতি সৃজি আমি বারংবার।
প্রকৃতি-বশে অবশ অখিল ভূতসংসার। ৮
সেই সব কর্ম্মে বদ্ধ নহি আমি হে ভারত।
অনাসক্ত সেই কর্ম্মে থাকি উদাসীন মত। ৯
প্রকৃতি অধ্যক্ষে মম সৃজে এই চরাচর।
এই হেতু জগতের বিপর্য্যয় বীরবর।" ১০

এখন চণ্ডীর প্রথম পৃষ্ঠা খুলিয়া দেখ।

"বিশ্ব একার্ণব করি যখন শেষে শয়ান
ভজিলেন যোগনিদ্রা কল্প-অন্তে ভগবান্, ৪৯
বিখ্যাত মধু-কৈটভ তখন অসুর দ্বয়,
বিষ্ণু কর্ণ-মলে জন্মি' ব্রহ্মা বধোদ্যত হয়। ৫০
বিষ্ণু-নাভিপদ্মেস্থিত সেই ব্রহ্মা প্রজাপতি
দেখিলা অসুর উগ্র, জনার্দ্দন সুপ্ত অতি। ৫১
স্তুতিলা যোগনিদ্রায় হরি-নেত্র-নিবাসিনী
বিশ্বেশ্বরী জগদ্ধাত্রী' স্থিতি-সংহার-কারিণী, ৫২
বিষ্ণুর তেজে অতুলা নিদ্রাদেবী ভগবতী,
হরির চেতনা তরে এক চিত্তে প্রজাপতি।" ৫৩

অহো কি মহাদৃশ্য! কল্পারম্ভে সৃষ্টক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। ভগবান স্বপ্রকৃতি অবলম্বন করিয়া প্রকৃতিবশে অবশ হইয়া অখিল-সংসার সৃষ্ট করিতেছেন। জল পর্য্যন্ত সৃষ্টি হইয়াছে। বিশ্ব একার্ণব—ঐশশক্তি সেই অনন্ত সলিল ব্যাপিয়া বিরাজিত। ভগবান্ অনন্ত-শয্যায় শয়িত—তিনি "প্রকৃতির বশে অবশ" বা যোগনিদ্রাগত উদাসীন।

"জন্মে সত্ত্ব রজ তমে করি পার্থ! অভিভূত,
রজ—সত্ত্ব তমে; তম—সত্ত্ব রজে কুক্ষিসুত।
গীতা ১৪ অ-১০

ভগবানের সৃষ্টি-ইচ্ছা হইয়াছে। ব্রহ্মা বা রজোগুণ তাঁহার নাভিপদ্মস্থিত কিন্তু সমুদ্রমন্থনে বা বিবর্ত্তনে মধু ও কৈটভ সত্ত্ব ও তম, অমৃত ও বিষ, আত্মজ্ঞান ও অসজ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়াছে। তাহারা প্রবল। তাহাদিগকে অভিভূত করিতে না পারিলে রজঃ শক্তির কার্য্য হইতে পারে না—সৃষ্টিকার্য্য অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। ভগবান প্রকৃতির বশে অবশ বা নিদ্রাগত। ব্রহ্মা প্রকৃতির স্তুতি করিলেন। ভগবান সেই নিদ্রামুক্ত হইয়া মধুকৈটভরূপী সত্ত্ব তমঃ গুণকে অভিভূত করিলেন। তখন সৃষ্টি-কার্য্য রজোগুণের দ্বারা অপ্রতিহত ভাবে চলিতে লাগিল।

ক্রমে ক্রমে সলিলে মৎস্য, কর্দ্দমে কূর্ম্ম ও পরে কর্দ্দম দৃঢ়ীভূত হইয়া অরণ্যময় হইলে বরাহ সৃষ্ট হইল। চণ্ডীকার কেবল চিক্ষুরাখ্য বিড়ালাখ্য মহাহনু প্রভৃতি রাক্ষস সৃষ্টির দ্বারা অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া সৃষ্টির এই তিন যুগের পর একবারে চতুর্থ যুগে গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। চণ্ডীর মহিষাসুর অবতারবাদের নরসিংহ—নিম্নার্দ্ধ পশু, উপরি অর্দ্ধ নর। বানর হইতে বা পশু হইতে মানুষের সৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে।

তাহার পর একদিকে বামন ও পরশুরাম, অন্যদিকে নিশুম্ভ শুম্ভ। দেহ মানবের, হৃদয় পশুর। বিবর্ত্তননীতিতে ক্রমে পূর্ণ মনুষ্য সৃষ্ট হইল। বর্ত্তমান যুগ আরম্ভ হইল। চণ্ডী এখানে শেষ হইয়াছে।

এখন বুঝিলে বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব অনেক সময়ে আবাঢ়ে গল্প। চণ্ডিকার এরূপ গল্পের দ্বারা সৃষ্টিপ্রক্রিয়া ও বিবর্ত্তনবাদ বুঝাইতে বুঝাইতে Illustration বা উদাহরণের দ্বারা গীতার আরও

কয়েকটি মহান্ তত্ত্ব বুঝাইয়া দিয়াছেন। দুটীর উল্লেখ করিব। ভগবানের সেই মহদ্বাক্য স্মরণ কর—।

যখন যখন ঘটে, ভারত! ধর্ম্মের গ্লানি,
অধর্ম্মের অভ্যুত্থান, আপনাকে সৃজি আমি।
সাধুদের পরিত্রাণ, বিনাশ দুষ্কৃতদের
করিতে সাধন,
স্থাপন করিতে ধর্ম্ম, করি আমি যুগে যুগে
জনম গ্রহণ। গীতা, ৪ অ, ৭।৮

চণ্ডীতে দেখি দুষ্কৃত দানবেরা সাধু দেবতাদিগের নিগ্রহ করিলে ভগবানের প্রকৃতি 'মহামায়া' রূপে যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া তাহাদের বিনাশসাধন করিতেছেন। গীতায় ভগবানের ভাষা যাহা, চণ্ডীতে ভগবতীর ভাষাও তাহা—

"ঐরূপে দানবগণ ঘটাবে বাধা যখন,
অবতীর্ণা হ'য়ে আমি বিনাশিব শত্রুগণ।" ৫০

দ্বিতীয়তঃ—

"সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।"

আবার—

"ময়িস্সর্ব্বমিদং প্রোক্তং সূত্রে মণিগণা ইব।"

গীতার এ সকল মহদ্বাক্য স্মরণ করিয়া চণ্ডীর প্রথম, পঞ্চম ও একাদশ মাহাত্ম্যের সুললিত অমৃতস্যন্দিনী স্তবমালা পাঠ কর, এবং গীতার দশম অধ্যায়ের বিভূতিযোগ একাদশ অধ্যায়ের বিশ্বরূপের স্তবের সঙ্গে মিলাইয়া দেখ। গীতার উপর্য্যুক্ত জটিল দার্শনিক তত্ত্বটি চণ্ডীকার তিনটি দীর্ঘ স্তবের দ্বারা জলের মত বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। গীতার সেই—

"প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস!'

আর চণ্ডীর—

প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং
ত্বমীশ্বরী দেবী চরাচরস্য।"

গীতার সেই—

"নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োপি নমো নমস্তে।
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।"

আর চণ্ডীর—

"যা দেবী সর্ব্ব ভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা।
নমস্তস্যৈ ১৪ নমস্তস্যৈ ১৫ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥ ১৬
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে।
নমস্তস্যৈ ১৭ নমস্তস্যৈ ১৮ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥" ১৯

আবার—

"সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বেশে সর্ব্বশক্তিসমন্বিতে।
ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবি দুর্গে দেবি নমোঽস্তুতে॥" ২৪

গীতার সেই—

"কিরীটিনং গদিনং চক্রিণং চ
তেজোরাশিং সর্ব্বতো দীপ্তিমন্তম্।"

আর চণ্ডীর—

শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গং গৃহীতে পরমায়ুধে।
প্রসীদ বৈষ্ণবীরূপে নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥ ১১ অ, ১৬

এখন বুঝিলে কি চণ্ডীখানি গীতার কয়েকটী সূক্ষ্মতত্বের স্থূল ব্যাখ্যা মাত্র। স্থূলবুদ্ধি লোকের জন্যে—জগতে তাহাদের সংখ্যাই অধিক—এরূপ আষাঢ়ে গল্পের দ্বারা জটিল তত্বের স্থূল ব্যাখ্যা প্রয়োজন। বেলা হইল—এখন আমায় বিদায় দেও।

আমি বলিলাম কিছুই হইল না। আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা হইল কই? এই দেখ শাস্ত্র প্রকরণের তর্কভূষণ মহাশয় কি বলিতেছেন—"অন্য পার্থিব পদার্থের সাহায্য ব্যতিরেকে, তখন (অর্থাৎ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে) কত শত গৃহস্থ কেবল দেবীমাহাত্ম্যের কৃপায়, ভয়ঙ্কর বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইত তাহা গণিয়া উঠা যায় না। আর অদ্য সভ্যতাভিমানী হিন্দু, দেবীমাহাত্ম্য কাহাকে বলে জানেন না—মায়ের সন্তান হইয়া মায়ের পরিচয় জানেন না, ও জানিতে ইচ্ছা করেন না। হিন্দু বলিয়া অভিমান করেন, কিন্তু হিন্দু কাহাকে বলে বুঝেন না। দুঃখে পড়িলে, কাঁদিয়া দিন কাটাইবেন, তবু একবার সর্ব্বসন্তাপহারিণী জননীকে ডাকিবেন না। না ডাকিবার কারণ আর কিছুই নহে, ইহা ইংরেজী স্কুলে পঠিত হয় না—সাহেবী রুচির বিমল জলে ইহার কোন পংক্তিই ধৌত নহে।"

পাঠ সমাপন করিয়া বলিলাম—"তোমার এই সাহেবী রুচির বিমল জলে ধৌত" অর্থ করিয়া চণ্ডী পাঠ করিলে কি কেহ "ভয়ঙ্কর বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবে?"

ভিন্দিপাল ঠাকুর তখন তিন গ্রাম বাঁপিয়া সপ্তস্বরে একটি Sartor Resartus গোছের হাসি আরম্ভ করিলেন। নানাবিধ মূর্চ্ছনা খেলিয়া হাসি প্রায় ১৫ মিনিট পরে শেষ হইলে, বেল্লিকটা বলিল—"কথাটা ঠিক। হিন্দু কাহাকে বলে বুঝি না? হিন্দু তর্কভূষণ মহাশয় কোন অভিধানে পাইয়াছেন, কোন্ ব্যাকরণ মতে হিন্দু শব্দ প্রতিপন্ন করিয়া তাহার অর্থ বুঝিয়াছেন তাহা বুঝা বড় সহজ নহে। যবনবিপ্লব হইতে তর্কভূষণ মহাশয়েরা হিন্দুনাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। শুনিয়াছি যাবনিক ভাষায় তাহার অর্থ গোলাম। তর্কভূষণ মহাশয়েরা ধর্ম্মগ্রন্থের এরূপ "ভয়ঙ্কর বিপদভঞ্জন" অর্থ করিয়াই আজ পুণ্যভূমি আর্য্যস্থানকে, হিন্দুস্থান

বা গোলামের স্থান এবং সনাতন আর্য্যধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্ম বা গোলামের ধর্ম্মে পরিণত করিয়াছেন।"

একজন মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রব্যাখ্যাকারকের নিগূঢ় অর্থপূর্ণ কথার প্রতি এরূপ শ্লেষ শুনিয়া আমি ভয়ঙ্কর চটিয়া বলিলাম—"ঠাকুর আমি তোমাকে কিছুই দিব না।" বেল্লিকটা বলিল—"না দেও ক্ষতি নাই। আমার ব্যাখ্যাটি ছাপাইব।"

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন।

দেবী মাহাত্ম্য চণ্ডী।

প্রথম মাহাত্ম্য

চণ্ডিকাকে নমস্কার।

মার্কাণ্ডেয়, কহিলেন,

সাবর্ণি সূর্য্যতনয়, অষ্টম মনু কথিত।
তাহার উৎপত্তি শুন মম মুখে বিস্তারিত। ১
মহামায়া প্রভাবেতে যথা মন্বন্তরপতি
হইলা মহাভাগ, সাবর্ণি সূর্য্য-সন্ততি। ২
চৈত্র-বংশ সমুদ্ভূত স্বারোচিষ মন্বন্তরে
আছিল সুরথ রাজা সমস্ত অবনী পরে। ৩
সম্যক প্রজাপালক ঔরস পুত্রের মত
ভূপতির ছিল শত্রু কোলা* বিধ্বংসীরা যত। ৪
সে প্রবল দণ্ডী সহ হলো তাহাদের রণ
ন্যূন হয়ে তবু জয়ী হলো কোলধ্বংসিগণ। ৫
হইলে স্বপুরে আসি নিজ দেশ অধিপতি
আক্রান্ত সে অরিগণে হইলেন মহামতি। ৬

* কোলা—শূকরী।

স্বপুরেও বলি দুষ্ট দুরাত্মা অমাত্য যত,
করিল সে দুর্ব্বলের ধন বল অপহৃত। ৭
তখন মৃগয়াছলে হৃতরাজ্য নৃপবর
পশিয়া' গহন বনে অশ্বপৃষ্ঠে একেশ্বর। ৮
দ্বিজশ্রেষ্ঠ মেধসের, দেখিলেন পুণ্যাশ্রম
প্রশান্ত শ্বাপদপূর্ণ, মুনি-শিষ্যে সুশোভন। ৯
থাকি কিছুকাল তথা সৎকার করি গ্রহণ
সেই মুনিবরাশ্রমে, ইতস্তত বিচরণ ১০
করিয়া, চিন্তিলা তবে হইয়া মমত্বাধীন—
পূর্ব্ব পুরুষের পুর আমি করিলাম হীন। ১১
ধর্ম্মতঃ পালিছে কিনা অসদ্বৃত্ত ভৃত্যগণ
নাহি জানি, সে প্রধান সদা মদহস্তি মম
মম বৈরি বশে গিয়া কি ভোগ পায় এখন। ১২
প্রসাদে, ধনে, ভোজনে ছিল যারা অনুচর
তারা সেবিতেছে অদ্য ধ্রুব অন্য নৃপবর। ১৩
অসম্যগ্ব্যয়শীল সতত করিয়া ব্যয়,
সে অতি দুঃখে সঞ্চিত কোষ করিতেছে ক্ষয়। ১৪
নৃপতি চিন্তিলা সদা এরূপ নানা বিষয়। ১৫
বিপ্রাশ্রম কাছে করি বৈশ্য এক দরশন
জিজ্ঞাসিলা—"কেহে তুমি? কোন হেতু আগমন?
কিহেতু সশোক আর দুর্ম্মনা করি দর্শন? ১৬
ভূপতির প্রীতি মাখা শুনিয়া বচন চয়,
নৃপতিকে সেই বৈশ্য উত্তরিল সবিনয়। ১৭

বৈশ্য কহিলেন,

সমাধি নামক বৈশ্য ধনিকুলে উপস্থিত,
ধন-লোভি দুষ্টপুত্র দারাহস্তে নিগৃহীত। ১৮

হয়ে ধনদারাহীন হৃত ধন পুত্রগণে,
নিরস্ত বন্ধুর হস্তে, দুঃখী আসিয়াছি বনে। ১৯
নাহি জানি পুত্রদের কুশল ও অকুশল,
না জানি কেমন আছে স্বজন দারা সকল। ২০
মঙ্গল কি অমঙ্গল তাদের গৃহে এখন,
সদ্বৃত্ত দুর্বৃত্ত কিবা হইয়াছে পুত্রগণ। ২১

রাজা কহিলেন,

ধনলুব্ধ যে স্ত্রী পুত্রে নিরস্ত তুমি এমন,
তাহাদের প্রতি কেন স্নেহবদ্ধ কর মন ?। ২২

বৈশ্য কহিলেন.

তাই বটে, কহিলেন আপনি কথা যেমন,
কি করিব নিষ্ঠুর ত নাহি হয় মম মন। ২৩
ত্যজি পিতৃ পতি স্নেহ যেই ধনলুব্ধগণ
খেদায়েছে বনে, স্নেহ তাহাদের করে মন। ২৪
জানিয়াও মহামতি! আমি কি তা নাহি জানি,
হতেছি যে প্রেমাসক্ত বিগুণ বন্ধুতে আমি। ২৫
নিশ্বাস তাদের তরে বহিছে করি দুর্মন,
কি করি তাদের স্নেহে নিষ্ঠুর না হয় মন। ২৬

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,

তখন হে বিপ্র! হ'লো মুনি কাছে উপস্থিত
সুরথ নৃপসত্তম, সমাধি বৈশ্য সহিত। ২৭
উভয়েতে যথাবিধি করি পূজা সম্ভাষণ,
বসিয়া বৈশ্য পার্থিব করিলেন নিবেদন। ২৮

রাজা কহিলেন।

ভগবন! ইচ্ছা মম জিজ্ঞাসি এক বচন,
চিত্ত আয়ত্ততা বিনা যাহাতে দুঃখিত মন, ২৯

জানিয়া অজ্ঞানী মত অখিল রাজ্যাঙ্গে মম
কি হেতু মমতা মম হতেছে, মুনিসত্তম ? ৩০
ইনিও স্ত্রী পুত্র ভৃত্যে হয়ে গৃহ নির্ব্বাসিত—
স্বজনে সংত্যক্ত,—কেন তবু হেন স্নেহান্বিত ? ৩১
এই রূপে ইনি, আমি, অতি দুঃখী দুইজন,
দৃষ্ট দোষ বিষয়েতে মমত্বে আকৃষ্ট মন। ৩২
জ্ঞানীরা এমন মোহ মহাভাগ ! হয় কেন ?
জ্ঞানান্ধের বিমূঢ়তা হয় আমাদের হেন ? ৩৩

ঋষি কহিলেন।

সমস্ত জন্তুর আছে বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান,
পৃথক্ পৃথক্ আছে বিষয়ও, জ্ঞানবান ! ৩৪
দিবা-অন্ধ কোন প্রাণী, রাত্রি-অন্ধ কেহ আর,
কেহ দিবা-রাত্রি অন্ধ, তুল্য দৃষ্টি পুনঃ কার। ৩৫
নর জ্ঞানী সত্য, কিন্তু তাহারা নহে কেবল,
পশু পক্ষী মৃগগণ যেহেতু জ্ঞানী সকল।
যাহা পশু পক্ষীদের, সেই জ্ঞান মানুষের,
মানুষের যাহা, তুল্য তথা অন্য উভয়ের। ৩৭
স্নেহ মোহে দেখ জ্ঞানে ক্ষুধাতুর পক্ষিগণ
শাবক চঞ্চুতে করে মুখস্থ কণা অর্পণ। ৩৮
মানুষ, হে নরব্যাঘ্র ! অভিলাষী সুত প্রতি
প্রত্যুপকারের লোভে, দেখনা কি, নরপতি ? ৩৯
পতিত মমতাবর্ত্তে, মোহ গর্ত্তে জীব যত,
সংসার স্থিতিকারীর মহামায়া প্রভাবতঃ। ৪০
এ নহে বিস্ময় কার্য্য, হরির ইহা নিশ্চিত
যোগনিদ্রা মহামায়া, জগত তাহে মোহিত। ৪১

জ্ঞানীদেরও চিত্ত বলে সেই দেবী ভগবতী
আকর্ষি, ঘটায় মোহ মহামায়া হে নৃপতি। ৪২
তাহা হ'তে সৃষ্ট বিশ্ব এ জগত চরাচর।
সে প্রসন্না বরদাই নরের মুক্তি-আকর। ৪৩
সে পরমা বিদ্যা, মুক্তি-প্রদায়িনী সে অমরী,
সংসার বন্ধন হেতু সেই সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী। ৪৪

রাজা কহিলেন,

ভগবন্! কে সে দেবী মহামায়া নাম যার?
কিরূপে উৎপন্না তিনি হে দ্বিজ! কি কর্ম্ম তাঁর? ৪৫
যে স্বভাব, যে স্বরূপ, যাহা হ'তে সম্ভাবিত,
শুনিতে সব ইচ্ছা, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিৎ। ৪৬

ঋষি কহিলেন,

নিত্যা সে জগন্মূর্ত্তি ব্যাপ্ত তাহে চরাচর।
তথাপিও শুন তার সমুৎপত্তি বহুতর। ৪৭
সেই নিত্যা অভিহিতা; হন আবির্ভূতা যবে
দেব-কার্য্য সিদ্ধি তরে, উৎপন্না কহে তবে। ৪৮
বিশ্ব একার্ণব করি, যখন শেষে শয়ান
ভজিলে যোগ নিদ্রা কল্প অন্তে ভগবান, ৪৯
বিখ্যাত মধুকৈটভ তখন অসুর দ্বয়
বিষ্ণু-কর্ণমূলে জন্মি, ব্রহ্মা বধোদ্যত হয়। ৫০
বিষ্ণু নাভিপদ্মে স্থিত সেই ব্রহ্মা প্রজাপতি
দেখিলা অসুর উগ্র, জনার্দ্দন সুপ্ত অতি। ৫১
স্তুতিলা যোগনিদ্রায় হরি নেত্র-নিবাসিনী,
বিশ্বেশ্বরী, জগদ্ধাত্রী, স্থিতি সংসারকারিণী, ৫২
বিষ্ণুর তেজে অতুলা, নিদ্রাদেবী ভগবতী,
হরির চেতনা তরে এক চিত্তে প্রজাপতি। ৫৩

ব্রহ্মা কহিলেন,

তুমি স্বাহা, তুমি স্বধা, তুমি স্বর, বষট্‌কার *,
হে অক্ষরে! নিত্যে! তুমি সুধা তিন মাত্রা আর। ৫৪
অর্দ্ধ মাত্রা স্থিতা, নিত্যা অনুচার্য্য মাত্রা আর,
তুমিই সাবিত্রী দেবী জননী তুমি সবাঁর। ৫৫
ধারণ কর সকল, জগৎ কর সৃজন,
তুমিই কর পালন, অন্তিমে কর ভক্ষণ। ৫৬
সৃষ্টি কালে সৃষ্টিরূপা, স্থিতিরূপা সংরক্ষণে,
জগন্ময়ে! জগতে সংহৃতিরূপা ধ্বংসনে। ৫৭
মহাবিদ্যা, মহামায়া, মহামেধা মহাস্মৃতি,
মহাদেবী, মহাসুরী, মহামোহা, মহাধৃতি। ৫৮
প্রকৃতিস্থ সকলের গুণত্রয় প্রদায়িনী,
কালরাত্রি, মহারাত্রি, মোহরাত্রি সংহারিণী। ৫৯
তুমি শ্রী, ঈশ্বরী লজ্জা, বুদ্ধি ও বোধলক্ষণা,
পুষ্টি, তুষ্টি, শান্তি, ক্ষান্তি তুমি লজ্জা নিরুপমা, ৬০
খড়্গিনী, শূলিনী, ঘোরা, গদিনী চক্রধারিণী,
শঙ্খিনী, চাপিনী বাণ-ভুষণ্ডী পরিঘ-পাণি, ৬১
সৌম্যা, সৌম্যতরা, সৌম্য হ'তেও অতি সুন্দরা,
শ্রেষ্ঠার পরম শ্রেষ্ঠা, তুমিই পরমেশ্বরী। ৬২
বিশ্বময়ি! সৎ অসৎ যাহা কিছু আছে সব,
তাহাদের শক্তি তুমি, কি করিব তব স্তব? ৬৩
তোমা হ'তে জগতের স্রষ্টাপাতা ধ্বংসকারী
তিনিও নিদ্রিত,—আমি কি স্তুতি করিতে পারি? ৬৪
আমি ও ঈশান, বিষ্ণু হইয়াছি দেহ ধারী
তোমা হ'তে আমি তব কি স্তুতি করিতে পারি? ৬৫

*বষট—মন্ত্র বিশেষ।

মহৎ প্রভাবে তব, হে দেবি ! হইয়া স্তুত,
দুর্দ্ধর্ষ মধুকৈটভে কর তুমি মোহভূত। ৬৬
বিশ্বস্বামি অচ্যুতকে কর শীঘ্র জাগরিত
বধিতে এ মহাসুর, কর তুমি প্রবর্ত্তিত। ৬৭
বধিতে মধুকৈটভ, জাগাইতে নারায়ণ,
এরূপে তামসী দেবী হইয়া স্তুত, তখন ৬৮
নেত্রাস্য, নাসিকা, বাহু, হৃদয়, বক্ষহতে
বাহিরি, হইলা স্থিত ব্রহ্মার নয়ন-পথে। ৬৯
একার্ণব-নাগ-শয্যা হ'তে উঠি জনার্দ্দন,
নিদ্রামুক্ত জগন্নাথ করিলেন দরশন। ৭০
দুরাত্মা মধুকৈটভ অতি বীর্য্য পরাক্রম,
ব্রহ্মাকে ভক্ষণোদ্যত ক্রোধেতে রক্তনয়ন। ৭১
যুঝিলা তাদের সহ, উঠি ভগবান হরি,
বৎসর পঞ্চ সহস্র, বাহু প্রহরণ করি। ৭২
তারা অতি বলবন্ত, মহামায়া-বিমোহিত,
কহিল কেশবে—"মাগ তোমার বর বাঞ্ছিত।" ৭৩

ভগবান কহিলেন।

তুষ্ট যদি আজি, হও মম বধ্য দুইজন।
কি কায অন্য বরেতে ? এই মাত্র বর মম। ৭৪

ঋষি কহিলেন।

সর্ব্ব জলময় বিশ্ব দেখিয়া বঞ্চিতদ্বয়
কহিল কমলেক্ষণ ভগবানে সে সময়—
"বধ আমাদের যথা নহে ধরা জলময়।" ৭৫
"তাই হ'ক—বলি হরি শঙ্খ চক্র গদাধর,
চক্রে কাটিলেন শির, রাখি নিজ উরুপর। ৭৬
এই রূপে সমুৎপন্না, ব্রহ্মা স্তুতি করে যার,

সে দেবী প্রভাব আমি কহি শুন পুনর্ব্বার। ৭৭

ইতি মধুকৈটভ বধনাম প্রথম মাহাত্ম্য। ১।

[দ্বিতীয় মাহাত্ম্য]

—•—

চণ্ডিকাকে নমস্কার।

ঋষি কহিলেন।

দেবাসুরে হ'ল যুদ্ধ পূর্ণ-অব্দ-শত ধ'রে,
অসুর-রাজ মহিষে, দেবরাজ পুরন্দরে। ১
মহাবীর্য্য অসুরেরা পরাজিল দেববল ;
জিনিল মহিষাসুর ইন্দ্র ও দেব সকল। ২
প্রজাপতি আগে করি, পরাজিত দেবগণ,
যথায় ঈশান বিষ্ণু, করিলা তথা গমন। ৩
মহিষাসুরের কার্য্য আবৃত্তি করিয়া সব
কহিলেন দেবগণ, বিস্তর সে পরাভব। ৪
"সূর্য্য, ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, বরুণ, যমের আর,
করেছে গ্রহণ নিজে অন্য দেব অধিকার। ৫
দুরাত্মা মহিষ দ্বারা স্বর্গচ্যুত দেবগণ,
মর্ত্ত্যে মানুষের মত করিতেছে বিচরণ। ৬
অমর শত্রুর কার্য্য এ রূপে হল কথিত ;
লইনু শরণ ; হও তার বধে বিচিন্তিত। ৭
এই রূপ দেববাক্য শুনিয়া মধুসূদন
কুপিলা করিলা শম্ভু ভ্রূকুটী কুটিলানন। ৮
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করের অতিশয় কোপান্বিত,
হইল বদন হ'তে মহাতেজ নিক্রামিত। ৯

ইন্দ্র আদি দেবদেব দেহ হ'তে বিনিঃসৃত
সু মহৎ তেজোরাশি হইল তাহে মিলিত। ১০
অতিশয় তেজোরাশি, জ্বলন্ত পর্ব্বত মত,
জ্বালা-ব্যাপ্তি দিগন্তর, দেখিলেন সুর যত। ১১
একত্র হইয়া সেই দেবতেজ অতুলিত
সা রমণী তেজে ত্রিলোক করি ব্যাপিত। ১২

শম্ভু-সমুদ্ভূত তেজে হইল তার বদন,
যম তেজে হ'লো কেশ, বিষ্ণু তেজে বাহুগণ। ১৩
সৌম্য তেজে স্তনযুগ, চন্দ্র তেজে মধ্য চারু,
পৃথিবী তেজে নিতম্ব, বরুণেতে জঙ্ঘা উরু। ১৪
ব্রহ্মা তেজে পদদ্বয়, পদাঙ্গুলি প্রভাকর,
বসুগণে করাঙ্গুলি, কুবেরে নাসিকাবর। ১৫
প্রজাপতি তেজে তাঁর জনমিল দন্তচয়,
পাবক তেজেতে আর জন্মিল নয়নত্রয়। ১৬
সন্ধ্যা তেজে ভ্রূযুগল অনিলে শ্রবণ কিবা!
অন্য দেব তেজে আর সম্ভূতা হইলা শিবা। ১৭
দেখি তাঁকে সর্ব্বদেব তেজোরাশি সম্ভাবিত,
হর্ষিত হইল সর্ব্ব অমর মহিষার্দ্দিত। ১৮
শূল হ'তে সৃজি শূল দিলেন পিনাকধারী,
স্বচক্র হইতে সৃজি দিলেন চক্র কংসারি। ১৯
বরুণ দিলেন শঙ্খ দিলা শক্তি বৈশ্বানর,
মারুত দিলেন চাপ সহ তূণ-পূর্ণ শর। ২০
বজ্র হ'তে সৃজি বজ্র দিলেন অমরেশ্বর,
ঐরাবত হ'তে ঘণ্টা দিলা আর পুরন্দর। ২১
দিলা কালদণ্ড যম, দিলা পাশ জলপতি,
কমণ্ডলু অক্ষমালা দিলা ব্রহ্মা প্রজাপতি। ২২

সর্ব্ব রোমকূপে দিলা নিজরশ্মি দিবাকর,
নির্ম্মল চর্ম্মের সহ দিলা কাল অসিবর। ২৩
ক্ষীরোদ অজীর্ণ বাস যুগল, অমল হার,
কুণ্ডল ও কটিসূত্র, দিব্য চূড়ামণি আর। ২৪
কেয়ূর সকল ভুজে, অর্দ্ধচন্দ্র শুভ্র শোভা,
বিমল নূপুর আর, গ্রীবাপত্র মনোলোভা। ২৫
সর্ব্ব অঙ্গুলিতে দিয়া অঙ্গুরীয় রত্নোজ্জ্বল,
বিশ্বকর্ম্মা প্রদানিলা পরশু অতি নির্ম্মল। ২৬
অন্য অস্ত্র বহুরূপ. অভেদ্য কবচ আলা,
মস্তকে উরসে দিলা অম্লান পঙ্কজমালা। ১
জলধি পঙ্কজ দিলা অতিশয় সুশোভন,
হিমবান নানা রত্ন সহিত সিংহবাহন। ২৮
ধনেশ দিলেন পাত্র, সুরায় চির-পূরিত,
সর্ব্বনাগেশ্বর শেষ মহামণিবিভূষিত, ২৯
দিলা নাগহার, যাহে পৃথিবী করে ধারণ।
অন্য সুরগণ দিলা আয়ুধ তথা ভূষণ। ৩০
পূজ্যা নিনাদিলা উচ্চে মুহুর্ম্মুহু অট্টহাসি,
সে ঘোর নিনাদ নভঃ পূরিয়া উঠিল আসি। ৩১
হ'ল মহৎ প্রতিশব্দ করি অমা বিধ্বনিত,
ক্ষোভিত সকল লোক, পারাবার প্রকম্পিত। ৩২
চঞ্চলিত বসুন্ধরা চঞ্চল ভূধরচয়,
গাইল দেবেরা হর্ষে সিংহবাহিনীর জয়। ৩৩
স্তুতি করিলেন শান্ত ভক্তিনম্র মুনিগণ।
ত্রৈলোক্য অমর-অরি-নিরখিল ক্ষুব্ধ মন
যুদ্ধার্থী অখিল সৈন্য, সমুত্থিত অস্ত্রগণ। ৩৪

যুদ্ধার্থী অখিল সৈন্য, সমুত্থিত অস্ত্রগণ,
"আঃ একি!"—ইহা কহি মহিষাসুর ক্রোধিত। ৩৫
ছুটিল সে শব্দ প্রতি, অশেষ অসুরাবৃত,
দেখিল সে দেবী তেজে ব্যাপী লোকত্রয় সব,। ৩৬
পদভরে নত ধরা, কিরীটী পরশি নভঃ,
ধনুর্গুণ নিস্বনেতে পাতাল সমস্ত ভীত,। ৩৭
ভুজ সহস্রেতে দিক আচ্ছাদিয়া দেবী স্থিত,।
দেবী সহ অসুরেরা হ'ল যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত " ৩৮
করিল বহুধা শস্ত্রে, অস্ত্রে দীপ্ত দিগন্তর,
মহিষাসুর সেনানী চিক্ষুরাখ্য বীরবর। ৩৯
যুঝিল চামর আর, চতুরঙ্গ বলান্বিত,
ষষ্ঠাযুত রথ সহ উদগ্রাখ্য দুর্বৃত্ত। ৪০
অযুত সহস্র সহ মহাহনু করে রণ,
পঞ্চাশ নিযুত সহ অসিলোম বীরোত্তম। ৪১
ছয় শ অযুত সহ বাস্কল যুঝিছে রণে,
অনেক সহস্র গজ বাজি সহ পরাক্রমে। ৪২
বিড়ালাক্ষ করে যুদ্ধ কটি রথ সমাবৃত,
পঞ্চাশ অযুত সৈন্যে সহিত রথ অযুত। ৪৩
যুঝে যুদ্ধে অন্যে আরো, রথগণে পরিবৃত,
অযুত অযুত রথ গজ অশ্ব সমাযুত। ৪৪
করিল দেবীর সহ যুদ্ধ মহাসুর যত
রথ হস্তিগণ সহ, কোটি কোটি শত শত। ৪৫
যুঝিল মহিষাসুরে অশ্বাবৃত বীর্য্যাধার,
তোমর ও ভিন্দিপালে শক্তি ও মুষলে আর। ৪৬
যুঝে দেবী সহ খড়্গ পরশু পট্টিশ করে,
নিক্ষেপিল শক্তি কেহ, ক্ষেপিল পাশ অপরে। ৪৭

দেবীকে কাটিতে খড়্গে কেহ করে উপক্রম,
হাসিয়া চণ্ডিকা দেবী সেই অস্ত্র শস্ত্র গণ। ৪৮
কাটিলা লীলায় করি নিজ অস্ত্র বরিষণ,
অম্লান বদনা দেবী হ'য়ে স্তুত সুরগণে। ৪৯
ঈশ্বরী অসুর দেহে হানিলেন অস্ত্র রণে,
কম্পিত-কেশর ক্রুদ্ধ করিল দেবী-বাহন। ৫০
বনে হুতাশন মত শত্রু-সৈন্য বিচরণ,
যুদ্ধমানা অম্বিকায় নিশ্বাসেতে সেইক্ষণ। ৫১
জন্মিল শত সহস্র সদ্য গণদেবগণ,
পরশু পট্টিশ আর ভিন্দিপালে করি রণ। ৫২
বর্দ্ধিত দেবীর বলে নাশিল অসুরগণ,
গণেরা পটাহ শঙ্খ বাজাইল ভীমরবে। ৫৩
মৃদঙ্গ বাজায় অন্যে সেই যুদ্ধে মহোৎসবে,
তখন ত্রিশূল, গদা, শক্তিদেবী বৃষ্টি করি। ৫৪
খড়্গে শত শত হত করিলা অসুর অরি,
মূর্চ্ছিত ঘণ্টার শব্দে দিল কেহ গড়াগড়ি। ৫৫
পাশে বাঁধি অন্য কেহ করিলেন আকর্ষণ,
তীক্ষ্ণ খড়্গে দুই খণ্ড করিলেন অন্যজন। ৫৬.
গদাঘাতে নিপাতিত করিল ভূমে শয়ন,
মুষল আঘাতে কেহ করিল রক্ত বমন। ৫৭
শূলে বক্ষে ভিন্ন কেহ দিল ভূমে গড়াগড়ি,
রণক্ষেত্রে নিরন্তর শর বরিষণ করি। ৫৮
সেনাপতিগণ প্রাণ ত্যজিল ত্রিদশ অরি,
কারো বাহুদ্বয় ছিন্ন কেহবা গ্রীবা রহিত। ৫৯
অন্যের পতিত শির অন্য মধ্য-বিদারিত,
ছিন্ন জঙ্ঘা অন্যসুর ভূমিতলে নিপতিত। ৬০

একবাহু, আঁখি, পদ, কাটিয়াছে দেবী কার,
ছিন্ন শির নিপতিত, উঠিতেছে পুনর্ব্বার। ৬১
ধরিয়া পরমাস্ত্র কবন্ধ করিছে রণ,
নাচিছে তুরীর রবে অপর অসুর গণ। ৬২
ছিন্ন শির কবন্ধেরা খড়্গ, শক্তি, ঋষ্টি, ধরি,
দেবীকে কহিছে ডাকি "তিষ্ঠ তিষ্ঠ তিষ্ঠ" করি। ৬৩
পড়িয়া অসুর, রথ, হস্তী, অশ্ব, ভূমিতল,
অগম্য হইল তথা যথায় সে রণস্থল। ৬৪
শোণিতের মহানদী হ'লো সদা প্রবাহিত,
হস্তী অশ্ব অসুরের সেনা মধ্যে নিপতিত। ৬৫
ক্ষণেকে সে মহা সৈন্য অম্বিকা করিল ক্ষয়,
অসুরের, যথা বহ্নি তৃণ দারু স্তূপ চয়। ৬৬
কম্পিত কেশর সিংহ করিল ছাড়ি গর্জ্জন,
অমর-অরির প্রাণ দেহ হ'তে বিমোচন। ৬৭
করিল অসুর সহ দেবীর গণেরা রণ,
দেবেরা করিলা স্তুতি, আকাশে পুষ্পবর্ষণ। ৬৮

ইতি মহিষাসুর—সৈন্য—বধনাম দ্বিতীয় মাহাত্ম্য। ২।

[তৃতীয় মাহাত্ম্য]

চণ্ডিকে নমস্কার।

ঋষি কহিলেন।

নিহত সকল সৈন্য নিরখিয়া মহাসুর,
যুঝিতে অম্বিকা সহ আসিল কোপে চিক্ষুর। ১

অসুর দেবীকে রণে বরষিল শর গণ,
যথা মেরু-শৃঙ্গে করে তোয়দ তোয় বর্ষণ। ২
লীলায় কাটিয়া দেবী শরজালে সে সকল,
তুরঙ্গ-চালক সহ বধিলা তুরঙ্গ দল। ৩
কাটিলেন সস্ত ধনু, কাটিলেন উচ্চ ধ্বজ,
ছিন্ন ধনুর্দ্ধারী-গাত্রে বিঁধিলেন বাণ ব্রজ। ৪
ছিন্ন ধনু, রথহীন, নিহত অশ্ব সারথী;
খড়্গ চর্ম্ম ধরি বেগে ধাইল দেবীর প্রতি।
তীক্ষ্ণ খড়্গে আঘাতিয়া কেশরীর শীর্ষস্থান,
দেবীকেও সব্য ভুজে আঘাতিল বেগবান। ৭
লাগি খড়্গ সেই ভুজে ভাঙ্গিল, নৃপনন্দন!
তখন লইল শূল কোপে অরুণ লোচন, ৭
ভদ্রকালী প্রতি তাহা নিক্ষেপিল মহাসুর।
অনন্ত অম্বর পথে তেজে রবি বিম্বমত, ৮
পড়িছে দেখিয়া শূল, দেবী তেয়াগিলা শূল,
সে শূল শতধা করি বধিলা অসুরাতুল। ৯
মহিষের সেনাপতি মহাবীর্য্য হ'লে নাশ,
আসিলেক গজারূঢ় চামর ত্রিদশত্রাস। ১০
সেও নিক্ষেপিল শক্তি, ক্রত তাহা সুরেশ্বরী
হুঙ্কারি আঘাতী ভূমে ফেলিলা নিষ্প্রভ করি। ১১
ভগ্ন শক্তি নিপতিত দেখি, ক্রোধ সমন্বিত
চামর হানিল শূল, হইল বাণে ছেদিত। ১২
লম্ফ দিয়া উঠি সিংহ গজ কুম্ভান্তর স্থিত,
আরম্ভিল বাহু যুদ্ধ ত্রিদশ-অরি সহিত। ১৩
তাহাদের যুদ্ধে হস্তী ভূমিতলে নিপতিত,
দারুণ প্রহারে ঘোর গর্জ্জি হ'লো যুদ্ধান্বিত। ১৪

বেগে লম্ফ দিয়া শূন্যে, পড়ি মৃগশত্রুবীর
করাঘাতে চামরের পৃথক করিল শির। ১৫
শিলা বৃক্ষাঘাতে রণে উদগ্র হইল হত,
দণ্ড মুষ্টি আঘাতেতে করাল হইল গত। ১
ক্রুদ্ধা দেবী গদাপাতে চূর্ণিত সমরোদ্ধত
বাস্কল; অন্ধক, তাম্র, ভিন্দিপালে হ'ল হত। ১৭
উগ্র আস্য, উগ্রবীর্য্য, মহাহনু, সুর-অরি
বিনাশিলা ত্রিশূলেতে ত্রিনেত্রা পরমেশ্বরী। ১৮
কায়া হ'তে বিড়ালের অসিতে কাটিলা শির,
শরে গেল যমালয় দুর্দ্ধর্ষ দুর্ম্মুখ বীর। ১৯
এরূপে হইলে ক্ষয় সসৈন্যে মহিষাসুর
মহিষ স্বরূপে গণে করিলেক ত্রাসাতুর।২০
করিল কাহাকে তুণ্ডে, কারে খুরে আঘাতিত,
লাঙ্গুলে তাড়িত কারে, কারে শৃঙ্গে বিদারিত। ২১
কারে বেগে, কারে নাদে, কারে ভ্রমণের বলে
নিশ্বাস পবনে অন্যে ফেলিতেছে ভূমিতলে। ২২
নিপাতি প্রমথ সৈন্য, ধাইল মহিষ বীর
বধিতে দেবীর সিংহ; অম্বিকা কোপে অধীর। ২৩
সেও করিলেক ক্রোধে খুর-ক্ষুণ্ণ মহীতল,
নিনাদিল, নিক্ষেপিল শৃঙ্গেতে উচ্চ অচল। ২৪
তার বেগ ভ্রমণেতে ক্ষুণ্ণা মহী হ'লো শীর্ণ,
লাঙ্গুলে আহত সিন্ধু করিল জগতাকীর্ণ। ২৫
কম্পিত শৃঙ্গ আঘাতে খণ্ড খণ্ড মেঘ সব
শ্বাসানিলে হ'ল ক্ষিপ্ত গিরিমালা হ'তে নভঃ। ২৬
আসিতেছে মহাসুর ক্রোধেতে উন্মত্ত প্রায়,
তাহাকে বধিতে ক্রোধ করিলেন চণ্ডিকায়। ২৭

বাঁধিলেন মহাসুর পাশাস্ত্র করি ক্ষেপণ;
সে ত্যজি মহিষ রূপ আরম্ভিল মহারণ। ২৮
হইল কেশরী সত্ত যাবত অম্বিকা শির
কাটিলেন, দেখা দিল খড়্গপাণি মহাবীর। ২৯
কাটিলা তাহাকে শীঘ্র প্রহারি সায়কব্রজ
খড়্গ চর্ম্ম ধরি দেবী, হইল সে মহাগজ। ৩০
শুণ্ড দ্বারা মহাসিংহ কর্ষিল গর্জ্জিল আর,
কাটিল সে শুণ্ড দেবী করিয়া খড়্গ প্রহার। ৩১
তখন ধরিল পুনঃ মহিষের কলেবর,
ক্ষোভিত করিল তাহে ত্রৈলোক্য ও চরাচর। ৩২
তখন জগতমাতা করি পান পানোত্তম,
হাসিলেন পুনঃ পুনঃ ক্রোধে অরুণ নয়ন। ৩৩
নাদিল অসুর সেও বলবীর্য্য মদোদ্ধত,
শৃঙ্গে চণ্ডিকার প্রতি নিক্ষেপি ভূধর কত। ৩৪
দেবী শরজালে তাহা করিলেন বিচূর্ণিত,
কহিলেন মুখরাগ—মদোদ্ধত আকুলিত। ৩৫

দেবী কহিলেন।

"গর্জ্জ গর্জ্জ মূঢ় ! মধু পান করি ততক্ষণ।
তোমাকে বধিলে শীঘ্র গর্জ্জিবেন দেবগণ।" ৩৬

ঋষি কহিলেন।

ইহা কহি একলম্ফে আরোহিয়া ক্রোধাকুল,
অসুরে আক্রমি পদে, কণ্ঠে হানিলেন শূল। ৩৭
তখন সে পদাক্রান্ত, তুলে অর্দ্ধ বিনিষ্কৃত,
নিজ মুখ হ'তে, হ'লো দেবীর বীর্য্যে সংবৃত। ৩৮
যুঝিলেক মহাসুর হ'য়ে অর্দ্ধ বিনির্গত,
অসিতে কাটিয়া শির দেবী করিলেন হত। ৩৯

দৈত্য সৈন্য হ'লো নাশ করি তবে হাহাকার,
হইল পরম হর্ষ সমুদয় দেবতার। ৪০
কালিকা দেবীর স্তুতি দেব ঋষি তপোধন,
গাইল গন্ধর্ব্বপতি নাচিল অপ্সরোগণ। ৪১
ইতি মহিষাসুর বধনামক তৃতীয়মাহাত্ম্য। ৩

[চতুর্থ মাহাত্ম্য

—*—

চণ্ডিকাকে নমস্কার।

ঋষি কহিলেন।

দুরাত্মা সুরারি বল অতি বীর্য্য নিপাতিত
হলে দেবী পরাক্রমে, শক্র আদি সুরগণে
করিল তাঁহার স্তুতি,—চারুদেহ রোমাঞ্চিত,—
প্রণত নম্র মস্তকে, অধরে, অংসে, বচনে। ১
জগতের আত্ম-শক্তি, সর্ব্বদেব শক্তিরূপা,
যে দেবীর দ্বারা ব্যাপ্তা এই বিশ্ব চরাচর
অখিল দেব-মহর্ষি-পূজিতা সে অম্বিকায়,
ভক্তিভরে নমি সবে, মঙ্গল বিধান কর। ২
ভগবান্ নারায়ণ ব্রহ্মা হর নাহি পারে
বর্ণিতে অতুল বল, অতুল প্রভাব যাঁর ;
পালিতে অখিল বিশ্ব, নাশিতে অশুভ, ভয়
সে অম্বিকা মহাদেবী কর মতি অনিবার। ৩
সুকৃত ভবনে লক্ষ্মী, অলক্ষ্মী দুষ্কৃত ঘরে,
ধীমান্ হৃদয়ে বুদ্ধি স্বয়ং যে মহেশ্বরী,

সুজনগণের শ্রদ্ধা, লজ্জা কুল-জননীর,
পালহ হে দেবি! বিশ্ব তোমাকে প্রণাম করি। ৪
কি আর বর্ণিব এই অচিন্ত্য রূপ তোমার ?।
অসংখ্য অসুর নাশী কিংবা অতিবীর্য্য তব ?
কিংবা সর্ব্ব দেবা সুরগণদের আহবেতে,
তোমার চরিত যাহা, কি আর আমরা কব ? ৫
সমস্ত জগর্ত হেতু, ত্রিগুণা, না জানে দোষী,
হরি হর দেবগণ, না পায় তোমার পার ;
পরমা আদ্যা প্রকৃতি অখিলের সর্ব্বাশ্রয়া,
তুমি এই জগতের অংশভূতা অবিকার। ৬
যাঁর নাম উচ্চারণে সমুদায় দেবগণ
সকল যজ্ঞেতে সদা তৃপ্তি লাভ করে, দেবি !
তুমি স্বাহা ; পিতৃদের তৃপ্তি হেতু সমুচ্চার্য্য,
স্বধাও তুমিই দেবি ! সর্ব্বজন গণ সেবী। ৭
অবিচিন্ত্য মুক্তি হেতু যেই দেবী মহাব্রতা,
জিতেন্দ্রিয় তত্ত্বজ্ঞানী করে নিত্য ধ্যান যাঁর,—
করে ধ্যান মুনিগণ মোক্ষাকাঙ্ক্ষী পাপহীন,
তুমি বিদ্যা, ভগবতি! পরমা হে দেবি! আর। ৮
সুবিমল শব্দাত্মিকা ঋক্ ও যজু নিধান,
পঠিত সাম বেদের গীত বাণি মনোহরা,
ত্রিবেদ স্বরূপা দেবী, প্রবৃত্তি সৃষ্টির তরে,
তুমি সর্ব্ব জগতের দুঃখ হর্ত্রী শ্রে ত্তরা। ৯
মেধা তুমি তুমি দেবি ! অখিল শাস্ত্রের সার
দুর্গা তুমি, সঙ্গহীন ভব সাগরের তরী,
তুমি লক্ষ্মী কৈটভারি হৃদিপদ্মনিবাসিনী,
তুমি গৌরী, তুমি দেবি ! প্রতিষ্ঠা শশীশেখরী। ১০

পরিপূর্ণ চন্দ্র-বিম্ব-অনুকারী মনোহর
কনক কান্তি উত্তম, ঈষৎ অমল হাসি,—
নিরখি বদন হেন, তথাপি মহিষাসুর
প্রহারিল ক্রোধে শীঘ্র অতীব অদ্ভুত বাসী ১১
দেখিয়া কুপিত তব ভ্রূকুটী করাল মুখ,
উদিত শশাঙ্ক ছবি, নাহি যে সদ্যজীবন
ত্যজিল মহিষাসুর, অতীব বিচিত্র তাঁহা,
কে পারে বাঁচিতে, করি কুপিত যম দর্শন ? ১২
প্রসন্না হইলে হও পরমা সৃষ্টির হেতু,
কোপবতী হ'লে কর সদ্য কুল বিনাশিত,
জানিনু এখন ইহা, যে হেতু হইল তাহে
মহিষাসুরের বল সুবিপুল অস্তমিত। ১৩
খ্যাত তারা জন পদে, হয় তাহাদের ধন,
হয় তাহাদের যশ, ধর্ম্ম, বর্গঃ ক্ষয়হীন,
ধন্য তারা, সুপালিত পুত্র কন্যা ভৃত্য দারা,—
প্রসন্না, অভ্যুদয়দা, যাহাদেরে চির দিন। ১৪
হে দেবি! সকল ধর্ম্ম, কর্ম্ম, সে সুকৃতি নর
করে সদা প্রতিদিন আদরেতে আচরণ ;
পায় স্বর্গ অনন্তর তোমার প্রসাদে তাহে,
হও তিন লোকে দেবি! ফলদাতৃ অনুক্ষণ। ১৫
হে দুর্গে! স্মরিলে হর অশেষ জন্তুর ভয়,
স্মরিলে সুস্থির চিত্তে কর শুভ মতি দান,
দারিদ্র ও দুঃখ-ভয়-হারিণী কে তোমা বিনা ?
সর্ব্বরূপ উপকার করিতে সদার্দ্র প্রাণ ? ১৬
ইহাদের মৃত্যু হ'তে হ'লো জগতের সুখ,
কি পাপ করিতেছিল চির নরকের তরে!

সংগ্রাম মৃত্যুর লভ্য প্রদানিতে দিব্যলোক
বিনাশিলে তাহাদেরে হে দেবি ! সমর করে। ১৭
দৃষ্টিমাত্র পারিতে না করিতে কি ভস্ম সব,
অসুরগণে যে অস্ত্র প্রহারিলে, ভগবতি ! ?
শক্রগণো হউক্ প্রাপ্ত শস্ত্র পূত পুণ্যলোক,
অতি সাধ্বী তুমি, তাহে হ'লো তব হেন মতি। ১৮
শূলাগ্র উগ্র কান্তিতে খড়্গ প্রভাবিস্ফুরণে,
না হইল হত রণে যে সব অসুরগণ,
হইল বিলয় সব, দেবি ! বিলোকন করি
তব এই অংশুপূর্ণ ইন্দু খণ্ড নিভানন। ১৯
দুর্ব্বৃত্ত দমনকারী হে দেবি ! চরিত্র তব,
অন্যের অচিন্তনীয় রূপ তব অতুলিত ;
দেব-পরাক্রম-হারী অসুরনাশক বীর্য্য,
বৈরিতেও এইরূপে দয়া তব প্রকটিত। ২০
তব এ পরাক্রমের আছে কি উপমা ভবে ?
শত্রুভয়-কার্য্য-হারী কোথায় রূপ এমন
চিত্তে কৃপা, সমরের নিষ্ঠুরতা, ত্রিভুবনে
হে দেবি বরদে ! করি তোমাতেই দরশন। ২১
ত্রৈলোক্য অখিল এই রিপুনাশে করি ত্রাণ,
বধিয়া সমর ক্ষেত্রে পাঠাইলা যত অরি
দিব্যলোকে ; আমাদের উন্মদ সুরারিভয়
করিলে দূরীকৃত,—তোমাকে প্রণাম করি। ২২
শূলে রক্ষ আমাদেরে, রক্ষ খড়্গে, হে অম্বিকে !
ঘণ্টাস্বনে কর রক্ষা, রক্ষ ধনুর্গুণে,
রক্ষ পূর্ব্বে, পশ্চিমেতে, চণ্ডিকে রক্ষ দক্ষিণে,
উত্তরে রক্ষ ঈশ্বরি নিজ শূল আস্ফালনে। ২৩। ২৪

যেই সৌম্যারূপে কর ত্রিলোকেতে বিচরণ—
অতি ঘোরা, তাহে রক্ষ সর্ব্বরূপে সুরাদিকে,
খড়্গ শূল গদা অস্ত্র কর-পল্লব শোভন,—
সর্ব্বরূপে আমাদেরে রক্ষ তাহে, হে অম্বিকে। ২৫।২৬

ঋষি কহিলেন।

করি স্তুতি সুরগণ নন্দন কুসুমগণে
পূজিলা জগত ধাত্রী সুগন্ধ অনুলেপনে। ২৭
দেব দ্বারা ভক্তিভা ধূপেতে হয়ে ধূপিতা,
কহিলা প্রণত সুরে সুমুখী সুপ্রসন্নিতা। ২৮

দেবী কহিলেন।

কহ সর্ব্ব দেবগণ তোমাদের কি বাঞ্ছিত?
দিব আমি হয়ে স্তবে সুপূজিতা, অতি প্রীত। ২৯

দেবতারা কহিলেন।

করিলেন ভগবতী সব, কিছু নাহি আর
যখন মহিষাসুর হত শত্রু দেবতার। ৩০
তবু যদি দিবে বর আমাদের মাহেশ্বরি!
নাশিও পরমাপদ যখন আমরা স্মরি। ৩১
যে নর এ স্তবে তোমা তুষিবে অমলাননে!
সমৃদ্ধি বিভবে তাকে, সম্পদ স্ত্রী পুত্র ধনে, ৩২
বাড়াও অম্বিকে! তুমি প্রসন্না যে দেবগণে। ৩৩

ঋষি কহিলেন।

জগত ও দেব তরে এরূপে হ'য়ে প্রার্থিতা,
"তাই হউক"—বলি কালী হইলেন অন্তর্হিতা। ৩৪
কহিলাম যথা পূর্ব্বে হইলা সম্ভূতা তিনি
দেব-দেহ হ'তে দেবী, ত্রিজগত-হিতৈষিণী। ৩৫

যেই রূপে হইলেন গৌরী দেহা পুনর্ব্বার,
বধিতে নিশুম্ভ শুম্ভ দুষ্ট দৈত্য দুরাচার, ৩৬
সাধিতে দেবের হিত রক্ষিবারে লোকগণ—
আখ্যাত করিব আমি শুন সেই বিবরণ। ৩৭

ইতি শক্রাদি স্তুতি নামক চতুর্থ মাহাত্ম্য। ৪।

[পঞ্চম মাহাত্ম্য]

চণ্ডিকাকে নমস্কার

ঋষি কহিলেন।

হরিল ইন্দ্রের পূর্ব্বে শুম্ভ ও নিশুম্ভদ্বয়
ত্রৈলোক্য ও যজ্ঞ ভাগ করি মদ বলাশ্রয় ১
সূর্য্যত্ব, চন্দ্রত্ব, তারা সেই রূপে অধিকার
করিলে, ও কুবেরত্ব, যাম্য, বরুণত্ব আর ২
লইল পবন-ঋদ্ধি, বহ্নি-কর্ম্ম দুর্ব্বিনীত,
ভ্রষ্ট রাজ্য দেবগণ নিষ্কাসিত, পরাজিত। ৩
হৃতরাজ্য, মহাসুর হস্তে, শক্তি নির্ব্বাসন,
সে দেবী অপরাজিতা স্মরিলেক দেবগণ। ৪
দিলা বর,—"আপদেতে স্মরিলে অমরগণ,
নাশিব পরমাপদ তোমাদের সেইক্ষণ"।
ইহা মনে করি গিয়া নগেশ্বর হিমাচলে,
দেবী বিষ্ণু-মায়া স্তুতি করিল দেব সকলে। ৬

দেবগণ কহিলেন।

দেবী, মহাদেবী, শিবা প্রণাম তাঁকে সতত
প্রকৃতি ভদ্রাকে আর প্রণাম করি নিয়ত। ৭
রৌদ্রা, নিত্যা, গৌরী, ধাত্রী. প্রণাম তাঁকে প্রণাম,
জ্যোৎস্না, চন্দ্ররূপিণী, সুখাকে সদা প্রণাম। ৮
নমস্কার বৃদ্ধি, সিদ্ধি, কল্যাণীকে নমস্কার
নৈর্ঋতী ও রাজলক্ষ্মী, সর্ব্বাণীকে নমস্কার। ৯
দুর্গা, দুর্গা-পারা, সারা সর্ব্বকারিণীকে আর,
খ্যাতা, কৃষ্ণা, ধূম্রাকেও করি সদা নমস্কার। ১০
অতি সৌম্যা, অতি রৌদ্রা, করি তাঁকে নমস্কার।
জগত প্রতিষ্ঠা দেবী তাঁকে করি নমস্কার। ১১
যেই দেবী সর্ব্বভূতে বিষ্ণু-মায়া খ্যাত নাম,
প্রণাম, প্রণাম তাঁকে প্রণাম তাঁকে প্রণাম। ১২
যে দেবীর সর্ব্বভূতে চেতনা এ অভিধান,
প্রণাম, প্রণাম তাঁকে, প্রণাম তাঁকে প্রণাম। ১৩
যে দেবীর সর্ব্বভূতে বুদ্ধিরূপে সংস্থান.
প্রণাম, প্রণাম তাঁকে, প্রণাম তাঁকে প্রণাম। ১৪
যে দেবীর সর্ব্বভূতে নিদ্রারূপে সংস্থান,
প্রণাম, প্রণাম তাঁকে, প্রণাম তাকে প্রণাম। ১৫
যে দেবীর সর্ব্বভূতে ক্ষুধারূপে সংস্থান,
প্রণাম, প্রণাম তাঁকে, প্রণাম তাঁকে প্রণাম। ১৬
যে দেবীর সর্ব্বভূতে, ছায়ারূপে সংস্থান,
প্রণাম, প্রণাম তাঁকে, প্রণাম তাঁকে প্রণাম। ১৭
যে দেবীর সর্ব্বভূতে, শক্তিরূপে সংস্থান,
প্রণাম, প্রণাম তাঁকে, প্রণাম তাঁকে প্রণাম। ১৮

যে দেবীর সর্ব্বভূতে তৃষ্ণা রূপে সংস্থান,
প্রণাম, প্রণাম তাঁকে, প্রণাম তাঁকে প্রণাম ১৯
যে দেবীর সর্ব্বভূতে ক্ষান্তিরূপে সংস্থান,
প্রণাম, প্রণাম তাঁকে, প্রণাম তাঁকে প্রণাম। ২০
যে দেবীর সর্ব্বভূতে জাতিরূপে সংস্থান,
প্রণাম, প্রণাম তাঁকে, প্রণাম তাঁকে প্রণাম। ২১
যে দেবীর সর্ব্বভূতে লজ্জারূপে সংস্থান,
প্রণাম, প্রণাম তাঁকে, প্রণাম তাঁকে প্রণাম। ২২
যে দেবীর সর্ব্বভূতে শান্তিরূপে সংস্থান,
প্রণাম, প্রণাম তাঁকে, প্রণাম তাঁকে প্রণাম। ২৩
যে দেবীর সর্ব্বভূতে, শ্রদ্ধারূপে সংস্থাপন,
প্রণাম প্রণাম তাঁকে প্রণাম তাঁকে প্রণাম। ২৪
যে দেবীর সর্ব্বভূতে কান্তিরূপে সংস্থান,
প্রণাম, প্রণাম তাঁকে, প্রণাম তাঁকে প্রণাম। ২৫
যে দেবীর সর্ব্বভূতে লক্ষ্মীরূপে সংস্থান,
প্রণাম, প্রণাম তাঁকে, প্রণাম তাঁকে প্রণাম। ২৬
যে দেবীর সর্ব্বভূতে বৃত্তিরূপে সংস্থান,
প্রণাম, প্রণাম তাঁকে, প্রণাম তাঁকে প্রণাম। ২৭
যে দেবীর সর্ব্বভূতে, স্মৃতিরূপে সংস্থান,
প্রণাম, প্রণাম তাঁকে, প্রণাম তাঁকে প্রণাম। ২৮
যে দেবীর সর্ব্বভূতে, দয়ারূপে সংস্থান,
প্রণাম, প্রণাম তাঁকে, প্রণাম তাঁকে প্রণাম। ২৯
যে দেবীর সর্ব্বভূতে তুষ্টিরূপে সংস্থান,
প্রণাম, প্রণাম তাঁকে প্রণাম তাঁকে, প্রণাম। ৩০
যে দেবীর সর্ব্বভূতে, মাতৃরূপে সংস্থান,
প্রণাম. প্রণাম তাঁকে, প্রণাম তাঁকে প্রণাম। ৩১

যে দেবীর সর্ব্বভূতে ভ্রান্তিরূপে সংস্থান,
প্রণাম, প্রণাম তাঁকে, প্রণাম তাঁকে প্রণাম। ৩২
সর্ব্বভূত ইন্দ্রিয়েতে যে দেবীর অধিষ্ঠান,—
যাহা সর্ব্বভূতে ব্যাপ্তা—প্রণাম পুনঃ প্রণাম। ৩৩
চিৎরূপে সর্ব্ব বিশ্ব ব্যাপী যাঁর অবস্থান,
প্রণাম, প্রণাম তাঁকে, প্রণাম তাঁকে প্রণাম। ৩৪
পূর্ব্বে সুরগণে স্তুতা ইষ্ট তরে,
সুরেন্দ্রে সেবিতা নিত্য অবিরাম,
বিনাশি আপদ্ শুভ বিধায়িনী!
কর আমাদের মঙ্গল বিধান। ৩৫
উদ্ধত অসুরে তাপিত আমরা,
যেই ঈশ্বরীকে নমিনু এখন
ভক্তি নম্র দেহে, স্মরিলে যাঁহাকে
সকল আপদ নাশেন তখন। ৩৬

ঋষি কহিলেন।

এরূপে করিলে স্তুতি দেবেরা, তবে পার্ব্বতী
গেলেন জাহ্নবিজলে স্নান হেতু নরপতি। ৩৭
কহিলা সে সুভ্র দেবে—"করিছ স্তুতি কাহার"
উত্তরিলা শিবা দেহ-কোষ-সমুদ্ভূতা-তাঁর,—৩৮
"করিছে আমার স্তুতি শুম্ভ দৈত্যে নিরাকৃত
দেবেরা, নিশুম্ভ-সহ সমরেতে পরাজিত।" ৩৯
পার্ব্বতী-শরীর-কোষ-নিঃসৃত সে অম্বিকায়
'কৌষিকী' আখ্যাতি দিয়া সমস্ত লোকেতে গায়। ৪০
হ'য়ে বিনির্গত কৃষ্ণা হইলা দেবী অম্বিকা
চলি গেলা হিমাচলে হইয়া খ্যাতা কালিকা। ৪১

করিল সে অম্বিকার সুন্দর রূপ পরম
শুম্ভ নিশুম্ভের ভৃত্য চণ্ড মুণ্ড দরশন। ৪২
কহিল শুম্ভেরে তারা—"মনোহরা, মহাবল
কেবা নারী নিরুপমা" দীপিতেছে হিমাচল। ৪৩
দেখি নাই কারো কভু তাদৃশ রূপ উত্তম;
জান কে সে দেবী, কর অসুরেশ্বর! গ্রহণ। ৪৪
স্ত্রীরত্ন চারু অঙ্গিনী তেজে দিক্ উজ্জ্বলিত,
বিরাজে, দৈত্যেন্দ্র তাকে দেখা তব সমুচিত। ৪৫
আছে প্রভো! যেই রত্ন মণি গজ অশ্বগণ
ত্রৈলোক্যেতে, সবে এবে দীপিছে তব ভবন। ৪৬
আনিয়াছ ইন্দ্র হ'তে গজরত্ন ঐরাবত,
পারিজাত তরু, অশ্ব উচ্চৈঃশ্রবা সেই মত। ৪৭
হংসযুক্ত রথ তব অঙ্গনেতে বিরাজিত,
আছিল ব্রহ্মার যাহা অদ্ভুত রত্ন-ভূষিত। ৪৮
কুবের হ'তে আনিত মহাপদ্ম নিধি আলা,
কিঞ্জল্কিনী দিলা সিন্ধু অম্লান পঙ্কজমালা। ৪৯
তব গেহে বরুণের স্বর্ণস্রাবী ছত্র ছায়া,
তেমতি স্যন্দনবর, ব্রহ্মার আছিল যাহা। ৫০
মহাশক্তি উৎক্রান্তিদা যমের হয়েছে হৃত,
করেছে পাশীর পাশ তোমার ভ্রাতা গৃহীত। ৫১
নিশুম্ভের সিন্ধুজাত সমুদয় রত্নগণ;
অনল দিলা তোমাকে অগ্নিশৌচ দ্বিবসন। ৫২
এরূপে সমস্ত রত্ন করিয়াছ আহরণ!
কল্যাণি স্ত্রীরত্ন কেন কর না তুমি গ্রহণ?" ৫৩

ঋষি কহিলেন।

শুম্ভ সে চণ্ড মুণ্ডের বচন করি শ্রবণ,

এরূপ কহিবে গিয়া যাতে সে বচনে মম
প্রতীতে আইস শীঘ্র, কর তথা আচরণ। ৫৫
দেবী যে শোভন শৈলে তথায় করি গমন,
মৃদুল মধুর ভাবে করিল সে নিবেদন ৫৬

দূত কহিল।

দেবি! দৈত্যেশ্বর শুম্ভ ত্রৈলোক্যে পরমেশ্বর,
তাঁহার প্রেরিত দূত তব কাছে এ কিঙ্কর ৫৭
সকল দেবতাগণে যাঁর আজ্ঞা অব্যাহত,
কহিল অখিল জয়ী দৈত্য শুন যেই মত। ৫৮
"অখিল ত্রৈলোক্য মম, দেবগণ বশে মম,
পৃথক পৃথক আমি ভুঞ্জি যজ্ঞভাগ গণ। ৫৯
ত্রৈলোক্যেতে শ্রেষ্ঠ রত্ন অশেষ বশেতে মম,
হরিয়াছি গজরত্ন তথা দেবেন্দ্র বাহন। ৬০
ক্ষীরোদ মথনোদ্ভূত উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ববর,
সমর্পিল প্রণিপাত করিয়া যত অমর। ৬১
যাহা ছিল অন্য দেবে, গন্ধর্ব্ব, উরগগণে
রত্নরূপ সেই সব আমাতে আছে, শোভনে! ৬২
তোমাকে স্ত্রীরত্নভূত ত্রিলোক আমরা মানি,
তুমি আমাদের কাছে এস রত্নভোগী জানি। ৬৩
আমাকে, বা মমানুজ নিশুম্ভ মহাবিক্রম,
ভজ হে চঞ্চলাপাঙ্গি! রত্নভূত নারী ধন। ৬৪
অতুল পরমৈশ্বর্য্য পাইবে করি বরণ।
ইহা আলোচনা করি আমাকে কর গ্রহণ। ৬৫

ঋষি কহিলেন।

শুনিয়া গম্ভীরা দেবী হাসিলেন মনে তিনি,—
দুর্গা, ভগবতী, ভদ্রা, জগত ধারিণী যিনি। ৬৬

দেবী কহিলেন।

কিছু নহে মিথ্যা, সত্য কহিলে এ কথা যত,
ত্রৈলোক্য ঈশ্বর শুম্ভ নিশুম্ভও সেইমত। ৬৭
ক'রেছি প্রতিজ্ঞা কিন্তু মিথ্যা কিসে করি পুনঃ?
অল্প বুদ্ধি হেতু পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা ক'রেছি শুন। ৬৮
যে আমাকে জিনে রণে, করে দর্প চূর্ণ মম,
যে আমার প্রতিযোগী ভর্ত্তা হবে সেই জন। ৬৯
করি শুম্ভ কিঁ নিশুম্ভ মহাসুর আগমন
আমাকে জিনিয়া শীঘ্র করুক পাণিগ্রহণ। ৭০

দূত কহিল।

নিশ্চয় প্রলাপ দেবি! কহিতেছ মম কাছে
শুম্ভ নিশুম্ভের আগে তিষ্ঠে কে ত্রিলোকে আছে? ৭১
অন্য দৈত্যদেরও আগে নাহি তিষ্ঠে দেবগণ
একাকিনী নারী তুমি পুনঃ কি করিবে রণ? ৭২
যাহাদের যুদ্ধে নাহি তিষ্ঠে ইন্দ্র দেবগণ,
সেই শুম্ভদের আগে করিবে নারী গমন? ৭৩
শুম্ভ নিশুম্ভের কাছে যাও তুমি রাখ কথা;
অগৌরবা কেশাকৃষ্টা অন্যথা যাইবে তথা। ৭৪

দেবী কহিলেন।

এমনই বলী শুম্ভ, নিশুম্ভ, ও বীর্য্যবান্।
কি করি প্রতিজ্ঞা মম কহিয়াছি, নহে আন। ৭৫
যাও তুমি মম কথা এইরূপে সর্ব্বাদৃত
কহ গিয়া অসুরেন্দ্রে করুক যাহা বিহিত। ৭৬

ইতি দূত সংবাদ নামক পঞ্চম মাহাত্ম্য। ৫।

[ষষ্ঠ মাহাত্ম্য।]

—*—

চণ্ডিকাকে নমস্কার।

ঋষি কহিলেন।

দেবীর বচন শুনি সে দূত ক্রোধ পূরিত
দৈত্যরাজ কাছে গিয়া কহিলেন বিস্তারিত। ১
শুনিয়া অসুর রাজ দূত বাক্য সেইক্ষণে
সক্রোধে কহিলা দৈত্য-অধিপ ধূম্রলোচনে। ২

শুম্ভ কহিলেন।

হে ধূম্রলোচন! তুমি বেষ্টিত স্বসৈন্য গণে
আন বলে সে দুষ্টাকে বিহ্বলা কেশাকর্ষণে। ৩
পরিত্রাণকারী তার থাকে যদি কোন জন—
হউক অমর, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব,—করি হনন। ৪

ঋষি কহিলেন।

হইয়া অজ্ঞাপ্ত শীঘ্র সে দৈত্য ধূম্রলোচন
অসুর সহস্র ষষ্টি সহ গেল সেইক্ষণ। ৫
তুহিন-অচল-স্থিতা দেবীকে করি দর্শন,
শুম্ভ নিশুম্ভের কথা কহিল উচ্চে তখন। ৬
"প্রীতিতে প্রভুর কাছে না যাও যদি অবলা,
নিব তার ধরি বলে কেশাকর্ষণে বিহ্বলা।" ৭

দেবী কহিলেন।

বলবান্ বলযুত পাঠাইলা দৈত্যস্বামি,
বলে যদি নেও তুমি, কি আর করিব আমি? । ৮

ঋষি কহিলেন।

ইহা শুনি দেবী প্রতি ধাইল ধূম্রলোচন।
হুঙ্কারে অম্বিকা, ভস্ম করিলেন সেইক্ষণ।৯
অসুরের মহাসৈন্য ক্রোধে অম্বিকার প্রতি,
বর্ষিল পরশু শক্তি, সায়ক সুতীক্ষ্ণ অতি। ১০
দেবীর বাহন সিংহ, কম্পিত কেশর সব,
পড়িল অসুর সৈন্যে করিয়া ভৈরব রব। ১১
কাহাকে কর প্রহারে, অপর দৈত্য বদনে
আক্রমি অধরে অন্যে নাশিল অসুরগণে। ১২
বিদীর্ণ উদর কারো হলো নখে কেশরীর
চল প্রহারেতে কারো হইল পৃথক শির। ১৩
বিচ্ছিন্ন মস্তক বাহু হইল তাহে অপর।
অন্যের উদর রক্ত খাইল ধূতকেশর। ১৪
দেবীর বাহন সেই কেশরী অতি কোপন,
ক্ষণেকে সকল সৈন্য বিনাশিল মহাত্মন্। ১৫
শুনিয়া, করিল দেবী নিহত ধূম্রলোচন,
নাশিল সকল সৈন্য কেশরী দেবী বাহন, ১৬
কোপিল দৈত্যাধিপতি শুম্ভ প্রস্ফুরিতাধর,
চণ্ড মুণ্ড মহাসুরে আজ্ঞা দিল অতঃপর। ১৭
"হে চণ্ড! হে মুণ্ড! সৈন্য লয়ে সঙ্গে বহুতর,
"যাও তথা, গিয়া তাকে আন হেতা শীঘ্রতর। ১৮
"কেশে ধরি, বান্ধিয়া বা যদি তব পায় মনে
"যুদ্ধেতে অশেষ অস্ত্রে আঘাতি অসুরগণে। ১৯
"দুষ্টাকে আহত করি, বিনাশিয়া সিংহবর,
"বাঁধিয়া লইয়া এস অম্বিকাকে শীঘ্রতর।" ২০

ইতি ধূম্রলোচন বধনামক ষষ্ঠ মাহাত্ম্য। ৬

[সপ্তম মাহাত্ম্য]

—*—

চণ্ডিকাকে নমস্কার।

ঋষি কহিলেন।

আজ্ঞা পেয়ে দৈত্যগণ চণ্ড মুণ্ড পুরঃসর,
চতুরঙ্গ সৈন্যসহ চলিল উদ্যত শর। ১
দেখিল ঈষদ হাস্যে স্থিতা দেবী অতঃপর,
মহতী কাঞ্চন শৃঙ্গে শৈলেন্দ্রেতে সিংহোপর। ২
দেখিয়া হলো উদ্যত করিতে তাঁকে গ্রহণ,
আকর্ষিয়া চাপ, অসি ধরি গেল অন্য জন। ৩
অম্বিকা করিলা অতি কোপ অরিগণ প্রতি,
ক্রোধে মসিবর্ণ মুখ হইল ভীষণ অতি। ৪
ললাট ফলক হতে—ভ্রূকুটি কুটিলাননী,—
করাল বদনা কালী জন্মিলা অসি পাশিনী। ৫
বিচিত্র খট্টাঙ্গ-ধরা, নরমালা বিভূষণা,
ব্যাঘ্র চর্ম্ম পরিধানা, শুষ্ক মাংসা বিভীষণা। ৬
কি ভীষণ লোল জিহ্বা! কিবা মুখ বিস্তারিত,
নিমগ্ন রক্ত নয়ন দিঙ্মুখ নাদে পূরিত ৭
বেগে পড়ি নাশিতেছে প্রবল অসুরগণ,
সুরারির সৈন্যে পড়ি করিছে সৈন্য ভক্ষণ। ৮
পার্ষ্ণি ও অঙ্কুশগ্রাহী যোধ-ঘণ্টা-সমন্বিত
হস্তিগণ, একহস্তে করে মুখে নিক্ষেপিত। ৯
যোদ্ধা সহ অশ্ব, রথ সহিত সারথিগণ,
নিক্ষেপিয়া মুখে, দন্তে করিছে ভীম চর্ব্বণ। ১০

কাহাকে ধরিয়া কেশে গ্রীবা ধরি অন্যজন,
আক্রমিয়া কাকে পদে, বক্ষে, করে নিপতন। ১১
তথা অসুরের নিক্ষেপিত মহা অস্ত্র শস্ত্র যত,
গ্রাসিতেছে ক্রোধে, দন্তে করিতেছে বিমথিত। ১২
মহাবলী, মহাবীর, অসুরের সৈন্যগণ,—
মর্দ্দিছে ভক্ষিছে কাকে, করিছে কাকে তাড়ন। ১৩
অসিতে নিহত কেহ, কেহ খট্টাঙ্গ তাড়িত,
দন্তাগ্রে আহত হ'য়ে হইতেছে বিনাশিত। ১৪
ক্ষণেকে সকল সৈন্য অসুরের নিপাতিত
দেখি চণ্ড, হ'লো ভীমা কালিকা প্রতি ধাবিত। ১৫
মুণ্ডাসুরও ভীমাক্ষীকে বর্ষি মহা ভীম শর,
সহস্র সহস্র চক্রে ছাইল সে কলেবর। ১
সে সব অনেক চক্রে তাঁর মুখ ভয়ঙ্কর,
হ'লো যথা বহু অর্ক-বিম্ব-পূর্ণ ঘনোদর। ১৭
ভৈরব নাদিনী ভীমা হাসিলেন খল খল;
কালীর করাল মুখ দুর্দর্শ দশনোজ্জ্বল। ১৮
আরোহিয়া মহা সিংহ, হুঙ্কার করি গভীর,
কেশেতে ধরিয়া তার খড়্গে কাটিলেন শির। ১৯
ধাইলেক মুণ্ড তবে দেখি চণ্ড বিনাশিত,
তাহাকে করিলা খড়্গে ভূমিতলে নিপাতিত। ২০
হতশেষ সৈন্যগণ দেখি হত চণ্ডাসুর
মহাবীর্য্য মুণ্ড হত, পলাইল ভয়াতুর। ২১
চণ্ড ও মুণ্ডের শির লয়ে করে কালিকায়,
হাসি মহা অট্টহাসি, কহিলেন চণ্ডিকায়,—২২
"মহাপশু চণ্ড মুণ্ড বধিয়াছি, অতঃপর
যুদ্ধ যজ্ঞে স্বয়ং শুম্ভে নিশুম্ভে হনন কর।" ২৩

ঋষি কহিলেন।

চণ্ড মুণ্ড অসুরের দেখিয়া শির আনীত,
কল্যাণী চণ্ডিকা-বাণী কহিলেন সুললিত—২৪
"চণ্ড মুণ্ড বধি তুমি হইয়াছ উপস্থিত,
চামুণ্ডা নামেতে তুমি হইবে লোকে পূজিত।" ২৫
ইতি চণ্ড মুণ্ড বধ নামক সপ্তম মাহাত্ম্য। ৭।

[অষ্টম মাহাত্ম্য]

—:•:—

চণ্ডিকাকে নমস্কার।

ঋষি কহিলেন।

হ'লে চণ্ড বিনিহত, মুণ্ড ও বিনিপাতিত,
বহু বল বহু সৈন্য হইলে সর্ব্ব ক্ষয়িত, ১
তখন প্রতাপী শুম্ভ ক্রোধেতে অধীর মন,
আদেশিল দৈত্য সৈন্য সাজিতে করিতে রণ। ২
"দৈত্য ষড়শীতি সহ সর্ব্ব-বল শস্ত্রোথিত,
"চৌরাশী কম্বু-কুলজ যাক হ'য়ে সৈন্যাবৃত। ৩
"কোটি বীর্য্য নামধারী পঞ্চশত কুলগণ
"ধৌম্র নামা শত কুল, যাউক আজ্ঞায় মম। ৪
"কালকা, দৌহৃদা, মৌর্য্য, কালকেয়, বীর!
"সাজিয়ে যুদ্ধের সাজে যাউক আজ্ঞায় মম।" ৫
আজ্ঞা দিয়া অসুরপতি শুম্ভ ভৈরব-শাসন,
বহুল সহস্র সৈন্যে করিল যুদ্ধে গমন।

দেখিয়া চণ্ডিকা সৈন্য আসিছে অতি ভীষণ,
ধনুর টঙ্কারে পূর্ণ করিলা ধরা গগণ। ৭
করিল ভীষণ নাদ নৃপ! সিংহ মহাকায়,
ঘণ্টাস্বনে সেই নাদ বাড়াইলা অম্বিকায়। ৮
ধনু, সিংহ, ঘণ্টা শব্দে প্রপূরিত দিঙ্‌মণ্ডল।
নিনাদে জিনিলা কালী বিস্তারিয়া যুঝোদ্যত ৯
দৈত্য সৈন্য চতুর্দ্দিকে সে নিনাদ হয়ে শ্রুত
দেবীসিংহ আর কালি সরোষেতে পরিবৃত। ১০
এমন সময়ে ভূপ! সুর-শত্রু নাশিবারে
অতি বীর্য্য অমরের শুভ কার্য্য সাধিবারে, ১১
বাহিরি শরীর হতে গেল কাছে চণ্ডিকার,
ব্রহ্মার বিষ্ণুর শক্তি, কার্ত্তিক ইন্দ্রের আর। ১২
যে দেবের যেই রূপ ভূষণ যথা বাহন
সেইরূপে শক্তি তাঁর করিল যুদ্ধে গমন। ১৩
অক্ষসূত্র কমণ্ডলু করে, হংস-যুক্ত রথে,
আসিল ব্রহ্মার শক্তি ব্রহ্মাণী খ্যাত জগতে। ১৪
মাহেশ্বরী বৃষারূঢ়া ত্রিশূলবর ধারিণী,
মহতি বলয়া যুতা চন্দ্ররেখা বিশোভিনী। ১৫
ময়ূর-বর বাহনা কৌমারী শক্তিধারিণী,
দৈত্য যুদ্ধে আসিলেন অম্বিকা গুহরূপিণী। ১৬
তেমতি বৈষ্ণব শক্তি গরুড় উপরি স্থিতা,
শঙ্খ-চক্র গদা-পদ্ম-খড়্গ-হস্তা উপনীতা। ১৭
হরির অতুল যজ্ঞ-বরাহ রূপে রূপিণী,
সে শক্তিও গেল তথা বারাহী তনুধারিণী। ১৮
গেল নারসিংহী দেহ নৃসিংহ সদৃশ ধরি,
স্কন্ধের লোম-ক্ষেপ নক্ষত্র বিক্ষিপ্ত করি। ১৯

বজ্র-হস্তা তথা ঐন্দ্রী আরোহিয়া ঐরাবত,
সহস্র নয়না গেল যথা ইন্দ্র সেই মত। ২০
দেব, শক্তি পরিবৃত্ত কহিলা ঈশান তবে
চণ্ডিকায়—"কর প্রীতি বধিয়া অসুর সবে।" ২১
বাহিরিল দেবী দেহ হইতে ভীষণাননী
চণ্ডিকা, অত্যুগ্রা শক্তি শত শিবা নিনাদিনী। ২২
ঈশানে ধূম্র-জটিল অপরাজিতা তখনি
কহিলা নিশুম্ভ শুম্ভ কাছে যাও ভগবন্। ২৩
"কহ শুম্ভ নিশুম্ভকে দানব অতি গর্ব্বিত,
"অন্য যে দানব আছে যুদ্ধ তরে উপস্থিত, ২৪
"ত্রৈলোক্য লভুক ইন্দ্র, হবির্ভুজ দেবগণ
"পাতালে প্রয়াণ কর ইচ্ছহ যদি জীবন। ২৫
"বলের মত্ততা হেতু ইচ্ছা কর যদি রণ,
"তোমাদের মাংসে তৃপ্ত হ'ক মম শিবাগণ!" ২৬
করিলা দৌত্যেতে দেবী স্বয়ং শিব নিয়োজিত,
'শিব দূতী'—এই খ্যাতি হ'ল লোকে প্রচলিত। ২৭
শিব মুখে দেবী বাক্য শুনি মহাসুরগণ,
গেল কাত্যায়নী যথা অমর্ষপূরিত মন। ২৮
শর, শক্তি, ঋষ্টি বৃষ্টি করিয়া সর্ব্ব প্রথম,
দেবী সহ যুঝে ক্রোধে যত অমরারিগণ। ২৯
সেই বাণ, শূল, চক্র, ধ্বনিত ধনুক ধরি,
পরশু কুঠার সব, কাটিলেন লীলা করি। ৩০
অগ্রেতে করিয়া কালী শূলপাতে বিদারিত
করিলেন বিচরণ খট্টাঙ্গে করি পাতিত। ৩১
কমণ্ডলু জলক্ষেপে হত বীর্য্য হত বল
করিল ব্রহ্মাণী শক্তি, ধাইতেছে যে সকল। ৩২

বৈষ্ণবী চক্রেতে, তথা ত্রিশূলেতে মাহেশ্বরী
কোপনা কৌমারী দৈত্য, বধিলেন শক্তি ধরি। ৩৩
ঐন্দ্রী বজ্রাঘাতে দৈত্য পড়িলেক অগণন
ভূমিতলে, বিদারিত রুধির করি বমন। ৩৪
তুণ্ড প্রহারে বিধ্বস্ত, বক্ষ দংষ্ট্রাগ্রেতে ক্ষত,
চক্রে বিদারিত করি বারাহী ফেলিলা কত। ৩৫
ভক্ষিয়া বিদারি নখে অন্ত মহাসুর দল
নারসিংহী ভ্রমে রণে নাদে পূরি দিঙ্মণ্ডল। ৩৬
চণ্ডাট্ট হাসিতে করি শিবদূতী আঘাতিত,
খাইছে অসুরগণ ভূতলে করি পাতিত। ৩৭
করিতেছে মাতৃগণ অসুর ক্রোধে, মর্দ্দন,
দেখি নানামতে নাশে দেবারি সৈনিকগণ, ৩৮
মাতৃগণার্দ্দিত দৈত্য দেখি পলায়ণপর,
যুদ্ধার্থে আসিল ক্রুদ্ধ রক্তবীজ বীরবর। ৩৯
দেহ হতে হয় যদি রক্তবিন্দু ভূমিগত,
মেদিনী হইতে জন্মে মহাসুর সেইমত। ৪০
যুদ্ধে ইন্দ্র শক্তি ধরি মহাসুর গদাপাণি,
আঘাতিলা রক্তবীজে ঐন্দ্রী নিজ বজ্রহানি। ৪১
কুলিশ আঘাতে শীঘ্র শোণিত হয়ে পতন,
সমুত্থিত হ'লো যোদ্ধা তদ্রূপ তদ্‌পরাক্রম। ৪২
দেহ হতে রক্তবিন্দু যাবৎ হলো পতিত,
তাবৎ জন্মিল বীর তদ্‌বীর্য্য তদ্‌বলান্বিত। ৪৩
পুরুষ রক্তসম্ভূত যুদ্ধে মাতৃগণ সনে
অত্যুগ্র শস্ত্র নিক্ষেপ অতীব ভীষণ রণে। ৪৪
পুনঃ বজ্রাঘাতে ক্ষত করিলে শির তাহার,
বহি রক্ত জনমিল পুরুষ সহস্র আর। ৪৫

করিল চক্রেতে হত বৈষ্ণবী সমরে পরে,
করিল গদায় ঐন্দ্রী তাড়িত অসুরেশ্বরে। ৪৬
বৈষ্ণবীর চক্রে ভিন্ন রুধির-স্রাব সম্ভব
সহস্র সহস্রাসুরে ব্যাপিত করিল ভব। ৪৭
কৌমারী-শক্তিতে, অসি বারাহী প্রহার করি,
আঘাতিল রক্তবীজে ত্রিশূলেতে মাহেশ্বরী। ৪৮
রক্তবীজ মহাসুর কোপ সমাবিষ্ট মন
করিল গদায় দৈত্য আহত মাতৃকাগণ। ৪৯
বহু শক্তি শূলাহত হইয়া, ভূতলে তার
পড়ি রক্ত, শত শত জন্মিল অসুর আর। ৫০
রক্তজাত সে অসুরে হইল পৃথিবীময়
তাহাতে হইলা ভীত দেবগণ অতিশয়। ৫১
চণ্ডিকা দেখিয়া সেই সুরগণ বিষাদিত,
কহিলা—"চামুণ্ডে! তুমি কর মুখ বিস্তারিত,—৫২
"মম শস্ত্রপাতে রক্তবিন্দু-জাত দৈত্যগণ,
"বেগেতে সকল তব বদনে কর গ্রহণ। ৫৩
"বিচরণ কর রণে ভক্ষি মহাসুরচয়,
"ক্ষীণ রক্ত দৈত্য তবে এইরূপে হবে ক্ষয়। ৫৪
"তব উগ্র ভক্ষণেতে পুনঃ না জন্মিবে আর।"
ইহা কহি দেবী তাকে করিলা শূল প্রহার। ৫৫
শোণিত রক্তবীজের লইয়া মুখে কালিকা,
হইলেন আঘাতিত গদায় তার চণ্ডিকা। ৫৬
হইল না ব্যথামাত্র গদাপাতে আবির্ভাব।
আহত হ'লে অসুর, হইল শোণিতস্রাব। ৫৭
চামুণ্ডা সকল রক্ত করিলা মুখে গ্রহণ,
বদনে আসিল যেই রক্ত-জন্মা দৈত্যগণ। ৫৮

খাইলা চণ্ডিকা, রক্ত পান করি সেইক্ষণ,
প্রহারিয়া দেবী শূল, বজ্র, অসি, ঋষ্টি, বাণ। ৫৯
আঘাতিলা রক্তবীজ, শোণিত করিলা পান,
পড়িল ধরণী পৃষ্ঠে, শস্ত্রজালে সমাহত। ৬০
রক্তবীজ মহাসুর, রক্তহীন, হে সুরথ!
তখন অতুল হর্ষ লভিলা সর্ব্ব দেবতা,
নাচিলেন মাতৃগণ শোণিত-মদ উদ্ধতা। ৬১

ইতি রক্তবীজ বধনামক অষ্টম মাহাত্ম্য। ৮

[নবম মাহাত্ম্য।]

চণ্ডিকাকে নমস্কার।

রাজা কহিলেন।

কহিলেন, ভগবন! মম কাছে আখ্যাতিত
রক্তবীজ বধ কথা—বিচিত্র দেবী চরিত। ১
পুনঃ ইচ্ছা শুনি, হলে রক্তবীজ নিপতন
কি কাজ করিল শুম্ভ নিশুম্ভ অতি কোপন। ২

ঋষি কহিলেন।

রক্তবীজ আহবেতে এইরূপে হ'লে ক্ষয়
করিল অতুল কোপ শুম্ভ ও নিশুম্ভদ্বয়। ৩
মহা সৈন্য দেখি হত ক্রোধেতে আকুল মন
ধাইল নিশুম্ভ তবে লয়ে মুখ্য সেনাগণ। ৪
অগ্রে, পৃষ্ঠে, পার্শ্বে, লয়ে গেল মহাসুরগণ,
দেবীকে বধিতে ক্রোধে অধর করি দংশন। ৫

আসিল ও মহাবীর্য্য শুম্ভ স্বসৈন্যে বেষ্টিত,
বধিতে চণ্ডিকা, যুঝি মাতৃকাগণ সহিত। ৬
শুম্ভ নিশুম্ভের সহ দেবীর হইল রণ,
মেঘ মত অতি উগ্র করিয়া শর বর্ষণ। ৭
কাটিলা সে শরজাল চণ্ডিকা তাঁহার শরে,
আহত করিলা শস্ত্রে যুগল অসুরেশ্বরে। ৮
নিশুম্ভ নিশিত খড়্গ লইয়া চর্ম্ম ভাস্বর
উত্তম বাহন সিংহে আঘাতিল শিরোপর। ৯
বাহন তাড়িত দেখি ক্ষুরপ্রে দেবী তখন
অষ্টচন্দ্র চর্ম্ম সহ কাটিলা অসি উত্তম। ১০
ছিন্ন চর্ম্ম খড়্গ, শক্তি, নিক্ষেপিল সে অসুর,
আগত সে শক্তি চক্রে কাটি করিলেন দূর। ১১
গর্জ্জিয়া ক্রোধে নিশুম্ভ করিল শূল গ্রহণ,
তাও চূর্ণ মুষ্টিপাতে করিলা দেবী তখন। ১২
ঘুরাইয়া গদা সেও ক্ষেপিল চণ্ডিকা প্রতি,
ত্রিশূলেতে ভিন্ন ভস্ম করিলেন তাহা সতী। ১৩
আসিয়া দৈত্যপুঙ্গব তখন পরশু করে,
আঘাতিল, দেবী বাণে ফেলিলেন মহীপরে। ১৪
ভূমিতে পড়িলে ভ্রাতা নিশুম্ভ ভীম বিক্রম
ক্রোধেতে আসিল শুম্ভ অম্বিকা বধ কারণ। ১৫
সরথ উঠিয়া উচ্চে লইয়া আয়ুধ সব
অষ্ট ভুজে অতুলিত, ব্যাপৃত করিল নভঃ। ১৬
দেবী বাজাইলা শঙ্খ দেখি তাকে উপস্থিত,
ধনুর টঙ্কার শব্দ করিলা সহনাতীত। ১৭
নিজ ঘণ্টাস্বনে দেবী পূরিলেন দিঙ্‌মণ্ডল,
হততেজ করি তাহে সমস্ত দানব বল। ১৮

সিংহ ছাড়ি মহানাদ, মহামদ করিগণ
পরিপূর্ণ দশদিক্ করিল পৃথ্বী গগণ । ১৯
লম্ফ দিয়া কালী করে করিলেন বিতাড়িত,
গগণ পৃথিবী করি পূর্ব্বনাদ তিরোহিত । ২০
হাসিলেন শিবদূতী অশিব অট্টাট্ট হাসি ।
সে অসুর ত্রাস শব্দে শুম্ভ কোপে অগ্নিরাশি । ২১
"তিষ্ঠ তিষ্ঠ"—দুরাত্মাকে কহিলা অম্বিকা যবে,
"জয়া" নাম দিলা তাঁকে আকাশস্থ দেব সবে । ২২
শুম্ভ নিক্ষেপিত শক্তি বিভীষণা প্রজ্বলিত
বহ্নি আভা, হলো মহা উল্কা অস্ত্রে নিবারিত । ২৩
শুম্ভ সিংহনাদে ব্যাপ্ত করি লোকত্রয়ান্তর
নিস্বন—নির্ঘাত ঘোরে জিনিল, হে পৃথ্বীশ্বর ! ২৪
শুম্ভ ত্যক্ত শর দেবী, শুম্ভ তাঁর শরগণ,
কাটিল স্ব উগ্রশরে শত শত অগণন । ২৫
তখন চণ্ডিকা ক্রোধে করিলা শূল প্রহার
আহত মূর্চ্ছিত ভূমে পড়িল সে দুরাচার । ২৬
নিশুম্ভ চেতনা পেয়ে কার্ম্মুক করি গৃহীত,
কালীকেশরীকে শরে করিলেক আঘাতিত । ২৭
পুনশ্চ অযুত বাহু সৃজিয়া দনুজেশ্বর,
চণ্ডিকার চক্রায়ুধে ছাইল দিতিজবর । ২৮
তবে ক্রুদ্ধা ভগবতী দুর্গা দুর্গার্ত্তিনাশনী,
সে চক্র সায়ক সব কাটিলা শরে তখনি । ২৯
দৈত্যসেনা সমাবৃত নিশুম্ভ তখন ধায়
সবেগে লইয়া গদা বধিবারে চণ্ডিকায় । ৩০
কাটিলা চণ্ডিকা শীঘ্র সেই গদা নিক্ষেপিত
শিরধার খড়্গে, শূল হইল তবে গৃহীত । ৩১

আসিতেছি শূল হস্তে নিশুম্ভ অমরার্দ্দন,
চণ্ডিকা বিঁধিলা বেগে হৃদয় শূলে তখন। ৩২
শূলে ভিন্ন বক্ষ হ'তে জনমি পুরুষ আর—
মহাবল মহাবীর্য্য কহে "তিষ্ঠ" বারংবার। ৩৩
সহাস্য আস্যেতে খড়্গে কাটিলেন শির তার,
হইল তখন সেই ভূমিতলে নিপতিত। ৩৪
তখন খাইল সিংহ উগ্রদন্তে শিরোধর,
খাইলা অসুরে কালী, শিবদূতী তথাপর। ৩৫
কৌমারী শক্তিতে ভিন্ন করে মহাসুরচয়,
মন্ত্রপূত জলে অন্যে ব্রহ্মাণী করিল জয়। ৩৬
অপর ত্রিশূলে ভিন্ন করিলেন মাহেশ্বরী।
ফেলিল বারাহী ভূমে তুণ্ডাঘাতে চূর্ণ করি। ৩৭
চক্রে খণ্ড খণ্ড করে বৈষ্ণবী দানব যত,
ঐন্দ্রাণী হস্তাগ্র-মুক্ত বজ্রে অন্যে করে হত। ৩৮
বিনষ্ট অসুর কেহ, কেহ যুদ্ধে পলায়িত,
কালী শিব দূতী সিংহে হইল অন্য ভক্ষিত। ৩৯
ইতি নিশুম্ভ বধ নামক নবম মাহাত্ম্য। ৯

[দশম মাহাত্ম্য।]

—*—

চণ্ডিকাকে নমস্কার।

ঋষি কহিলেন।

হত প্রাণসম ভ্রাতা নিশুম্ভ করি দর্শন,
হত সৈন্যগণ,—ক্রুদ্ধ কহিল শুম্ভ তখন।

"বলোন্মত্তা দুষ্টে! দুর্গে! হইওনা গরবিণী।"
অন্য বলাশ্রয়ে তুমি যুঝিছ অতি মানিনী। ২

দেবী কহিলেন।

এ জগতে একা আমি কে মম দ্বিতীয়া আর?
আমাতে পশিছে দেখ বিভূতিচয় আমার। ৩
ব্রহ্মাণী প্রমুখ তবে সমস্ত সে দেবীগণ,
গেল দেবী দেহে, র'ল অম্বিকা একা তখন। ৪

দেবী কহিলেন।

বহু বিভূতির রূপে ছিনু যাহে, অতঃপর
হরিলাম, একা আমি, যুদ্ধে থাক স্থিরতর। ৫

ঋষি কহিলেন।

দেবীর শুম্ভের তরে হইল দারুণ রণ।
বুঝিল সকল দেব সকল অসুর গণ।
শিত শস্ত্রে দারুণাস্ত্রে, বরিষণ করি শর,
হলো যুদ্ধ পুনঃ পুনঃ সর্ব্বলোক ভয়ঙ্কর। ৭
দিব্য অস্ত্র শত শত বর্ষিলা অম্বিকা যাহা,
অস্ত্র প্রতিঘাতে সব ভাঙ্গিল দৈত্যেন্দ্র তাহা। ৮
তার কর-মুক্ত যত দিব্যাস্ত্র পরমেশ্বরী
ভাঙ্গিল লীলায়, উগ্র হুহুকার শব্দ করি। ৯
করিল দেবীকে শরে সে অসুরে আচ্ছাদন,
কাটিলা কুপিতা দেবী অস্ত্রে তার শরাসন। ১০
ছিন্ন হ'লে ধনু, দৈত্য করিল শক্তি গ্রহণ,
কাটিলেন চক্রে দেবী তাও করে সেইক্ষণ। ১১
শত-চন্দ্র-ভানু-প্রভা লইয়া খড়্গ তখন,
ধাইল দেবীর প্রতি দৈত্যপতি ক্রুদ্ধ মন। ১২

চণ্ডিকা কাটিলা শীঘ্র সেই খড়্গ আপতিত,
ধনুর্ম্মুক্ত-শিতবাণে—চর্ম্ম-অর্ক-প্রভান্বিত। ১৩
হত অশ্ব, হিসারথী, ছিন্ন ধনু দৈত্যবরে
লইল মুদ্গার ঘোর, অম্বিকা নিধন তরে। ১৪
মুদ্গর পতনোন্মুখ কাটিলা নিশিত শরে,
তথাপি ধাইল দৈত্য তুলি মুষ্টি বেগবরে। ১৫
দেবীর হৃদয়ে মুষ্টি প্রহারিল দৈত্যনাথ,
দেবী উরসেতে তার করিলা চপেটাঘাত।
সে প্রহারে অভিহত মহীতলে নিপতিত
হ'য়ে দৈত্যরাজ শীঘ্র হইল পুনঃ উত্থিত। ১৭
দেবীকে আকাশে লম্ফে করিল সে উত্তোলন,
তথাপি সে নিরাধারা চণ্ডিকা করিলা রণ। ১৮
দৈত্য চণ্ডিকায় যুদ্ধ আকাশেতে পরস্পর
হলো সিদ্ধ মুনিদের প্রথমে বিস্ময়কর। ১৯
অম্বিকার সহ যুদ্ধ করি তবে মহাবলে,
লম্ফ দিয়া ঘুরাইয়া নিক্ষেপিল মহীতলে। ২০
পড়িলে ধরণী পৃষ্ঠে, তুলি মুষ্টি বেগভরে
ধাইল দুষ্টাত্মা ক্রোধে অম্বিকা নিধন তরে। ২১
দেখি সমাগত দেবী সর্ব্বদৈত্যজনেশ্বর
শূলে বিদারিয়া বক্ষ ফেলিলা অবনীপর ২২
মরিল সে পড়ি ভূমে দেবী শূলাগ্র বিক্ষত।
কাঁপিল সকল পৃথ্বী সসিন্ধু-দ্বীপ-পর্ব্বত। ২৩
হত হ'লে দুরাত্মন্ প্রসন্ন হইল ভব।
জগত লভিল স্বাস্থ্য, নির্ম্মল হইল নভঃ। ২৪
উল্কাসহ মেঘোৎপাত হলো সব প্রশমিত,
নিরাপদ নদী, পথ হইলে সে নিপতিত। ২৫

সর্ব্ব দেবগণ তবে হলো হর্ষান্বিত মন,
আনন্দে ললিত বাদ্য, হইলে তার নিধন,
বাজাইল গন্ধর্ব্বেরা ; নাচিল অপ্সরোগণ। ২৬
বহিল পুণ্য বাতাস সুখ প্রভা আখণ্ডল,
জ্বলিল শান্ত অনল, শান্ত দিক্ কোলাহল। ২৭
ইতি শুম্ভ বধ নামক দশম মাহাত্ম্য। ১০।

।একাদশ মাহাত্ম্য।।

চণ্ডিকাকে নমস্কার।

ঋষি কহিলেন।

মহ অসুরেন্দ্র হত হলে, তবে ইন্দ্র সহ
বহ্নি পুরোগামী সুরগণ,
করে স্তুতি কাত্যায়নী,—হর্ষ বিকশিত আশা,
ইষ্ট লভি প্রফুল্ল বদন। ১
দেবি দুঃখহরা হরে! প্রসীদ,—প্রসীদ মাতঃ!
হে অখিল জগত জননি!
প্রসীদ হে বিশ্বেশ্বরি, রক্ষ বিশ্ব তুমি দেবি
চরাচর ঈশ্বরী আপনি। ২
একা তুমি জগতের হইয়া আধারভূতা
মহীরূপে আছ অবস্থিত,
জলরূপে করি স্থিতি, অলঙ্ঘ্য বীর্য্যেতে তব
কর সর্ব্ব বিশ্ব আপ্যায়িত। ৩

মার্কণ্ডেয় চণ্ডী। ২১০৩

তুমি হে বৈষ্ণবী শক্তি, অনন্ত বীর্য্যশালিনী,
মায়া বিশ্ববীজ সনাতন,
সকলি মোহিত দেবি! তোমা হ'তে, তব কৃপা।
জগতের মুক্তির কারণ। ৪
হে দেবি! সমস্ত বিদ্যা তোমার বিভিন্ন রূপ
তুমি জগতের স্ত্রী সকল;
তোমায় পূরিত একা; তুমি ভিন্ন আছে কিবা
তব স্তব অত্যুক্তি কেবল। ৫
সর্ব্বভূতা যবে দেবী স্বর্গ মুক্তি প্রদায়িনী,
তুমি স্তুতা আর কেবা পরমোক্ত স্বরূপিণী। ৬
সকলের বুদ্ধিরূপে হৃদয়ে স্থিতি তোমার
স্বর্গ মোক্ষ প্রদায়িনি! নারায়ণি! নমস্কার। ৭
পরিণাম প্রদায়িনী, কলাপল রূপ যার,
বিশ্বের পরমাশক্তি, নারায়ণি নমস্কার। ৮
সর্ব্বার্থ সাধিকে শিবে! হে সর্ব্ব মঙ্গলাধার।
শরণ্যে! ত্র্যম্বকে! গৌরি! নারায়ণি! নমস্কার। ৯
সৃষ্টি স্থিতি বিনাশের শক্তিভূতা মূলাধার,
গুণাশ্রয়া গুণময়ী নারায়ণি! নমস্কার।১০
শরণাগত দীনার্ত্ত তুমিই কর উদ্ধার,
সর্ব্ব দুঃখ হরে দেবি! নারায়ণি! নমস্কার। ১১
ব্রহ্মাণী রূপ ধারিণী হংসযুক্ত রথ যাঁর,
কুশা-জল-বরষিণি! নারায়ণি! নমস্কার। ১২
শূল-চন্দ্র-অহি-ধরে! বৃষভ বাহন যাঁর,
মাহেশ্বরী স্বরূপেতে—নারায়ণি! নমস্কার! ১৩
ময়ূর কুক্কুটাবৃতা মহাশক্তি নির্ব্বিকার,
কৌমারী রূপ ধারিণী, নারায়ণি! নমস্কার। ১৪

শঙ্খ, চক্র, গদা, শার্ঙ্গ, পরম আয়ুধ যাঁর,
প্রসীদ বৈষ্ণবী-রূপে! নারায়ণি! নমস্কার। ১৫
উগ্র মহাচক্র ধরা, ধরার দন্তে উদ্ধার
করিলে বরাহ রূপে, নারায়ণি! নমস্কার। ১৬
উগ্র নৃসিংহের রূপে করিয়া দৈত্য সংহার
ত্রৈলোক্য করিলে ত্রাণ, নারায়ণি! নমস্কার। ১৭
কিরীটিনি! মহাবজ্রে! সহস্র নয়ন যাঁর,
বৃত্র-প্রাণ-হরা-ঐন্দ্রি! নারায়ণি! নমস্কার। ১৮
শিবদূতী স্বরূপেতে বধিলে দৈত্য অপার,
ঘোররূপা, মহারাবা, নারায়ণি! নমস্কার। ১৯
দংষ্ট্রা-করাল-বদনে! শিরোমালা অলঙ্কার,
চামুণ্ডে! মুণ্ডমথিনি! নারায়ণি! নমস্কার। ২০
লক্ষ্মি, লজ্জা, মহাবিদ্যা, শ্রদ্ধা, সৃষ্টি, স্বধা, সার,
মহারাত্রি, মহাদিবা, নারায়ণি! নমস্কার। ২১
মেধে! সরস্বতি! বরে! সৃষ্টি, স্থিতি, ধ্বংস আর,
নিয়তি! প্রসন্না হও, নারায়ণি! নমস্কার। ২২
সর্ব্বরূপা, সর্ব্বেশ্বরী, সর্ব্বশক্তি মা তোমার;
ভয়ে ত্রাণ কর দুর্গে! নারায়ণি! নমস্কার। ২৩
লোচন-ত্রয় ভূষিত বদন সৌম্য তোমার,
রক্ষ সর্ব্ব ভূত হ'তে কাত্যায়নি! নমস্কার। ২৪
অত্যুগ্র-জ্বালা-করাল, অশেষ দৈত্য সংহার—
ত্রিশূলেতে রক্ষ ভীতে, ভদ্রকালি! নমস্কার। ২৫
নাশিল যে দৈত্যতেজ, জগত পূরিয়া স্বনে,
সে ঘণ্টায় পাপ হ'তে রক্ষ দেবি! সুতগণে। ২৬
দৈত্য-রক্ত-বসা-পঙ্কে-চর্চ্চিত খড়্গ উজ্জ্বল
কর শুভ হে চণ্ডিকে! আমরা নমি সকল। ২৭

তুষ্টা হ'লে, রোগ বিনাশ সকল ;
রুষ্টা হ'লে, সর্ব্ব কামনা বিফল।
তব আশ্রিতেরা অবিপন্ন সদা ;
তবাশ্রিতে প্রাপ্ত আশ্রয় কেবল। ২৮
দেবি! ধর্ম্মদ্বেষী মহাসুরগণ,
এই তুমি অদ্য করিলে সংহার
অনেক রূপেতে, বহু মূর্ত্তি ধরি,—
হে অম্বিকে! অন্য কেবা পারে আর। ২৯
শাস্ত্রে ও বিদ্যায় আদ্যজ্ঞান দীপে,
বাক্যেতেও অন্য আছে কেবা আর ?
মমতা গুহায়, মোহ অন্ধকারে,
ঘুরাইছ অতি এ বিশ্ব সংসার। ৩০
রক্ষ যথা উগ্রবিষ নাগগণ,
যথা অরিগণ, যথা দস্যু বল।
দাবানল যথা, তথা সিন্ধু গর্ভে,
রক্ষা কর তুমি এ বিশ্বমণ্ডল। ৩১
বিশ্বেশ্বরি! তুমি পাল এই বিশ্ব,
বিশ্ব আত্মা, কর এ বিশ্ব ধারণ ;
বিশ্ব-ঈশ্বরের বন্দনীয়া তুমি,
বিশ্বের আশ্রয় তব ভক্তগণ।৩২
অবিনীত আমাদেরে প্রসন্ন হইয়া
রক্ষ নিত্য, যথা দৈত্য বধিয়া এখন।
সর্ব্ব জগতের পাপ কর প্রশমিত,
উৎপাতজনিত মহা অমঙ্গলগণ। ৩৩
প্রণতে প্রসন্ন হও, বিশ্ব-দুঃখ-বিনাশিনি।
ত্রৈলোক্য-বাসী-আরাধ্যে! ত্রিলোক বর দায়িনী।৩।

দেবী কহিলেন।

দিব বর, সুরগণ যেই বর মনে ধরে
ইচ্ছা কর, দিব আমি জগত হিতের তরে। ৩৫

দেবগণ কহিলেন

ত্রৈলোক্য-অখিলেশ্বরি! সর্ব্ব বাধা প্রশমিত
কর, এইরূপে করি সুরবৈরি বিনাশিত। ৩৬

দেবী কহিলেন।

অষ্টাবিংশতি যুগেতে, বৈবস্বত মন্বন্তরে,
শুম্ভ নিশুম্ভের জন্ম হ'বে যবে নামান্তরে,। ৩৭
নন্দ গোপ গৃহে জন্মি পুণ্যগর্ভে যশোদার,
বিন্ধ্যাচল নিবাসিনী, করিব সব সংহার। ৩৮
পুনরপি অতি রৌদ্র রূপেতে পৃথিবী তলে
অবতরি বিনাশিব বৈপ্রচিত্ত দৈত্যদলে। ৩৯
বিপ্রচিত্ত বংশোদ্ভব ভক্ষি মহাসুরগণ
হব আমি রক্তদন্তা দাড়িম্ব-কুসুমোপম। ৪০
তখন দেবতা স্বর্গে মর্ত্ত্যেতে মানব স্তুত,
কহিবে রক্ত-দন্তিকা আমায় পূজি সতত। ৪১
শত বর্ষ অনাবৃষ্টি হইবে আবার যবে
মুনিস্তুতা হয়ে জন্ম লব অযোনিজা তবে। ৪২
শত নেত্রে আমি তবে নিরখিব মুনিগণ,—
শতাক্ষী বলিয়া নর গাইবেক কীর্ত্তি মম। ৪৩
জীবন-ধারক শাকে—আপন দেহ-সম্ভব—
আবৃষ্টিতে দেবগণ! পালিব অখিল-ভব। ৪৪
শাকম্ভরী নামে খ্যাতি ভূতলে লভি তখন,
দুর্গমাখ্য মহাসুর বিনাশিব করি রণ,—
দুর্গাদেবী নাম তবে হইবে বিখ্যাত মম। ৪৫

যাব ভীম রূপ ধরি হিমাচলে পুনর্ব্বার
মুনিদের ত্রাণ হেতু করিব রক্ষ সংহার, । ৪৬
তুষিবে আমায় সবে নম্রমূর্ত্তি মুনিগণ,—
ভীমাদেবী নাম মম হইবে খ্যাত তখন। ৪৭
অরুণাখ্য মহাবাধা ত্রিলোকে করিবে যবে
ষট্‌পদ ভ্রমর রূপ গ্রহণ করিব তবে। ৪৮
ত্রিলোকের হিত তরে বধিব অসুরগণ,
ভ্রামরী নামেতে তবে তুষিবেক সর্ব্বজন। ৪৯
এরূপে দানবগণ ঘটাবে বাধা যখন
অবতীর্ণা হয়ে আমি বিনাশিব শত্রুগণ। ৫০

ইতি নারায়ণী-স্তুতি—নামক একাদশ মাহাত্ম্য। ১১

[দ্বাদশ মাহাত্ম্য]

চণ্ডিকাকে নমস্কার।

দেবী কহিলেন।

এই স্তবে আমাকে যে নিত্য তোষে সমাহিত,
তাহার সকল বিঘ্ন বিনাশি আমি নিশ্চিত। ১
মধু কৈটভের নাশ, মহিষাসুর-ঘাতন,
শুম্ভ নিশুম্ভের বধ তথা, যে করে কীর্ত্তন, ২
অষ্টমী কি চতুর্দ্দশী নবমীতে একমন
শুনে যেই ভক্তগণ মাহাত্ম্য মম উত্তম, ৩
তাদের দুষ্কৃত কিছু, আপদ দুষ্কৃতোত্থিত,
না ঘটে, ইষ্ট-বিয়োগ, দরিদ্রতা কদাচিত। ৪

শত্রুভয় নাহি তার, নাহি দস্যু-রাজ-ভয়,
অস্ত্রানলে, জলে, কভু আহত সে নাহি হয়। ৫
মঙ্গল মাহাত্ম্য মম করি চিত্ত-সমাহিত,
পড়িবে, শুনিবে সদা হ'য়ে ভক্তি-সমন্বিত। ৬
মহামারী সমুদ্ভূত অশেষ বিপদচয়,
ত্রিবিধ উৎপাত, মম মাহাত্ম্যে শমিত হয়। ৭
যে ইহা সম্যক্ পড়ে নিত্য নিজ নিকেতনে,
না ছাড়ি তাহাকে, থাকি সতত তার সদনে। ৮
বলিদানে, অগ্নিকার্য্যে, পূজায় বা মহোৎসবে
সদা মম এ চরিত কহিবে শুনিবে সবে। ৯
বলি পূজা করি দান, জানত কি অজানত,
প্রীতি ইচ্ছে করি মম বহ্নি হোম সেই মত, ১০
শরৎকালে মহাপূজা বার্ষিক করে যে জন,
তথা এ মাহাত্ম্য মম শুনে ভক্তিপরায়ণ, ১১
সর্ব্ব বিঘ্ন বিনির্ম্মুক্ত ধন ধান্য সুতান্বিত
হয় নরগণ সবে প্রসাদে মম নিশ্চিত। ১২
শুনি এ মাহাত্ম্য মম, উৎপত্তি মঙ্গলময়,
লভে যুদ্ধে পরাক্রম পুরুষশ্রেষ্ঠ নির্ভয়। ১৩
রিপুগণ ক্ষয়প্রাপ্ত, কল্যাণ হয় বর্দ্ধিত,
শুনিলে মাহাত্ম্য, কুল সমৃদ্ধি হয় নিশ্চিত। ১৪
সর্ব্ব শান্তি কর্ম্মে, হলে দুঃস্বপন দরশন,
উগ্র-গ্রহ পীড়াকালে শুনিবে মাহাত্ম্য মম। ১৫
নিদারুণ গ্রহপীড়া, শান্তি হয় রোগচয়,
নরের দুঃস্বপ্ন ঘুচি সুস্বপ্ন উদয় হয়। ১৬
শিশুদের বালগ্রহ রোগ করে প্রশমন,
ঘুচিয়া শত্রুতা ঘোর মিত্রতা হয় উত্তম। ১৭

মহা বলহানিকর অশেষ দুর্বৃত্তচয়,
রক্ষ, ভূত, পিশাচেরা, পঠনেই নষ্ট হয়। ১৮
সর্বমন্ত্রে মাহাত্ম্য এই সুখ-বিধায়ক মম
পশু, পুষ্প, অর্ঘ্য, ধূপ, সুগন্ধ দীপে-উত্তম। ১৯
বিপ্রের ভোজনে, হোমে, দিবানিশি শুদ্ধতম,
পাইলে বৎসর ভোগ হয় যেই প্রীতি মম, ২০
সে প্রীতি শুনিলে হয় বারেক এ সুচরিত।
শুনিলেই হরে পাপ, হয় রোগ প্রশমিত। ২১
রক্ষা করে ভূত হ'তে আমার জন্ম-কীর্ত্তন,
যুদ্ধে রক্ষে এ চরিত দুষ্ট-দৈত্য-বিনাশন,
শুনিলে তা বৈরি-ভয় নাহি ঘটে কদাচন। ২২
তোমরা ও ব্রহ্মর্ষিরা করিয়াছ স্তুতি যাহা,
যে স্তুতি করেছে ব্রহ্মা দিবে শুভমতি তাহা। ২৩
অরণ্যে, প্রান্তরে কিবা দেবাগ্নি পরিবেষ্টিত,
দস্যুতে বেষ্টিত শূন্যে, কিবা শত্রু করে ধৃত ২৪
সিংহ, ব্যাঘ্র, বন্যহস্তী করে যদি বিতাড়িত,
রাজ-ক্রোধে দণ্ডপ্রাপ্ত হয় বধ্য কি বন্দীত। ২৫
বাতে বিঘূর্ণিত কিবা, মহার্ণবে পোতে স্থিত;
সংগ্রামে দারুণ শস্ত্রে হয় যদি নিপতিত; ২৬
ঘোর সর্ব্ব বিপদেতে ব্যথিত, হলে পীড়িত;—
হয় বিঘ্ন-মুক্ত সব স্মরিলে মম চরিত। ২
আমার প্রভাবে সিংহ দস্যু কিংবা বৈরিগণ,
স্মরিলে চরিত মম, দূরে করে পলায়ন। ২৮

ঋষি কহিলেন।

ইহা কহি ভগবতী দর্শক দেবতা স্থান,—
চণ্ডিকা চণ্ড-বিক্রমা,—হইলেন অন্তর্দ্ধান। ২৯

নিরাতঙ্ক দেবগণ যথা-পূর্ব্ব অধিকার,
যজ্ঞভাগ করে ভোগ হইলে অরি সংহার। ৩০
দেবরিপু, বিশ্ব-ধ্বংসী, অতুল উগ্র-বিক্রম,
মহাবীর্য্য শুম্ভ আর নিশুম্ভ হ'লে নিধন
দেবী করে, পাতালেতে গেল শেষ দৈত্যগণ। ৩১
এইরূপে ভগবতী পুনঃ পুনঃ সর্ব্বক্ষণ
জগৎ পালন তরে লভেন, ভূপ! জনম। ৩২
বিশ্বের প্রসূতি তিনি, তাঁহাতে বিশ্ব মোহিত,
করেন পূজিতা হ'লে জ্ঞানোন্নতি প্রদানিত। ৩৩
মহামারী স্বরূপেতে মহাকালী চরাচর
করেন সকল ব্যাপ্ত মহাকালে, নৃপবর! ৩৪
তিনি কালে মহামারী তিনি সৃষ্টি-প্রসবিনী,
রক্ষেণ সকল ভূত, কালে সেই সনাতনী। ৩৫
নরের উন্নতি কালে লক্ষ্মী-বৃদ্ধি-প্রদায়িনী,
বিনাশ সময়ে তথা অলক্ষ্মী-ধ্বংস-কারিণী। ৩৬
পুষ্প, ধূপ, গন্ধাদিতে করিলে পূজা তাঁহার,
প্রদানেন বিত্ত, পুত্র, ধর্ম্মে মতি শুভ আর। ৩৭

ইতি শুম্ভ-নিশুম্ভ-বধ—নামক দ্বাদশ মাহাত্ম্য। ১২।

[ত্রয়োদশ মাহাত্ম্য]

—*—

চণ্ডিকাকে নমস্কার।

ঋষি কহিলেন।

কহিনু তোমায় ভূপ! দেবী মাহাত্ম্য উত্তম,
এরূপ প্রভাবা তিনি, করেন বিশ্ব ধারণ;—
বিষ্ণু মায়ায় বিদ্যা করেন সৃষ্টি যেমন। ১

দ্বিতীয় খণ্ডের

সূচী।